"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

বর্ষ ৩৩। সংখ্যা ৭
মাঘ, ১৩৭০

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক
গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

কথাপ্রসঙ্গে

কথার পরে পরে কতকগুলো কথা মনে হচ্ছে। একটা হচ্ছে এই যে, আমার বন্ধু নির্মলকুমার (বসু) বললেন, "আমাদের দেশে আমাদের যাঁরা ধর্মস্রষ্টা কিংবা ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা এসব কথা অনেক আগেই বলে এসেছেন, তাঁরা দুঃখকে ভালো করেই বুঝতেন।"

আমরা যখন ইস্কুলের ছাত্র তখন আমাদের মধ্যে নানা রকমের লোক ছিল। একজন একদিন হঠাৎ নিয়ে এল সাংখ্যের বই। তার প্রথম কথা রয়েছে মানুষের যত রকম দুঃখ তার নিবারণ করার চেষ্টা হচ্ছে মানুষের প্রধান কর্তব্য। অবশ্য ঐতিহাসিকরা বিবেচনা করবেন বুদ্ধদেব আগে বলেছিলেন কি তারা আগে বলেছিলেন। ওসব কথা ছেড়ে দিলে বিজ্ঞানের যে কথাটা সেটা হচ্ছে এই যে, ঠিক আমাদের ধার্মিকেরা যে ভাবে এর উত্তর দিতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানের উত্তর ঠিক তা নয়। বুদ্ধদেব যখন কিসা গৌতমীকে বললেন যে, "যাও তুমি, যার বাড়িতে কেউ মরে নি সেখান থেকে নিয়ে এস সর্ষে, তাহলে আমি তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি"—এটা সহানুভূতির চূড়ান্ত হতে পারে, মানুষকে অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে; কিন্তু তার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের মনোভাব একটু আপনারা বিচার করে দেখুন। হঠাৎ কয়েকটা লোক বসন্তে মারা গেল। তাদের বাঁচাবার কথা হল না কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে যে এরকম বিপদপাত হল তার জন্য তাদের একথা বলে সান্ত্বনা দিলে না যে এটা ভগবানের মার। বরঞ্চ তারা মনে করলে যে আমাদের কোথাও একটা ঘাটতি হয়ে গেছে। অতএব এর জন্য তৎপর হতে হবে। মানুষের দুঃখ ভগবান এমন ভাবে

দিয়েছেন যে তাকে যদি বলা যায় সেটা নেই, তাহলে সত্যি সত্যি জগৎ নেই এ কথাই বলতে হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে জগৎ যদি না থাকে তাহলে আমরাও নেই। শেষ অবধি গিয়ে দাঁড়াবে অদ্বৈতবাদে।

আজকে আমি রমণ মহর্ষির বই পড়ছিলাম—তাঁর জীবনী। তাতে দেখা গেল যে ভারতবর্ষেও যে সাধনা মূর্ত হয়ে অরুণাচলে ছিল তার ভেতরে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যেটা এসব দুঃখে প্রবৃত্ত বৈদেশিকের মনের ভেতরে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু শোকে অভিভূত হয়ে সান্ত্বনা পাওয়ার কথা এক, আর লক্ষ্মণের বলিষ্ঠভাবে লাঠি হাতে করে বেরনো, যে মানুষের কে শত্রু আছে তাকে নিপাত করব, এটা দুটো আলাদা। এই মনোভাব মানুষ প্রথম দিন পায় নি—ক্রমশ পেয়েছে—এই বিংশ শতাব্দীর এতদিনের সাধনার ফলে অন্তত এটুকু পেয়েছে বলা যেতে পারে।

আমি সনাতনীদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সব কিছু আমার বন্ধু যেমন বলতেন ঠাট্টা করে যে 'ব্যাদে আছে'; সে—'বেদে আছে' এই মনোভাবটা অনেক সময়তে যদি নিদান করতে হয় তাহলে মাঝে মাঝে শক্ত কথাই বলতে হয়। আমি অবশ্য খুব ভক্তিমান,—আমি বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সবারই থেকে বেশি শ্রদ্ধা করি বুদ্ধদেবকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলি, বুদ্ধদেবকে আমরা আড়াই হাজার বৎসর বাদে জয়ন্তী করে দিয়ে,—অন্তত তাঁর প্রতি এত বছর ধরে যে অবিচার করে এসেছি তার কিছু দাম দেবার চেষ্টা করেছি। যদিও তাঁকে আমরা ভগবান করেছি। এ রকম অনেক লোককে,—আমাদের একটা উপায় হচ্ছে তাকে ভগবানের তক্তাতে বসিয়ে দিলেই তার কথা শোনবার আর দরকার নেই। আগেকার কথা আমি বলব না, সম্প্রতি ভারতবর্ষেও অনেক কিছু ঘটে গেছে—যা থেকে আপনাদের সহজেই এসব কথা মনে পড়বে। আজকের দিনেও আপনারা রবীন্দ্রনাথকে পূজা করে তক্তে বসিয়ে দিচ্ছেন। তারপরে রবীন্দ্রনাথের কোনো কথা ভাববার দরকার থাকবে না। আমরা তাঁকে মিউজিয়াম পিসের মধ্যে তুলে নিলাম।

আর আমাদের দেশের কথাতে দু-চারটে কথা মনে হয় যে অন্তত আমরা যারা বিজ্ঞানী, তাদের কতকগুলো কথা মনে রাখতে হবে। একবার পরিহাসচ্ছলে আমাদের দেশের এক নেতা বলেছিলেন আর একজন বিশেষ কোনো নেতার বিষয়ে যিনি সনাতনী। বলেছিলেন, "লোকটি এমন—

সোজা ছুরি যদি তার মধ্যে চালিয়ে দাও তাহলে সেটা cork-screw হয়ে বেরিয়ে আসবে।" আমাদের দেশে লোকের মনোভাব হয়তো এই ধরনের। খুব সোজা সরল সত্যকথা বললে সেটা অনেক সময় কাব্য হয়ে বেরিয়ে আসবে। অদ্ভুত মনোভাব। এইটে আমার বার বার মনে হয় যে আমাদের কথাও যেমন, চলনেও তেমনি এবং বিজ্ঞানেও প্রায় তাই। যে মনোভাব বলিষ্ঠ, যেটা, যাকে বলে কোদালকে কোদাল বলা,—সেটা যেন আমাদের মনেতে বিশেষ নেই। আমাদের সবই কাব্য !—কাব্যমধু খেয়ে আমরা একেবারে এমন মাতোয়ারা হয়ে আছি যে চোখের সামনে আর কিছু দেখি না। অবশ্য আমি বলছি যে, সে হয়তো দেখে যে এই স্রষ্টা পৃথিবীটাকে এত সুন্দর করে তোলেন নি যে তা দেখেই ভুলে যাবে যে তার ভেতরে এত দুঃখ-কষ্ট আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আমার যেটা আশ্চর্য লাগে সেটা হচ্ছে তাঁর শিশুর মতো মনোভাব। শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন তার সঙ্গে পরিচয় নেই কিছুরই অথচ সব জিনিসেতে সে আনন্দের আস্বাদ পায়, এই মনোভাব মানুষের হওয়া উচিত বলে আমাদের ও অন্য দেশেরও বহু মহাপুরুষরা বলে গিয়েছেন, যেমন যীশু বলেছেন ছেলেদের আমার কাছে আসতে দাও। শোনা যাচ্ছে অরুণাচলের রমণ ঋষির কাছেও ছেলেরা অনায়াসে চলে যেত। কিন্তু অন্য বহু লোক এসে তাঁর মুখ থেকে কোনো কথাই পেত না। এই শিশুর মনোভাব পরে মানুষের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়ে পাটোয়ারী বুদ্ধি ইত্যাদি নানান রকম জিনিস তার মধ্যে ঢোকে। সেটাকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে আসে যাতে তার কাছে সত্যও বিকৃত হয়ে দাঁড়ায়।

আমি যা বলছিলাম, সবই প্রায় কাব্য হয়ে যায় অনেক সময়ে। তাই ধর্মধ্বজীরা যখন অনেক সময়েতে বলে যান এবং চোখ দিয়ে অনবরত দুঃখের অশ্রু যখন তাঁর পড়ে তখন আমার মনে হয় যে ঘরের কোণে বসে কেবলমাত্র ভগবানের ওপর দোহাই না পেড়ে এবং মাথা না ঠুকে যদি প্রতীচ্যের লোকেরা বেরিয়ে পড়ে যে মানুষের শত্রুকে আমরা দমন করব তাহলে সেটা কিছু একটা চিরন্তনী সত্যের মধ্যে একটা নিম্নস্তরের মনোভাব এই বলে নিজেদের কিছু বাহবা নেবার কোনো দরকার নেই। কবে আমরা বুঝব যে এই ধরনের মনোভাব, যেটা সেই আদি যুগ থেকে মানুষ বিস্ময়ের চোখে যখন পৃথিবীকে দেখেছে তখন থেকেই তার মনে হয়েছে—হয়তো প্রস্ফুটিত হতে কোনো ভাষাতে দেরি লেগেছে, কোনো ভাষায় হয়তো

প্রথমেই ফুটেছে। কিন্তু এই মনোভাব যে চিরকালই সমস্ত কাজের ভেতরে ওতপ্রোতভাবে দেশের মানুষের মধ্যে ছিল না, যাঁরা একটু খোলা চোখে দেশের ইতিহাস অনুধাবন করবেন তাঁরাই তা বুঝতে পারবেন। যখন আমরা এদিকে সাংখ্যসূত্র পড়ছি তখন আমাদের আর একটা বই সঙ্গে সঙ্গে পকেটে থাকত, সেটা হচ্ছে ম্যাৎসিনির 'On the Duties of Man'। ছাত্ররা বোধ হয় এসব বই কখনো চোখেও দেখে নি। কিন্তু তখন, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন আমাদের মনে অত্যন্ত গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এই দুই ধর্মের পদ্ধতি যে, একটা হচ্ছে বলিষ্ঠভাবে পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করা—এর মধ্যে মায়ার প্রপঞ্চ যে সবই এবং নিজের মধ্যে যদি আমরা চলে যাই তাহলে ভাবা যেতে পারে—এই যে দেহ, এ দেহকে যদি ছুরি দিয়ে কাটি, আমাদের গায়ে যদি বিদ্ধ করে দিই বিষাক্ত বাণ, তাহলে ভেতরের আত্মাকে কেউ তো হত্যা করতে পারবে না। খুব ভালো কথা। অতএব যুদ্ধ কর, বাণ এবং অস্ত্রও চালাও, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতি যা কিছু সবই বধ করে চল। যখন মনে হবে যে তোমাদের সঙ্গে ঠিকমতো না মিলছে, তখন যে বেচারী শূদ্র, যার সাহস হয়েছে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করতে, যার দরুণ পৃথিবীতে দ্বাদশ বৎসর অবৃষ্টি, রাজার উচিত হচ্ছে প্রথমেই তার মুণ্ডচ্ছেদ করা। এসব কথা ভুললে চলবে না কেননা আমরা উপনিষদের বাণী দিয়ে পুষ্ট নই। সত্যিকারের হিন্দুসমাজ পুষ্ট হচ্ছে লোকমুখে নানাভাবে যে পুরাণশাস্ত্র থেকে মানুষের উপভোগ্য যে সমস্ত আখ্যায়িকা দেশের মধ্যে চলিত আছে তারই ওপর। এই বিশ্বাস সব দেশেই ছিল। আমি যে আমার নিজের দেশকে ভালোবাসি না, তা নয়। তবে আমি বলি এই যে ভালোবাসা যদি এমন রূপ নেয় যাতে পদে পদে সত্যের অপলাপ করতে হয়, তাহলে সে ভালোবাসার কোনো দাম নেই। যাকে গ্রহণ করতে হবে, যার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে তার যদি সমস্ত দোষ পর্যন্ত আমি গুণ বলে বর্ণনা করি তাহলে সে কাব্যের জগতেই চলে। মানুষের মধ্যে সেই মনোভাব আনা অত্যন্ত দুষ্কর। হয়তো আজকাল ছেলেদের মধ্যে সে মনোভাব হতে পারে তা আমি জানি না। আর এই যে বিস্ময়—আমরা যে সৃষ্টি করেছি আমরা যা সব গড়ে তুলেছি সেগুলিকে আমরা যেভাবে দেখি হয়তো বিদেশীদের মন সেগুলি সেভাবে নেয় না।

একটা গল্প বলি। বিদেশী একটি লোক এসেছিলেন যিনি চেকো-

স্লোভাকিয়ার, বাটানগরের সঙ্গে বিশেষ করে তাঁর সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্র-উৎসব সম্প্রতি যে সব হচ্ছে তার মধ্যে তিনি ছিলেন। গিয়ে দেখে-টেকে এসে, এমন, তারপরে তার দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে এবং যে তাঁকে সমস্ত জিনিস দেখিয়েছে তার সঙ্গে কথা হল। তাকে তিনি বললেন, "দেখ একটা জিনিস আমি দেখলুম, এ আমি আমার দেশের ডিরেক্টারকে না বলেই পারি না। তোমরা যাই বল না কেন, আমায় কিন্তু বলতেই হবে।" সে বেচারী, যে পথপ্রদর্শক হয়ে তাঁর সঙ্গে ঘুরেছিল, সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলো। ভাবল যে কি বা আমার হয়তো একটা দোষ হয়ে গিয়েছে। হয়তো এমন একটা কিছু করলাম, এরকম একজন মহামান্য অতিথি, তাঁকে হয়তো আমরা পুরোপুরি মাত্রায় শ্রদ্ধা দেখাতে পারিনি ; কি হয়েছে, কি বৃত্তান্ত। অনেকবার তাঁকে ধরাধরি করাতে শেষকালে বললে, "দেখ আমার চোখেতে যেটা লাগল সেটা অদ্ভুত জিনিস। এই শান্তিনিকেতনে কেউ জুতো পরে না!"— এই যে বাটার লোক আমাদের সভ্যতাটাকে কি চোখে দেখেছে সেটা তোমরা কিছুটা বুঝতে পারলে। অনেক সময়ে মৌখিক তারিফ হয়তো আমাদের লোককে তারা জানায় কিন্তু মনের মধ্যে হয়তো বলে যে-এদের দেশের লোক জুতো পরে না।

এই, তাছাড়া আমাদের বাঙলাভাষায় যে বিজ্ঞানের চর্চা করা উচিত রবীন্দ্রনাথ এতদিন আগে বলে গিয়েছেন তা সত্বেও আমাদের দেশের মন কি নড়াতে পারা গিয়েছে? তোমরাই জানো, আমি তো চিরকাল বেঁচে থাকব না,—অবশ্য আমাকে লোকে বলে ঐ একটি লোক আছে—আর কেউ চায় না, আর রবীন্দ্রনাথ চাইতেন। তিনি তো কবি মানুষ তিনি তো বোঝেন না বৈজ্ঞানিক যে উন্নতি কি সমৃদ্ধি হতে গেলে বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখতে হয়। বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখা, মানে তার সঙ্গে সঙ্গে সে যে ভাষা বলবে সেই বুলি কাটা এবং যখনই যেটা বলবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যদি আসে তো সেই কথাটাই আবার চুনে নিয়ে আবার সেইগুলো যথাসম্ভব সেই ভাষাতেই উত্তর দেওয়া, এইটি হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের সবার থেকে প্রধান—যাকে বলে যে যেটার নির্যাস।

আমাদের দেশে অনেক সময়েতে দেখা যায় এই রকমই ব্যবস্থার এইটাই ফল। আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন নিজের দেশে। সেখানেও এইরকম হয়েছিল যে অনেক বিত্তের ভারেতে তাঁকে মুমূর্ষু হয়ে পড়তে হত। এবং

তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে, "পরীক্ষা দেবার পর এক বছর লাগল আমাকে এই যা মুখস্থ-টুখস্থ করে পাশ করতে হয়েছে তার থেকে আবার একটা মনোভাব ফিরিয়ে নিয়ে আসতে, যাতে আমি সব বিষয়ে উদ্ভাবনী শক্তিকে সামনে রেখে, উদ্ভাবনী শক্তি অনুসারে তাকে ভাবতে পারি।" তিনি একটা কথা বলেছেন যে, নানান রকম নিয়ম সিলেবাস ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ভালো করে বেঁধে প্রতি ঘণ্টায় এই করতে হবে রুটিন রেখে এবং প্রতি বৎসর বৎসর কি প্রতি মাসে পরীক্ষা দিতে হবে—এ রকম করলে আমাদের দেশের যে উদ্ভাবনীশক্তি সেটা ঠিক বেরুবে না। সৃজনীশক্তি চায় স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা এ নয় যে পরীক্ষা-হলে বই নিয়ে গিয়ে উত্তর লেখা—কিংবা মনোমত প্রশ্ন না পেলে খাতাপত্তর ছিঁড়ে দিয়ে উঠে চলে আসা। এটা ঠিক নয়। তিনি ভেবেছিলেন যে মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে, যে—যে বিজ্ঞান করতে এসেছে সে সেইরকম সাধকেরও মনোবৃত্তি আছে বলেই এইরকম বিরস বিষয় নিয়ে সে আলোচনা করতে রাজী হয়েছে। এগিয়ে চলতে চেয়েছে এই রকম বন্ধুর পথে। অন্তত তাকে এই স্বাধীনতাটুকু দাও যাতে এর ভেতর থেকে তার চিত্তাকর্ষক যা বলে মনে হয়, সেই জিনিস নিয়ে তারই রস সংগ্রহ করতে সে পারে। এই রকম ধরনের স্বাধীনতা না হলে সেখানেতে যাকে আমরা বলি talent, যেটা আজকাল বসু বিজ্ঞান মন্দিরেতে খোঁজাখুঁজি চলছে নাকি শুনেছি, সেটা হবে না। কেননা একটা বাঘ, ভাল্লুককে ধরে নিয়ে এসে যদি অনবরত বলা হয় "খিদে থাক আর না থাক্ তোকে গুঁতিয়ে খাওয়াবো" তাহলে তার ক্ষুধা চলে যায়। আমার বন্ধু শিবসুন্দরের দাদার একটা গল্পের কথা মনে হল, সেটা আর এখানে বলব না। সংক্ষেপে হল এই—তাঁর দাদা যাচ্ছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে, সেখানেতে নানান রকম খাওয়ার দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে, শেষ পর্ব ছিল রসগোল্লার হাঁড়ি। তিনি যখন বললেন, একটার বেশি দুটো খেতে পারব না, তখন গৃহস্বামী, যিনি তাঁদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি অভ্যাগতদের বললেন (একটু গোলাপী নেশার আমেজ ছিল)—"কি রকম, আমি এত পয়সা খরচ করে রসগোল্লা নিয়ে এলাম, তুমি খাবে না? তোমাকে মেরে খাওয়াবো।" তা সে আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে অনেক সময়ে দেখা যায়। বিশেষ করে আজকের দিনেতে যা শোনা যাচ্ছে, যে শিক্ষার নতুন সংস্করণ যা বেরোচ্ছে তার ব্যবস্থা দেখে প্রাণে ভয় আসে। কোথায় এ সমস্ত জিনিস অন্য দেশেতে নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে যখন

শেখানো হয়, তখন সেটা সহজ ও সরল হলেও, তারা যখন চায় ছেলেদের কাছে বহু পরিমাণে বহু জিনিসের সঙ্গে পরিচয় তখন-তারা স্বতঃই বুঝতে পারে যে এটা কিছু সম্ভব হবে না এত অল্পবয়স্ক ছেলেদের মধ্যে। কিন্তু আমাদের কর্তারা তাঁরা সে সব বিষয়ে ভাবেন না। তাঁরা ভাবেন একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে হবে। এতদিন পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। আর যদি বা চীন আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাহলে তো আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। অতএব পাঁচ বছরের ছেলেকে পর্যন্ত নিয়ে তাকে বিজ্ঞানের সমস্ত কঠিন বস্তুর সঙ্গে অন্তত পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। এই পরিচয়ের উপায় হল বই। এবং এ বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করছেন গ্রন্থ লেখক এবং শিক্ষক। কেননা তাঁরা প্রত্যেক বৎসর বই বদলাচ্ছেন। একজনকে চেষ্টা করা হল সাত বৎসর বয়সেতে কিছু অঙ্ক শেখাবার। খানিকদূর পারলেন কি পারলেন না। তার পরের ক্লাসের লোককে আর একখানা বই দেওয়া হল যাতে সে আর একটু ভালো করে শেখাতে পারে। এইভাবে চলছে, অভিভাবকগুলি জেরবার। কারণ প্রত্যেক দিনে তিনটি করে ছেলেকে যদি লেখাপড়া শেখাতে হয় তাহলে তার চৌর্যবৃত্তি করা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে বলে তো আমি মনে করি না।

এইভাবে আমাদের ভাবপ্রবণ দেশে যারা ওপর থেকেই স্বপ্ন দেখে এবং মাঝে যে কত খাদ এবং কত পাহাড় অতিক্রম করে তারপরে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে উঠতে হবে সে কথা ভুলে গিয়ে মনে করে যে আমরা এরোপ্লেনে চড়ে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর গিয়ে নেমে পড়ব। এইভাবে মনোভাব এবং সত্য কথা,—সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে তো কোনো তফাৎই নেই—কারণ যা সত্য, চিরন্তন সত্যের সঙ্গে যদি তার তুলনা করা যায় কোনোটাই সত্য বলা যাবে না, ব্যবহারবিদরা ঠিক করলেন, যে কোনো কথা বহুবার উচ্চারণ করা যাবে সেই কথাই সত্য হয়ে দাঁড়াবে। এটা আমার নিজের কথা নয়, এটা হিটলার বিশ্বাস করতেন এবং সুইডেনের লেখক বোইয়ার একটা বই লিখেছিলেন। তাতে বলেছিলেন "the power of a lie।" আমাদের দেশে এমন খুব সমীহ করে বলতে হয়, অসত্য কারুকে বলবার যো নেই—কারণ সেটা আপেক্ষিকতাবাদের মাধ্যমে একটা বিশেষ রকম দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্য হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই এই সমস্ত নানান রকম কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

কিন্তু এর ভেতর থেকে যেটা ফুটে উঠছে সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের

দেশের সাধারণ নিয়মের মধ্যে দিয়ে যিনি যান নি, যিনি সাদা চোখে দেখেছিলেন সমস্ত জিনিসটাকে, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুতদের হাতে পড়েন নি, যিনি চেষ্টা করেছিলেন জানালার খড়খড়ি তুলে আকাশের দৃশ্য দেখতে কিংবা জলে পাখি চড়ছে। সব জিনিস দেখে তার মনে যে বিস্ময় হয়েছিল সে পরিচয় সেই আনন্দটুকু আমরা পাই কিনা।

বিজ্ঞানীদের অনেক সময়ে পথের খোরাক হল এই যে, নানা রকম দুঃখ-কষ্ট হবে—বাড়িতে গেলে বৌয়ের মুখঝামটা খেতে হবে যে "তুমি কি এতক্ষণ করে এলে,—বাড়িতে যে চাল বাড়ন্ত এ তুমি খবর রাখছ না?" কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যে সত্যিকারের আলোচনার ভেতর দিয়ে যে মনের আনন্দ পাওয়া যায়। এ আনন্দের বর্ণনা স্বার্থের ভিত্তিতে নয়। পৃথিবীর উপকার করব, এ কথা ভাবলেও নয়। তার জবাব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যে এর এমন একটা আকর্ষণীশক্তি আছে যে মানুষের মন স্বভাবতই অভিভূত হয়ে পড়ে। এর মর্ম বুঝে যে শুধু আর একজনকে বোঝাবে তা নয়, তাতেই সে মোহিত হয়ে যায়। আমাদের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারকা, এ সবের বিষয়ে আলোচনা করে আমরা অনেক রকম গোলমাল সৃষ্টি করেছি যে ভগবান যেন আমাদের জন্যই এতকাল চলে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের মধ্যেও সে সব কথা আছে—আমার জন্য তুমি আসছ এতকাল ধরে। কিন্তু জ্যোতির্বেত্তা একবার আকাশের দিকে তাকালে দেখবেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নীহারিকা নক্ষত্র। অবশ্য এতদূর যে তার মধ্যে কোনো ছোট পৃথিবী দেখা যায় কিনা। আজকাল সে যায় না, তবে কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন "অন্তত আমাদের মতো একটা অবস্থা হবে তো।" কিন্তু সাংখ্যায়ন তত্ত্বের মূল হচ্ছে যে সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে যদি নানা রকমের প্রাথমিক অবস্থা থেকে চলা শুরু করা যায় তাহলে বহুদিন বাদে যে অবস্থায় আমরা এসে পৌঁছব তার মধ্যে একটা মোটামুটি সাদৃশ্য থাকবে। তোমরা জানো অবশ্য যারা এই Boltzmann-এর Entropy-র কথার বিষয়ে আলোচনা করেছ। অনেক সময়ে আমাদের এই সব কথাই ভাবতে হয় যে শুধু বস্তুজগতের বিষয়ে একথা খাটে কিংবা বস্তুজগতের মধ্যেই যে প্রাণের প্রকাশ এর বিশ্লেষণ করতেও কি সেই নিয়মই খাটাতে হবে? অর্থাৎ আমরা যেমন যুগ যুগ ধরে নানা রকম অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে প্রাণশক্তি মানুষে এসে পৌঁছেচি এই রকমের কোনো রকমের প্রাণী দূর নক্ষত্রলোকে থাকতেও বা পারে।

যারা সোভিয়েতের নানা রকম বই পড়ো তারা দেখবে যে জুলভার্নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই রকম ধরনের গল্প-টল্প তারা লিখছে। 'Andromeda' বলে একটা গল্প লিখেছে তার মধ্যেও এই রকম ধরনের কথাবার্তা। কিন্তু এতো গেল গল্প। লোকে আশা করছে বেতারবার্তার মধ্যে যে নানা রকম আকস্মিক অদ্ভুত রকমের আওয়াজ শুনতে পাই তার ভেতরেতে ন্যূনতম কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় হয়তো আছে, আর এটা বিচার করলে জানা যাবে যে বহুদূরের কোনো নীহারিকামণ্ডলীর ভেতরে আমাদেরই মতো কোনো গ্রহে হয়তো এ-রকম চিৎশক্তির বিকাশ হয়েছে। এ সমস্ত কথা মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। এবং এ ভাবনা শুধু কেবলমাত্র নিজের দুঃখ নিরসন নয়। একটা অদ্ভুত রকমের মনোভাব, এটা শুধু বিস্ময় নয়—যেন কতকটা স্রষ্টার মনোভাব—স্রষ্টার যে সৃষ্টি তার ভেতর দিয়ে তার সঙ্গে তাল রেখে ভাববার চেষ্টা করে তার মূলসূত্রটা ধরবার যে একটা চেষ্টা এটা শুধু কেবলমাত্র কবিত্বে পাওয়া যায় না—বিজ্ঞানীর মধ্যেও এ রকম মনোভাব আজকাল রয়েছে। কাজেই জ্যোতিবিজ্ঞানের মধ্যে তোমরা দেখতে পাবে অনেক সময়ে তারা ভাবছে কি ভাবে নীহারিকামণ্ডলীর সৃষ্টি হল, আর কি ভাবেই বা নক্ষত্রমণ্ডলী হল? ভগবান ঠিক একই সময়ে কি সৃষ্টি করে তারপর নাকে সর্ষে তেল দিয়ে ঘুমলেন আর বললেন, "যা হয় হোক"। না এখনও পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে জগৎ প্রসূত হচ্ছে আবার বিনষ্ট হচ্ছে? সব কথা ঠিক আমাদের দেশের পুরাণে পাওয়া যাবে না। অবশ্য হয়তো কেউ বলবেন যে গীতার অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে দেখবেন ভগবানের মুখ থেকে কত লক্ষ লক্ষ জীব ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। এ আলাদা কথা। অবশ্য আমার মনে হয় যে বর্তমানকে সহজভাবে স্বীকার করাই ভালো। আমাদের মনের মধ্যে একটা বিরুদ্ধভাব আছে যদি কেউ বলে যে আমাদের অতীতকালে কিছু ছিল না আমরা সহজেই চটে যাই।

আমার এক বন্ধু ছিলেন যিনি বেদের মধ্যে এক শ্লোক থেকে প্রমাণ করেছিলেন যে তখনকার লোকেদের নিশ্চয় এরোপ্লেনের সঙ্গে পরিচয় ছিল। অনেক শ্লোক বের করেছিলেন। রামায়ণের প্রথম শ্লোক থেকে অনেকে বলেছেন যে তারা কামানও জানতো ইত্যাদি অনেক ধরনের কথা।

বলতে ইচ্ছে করে এই, যে যেটা জানতো সেটা হচ্ছে এই যে হিংসা, দ্বেষ এখনকার মতনও তখন ছিল। আমার বন্ধু নির্মলকুমারের আনুকূল্যে তার ওখানে গিয়ে হরপ্পার কতকগুলো মাথা দেখলাম। তাঁরা খুঁজে বের করেছেন

যে কে বা কারা কতগুলো লোককে বেশ নির্মমভাবে হত্যা করেছিল বলেই মনে হয়। অবশ্য তারা কারা তা জানা নেই। এই হত্যাকাণ্ড চলছে আজকের দিনেও এবং কেউ যদি কথাটা বিশেষ করে বলতে পেরে থাকে যে এটার শেষ চাই; কেননা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষসমাজ এক;—একথা কেবল বিজ্ঞানীরাই বলেছেন। আমি সেইজন্য বর্তমান বিজ্ঞানীদের নমস্কার করছি। আর ভবিষ্যতে তোমরা যারা বিজ্ঞান-সাধক আছ, আমরা মনে করি যে, আমরা যা দেখে যাইনি তোমরা হয়তো দেখে যেতে পারবে, যাতে অনুভূতি নিবিড় হবে, যাতে তোমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা স্থির ধারণা থেকে যাবে যে মানুষ মাত্রেই এক এবং সকলে মিলে আমাদের এই মানবসভ্যতার সৌধ রচনা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই মহামানবের আসার কথা তিনি বলে গেছেন, তিনি বলেছেন, তিনি পদশব্দ শুনেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর মনোভাব পাওয়ার চেষ্টা করি। দেখা যায় যে তিনি বোধ হয় সব সময়ে খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কিন্তু যেটা ছিল তাঁর, যে সমস্ত রকমের বাক্যজালের ভেতর দিয়েও যে চিরন্তন সত্য, যে সত্য হয়তো রূপায়িত হয়নি, যে সত্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, সেই সত্যের পদধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। তোমাদের ধন্যবাদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে এক আলোচনা-চক্রে বিজ্ঞানাচার্যের প্রতিভাষণ।

সম্পাদক, পরিচয়

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

অঙ্গন থেকে প্রাঙ্গনে

যে স্কুলে আমি প্রথম ভর্তি হই তা সত্যই বাসাবাড়ির প্রাঙ্গণ। 'বঙ্গ বিদ্যালয়' প্রায় ঘরের সঙ্গে। প্রাঙ্গণ থেকে বরাবর তার ছাত্র ও শিক্ষকদের দেখেছি, শিক্ষকদের অধ্যাপনা শুনেছি, মাঝে-মাঝে চড়-চাপড়-বেত্রাঘাতেরও সাক্ষী। কাজেই, এ স্কুলের কোনো নতুনত্ব ছিল না। গৌরবও বোধ করতে পারি নি। স্কুলটা বাঙলা। সেই জীর্ণ পাকা-বাড়ি ও পুরনো ঘরগুলি মর্যাদাসূচক নয়। পরিবারে যিনি আমার জুটি এবং জন্মাবধি আমি যার অনুগামী (প্রফুল্ল হালদার, ডাক নাম 'সাধু')—তিনি তখন ইংরেজি স্কুলে পড়েন, আর এই 'বাঙলা' স্কুলের প্রতি—তার ঘর-দুয়ারের প্রতিও—তাঁর অবজ্ঞা। আমারও তাই লজ্জাবোধ না করে উপায় কি ?

কথাটা পরিবারে কারও অজানা নেই—আমিও তা অন্যত্র ইঙ্গিত করেছি—আমার কাছে সে বয়সে আদর্শস্থানীয় ছিলেন এই দাদা (তাঁকে আমি 'সাধু' বলেই ডাকি, আর দাদা বলে উল্লেখও করি না। বলব আমার জুটি—কিন্তু তিনি আমার থেকে প্রায় আড়াই বৎসরের বড়ো)। আদর্শ বদলে গিয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার আস্থা অম্লান। সে যা করত বাল্যে-কৈশোরে আমিও তাই করতাম—আজ যে করি না তার কারণ তা আমার সাধ্যাতীত। সে যা পড়ত, এক ক্লাশ পিছনে থেকে আমি তাই পড়তাম। প্রায় পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, সবই প্রায় এক সঙ্গে হয়েছে—যাঁরা জানতেন না তাঁরা এমনো মনে করতেন সাধু গোপাল বুঝি বাড়ির একই ছেলের নাম। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি তখনো দু-জনার উপার্জন থাকত এক বাক্সে, এক সঙ্গে—তারপরে দু-জনার পথ পৃথক হয়েছে। যতটা রাজনৈতিক পথের ও জীবিকাপথের পার্থক্যে পৃথক্ হতে পারে। না হলে আমার রাজনৈতিক দুর্যোগেও সে আমার

সম্পর্ক ত্যাগ করে নি, কোনো সঙ্কটেই না। আমরা এককালে, আকাশ-পাতাল তফাৎ আমাদের মতামতে ও কর্মপথে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর বন্ধুরা আমার বন্ধু, আমার বন্ধুরাও তাঁর। এ কথাটা অবশ্য আরও যিনি বড়ো—আমার থেকে সাত বৎসরের বড়ো, তাঁর জ্যেষ্ঠ—রঙ্গীনদা'র সম্বন্ধেও সত্য। এঁদের দু-জনার বা বোনদের মধ্যে লক্ষ্মীর (স্বর্গীয় ডাক্তার লক্ষ্মী হালদার) কথা যথার্থ রূপে বলা আমার কেন, অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। আমার পক্ষে অসম্ভব—কারণ, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অপরিমেয়ের কোঠায় পড়ে। অন্যের পক্ষে অসম্ভব, কারণ সত্যই এঁদের মতো বিশিষ্ট মানুষ বিশেষ দেখা যায় না।

কিসে এঁদের সেই বৈশিষ্ট্য ? হয়তো বৈশিষ্ট্য জিনিসটাই বিশ্লেষণাতীত না হলে সাধুকে শুধু বিচক্ষণ স্থিরচিত্ত ও দায়িত্বশীল সুহৃদ বললে কি বুঝানো যায় ? সেদিন বাদামতলায় মারবেল্ খেলায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। অন্য পাড়ার সঙ্গে বারবার আমরা দ্বন্দ্বে নামতাম, সগৌরবে দেখেছি—অমন তাক্ কারো নেই। অব্যর্থ তার লক্ষ্য, অদ্ভুত সেই লক্ষ্যবেধ। অনেকের মারবেল তাঁর মারে ফেটে দু-ভাগ হয়ে গিয়েছে। লাট্টু খেলায়ও ঠিক তা ঘটেছে অন্যের লাট্টুর। অর্জুনকে দেখি নি, কিন্তু যে একাগ্রচিত্ততা: মৎস্যের চক্ষু ছাড়া জলে অন্য কিছু প্রতিবিম্বিত দেখে না সে একাগ্রচিত্ততা আমি দেখেছি—দেখেছি তেমনি লক্ষ্যবেধ বাদামতলায় ও তারপরে। তার আর একটি জিনিসও ছিল সে সঙ্গে—সাধারণতঃ যা দৈহিক ক্লেশকর তাতে সাধুর ছিল অনিচ্ছা। ক্রিকেট খেলায় সে ব্যাটিং করত চমৎকার। কিন্তু তারপরে ফিল্ডিং-এর সময় পলায়ন করত অতি সুকৌশলে। হয়তো এই অনিচ্ছা বা অত্যন্ত সবল ব্যবহারিক বুদ্ধির জন্যই বা সামাজিক জীবনের নেতৃত্ব কামনা তিনি করেন নি—করতে পারতেন না। না হলে নেতৃত্বের বহু গুণ ছিল তাঁর জন্মগত। সেই কৌশলও ছিল চমৎকার আয়ত্ত—যেখানে তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে না সেখান থেকে তিনি দূরে থাকতেন এমন একটি ভাব অবলম্বন করে যেন কাজটা তুচ্ছ, উপেক্ষণীয়। আত্ম-সচেতন মানুষ অনেক হয়, কিন্তু মাত্রা-সচেতন মানুষ কম। গুণ যাদের প্রচুর তারা গুণের সীমা সম্বন্ধে প্রায়ই অচেতন। পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতের টানেই যেমন গুণের বিকাশ তেমনি সেই পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতেরই টানা একটা সীমান্ত আছে—মাত্রা ছাড়াতে গেলে গুণ হয় দোষ। অথচ সে মাত্রা ছাড়াবার মতো

প্রেরণা প্ররোচনা ও প্রবর্তনাও তো চারিদিকেই শক্তির প্রেরণা, সাহসের প্রবর্তনা, উচ্চাশয়ের প্ররোচনা। গ্রীক ট্রাজিডির নায়কদের আত্মনাশ এই মাত্রালঙ্ঘনেই। এই গ্রীক্ মাত্রাবোধ আমাদের বুদ্ধদেবের 'মধ্যমপথের' সঙ্গে তুলনীয় হলেও এক নয়। গ্রীক মাত্রবোধ জীবনধর্মী, বৌদ্ধধর্ম বৈরাগ্যবাদী। ওসব বিচার-বিশ্লেষণ ছেড়ে বলতে পারি—'কমন্‌সেন্স' একটা 'অন্‌কমন্' গুণ আর আমার এই অগ্রজ অন্‌কমন্ মাত্রায় তার অধিকারী। অনেক গুণই তার ছিল—বিদ্যা-বুদ্ধি, বাক্-পটুতা, আড্ডায়-বৈঠকে, বিশেষ করে ড্রয়িং-রুমে বন্ধু-বান্ধবীর সমাবেশে পরিহাস-কুশলতা—রঙ্গ-স্থানীয় কারো সঙ্গে লাগতে তার ক্লান্তি নেই। ব্যঙ্গের ছোট ছোট বানে বিদ্ধ করারও অক্লান্ত ক্ষমতা। সে বান্ মর্মঘাতী নয়, কিন্তু চর্মঘাতী, তাতে মন ছট্‌ফট্ না করুক গা চিড়্‌বিড়্ করে। আবার, পরিমিত বিলাস-কলায় তিনি হতে জানেন ড্রয়িংরুম গোষ্ঠীতে আকর্ষণীয়, প্রীতিকর। এই সমাজের উপর নিজেরও আকর্ষণ প্রচুর, কিন্তু পরিমিত রকমে প্রচুর। সংসারে যাঁরা উঠতে পেরেছেন আপনা থেকে তাঁদের গোষ্ঠী গঠিত হয়ে যায়। যাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন তাঁদের ফেলে যেতে হয় পিছনে—এই থিওরি অব ডাইনামিক্স কে না মানবে? কিন্তু যাকে হৃদয়বত্তা বলে, qualities of heart, শুধু heart নয়, তা বিপদ ঘটায়। এই হৃদয়বত্তাও তাঁর আছে প্রচুর মাত্রায়। কিন্তু তাঁর 'কমনসেন্স' বা সুস্থ বুদ্ধি বিপদ ঘটাতেও দেয় নি। বিপদ ঘটায় নি বলেই তিনি যেমন, নিছক আপনার গুণে, কর্মদক্ষতায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন তেমনি সেই আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে আত্মীয়-বান্ধব স্বজন-পরিজন সহায়-সম্পদহীন অনাত্মীয় বহুজনের সম্ভবমতো প্রতিষ্ঠায়ও নিয়োজিত করতে পেরেছেন। ক্ষমতা দাম্ভিকতায় পরিণত হয় নি, এ জানে তাঁর আপিসের ছোট সহকর্মীরা। হৃদয়বত্তা ভাবালুতায় নিঃশেষ হয় নি, সম্ভবমতো পরার্থে রূপায়িত হয়ে সার্থক হয়েছে, এখানে তাঁর আত্মীয় অনাত্মীয় বহু উপকৃত। নিজের প্রতি ও পরের প্রতি কর্তব্য উদ্‌যাপনের সঙ্গত তৃপ্তির সঙ্গে আজ পরিণত জীবনে তিনি উত্তীর্ণ। আরেকটি কথাও বলা উচিত—তাঁর সুস্থবুদ্ধি ও সহৃদয়তা পুষ্ট, পালিত ও বর্ধিত হয়েছে আমার বউদির সাহায্যে—আমার সঙ্গে যাঁর সৌহার্দ্য তাঁর স্বামীর আমার প্রতি সৌহার্দ্যের অপেক্ষাও কম নয়।

বাড়ির সকলে পড়ে তখন ইংরেজি স্কুল জুবিলী স্কুলে। বাদামতলার বন্ধুরাও অন্য স্কুলে পড়েন—আমি একা সেই 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' পড়ি। তাতেও মনে বিদ্ধ হত।

বঙ্গ বিদ্যালয়ে আমি বোধহয় এক বা দুই বৎসর পড়েছি। এখানকার দুটি স্মৃতিই আমার আছে—প্রথম মাস্টারমশায়ের—আর কয়জন সহপাঠীর।

স্কুলে ইংরেজি পড়ানো হয় না। পরে ইংরেজি স্কুলে পড়তে গেলে অসুবিধা হবে। তাই স্কুলে ভর্তি হতেই বাড়িতে ইংরেজি পড়ানো ঠিক হল। ভার পড়ল ভুলুয়া কাছারীর একজন আমলার ওপর। ষোড়শী সেন মহাশয় আমার সেই মাস্টারমহাশয়, তিনি সেন-পাড়ার লোক—তাঁদের প্রায় সকলেরই বাড়ি বানাড়ি, বিদগাঁও বানাড়ি বলতে গেলে একই গ্রাম। এক সময়ে এই সেনদের প্রবল ছিল জাঁক। পদ্মা থেকে বিদ্গাঁয়ের খালের মোড়ে পৌছুলে বাজারের কাছে কর্তারা নৌকা বাঁধতেন, পাঁঠা কাটতেন, ভোজ্য পেয় এক দফা শেষ করে খাল দিয়ে চলতেন বন্দুক ছাড়তে ছাড়তে—জানুক সবাই 'মজুমদাররা প্রবাস থেকে বাড়ি আসছেন।' ভাগ্যটা আর এখন তত প্রসন্ন নেই। জ্ঞাতি-কুটুম্ব সুদ্ধ এখানেই প্রায় স্থায়ী বাসিন্দা—কালেভদ্রে দেশে যান। কিন্তু আছে তবু সেনপাড়ার দুর্দান্ত নাম। কিছু একটা কাজ কেউ করেন, কারও আছে সামান্য জমির আয়। কারও তাও নেই। কিন্তু তাই বলে গর্ব কম নয়, মাস্টারমশায় ছিলেন তার মধ্যে স্বতন্ত্র—গর্ব তাঁরও আছে, মনে করিয়ে দিলে বলতেন, 'হ্যাঁ, আমরাই বানাড়ির মজুমদার।' কিন্তু মনে করিয়ে না দিলে ভুলে থাকতেন। গর্বিত জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও যেমন মিশে আছেন তেমনি মিশে আছেন অপর দশজনার সঙ্গে। সেন-পাড়ার লোকেরা তাঁকে নিয়ে গর্ব করবেন কি করে? কিন্তু শহরে বৈদ্যগোষ্ঠীর কেউ মারা গেলে ষোড়শীকে শ্মশানবন্ধু পাওয়া যাবেই। তাকে তাই কে অবজ্ঞা করবে? আমাদের বাড়িতে মেজ জেঠামশায়ের তিনি প্রায় সমবয়সী—সেন-পাড়ার অনেকেই জেঠামশায়ের আবাল্য বন্ধু। মাস্টারমশায়ও প্রায় সে পর্যায়ের। বেঁটে খাটো ছোট্ট মানুষটি, সামান্য স্থূলকায়, দীর্ঘ শ্মশ্রু। হেলে দুলে সাধারণ ভাবে চলেন ধীরে ধীরে। ভুলুয়ার কাছারির আমলা, আট নয় টাকা মাইনে, ধীরে সুস্থে কলম পিষেন, ঘণ্টায় বার দুই উঠে যান তামাক খেতে। বারকয় কাশেন, এক আধবার জল খান। সকালে-দুপুরে এমনি তার কাজ। ইংরেজি বাঙলা, অঙ্ক—যা তিনি জানতেন তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমার মতো ছ বছরের শিশুকে পড়াতে বা আমার সেই জুটি আট-নয় বছরের দাদাটিকে পড়াতে—বিদ্যা লাগে না লাগে ধৈর্য। কিন্তু যা যথেষ্টেরও বেশি ছিল

তা মাস্টারমশায়ের নিয়মানুবর্তিতা আর ধৈর্য। সকাল-সন্ধ্যা দু-বেলা—শনি-রবি বাদ নেই—ঠিক সময় তাঁর ডাক শুনতে পাব—গোপাল, সাধু। 'পড়তে আয়।' পড়া দেওয়া, পড়া নেওয়া, মামুলী ব্যাপার, তার বেশি কিছু নয়। ম্যারের 'স্পেলিং বুক' থেকে আমরা বানান শিখতাম। অর্থ মুখস্ত করতাম। বাঙলা বই ও তার অর্থবই থেকেও মুখস্ত করতাম। যোগ-বিয়োগ পুরণ ভাগ ক্রমে ক্রমে শিখে উঠেছি। ওসব শেখার ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব এই—তিনি শিখাতেন না, শিখতে শিখাতেন। তিনি বসে থাকতেন—মন অন্য দিকে গেলে তা ফিরিয়ে আনতেন। সন্ধ্যায় ঘুম পেলে সে ঘুম ভাঙিয়ে দিতে জানতেন—"কী করে তোর বড়দা মাছটা ধরল রে?" মুদিত চোখ খুলে আমি বলি, "সকাল থেকে বসে রয়েছেন—চুপ করে কড়ুই গাছটার তলায়। মাছটা ঘুরছে, কিছুতেই ভাসে না।..." সাগ্রহে বর্ণনা করি। হায় সরস্বতী তোমার যে কত ছলনা তা কি তখন জানতাম। বর্ণনা শেষ হতে মাস্টার মশায় বলেন "ওর মেছোরাশি। কিন্তু এখন পড়।" আবার মুখস্ত করতে বস্‌তাম। অবশ্য তাতে তখন বেগ পেতে হত না। কিন্তু সে পড়া না বলতে পারলে ছুটি নেই, তিনি উঠতেন না। বিষ্টি-বাদল ঝড়-তুফান—কিছুতেই কিছু হবে না। ঠিক সময়ে সেই নাম ধরে ডাক শোনা যাবে—। মাস্টারমশায় ঠিক এসেছেন—পড়তে বসতে হবে, আর পড়া দিতেও হবে। অঙ্কে একটা একটা স্থবিধা ছিল—মাস্টারমশায় ফল মিলেছে দেখলেই সন্তুষ্ট। তা না মিললে একটু দেখে শুনে আমরা ঘোষণা করতাম—"ছাপার ভুল।" মাস্টারমশায় বলতেন 'দেখি।' কিন্তু ভুল প্রায়ই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত। এমন না হলে এমন অঙ্কে অবিশ্বাস জন্মাত কি করে? কিন্তু ইংরেজি বাঙলায় তো অর্থ ভুল না, বানান ভুল করবার পথ নেই। মারবেল খেলা, লাট্টু খেলা, জামরুল গাছের পাকা ফল, বাদামতলার নানা আয়োজন—কিছুতে বাধা নেই। শুধু এ পড়া দিয়ে নিতে হবে।

বৎসর চার-পাঁচ মাস্টারমশায় প্রথম আমাকে, পরে আমাদের দু ভাইকে পড়ালেন। আমরা উঁচু শ্রেণীর লেখাপড়ার অন্য রাজ্যে প্রবেশ করি অন্য শিক্ষকরা আমাদের ভার নেন। আশ্চর্য হয়ে দেখতাম—তারা অর্থবই না দেখে বাঙলা-ইংরেজি পড়া নেন; পাটীগণিতের ফলের পৃষ্ঠার একটা ফলও ভুল ছাপা বের হয় না। কিন্তু অত সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। কেমন ভয় করে। মাস্টারমশায়ের কাছে কোনো

ভয় ছিল না। আমাদের দুরন্তপনা তাঁর কাছে অনাবৃত আত্মপ্রকাশ করত —বাড়ির পিতামাতার মতো তিনি আমাদের শাসন করতেন—তিনি কীল দিলে চাপড় দিলে গায়ে লাগত কিনা জানি না। আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম। তিনি বলতেন, "বাঁদরগুলোর গায়েও লাগে না।"

আমাদের পরে আমার কনিষ্ঠরা লেখাপড়ায় পা দিতেই এই মাস্টারমশায় আবার তাঁদের মাস্টারমশায় হন। তারপরে ভাগ্নেদের এক আধজনার। তারপর পাড়া-প্রতিবেশীদেরও ছেলেদের। শেষে সমস্ত শহরে তাঁর এই পরিচয়টাই প্রধান হয়ে যায়—'মাস্টারমশায়।' কিন্তু আমাকে নিয়েই তার প্রথম এই পরিচয়।

নিঃসন্তান মাস্টারমশায়ের পরিচয়টা তবু অসম্পূর্ণ থাকে যদি না বলি তার স্ত্রীর কথা। তাঁর সাধারণ পরিচয় 'জেঠাইমা'—দুর্ধর্ষ সেন-পাড়ার অল্পাধিক গর্বিত নারীকূলের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্যা—গর্বে বিন্দুমাত্র নয়, সকলকে সমজ্ঞানে, সকলের প্রতি মমতায়, সকলের স্নেহে, সেবায়, অকাতরে পরিচর্যায়। সেদিনের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ঘরের সাধারণ মেয়ে; গ্রামের সাধারণ শিক্ষাদীক্ষাই বোধহয় তিনি পেয়েছিলেন, তার বেশি নয়—শ্যামাঙ্গী, বড় টানা টানা চোখ, সুন্দর মুখশ্রী। শান্ত স্নেহশীল দৃষ্টি তাঁর মুখে চোখে, করুণ ও করুণাভরা ব্যক্তিত্বে সে চোখমুখ কোমল। যে শ্রী স্বাভাবিক শ্রী এই নিঃসন্তানা মহিলার মাতৃশ্রী অন্তরে-বাহিরে তাই ছিল স্বচ্ছন্দ সহজ অকুণ্ঠিত। আশ্চর্য নয় যে, একাধিক কিশোর ও যুবকের তিনি 'মা' হয়ে গিয়েছিলেন। বাকী অনেকেরই হয়েছিলেন 'জেঠাইমা'—যার কাছে তারা সহজ ভাবে গিয়ে বসবে, গল্প করবে, গল্প শুনবে—আর সামান্য কিছু চিঁড়া, নাড়ু পেলে পরম আনন্দে তা খেয়ে নেবে। আমার তো কথাই নেই—তিনি তো আমার কাছে 'জেঠাইমা' সেই ছয়-সাত বৎসর বয়স থেকে। আর নোয়াখালির জীবনের শেষদিকে যখন সেন-পাড়া ভেঙে যাচ্ছে তখন নতুন ভুলুয়া-পাড়ায় আমরা ছিলাম প্রতিবেশী—কলকাতা থেকে কবে আমি ফিরব মায়ের মতো তিনিও তার দিন গণতেন।

১৯৩৩ সালে আমি যখন বকসা বন্দিশালায় তখন একদিন বাড়ির চিঠিতে জানলাম—'মাস্টারমশাই' নেই। সেন্সরের অনেক বেড়া ডিঙিয়ে একখানা চিঠি দিতে পেরেছিলাম জেঠাইমাকে, উত্তরও পেয়েছিলাম। তাঁর সেই পুত্রদের একজনার সংসারে তিনি ক্রমে মিশে গিয়েছিলেন। এমন মানুষই

যে অন্তরে অন্তরে আমার এ ধারণা কি একটা মিথ্যা কল্পনা, ভাববিলাস? সেই অসামান্য মানুষ—যাদের নিয়ে তৈরি হয় শরৎচন্দ্রের 'জেঠাইমা', রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দময়ী'।

প্রথম মাস্টারমশায়ের কথা যতটা বলতে পারি প্রথম স্কুল বা সে স্কুলের মাস্টারমশায়দের কথা তত বলতে পারি না। কারও কারও কথা মনে আছে—বাড়ির সঙ্গেই স্কুল, কাজেই স্কুল ছাড়ার পরেও তাঁদের থেকে দূরে চলে যাই নি। কিন্তু দু-জন প্রথম সহপাঠী আমার চিরদিনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু থেকে গিয়েছেন—অমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ও হরিগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়। অমৃত ঢাকা থেকে বি. এ. পাশ করে ধানবাদে বীমা-ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত; হরিগোপাল যাদবপুর থেকে পাশ করে অধ্যাপনায় সেখানেই সুপরিচিত। দু-জনেই সমাজ-সংসারে সম্মানিত, কর্তব্যপরায়ণ ও স্থিরস্বভাব। যুগের আঁচ-এ তাঁরাও হাত এক-আধটুকু পুড়িয়েছেন। কিন্তু সুস্থ স্বাদেশিকতা ও সংসারধর্মে তাঁরা একটা মিলনও ঘটাতে পেরেছেন। হরিগোপালের সঙ্গে অবশ্য সেই প্রথম দুবৎসরই এক স্কুলে পড়েছি। অমৃতের সঙ্গে পড়েছি পরেও ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা পর্যন্ত। সে আবার নিকট কুটুম্ব, সেই স্কুলে পড়তেই। আমার সহোদরা অগ্রজার বিয়ে যখন হচ্ছে, আমার তখন সাত বৎসর বয়স—বিবাহ-সভায় দেখি অনেক বড়ো-ছোট বরযাত্রের মধ্যে আমার সহপাঠী অমৃত। জিজ্ঞাসা করতে বললে, "আমার দাদার বিয়ে।" আর আমি বললাম, "আমার দিদির বিয়ে।" সেই যে নতুন সম্পর্ক তা অচ্ছেদ্য, কিন্তু তার থেকেও বেশি হয়ে উঠল আমাদের দু-জনার সহপাঠীরূপে একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খেলা, প্রতিদিনের ছোট-বড়ো হাজার কাজে সাহচর্য। এতটাই তা অকুণ্ঠিত যে তাকে কিছুমাত্র না জানিয়ে তার বেনামীতে নন কো-অপারেশনের সমর্থনে একটা প্রবন্ধ লিখে তাকে একবার বিড়ম্বিত করতেও দ্বিধাবোধ করি নি। মাঝে-মাঝে সুদীর্ঘ অদর্শন ঘটে, সম্ভবত আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক মতামতেও সাদৃশ্য নেই। নিশ্চয়ই আমার অ-সামাজিক চালচলনে তার সুস্থির কর্তব্যপরায়ণতায় দীর্ঘতর ব্যবধান। কিন্তু একটা কথা জানি—তার সঙ্গে আমার সাযুজ্য অপ্রতিহত। হরিগোপালের সঙ্গে স্কুলের ব্যবধানে যে নৈকট্য জমতে পারে নি, তারপরে তা তেমনি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে—আর আজও শেষ হয় নি। সে ঘনিষ্ঠতার পরিমাণ এই কথাতেই বলা যাবে—একবার এক পলায়িত

রাজনীতিক সহকর্মীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও কথাবার্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্থান ঠিক করতে গিয়ে হরিগোপাল ছাড়া আর কারো কথাই মাথায়ও এল না। সমস্ত রাত্রি তর্ক ও কথাবার্তা বলে শেষ রাত্রিতে আমার সহকর্মী হরিগোপালের আশ্রয় থেকে বিদায় নিলেন, আর সকালবেলা আমি। দলভুক্ত না হলেও যে বন্ধুকে বিপন্ন করতে দ্বিধা করি না—হরিগোপাল তেমনি বন্ধু, মানুষ হিসাবেও তেমনি মানুষ। একটা অপাতস্থিরতায় চাপা শান্ত রসিকতা তার সঙ্গকে করে তুলেছে আরও আকর্ষণীয়। উচ্ছ্রিত হাস্যকৌতুক নয়, স্মিতহাসির সঙ্গে এক-আধটি মন্তব্য বা প্রশ্ন—তাঁর 'ড্রাই হিউমার'-এর বৈশিষ্ট্য।

জুবিলী স্কুল

বৎসর দেড়েক পরে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হলাম। একটা খেদ মিটল। জিলা স্কুল নিশ্চয়ই অনেক ভালো স্কুল, কিন্তু তা অনেক দূরে, জুবিলী স্কুল সে তুলনায় নিকটে। বিশেষত এ-স্কুলেই আমাদের বাড়ির সবাই পড়েছেন, বাবাও করেছেন পূর্বে শিক্ষকতা; পরে বরাবর ছিলেন তার কমিটির সদস্য। কাজেই অন্য স্কুলে আমার পড়ার প্রশ্ন ওঠে না। একটা প্রশ্নই উঠেছিল—ঘরে ইংরেজি পড়ায় আমি এক ক্লাশ উপরে ভর্তি হলাম। তা তেমন কিছু নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল—বয়স লেখানো হবে কত? কারণ, ম্যাট্রিকুলেশনের সময় ষোল বৎসর সম্পূর্ণ না হলে তখন ঠেকে থাকতে হত। যিনি ভর্তি করতে নিয়ে যাবেন বাবা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে বললেন: "এক বৎসর কমিয়ে লেখ—কতবার ফেল করবে কত ক্লাশে তার ঠিকানা কি?" বাড়িতে আমাদের সকলের সম্বন্ধেই এরূপ ছিল প্রত্যাশা। বাবার ধারণাটা নির্ভুল হয় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ম্যাট্রিকে যে আমাকে ঠেকে থাকতে হয় নি—সে আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কৃপা। তাঁরা খাতার অঙ্ক থেকেও ছাত্রের মনটাকে বড় বলে জানতেন। আর সত্যের মর্যাদাও তাতে রক্ষা পায়। কারণ ১৯১৮ ফেব্রুয়ারিতেই আমার ষোল বৎসরই পূর্ণ হয়।

ইংরেজি স্কুল—কাজেই মর্যাদা বোধ করলাম। অবশ্য লেখাপড়ায় উৎসাহ বাড়ল, এমন নয়। ও বস্তুর জন্য সে স্কুলে তাড়না ছিল না। তারপর আমরা হাইস্কুলের চক্ষে লালনীয় শিশু, তাড়নী বালকও নই। পড়া

অপেক্ষা আমাদের পাহারা দেবার জন্য কোনো শিক্ষক ক্লাশে থাকলে হয়। সব সময়ে তাও থাকত না, আমরা স্বাধীনতা ভোগ করতাম। স্কুল আমার কাছে তাই বিভীষিকা হয় নি—বরং নতুন নতুন সহপাঠীর সঙ্গে মিশবার, বাইরের সঙ্গে জানাশোনার পথ তৈরি করে দিয়েছে। শিক্ষার বিধি-বিধানও ছিল শিক্ষকদের নিজেদের মতানুযায়ী। লেখাপড়া শিখতে গিয়ে কানমলা, চপেটাঘাত পেলে ছাত্ররা তখনো অপমান বোধ করত না। বেত বা বাঁশের কঞ্চির প্রয়োগটা গুরুতর কারণে হত, আর তাতে ছাত্রদেরও মনে একটু ব্যথা জাগত। ইংরেজি পড়া আরম্ভ হয় সেই স্পেলিং বই থেকে, তা আমার পূর্বেই আয়ত্ত। তবে মাস্টারমহাশয় ছিলেন নিজের বানান-পাণ্ডিত্যে গর্বিত, উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ বলে প্রতাপশালী লোক, আর ছাত্রদেরও যথেষ্ট ভীতি-সম্ভ্রমের পাত্র। আমারও তা ছিল। কিন্তু ভীতির কারণ তিনি হন নি—কারণ তাঁর শাস্ত্রটা আমার পূর্বেই গৃহে আয়ত্ত। উপরের ক্লাশের বড়ো ছাত্রদের বানানে ভুল হলে আমাকে দিয়ে তা শুধরে দিয়ে তাদের অপমান করিয়ে তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর নির্দেশ মতো বড়োদের এভাবে অপমান করে একটা লজ্জা আমরা বোধ করতাম। কিন্তু সাহস কি আপত্তি করি? সেই স্পেলিং-বিশেষজ্ঞ মাস্টার-মহাশয়ের 'এ্যাক্‌সেণ্ট' মাহাত্ম্য বুঝে উঠতে পারি নি। অথবা, যা অভ্যাস করেছিলাম পরবর্তী কালে তা অন্য মাস্টারমশায়দের কৃপায় বেশ মসৃণ হয়ে সম্পূর্ণ 'বাবু ইংরেজি' উচ্চারণে এসে সুস্থির হয়েছে।

এই শিক্ষাবিধির দৌরাত্ম্য অবশ্য তখনি শেষ হচ্ছিল, শেষ হয়েও যায়। কিন্তু অঙ্কের শিক্ষকমহাশয়ের শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের অনেককে পঙ্গু করে দিয়েছিল। বাড়ি থেকে মিশ্রপূরণ এক-একদিনে ২৫।৩০টা কষে আনতে তিনি নির্দেশ দিতেন। ও-বয়সে অতগুলো অঙ্ক চাপানো একটা অত্যাচার। অন্য বিষয়ও তো পড়তে হয়, লিখতে হয়। অনেক ছেলেকেই অক্ষমতার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হত। শেষ পর্যন্ত আমরা অনেকেই ঠিক করলাম পাঁচটা বা সাতটার বেশি করব না। সেদিনের 'একটা ছাত্র ধর্মঘট।' সারা ক্লাশ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর তিনি অঙ্কের বোঝা কমালেন, কিন্তু অঙ্কের প্রতি যে অপ্রীতি তিনি জাগালেন তা লুপ্ত হল না। তাতে উৎসাহ জোগালেন—না জেনেই আমার গুরুজনরা—"আমাদের পরিবারের অঙ্কে মাথা নেই।" ঠিক এ সময়েই আমার দাদা

সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে ফার্স্ট ক্লাশে উঠলেন—অঙ্কে শূন্য পেয়ে। ও স্কুলে তাতেও বাধে নি। কারণ, দাদা ইংরেজি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে মার্ক ভালো করেন, বাঙলায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী; আঁকায়-লেখায়, বলায়, আবৃত্তিতে অগ্রগণ্য। তাঁর অঙ্কে অকৃতিত্ব প্রতিবেশীদেরও মন্তব্যের বিষয় ছিল। অবশ্য তাঁরা সকলে জানতেন—"আমাদের বাড়ির ছেলেদের কিছু হবে না।" আমিও যখন একটা ক্লাশে অঙ্কের পরীক্ষায় মাত্র আধাআধি মার্ক পেলাম—অন্য বিষয়ে আশী থেকে একশোও ছিল—লজ্জিত অপদস্থ ভাবেই বাড়ি ফিরলাম। দাদার সঙ্গেই প্রথম দেখা। তিনি আমার লজ্জার কথা শুনে বললেন, "যা। আমি পাই শূন্য, তুই তো তবু পঞ্চাশের ওপরে পেয়েছিস।" এমন অকৃত্রিম উৎসাহ তাঁর থেকে বরাবরই এরূপ অপমান-অগৌরব-মুহূর্তে পেয়েছি। কিন্তু সেদিনকার কথা এখনো মনে আছে। তাই ওপরের ক্লাসে উঠে আমি যখন অঙ্কে আর একটি মার্কও খোয়াতাম না—সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির আঁক আমার পরে আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল—তখন সেই অঙ্কের মাস্টার মণীন্দ্রবাবুর সস্নেহ প্ররোচনায়ও অঙ্ককে 'বিশেষ অধীতব্য' বিষয়রূপে গ্রহণ করি নি। সেদিনকার অস্বীকৃতির মধ্যে স্পর্ধাও ছিল। তার পরিতাপ আমাকে পরবর্তী সময়ে প্রতিদিনই করতে হয়েছে; কারণ, বুঝেছি অঙ্কের প্রতি অবজ্ঞায় আমার পক্ষে বিজ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ; আর বিজ্ঞান একালে যার অনধিগম্য তার কাছে একালও অনেকাংশে বুদ্ধিতে অনায়ত্ত। কিন্তু এই দুঃখটার মূল খুঁজতে গিয়ে এখনো পাই সেই আট-নয় বৎসর বয়সে অঙ্কর মাস্টারমশায়ের দুর্বোধ্য তাড়না। সে মাস্টারমশায়ের কিন্তু অন্য গুণও ছিল। যখন ইতিহাসের কিছুই জানতাম না, আমাদের ক্লাশে গল্প বলতে বসে তিনি একদিন এক আশ্চর্য গল্প বললেন—আর্য-অনার্যের গল্প। আর সবিস্ময়ে শুনলাম আমরা নাকি সেই আর্যদের বংশধর। তাঁরই মুখে কোনো কাজে আমাদের অমনোযোগ বা অযত্ন দেখলে শুনতাম—"হাঁরে, তোদের দিয়ে কি ভারত-উদ্ধার হবে?"

সে বোধহয় ১৯০৯-১০-এর কালের কথা। তাই কথাটা আমাদের কানেও একবারে অশ্রুতপূর্ব নয়। কখন কিভাবে তা জীবনে বড়ো কথা হয়ে উঠল তা সেই বিশেষ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু কথাটা দেশে তখন প্রধান হয়ে না উঠলে তিনি আমাদের এ কথা মনে করিয়ে দিতে চাইবেন কেন? আর মনের উদ্বোধন যাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে অনুমোদিত, তাঁর অঙ্কের সেই অশুভ তাড়না নিয়ে তাঁর প্রতি বিরূপ হতে পারি না।

(ক্রমশ)

অন্নদাশঙ্কর রায়

পাণ্ডববর্জিত দেশ

শান্তিনিকেতন, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেন

প্রীতিভাজনেষু,

ভাবছি বইকি। না ভেবে উপায় আছে? হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। বাংলাদেশের দুই প্রান্তে সাম্প্রদায়িক প্রাণহানি। লুটতরাজ। গৃহদাহ। লক্ষ লক্ষ টাকার বই ও লক্ষ লক্ষ মণ ধান অগ্নিসাৎ। সেই সঙ্গে সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধূলিসাৎ। যথারীতি লোকবিনিময়ের উদ্যোগ। পূর্ববঙ্গ ত্যাগের জন্যে আকুলিবিকুলি। জনস্রোত।

কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ, কিন্তু কাশ্মীরের মাটিতে হচ্ছে না। হচ্ছে বাংলাদেশের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, বন্দরে বন্দরে। অন্তরে অন্তরে। এর ফলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কতটুকু নিকটতর হল জানিনে, কিন্তু বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের জীবন আরো দুর্বহ হল। জাতিহিসাবে আমরা আরো দুর্বল, আরো দীনহীন, আরো পরনির্ভর হলুম। যা নিয়ে আমাদের গর্ব—সাহিত্য ও শিল্প—তার আধারটাই আমরা নিজেরাই ধ্বংস করে দিলুম।

সরকার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ করবেন। কিন্তু কিসের ক্ষতিপূরণ? এমন ক্ষতি আছে যার পূরণ নেই। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে বিশ্বাস করে একরাষ্ট্রে থাকতে পারবে কি? তার জন্যে লাগবে শুধু পুলিশের লাঠি নয়, মিলিটারির সঙীন। এক পাড়ায় বাস করার সাহস ক'জনের হবে! এ যেন নদীর তীরে বাস ভাবনা বারো মাস। বিশ্বাস বা আস্থা হচ্ছে অত্যন্ত ভঙ্গুর একটি পাত্র। ফুটো হলে বা ফেটে গেলে সহজে জোড়া লাগে না।

মানুষের হৃদয়ও তেমনি ভঙ্গুর। কেমন করে মানুষ ভালোবাসবে মানুষকে, যদি সে পরকে আপন ভেবে আপনার লোককে পর করে দেয়? সাত শ' বছর যে তোমার সুখ-দুঃখের সাথী, হয়তো আরো সাত শ' বছর সাথী হতে পারত, তাকেই তুমি পর করে দিলে রাওলপিণ্ডির বা করাচীর ইঙ্গিতে।

তোমার দুর্দিন কি কোনোদিন আসবে না? সেদিন কে তোমার প্রকৃত বন্ধু হবে? বাঙালী হিন্দু না পশ্চিমা মুসলমান?

তেমনি বাঙালী হিন্দুরও প্রকৃত বন্ধু বাঙালী মুসলমান। কী করে আমি এদের বোঝাব যে ইতিহাস ষোল-সতেরো বছরে শেষ হয়ে যায় না! শতাব্দীর পর শতাব্দী রয়েছে সামনে। হিন্দুও থাকবে, মুসলমানও থাকবে। একটাই জাতি, একই নিয়তি। সাময়িকভাবে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, তার পরিণাম হাড়ে হাড়ে অনুভব করে বিচ্ছেদেও একদিন অনিচ্ছা আসবে। বই পড়ে শেখে ক'জন! অধিকাংশ লোক শেখে হাতে-কলমে। আগুনে হাত দিয়েই শেখে যে আগুনে হাত দিতে নেই।

অন্তত কয়েকজন থাকবেন যাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁরা হাজার আঘাত পেলেও ভবিষ্যতের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। বর্তমান থেকেই ভবিষ্যতের উদ্ভব। সুতরাং বর্তমানের উপরেও এক চোখ রাখতে হবে বইকি। তা বলে তাঁরা একচোখো হবেন না। রাজনীতিকদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি বর্তমানের প্রতি মনোযোগী হয়েও ভবিষ্যতের ধ্যানে নিমগ্ন। তেমনি সাংবাদিকদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি বর্তমানের প্রতি সতর্ক, অথচ ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। সাহিত্যিকদেরও তেমনি বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দুই দিকে নজর রাখতে হবে।

এ কখনো সত্য হতে পারে না যে পূর্ববঙ্গের সকলেই উন্মত্ত বা সকলেই হিন্দুদ্বেষী। এই তো কয়েকজন প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন যে তাঁরাই পূর্ববঙ্গের হৃদয়। সে হৃদয় হিন্দুকেও ভালোবাসে, হিন্দুকেও বাঁচাতে চায়। বিজ্ঞাপনটা কিন্তু পাষণ্ডরাই একচেটে করল। পশ্চিমবঙ্গেও তাই। আমি বন্দনা করি পূর্ব ও পশ্চিমের দরাজ হৃদয়কে। বন্দনা করি আমীর হোসেন চৌধুরীকে, মিশ্রীলালকে, আরো কয়েকজন অনামা শহীদকে। আমি বন্দনা করি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে। উৎপল দত্তকে। তাদেরি মতো মানবপ্রেমিকদের।

এ যদি সত্য হয়ে থাকে যে বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য তাহলে একদিন না একদিন সেই সত্যের জয় হবে। আমরা হয়তো দেখে যেতে পারব না সে দৃশ্য। তবু তার ধ্যান করব। সেই যে আমাদের চিরকালের বাংলাদেশ তাতে হিন্দুও থাকবে, মুসলমানও থাকবে, খ্রীষ্টান বৌদ্ধরাও বাদ যাবে না। তাই

যদি হয় তবে আজকের এই ছিন্নমস্তা দেবীকে আপনার রক্ত আপনি পান করতে দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হব না। এটা সত্যরূপ নয়।

তবে এটাও ঠিক যে দেশটা ক্রমে পাণ্ডববর্জিত হয়ে উঠছে। যেমন পূর্ববঙ্গ তেমনি পশ্চিমবঙ্গ। বাঙালীকেই বাঙালীর হাত ধরে তুলতে হবে। মুসলমানকে হিন্দুর হাত। হিন্দুকে মুসলমানের হাত। এপারের সাহিত্যিকরা যে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন সেটি এই ধরনের কাজ। তেমনি ওপারের সম্পাদকরা যে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন সেটিও। দুই প্রান্তের লেখকদের দিয়ে কি মিলিতভাবে কিছু করা যায় না? নিশ্চয়ই করা যায়, কিন্তু করতে গেলে পূর্বপাকিস্তান সরকার বাধা দেবেন। একসঙ্গে মিলেমিশে কিছু করা তাঁদের মূলনীতিবিরুদ্ধ। অমন করলে দুই 'জাতি' এক হয়ে যাবে। এদিকেও বাধা পাওয়া যাবে? সরকারের কাছ থেকে নয়। বিক্ষুব্ধ জনমতের কাছ থেকে। পূর্বপাকিস্তান যে অন্যায় করেছে তার বেলা কী হবে?

এই পরিস্থিতি যদি বেশিদিন গড়ায় তাহলে এদিকে অন্যায়বোধ তীব্রতর হবে। আর ওদিকে যারা অসহায় বোধ করছে তাদের অসহায়তাবোধ হবে গভীরতর। আমরা লেখকরা এর কী করতে পারি? আমরা এমন কোনো মন্ত্র জানিনে যা দিয়ে অন্যায়ের হাতে হাতে প্রতিকার হয়। আর অসহায় অসহায়াদের উদ্ধার হয়। আমাদের হাতে যা আছে তার নাম তলোয়ার নয়, তার নাম কলম। শোনা যায় কলম নাকি তলোয়ারের চেয়ে প্রবল। হতে পারে, কিন্তু এই অবস্থায় নয়। আর তলোয়ারও কি এ ক্ষেত্রে কাজে লাগবে? যুদ্ধঘোষণা করলে সৈনিকরা চলে যাবে সীমান্ত রক্ষা করতে। শহর রক্ষা করার ভার পড়বে পুলিশের উপর। গ্রাম রক্ষার ভার চৌকিদারের উপর। এরা কি সংখ্যালঘুদের ধনে প্রাণে বাঁচাতে পারবে? পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গের কোনোখানেই যথেষ্ট পুলিশ বা চৌকিদার নেই।

সংখ্যালঘুদের একমাত্র ভরসা সংখ্যাগুরুদের শুভবুদ্ধি। যেমন এখানে তেমনি ওখানে। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান যদি পরস্পরকে মেরে সাবাড় করতে চায় তবে কে বাঁচাবে? যদি সীমানা পার করে দিতে চায় তবে কে ঠেকাবে? শান্তির সময়েও দেখা গেল পুলিশ পেরে উঠছে না, মিলিটারি এসে না থামালে এপারে বা ওপারে কোনো পারেই থামত না। যুদ্ধকালে কে থামাবে? আমরা গান্ধীজীর কাছ থেকে শিখিনি। কেমন করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবানের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করতে হয় তা

জানিনে। শান্তিসেনা যদি বা গঠন করা গেল তাকে ঠিক সময়টিকে ঠিক জায়গাটিতে পাওয়া গেল না। এত বড় একটা দায় দু-চারজন আদর্শবাদীর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। রাজনীতিকদের এ দায় নিতে এগিয়ে আসা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা আসেন না।

সুতরাং যা হবার তা হবেই। মানুষ মরবে, ঘর পুড়বে, সম্পত্তি লুট হবে। আমার ধারণা ছিল এটা শুধু গুণ্ডাদেরই কাজ। কিন্তু ইতিমধ্যে নানা সূত্রে জানতে পেরেছি ভদ্রলোকের ছেলেরা, এমন কি বড়রাও এতে লিপ্ত। এ জাতিকে বাঁচাবে কে? গুণ্ডাকে কেমন করে দমন করতে হয়, সেটা জানা। কিন্তু এই শ্রেণীর অপরাধীদের শাসন করার কৌশল অজানা। আমরা লেখকরা দমন বা শাসনকর্মে অক্ষম। উদ্ধার কর্মে অসমর্থ। আমরা বড়জোর লিখতে পারি, লিখে অপ্রিয় হতে পারি। তাই বা ক'জন হতে রাজী? লেখকদের হাতে অন্য কাজ। সৃষ্টির কাজও তো কাউকে না কাউকে করতে হবে। শিল্পী যেন গর্ভিণী নারী। তাকে গর্ভ রক্ষা করতে হবে। যেখানে ঘোরতর অন্যায় সেখানে সে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকলে তারও বিবেকে বাধে, কিন্তু সে যদি তার গর্ভ রক্ষা না করে সেটাও কি কম ভাবনার কথা।

আমার নমস্কার নিন। ইতি। ভবদীয়

অন্নদাশঙ্কর রায়

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

(সেই রাত্রে প্রবল জ্বরের উত্তাপে শান্তনু জেগে থাকতেও পারল না। আবার ঘুমোতেও পারল না। আর সেই সংশয়িত চেতনার আবছা আলোয় ও কেবল নন্দিনীকেই দেখতে লাগল।) আর ওদিকে অর্ধরাত্রের নন্দিনী নিজের মাদকতায় নিজেই যেন কেমন আত্মহারা হয়ে উঠেছে। সংক্ষিপ্তবসনা নন্দিনী। প্রিয়ব্রতর মধ্যে আহ্বান সৃষ্টি করার জন্য সে আকুল। নন্দিনী সেদিন বিকেলবেলায় সেজেছিল অন্যকে চঞ্চল করে তুলবে এই আশায়। অন্যকে তরল করবে—এই কথাই সে ভেবেছিল। কিন্তু ও যে নিজেকেই চঞ্চল করে তুলেছে—ভিতরে ভিতরে নিজেই কখন গলে গেছে এটা জানতেই পারে নি।

(শান্তনু তার নিজের শয্যায় স্বপ্ন দেখতে লাগল নন্দিনীর আঁচল খসে গেছে।)

তাই সম্ভবত ঘুম আসছে না। সারা পায়ে, বোধ হয় দীর্ঘপথ হাঁটার জন্যেই, কেমন যেন অস্বস্তি। শাড়ির আঁচলটা এক হাতে মুঠো করে অন্য হাতে পাকাতে লাগল। অন্ধকার যেন ওকে শুষে নিচ্ছে। গলা শুখিয়ে কাঠ। প্রিয়ব্রতর বিছানা থেকে দেশলাই জ্বালার শব্দ পেয়ে চমকে উঠল নন্দিনী। প্রিয়ব্রত জেগে আছে।

(সেই অস্ফুট চেতনাতে শান্তনু অনুভব করল নন্দিনীকে তার ভালো লাগছে না।) নন্দিনী নিজের বিছানা ছেড়ে প্রিয়ব্রতর বিছানায় গিয়ে হাজির হল। শান্তনু যা স্বপ্ন দেখছিল তার নিরাসবাব ঘরে জ্বরো উত্তাপের মধ্যে তা হয়তো নেহাৎই তার কামনারই বিকার। কিন্তু নন্দিনী আর প্রিয়ব্রতর জীবনে সেটা সত্য হতে সময় লাগল না।

নন্দিনী প্রিয়ব্রতকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরল—তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না।

খাট থেকে হাত বাড়িয়ে জলন্ত সিগারেটটাকে ছাইদানিতে টিপে নিবিয়ে দিল প্রিয়ব্রত। আর সঙ্গে সঙ্গে তার যেটুকু অস্বস্তি ছিল সেটুকুও মুছে গেল।

ও বলল—তুমি বড় ছেলেমানুষ নন্দিন।

তারপর প্রিয়ব্রতই অন্ধকার হয়ে ঢেকে দিল, ঘিরে ধরল, পরিপূর্ণ করল, অনাবৃত নিশীথিনীর মতো নন্দিনীকে।

খানিকক্ষণ বাদে স্খলিত পায়ে নন্দিনী আবার নিজের বিছানায় ফিরে এল। শাড়িটা গুছিয়ে পরল। ভেঙে-যাওয়া খোঁপাকে বেঁধে নিতে গিয়ে দেখল ঠিকমতো বাঁধা যাচ্ছে না। প্রিয়ব্রতও সিগারেটটা আবার ধরাল। শান্তনুর স্বপ্ন কখন গলে গিয়ে মিশে গেল ঘুমে। হেমন্ত রাত্রির শিশিরফোঁটা পাতায় পাতায়। তারারা নিঃশব্দে যে যার স্থান পরিবর্তন করতে লাগল। ঘুমোতে ঘুমোতে নন্দিনীর চোখে দু-একটা ফোঁটা জল আসি আসি করেও এল না। এই রকমই হয়। এই রকমই হবে। যে কথা কোনো দিন নন্দিনী ভাবত না, ভাবতে চাইত না সে কথা ভাবল—আমি মেয়েমানুষ, আমার নিজের হাতে কোনো উপায় নেই। আমার মা যেই হোক, বাবা যে আদর্শই ধারণ করে থাকুন না আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আদর্শ—ওসব কথা কি আমারই বলার কোনো অধিকার আছে? আমিও তো নিজের লোভ সামলাতে পারি না। তাহলে এ কথাও ভাবি না কেন যে প্রিয়ব্রতও প্রিয়ব্রতর লোভের কাছেই অসহায়। ঘুম—ঘুম—যে ঘুমের জন্য তার সমস্ত রোমকূপ আকুল—তার চোখের পাতায় শুধু সেই ঘুমের দেখা নেই······

(শান্তনু ঘুমোতে পারল না। জেগে থাকতেও পারল না—জ্বর—জ্বর—সকল সত্তাই যেন জ্বরগ্রস্ত।)

সপ্তম অধ্যায়

সেদিন বিকেলটা ছিল অসামান্য বিরস।

শীতের কুয়াশা নদীর জল ঢেকে ফেলেছে। নিমগাছের ঝুঁকে-পড়া ডালে বিবর্ণ হলুদ পাতারা স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে কখন একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগবে। মরা রোদ সাপের অর্থহীন খোলসের মতো এখানে

ওখানে লেগে রয়েছে। সুব্রত একা একা এলোমেলো ঘুরছিল। সন্ধের দিকে একটা জায়গায় কজনে একবার বসবে কথা আছে। অনেকেই আসবে। শান্তনু, রুচিও আসবে। রমেনের স্মৃতি-সভার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দেরি আছে খানিকটা। গঙ্গার ধারে পায়চারি করছে, ভাবছে রুচিদের বাড়িতে কয়েক দিন আগের অভিজ্ঞতা। রুচির মা বাবা হঠাৎ সুব্রত সম্বন্ধে বড় সচেতন হয়ে উঠেছেন। অত বড় বাড়িটা প্রিয়ব্রতর কথায় বেচে ফেলা ঠিক হবে না—রুচির মা প্রকারান্তরে এই পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

কেন দিচ্ছিলেন? আর দিচ্ছিলেনই যদি রুচি কেন অস্বস্তি বোধ করছিল? রুচির বাবা কেন অমৃতবাজারের আড়ালে মুখ ঢেকে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন? সুব্রত মিনমিন করে বলেছিল—ঠিক করতে পারছি না কিছু।

—এর আবার ঠিক করার কী আছে। তুমি পার্টিশন করে নাও। কী বল? রুচির মা রুচির বাবার দিকে তাকালেন। রুচির বাবা কাগজ থেকে মুখ তুলে কিছু বলতে গিয়ে দেখলেন শ্লেষ্মা বেধে রয়েছে গলায়। গলা ঝেড়ে—এ্যাঁ, মানে—

রুচির মা বললেন—না, তোমার অংশ তুমি বেচবে কেন? আজ না হয় তুমি একা আছ। চিরদিনই যে তাই থাকবে তা তো নয়।

ভালো লাগছিল না রুচির মায়ের এই অযাচিত অভিভাবকত্ব। রুচি হয়তো বুঝতে পারছিল। কথা ঘোরাবার চেষ্টা করছিল ও। হঠাৎ মনে হল সুব্রতর রুচির মায়ের কথার আড়ালে কোনো অনির্দেশ্য ইঙ্গিত উঁকি দিচ্ছে কি? যে অধ্যাপক ছেলেটিকে এঁরা সংগ্রহ করেছিলেন রুচি অকস্মাৎ সেখানে না বলে দিয়েছে। এবং না বলে দেওয়ার গল্পটা রুচি স্মিত মুখে সুব্রতকে বলেছে। তারপর সহাস্য মন্তব্য করেছে—নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলাম দেখেছ সুব্রতদা। সেদিনই বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিল সুব্রত যে রুচি তাকে তুমি বলছে। সুব্রতর ভালো লেগেছিল। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধার ছেড়ে পাড়ার মধ্যে ঢুকল। কিন্তু সে ভালো লাগার সীমা ভালো লাগাতেই সীমাবদ্ধ। রুচিদের পক্ষ থেকে যদি এর অর্থকে আরো বিস্তারিত করে তোলা হয় তাহলে?—না, সুব্রত যেন রটনাকে ঘটনা করে না তোলে। আজই রমেনের স্মৃতি-সভা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিনে আরো

বেশি করে কথাটা সুব্রতর মনে হল। সে ঠিক করল রুচিদের বাড়ি যাওয়া কমিয়ে দেবে।

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে সুব্রত পায়চারি করছিল। অনেক বাড়িতে উনুনে আঁচ পড়েছে। একটা গলির মধ্যে ঢুকল ও। দুধারের বাড়ি থেকে ছোট ছেলেদের পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। কয়লার উনুনের ধোঁয়ায় গলির বুকে দম-বন্ধ হাঁপানি। চোখ জ্বালা করে। একটা জায়গায় পলস্তারা খসে যাওয়া একতলা একটা বাড়ির ভাঙা রোয়াকের সামনে একটা ভীড় দেখে সুব্রত থামল। বড় রাস্তার ভীড় হলে সে হয়তো দাঁড়াত না। গলির ভীড় বলেই সে দাঁড়াল। কে একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। কেউ কেউ দেখেছে মেয়েটির মৃতদেহ। কেউ দেখেছে এইতো একটু আগে সে বাইরের জল-কলে জল নিতে এসেছিল। পাড়ার মাতব্বরেরা পুলিশের কথা বলছেন। এ পাড়ার মেয়ে নয়। ওরা পাকিস্তান থেকে এসেছে। একটা ঘর ভাড়া করে একটা পুরো পরিবার এসে উঠেছিল। মেয়েটির বিয়ের কথা হতে হতে দু-দুবার ভেঙে গেছে। একবার সে দেশে। একবার এ দেশে। কিন্তু ভেতরের কথা কে জানে মশাই। সন্ধেবেলায় মেয়েটা যে বেড়াতে যেত, কোথায় যেত? লাস নিয়ে যাবে পুলিশে। হ্যাঃ ও লাস আটকাতে হলে একশটি টাকা গলে যাবে। সেই ধোঁয়া-ধোঁয়া অন্ধকারে কিম্ভূতকিমাকার ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুব্রত দুটো বারো তেরো বছরের ছেলের কথা শুনতে লাগল আনমনে—

: দেখবি না?

: দেখেছি, ঝুলছিল তখন। কষ দিয়ে রক্ত না পানের পিক গড়িয়ে পড়ছিল।

: এ কেরে হাঁদুমণি, মরার আগে লোকে পান খায়?

: খায় না বাণ্টুর মা আলতা পরে, পান খেয়ে সিঁদুর পরে পুকুরে ঝাঁপ দেয়নি?

: হৃদয় খুড়ো কি-রকম বোল ছড়াচ্ছে দেখছিস?

: ছড়াবেই তো, ওর বাড়ি ভূতের বাড়ি হয়ে গেল না? কে ভাড়া নেবে আর?

: কে নেবে? যারা রয়েছে ওদের কাছ থেকেই খুড়ো ওই বলে ভাড়া বাড়িয়ে নেবে।

: কে দেবে পয়সা আর, শুনছিস না মেয়েটাই তো পয়সা আনত, ওদের ব্যাটাছেলেরা তো সারাদিন বসেই থাকে।

: সবাই বলছে মেয়েটা বেঁচে থাকলে মেয়েটার নাকি ছেলে হত।

: গাঁজা। বিয়ে না হলে মেয়েদের ছেলে হয় না।

: খারাপ মেয়েদের হয়।

গলির মাথায় ছোট দারোগা সাইকেল থেকে নামলেন। পিছু পিছু একটি সিপাই। ভীড় ঘন হয়ে উঠল। সুব্রত আর দাঁড়াল না। এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল একটি কেসো বুড়োর গলা—ও মশাই শুনে যান না, কী বুঝলেন···কেউ দাঁড়াচ্ছে না তার কথা শুনে, রোয়াকের ধারে জানলায় মুখ বাড়িয়ে বুড়ো বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করছে—বুড়ো বলে একটা ভদ্দতাই নেই। হেঁপো মানুষ নড়তে পারি না, এত বড় ব্যাপারটা, তা কেউ যদি···বুড়োর দিকে তাকাতে গিয়ে সুব্রত হঠাৎ একটা কুকুরের ল্যাজ মাড়িয়ে ফেলে লাফিয়ে উঠল। গলিটা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরুতে পারলে যেন বাঁচে সে। পুলিশ লাস ছেড়ে দিক অথবা নিয়ে যাক এখুনি গলিটায় মড়াকান্নার ঘোলাটে সুর বাজতে থাকবে। গলিটার নাম মনসাতলার গলি। ঘুরে ঘুরে ঘোরালো হয়ে সরু গলিটা যেন অন্ধকারেই মিশে গেছে শেষটা। দু-পাশে নোনাধরা দেওয়াল। খোলা নর্দমা। লণ্ঠনের অথবা তেলের কুপির ম্লান আলো। দু-পাশে ব্যর্থতা—গ্লানি—গঞ্জনা। কদিন আগে শান্তনুকে সঙ্গে করে ফটিকদার ওখান থেকে ফিরতে ফিরতে মমতাদের কথা ভাবতে ভাবতে ওর ঠিক এইরকম গ্লানি বোধটাই জেগেছিল। ফটিকদা শান্তনুকে বুকের প্লেট নিতে বলেছেন। মমতা নামে সেই মেয়েটির গল্প শুনিয়েছেন। মমতার বাবা মমতাকে ফেলে রেখে বাইরে পড়ে থাকে। বাড়ি ফিরে মমতাকে ঠেঙায়। মমতাকে চিকিৎসার সূত্রে ফটিকদা ও ফটিক-বৌদি মমতার কাছে বার দুয়েক গিয়েছিলেন। মেয়েটি অনুনয় করেছে এঁদের আপনারা আমার জন্যে কিছু করবেন না। বাবা পছন্দ করেন না। ফটিক-বৌদি বললেন—মমতা কাঁদে না। নিঃশব্দে মার খায়। পাড়া প্রতিবেশীরা কেউ যদি মাথা গলায় তো সে বিরক্ত হয়।

আজ এই অচেনা মেয়েটির আত্মহত্যার কথা ভাবতে ভাবতে সুব্রতর মমতার কথাটাই বিশেষ করে মনে পড়ল। ফটিকদার জন্যে কী একটা

বুনতে বুনতে ফটিক-বৌদি বলেছিলেন—মমতাদের ব্যাপার ঠিক ডিসপ্লেসড পার্সনদের ব্যাপার নয়।

কুমিল্লায় একটা ব্যাঙ্কে কাজ করতেন শ্রীনাথবাবু—মমতার বাবা। শ্রীনাথবাবু বিয়ে করেছিলেন পাড়াগাঁয়ে। সাধারণ গেরস্থর ঘরে। মালতী শ্রীনাথবাবুর স্ত্রীর নাম। মমতার যখন বছর পাঁচেক বয়স তখন মালতী শ্রীনাথবাবুকে ছেড়ে চলে যায়।

—কেন যায়? সুব্রত জিজ্ঞাসা করেছিল।

—মমতার সেটা আমাকে বলার কথা নয়, বলেও নি। জানে, অথচ বলেনি আমিও আর—সে আজ বছর দশেকের কথা। ওর বাবা চাকরি ছেড়ে দিয়ে বৌকে খুঁজেছেন দীর্ঘদিন।

—পান নি নিশ্চয়?

—মমতাকে এসব জিজ্ঞাসা করা যায় না। মেয়েটা বাচ্ছা হলে কী হবে, খুব শক্ত। সম্ভবত এ-জাতীয় কৌতুহলের সম্মুখীন হতে হতেই ওর অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। তবে মনে হয় ওর বাবা একটা হদিস কিছু করেছেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই আর। এখন আর কিছু করার নেই ভদ্রলোকের —নেশা করা আর মেয়ে-ঠ্যাঙানো ছাড়া।

ফটিকদা বললেন—আমার মিসেস দেখতে চাইছিলেন মেয়েটাকে নিজের দানশীলতার ছত্রছায়ায় টেনে আনা যায় কিনা। কিন্তু দেখা গেল সে বড় কঠিন ঠাঁই।

সেদিনও এইরকমই বিষণ্ণ মন নিয়ে সুব্রত বাড়ি ফিরেছিল। বন্যার দুর্যোগে দেখা মেয়েটির বিশীর্ণ সুন্দর মুখশ্রী, জট-পাকানো অবিন্যস্ত চুলের চাল আর তার দুর্ভাগ্যের কথা তার বারে বারে মনে পড়েছিল। আজো অনুভূতি তার একই। মমতা—শান্তনু—এই অচেনা মেয়েটি—চারিদিকে শুধু ক্লান্তি আর ক্লান্তি। শান্তনুর বুকের প্লেট নিতে হবে। সেদিন ফটিকদা ও ফটিক-বৌদি যতক্ষণ মমতার গল্প বলে যাচ্ছিলেন—জরোত্তপ্ত লালচে মুখে উদ্‌ভ্রান্ত চোখে শান্তনু ঘরের ভেন্টিলেটারের দিকে তাকিয়ে ছিল। কী অন্তহীন শ্রান্তি শান্তনুর ঘাড় এলিয়ে বসে থাকার ভঙ্গিতে। কী যে হল সেদিন রুচি আর শান্তনুর মধ্যে, ওরা এ ওর সম্বন্ধে কথা উঠলেই কেমন গম্ভীর হয়ে যায়।

পথে যেতে যেতে সুব্রত দেখল গঙ্গার ধারে ফিলটার হাউসের পাচিলের

কাছে আবছা অন্ধকারে কতকগুলি লোক মোমবাতি জ্বালিয়ে তে-তাস খেলছে। মোমবাতির তেরছা আলোয় ওদের একজনকে দেখে মনে হল সে একটু ফরসা হলে প্রিয়ব্রতর মতো দেখতে হত। প্রিয়ব্রতরা চলে গেছে। নন্দিনী আর কোনো গোলমাল করে নি। যাবার দিন স্বচ্ছন্দে সুব্রতকে প্রণাম করে হাসিমুখে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। আগামী সপ্তাহে বাড়িটা এক সাহা ভদ্রলোক কিনবেন। ওঁরা ঢাকা জেলা থেকে আসছেন। নন্দিনীর প্রতিরোধ সুব্রতর চোখের সামনেই গলে গেল কিছু না—কিছু মনে করে নি সুব্রত। নন্দিনীর বিরুদ্ধে তার মনের মধ্যে কোনো অভিযোগ নেই। সে কি দেখে নি কেমন করে উত্তাপ জুড়িয়ে নিতে হয়। জুড়িয়ে যাওয়া-না-যাওয়ার প্রশ্ন নয়। উত্তাপের সঙ্গেও আপোষ করে নিতে হয়। ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরাও কি তাই করল না? গোঁড়া বিপ্লবী দর্শনের নৈষ্ঠিক শিষ্যরাও যদি মানিয়ে নেয়, এক পা এবং দুই পায়ের এগুনো পেছুনোয় যদি সব পশ্চাদপসরণের ব্যাখ্যা হয়ে যায়—নন্দিনীর এটাও তো তাহলে কিছু নয়—ওয়ান স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড হওয়া মাত্র।

সবাই কি মানিয়ে নেয়? অবজেকটিব কণ্ডিশনের কথাই এ ভাষায় না হয় ও ভাষায় সবাই বলে। রুচি বলে। নন্দিনী বলে। দেবুকে বলতে শুনেছে। মমতাও হয়তো বলে। শুধু কি এই মেয়েটাই বলল না—গলায় দড়িটাই তার সোজা মনে হল? না কি সেও অবজেকটিব কণ্ডিশনের নির্দেশই মেনে নিল? মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলো কুয়াশায় বিবর্ণ। নদীর বুক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। পথে লোক চলাচল কম। মুড়ি-সুড়ি দেওয়া সন্ধ্যা। ঘুরতে ঘুরতে সুব্রত আবার সেই গলিটার মুখে এসে দাঁড়াল। পুলিশ চলে গেছে। ভীড় সরে গেছে। মেয়েটির হাতে লেখা চিঠি ছিল। পুলিশ লাস ছেড়ে দিয়েছে। এবং এতক্ষণের থমকে-থাকা কান্না যেন এতক্ষণ থমকে থেকেই ক্লান্ত হয়ে গেছে। সুব্রতর মনে হল অস্বাভাবিক—সবই অস্বাভাবিক—এমন কি এই ক্লান্ত ভীত কান্নাটাও অস্বাভাবিক।

এই গলির শেষে একটা একতলা বাড়ির ভেতরের দিকে একটা টিনের চালাঘরে ওদের বসবার কথা। সুব্রত দেখল বাইরের ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঝুঁকে পড়ে একজন কাগজ পড়ছে। সুব্রত দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লণ্ঠনের ওপার থেকে ভ্রূ কুঁচকে লোকটি জিজ্ঞাসা করল—কে? সুব্রত এগিয়ে যেতে বলল—আসুন। নস্যি রঙের আলোয়ানের আড়াল থেকে মুখ বার করল না।

—সবাই এসেছে ?

—রুচিদি এসেছেন শুধু। এই এসে পড়বে সব। সবে তো সময় হল।

কাঁচা মাটির উঠোন ডিঙিয়ে একটি লম্বা চওড়া ঘরে ঢুকল সুব্রত। একটা বিচালি-কাটা মেসিন রয়েছে ঘরের একপাশে। হাতে চালানো মেসিন। তার নিচে স্তূপাকার বিচালির কুচো। মাটির মেঝে। ঝাঁট দিয়ে ভদ্রস্থ করা হয়েছে। একটা চটও পাতা হয়েছে তার ওপর। ঘরের দুটো খুঁটির সঙ্গে বাঁশ বেঁধে গোটা দুই লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে। আলো দুটোর দু-রকম রঙ। একটা লাল কেরোসিনের আলো। আর একটা শাদা কেরোসিনের। এই আলোটার নিচে খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে আছে রুচি।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—কতক্ষণ ? চমকে উঠল রুচি। একটু যেন নার্ভাস গলায় বলল—সময় হল, বাবাঃ কী কাণ্ড সব। কতক্ষণ একা এসে বসে আছি। অচেনা জায়গা।

গায়ের চাদরটা খুলে রাখল সুব্রত। রুচির দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে না তাকিয়ে সে পারল না। একটা লাল রঙের শীতের সোয়েটার পরেছে রুচি। সব বোতামগুলো আঁটা যায় নি। অথবা আঁটে নি। কিন্তু এই ঘরে—আজ—এই সভায় রুচির বুকের প্রগলভ উচ্ছ্বাস বেমানান হবে না ? সুব্রত ঠিক করল আজ রুচির পাশে সে বসবে না, দূরে বসবে। আজ রুচিকে একা বসতে দেওয়াই ভালো। রুচির মুখ-চোখ থমথমে। সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে ?

রুচি জবাব দিল—আক্কেল দাঁত উঠছে।

একটা মাঝারি গোছের মাটির সরায় দেখতে দেখতে অনেকগুলো বিড়ির টুকরো জমে উঠল। একটা পান বিড়ির দোকানের মতো ঝোলানো দড়ি বেশ খানিকটা পুড়ে গেল। কিছু শ্রমিক, মাফলারে কাণ মাথা ঢাকা, কিছু জহরকোট পরা ছাত্র, কিছু স্কার্ফ ঢাকা মহিলা—একজন ডাক্তার (ফটিকদা), কয়েকজন শিক্ষক—ঘরখানাকে এবারে রীতিমত ছোটই মনে হচ্ছে। ধুলোয় আর ধোঁয়ায় দমবন্ধ হবার মতো অবস্থা।

পার্টির সরকারী নীতি আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনো বাতিল হয়ে যায় নি। কিন্তু সে নীতির সমালোচক যারা তারা অনেক মুখর হয়ে উঠেছে। সরকারী নীতির সমর্থকেরা আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতায় বেশ খানিকটা হতভম্ব হয়ে

গেছে। আর কারো কারো মধ্যে একটা কিম্ভুতকিমাকার ভয় বা সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়েছে—গোপন মিটিঙের সব ব্যক্তিগত বক্তব্য গবর্নমেন্টের গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারে। কাজেই তারা কিছুটা বোবা। অনেকেরই মনের ভাব যাই হোক মুখের ভাব, আমরা তো আগেই বলেছিলাম। শুধু মানব বেশ মানিয়ে নিয়েছে। আসনপিঁড়ি হয়ে মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছে।

…কাজেই চীনের পথ আর ভারতবর্ষের পথে তফাৎ থাকবেই। (মানব বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ নয়।)

…কেন ?

…চীনের অবজেকটিব কণ্ডিশন আর ভারতবর্ষের অবজেকটিব কণ্ডিশন এক নয়।

…কমরেড অবজেকটিভ কণ্ডিশন, একটা—

…এ সম্বন্ধে আপনি কিছু তথ্যমূলক ভাবে জানেন ?

…শুনুন—

…(পানের পিকটা বাইরে ফেলে আসুন আগে)

রাজনৈতিক রিপোর্টিং-এর এই ক্লান্তিকর অধ্যায়টা কিছুতেই কমরেডরা সংক্ষিপ্ত করতে জানে না। অথচ কেউ কেউ কেমন প্রশান্ত ধৈর্য নিয়ে শোনে। যেমন মানব। সুব্রতর চিরদিনই মনে হয় কমে সারা যায়। সমস্তটা বলা শেষ হতে এখনো তিন কোয়ার্টার। রুচি গালে হাত দিয়ে বসে আছে। খইনি ডলছে দুধনাথ। সুব্রত হাত বাড়িয়ে দুধনাথের কাছ থেকে এক চিমটে খইনি নিল। প্যাণ্ট পরে মাটিতে বসতে ফটিকদার অসুবিধা হচ্ছে। বার বার বসার ভঙ্গিটা পাল্টাচ্ছেন। ফটিকদার স্ত্রীও এসেছেন। সামান্য সুন্দরী। মানব ফোলিও ব্যাগ থেকে একটা সাইক্লো করা কাগজ পড়িয়ে শোনাতে লাগল।

…তাহলে আমরা কি এখন ইলেকশন লড়ব ?

…সে ক্ষেত্রে এত দুর্ভোগের দরকার কি ছিল।

…ব্যাপারটা তা নয়। সবটা এখনো—

…ঠিক করে ভাবা হয় নি। সেণ্ট্রাল কমিটির স্তরে আলোচনা চলছে।

…তবে আর উর্বশীকে চিৎপুরের গণিকা বলা হবে না ? একটি কোণ থেকে শান্তনু বলে উঠল।

…থামো হে এ সভায় মেয়েরা আছে। কটিকদা ধমক দিলেন।

…সে কি আপনি ও-সব বুর্জোয়া চক্ষুলজ্জা মানেন?

একটা হট্টগোল বেধে গেল। সবাই মিলে আবার থামাল। কেউ কেউ লবি করতে লাগল পাশে সরে গিয়ে। লবিটায় সারমর্ম হঠাৎ উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠল—অনেক হারিয়েছি আমরা, হারিয়েছি কি না?

—জরুর। আলবত। ইউনিয়ন আগে একঠো এলান দিলে হাজারো মজদুর সামিল হয়ে যেত। যো কুছ সওয়াল হো পার্টি নাড়া তুললে খলবলি পয়দা করা তো উস টাইমমে সিধা বাত ছিল। লেকিন এখন কি হয়েছে? ইউনিয়ন অফিসকো চারো তরফে কোই আসে না, অফিসমে ঘুসনা তো দুসরা বাত। ডরপোক করে দিয়েছে কারা?

আবেগে দুধনাথ আরো দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে যেন। সুখদেও বলল—জুটার হাওার মাফিক ইউনিয়ন বাতিল করে দিয়েছে, কসুর কিসকো?

মানব রুমাল বের করে মাথার ঘামটা মুছলে। নিরুত্তাপ শান্তনু রুচির দিকে একবার তাকাল। দুধনাথ বলে চলল—আপলোক জানেন পার্টিকা বারে কত আদমি জিন্দগী বরবাদ করেছে। আটতিশ সালে মীরাবাগানে সারা বঙ্গালমে সবসে পহেলা চটকল মজদুর পুলিশকো সাথ মোকাবেলা করেছে। ওহি হাঙ্গামায় হামারা দাদাকে একঠো হাথ বরবাদ হয়ে গেল, আউর মজা হামার বাপকো নোকড়িভি ছুটে গেল। বাপ জুয়া খেলতে লাগল। খাঁয়ের কাছে খত লেখে, কিস্তিওয়ালার কাছে লেখে—জুয়াড়ী শালালোকের কাছে লেখে—আমি লঙ্গোটিয়া ছোকরা—পেপার মিলে সড়কসে কাগজ উঠাকে বিক্রি করি। মহাজনকো ডরসে শেষে রাতকো আন্ধেরিমে ছিপায়কে বাপকে সাথ ভেগে গেলাম। পাণিহাট্টিসে হামরা নোকড়ি মিলে চৌচল্লিস সালে—ওহি সালে সর্দারকো সাথ হাঙ্গামায় নোকড়ি ছুটে ভি গেল। ওহি সালে হামি লালঝাণ্ডা পকড় লিয়া। বিলাকৃর্বোর ব্রার্কার্স ইউনিয়ন বানিয়েছি খুন দিয়ে। আজ ওহি ইউনিয়নকো চাকনাচুর হো গয়া—কসুর কিসকো?

থম থম করতে লাগল ঘরখানা। দুধনাথ হঠাৎ যেন উপলব্ধি করল যে সে বোকার মতো কথার ঝাঁজ প্রকাশ করে ফেলেছে। হেসে আবহাওয়া ঠাণ্ডা করতে চাইল সে। সুব্রতর কাছে সেটাই মনে হল বোকার মতো হাসি।

মানব বলে চলল—যাই হোক, পার্টির সব থেকে বড় কলঙ্ক সিয়ানী

খেয়াল—মানে রাজনৈতিক চেতনা। পার্টির অন্দরে—মানে ভেতরে যে একাই মানে ঐক্য তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এ বিষয়ে কোই দুসরা সওয়াল নেহি, দ্বিতীয় প্রশ্ন নেই।

ভেঙে গেছে, পালিয়ে গেছে, মরে গেছে, নেই, চাকনাচুর হয়ে গেছে। এই কি তাহলে আজকের মিটিং-এর যোগফল—সুব্রত বিমূঢ় হয়ে যেতে বসেছে যেন।

...তাহলে এর পর আমাদের কী করণীয় ?

.. সিফ´ বোলো খানেকো রোটি দেও, জাড়াকো কমলি দেও—সিয়াসী লড়াইকো বাত ছোড় দেনা ? শান্তনু উঠে দাঁড়াল। এ-কদিনে ও যেন আরো রোগা হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সবাই ছাপিয়ে প্রশ্নের আকার ধারণ করল—তাহলে যে সব ছেলেরা রমেনের জন্যে শহিদ স্মৃতি-সভা করতে চাইছে তাদের বারণ করে দেওয়া হোক ?

...কেন ?

...কাহে, কিস লিয়ে ?

—রমেনের কথা, তার বাঁচা মরার কথা এখন যত চেপে যাওয়া যাবে তত অপ্রিয় প্রসঙ্গের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে—তাই না ? তাছাড়া রমেন তো দেখা যাচ্ছে ভুল চিন্তার জন্যে মরেছে। ভুল শহিদ নিয়ে কী হবে আমাদের ?

তীক্ষ্ণ শরের মতো বিদ্রূপের খোঁচা সবাইকে লাগল।

মানবের চোখ-মুখ দেখে মনে হল সে আর ধৈর্য রাখতে পারবে না। তবুও অনেকখানি শান্ত হবার চেষ্টা করল সে। বলল—না, মোটে আমরা তা বলতে চাচ্ছি না ? আমাদের ট্যাকটিকস-এর কথাটা ভাবতে হবে, শুধু এই কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছি। রমেনের মৃত্যুর স্মৃতি আমরাই ধরে রাখব, আমরা যারা মরতে ভয় খাই না তারাই।

রুচির জিজ্ঞাসা চাবুকের মতো ফুঁসে উঠল—তাহলে আমরাই বা ধামাচাপা দিতে চাচ্ছি কেন ?

—চাপা দেবার প্রশ্ন নয়, সমীচীনতার প্রশ্ন।

—কাদের কাছে এ প্রশ্ন ? রুচি যেন থামতে চায় না।

সুব্রত বলল—না, সমীচীনতার প্রশ্নও এ নয়।

...উঠে দাঁড়িয়ে বলুন।

চাদরটা ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াল সুব্রত।

—ভুল অথবা ঠিক, এ বিচার কে করে ? করার মালিক কে ?

শান্তনু বলল—সাফল্য। সফল যখন হই নি, তখন ধরে নিতে হবে আমরা ভুল।

সুব্রত বলল—ব্যঙ্গ করার কোনো মানে হয় না, কেন না একটা কথা ঠিক যে ভুল আমরা করেছি। ভুল করা অস্বাভাবিক নয়, ভুল সংশোধন না করাটাই অস্বাভাবিক।—প্রায় মুখস্থ বলে গেল সুব্রত।—কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রমেন কি, ভুল করছে জেনেই মরেছে, না, তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে অভেদ থেকেই সে মরেছে ? ভুলটা ভুলই। সেটা অপরাধ নয়। পার্টি মেসিনারিকে কবজা করব এই ভাবনাটাই যেখানে বড় সেখানে ঐ চিন্তাই অপরাধ—যেমন নতুন পার্টি-লাইনে যদি এই চিন্তাই নতুন আকারে কারো মাথায় ঢোকে সেটাও অপরাধ। কিন্তু যদি জনসাধারণের স্বার্থের প্রশ্নটাই প্রধান হয় তাহলে ভুলের আকার-প্রকার পাল্টে যায়। রমেনের মৃত্যুর মধ্যে কোনো ভুল নেই। সে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছে। আর, প্রমাণ করেছে যে সে নিজে একজন সৎ মানুষ ছিল।

শান্তনু আবার উঠল—আমরা আমাদের আচরণে যদিও এর উল্টো সাক্ষ্যই দিচ্ছি। অস্ফুট স্বরে রুচি বলল—মানে কি তোমার কথার ?

—তোমরা সকলেই সে কথা বেশ জানো। এই বলে শান্তনু উঠে দরজার কাছে গেল। চটি পরবার জন্যে ফিরে দাঁড়িয়ে সে বলল—আমরা কেউ বুকে হাত রেখে কথা বলি না।

শান্তনু চলে যাবার পর সুব্রত বসে পড়ল। মানব জিজ্ঞাসা করল—তাহলে ?

ফটিকদা বললেন—তাহলে আবার কী ? আমরা প্রথম প্রকাশ্য জনসভা যেটা আমাদের নামে ডাকব সেটা আমরা রমেনের নামেই ডাকব। সেটা তারই স্মৃতি-সভা হবে।

ঠিক—ঠিক কথা—জরুর—ঠিক বাত।

ছেলেরা বলল—আমরা প্রস্তুত। আমাদের শিল্পী, রমেনের একটা বুক পর্যন্ত ছবি এঁকেছে সেটা বাঁধাবার ব্যবস্থা হোক। প্রথম মিটিঙে সভাপতির চেয়ারে ঐ ছবিটাই থাকবে।

—কোথায় সে ছবি ?

একটি খদ্দরের গেরুয়া-চাদর মুড়ি-দেওয়া ছেলে উঠে দাঁড়াল। গোল করে পাকানো একটা বেশ বড় কাগজের প্যাকেট হাতে আলোর দিকে এগিয়ে গেল সে। আর দুটি ছেলের সহায়তা নিয়ে মেটে দেওয়ালে ছবিটাকে সে আটকিয়ে দিল। তখনো বোধ হয় একটু আধটু কাজ বাকি ছিল—ছেলেটি পকেট থেকে পেনসিলের টুকরো বের করে এখানে ওখানে ঘষতে লাগল। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় রমেনের ধূসর ছবিটার দিকে তাকিয়ে সারা ঘরটা এদিকে স্থির হয়ে গেল। শুখনো মুখ, দৃঢ় চোয়াল, অনেকখানি কপাল—মানুষটা যেন সবাইকে বোবা করে দিয়েছে।

মৃদুস্বরে ফটিকদা বললেন—উঠে দাঁড়াও সবাই। আর কোনো তর্ক নেই, প্রশ্ন নেই। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। কে যেন বলল—একেবারে রিএ্যাল।

আর একটা অচেনা গলা বলল—হি ইজ নট ডেড্, হি ইজ উইথ আস।

রুচি ছবির দিকে নয়—সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সকলে আবার শান্ত ভাবে বসে পড়লে সুব্রত বলল—একটা গান হোক। কেউ রাজি নয়। সকলেরই মধ্যে কেমন একটা স্তব্ধতা এসেছে। ফটিকদা রুচিকে বললেন গাইতে। রুচি বলল, কী গাইব? কে জবাব দিল—যা ইচ্ছে। "আমি যে এসব গান জানিনে।" "যা জানো তাই হোক।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অনেক ভেবে, কিম্বা হয়তো কিছু না ভেবেই রুচি ধরল—আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে—আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে। সমস্ত ঘরখানা এখন মনে মনে বিভিন্ন ভাষায় ঐ একটা কথাই বলছিল। সুব্রত আবার বুঝল যে বেদনাই সাম্যবিধায়ক—বেদনার কাছেই সকলে সবকিছু মুলতুবি রাখতে পারে। সুব্রতর নিজেরও তো রমেনের সঙ্গে কত রূঢ় তর্ক বিতর্ক হয়ে গেছে। সুব্রতর মধ্যে রমেন কতদিন আইসোলেশনিস্টকে প্রত্যক্ষ করেছে, সুব্রত দেখেছে রমেনের মধ্যে পলিটিক্যাল টেররিজমের হতাশাকে—তবু সে রমেনের মধ্যে কখনো হেয় ছলনাকে মাথা তুলতে দেখে নি। স্তব্ধ হয়ে-যাওয়া মিটিঙ। গান শেষ করে রুচি এতক্ষণে ছবিটার দিকে তাকিয়েছে। সুব্রতর ডাকতে ইচ্ছে করছিল রুচিকে।

মিটিং শেষ হয়ে গেছে।

পথে নেমে রুচি আর সুব্রত কথা বলছিল না। পাশাপাশি নীরবে হাঁটছিল। সুব্রত রুচিকে কথা বলাবার চেষ্টাও করছিল না। গলির মোড়ে সেই আত্মহত্যার বাড়ি থেকে কান্না উঠছে ডুকরে ডুকরে। নির্জন গলি। একলা কান্না—যেন কোথাও সহানুভূতি চেয়ে পায় নি। ধোঁয়া—কনকনে শীত—অন্ধকার—আত্মহত্যা—অপঘাত—দোমড়ানো কান্না—বোবা কান্না—নানা দিক থেকে মুচড়ে যাওয়া এ এক অপরূপ ভারতবর্ষ। এরি মাঝখানে আমাকে সন্ধান করতে হবে তাকে? সুব্রত মনে মনে বলল।

কাকে?

তার নাম কী?—সুব্রত ভাবল॥

(ক্রমশ)

বিষ্ণু দে

উত্তর

তখন জিজ্ঞাসা করি : কে তুমি ? কে তুমি ? দুইজনই
নিরুত্তর, চিরকালই নিরুত্তর এরা দুইজনে।
হয়তো জীবিত ব'লে। যেহেতু জীবনে এরা কেউ
ভাবেনি যে, কে সে আর ওই বা কে ? স্বচ্ছন্দ নির্জনে
বোধহয় দেখেইনি মুখ পরস্পর, এরা নয় ধনী
বণিক বা শক্তিধর, কোথা সে সময় বা সুযোগ ?
দেখে নি নিজেরই মুখ, প্রতিদিন বড়ই দুর্ভোগ।

সাহেব-পাড়ায় দেখি সুন্দর বাগানে শ্যাম পীত
আমের বউল আজ শীতের বিদায়ে উন্মুখর।
এরা কিন্তু নিরুত্তর, আজীবন, আজও নিরুত্তর,
অথবা উত্তর দেয় কানে কানে। কিন্তু সে উত্তর
ডুবে যায়, কারণ শহরে গ্রামে হল্লে দেয় ঢেউ।
তবু নাম পথে ভাসে, রাজপথে গলিতে দুস্তর,
কারণ এ গাজী, আর ও দক্ষিণ রায়, এরা মৃত ॥

পরভেজ্ শাহিদী

মুখাকৃতিহীন

অস্থি হাজার ত্বকে ঘেরা
বিষণ্ণতা হাজার ওষ্ঠ তুলে
তৃষ্ণা হাজার পর্দায় ঢাকা
তাচ্ছিল্য, হাজারো অছিলায়

গর্ব হাজার ভঙ্গী নিয়ে
বিনয়ও হাজার ভঙ্গিমায়
চেতনার পাক সহস্র
মূঢ়তার গ্রন্থি অগাধ

নীরবতারও সহস্র স্বর
জীবন সহস্র মৃত্যুর রূপে
হীনমন্যতার উত্তেজনা উচ্চাভিমানের পরতে বাঁধা

এ ছিন্নভিন্ন মানুষ
এ টুকরো-টাকরা মানুষ
এই সহস্রাকৃতি মানুষ
লোভের অর্থনীতির সাজান বিশৃঙ্খলা—
অশেষ যন্ত্রণা মূর্তিমান—
বল্গাহীন সমাজের অনুপম সৃষ্টি!

এই হাজার আকৃতির মানুষ
আপন আকারের খোঁজে
এখানে-ওখানে-সেখানে, ঘোরে
দিগ্বিদিকহীন, দিশাহারা
আত্মগর্বের মলিন চাদর গা'য়

তারা এখানে-ওখানে
পালায়
তার আপন আকৃতি হাজার চেহারার ভীড়ে
গিয়েছে হারিয়ে
পেতে পারে কি খুঁজে ?

আয়নার সহযোগও বৃথা
দর্পণও অতলস্পর্শী
আপন অসংখ্য চেহারার ভীড়ে
দৃষ্টিও পড়ে ঘূর্ণাবর্তে

কোনও ছবিরই আর বৈশিষ্ট্য নেই
কোনও ছায়াও
বিশ্বাসযোগ্য নয়

এই অসংখ্য আকৃতির মানুষ
অসংখ্য আকৃতি ব'য়ে
ছুটছে, পালাচ্ছে, অজ্ঞাতসারে, নিজেরই
কোথায়, আপন রূপ কোথায়—
সেই সত্য মুখাবয়ব, যে মুখ
পড়ে আছে ছিটকে, কাঁদছে, এই অসংখ্য আকৃতির ভীড়ে।

[মূল উর্দু থেকে কবির সহযোগিতায় অনুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানুষের নামে

সাদা কালো হলদে বাদামী নানা রঙের মানুষ
শিশু বৃদ্ধ যুবক যুবতী
দেশে দেশে
যারা পাখির চেয়েও বড় প্রতীক্ষায় নীড় বাঁধে
জনক জননী সন্তান সন্ততি-কে নিয়ে

তাদের আমি দেখতে পাই পৃথিবীর সব দেশে
রুশ ভারত চীন আমেরিকা মিশর পাকিস্তান
কংগো কিউবা
যেখানে যখন একটি সদ্যোজাত শিশুর কান্না শুনি
অথবা প্রেমিক প্রেমিকার মৃদু গুঞ্জনে অনুভব করি
একটি রাত ভোর হচ্ছে
তাদের আমি দেখতে পাই

অন্ধকারের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। আর
তখনই তাদের মুখে
আমার নিজের নাম শুনতে পাই
বুঝতে পারি আমিও একজন মানুষ, পবিত্র
এবং নিরপরাধ॥

চিত্ত ঘোষ

ঘৃণা হত্যা অন্ধকার

যেখানে ঘৃণা হত্যা অন্ধকার জেগে বসে আছে
সেই মৃত্যুপুরীর ভেতর থেকে প্রবল মত্ততা বেরিয়ে এল।

কোথায় কখন খুনের থপ্পরে পড়বে
চারহাতে-পাতা সংসার দশদিক থেকে ছেঁকে ধরবে আগুন
গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে বুকের-কাছে-লেগে-থাকা বুক
তাই
মানুষটার কথা বলতে ভয়
ছেলেটার কাঁদতে ভয়
বৌটার নিজেকে ভয়
তাড়া খেয়ে খেয়ে, তাড়া খেয়ে খেয়ে যখন পা মুড়ে আসে
পেছনে শুধু অনুসরণের শব্দ, ছায়া
তখন
আস্তে আস্তে কাঁধে হাত রেখে কে এসে সামনে দাঁড়াল ?
জীবন।
থাকতে দেবে বলে জোর গলায় ডাক দিল কার ঘর ?
ভালোবাসার।
দরজায় দাঁড়িয়ে এদিক থেকে ওদিক পাহারাদার কে গো ?
সাহস।
অতিতামস পরাভূত করে কে আবার আলো ফোটায় ?
শুভময়।

উপাসনার ঈশ্বরের নাম আলাদা বলে
পুড়ে ছারখার সংসার, বাতাসে ছাই ওড়ে।
উপাসনার ঈশ্বরের নাম আলাদা বলে
ঘরগুলো খালি, ঘরগুলো আগুন, ঘরগুলো অঙ্গার

উপাসনায় ঈশ্বরের নাম আলাদা বলে
কলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে মানুষটা সেই যে গেল
আর এল না।

খুঁজে খুঁজে খুঁজে খুঁজে কে কাকে পায়
ফিরে পায়
কি কি হারায় নি, পোড়ে নি
তার তালিকা বানাতে
একই ঘরের দরজা দিয়ে যাওয়া আসা
আর কুহকিনী, সেই আশার মুখ চেয়ে
এ-ঘর ও-ঘর, এ-পাড়া ও-পাড়া
এ-দেশ ও-দেশ।

সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন, পোড়ার চিহ্ন
কাছে বসে আছে হৃদয়।

তরুণ সান্যাল

লোনা পানির গাঙে

চোখের নিচে তোমরা কারা
চিনতেই পারছি না
চিনতে পারব আর ?
তোরা ছিলি কী পাতাবাহার
বনদোপাটি, ভাঁটি
লতার অন্ধকার ?
[illegible] ফেটে যায় কার ও ঘরে
ধোঁয়ার লালে ঘোর

এখন দশটা রাত :
ট্রাম চলে না নোনাপুকুরে
কবর ঘরে সাদায়
কালো বোমারু হাত।

আলো ঘুরে যায়, যায় পিছনে
দাঁতে বালির কুচি :
লালমোহন সেন—
তিনি এলেন, ফিরে এলেন ?
আলী ইমাম, কেয়া, আশীষ···
—তিনি কী এসেছেন—?
নিচে কেবল ঢেউয়ের হাঁক
বাঘের ডাক, হাঙর, সাপ
কুমীরে কিলবিল—
আমি চিনতে পারছি না কে
সিরাজ, সুবোধ, একটা দেশের
বুক বরাবর খিল।

বুড়ো মিঞার নায় চলেছি
লোনা পানির গাঙে
রমজানের চাঁদ
ভাবতেই পারছি না, কাদের
ভাঙা ভিটেয় এসে
পোছে না সংবাদ—
তারা শিকার রক্তে দুঃখে
ভয়ে ও বেদনায়
আমি তাদেরই ভাই :
একা উজান বাইতে গেলে
আদি গঙ্গায় বুড়িগঙ্গায়
একা গোলুয়ে একা গোলুয়ে
কপালই চাপড়াই।

গোলাম কুদ্দুস

একজন শ্রমিক ও সাহিত্য

চাষীর ছেলের কে নাম রেখেছিল গওসল? এ কী স্কুলের মৌলভীর কাণ্ড! এঁরা অনেক সময় নাম পালটিয়ে চাষীর ছেলেকে ভদ্র করার চেষ্টা করেন! কিন্তু তুমি হয়ে গেলে শ্রমিক। আর গওসল শব্দটা শোনামাত্র ভদ্র চেহারার পরিবর্তে কেন জানি কাঁটা-ফোলানো সজারুর দেহ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

যাকগে, নামের সঙ্গে তোমার চেহারার আদৌ মিল ছিল না। বরং সাহিত্যের জটিল আলোচনা উঠলে সর্বাগ্রে তোমার সরল মুখখানাই আমার মনে পড়ে।

সাহিত্য নিয়ে বিদ্বানদের মুখে কি কম আলোচনা শুনেছি! তার মূল্য কমানোর সাহস আমার নেই। কিন্তু সে সব কথার সাড়ে যোলো আনাই কেন মন ভুলে বসে থাকে? অথচ চৌদ্দ বছর আগে তোমার মুখে যা শুনেছিলাম তার প্রায় প্রত্যেকটা কথাই এখনো স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি!

তখন সবেমাত্র দেশ ভাগ হয়েছে। তখনো ঢাকা রেল স্টেশনের অদূরে মালগাড়ীর শত শত ওয়াগনে ভারতত্যাগী হাজার হাজার রেলশ্রমিককে বাস করতে হত। তুমি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে সেই নরকবাসের চিত্র আমার একটি উপন্যাসে স্থানলাভও করেছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তুমি আর আমি ঐ রকম একখানা ওয়াগনে একসঙ্গে বেশ কিছুদিন বাস করেছিলাম।

তুমি হয়তো ভুলে যাওনি, ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে ভারত ও পাকিস্তানে একই দিনে রেল ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছিল। তাতে শ্রমিকেরা বিন্দুমাত্র সাড়া দেয় নি। তারপরই বন্ধুদের তাড়নায় আমাকে কোলকাতা ছেড়ে কিছুদিনের জন্য ঢাকায় যেতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল মহৎ—রেল শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান। ব্যাপারটা এখন হাস্যকর ঠেকে। কিন্তু কোনো জিনিসই যে তুচ্ছ নয় তার কারণ বোধ হয় এই যে, মানুষের কাছে গেলে কিছু না কিছু সব সময়েই শেখা যায়।

আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল, আর তুমি হয়েছিলে কার্যত আমার বডিগার্ড! আমার আত্মার দিকেও যে তুমি হাত বাড়িয়েছিলে তখন তা কি জানতাম!

রাত্রিবেলা গা ঢাকা দিয়ে চলাফেরা করা যেত, দিনের বেলাটাই ছিল মারাত্মক। ওয়াগনের ঘেরাটোপের মধ্যে এমনিতেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত। তার উপর যখন চারদিকে ডজন ডজন কয়লার উনুন জ্বালানো হত আর তার ধোঁয়া মলমূত্রের দুর্গন্ধের সঙ্গে মিলে নাকে এসে ঢুকত, তখন কল্পিত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী নিতান্ত সত্য বলেই বোধ হত। কেউ কি ভ্রমেও কল্পনা করতে পেরেছিল এটাই হবে তোমার আমার মধ্যে সাহিত্য আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ!

আমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কি করে কমিউনিস্ট হলে?

শরৎচন্দ্রের বই পড়ে!

বল কি!

হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

কিন্তু তাঁর বইয়ের মধ্যে কমিউনিজম কোথায়।

তা জানি নে। তবে এটা জানি তাঁর বই না পড়লে আমি কমিউনিস্ট হতে পারতাম না।

ব্যাপারটা খোলসা করে বলো দেখি! এখানকার এই ধোঁয়ার চেয়েও যে ধোঁয়াটে লাগছে।

তা কি করব বলুন!

কিছু করতে বলছি নে, একটু বুঝিয়ে বলতে বলছি।

তুমি তখন ঢোক গিলে বললে, আমি যা বলেছি তার চেয়ে বেশি বলতে পারব না।

ক্ষণিকের তরে তোমার মুখটা যে একটা অজ্ঞাত কারণে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল, তা আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই পীড়াপীড়ি করতে ইচ্ছে হল না।

আচ্ছা বলতে হবে না।

রাগ করছেন?

রাগ করব কেন! কাউকে দিয়ে তো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলানো যায় না।

আপনি কি মনে করছেন এর মধ্যে কোনো গোপন কথা আছে?

কি করে জানব!

শুনতেই হবে?

বললেই শুনব। তবে এ এমন একটা ব্যাপার নয় যা না শুনলেই নয়। বললেই বা তোমার কি ক্ষতি হবে, আর শুনলেই বা আমার কি লাভ হবে জানিনে। তবে কৌতূহল হয়েছিল এই যা।

তুমি একটু চুপ করে থেকে বললে, আচ্ছা বলছি। বাড়ি আমার ময়মনসিং জেলার গ্রামে। আমরা খুব গরীব ছিলাম। তবু বাপ আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। আমি যখন ভাগের অঙ্ক কষছি তখন বাপ মারা গেল। আমার দ্বারা কি চাষের কাজ হয়! কর্তারা ভাগের জমি ছাড়িয়ে নিল। গরু-জোড়া বিক্রি করে দিলাম। সংসারে তখন আমার নিজের বলতে থাকল সাড়ে তিন বিঘে জমি আর এক মা। তাছাড়া আরো একজন ছিল, তার কথা মনে হলে এখনো আমার চোখে পানি আসে।

সেও চাষীর মেয়ে। আমার চোখে ছিল পরী। পরী বলেই তাকে ডাকতাম। কি করে তার সঙ্গে আমার—সে অনেক কথা, সে সব থাক। পরীর বাপ চাষী হলেও তার ছিল চারখানা লাঙল, চারজোড়া গরু, তিনটে দুধেল গাই, পাঁচটা জোয়ান মর্দ ছেলে। আমার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?

একদিন পরীকে বললাম, যদি চাকরী পাই তো দেশে ফিরব, নইলে এই শেষ দেখা।

সে খুব কাঁদতে লাগল।

আমি ময়মনসিং শহরে এলাম। ছয় মাস এ হেন কাজ নেই যা আমি করিনি। সে সব কথাও থাক। ঘুরতে ঘুরতে শেষে আমার কপাল খুলে গেল—রেলে সামান্য একটা চাকরী পেলাম। তাতেই আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম, মসজিদে গিয়ে সিন্নি দিলাম। হাসছেন কী, আমি তখন যে খুব ধার্মিক ছিলাম! যাক, শুনুন, দু'মাস পরে আমি তো আশায় আনন্দে আটখানা হয়ে বাড়ি গেলাম, গিয়েই কি শুনলাম জানেন? পরীর বিয়ে হয়ে গেছে!

আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। যে গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ি, সেখানে গেলাম। তারা কুটুম ভেবে আদরযত্ন করে খাওয়াল। পরীর সাথে রাত্রে

লুকিয়ে দেখা করলাম। সে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিল, কিন্তু আমার সঙ্গে পালাতে রাজী হল না। পরদিন আবার রাত্রে দেখা করলাম। সে আমাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করল। বিয়ে করলেই আমার সব কষ্ট চলে যাবে।

মন সায় দিল না। তিন মাস পরে আবার পরীর শ্বশুরবাড়ি গেলাম। আবার অনিচ্ছুক পরীর সঙ্গে দেখা করলাম। ওরা নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছিল, আমাদের দুইজনকে ওরা হাতেনাতে ধরে ফেলল। পরীর দশা কি হল জানিনে, আমাকে ওরা মেরে মেরে আধমরা করে ছেড়ে দিল।

আমি মাস তিনেক পরে পরীর কথাই রাখলাম—বিয়ে করলাম। কিন্তু তাকে ভুলতে পারলাম কই?

আমাকে লোকে বলতে লাগল ক্ষ্যাপা, আধপাগলা। আমি প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকতাম। কয়েকবার গাড়ী চাপা পড়তে পড়তে পড়িনি।

ঢাকা ওয়ার্কসপে বদলী হয়ে এলাম। কারও সঙ্গে কথা বলতে গল্প করতে ভালো লাগত না, একা একা ঘুরে বেড়াতাম, আর মাঝে মাঝে সিনেমা দেখতাম। বাড়ি গেলে বৌ বলত, বাসা কর। আমি সে-কথা এড়িয়ে যেতাম।

একবার বৌকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম তার খুব অসুখ। সে গ্রামের ডাক্তারকে আমি চিনতাম, কারণ তিনি আমাদের গ্রামের জামাই। তাঁর কাছে আমি ওষুধ আনতে এবং গল্প করতে যেতাম। একদিন দেখি তাঁর টেবিলের উপর 'পল্লীসমাজ' বলে একটা বই পড়ে আছে। ডাক্তার কলে বেরিয়েছিলেন, আমি বইখানা একটু একটু করে পড়তে লাগলাম। কয়েকপাতা পড়েই যেন ওর মধ্যে ডুবে গেলাম। ডাক্তার এলে বললাম, এটা একটু নিয়ে যাব?

একে আমি ওঁদের গ্রামের জামাই, তার উপর শহরে চাকরি করি, ওরা একটু খাতির করত। ডাক্তার হেসে বললেন, যাওয়ার আগে ফেরত দিয়ে যাবেন কিন্তু।

আমার কোনোকালে বইপড়া অভ্যেস ছিল না। তাই প্রথমে পড়াটা আয়ত্ব করতে বেশ বেগ পেতে হল। কিন্তু বইটা যেন আমার হাতে আঠার মতো লেগে রইল। আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না। পড়ি আর ভাবি। আগে চোখ বুঁজলেই পরীর মুখ দেখতে পেতাম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন এক-একবার রমা এবং রমেশের মুখও চোখের পাশে এসে

উঁকি মারতে লাগল। আমি যেন ওদের হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি। ওরা আমার কাছে এমন স্পষ্ট, এমন জ্যান্ত! আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম! এ কেমন করে হয়!

আমি ওদের ভালোবেসে ফেললাম। হঠাৎ আমার মনে হল কি জানেন? রমা এবং রমেশের দুঃখ আমার চেয়ে কম নয়! এ যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! কেননা আমার কেবলি মনে হত, আমার মতো দুঃখী দ্বিতীয় কেউ নেই। আমার মতো হতভাগ্য তাহলে সংসারে আরো আছে! আমি যেন ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠলাম।

তখন চারপাশের লোকজনের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। এক-একজনকে দেখতাম আর ভাবতাম, এর কি দুঃখ? ক্রমেই আমি তাদের মধ্যে দুঃখের সন্ধান পেতে লাগলাম। তারপর আমার মনে হল, আমার চারপাশে এত দুঃখী লোক! অথচ আমি এদের মধ্যেই এতদিন বাস করে আসছি! তবু তাদের দেখি নি! এ কি করে হয়! আমার সে সময়কার বিচিত্র বিস্ময়ের কথা আপনাকে কি করে বোঝাব! পরীর জন্য তখনো আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল, কিন্তু বুকের অসহ্য ভার যেন একটু নেমে গেল।

তখন জানাশোনা কত লোকের সুখ-দুঃখের কথাই যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে ভাবতে শিখলাম তা বলতে গেলে সাত দিন সাত রাত লেগে যাবে। আমি তখন খুঁজে খুঁজে এক লাইব্রেরী বের করলাম। সেখান থেকে শরৎচন্দ্রের বই এনে এনে পড়তে লাগলাম। যতই পড়ি ততই দেখি দুঃখ এক রকমের নয়, বহু রকমের! দুঃখের যে এত রকমফের আছে তাই কি জানতাম! আবার সুখও যে হরেক রকমের তাও তো চোখে পড়ে নি! ক্রমেই আমার চারদিকে বইয়ের লোকেরা এসে ঘিরে দাঁড়াতে লাগল। আমি তাদের সঙ্গে মনে মনে কত কথাই বলতে লাগলাম!

এমন সময় কমিনিউস্টদের সঙ্গে আলাপ হল। তারাও আমাকে মানুষের দুঃখের কথা বলল, শোষণ এবং সংগ্রামের কথা শোনাল, মুক্তির উপায় জানাল। সব কি আর বুঝেছি, না তারাই বোঝাতে পেরেছে? তবু আমার মন বলল—বুঝেছি! দেশদেশান্তরের কত মানুষ যেন আমার কাছে এসে তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলতে লাগল। তাদের আমি দেখি নি, কিন্তু কল্পনায় তাদের ভাই-বন্ধু বলে স্বীকার করে নিতে কষ্ট হল না। এক বিরাট দুনিয়া আমার চোখের সামনে খুলে গেল!

গওসল, তুমি তোমার কথা শেষ করে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইলে। ভাবখানা এই : আমার জিজ্ঞাসার জবাব মিলেছে কিনা। তোমার সহজ সুন্দর কাহিনীটি আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল, তাই আর কিছু খুঁটিয়ে জানার প্রয়োজন অনুভব করি নি। নিজের মনেই তোমার জীবনের অকথিত ফাঁকগুলি পূর্ণ করে তোমাকে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। আর ভাবছিলাম বহু বিতর্কিত সমাজ-ব্যক্তি-রাজনীতি-সাহিত্যের সম্পর্কের সমস্যা।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তুমি বললে, আর একটা কথা আপনাকে বলা হয় নি। মানুষ সম্পর্কে আমার পর্যবেক্ষণশক্তি যেটুকু বেড়ে গেল তাতেই আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, শতকরা নিরানব্বুই ভাগ লোক শুধু নিজের কথাই চিন্তা করে, আর নিজের দুঃখকেই সবচেয়ে বড় মনে করে! জানেন এতেই সবকিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি! আপনার কি মত?

আমি শুনছি।

আচ্ছা যাদের চিনি না জানি না সাহিত্য আমার কাছে কী করে তাদের টেনে আনে? কাছে মানে? যাকে বলে একেবারে বুকের মধ্যে! আর তাতেই বুকটা বড় হয়ে ওঠে। অনেক মানুষকে ভালোবেসে ফেলি! আর কেবলি মনে হয় তাদের দুঃখের কারণ কি দূর করা যায় না? আপনার সে রকম মনে হয় না?

আমি শুনছি।

তুমি বললে, আর একটা কথা, সাহিত্য পড়লে কেন ভয় কমে যায়? সাহিত্যের মানুষের কথা যতই ভাবি ততই যেন সাহস পাই। তার কারণ কি এই তারা অনেকে একসঙ্গে বুকের ভিতর বসে থেকে সাহস দেয়? আপনার কি ধারণা?

আমি শুনছি।

তুমি রাগের ভান করে বললে, ভালো হবে না কিন্তু। আপনি কোনো কথার জবাব দিচ্ছেন না। আর দেখুন, আমার মনে হয় ধনীরা মানুষকে ভাগ করে করে রেখেছে, সাহিত্যের মধ্যে তারা বেশ পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। আপনি কি বলেন?

আমি শুনছি।

তুমি তখন বললে, আপনি ভারি খারাপ লোক।

সমরেশ বসু

আদাব

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারী হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই—দা, শড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তাছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্ত-ঘাতকের দল—চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু-বিভীষিকার এ-অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলেছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন, মৃত্যু-কাতর নারী-শিশুর চিৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী গাড়ি। তারা গুলি ছুঁড়ছে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে—আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিনটা উলটে এসে পড়েছে গলি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙা-চোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না—'আল্লা-হু-আকবর' কি 'বন্দেমাতরম্।'

হঠাৎ ডাস্টবিনটা নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত-পাগুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে।··· নিশ্চল, নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধ হয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্ত লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল

একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ! আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা। ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা।…ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটা মাথা! মানুষ! ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ, নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা—ধীর…। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল—হিন্দু না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয়তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দুজনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি জিজ্ঞেস করে ফেলে,—হিন্দু না মুসলমান?

—আগে তুমি কও, অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে অস্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে। প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, আবার অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে বাড়ি কোন্‌খানে?

—বুড়িগঙ্গার হেই পারে—সুবইডায়। তোমার?

—চাষারা—নারায়ণগঞ্জের কাছে।…কি কাম কর?

—নাও আছে আমার, না'য়ের মাঝি।—তুমি?

—নারায়ণগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে অন্ধকারের মধ্যে দুজনে দুজনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটাকে খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে। হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা সোরগোল ওঠে। শোনা যায় দু-পক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

—ধারে কাছেই য্যান্ লাগছে, সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

—হ, চল এইখান থেইক্যা উইঠা যাই, মাঝিও বলে অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল: আরে না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি?

মাঝির মন আরো সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোনো বদ্-অভিপ্রায় নেই তো! সুতা-মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই বলল—বইয়ো। যেমন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাক।

মাঝির মনটা ছাঁৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তা হলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—ক্যান্?

—ক্যান্? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উটল—ক্যান্ কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল।—যামু না তো কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ! বলল—তোমার মতলবটা তো ভালো মনে হইতাছে না। কোন জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমাকে মারনের লেইগা?

—এইটা কেমুন কথা কও তুমি?—স্থান-কাল ভুলে রাগে দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—ভালো কথাই কইছি ভাই; বইয়ো, মানুষের মন বোঝ না?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কি ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হল শুনে।

—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?

সোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো। অন্ধকার গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ ছেলেমেয়েদের কথা…তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে—না তারাই থাকবে বেঁচে!…কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত

হাসাহাসি, কথা-কওয়াকয়ি—আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কি করে? কি অভিশপ্ত জাত!···সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

—বিড়ি খাইবা? সুতা-মজুর পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমতো দু-একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ্য করেনি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খস্ খস্ শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ-ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

হালার ম্যাচ্‌বাতিও গেছে সেঁতাইয়া।—আর একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সুতা-মজুরের পাশে।

—আরে জলব জলব, দেও দেহিনি—আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু-একবার খস্ খস্ করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

—সোহান্ আল্লা!—নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি।···

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

—তুমি···?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দুজোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড় বড় হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট্ করে উঠে দাঁড়াল। বলল—হ আমি মোছলমান। কি হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—কিছু হয় নাই, কিন্তু···

মাঝির বগলের পুঁটলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কি আছে?

—পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখানা শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব জান?

—আর কিছু নাই তো ?—সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

—মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি ? বিশ্বাস না হয় দেখ।—পুঁটলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

—আরে না না, ভাই, দেখুম আর কি। তবে দিনকালটা দেখছ তো ? বিশ্বাস করন যায়—তুমিই কও ?

—হেই তো হক্ কথাই। দেইছ ভাই—তুমি কিছু রাখ-টাক নাইতো ?

—ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটা সুইও নাই। পরাণটা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়।—সুতা-মজুর তার জামা-কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দুজনে বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনযোগ-সহকারে দুজনে ধূমপান করল খানিকক্ষণ।

—আইচ্ছা···। মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

—আইচ্ছা—আমারে কইতে পার নি—এই মাইর-দইর, কাটাকুটি কিসের লেইগা ?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ তো তোমাগো ওই লীগওয়ালাগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটা কটুক্তি করে উঠল, হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কি। তোমাগো দু-গা লোক মরব আমাগো দু-গা মরব। তাতে দ্যাশের কি উপকারটা হইব ?

—আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কি, হইব আমার এই কলাটা।—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে : তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল সনের রায়টে আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইর মারল। ফলে হইল বিধবা বইন আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কি আর সাধে, স্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপর পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

—মানুষ না, আমরা য্যান্ কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নাইলে এমুন কামড়াকামড়িটা লাগে কেম্‌বায়?—নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু-হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।

—আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমন্দি। নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কি। জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েবমশায় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান্ হজরতের হাত, বখ্‌শিস্ দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। ভাই, আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে।

সুতা-মজুর কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। এক সঙ্গে অনেকগুলি ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যেন বড় রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

—কি করবা? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটলিটাকে বগলদাবা করে।

—চল পলাই। কিন্তুক যামু কোন্‌দিকে? শহরের রাস্তাঘাট তো ভালো চিনি না।

মাঝি বলল, চল যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর খামু না—ওই ড্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

—হ। ঠিক কথাই কইছ। কোন্‌দিকে যাইবা কও—আইয়া তো পড়ল।

—এই দিকে—

গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করে মাঝি। বলল, চল, কোনো গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ভয় নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবারে পটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুটফুট করছে। দুজনেই একবার থমকে দাঁড়াল—ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এ-মোড় ও-মোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় তাদের পিছনে

শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে এক অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ পাশে মেথর যাতায়াতের একটা সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে, উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে আবার তারা বেরোয়।

—কিনারে কিনারে চল। সূতা-মজুর বলে।

রাস্তার ধার ঘেঁযে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

—খাড়াও। মাঝি চাপা-গলায় বলে। সূতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

—কি হইল ?

—এদিকে আইয়ো—সূতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পান-বিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

—হেদিকে দেখ।

মাঝির সঙ্কেত মতো সামনের দিকে তাকিয়ে সূতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কি যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত-মুখ নেড়ে। বারান্দার নিচে ঘোড়ার জিন্ ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলি পা ঠুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে, ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। আর একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে সেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সূতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল।—তবে ?

—তাই কইতেছি তুমি থাক, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দুগো আস্তনা। আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সক্কালে উইঠা বাড়িত্ যাইব গা।

—আর তুমি ?

—আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে।—আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কি

হইল না হইল আল্লাই জানে। কোনোরকম কইরা গলির মধ্যে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

—আরে না না মিয়া কর কি ? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে।—কেমনে যাইবা তুমি, আঁ ?

আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

—ধইরো না ভাই, ছাইড়া দেও। বোঝ না তুমি কাইল ঈদ্, পোলা-মাইয়ারা সব আজ চান্দ্ দেখ্ছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিন্‌ব, বাপজানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই—মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টন টন করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

—যদি তোমারে ধইরা ফেলায় ?—ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

—পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখানে থাইকো য্যান্ উইঠো না। যাই…ভুলুম না ভাই, এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব।—আদাব।

—আমিও ভুলুম না ভাই। আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুক্-ধুকানি তার কিছুতেই বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগ্‌মান—মাজি য্যান বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে। অনেকক্ষণ তো হল, মাঝি বোধহয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা পোলামাইয়ার কত আশা নতুন জামা পরবে, আনন্দ করে পরবে। বেচারা বাপজানের পরাণ তো। সুতা-মজুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে, 'হ ? মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ ?'—সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি—তখন কি করবে ? মাঝি তখন —

—হলট্…

ধবক্ করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি

করছে। কি যেন বলাবলি করছে চিৎকার করে: ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ-অফিসার রিভলভার হাতে রাস্তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম্, গুড়ুম। দুটো নীল্‌চে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ-আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলা-মাইয়ার, তার বিবির জামা-শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালেরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুষমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

শ্রীসমরেশ বসুর "আদাব" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ সালের শারদীয় 'পরিচয়'-এ। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হল।

হীরেন মুখোপাধ্যায়

শিল্পী নন্দলাল

বিগত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৩ নন্দলালের আশী বর্ষ পূর্তি হলে সেই উপলক্ষে তাঁর দেশবাসী তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখান। নন্দলালের মত প্রতিভা যে কোনো দেশে যে কোনো কালেই দুর্লভ। দীর্ঘদিন একান্তে বসে এই নিরহঙ্কার আত্মপ্রচারবিমুখ শিল্পী তাঁর ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য যে বিপুল শিল্পসম্ভার সৃষ্টি করে গেছেন (এবং এখনও করছেন) তার যথার্থ মূল্য আজও নিরূপিত হয় নি। আগে তাঁর ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর শিষ্য ও গুণমুগ্ধরা মিলে তাঁর চিত্রকলার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন এবং সেই কর্মসূচীরই অঙ্গ হিসাবে কিছুদিন পরে তাঁর চিত্রকলার একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন। নন্দলালের ছবির সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ নেই তাঁদের কাছে এই অ্যালবামটি অপরিহার্য। এতে নন্দলালের জীবন ও কর্ম নিয়ে দীর্ঘ অথচ সুলিখিত একটি ভূমিকা আছে এবং তাঁর শিল্পী জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অবলম্বনে ২৯টি বাছাই করা ছবির রঙীন ও একরঙা প্রতিলিপি আছে এবং সেই সঙ্গে আছে কিছু কার্ড স্কেচেরও প্রতিলিপি। যদিও রঙীন ছবিগুলির প্রতিলিপি সবক্ষেত্রে আশানুরূপ হয় নি এবং তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ ছবিই এ সংকলন থেকে বাদ পড়ে গেছে তবুও নন্দলালের চিত্রকলার একমাত্র সংকলন হিসাবে অ্যালবামটি চিত্র-প্রেমিকদের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। দুঃখের বিষয় অ্যালবামটি এখন আর পাওয়া যায় না, এটির পুনর্মুদ্রণ দরকার। তাছাড়া নন্দলালের প্রতিভার সম্যক পরিচয় একটিমাত্র অ্যালবামে দেওয়া সম্ভব নয়, তাঁর শিল্পীজীবনের বিভিন্ন পর্ব অবলম্বনে একাধিক অ্যালবাম প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে এই সমস্ত অ্যালবামে নন্দলালের ছবির প্রতিলিপি যাতে নিখুঁত হয় এবং সেজন্য প্রয়োজনবোধে তাঁর ছবি বাইরে পাঠিয়েও মুদ্রণ করিয়ে আনতে হবে (যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে করা হয়েছে)। এ ছাড়া দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ যাতে নন্দলালের মূল ছবির

সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন সেজন্য তাঁর ছবির প্রায়শই প্রদর্শনী হওয়া দরকার এবং এই সমস্ত প্রদর্শনী ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহরগুলি ঘুরে বেড়াবে। এই সব পরিকল্পনা সফল করতে গেলে নন্দলালের ছাত্র গুণগ্রাহী এবং সরকারের মধ্যে সহযোগিতা থাকা দরকার। আশা করি তাঁর একাশীতম জন্মদিবসের পূর্বেই তাঁর দেশবাসী তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবেন।

ইওরোপীয় রেণেসাঁর ঢেউ আমাদের দেশে পৌঁছেছিল ১৮শ শতকের শেষে। ১৯শ শতকে দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জোয়ার এল তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ। কিন্তু সংস্কৃতির একটি শাখা অবহেলিত রইল—সেটি শিল্প। অবনীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকা শুরু করেন তখন তিনিও ভারত-শিল্পের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। ভারত-শিল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে দৈবাৎ এবং সেই থেকে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন তাঁর নতুন শিল্প-সাধনায়। এই সাধনারই ফলস্বরূপ দেখা দিল আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা, বিদেশীরা যার নাম দিয়েছেন নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা।

এই নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার ভাগ্যে এককালে প্রশংসা ও নিন্দা দুই-ই জুটেছিল, এখন এর ভাগ্যে শুধু নিন্দাই জোটে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যার কয়েকটি সত্য এবং বেশির ভাগই মিথ্যা এবং রসের বিচারে অপ্রয়োজনীয়। বলা হয়েছে এই সব শিল্পীরা শুধু অতীতের দিকে তাকিয়েই ছবি এঁকেছেন, বর্তমান জগৎকে এঁরা উপেক্ষা করেছেন। এ অভিযোগ সত্য, অন্ততঃ বেশির ভাগের ক্ষেত্রে, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? শিল্পের বিষয়বস্তু দিয়ে শিল্পকর্মের মূল্য বিচার হয় না। অতীতের দিকে তাকিয়ে ছবি আঁকলেই যদি সে ছবি অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে তাহলে অজন্তা থেকে ইটালীয় রেণেসাঁর সব ছবিকেই ফেলে দিতে হয় আঁস্তাকুরে। জানিনা এমন প্রস্তাব কেউ করবেন কিনা। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এঁরা অতিমাত্রায় ভারতীয়ত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং তার জন্য এমন কতকগুলি বিশেষ ধরণ-ধারণ প্রবর্তন করেছিলেন (যেমন—পেলব হাত পা; নুয়ে পড়া ঘাড়, ধোঁয়াটে-ধোঁয়াটে ভাব ইত্যাদি) যা চক্ষুর পক্ষে রীতিমত পীড়াদায়ক। অভিযোগের প্রসঙ্গ অংশ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে স্বাদেশিকতা শিল্পের দোষ নয় গুণ, শিল্পের আবেদন সর্বজনীন হলেও তার ভাষা আন্তর্জাতিক নয়।

অভিযোগের দ্বিতীয় অংশ স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, অন্তত বেশির ভাগের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন এর জন্য দায়ী অবনীন্দ্রনাথ নন। এঁদের সর্বশেষ অভিযোগ অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের রেখা অত্যন্ত দুর্বল। এঁরা ড্রইং জানতেন না। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা—অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের প্রত্যেকেরই ড্রইং-এ ছিল অসাধারণ দক্ষতা।

তবু এই সব শিল্পান্দোলন খুব বেশি ফলপ্রসূ হয় নি তার কারণ অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে (কেবল নন্দলাল বাদে) প্রতিভার অভাব না থাকলেও কল্পনাশক্তির অভাব ছিল। এঁরা সবাই কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে থেমে গেছেন তারপর একই বিষয় ও একই ভাবের পুনরাবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন ফলে কিছুদিনের মধ্যেই এঁদের সৃষ্টির উৎস শুকিয়ে গেছে। এ ছাড়া এঁদের আবার যাঁরা শিষ্য তাঁদের অনেকেই সেরকম ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন না, ফলে অক্ষম অনুকরণের মধ্যেই এঁরা খুঁজেছেন নিজেদের সার্থকতা। এই সব অক্ষম অনুকারকদের ভীড়ে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিল্পসৃষ্টি কিছুদিনের মধ্যেই হারিয়ে গেল। নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা বলতে এখনকার লোকেরা এঁদের চিত্রকলাই বোঝেন।

এই গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া দুটি মাত্র শিল্পী বেরিয়ে এসেছিলেন—এঁরা হলেন গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল। গগনেন্দ্রনাথ যদিও প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন নব শিল্পান্দোলনের সঙ্গে তথাপি তাঁর নিজের সাধনা-পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তাঁর অনুগামী বা শিষ্য বলে কেউ ছিল না। নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেও কোনদিন গুরুর পথে পা বাড়ান নি, অবনীন্দ্রনাথও চান নি নিজের ধরনধারন জোর করে শিষ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। অবনীন্দ্রনাথের সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল যাতে শিষ্যর নিজস্ব প্রতিভার উন্মেষে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। সেইজন্য নন্দলাল নিজেকে বলেছেন অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।

অনেকেরই ধারণা অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। এ ধারণা ভুল। ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল চিত্রকলা—যার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল অজন্তার দেওয়াল চিত্রে—সে সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি নিজে কোনোদিন অজন্তায় যান নি। তাঁর ঝোঁক ছিল বরং মধ্যযুগীয় ক্ষুদ্রাকৃতি (মিনিয়েচর) চিত্রকলার প্রতি

মোগল চিত্রকলার অলঙ্করণ, রঙের মীড় এবং সূক্ষ্ম রেখা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু মোগল ছবির বিষয়বৈচিত্র্যহীনতা তাঁর ভালো লাগে নি। তাঁর মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মোগল চিত্রকরদের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি ছবিতে চাইতেন গল্প, নাটকীয়তা, কৌতুক রস ও গীতিময়তা। এই সবের মিলন ঘটেছিল তাঁর ছবিতে এবং সেজন্য তিনি ভিন্ন টেকনিক (তাঁর নিজস্ব 'ওয়াশ') উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর ছবিতে কেউ যদি গভীর ভাব খুঁজতে যান তাহলে বিফল হবেন কিন্তু তাই বলে তাঁর ছবি চটুল নয়।

পক্ষান্তরে মধ্যযুগের ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলা নন্দলালের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারে নি। ১৯১০ সালে লেডী হেরিংহ্যামের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তিনি যখন জনকয়েক সতীর্থের সঙ্গে অজন্তায় গিয়েছিলেন সেখানকার ছবি কপি করবার জন্য, তখন ভারতের ধ্রুব রীতির চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছিল। অজন্তা চিত্রের দ্রুত সাবলীল রেখা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এক নম্বর গুহার আত্মসমাহিত বোধিসত্ত্বের রূপ তাঁকে অভিভূত করেছিল। অজন্তা থেকে ফিরে আসার পর তাঁর উপরে এই অজন্তার চিত্রকলার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। আধুনিক ভারতে তিনিই একমাত্র শিল্পী যাঁর তুলিতে অজন্তা ছবির সাবলীল ছন্দময় রেখা ধরা দিয়েছে এবং সেদিক দিয়ে তাঁকেই ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল চিত্রকলার উত্তরসাধক বলা যেতে পারে।

এ ছাড়া পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকায় তিনি যতখানি সার্থকতা অর্জন করেছেন এ রকম সাম্প্রতিককালে আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য লক্ষণীয়। অবনীন্দ্রনাথ দেব-দেবীর ছবি বড় আঁকেন নি তার কারণ তাঁর মেজাজের সঙ্গে এসব বিষয় খাপ খেত না। যে দু-এক ক্ষেত্রে এঁকেছেন সে সব ক্ষেত্রে ঘরের মানুষের মতো করেই এঁকেছেন (তাঁর উমার ছবি স্মরণীয়)। অপর পক্ষে নন্দলাল আজীবন গভীর অধ্যাত্মবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। সাধারণ হিন্দু ঘরের ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কার সব কিছুই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। হিন্দু ধর্মের দেব-দেবী, রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র সব কিছুই তাঁর কাছে বাস্তবের মতো প্রত্যক্ষ। শুধু বিশ্বাস বা সংস্কার নয় এদের মহিমা তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন এবং সেই অনুভূতিই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর

ছবিতে। এদিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর শৈব-চিত্রগুলি। প্রাচীন ভারতে শিব ও উমার কল্পনা এক সময় শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার জন্ম দিয়েছিল যার উদাহরণ মিলবে ইলোরা ও এলিফ্যাণ্টার ভাস্কর্যে এবং পরে দাক্ষিণ ভারতীয় ব্রোঞ্জে। মধ্যযুগে শিব ও উমা তাঁদের মহিমা হারিয়ে ফেলে সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন এবং রাজপুত ও পাহাড়ী শিল্পীরা তাঁদের সেই ভাবেই চিত্রিত করেছিলেন। এই শিব ও উমারই সাক্ষাৎ মিলবে আমাদের ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে। নন্দলাল শিব ও উমাকে আবার দেবত্বে উন্নীত করলেন, তাঁদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর শিবের তাণ্ডবনৃত্য, বিষপানরত শিব, সতীদেহ স্কন্ধে শিব, হিমালয়ে শিব, শিবের মুখ প্রভৃতি ছবিতে শিবের যে নিরাসক্ত ধ্যানমগ্নরূপ ধরা পড়েছে তা প্রাচীন শৈব কল্পনারই নতুন প্রকাশ। তাঁর উমার ছবিগুলির মধ্যে প্রত্যাখ্যাত উমা, উমার তপস্যা প্রভৃতি ছবি ঐ একই আদর্শের বাহক।

শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে (১৯২৩) নন্দলালের শিল্পী জীবনের এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এতদিন শুধু পৌরাণিক বিষয় নিয়েই ছবি আঁকতেন (এর একদম ব্যতিক্রম ছিল না যে তা নয়) এবার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা অবলম্বনে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। এদিক দিয়েও তিনি পথিকৃৎ। তাঁর আগে বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগ ছিল না। তিনিই সবপ্রথম সমাজের উপরতলা ছেড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেমে এলেন। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি ধরা পড়েছে তাঁর তুলিতে। মা তার ছেলেকে কোলে করে নাচাচ্ছে; ছেলেরা কানামাছি খেলছে; গোপিনী তার দুধের ভাঁড় মাথায় করে নিয়ে লোকালয়ে বেচতে চলেছে; চাষী মাঠে লাঙ্গল চষছে; জেলে জাল বেঁধে নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছে; বাড়ির মেয়েরা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে; রাখাল ছেলে মোষের পিঠে চেপে বিকেলবেলা ঘরে ফিরছে; বুড়ো স্যাকরা নাকের ডগায় চশমা নামিয়ে ঠুকঠাক করে গয়না গড়ছে; কামার হাপর টানছে; বাউল একতারা হাতে করে নাচছে; মেলা থেকে লোকেরা ঘরে ফিরছে—এ রকম অসংখ্য পরিচিত দৃশ্য। বিশেষ করে সাঁওতাল জীবনের আনন্দ উৎসব বিবাদ তাঁর তুলিতে যে ভাবে ধরা পড়েছে তার তুলনা মেলে না। সাঁওতালদের বিয়ের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে; বর কনেকে ঘাড়ে করে বাড়ি ফিরছে; সন্ধ্যেবেলা মাঠের কাজ শেষ করে সাঁওতাল মেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজে গান গাইছে

গাইতে ঘরে ফিরছে ; চৈত্র সন্ধ্যায় একটি সাঁওতাল পুরুষ ঢোলক বাজাচ্ছে ও তার সঙ্গে তালে তালে কোমর জড়াজড়ি করে নাচছে তিনটি সাঁওতাল মেয়ে ; বর্ষা সমাগমে একটি সাঁওতাল পরিবার ছুটে চলেছে বোলপুর স্টেশনের দিকে এবার তাদের কাজের সন্ধানে বাইরে বেরোতে হবে ; বহুদিন পরে ঘরে ফিরেছে সাঁওতাল পুরুষ, তার ঘরণী দুয়ারে দাঁড়িয়ে স্মিত হাস্যে তাকে অভ্যর্থনা করছে —এরকম অনেক ছোট ছোট ঘটনা তাঁর হাতে পড়ে অবিস্মরণীয় হয়ে গেছে। শুধু মানুষ নয় পশু-পাখিও তাঁর স্নেহ দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় নি। অনেকেরই ধারণা নন্দলালের দেব-দেবী বা পৌরাণিক বিষয়ের ছবি থেকে এ ছবিগুলি নিকৃষ্ট তার কারণ এগুলির উপকরণ স্থূল পার্থিব জীবন থেকে আহৃত। কিন্তু এ এক ধরনের গোঁড়ামী ছাড়া আর কিছু নয়। নন্দলাল নিজেই বলেছেন "এককালে দেব-দেবীর ছবিই বেশি এঁকেছি কিন্তু এখন সব কিছুই আঁকি, তার কারণ এখন সব কিছুর মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি।" আসল কথা যে কল্পনাশক্তি থাকলে অতি তুচ্ছ বস্তুকেও অসাধারণে উন্নীত করা যায় সে কল্পনাশক্তি সবার থাকে না। নন্দলাল সেই বিরল কল্পনাশক্তির অধিকারী।

নন্দলালের বহুমুখী প্রতিভার এক বিস্ময়কর নিদর্শন তাঁর নিসর্গ চিত্রগুলি। এ বিষয়ে তিনি পথিকৃৎ না হলেও (তাঁর আগে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ নিসর্গ চিত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন) তাঁর নিসর্গচিত্রগুলি এক স্বাতন্ত্র্যের ছাপ বহন করে। নন্দলাল প্রকৃতির মধ্যে এক প্রচণ্ড প্রাণস্পন্দন অনুভব করেছেন। বোলপুরের রুক্ষ প্রান্তর থেকে শুরু করে দার্জিলিঙে মেঘের খেলায়, তাগদার পাইন বনে, গোয়ালপাড়ার উত্তাল সমুদ্রে সর্বত্র তিনি এই প্রাণশক্তিরই বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নিজের প্রাণের সঙ্গে তার সাযুজ্য অনুভব করেছেন বলেই মায়াবতীর পথে এক বিপুল পাইন বৃক্ষকে একজন মানুষের সামান্য একটু অসতর্কতার জন্য পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখে তাঁর অন্তর ব্যথায় মুচড়ে উঠেছিল। নন্দলাল প্রকৃতিকে দেখেছেন দূর থেকে নয়, কাছ থেকে, নিজেকে তার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে। এই জন্যই প্রকৃতির রহস্যগুলি উন্মোচন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে নন্দলাল নিজেকে কখনও জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। যখনই তাঁর ডাক এসেছে তখনই তিনি

সে ডাকে সাড়া দিয়েছেন। একজন শিল্পী জাতীয় আন্দোলনকে যতখানি প্রেরণা যোগাতে পারে তিনি ততখানিই জুগিয়েছেন। জেলে রাজবন্দীদের মধ্যে তিনি পোস্টার বিতরণ করেছেন নিজে হাতে এঁকে। ১৯৩০ সালে লবন সত্যাগ্রহের পটভূমিকায় এঁকেছেন তাঁর বিখ্যাত ছবি গান্ধীজীর 'ডাণ্ডী মার্চ'। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা গান্ধীজীর চোখেমুখে দেহের প্রতিটি পেশীতে পরিস্ফুট, তাঁর হস্তধৃত লাঠিটির মতোই তাঁর দেহ ঋজু, শুধু চিন্তাভারাক্রান্ত মুখ ঈষৎ আনত—তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেশের সর্ব স্তরের মানুষ। একটা জাতির অনমনীয় মনোভাবকে এমনভাবে রূপ দিতে আর কেউ পারেন নি। নন্দলালের উপর ছিল গান্ধীজীর গভীর শ্রদ্ধা তাই একাধিকবার কংগ্রেস প্যাণ্ডাল সজ্জিত করার জন্য তাঁর ডাক পড়েছে। শেষবার যখন তিনি হরিপুরায় কংগ্রেস প্যাণ্ডাল সজ্জিত করেন তখন মণ্ডপের চারিধার অলঙ্কৃত করেছিলেন ভারতীয় জনজীবন অবলম্বনে আঁকা অসংখ্য পটে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবন এতে ধরা পড়েছে। ছুতোর, কামার, কাঠুরে, শাঁখারী, ঢোলক বাদক, লাঠিয়াল, কুস্তীগির কেউই বাদ যায় নি। ভারতীয় জন-জীবনের সঙ্গে এই নিবিড় সংযোগ তাঁকে ভারতবর্ষে যথার্থ জাতীয় শিল্পীতে পরিণত করেছে।

প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় দেওয়াল চিত্রের পুনঃপ্রবর্তন আধুনিককালে নন্দলালই সর্ব পথম করেন। শান্তিনিকেতনে চীনা-ভবনের গায়ে, পাঠ-ভবনের বারান্দায় এবং বরোদায় কীর্তি-মন্দিরের গায়ে তিনি যে দেওয়াল চিত্র এঁকেছেন তা তাঁর প্রতিভা বৈচিত্র্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আগেই বলেছি মধ্যযুগের ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলা নন্দলালকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাঁর প্রতিভা মিনিয়েচার ছবির চাইতে দেওয়াল চিত্রের পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। দেওয়াল চিত্রের সঙ্গে মিনিয়েচার ছবির পার্থক্য শুধু এই নয় যে একটি আকারে বড় ও অপরটি ছোট—একটির মধ্যে ক্রমানুস্যূতি (continuity) ও বেগ বর্তমান, অপরটি আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। নন্দলালের বহু একক ছবির মধ্যে (প্রত্যাখ্যাত উমা, নটীর পূজা, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান ইত্যাদি) দেওয়াল চিত্রের এই গুণগুলি বর্তমান সেজন্য অনেকে মনে করেন নন্দলালের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে দেওয়াল চিত্রে অথবা দেওয়াল চিত্র-ধর্মী চিত্রে। এরকম মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই তার কারণ দেওয়াল চিত্রের গুণ নেই অথচ মিনিয়েচার ছবি নয় এমন

অনেক ছবি নন্দলাল এঁকেছেন যা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। আসল কথা নন্দলালের প্রতিভা একমুখী নয় বহুমুখী।

নন্দলালের বিপুল সৃষ্টি-সম্ভারের মধ্যে কোথাও পুনরাবৃত্তির ছাপ নেই। একই বিষয় নিয়ে হয়তো একাধিকবার এঁকেছেন কিন্তু প্রতিবারেই নতুন সৃষ্টি হয়েছে (যেমন তাঁর শবী প্রতীক্ষা)। অফুরন্ত কল্পনাশক্তি এবং অন্বেষণ প্রবৃত্তি তাঁকে এক জায়গায় কোনোদিন স্থির হতে দেয় নি। ছবির উপকরণ ও টেকনিক নিয়ে তিনি নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর আজও শেষ হয় নি। ছবির আশ্রয় হিসাবে কখনও ব্যবহার করেছেন কাগজ, কখনও সিল্ক, কখনও পাটা, কখনও দেওয়াল আবার কখনও বা তামার পাত (তাঁর তামার পাতের উপর তীক্ষ্ণাগ্র নরুণ দিয়ে আঁকা অজ্ঞাতবাসে অর্জুনের ছবিখানি স্মরণীয়)। আধুনিক কালে পট নিয়ে তিনিই প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এ ছাড়া ছবির রঙের নির্বাচন এবং টেকনিক নিয়েও বহু পরীক্ষা করেছেন তিনি। তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলির বেশির ভাগই 'ওয়াশে' আঁকা কিন্তু শেষের দিকে টেম্পরাকেই তিনি তাঁর প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। এর কারণ আছে। তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলি সাধারণত ফ্ল্যাট এবং এগুলির প্রাণরেখা যা ওয়াশে খুলতে কোনো বাধা নেই কিন্তু শেষের দিকের ছবিগুলি প্রধানত ছোপে আঁকা এবং এগুলির মধ্যে গভীরতার ইঙ্গিত আছে। টেম্পরায় যেমন গভীরতার ইঙ্গিত দেওয়া যায় ওয়াশে সেরকম দেওয়া যায় না। নন্দলাল অবশ্য রেখাভিত্তিক ছবি কোনোকালেই একেবারে বর্জন করেন নি যার প্রমাণ তাঁর 'দুর্গা' অথবা 'বিরহিনী রাধিকা'। এ ছাড়া শুধু মাত্র কালি তুলির ছোপে নন্দলাল বহু বিস্ময়কর ছবি এঁকেছেন, তার তুলনা মেলা ভার। এগুলি তাঁর শিল্প প্রতিভার আর এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

নন্দলাল আধুনিক কিনা এ বিষয়ে অনেকে তর্ক তুলেছেন। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন তাঁরাই যাঁরা তথাকথিত আধুনিকতার উগ্র সমর্থক। আধুনিকতার অর্থ যদি উৎকেন্দ্রিকতা হয় তাহলে নন্দলাল অবশ্য আধুনিক নন কিন্তু আধুনিকতার লক্ষণ যদি হয় 'নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা' তাহলে নন্দলাল অবশ্যই আধুনিক। আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যে এবং তার দেখাদেখি আমাদের দেশে শিল্পের জগতে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে

নন্দলাল মুক্ত কণ্ঠে তার নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন প্রাচ্য শিল্পীর আদর্শ এ নয়। প্রাচ্য শিল্প কোনোদিনই প্রকৃতির দাসত্ব করে নি কাজেই প্রকৃতির শৃঙ্খল কেটে বেরিয়ে আসার তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আসলে আধুনিকতা হচ্ছে একটা ফ্যাশান এবং এই ফ্যাশান শুধু যে শিল্পী-যশোপ্রার্থী অক্ষম তরুণদেরই আকৃষ্ট করেছে তা নয় অনেক স্থিতধী শিল্পীরও পদস্খলন ঘটিয়েছে। সুলভ বাহবা এবং নগদ পুরস্কারের লোভে এঁদের অনেকেই তাঁদের দীর্ঘদিনের সাধনা বিসর্জন দিয়ে 'আধুনিক' হয়ে গেছেন। এইসব বিপথগামী প্রতিভাদের মধ্যে নন্দলালের সতীর্থ ও শিষ্যও কেউ কেউ আছেন। এই 'আধুনিকতা'র ঢেউ নন্দলালকে যে স্পর্শ করতে পারেনি তার কারণ তাঁর স্ব-ধর্মে অর্থাৎ কিনা শিল্প-ধর্মে অবিচল নিষ্ঠা। নিন্দা প্রশংসার প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে এই মহৎ শিল্পী চিরদিন নিজের সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই ডুবে আছেন।

স্থনীল সেন

জন স্ট্রাচি প্রসঙ্গে

জন ষ্ট্রাচি সম্পর্কে বড় কথা, তিনি কর্মে ও কথায় সমাজ-তান্ত্রিক। বিশ্বাসহীনতার এই যুগে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর গভীর বিশ্বাস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। জগৎজোড়া পরিবর্তনের মুখে ধনতন্ত্রবাদের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথের সন্ধানে তাঁর গবেষণা বহুদূর প্রসারিত। এই গবেষণার ফল গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। অধুনা এই মতবাদের নতুন শিষ্য দেশে-বিদেশে দুর্লভ নয়। মার্কসবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পার্থক্য কোনো কোনো বিষয়ে মৌলিক ; মার্কস ও লেনিনের কয়েকটি মত তার কাছে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রাহ্য, কিন্তু মার্কসীয় পদ্ধতি অনুসরণে তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহজেই চোখে পড়ে। মার্কস ও লেনিনের তত্ত্ব বুঝবারও বোঝাবার যে চেষ্টা তিনি করেছেন, নিষ্ঠাহীনতার এই যুগে তা আদৌ স্থলভ নয়।

উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে ষ্ট্রাচির জন্ম। ভারতের সঙ্গে ষ্ট্রাচি-পরিবারের সম্পর্ক পুরনো। প্রসিদ্ধ "ষ্ট্রাচি ভ্রাতৃদ্বয়"-এর কথা অনেকের মনে পড়বে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের অনেক বুদ্ধিজীবীর মত তিনি মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হন এবং সহজেই কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। 'ক্ষমতার আসন্ন সংগ্রাম' (The Coming Struggle for Power) তাঁর এই সময়কার রচনা। উনত্রিশের মহাসঙ্কটে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে। ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠেছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ আসন্ন। এই পটভূমিতে এসেছিল 'আসন্ন সংগ্রাম'-এর ডাক। হার্ভাডে বসে যুবক গলব্রেথ সে ডাক শুনেছিলেন। তাঁর মতে, এই শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী বইগুলির অন্যতম 'ক্ষমতার আসন্ন সংগ্রাম'। আমেরিকায় এই বই প্রায় লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল। ভারতের মার্কসবাদী মহলেও এই বই স্থপরিচিত। ষ্ট্রাচি তখন ষোল আনা কমিউনিস্ট। কয়েক বৎসর পরে তিনি তাঁর মতবাদ পরিবর্তন করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ লেবর পার্টির একজন নেতা

হিসাবে আমরা তাঁকে দেখি; কিছুকাল তিনি লেবর মন্ত্রিসভার সভ্য হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ধনতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর গবেষণার ফল 'সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদ' (Contemporary Capitalism, 1957)। আমেরিকার "নিউ ডিল", রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা, জনকল্যাণ-রাষ্ট্রের রূপ, সর্বজনীন ভোটাধিকার, ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপকতা, শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান চেতনা ও শক্তি, স্ট্রাচির চিন্তাধারাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। অনেকে বলেন, তিনি কেইন্‌সের মতবাদে বিশ্বাসী। ইচ্ছামতো "কেইনসীয় তত্ত্বের" লেবেল এঁটে অনেক তত্ত্বের বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ। স্ট্রাচি তাঁর লেখায় কেইন্‌স-এর যে সমালোচনা করেছেন, তা উক্ত তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ সমালোচনাগুলির পর্যায়ে পড়ে। স্ট্রাচির অভিযোগ, কেইন্‌স মার্কস পড়েন নি। স্ট্রাচিকে কেইন্‌স-পন্থী বললে তাঁর উপর অবিচার করা হয়। 'সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদ'-এ স্ট্রাচি যে তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন, তার সমালোচনা আরো ধৈর্য, নিষ্ঠা ও গবেষণার দাবি করে। পুরনো ছকে সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যা অধুনা অচল। সংকট প্রতিরোধে রাষ্ট্রের ভূমিকা ("anti-crisis measures") এবং অস্থায়ী সাফল্য মার্কসবাদী মহলে বর্তমানে স্বীকৃত। মার্কসবাদ বাস্তবকে মেনে নেয়। আজকাল Government spending যে বহুল আলোচিত তা অস্বাভাবিক নয়। তবু মনে হয় স্ট্রাচি রাষ্ট্রযন্ত্রে, সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিসনে একচেটিয়া গোষ্ঠীর বিপুল এবং ভয়ঙ্কর প্রভাবকে খাটো করে দেখেছেন। দুই দশক আগে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রামের যিনি ডাক দিয়েছিলেন, 'সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদ'-এ তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। স্ট্রাচি বুদ্ধিজীবী, নতুন তাঁকে সর্বদা আকর্ষণ করে। নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় বুদ্ধিজীবী অনেক সময় পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলেন। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা কিছুটা প্রতিষেধকের কাজ বোধহয় করতে পারে।

স্ট্রাচি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় নিয়েছেন। 'সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদ' প্রকাশিত হবার দু বছর পরে আমরা পেলাম 'সাম্রাজ্যের শেষ' (The End of Empire, 1959)। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিকাশ, বিস্তার ও অবসান এই বইএর প্রধান আলোচ্য বিষয়। বইএর অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে ভারতের কথা। ১৯৫৬ সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন; ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল

ইনষ্টিটিউটে তখন গলব্রেথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দুজনে কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারত পরিক্রমা করেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি ভারত ও পাকিস্তান সফর করে যান।

ষ্ট্রাচির সব লেখাই সুখপাঠ্য, কিন্তু পেশাদারী ঐতিহাসিক না হয়েও ইতিহাস লিখতে তিনি কত দক্ষ তার পরিচয় দেয় এই বই। ইতিহাস লিখবার এই নতুন ঢং, অর্থনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিতে রাজনৈতিক ইতিহাস বোঝাবার চেষ্টা, পাঠককে আকৃষ্ট করে। যে পদ্ধতিতে ষ্ট্রাচি অর্থনৈতিক তথ্য এবং সেই সঙ্গে Orme, Cromer, Milner Papers-এর তথ্য ব্যবহার করেছেন তা অভিনব। মনে হয় সুগঠিত দৃষ্টিভঙ্গি থাকবার ফলেই ষ্ট্রাচির এই পদ্ধতির অনুসরণ সার্থক। দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা অনেক সময় বন্ধ্যা হয়ে যায়।

'সাম্রাজ্যের শেষ' শিরোনামা অনেকের পছন্দ না হতে পারে। আমার মতে ষ্ট্রাচির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং ইতিহাসে বিশ্বাস সমগ্র বইতে স্পষ্ট প্রতিভাত। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের "পুনরুজ্জীবনশীল ভূমিকার" কথা তিনি অবশ্যই বলেছেন, এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর আশ্রয় মার্কসের প্রসিদ্ধ উক্তি। ব্রিটিশ শাসনের "ধ্বংসাত্মক ভূমিকা"—ক্লাইভের প্রবর্তিত "দস্যু রাষ্ট্র", "ড্রেইন", ভারতবাসীর দারিদ্র্য, শাসকশ্রেণীর "লাস্সা ফেয়ার" নীতির অনুসরণ, ভারত-শোষণের ফলে মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ "পরিবারের" (জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১০ ভাগ) ধনদৌলত বৃদ্ধি তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসনের দ্বৈত ভূমিকা ছিল। বর্তমান যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত। তিনি মনে করেন না, ভারত, ব্রহ্ম, সিংহলের "আজাদী ঝুঠা"; ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে ঐ সব দেশ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছে। উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা একালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অন্যতম। ব্রিটেনের পক্ষে ঔপনিবেশিক শাসন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার তিনি বিরোধী। ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখা বর্তমানে "অলাভজনক"; "তেল সম্পদের লাভ" (oil profits) হারালেও ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের মান নিম্নগামী হবার আশঙ্কা অমূলক, কেননা উপনিবেশে প্রতিরক্ষা খাতে ব্রিটেনকে বছরে যে টাকা খরচ করতে হচ্ছে, তার পরিমাণ কম নয়। ইউনিয়ন জ্যাক গুটিয়ে ফেলতে উচ্চ মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর, এমন কি শ্রমিক শ্রেণীর বক্ষ বিদীর্ণ হতে পারে, কিন্তু ঐ পতাকা উড্ডীন করবার পরিণতি 'সুয়েজ-এর' ঘটনা। সুয়েজ সম্ভাব্য ভবিষ্যতের নিশানা। সাম্রাজ্যের পর্ব শেষ—এই বাস্তবের মোকাবিলা ব্রিটিশ শ্রমিক-শ্রেণীকে করতে হবে, যদিও এর জন্য মানসিক প্রস্তুতি বেদনাদায়ক।

ইতিহাসে স্ট্রাচির আস্থা গভীর। মার্কসের প্রসিদ্ধ উক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন: "মানুষ নিজের ইতিহাস নিজেই গড়ে।" ইতিহাস পড়া পণ্ডশ্রম, ইতিহাস থেকে আমরা এই শিখি যে ইতিহাস থেকে কিছু শেখা যায় না—কার্ল পপার এবং তাঁর অনুগামী ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের এই ধরনের বক্তব্যের উদ্দেশে স্ট্রাচি বলেন: বেশ কথা, এদের বই আমরা বন্ধ করব, এবং কখনই আর সেগুলো খুলব না। খোলা মন নিয়ে স্ট্রাচি ইতিহাস পড়েছেন এবং বার বার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় নিয়েছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটতে তিনি নারাজ।

স্ট্রাচির লেখার কেন্দ্রীয় বক্তব্য কি? "কমিউনিস্ট" স্ট্রাচির কেন্দ্রীয় বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যায়: রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের "আসন্ন সংগ্রামে" শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি ও ভবিষ্যৎ। কিন্তু "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ" কি? কোন পথে এই লক্ষ্যে পৌছুনো যাবে? রাষ্ট্র ক্ষমতা কার হাতে থাকবে? যুগ পাল্টেছে এবং পাল্টাচ্ছে। সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদে পরিবর্তন ("mutation") এসেছে। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ভেঙ্গে পড়েছে। "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ" বোঝাতে গিয়ে এই বিষয়গুলি তিনি উত্থাপন করেছেন, কিন্তু মনে হয় তাঁর মনে জিজ্ঞাসা শেষ হয় নি। তিনি জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছিলেন।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ডাণ্ডি কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব তিনি করেছিলেন। তাঁর শূন্য আসনে ডাণ্ডির শ্রমিক শ্রেণী আবার লেবর পার্টির প্রার্থীকেই নির্বাচিত করেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সমাজতান্ত্রিকদের মনে ভরসা জোগাবে। জন স্ট্রাচি নিঃসন্দেহে একজন মহান সমাজতান্ত্রিক।

মতান্তর বনাম মনান্তর

আমারই দুর্ভাগ্য, অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়' কিছু বিলম্বে আমার হাতে আসে। ফলে, 'পরিচয়'-এর বিশেষ সমালোচনা সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৭০) প্রকাশিত আমার "উপন্যাস: ভাষা ও চিন্তা" নামক সমালোচনা-প্রবন্ধ প্রসঙ্গে অগ্রহায়ণের 'পরিচয়ে'র পাঠকগোষ্ঠী বিভাগে পত্রস্থ শ্রীঅনিরুদ্ধ রায়ের আলোচনা এ-যাবৎ আমার চোখে পড়েনি। ইতিমধ্যে পৌষের 'পরিচয়' বেরিয়েছে। পৌষের 'পরিচয়'-এও আমাকে নিরুত্তর দেখে অনিরুদ্ধবাবু কী না জানি ভাবছেন।

'পরিচয়' কর্তৃপক্ষকেও আমি কিছু পরিমাণ দায়ী করি। প্রকাশের পূর্বে অনিরুদ্ধবাবুর পত্রবিষয়ে আমাকে অবহিত করা তাঁদের উচিত হত মনে হয়। 'পাঠকগোষ্ঠী'র আলোচনায় এই এক অসুবিধা যে পাঠকের আলোচনা যখন প্রকাশিত হয় মূল রচনা ততদিনে সঙ্গত কারণেই সাধারণভাবে বিস্মৃত। সেক্ষেত্রে পাঠকের পত্র ও লেখকের উত্তরও যদি একই সঙ্গে প্রকাশের সুযোগ না থাকে তবে এ-জাতীয় আলোচনার সাধারণ আবেদন মূলতই ব্যর্থ হয়। তদুপরি, উভয় পক্ষেই কিছু ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ সর্বদাই থেকে যায়। এবং কখনো বা তার জের টেনে আপন যাথার্থ্য প্রমাণের আন্তরিক দুর্বলতায় 'পরিচয়'-এর আরো কিছু পৃষ্ঠা একই মতান্তরে আরো কিছুকাল ব্যয়িত হবার আশংকা বাড়ে বই কমে না। মতান্তর কখনো বা নিছকই মনান্তরের নামান্তর।

অবশ্য জগতের তাবৎ বিষয়ের ন্যায় 'পাঠক গোষ্ঠী'র আলোচনার উপরোক্ত অসুবিধাই আবার কখনো বা তার সুবিধারও কারণ বটে। মূল রচনা যেহেতু কিছু দুর্মরতার দাবী রাখে না (অন্তত আমার ক্ষেত্রে তো নয়ই), এবং আলোচনা প্রসঙ্গে মূল রচনার সম্পূর্ণ উদ্ধার যেহেতু অকল্পনীয় অবাস্তবতা, সেহেতু আলোচনাকারী পাঠকের পক্ষে মূল রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা ভিন্ন উপায় থাকে না। এবং কে না জানে যে উদ্ধৃতির স্বভাব জলবৎ

তরল, যে-পাত্রে রাখা যায় সে-পাত্রের আকার ধারণ করাই তার অনিবার্য ধর্ম। আলোচনার এই সুবিধা, দেখা যায়, অনিরুদ্ধবাবু ভালোভাবেই বোঝেন। তাই আমার রচনার ভিন্ন ভিন্ন অংশে উক্ত কিছু উদ্ধৃতির সাহায্যে আমার বক্তব্যের পরস্পর-বিরোধিতা প্রমাণে তাঁর যে অকৃত্রিম উৎসাহ, কিংবা যে-নৈয়ায়িক প্রেরণা বশে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবের ছিন্নভিন্ন গ্রন্থণায় তাঁর অনুপপত্তি সমূহ তিনি রচনা করেন, তার সমুচিত উত্তর বা যথাযোগ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এ-ক্ষেত্রে আমার পক্ষে সেই একই পুরাতন অসুবিধা যে আমার রচনার বিভিন্ন সামান্য প্রস্তাব ও প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তসমূহ পুনরায় উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হয়। অথচ একই কথা, অন্তত আংশিক ভাবেও, দু-বার লেখা নিতান্তই বিরক্তিকর। আমার বর্তমান পত্রের প্রত্যুত্তর দেবার প্রয়োজন হলে অনিরুদ্ধবাবু নিশ্চয় এ-কথা বুঝবেন।

ফলে, অনিরুদ্ধবাবু পত্রের বিস্তারিত আলোচনায় কোনো লাভ দেখি না। বিশেষত, সমালোচনা মুখ্যতই পরজীবী, পরোক্ষ রচনা। সমালোচনা লিখেও আমার বক্তব্য যদি প্রতিপন্ন না হয়ে থাকে, আলোচনাপত্রের উত্তর লিখেও যে তা সম্ভব হবে এমন আশা কম। উপরন্তু, আমার বক্তব্যের অসারতা প্রমাণে আমার দুর্বল যুক্তিজ্ঞান, ভ্রান্ত সমালোচনাবোধ, খণ্ডিত ঐতিহ্যচিন্তা এবং বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে যে অকপট বিস্ময়, সরল ও সাবলীল মন্তব্য এবং "অহো!", "বেচারি যুগান্তরবাবু!" ইত্যাদি মুখভঙ্গির শব্দরূপ অনিরুদ্ধবাবুর পত্রে অহরহ দেখা যায়, তার পর আমার পক্ষে আর কীইবা বলার থাকে। এত সব কিছুর পরও, অনিরুদ্ধবাবুর পত্রে উত্থাপিত বিষয়মুখ বনাম আত্মমুখ সমালোচনার আদর্শ, ঐতিহ্যবোধ বনাম অতীতপ্রীতি, কিংবা বিশুদ্ধতা বনাম জীবনচর্যার ন্যায় নানাবিধ সাধারণ প্রসঙ্গে যদি আমার বলার কিছু থাকেও (বলার যে কিছু থাকে সে-কথা সবিনয়েই বলা যায়), অনিরুদ্ধবাবু তা শুনবেনই বা কেন। এবং এত সবকিছুর পরও আমার রচনার কোনো কোনো অংশ সম্পর্কে অন্তত কিছু ছদ্মবেশী প্রশস্তিও যে অনিরুদ্ধবাবু করেন সে তো অনিরুদ্ধবাবুরই অনিবার্য গুণ। এই ছদ্মবেশী প্রশস্তি আক্ষরিক অর্থে মেনে নিতে পারলেই আমার পক্ষে আপাতত তবু কিছু মুখরক্ষার সুযোগ থাকে। কাজেই অনিরুদ্ধবাবুর পত্রের উত্তরে তাঁর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণে উপরোক্ত সরল মন্তব্যের

অনুরূপ কিছু-কিছু তাঁকেই ফিরিয়ে দেওয়া যেমন অর্থহীন, অনিরুদ্ধবাবুর বক্তব্য ও যুক্তিজ্ঞান সম্পর্কে ভাবগম্ভীর, সুচিন্তিত ইত্যাকার পিঠচাপড়ানির ছলনাও তেমনি অবান্তর।

কিছু প্রশ্ন কিন্তু তথাপি থেকে যায়। আমার সমালোচনা-প্রবন্ধের প্রথমার্ধের আলোচ্য ছিল শ্রীকমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা'। 'অন্তর্জলীর যাত্রা'র আপেক্ষিক সিদ্ধি সম্পর্কে কিন্তু দেখা যায় আমরা উভয়েই শেষাবধি একমত। আলোচনার পথে, যদিও অনিরুদ্ধবাবুর ধারণা অনুযায়ী আমার সূচণার বিষয়মুখ প্রস্তাব পরিণামে স্বেচ্ছাচারী, এবং আমার অজ্ঞতাবশতই যদিও অনিরুদ্ধবাবু কথিত "ব্যঞ্জনা", "প্রসাদ", "শিল্পগুণ" ইত্যাদির চরম অবজেক্‌টিভ টেস্ট আমার অজানাই থেকে যায়, তথাপি কিন্তু এ অলৌকিক ঐক্য ঘটে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আমরা উভয়েই একই সিদ্ধান্তে পৌছাই। তবে কি বুঝব, 'পরিচয়'এর সাড়ে সাত পৃষ্ঠাব্যাপী বদান্যতার সুযোগ নিয়ে অনিরুদ্ধবাবুর সমস্ত চিন্তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে আমার অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যই ব্যয়িত হয়? কিন্তু তাতে কি লাভ, আমি বা অনিরুদ্ধ বাবু কেউই তো আপাতত আলোচ্য নই। এবং এই ক্ষুৎকাতর আক্রমণের পরও আমার লেখা পড়েই বা কী ভাবে "অ্যাংরি-হাংরিআলিস্ট" প্রসঙ্গটি অনিরুদ্ধবাবুর মনে আসে বোঝা কঠিন। লেখার পর নিজের চিঠিটি কি অনিরুদ্ধবাবু একবারও পড়ে দেখেন্ নি?

যুগান্তর চক্রবর্তী

অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'ভারতের আবদ্ধ আর্থনীতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে' (প্রিয়তোষ মৈত্রেয়ের) প্রবন্ধটি বিশেষ কৌতুহল উদ্রেক করেছে। বিশেষত এই ধরনের প্রবন্ধ অন্ধতা দূর করে এবং আত্মসমীক্ষার পথ খুলে দেয়। শহরের মানুষের মনের থেকে আড়াল সরিয়ে দিয়ে গ্রামের প্রতি অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিশীল করে তোলে।

পৌষ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত সৈকত মণ্ডলের চিঠিটিও একসঙ্গে বিশেষ ভাবনার অবদান যুগিয়েছে। কারণ আমরা শহরের মানুষ গ্রামের কথা সত্যিই তো চিন্তা করি না, এবং মনে করি এইটুকু দেশ। এই জড়তা

থেকে আমাদের মুক্ত হওয়ার সময় এসেছে, মুক্তবুদ্ধির প্রয়োজন আজ সর্বাধিক।

'পরিচয়'-এ আপনারা শিক্ষিত মানুষের কাছে এভাবে দেশের কথাটি তুলে ধরতে থাকুন।

সন্ধ্যা সেন

আমি 'পরিচয়' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ও শুভাকাঙ্খী। পত্রিকায় নিয়মিত বিদেশী গল্পের অনুবাদ পাঠ করতে চাই। কারণ এই দিকটা এখনও প্রায়-উপেক্ষিত। যদিও সাহিত্যরসিকদের কাছে এবং সাধারণ পাঠকদের কাছেও এর বিশেষ চাহিদা বর্তমান। আধুনিক ছোটগল্পের ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী যে নবজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে, নতুন নতুন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তা আমাদের দেশের ইংরাজি অনভিজ্ঞরা (বেশির ভাগ পাঠকই) কি করে অনুসরণ করবে ?

আর, তাছাড়া 'পরিচয়' নামের তাৎপর্যও তো তাই সাহিত্যের বিভিন্ন ঘাটের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়ে দেওয়া।

জনৈক পাঠক

"নিগ্রো সমানাধিকারবাদীর গান" প্রসঙ্গে

"পীট সীগরের গলায় নিগ্রো সমানাধিকারবাদীর গান" প্রসঙ্গে আরও দু-একটি তথ্য নিবেদনের জন্য এই চিঠি। গানটির মূল ও অনুবাদ 'পরিচয়'-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর এই গানের দু-একটি ক্ষেত্রে পাঠান্তরের বিষয়টি আমি জানতে পারি। আমাদের দু-একজন বন্ধুও এ সম্পর্কে আমাকে জানান।

গানটির যে সাম্প্রতিকতম চেহারা আমরা পেয়েছি তা প্রথমে ছিল একটি নিগ্রো ধর্মসঙ্গীত। সেটির শুরু ছিল "I will overcome"—এইভাবে। তারই পরিবর্তিত রূপ "We shall overcome someday" আমেরিকার

নিগ্রোমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়ে যায়। আদিতে এই প্রাচীন গানটির বাণীতে বলে :

"আমি রইব ঠিক
রইব অনুরূপ তাঁর
ধরব মাথায় মুকুট
আমি করব জয়,…" ইত্যাদি

এই গানেরই পরিবর্তিত রূপ গত চতুর্থ দশকে আমেরিকার সুতাকল আর বাগিচা শ্রমিকদের খুবই প্রিয় হয়ে ওঠে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে তারই আবার পুনর্বিন্যস্ত বর্তমান আকারের গানটিই নিগ্রো মুক্তি অভিযাত্রীর গান।

পীট সীগরের সঙ্গীতানুষ্ঠানের টেপ-রেকর্ড আরও মিলিয়ে শুনে এই গানের একেবারে শেষাংশে "We shall end in peace, we shall end in peace"—এই পাঠান্তরটুকুও লক্ষ্য করলাম। সেজন্য আগের প্রকাশিত গানটির অনুবাদের শেষে এই পঙ্‌ক্তিটি :

"আমরা ফিরব শান্তিতে, শান্তিতে…
আমরা করব জয় সে-একদিন"

এই ভাবে রাখার আমি পক্ষপাতী।

সিদ্ধেশ্বর সেন

শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তীর চিঠি প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলা দরকার। কোনো লেখা প্রসঙ্গে প্রাপ্ত চিঠি মূল লেখককে পূর্বাহ্নে দেখালে সুবিধা হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সময়াভাবে তা সম্ভব হয় না—এবং দেখানটা, প্রসঙ্গত, বাধ্যতামূলকও নয়। শ্রীঅনিরুদ্ধ রায় যদি শ্রীচক্রবর্তী সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোনো অভিযোগ করতেন তাহলে প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই তাঁর বক্তব্য জেনে নেওয়া হত। কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে এবং এক বই সম্পর্কে দুজন সমালোচক কদাচিৎ একমত হন ধরে নিয়েই শ্রীরায়ের চিঠিটা আমরা পত্রস্থ করেছি শ্রীচক্রবর্তীকে না দেখিয়েই, যেমন শ্রীচক্রবর্তীর পত্রও প্রকাশ করা হল শ্রীরায়কে না দেখিয়েই। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই প্রত্যুত্তর প্রকাশে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাংবাদিকতার রীতি অনুসারে।

—সম্পাদক পরিচয়

ফরাসী মণ্ডন-শিল্প

কলকাতায় এবারকার চিত্র-প্রদর্শনীর মরশুমে চিত্ররসিকমহলে সবচেয়ে সাড়া জাগিয়েছে ফরাসী রাষ্ট্রদূতাবাসের সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্-এ অনুষ্ঠিত ফরাসী মণ্ডন-শিল্পের প্রদর্শনীটি। মোট ১৯২টি দ্রষ্টব্য নিয়ে এই প্রদর্শনী—যার সবগুলি দ্রষ্টব্য সামগ্রিক উপভোগের দিক থেকে তো বটেই, প্রায় প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য আলাদা ভাবেও দর্শকের চোখ আর মনকে অভিভূত করার মতো। বরং বলা যেতে পারে, এই প্রদর্শনীতে দর্শকের ইন্দ্রিয়ের পক্ষে একটু যেন অতিভোজনেরই আয়োজন ছিল, যে-কারণে বহু দর্শককেই একাধিকবার এই অতি-সমারোহময় শিল্প-সমাবেশে যেতে হয়েছে প্রতিবারে তার এক-একটি দিককে উপভোগ করার জন্যে: ট্যাপেস্ট্রি, স্টেন্‌ড্ গ্লাস, পুঁথি-চিত্র ও ইলাস্ট্রেশন, দেওয়ালে টাঙানোর মতো ছবি, ধাতু-কারুশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি। মণ্ডন-শিল্পের সমস্ত দিককেই এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে কত যত্নের সঙ্গে, দেশের এই সব সাংস্কৃতিক সম্পদগুলির প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে।

১৯২টি দ্রষ্টব্যের মধ্যে ৫৪টি ট্যাপেস্ট্রি: বিরাট আকারের কম্বলের ওপরে বোনা বিচিত্র সব বিষয়ের বর্ণসমারোহময় ছবি আর নক্শা—প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কালের লেজের, মাতিস, পিকাসো পর্যন্ত মহাশিল্পীদের আঁকা। প্রাচীন ট্যাপেস্ট্রিগুলির বিষয়বস্তু তৎকালীন মানুষের—প্রধানত যারা ছিল ট্যাপেস্ট্রি-শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক, বিপ্লবপূর্ব ফরাসী সমাজের সেই উচ্চকোটির নরনারীর মসৃণ ও অলস—দৈনন্দিন জীবনের নানা দিক, পুরাণকাহিনী ইত্যাদি। কিন্তু বুনোনের কারুকার্যে, চিত্রিত বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনায়, রঙের আশ্চর্য নিপুণতায় এইসব দেওয়াল-জোড়া বিপুল আকারের নক্শী-কম্বলগুলি ভিত্তিচিত্রকে আর পেন্টিংকেও যেন হার মানায়। ফরাসী বিপ্লবের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে গল্প বলার চেয়ে প্যাটার্ন সৃষ্টি করার দিকে, বর্ণবিন্যস্ত একটি ছককে প্রাধান্য দেবার দিকে শিল্পীদের বেশি নজর। যেমন, মার্ক সাঁ-সাঁয়েন্স-এর 'সূর্যের রথ' যাতে দেখি—ফরাসী বিপ্লবের পরে সর্বব্যাপী এক ব্যক্তিস্বাধীনতার খুব সচেতন উপলব্ধির ফলেই কিনা জানি না—ব্যক্তিগত স্টাইলের বিকাশ, প্রতীকের প্রাধান্য।

তারপরে বেশ কিছুকাল ধরে ফ্রান্সে—তথা ইওরোপে—ট্যাপেষ্ট্রি শিল্পের চর্চা প্রায় বন্ধ হয়েছিল প্রধানত ধনী পৃষ্ঠপোষকের অভাবে। আধুনিক কালে আবার ফ্রান্সে নকশী-কম্বল শিল্পের বিপুল প্রাণপরিপূর্ণতায় পুনরভ্যুদয় ঘটেছে এবং শ্রেষ্ঠ ফরাসী চিত্রকরদের মধ্যে অনেকেই কম্বলের ওপরে বুনে তোলার জন্যে ছবি আঁকায় উৎসাহিত হন। এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল পিকাসোর রেখা-নির্ভর 'দুই ক্লাউন', লেজেরের অপূর্ব বর্ণাঢ্য 'দি গ্র্যাণ্ড প্যারেড', মাতিসের প্রতীক-চিহ্নিত প্যাটার্ন-প্রধান 'আকাশ' আর 'সমুদ্র', লুক্রাটের ত্রিমাত্রিক ডৌলে চিত্রিত 'অ্যামাজোনিয়া', আঁদ্রে বোর্দোরিয়ে-র পশম-সুতোয় আশ্চর্য কৃতিত্বের সঙ্গে বুনে তোলা ব্রাশ-ছোপের কাজ 'মার্সেল সাম্বা' ইত্যাদি।

স্টেন্‌ড্ গ্লাস বা জানলায় রঙীন কাঁচ সাজানো ছবির প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক যেসব নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে, তাও এই ট্যাপেষ্ট্রিগুলির মতোই দর্শককে অভিভূত করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই স্টেন্‌ড্ গ্লাস অলঙ্কৃত করত গীর্জা, চাপেল আর সামন্ত-প্রভুদের কাস্‌ল্‌গুলিকে। তাই তাতে ধর্মভাবের প্রবলতা, খ্রীষ্ট-জীবনের নানা কাহিনীর—প্রধানত নেটিভিটির আর ক্রুসিফিক্‌শনের প্রাধান্য। আধুনিক কালে সেই স্টেন্‌ড্ গ্লাস সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলছে ইণ্ডাস্ট্রির পরিবেশকে, কারখানা-শপের অফিস-ঘরের জানালায় সন্নিবিষ্ট হচ্ছে। তাই তাতে এসেছে হরেক নতুন নতুন মোটিফ, অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট্ ল্যাণ্ডস্কেপ থেকে ষ্টিল লাইফ আর যন্ত্রযুগের প্রতীক-সমন্বয় পর্যন্ত সবকিছু। এক্ষেত্রেও অগ্রগণ্য ফরাসী শিল্পীরা যে উৎসাহী, তার অতি সুন্দর প্রমাণ মার্ক শাগাল-এর জেরুজালেম সিনাগগ-এর জানলাটি এবং ভিলঁ-র ক্রসবাহী খ্রীষ্টের বেশ কিছুটা অস্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিতে জটিল—কিন্তু অপূর্ব সুন্দর রঙের ছকে সাজানো—রচনাটি।

ইলাসট্রেশন বা পুঁথি-চিত্রগুলির মধ্যে আছে লুই আরাগঁ-এর বইয়ের জন্যে লেজের-অঙ্কিত চিত্র, নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী কবি সেণ্ট জন পার্স-এর কবিতার ব্রাক্‌-অঙ্কিত চিত্ররূপ, ডন কুইক্‌জোট-এর জন্যে আঁকা সালভাডর ডালি-র ছবি, বদ্‌ল্যার-এর রচনার এডুয়ার গ্যর্গ-অঙ্কিত চিত্ররূপ এবং রুয়ল্ট, মাতিস, পিকাসো ও আরও অনেকের নানা ধরনের কল্পনামণ্ডিত ইলাসট্রেশন।

পেণ্টিংগুলির মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ ফরাসী চিত্রকরের রচনা স্থান পেলেও ভান গগ, গোগ্যাঁ, রেনোয়া ও অন্যান্য ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কোনো রচনা নেই

দেখে একটু হতাশ হয়েছি। মাতিসের 'ওড্যালিস্ক' এতদিন পুনর্মুদ্রণে দেখে দেখেই মুগ্ধ হয়েছি, এবারে এই সিরিজের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় মূল রচনাকে চাক্ষুষ করার দুর্লভ সৌভাগ্য হল।

উত্রিল্লোর 'এ ভিউ অফ আঁজ' মুগ্ধ বিস্ময়ে খুঁটিয়ে অনুশীলন করার মতো একটি ছবি: দর্শকের চোখের গতিকোণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ছবির রাস্তাটি জীবন্ত হয়ে উঠে প্রতিবার নতুন ভাবে মোড় নিচ্ছে—কী আশ্চর্য নিখুঁত পরিপ্রেক্ষিত এনেছেন শিল্পী এই ছবিটিতে! এসব ছবির মূল রূপ দেখতে পাওয়াটা সত্যিই ভাগ্যের কথা।

শিল্পের ক্ষেত্রে পিকাসোর প্রতিভা প্রায় সর্বত্রগামী: তাঁর মৃৎশিল্প-রচনাগুলি খুব নয়নশোভন না হলেও, অভিনব। ধাতুশিল্পে ও অন্যান্য কারুশিল্পে আমাদের ভারতীয় শিল্পীদের কাজ এত উন্নত মানের, যে তার পাশে এই ফরাসী নিদর্শনগুলি ম্লান হয়ে পড়ে। ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সব ফরাসী কারুশিল্পের নমুনাগুলি সমকালীন ভারতীয় কারুশিল্পের পাশে শিল্পসুষমা ও কারিগরী দক্ষতার দিক থেকে দাঁড়াতেই পারে না।

গণতান্ত্রিক জার্মানির গ্র্যাফিক শিল্প

আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশেও—চিত্ররসিক মহলে জার্মান শিল্প যে স্বল্পজ্ঞাত, সে কথা বললে বোধহয় ভুল হবে না। এর কারণ: একদিকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিল্পে, তথা বিশ্বশিল্পে, প্যারিসের প্রচণ্ড মর্যাদা—যার ফলে অন্যান্য ইওরোপীয় দেশের আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ স্তিমিত। অন্যদিকে, হিটলার-নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানের ফলে জার্মানির বিচ্ছিন্নতা, জাতিবৈর, সাহিত্য-সিনেমা-চিত্রকলায় জার্মান ঐতিহ্যের ছেদ আর এক ধরনের একপেশে উগ্রতার বিকাশ—যার ফলে তার প্রতি অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবী-বিদগ্ধজনের স্বাভাবিক বীতস্পৃহা।

হিটলারের আমলে সাময়িক বিকার ও অধঃপতন ঘটলেও, জার্মান শিল্পের ('জার্মানিক' শিল্প বললে বোধহয় আরো ভালো হয়) পূর্বাপর গথিক ঐতিহ্যের এক বিপুল সম্পদ-সম্ভার রয়েছে। এই সম্পদ ফরাসী শিল্পের ল্যাটিন ঐতিহ্যের সমৃদ্ধির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বলা বাহুল্য, ইওরোপীয় শিল্পের এই দুই ধারাই ইটালীয় রেনেসাঁস-এর এক অভিন্ন উৎস থেকে পুষ্টি আহরণ করেছে।

গ্র্যাফিক শিল্পে—বিশেষত এনগ্রেভিং-এ—এক অত্যন্ত প্রবল প্রাণপূর্ণ ধারা জার্মানিতে দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত রয়েছে। শোন্‌গাউয়ের, ক্রানাখ, গ্রুনেওয়াল্ড প্রভৃতি হলেন এর শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। এঁদের সকলের, বিশেষত গ্রুনেওয়াল্ডের, রচনায় আমরা দেখি অসামান্য রেখার চারুতা, নিখুঁত ড্রয়িং, বিষয়-নির্বাচনে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রামময় দৈনন্দিনতা এবং বিষয়-চিত্রণে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ভাবালুতা-বর্জিত বলিষ্ঠ মানবতা। এই ধারারই একজন আধুনিক পথিকৃৎ হলেন ক্যা থে কোল্‌ভিৎস—যিনি জার্মান জনগণের, শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের ক্রোধ আর প্রতিবাদকে, স্বপ্ন আর সংগ্রামকে চিত্রিত করে গেছেন হিটলারের উদ্যত বন্দুকের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

স্থানীয় চারুকলা-ভবনে সম্প্রতি পূর্ব জার্মানির পাঁচ জন সমকালীন শিল্পীর ৬৫টি গ্র্যাফিক রচনার একটি সুন্দর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বাণিজ্য-প্রতিনিধি-দপ্তর। এই পাঁচজন শিল্পীর রচনা-শৈলী, মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠা, রচনা দক্ষতা আর শিল্পক্ষমতা প্রত্যেকেরই অসাধারণ। প্রধানত লিথোগ্রাফ, এচিং আর চারকোল ড্রয়িং দিয়ে সাজানো এই প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি প্রিন্টই আশ্চর্য নিখুঁত। আর, প্রত্যেকের রচনাতে দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি, গভীর ভালবাসার পরিচয়: বন্দর, কারখানা, শহর-গ্রামের পথ-ঘাট, সমুদ্রতীর। দৈনন্দিন কর্মজীবনের ও গোষ্ঠীজীবনের পটভূমিকায় শ্রমিক, খামারের মেয়ে, মা ও ছেলে, শিশুর দল, সাধারণ মানুষ। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, পারমাণবিক মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাদের সাগ্রাম।

যুদ্ধ ধ্বংস আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে জাগ্রত গণশক্তির চিত্রণে লেআ গ্রুন্‌ভিগের চিত্রমালার প্রচণ্ড তীব্রতা মনকে আচ্ছন্ন করে। ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান কৃষক-বিদ্রোহ নিয়েও গ্রুন্‌ভিগ-রচিত অনেকগুলি অতি তীক্ষ্ণ ও প্রচণ্ড আবেদনশীল এচিং এই প্রদর্শনীতে ছিল। ওই একই বিষয় নিয়ে রচিত কোলভিৎস-এর লিথোগ্রাফ-চিত্রমালার কতকগুলি প্রিন্ট দেখার সুযোগ আমাদের ইতিপূর্বে হয়েছে। কোলভিৎসের গণজীবনাশ্রয়ী সেই সংগ্রামী ধারার আরেকজন সার্থক শিল্পী হলেন মার্গারেট হাউএন্সের—যাঁর নাৎসীদের ইহুদী-নির্যাতনের ছবিটি ('পোগ্রম') বহুক্ষণ দর্শকমনকে অভিভূত করে রাখে।

হার্বার্ট টুখোল্স্কি-র রচনায় ('ট্রেলার', 'বল্টিক সমুদ্র তীর') যেমন একটি শান্ত ও মগ্ন শিল্পীমনের পরিচয় পাই, তেমনি হান্স্-থিও রিখ্টেয়ের রচনায় ('আয়নার সামনে মেয়েটি', 'মা ও ছেলের কথোপকথন') দেখি এক ধরনের অস্থির অনুসন্ধান। ফ্রিৎস ডায়েন বিষয়বস্তুর অংশবিশেষের ডিটেল বর্ণনার মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত জোরালো ভাবে প্রকাশ করেছেন সমগ্র বিষয়টিকে। 'খনি-শ্রমিকের জিনিসপত্র' লিথোটিতে প্রতীকীকরণের এক অতি সুন্দর রীতিকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন।

এম. পি. রাও

সম্প্রতি চারুকলা ভবনে শ্রী এম. পি. রাও তাঁর আঁকা ৩৫টি ছবির এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। শ্রীরাও স্বয়ংশিক্ষিত শিল্পী। পেশায় তিনি দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের একজন কারুবিজ্ঞানী। অবসর সময়ে ছবি আঁকা তাঁর নেশা। আমাদের দেশে ছবি আঁকার 'হবি' খুব বেশি লোকের নেই। বাংলা দেশে চাকুরীজীবীরা অনেকে অবসর সময়ে গান-বাজনার চর্চা করেন এবং মোটামুটি সকলেই অভিনেতা। ছবি আঁকার নেশা—বিশেষত ক্যান্ভাসের ওপর তেল-রঙে আঁকা ছবি—বেশ ব্যয়সাপেক্ষ বলেই হয়তো অপেশাদারদের মধ্যে বিরল। তাছাড়া স্কুল-কলেজে রীতিমতো শিল্পশিক্ষার অভাবে চিত্রচর্চার প্রতি আমাদের শিক্ষিত সাধারণের টান অপেক্ষাকৃত কম—যদিও আগ্রহের কিছুমাত্র অভাব নেই। সেদিক থেকেই শ্রীরাও-এর ছবিগুলির প্রতি আমরা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছি।

শ্রীরাও-এর কাছ থেকে জানা গেল, তিনি মাত্র বছর তিনেক হল রীতিমত ছবি আঁকা শুরু করেছেন এবং তাঁর প্রাথমিক শিল্প শিক্ষার মেয়াদ বিদেশের একটি নৈশ ক্লাসে মাত্র দু-তিন সপ্তাহ। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁর রচনায় মোটামুটি এমন একটি দক্ষতার পরিচয় আছে যে তাঁর সহজাত শিল্প-প্রবণতাকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা হয় না। অধিকাংশই তেল-রঙের কাজ এবং এগুলির ড্রয়িং পরিপ্রেক্ষিত ও কম্পোজিশন মোটেই কাঁচা নয়। উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারেও শিল্পীর উৎসুক মনের পরিচয় ফুটেছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রকৃতি, মানুষ, কল-কারখানা, জীবজন্তু আর বিমূর্ত ফর্ম ইত্যাদি সব কিছুর সমাবেশ।

কিন্তু স্টাইল ও টেকনিক-এর ক্ষেত্রে শ্রীরাও এখনও হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর নিজস্ব রীতিপদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বধর্ম এখনও তাঁর রচনায় দৃঢ়মূল হয় নি। প্রায় প্রত্যেকটি রচনা শৈলী ও ভঙ্গীর দিক থেকে অপরগুলি থেকে আলাদা। মানুষের মুখগুলি কোনোটি অ্যাকাডেমিক, কোনোটি প্রিমিটিভিস্ট ধরনে আঁকা, কোনোটি বা কিউবিস্ট প্যাটার্নে ভাঙা এবং কোনোটিতেই ব্যক্তি-চরিত্রের পরিচয় ফোটেনি। কতকগুলি ছবিতে সংযত মোলায়েম রঙ বেশ আকর্ষণীয় হলেও, অধিকাংশ ছবিতেই রঙ এতো বেশি চড়া এবং টোন-এর বৈপরীত্য এতো উগ্র যে দর্শকের চোখ কিছুক্ষণের মধ্যেই পীড়া বোধ করতে থাকে।

তবে এসব ত্রুটির ওপরে বেশি জোর দেওয়া উচিত নয়। কারণ, মাত্র তিন বছর আগে ছবি আঁকা শুরু করার পর, এইটেই তাঁর প্রথম প্রদর্শনী। সবচেয়ে বড়ো কথা : তিনি বাস্তববাদী শিল্পী। তাঁর রচনায় যে স্বভাবজাত শিল্পী মনের ও বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে তাঁর কাছ থেকে নিজস্ব বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল ও আরও স্বধর্মনিষ্ঠ রচনা পাবার ভরসা রাখব।

অসিতকুমার হালদার

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রবীণ শিল্পী অসিতকুমার হালদারের ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে। নব্য ভারতীয় চিত্রকলার প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারে যাঁদের দান অবিস্মরণীয়, অসিতকুমার ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর মৃত্যুতে আমরা আধুনিক ভারতীয় শিল্পের অগ্রগণ্য একজন পথিকৃৎকে হারালাম। কলকাতার সরকারী কলা-বিদ্যালয়ে অবনীন্দ্রনাথ প্রথম যে শিষ্যদল নিয়ে আমাদের নব্য শিল্পান্দোলন শুরু করেন, তাঁদের মধ্যে নন্দলালের সহযোগী হিসেবে ছিলেন অসিতকুমার।

বালক বয়সেই তাঁর শিল্পশিক্ষায় হাতে খড়ি হয় গ্রামবাংলার পটুয়া কুমোরদের কাছে, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের কাছে। সরকারী আর্ট স্কুলের শিক্ষাশেষে তিনি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতন-কলাভবনের অধ্যক্ষতা করেন। তারপর তিনি ইওরোপে যান এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর প্রথমে জয়পুরে ও পরে লক্ষ্ণৌতে সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থাকেন।

অসিতকুমারের একটি খুব বড়ো কাজ হল লেডী হেরিংহামের উদ্যোগে অজন্তা-চিত্রাবলীর প্রতিলিপি অঙ্কণ। এ কাজে তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন নন্দলাল। সরকারী প্রত্নবিভাগের উদ্যোগে তিনি বাগ ও যোগীমারা গুহারও অনেকগুলি ভিত্তিচিত্রের প্রতিলিপি অঙ্কণ করেছিলেন। অসিতকুমারের স্মরণীয় শিল্পসৃষ্টিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইংরেজী গীতাঞ্জলির জন্যে আঁকা কতকগুলি ছবি এবং বুদ্ধজীবনী-চিত্রমালা। দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অবলম্বনে তাঁর আঁকা অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে। অসামান্য রেখার চারুতা ও স্নিগ্ধ রঙের সুষমা তাঁর বহু রচনায় এক ধরনের শান্ত মধুর আত্মমগ্নতা সঞ্চারিত করেছে।

১৯৩৪ সালে ভারতীয় চিত্রকরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টস্-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ভারতের চারুশিল্প, কারুশিল্প ও শিল্প-ইতিহাস সম্পর্কে অসিতকুমারের লেখা অনেকগুলি মূল্যবান ইংরেজি ও বাংলা বই আছে। তিনি কতকগুলি কাব্যগ্রন্থ ও নাটকেরও রচয়িতা।

রবীন্দ্র মজুমদার

স ং স্কৃ তি - স ং বা দ

কলকাতায় লোক-সংস্কৃতি সম্মেলন

কাব্যের জন্মবৃত্তান্ত পরিক্রমা প্রসঙ্গে একদা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, কাব্য কবির পূর্বপুরুষ। কবিতার প্রাথমিক প্রকাশ ও সমগ্র সংস্কৃতির আদিমতম আবির্ভাব কোনো ব্যক্তিমানসের প্রয়াসে নয়, সামাজিক ঐক্যের সম্বন্ধপাতের সচলতায় লোকজীবনের অন্তরভাষ্যে। সমস্ত সংস্কৃতির উৎস হিসাবে লোক-সংস্কৃতি অনুধাবন ও চর্চার ইতিহাস সাম্প্রতিক। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশে সবেমাত্র তার সূত্রপাত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রথম সর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতি সম্মেলন সংগঠিত করার জন্য লোকসংস্কৃতি পিপাসু-মাত্রেই উদ্যোক্তাদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাবেন।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য বাংলাদেশে প্রথম হলেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এটি প্রথম সম্মেলন নয়। ইতিপূর্বে ১৯৫৮ সালে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর সভাপতিত্বে এলাহাবাদে, ১৯৫৯ সালে ওয়াই. বি. চওয়ান-এর সভাপতিত্বে বোম্বাইতে এবং ১৯৬১ সালে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য-র সভাপতিত্বে উজ্জয়িনীতে সর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ও বহুবিধ অসুবিধার জন্য কয়েকবার দিন পরিবর্তনের পর অবশেষে সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার সিংহী পার্কে তিনদিনব্যাপী লোকসংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াদিয়া এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বিবিধ আলোচনা-চক্র। অত্যন্ত দুঃখের কথা সম্মেলন কর্তৃপক্ষ পূর্ব ঘোষণানুসারে সব কয়টি আলোচনা-চক্র সংগঠিত করতে পারেন নি। সাহিত্য, সঙ্গীত ও সাধারণ অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে রচনা পাঠ ও আলোচনা করেন—সর্বশ্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মিরোস্লাভ প্রোকো পেক, এল. পি. বিদ্যার্থী, কুঞ্জবিহারী দাস, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কমল কোঠারী, বি. রামা রাজু, এস. মিশ্র, ভবগ্রাহী মিশ্র, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি। বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় কোনো প্রতিনিধিত্বপূর্ণ আলোচক ছিলেন না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় বাংলায় লোকসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপাদান বিষয়ক

প্রবন্ধে অনেক বক্তা বাংলার মঙ্গল কাব্যের সমাজচিত্রগুলি আলোচনা করেন। লোকসাহিত্য অধিবেশনে এইরূপ প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ডঃ কুঞ্জবিহারী দাস (উড়িষ্যা) [illegible] বিশেষভাবে [illegible] উত্থাপন করেন। প্রসঙ্গত প্রবন্ধ নির্বাচন কমিটির সভাপতি হিসাবে— ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সদস্যবৃন্দের মধ্যে ডঃ সুশীলকুমার দে, প্রিয়রঞ্জন সেন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লিখিত থাকায় সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। অবশ্য অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন যে প্রবন্ধগুলি যথাযথরূপে উক্ত কমিটির মাধ্যমে অধিবেশনে উপস্থাপিত হয় নি। যাহোক বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বাংলার লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত কোনো সার্থক প্রবন্ধ পঠিত না হওয়ায় প্রায় সকলেই দুঃখ প্রকাশ করেন।

সম্মেলন প্রাঙ্গনে বাংলার লোকশিল্পের ও লোকশিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত পুস্তকের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা উদ্যোক্তারা করেছিলেন। গুণগত ও সংখ্যাগত উপস্থাপনায় প্রদর্শনীটি অত্যন্ত দুর্বল। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যান্বিত হতে হয় পুস্তক প্রদর্শনীর মধ্যে ডঃ সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থখানি দেখে। সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে গ্রন্থখানির যে মূল্যই থাক আলোচ্য প্রদর্শনীতে গ্রন্থখানির অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে। প্রদর্শনীতে বাংলার রূপকথা, ছড়া, গীতিকা প্রভৃতির সঙ্কলন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুশীলকুমার দে, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শরৎচন্দ্র মিত্র, গোপাল হালদার, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, প্রভৃতির লোক সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থগুলি প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল।

সম্মেলনের তিনদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা অনেক দর্শককে আকর্ষণ করেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এই সাংস্কৃতিক অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের "লোকসংগীত," সোদপুর বান্ধব নাট্য সমাজ পরিচালিত বর্ধমানের সোদপুর গ্রামের সংস্কৃতি দলের "রণপানৃত্য" ও "লোকগীত", টিন প্রেনটিস দম্পতির "আমেরিকান লোকসংগীত", পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি শাখা প্রযোজিত "মহুয়া" নৃত্যনাট্য, মলয় গীতবীথির "সবুজ সোনা" নৃত্যনাট্য ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের "মৃচ্ছকটিক" নাট্যাভিনয় প্রভৃতি।

সম্মেলন উদ্যোক্তাদের পূর্বপ্রচার অনুসারে ধারণা হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশের লোকসংস্কৃতিবিদরা সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের হতাশ হতে হয়েছে। বর্তমানে ভারতে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য অবস্থানকারী একমাত্র চেকোস্লোভেকিয়ার মিরোস্লাভ প্রোকোপেকের সম্মেলনে উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। পঞ্জাব, উড়িষ্যা, রাজস্থান, অন্ধ্র, বিহার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতির প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগদান করলেও সারা ভারত সম্মেলনে অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিত্ব অনিবার্য ছিল। সর্বোপরি যেহেতু বর্তমান সম্মেলন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হল তাই বিভিন্ন আলোচনা-চক্র ও অধিবেশন—সর্বশ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, ও. সি. গাঙ্গুলি, নীহাররঞ্জন রায়, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার দে, বিনয় ঘোষ প্রভৃতি বাংলার লোকসংস্কৃতিবিদ ও গবেষকদের মননচর্চা ও সক্রিয়তায় জীবন্ত হয়ে উঠবে এইরূপ প্রত্যাশাই সম্মেলন সমাগতদের ছিল। এ আশা পূরণের ব্যর্থতার দায়িত্ব যারই হোক লোকসংস্কৃতি পিপাসুদের কাছে ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখের। সমস্ত সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উদ্যোগের তৎপরতা, নিষ্ঠা ও সততায় অদ্বৈত সম্পর্ক স্থাপন করে, প্রকৃত লোকসংস্কৃতিপ্রেমে পূর্ণ-সার্থকতাসন্ধানী হবে এই বিশ্বাস নিয়েই জিজ্ঞাসু মনস্ক লোকসংস্কৃতি পিপাসু-চিত্ত ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করবে।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

আগামী বৈশাখ সংখ্যা

পরিচয়

মহাকবি শেক্‌সপীয়রের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ এই সংখ্যায় শেক্‌সপীয়রের কবিকর্মের সম্যক পর্যালোচনা করবেন এবং তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হবে।

এজেন্টদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন আগেই তাঁদের বর্ধিত চাহিদা জানান।

তালিকাভুক্ত গ্রাহকদের এই সংখ্যাটির জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।

গ্রাহক চাঁদা

বার্ষিক : ১০ টাকা **ষান্মাসিক : ৫.৫০ ন.প.**

পরিচয়

বর্ষ ৩৩ ॥ সংখ্যা ৮
মাঘ, ১৩৭০

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরম তৃপ্তি
বাটা পামবিচ পায়ে দিয়ে।
এর সরেস চামড়া আর মনোজ্ঞ
ফ্যাশানে আপনি তুষ্ট হবেন,
উপরন্তু মুগ্ধ হবেন এর
উন্নত নির্মাণকৌশলে। পেরেক-
মুক্ত এই নতুন কৌশল। এই
লৌহশলাকার অপসারণে বাটা
পামবিচে নিহিত বিচিত্র আরাম।
Bata
PALMBEACH

শ্যামল চক্রবর্তী

শিক্ষা ও গণতন্ত্র

প্রচার বস্তুটা গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ—তা সে নিজের, দলের, বা সরকারের, যারই হোক না কেন। কারণ শেষ পর্যন্ত ভোটের ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে; এবং ভোটে জিততে হলে হঁকে জানাতেই হবে যে আপনি বা আপনারা কি ভাবছেন, কি করেছেন, বা কি করতে চাইছেন। কাজেই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে জানাতেই হবে দেশের মানুষকে যে সে সরকারী ক্ষমতাকে কি উদ্দেশ্যে এবং কি ভাবে ব্যবহার করেছে।

আবার রাষ্ট্রীয় চিন্তার দিক থেকে, জনসাধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতার যে তত্ত্ব গণতন্ত্রের মূলে নিহিত রয়েছে, তাতে সরকারকে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বীয় কৃতকর্মের জবাবদিহি করে যেতে হবে। এ দায়িত্ব সরকার পালন করেন সর্বপ্রকার প্রচারযন্ত্র মারফৎ, বিশেষ করে সুচিন্তিত, সুগ্রথিত প্রকাশনার মারফৎ।

কিন্তু গণতন্ত্র মানে সরকারের তরফ থেকে গণদেবতার উদ্দেশ্যে প্রকাশনা ও প্রচারের ফুল-বিল্বপত্র নিয়মিত নিবেদন নিশ্চয়ই নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে 'জনগণের সরকার'—এইরূপ যদি গণতন্ত্রকে প্রকৃতই নিতে হয়, তাহলে সরকার সম্পর্কীয় প্রতিটি বিষয়েই জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও বিচারপুষ্ট, সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত অভিমতের গভীর প্রভাব পড়তে হবে। এটা শুধু অধিকার নয়, অবশ্য পালনীয় দায়িত্বও বটে। আবার অন্য দিক থেকে এটা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। অর্থাৎ, সরকার তথ্য, তত্ত্ব ও মতামত সাধারণ্যে পরিবেশন করবেন এবং জনসাধারণ তার ওপর বিচার করবেন। সরকার যদি তাঁর কাজ না করেন, তবে জনমত সুশিক্ষিত ও সুচিন্তিত হওয়া দুষ্কর; হবে তথ্য-বঞ্চিত ক্ষোভ ও খণ্ড-অভিজ্ঞতা-প্রসূত অনুভূতি ও আবেগ-মিশ্রিত ধারণা। আর সাধারণ মানুষ যদি সরকার-পরিবেশিত তথ্য চিন্তন ও বিশ্লেষণে নিস্পৃহ

থাকেন, তাহলে তা নিতান্তই গ্রীষ্মের আকাশ-কালো-করা ধূলিঝড়ের মতো শুষ্ক প্রচারে পর্যবসিত হবে।

সুতরাং ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রিদপ্তর 'ভারতে শিক্ষণ-সমীক্ষা' (Review of Education in India) প্রকাশ করে একটি সৎ কাজ করেছেন। বইটিকে তাঁরা বলেছেন শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম বর্ষপঞ্জী (First Year Book of Education)। এর বিচারকাল ১৯৪৭ থেকে ১৯৬১। বইটি প্রকাশিত হয়েছে অগাস্ট, ১৯৬১। ঘটনা ইতিমধ্যে আরও এগিয়ে গেলেও, স্বাধীনতার পর প্রথম দশ-এগারো বছরের খবর যথেষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। বলতে গেলে, প্রথম দুটো পরিকল্পনার প্রায় শেষ পর্যন্ত খবর। বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তর এই দশকে যখন স্বাধীন ভারতের শিক্ষাদর্শ নির্ধারিত হচ্ছে, যখন নানারকমের নতুন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, তখন এই দশকের শিক্ষার ইতিবৃত্ত নিঃসন্দেহে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। তার ওপরেও অবশ্য এ বইয়ে আছে তৃতীয় পরিকল্পনার ঈপ্সিত লক্ষ্যগুলি। সম্প্রতি ভারতীয় ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলেছে। হয়তো বা সেই পটভূমিকাতেই ভারত সরকার পনেরো বছরের দূরায়ত-লক্ষ্য পরিকল্পনা বা Perspective Planning-এর জন্য কমিটি নিয়োগ করেছেন। সুতরাং এই সময়ে স্বাধীনতার পরের প্রথম যুগের চিন্তা ও ঘটনার পর্যালোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলেই মনে করি।

বইখানি বৃহদাকৃতি। তথ্য ও পরিসংখ্যান মিলিয়ে লেখা হাজার পৃষ্ঠার বেশি। ১৯টি পরিচ্ছেদ ও ৮টি সংযোজনী আছে। দেড়শো পৃষ্ঠা ধরে আছে 'শিক্ষা-দপ্তর' ও 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দপ্তরে'র নিজস্ব সংগঠন ও কার্যক্রমের বিবরণী। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে ১৫টি রাজ্য-সরকারের স্বতন্ত্র বিবরণ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিস্তৃত বর্ণনা; উপরন্তু সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি সার্বিক পর্যালোচনা। আলোচ্য বিষয়ের পরিধির বিশালতা অনুমান করা যাবে নিম্নলিখিত কতগুলি মোটা দাগের বিষয়-সূচীর দিকে দৃষ্টি রাখলে: যেমন, ঐতিহাসিক পটভূমি, সংগঠন ও কার্যভার, প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, ছাত্র-বৃত্তি, সামাজিক শিক্ষা, শরীরচর্চা ও সহযোগী শিক্ষা, হিন্দি-প্রসার, প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা, অন্ধ, মূক, বধির, অপরিণত বুদ্ধি প্রভৃতি আংশিক

অক্ষমদের শিক্ষা, শিক্ষা-গবেষণা, অন্যান্য কার্যসূচী, শিল্প-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানে ছাত্রবৃত্তি, স্বাধীনতার পরে ভারতে সংস্কৃতির প্রসার, বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, ইত্যাদি। স্বভাবতঃই এত বিভিন্নমুখী কার্যাবলী সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আগ্রহী পাঠকের জিজ্ঞাসার উপাদান যে এতে মিলবে সেটুকু জানাবার জন্যেই বিষয়গুলির উল্লেখ করলাম। কতকগুলি সাধারণ ঘটনা ও সমস্যার উল্লেখ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আশা করব, যোগ্যতর ব্যক্তি বারান্তরে এ আলোচনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

সরকারী কার্যক্রমের প্রসার

প্রথম দৃষ্টিতে যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হচ্ছে, আলোচ্য সময়ের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে কার্যক্রম বেড়েছে প্রচুর, আগের তুলনায় ব্যয় বেড়েছে অনেক, নতুন চিন্তার ভিত্তিতে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার চেষ্টা হয়েছে, শিক্ষা-প্রাপ্তের সংখ্যাও বেড়েছে। ভারতের সংবিধান 'শিক্ষার' মূল দায়িত্ব রেখেছে রাজ্য সরকারের হাতে; কিন্তু বিভিন্ন ধারা-উপধারার মারফতে কেন্দ্রীয় সরকারের এ সম্পর্কে মোট দায়িত্বও কম নয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব বিশেষ দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে চিন্তাগত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা বজায় রাখবার জন্যে 'Clearing House'-এর কাজ চালিয়ে চলেছে, এবং সারা দেশে শিক্ষাদানে সম-মান আনবার জন্যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত বা দুর্বলকে যথাযথ সাহায্য করবার দায়িত্বও গ্রহণ করেছে। এ কাজের জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর ৯টি 'বিভাগে' সংগঠিত হয়েছে; বেশ কিছু সংখ্যক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছে; 'বোর্ড', 'কাউন্সিল', প্রভৃতি নামে ১৫টি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সংগঠন গঠিত হয়েছে' ; কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর ৪টি বার্ষিক 'রিপোর্ট' ও ৬টি ত্রৈমাসিক শিক্ষা সম্পর্কীয় পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছে।[২] ভারত সরকার ১৯৪৮-৪৯ সালে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন' ও ১৯৫২ সালে ডঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে 'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ করেন। এই দুই মূল্যবান রিপোর্টের ভিত্তিতেই সারা ভারত জুড়ে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজা হয়েছে। মহাত্মাজির চিন্তা অনুসরণ করে 'বুনিয়াদি শিক্ষা'কে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সংখ্যায় ও বহুমুখী প্রবাহে। গড়ের হিসাবে দাঁড়ায় ১৯৪৯-৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সালে ছাত্র-ভর্তি সংখ্যা বেড়েছে নিম্নলিখিত শতক হারে :

তালিকা—ঘ

১৯৪৯-৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সালে ছাত্রবৃদ্ধির শতকরা হার

শিক্ষার মান	শতকরা বৃদ্ধি
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	১৪৫
বৃত্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার কলেজ	১৫৬
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	৩২০
মোট কলেজী ছাত্র	১৫০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৫৬
প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ম-৫ম শ্রেণী)	৬৯
মধ্য বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণী)	৯২
বৃত্তি বিষয়ক বিদ্যালয়	৭৩

'তালিকা ঘ' থেকে সহজেই দেখা যায় যে শতকরা হার সব থেকে বেশি বিশেষ শিক্ষার কলেজী ছাত্রের মধ্যে এবং সবচেয়ে কম ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ভর্তির মধ্যে। অবশ্য এটাতে প্রমাণ কিছু হয় না; আসলে বিশেষ শিক্ষার কলেজে ছাত্র বেড়েছে ৫ হাজার থেকে ২১ হাজার পর্যন্ত, এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেড়েছে ১ কোটি ৮১ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৭ লক্ষে।

শিক্ষাখাতে ব্যয়

এরই সাথে মিলিয়ে একবার ব্যয়ের হিসাবটা দেখা যাক :

তালিকা—ঙ

বিভিন্ন উৎস থেকে শিক্ষার জন্য মোট ব্যয়

বৎসর	সরকারী তহবিল	জিলা-বোর্ড তহবিল	মিউনিসিপ্যাল তহবিল	ছাত্রদের মাহিনা	অন্যান্য	
১৯৪৬-৪৭ কো. টা.	২৫'৯৫	৫'১৮	৩'২১	১৫'২২	৮'০৭	৫৭'৬৩
মোটের শতক হার	৪৫'৩%	৮'৭%	৫'৮%	২৫'৬%	১৪'৬%	১০০%
১৯৪৯-৫০ কো. টা.	৫৭'০১	৭'৪২	৪'৫২	২০'৬৬	১২'১১	১০১'২৩
মোটের শতক হার	৫৬'৩%	৭'৩%	৪'৪%	২০'২%	১১'৮%	১০০%
১৯৫৮-৫৯ কো. টা.	১৭৭'১৫	৮'৫৩	৭'৯৬	৪৮'৪৩	২৩'৬১	২৬৬'০০
মোটের শতক হার	৬৬'৭%	৩'২%	৩'০%	১৮'২%	৮'৯%	১০০%

এতে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার জন্য সামগ্রিক ব্যয় অনেক বেড়েছে, সরকারী ব্যয়ও বেড়েছে ১৯৪৯-৫০ সালে ৫৭ কোটি টাকা থেকে ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৭৭ কোটি টাকায়। অর্থাৎ, সরকারী বার্ষিক ব্যয় তুলনায় প্রায় ১২০ কোটি টাকা বা শতকরা ২০৮% বেড়েছে। সেই তুলনায় মোট ব্যয় বেড়েছে প্রায় ১৬৩ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬০%, এবং ছাত্রদের মাহিনার অংশ সাড়ে এগারো কোটি টাকা বা প্রায় ৯৫%।

এবার বিশেষ কতকগুলি খাতে ব্যয়ের তারতম্য কি হচ্ছে সেটা লক্ষ্য করলে আর্থিক দায়িত্বের চিত্রটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তালিকা চ

শিক্ষার জন্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ও মোট ব্যয়ের অনুপাত বিভাগ

শিক্ষা	বৎসর	মোট ব্যয়	সরকার র অংশ %	জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি অংশ %	ছাত্রদের মাহিনার অংশ %	অন্যান্য অংশ %
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪৯-৫০	৩৩,৯৫'৯৫	৬৬'৯	২৬'২	২'৪	৪'৫
	১৯৫৮-৫৯	৬৩,৬৩'৫৫	৮১'৪	১৩'২	৩'৪	২'০
মধ্য বিদ্যালয়	১৯৪৯-৫০	৬,১৭'৬৫	৪৮'৬	১৪'৫	২৪'৩	১২'৬
	১৯৫৮-৫৯	৩১,৮২'০২	৭১'৪	১২'২	৯'৭	৬'৭
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯৪৯-৫০	২০,৪৬'৩৩	৩০'৬	৬'১	৫০'৩	১২'০
	১৯৫৮-৫৯	৫০,৪৯'৮৭	৪৫'৯	৩'৮	৪১'১	৯'২
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ						
(সাধারণ শিক্ষা)	১৯৪৯-৫০	৬,৫২'৩৯	৩৮'১	০'৩	৪৯'৯	১১'৭
	১৯৫৭-৫৮	১৪,১১'৫৭	৩৪'৯	০'১	৫৩'০	১২'০
	১৯৫৮-৫৯	১৫,৮০'৪১	(পাওয়া যায় না)			
কৃষিবিজ্ঞান কলেজ	১৯৪৯-৫০	৩৩'৮৯	৬৮'৮	...	১২'২	১৯'০
	১৯৫৮-৫৯	৯৫'৩৮	৭০'৫	...	১১'৩	১২'৩

শিক্ষা	বৎসর	মোট ব্যয়	সরকারের অংশ %	জিলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি অংশ %	ছাত্রদের মাহিনার অংশ %	অন্যান্য অংশ %
বাণিজ্যবিষয়ক কলেজ	১৯৪৯-৫০	১৮'২৮	১৮'৬	..	৭০'০	১১'৪
	১৯৫৮-৫৯	৪৬'১৮	১৬'২	...	৭৫'৫	৮'৩
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১৯৪৯-৫০	৭৫'৬৯	৭২'০	...	২০'৬	৭'৪
	১৯৫৮-৫৯	২৯৯'২৫	৬৪'৭	...	২৬'৫	৮'৮
আইনবিষয়ক কলেজ	১৯৪৯-৫০	১০'২১	৮'০	...	৮৪'৩	৭'৭
	১৯৫৮-৫৯	২২'৬১	৫'০	...	৯১'৪	৩'৬
চিকিৎসাবিজ্ঞান কলেজ	১৯৪৯-৫০	১২৯'৮৯	৬৯'৫	৩'০	২২'৫	৬'০
	১৯৫৮-৫৯	৪৩৯'৫২	৭৩'১	১'৯	১৬'০	৯'০
শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ	১৯৪৯-৫০	৩৩'৫৫	৮২'৯	...	৮'৯	৮'২
	১৯৫৮-৫৯	১১৯'৩৪	৭৬'০	...	১৪'৭	৯'৩
প্রযুক্তিবিজ্ঞান কলেজ	১৯৪৯-৫০	১৬'৩৫	৮৮'৭	...	৭'১	৪'২
	১৯৫৮-৫৯	১৬'৫৭	৬২'৮	...	১১'৫	২৫'৭
প্রযুক্তিবিজ্ঞান স্কুল	১৯৪৯-৫০	৩৪৩'০২	৭৭'১	১'৯	৯ ৯	১১'১
	১৯৫৮-৫৯	৮২১'৮৪	৭৬'৭	১'১	১৩'৮	৮'৪
কৃষিবিজ্ঞান স্কুল	১৯৪৯-৫০	১০'৮৯	৯৩'৮	০'১	১'০	৫'১
	১৯৫৮-৫৯	৩৬'২২	৮৪'০	...	১'০	১৫'০
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	১৯৪৯-৫০	২০'৮৩	৮০'০	১'০	১৩'৭	৫'৩
	১৯৫৮-৫৯	১৪২'২৭	৭২'০	০'৫	২৪'০	৩'৫
প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্প-বিজ্ঞান স্কুল	১৯৪৯-৫০	১০৯'৪৩	৭০'৩	৪'০	৮'৯	১৬'৮
	১৯৫৮-৫৯	২৭২'২১	৮০'০	১'৭	৮'৭	৯'৬
শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুল	১৯৪৯-৫০	১৬০'৬৩	৮৮'৭	০'৩	৪'৪	৬'৬
	১৯৫৮-৫৯	২৫৫'৭৮	৮৭'৬	০'৩	৪'৭	৭'৪

তালিকা মস্ত বড়ো হয়ে গেল, যদিও অনেক ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের

হিসাব এতে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবু এই পরিসংখ্যান কতকগুলি জরুরি দিকে আলোকপাত করছে।

প্রথমেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা ধরা যেতে পারে। এই ন বছরের মধ্যে বার্ষিক ব্যয় প্রায় ৩০ কোটি টাকা বেড়ে গেছে; এবং সরকার আগে যেখানে মোট খরচের দুই-তৃতীয়াংশ বহন করতেন, পরে তা পাঁচ ভাগের চার ভাগে দাঁড়িয়েছে। তবু এখনও খরচের শতকরা সাড়ে তিন ভাগ ছাত্রদের মাইনে থেকেই আসছে। সম্পূর্ণ বিনা-মাইনে করা যায় নি; বরং সামান্য কিছু, অর্থাৎ শতকে এক ভাগ বেড়েছে। মধ্য বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে, দেখা যাচ্ছে, সরকারের দায়িত্ব বেড়েছে, অন্যদের কমেছে। কিন্তু এখনও প্রায় শতকে ১০ ভাগ অর্থ আসছে ছাত্রদের মাইনে থেকে। উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অবস্থা বেশ পালটাল। এখানে ছাত্রদের ভার আগের তুলনায় কমলেও, এখনও মোট খরচের শতকরা ৪৬ ভাগ সরকার এবং ৪১ ভাগ ছাত্ররা বহন করে। সাধারণ কলা ও বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষার ব্যয় দু-গুণের বেশি বাড়লেও, সরকারের দায়িত্বের হার অনুপাতে শতকরা তিন ভাগ কমেছে ও ছাত্রদেরও বেড়েছে ঠিক সেই অনুপাতেই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-গুলির ব্যয়ের অনুপাতের দিকে নজর করলে বোঝা যাবে যে সরকার বাণিজ্য ও আইন-বিষয়ক শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যয় করছেন না। এ দুটি ক্ষেত্রে বর্ধিত ব্যয়ের ভার ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়ে সামলানো যাচ্ছে। কৃষি শিল্পবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির মূল দায়িত্ব সরকারই বহন করছেন।

সমগ্রের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা

এবারে হিসেবটা অন্য দিক থেকে করা যাক। কতো ছিল আর এখন কতো বেড়েছে শুধু সেটুকু দেখাই যথেষ্ট নয়; কতো বাড়ার আশা বা প্রয়োজন ছিল সেই দিকটাও দেখা দরকার।

চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়ের বিনাখরচে বাধ্যতামূলক শিক্ষার দাবি ভারতবর্ষে উঠেছে আজ প্রায় একশো বছরেরও আগে থেকে। ব্রিটিশ-রাজ স্বভাবতঃই কোনোদিনই সে দাবি স্বীকার করে নি। ১৯৪৪ সালে 'যুদ্ধোত্তর যুগে শিক্ষাবিকাশের পরিকল্পনা'য় ধরা হয়েছিল যে এ লক্ষ্যে পৌঁছতে ৪০ বছর লাগবে। স্বাধীনতার পরে 'খের কমিটি' অভিমত জানিয়েছিলেন যে

১৬ বছরের মধ্যে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা সম্ভব। ভারতের সংবিধান বিষয়টির ওপর আরও গুরুত্ব দিয়ে নির্দেশ দিল যে আরও কম সময়, অর্থাৎ ১০ বছরের মধ্যে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। পরাধীনতামুক্ত কোটি কোটি ভারতবাসীর আকাঙ্খাকে ভাষায় রূপ দিয়ে সংবিধানে যা ঘোষিত হয়েছিল তার সঙ্গে বর্তমান অবস্থাকে মিলিয়ে দেখুন :

তালিকা ছ

বয়স	১৯৬০-৬১ (আনুমানিক হিসাব)			১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)		
	মোট %	ছেলে %	মেয়ে %	মোট %	ছেলে %	মেয়ে %
১। ৬-১১ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা যে অংশ স্কুলে ভর্তি হতে পারছে (শ্রেণী ১ম-৫ম) …	৬১'১	৮০'	৪০'৪	৭৬'৪	৯০'৪	৬১'৬
২। ১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা যে অংশ স্কুলে ভর্তি হতে পারছে (শ্রেণী ৬ষ্ঠ-৮ম) …	২২'৮	৩৪'৩	১০'৮	২৮'৬	৩৯'৯	১৬'৫
৩। ১৪-১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা যে অংশ স্কুলে ভর্তি হতে পারছে (শ্রেণী ৯ম-১১শ) …	১১'৮	১৮'৪	৪'২	১৫'৬	২৩'৭	৬'৯

ওপরের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে সংবিধান গৃহীত হবার ১০ বছর পরে ৬-১১ বছরের শতকরা ৬১ ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে ভর্তি হতে পারবে, তার মধ্যে ছেলেদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং মেয়েদের শতকরা ৪০ ভাগ। এমন কি আরও ৫ বছর, অর্থাৎ, তৃতীয় পরিকল্পনার পরেও এ অনুপাত, ছেলেদের শতকরা ৯০ ভাগ ও মেয়েদের শতকরা ৬১ ভাগের ওপরে ওঠবার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ সংবিধান গ্রহণোত্তর ১৫ বছর পরেও শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ মানুষের স্কুলে এসে অক্ষর পরিচয় করা সম্ভব হবে না। মনে রাখবেন, এদের বয়স তখন ৬ থেকে ১১ বছর। এদের জীবৎকাল আরও ৫০-৬০ বছর ধরুন। অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালের পর আরও ৫০।৬০ বছর পর্যন্ত ঐ সময়কার বয়সের এক-চতুর্থাংশ মানুষের নিরক্ষরতার ভার সমাজের ওপর অনড়ভাবে চেপে বসে থাকবে।

তার পরবর্তী অংশ, অর্থাৎ, ১১-১৪ বছরের অবস্থা তো ভয়াবহ সালে ব শতকরা ২২·৮ ভাগ স্কুলে পড়বে; আরও ৫ বছর পরে এই গড় গতকরা ৫·৮ ভাগ বেড়ে ২৮·৬ ভাগে দাঁড়াবে। অর্থাৎ সংবিধান গ্রহণের ১৫ বছর পরেও এই অংশের এক-তৃতীয়াংশকেও স্কুলে ভর্তি করা যাচ্ছে না। তাহলে ১৪ বছরের সব ছেলেমেয়েকে ৮ বছর স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা কবে নাগাদ করা যাবে? এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ নির্বাক। বরঞ্চ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬-১১ বছরের ছেলেদের শতকরা ৯০ ভাগকে যে স্কুলে আনা যাবে এই আশাতেই কর্তৃপক্ষের কথায়-বার্তায় বেশ একটু আত্মপ্রসাদের ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা বলছেন—মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাটা একটু পিছিয়ে রয়েছে, সেইদিকে মন দিতে পারলে বেশ কিছু এগুনো হবে।

এখানে প্রশ্ন আসে, সংবিধান .৪ বছরের লক্ষ্য উপস্থিত করে কি ভুল করেছিল? ১১ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করলেই কি যথেষ্ট হবে?

ব্যাপারটা আসলে তা নয়। 'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন' স্কুল শিক্ষাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—প্রাথমিক (ম-৫ম শ্রেণী), মধ্য (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী) ও উচ্চ মাধ্যমিক (৯ম-১১শ শ্রেণী)। তাঁদের মতে প্রাথমিক শিক্ষা ১ম-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত হলেও, ৫ম শ্রেণীর পর থেকে শিক্ষার ধরন পালটাতে হবে; এবং, ৯ম-১১শ শ্রেণী পর্যন্ত যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, ছাত্রদের তার জন্য, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী, এই পর্যায়ের মধ্যেই প্রস্তুত করে নিতে হবে; প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রদের পক্ষে যাতে দুস্তর বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কিন্তু তার মানে একথা নয় যে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত ৫ম শ্রেণীর বিদ্যাই যথেষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে যার পরে কোনো ছাত্রকে চরে খেতে বলা যেতে পারে। পশ্চিম দুনিয়ার অগ্রগামী দেশগুলিতে পুরো মাধ্যমিক শিক্ষাই সকল নাগরিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে আমাদের ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ। সুতরাং পূর্ণ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বাদ দিয়ে, ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার দাবি যে ন্যায্য, এটা নিশ্চয়। এটা নিশ্চয় এই কারণে যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ৮ বছরের শিক্ষাক্রম উত্তীর্ণ না হতে পারলে কারুকেই সংসারে প্রবেশ করার উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত এ কথা বলে চলে না। সংবিধানের মৌলিক অধিকারের

অধ্যায়ে ২৪ নং ধারায় বলা আছে ১৪ বছরের কম কোনো শিশুকে কোনো ফ্যাক্টরী বা খনিতে নিয়োগ করতে পারবে না। আইনে আছে, ১৪ বছরের কম বয়সের মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ, ১৪ বছর বয়স পার হলে আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা দেহে ও মনে সংসারে নিজের ঠাঁই করে নেবার সর্বনিম্ন যোগ্যতা অর্জন করছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং যারা ১৪ বছরের পর সংসারে ঢুকবে, তাদের সর্বনিম্ন প্রস্তুতি, এই ৮ বছরের স্কুল জীবন অপরিহার্য। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালের পরেও ১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৭২ জন এই স্কুল-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকবে। অবশ্য প্রথম বয়সের দলের (৬-১১) সঙ্গে, দ্বিতীয় দলের (১১-১৪) সংখ্যার তারতম্য আছে, তবুও মোটামুটি ধরা যায় যে, ৬-১১ বছরের শতকরা ৪৫ ভাগ ছেলেমেয়ে, যারা প্রাথমিক স্কুলে পড়ছিল, তারা ১১ বছরের পরে পড়া ছেড়ে দিল। তখন ছেলেদের চাকরী বারণ, মেয়েদের বারণ বিয়ে। তারা কি করবে তিন বছর ? বাপের সঙ্গে লাঙল কাঁধে নিয়ে মাঠে যাবে ? শহরে এসে বয়স ভাঁড়িয়ে কারখানায় ঢুকবে ? বাবুদের বাড়ি চাকরের কাজ করবে ? না, কি, চায়ের দোকানের বেয়ারা ? অথবা. তিন বছর ধরে শুধুই খেলে বেড়াবে, আর ভুলবে যা কিছু শিখেছিল ?

সমস্যাটা গুরুতর। আমি অবশ্য ধরে নিচ্ছি যে, যে ছেলেমেয়েরা ১১ বছরের মধ্যে স্কুলের পড়া সাঙ্গ করছে, তারা গরীব কৃষক-মজুরের ঘরের ছেলেমেয়ে ; ধনী, মধ্যবিত্ত, ভালো-মাইনে-পাওয়া কারখানার শ্রমিকের ঘরের নয়, এমনকি ধনী চাষীর ঘরেরও নয়। কাজেই এদের বড়ো অংশ লাগবে চাষের কাজে। এখন আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকল্পনায় সবচেয়ে বড়ো বাধা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে কৃষির অনগ্রসরতা। সে বাধা যে শুধু বর্তমানে রয়েছে তাই নয়, ভবিষ্যতেও তা বিপদরূপে দেখা দেবে। কৃষির উন্নতির জন্য নিশ্চয়ই শতরকম ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু একথা সকলেই মানবেন যে কৃষির উন্নতি হবে না, কৃষকের উন্নতি না হলে। অর্থাৎ, ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত যে প্রাথমিক পাঠক্রম তা সকলের জন্যে বাধ্যতা-মূলকভাবে চালু না করতে পারলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে অবশ্যই।

এতক্ষণ আলোচনা করেছিলাম এই ধরে নিয়ে যে ৬-১১ বছরের যে ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ছে, তারা বোধ হয় ৫ বছরের পুরো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম

লাঙ্গ করছে। বাস্তব অবস্থা আরও ভয়াবহ। আলোচ্য বই-এর ৭৯৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে ভারতে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া প্রতি ১০০টি ছাত্রের মধ্যে মোটে ৩৫টিকে ৫ বছর পরে ৫ম শ্রেণীতে দেখা যায়। তার মানে শতকরা বাকি ৬৫টি হয় ক্লাসে 'ফেল' করে আটকে থাকছে, নয়তো পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে একটা মারাত্মক অপচয় ও বদ্ধাবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 'ফেল' করার মধ্যে রয়েছে সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয়; 'ছেড়ে দেওয়া'র অপব্যয় আরও বেশি। অর্থাৎ, এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে কেবল, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ এই পর্যায়ে ছাত্র যে বিশেষ কিছু শিখল না তা নয়, যেটুকু শিখল তাও সে অনিবার্যভাবেই ভুলবে। অবশ্য এ কারণে সরকারী মহলে একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে প্রাথমিক শিক্ষাকে আর এমনি বাড়ানো নয়; একে দৃঢ়ভিত্তিক ও সুসংবদ্ধ করতে হবে। তা যে করতে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা করা যাবে না কেন? এঁরাই হিসেব করে বলেছেন যে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অপচয় কম। এক্ষেত্রে শতকরা যে ১০০টি ছাত্রছাত্রী ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়, তিন বছর পরে তাদের ৬০টিকে দেখা যায় ৮ম শ্রেণীতে। 'অপচয়' এখানেও যথেষ্ট; তবে আগের পর্যায়ের মতো নয়।

এই সূত্রে লক্ষ্য করা দরকার যে ১৪-১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা মোটে ১০·৮ ভাগ ১৯৬০-৬১ সালে এবং শতকরা ১৫·৬ ভাগ ১৯৫৫-৬৬ সালে স্কুলে ৯ম-১১শ শ্রেণীতে পড়তে পারছে। স্কুল-শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাকে একটা 'পিরামিড' হিসাবে কল্পনা করলে, দেখা যাবে এর ভিতটা যে পরিমাণে চওড়া তার তুলনায় কোমরটা হঠাৎ সরু হয়ে গিয়ে মাথাটা প্রায় ছুঁচলো হয়ে উঠেছে। চিন্তার কথা, এই বইয়েই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা না করে আমাদের দেশে এই বয়সের শতকরা ৩০ জন পড়লেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। নইলে চাকরির ব্যাপারে বিপদ ঘটতে পারে। যদি এটা ধরেও নিই যে সকলকে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা দেবার অবস্থা ভারতের এখনও নয়, তাহলেও ফারাকটা কি এত বেশিই হতে হবে? চাকরির বিষয়টা স্বতন্ত্র আলোচনা করা যাবে পরে। কিন্তু এই বিভেদের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল যে মারাত্মক রূপ নিচ্ছে তা ভুললে চলবে কেন?

এ কথা অনস্বীকার্য যে উচ্চ-শিক্ষা অর্জনের মধ্যে নিহিত রয়েছে নেতৃত্ব

দেবার ক্ষমতা—তা সে অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেই হোক আর সামাজিক পরিবেশেই হোক। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালেও শতকরা ১৫ জন মাত্র উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়তে পারছে; অর্থাৎ, আরও ১৫-২০-২৫ বছর পরে মূলত এদেরই একটা অংশের ওপর দেশের সব দিকের নায়কতার ভার পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশ তো গণতন্ত্রের দেশ, এবং আমরা সমাজতন্ত্র আনব বলে ঠিক করেছি। অথচ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু যে সম্পদের মোটা অংশ শতকরা ১০ জনের কুক্ষিগত হচ্ছে তাই নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নেতৃত্বভার দীর্ঘকালের জন্য শতকরা ১৫ জনের হাতে আটকে থাকছে। গণতন্ত্র মানে—জনগণের সরকার; শতকরা ১৫ জনের নেতৃত্ব নয়।

ব্যাপারটা অন্যদিক থেকেও দেখুন। 'তালিকা চ'-তে আমরা দেখেছি যে ১৯৫৮-৫৯ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার মোট ব্যয়ের শতকরা ৪১ ভাগ আসছে ছাত্রদের মাইনে থেকে, যেখানে তুলনায় মধ্য-বিদ্যালয়ে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট খরচের ছাত্রদের অংশ হল যথাক্রমে শতকরা ৯.৭ ও ৬.৪। অর্থাৎ, ৯ম শ্রেণী থেকে পড়তে গেলে ছাত্রকে কিছুটা খরচ করতে হয়। সুতরাং ছাত্রসংখ্যা এই পর্যায়ে এসে যে অনেক কমে গেল, তার কারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক পশ্চাৎপদতার ভার যতই হোক না কেন, ছেলেদের ক্ষেত্রে মূলত অর্থাভাব। অর্থাৎ, উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষায় শুধুমাত্র শতকরা ১৫ জন আসছে, এটাই একমাত্র চিন্তার বিষয় নয়; আসছে তারাই যাদের বাপ-মা খরচ করতে পারেন। এ হল 'শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষা'—Class Education-এর নমুনা, যা সমাজে বিত্তবান শ্রেণীর প্রাধান্য কায়েম করে। তাহলে ভাবতে হয় ভারতে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে অর্থনৈতিক একচেটিয়া মালিকানাকে যেমন ভাঙতে হবে, তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের একচেটিয়া অধিকারের পরিবর্তন প্রয়োজন।

অবশ্য এই পর্যায়েও ভিত্তিটা কিছুটা প্রসারিত হয়েছে। শুধু ছেলেদের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে ১৯৬৫-৬৬ সালে ছেলেদের শতকরা ২৬.৭ ভাগ ৯ম-১১শ শ্রেণীতে পড়ছে। কিন্তু অনুপাত এখনও কত সামান্য; সমগ্রের এক-চতুর্থাংশ ছাড়িয়েছে মাত্র।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর মোট ফল কি দাঁড়াচ্ছে। কলা, বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান—সর্ববিধ ব্যাপারেই দেশের ব্যাপকতম অংশের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। বলবেন—'প্রতিভা'কে চেপে রাখা যায় না। কিন্তু

যে কজন ফুটে বেরিয়েছেন তাদের দেখেই তো এ কথা বলছেন। যারা বেরতে পারল না, তাদের হিসেব কখনও নেওয়া হয়েছে কি? আর, তাছাড়া অসামান্য দিগ্বিজয়ী প্রতিভার ভরসায় জাতি অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। অগণিত সাধারণ মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতার ওপরেই জাতিকে নির্ভর করতে হয়। এবং, এই সাংস্কৃতিক পরিবেশই প্রতিভার বিকাশকে সাহায্য করে।

'হাই-স্কুল' থেকে 'হায়ার-সেকেণ্ডারি স্কুল'

সাধারণ কথা ছেড়ে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার দুটি বিশেষ সমস্যার কথা তুলছি।

'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন' মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রস্তাব করেছিলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষা ১১ বছরের হবে এবং ৯ম শ্রেণী থেকে 'কলা বা মানবিক' (Humanities), 'বিজ্ঞান', 'বাণিজ্য', 'প্রযুক্তিবিজ্ঞান' প্রভৃতি বিভিন্নমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। আলোচ্য বইখানিতে দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ, ১৯৬০-৬১ সালে, মোট ৩,১২১টি স্কুলকে 'হায়ার সেকেণ্ডারি' পর্যায়ে উন্নীত করা হবে, অর্থাৎ, এখানে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হবে। তার মানে মোট ১৫,৬০০ স্কুলের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র এই পর্যায়ে উন্নত হচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে মোট ১২,৬০০ স্কুলের শতকরা ৫০ ভাগ স্কুলেই ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। তাহলে এই ৫ বছরে ৮ হাজারের ওপর স্কুলকে উন্নত করা হলেও, ১১,৩০০ স্কুল পেছিয়ে পড়ে থাকত। কিন্তু পরিকল্পনার মাঝ-বরাবরের হিসাব-নিকাশে (Mid term appraisal) দেখা যাচ্ছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে শতকরা ৩০ ভাগের বেশিকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নত করা সম্ভব হবে না। (স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌—২৯।১০।৬৩) তাহলে 'মুদালিয়র কমিশন' যে সংস্কারের কথা বলছিলেন সেটা কতটা পেছিয়ে থাকছে, তা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বিভিন্নমুখী পাঠক্রমের সমস্যা

দ্বিতীয় সমস্যাটির কথা, দুঃখের বিষয়, বইটিতে একেবারেই আলোচিত হয় নি। 'মুদালিয়র কমিশন' যে বিভিন্নমুখী শিক্ষার কথা বলেছিলেন, বর্তমান অবস্থায় তার কতটা সংসাধিত হয়েছে? যাঁরাই খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে অধিকাংশ স্কুলেই উপযুক্ত মানের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞান-শিক্ষক পাওয়া যায় না।

অনেক ক্ষেত্রেই নানা জোড়াতালির সাহায্যে নিয়মকানুনকে চোখ-ঠারার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে নয়া-দিল্লীতে 'সারা-ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল'-এর যে অধিবেশন হয়ে গেছে, তাতে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাধ্যক্ষ (Pro-Vice-Chancellor) ডাঃ এ. সি. যোশী বলেছেন যে যদিও তাঁর রাজ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্কুলকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তাদের শতকরা ১ ভাগেও ভালো শিক্ষকের ব্যবস্থা করা যায় নি, এবং পরীক্ষায় 'ফেলের' সংখ্যাও সেইজন্য এত বেশি। তিনি বলেছেন যে বিশেষ করে অভাব হচ্ছে অঙ্ক, বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষকের। এইরূপ অসুবিধা জানিয়েছেন বিহার, অন্ধ্র ও কেরলের প্রতিনিধিরা। গুজরাট তো ১১শ শ্রেণী খোলা বন্ধ করে দিয়ে দু-বছরের 'জুনিয়র কলেজ' খোলারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ, সেই পুরনো ১০ বছরের স্কুল ও দু-বছরের 'ইণ্টার-মিডিয়েট' পড়ার ব্যবস্থা। (স্টেট্‌স্‌ম্যান্—২৯।১০।৬৩)

শিক্ষক সমস্যা

শিক্ষকদের কথাটা বারবার আলোচিত হয়েছে শিক্ষকদের অবস্থাটা এবার চাক্ষুষ করুন :

তালিকা—জ

ভারতে শিক্ষকদের শিক্ষার মান

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক	ম্যাট্রিক ও তদূর্ধ	ম্যাট্রিক নয়	বৃত্তি-শিক্ষা প্রাপ্ত	বৃত্তি-শিক্ষা নাই
১৯৪৯-৫০	৪৫,৫৩৪	৪,৭২,৩৬৪	৩,০২,০৫০	২,১৫,৮৪৮
	(৮·৭৯%)	(৯১·২১%)	(৫৮·৩২%)	(৪১·৬৮%)
১৯৫৭-৫৮	২,০৯,৯০৩	৫,১৯,৩৩৬	৪,৬৩,০৬৩	২,৫২,১৭৭
	(২৮·৭৮%)	(৭১·২২%)	(৬৩·৭৩%)	(৩৬·২৭%)
মধ্য স্কুল শিক্ষক				
১৯৪৯-৫০	৩৫,২২৮	৪৩,৬৩৭	৪১,৪৭৮	৩৭,৩৮৭
	(৪৪·৬৭%)	(৫৫·৩৩%)	(৫২·৬%)	(৪৭·৪%)
১৯৫৭-৫৮	১,০০,৩০৭	৮৪,৭৬৫	১,১৬,০২১	৬৯,০৫২
	(৫৪·২০%)	(৪৫·৮০%)	(৬২·৬৯%)	(৩৭·৩১%)

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক	স্নাতক	অস্নাতক	বৃত্তিশিক্ষা প্রাপ্ত	বৃত্তিশিক্ষা নাই
১৯৪৯-৫০	৪৮,২৭৫	৬৭,৮৮২	৬২,২৪৭	৫৩,৯১০
	(৪১·৫৬%)	(৫৮·৪৪%)	(৫৩·৫৯%)	(৪৬·৪১%)
১৯৫৭-৫৮	১,০৫,৬৩৮	১,১৬,০৫৭	১,৩৯,১৭৫	৮২,৫২০
	(৪৭·৬৫%)	(৫২·৩৫%)	(৬২·৭৮%)	(৩৭·২২%)

উপরোক্ত তালিকা থেকে অবস্থাটা খানিকটা বোঝা যাবে। ৮ বছরে অবস্থার উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু যাবার পথ কতোটা বাকি আছে, সেটা হিসেব করবেন। মাধ্যমিক-শিক্ষা কাউন্সিলে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা লক্ষ্য করলে বর্তমানেও অবস্থার ভয়াবহতা বোঝা যাবে। এই পরিসংখ্যানে উল্লেখ নেই যে উচ্চ শ্রেণীতে পড়াতে গেলে আশা করা হচ্ছে যে শিক্ষক, হয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর (এম এ./এম. এস. সি.) অধিকারী, নয়তো স্নাতক পর্যায়েই সম্মানের (Honours) সঙ্গে পাশ করেছেন। এই পর্যায়ের হিসাব মিলছে না। তাছাড়া অঙ্ক ও বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়াও দুরূহ—তারও হিসাব মিলছে না।

কলা ও বাণিজ্য বিভাগে ভিড়

এই সূত্রে আর একটি তালিকা লক্ষ্য করুন :

তালিকা—ঝ

বৎসর	কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার কলেজ	ছাত্র সংখ্যা (লক্ষে)
১৯৪৯-৫০	৪৮৮	৩·৩১
১৯৫৮-৫৯	৯১৩	৮·০০
১৯৬০-৬১ (আনুমানিক হিসাব)	১০৫০	৯·০০
১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	১৪০০	১৩·০০

এ কথা আরও বলা হয়েছে (পৃঃ ৮০৭, পাদটীকা) যে ১৯৫০-৫১তে বিজ্ঞানের ছাত্র সংখ্যা যেখানে ছিল ১,৪০,০০০, সেখানে ১৯৬০-৬১ সালে এদের সংখ্যা হবে ৩,২৩,০০০। সমগ্র ছাত্র-সংখ্যার তুলনায় অনুপাত কিন্তু কমেছে। ১৯৪৯-৫০এ বিজ্ঞান পাঠরত ছাত্রদের অনুপাত ছিল শতকরা ৩৮·১, ১৯৬০-৬১ সালে তা কমে হচ্ছে শতকরা ৩৫·৮। এর অর্থ বিজ্ঞান-শিক্ষা বাড়লেও মূল ঝোঁকটা থেকে যাচ্ছে অপর দিকে। এ অবস্থার কারণ দর্শানো হচ্ছে নিম্নরূপ : (১) মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচুর প্রসার হচ্ছে ; (২) মাধ্যমিক

শিক্ষা উত্তীর্ণ হলে পর উপার্জনযোগ্য কাজ জুটছে না; (৩) মাধ্যমিক স্কুলে বিভিন্নমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা নাই; (৪) বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার প্রতি চিরাচরিত সামাজিক মোহ ও (৫) বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষায় ইচ্ছুক ছাত্র মাত্রকেই গ্রহণের জন্য সামাজিক চাপ থেকেই যাচ্ছে।

এর ফল: কলেজে ভিড়; উচ্চ-শিক্ষার পর্যায়ে অযোগ্যতা, শিক্ষার মানের অধোগতি, ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রবণতা, শিক্ষায় 'অপচয়', স্নাতক ও স্নাতক-পূর্বদের মধ্যে বেকারি।

একটা পাপচক্র সৃষ্টি হয়েছে। যথোপযুক্ত, যথা সংখ্যক বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাবে মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্নমুখী শিক্ষা, বিশেষত বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার হচ্ছে না। মাধ্যমিক স্তরে যথোপযুক্ত বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রের অভাবে--(অন্যতম কারণ হিসাবে স্বীকৃত)—উচ্চ স্তরে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার হচ্ছে না। এই পাপচক্রকে ভাঙতে না পারলে এগোনো যাবে না, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

প্রযুক্তি বিজ্ঞানে শিক্ষা

এবারে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের কথা।

তালিকা—এ

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছাত্র ভর্তি সংখ্যা—১৯৫৯ সাল

	শাখা	আসন সংখ্যা ডিগ্রী	আসন সংখ্যা ডিপ্লোমা
১।	বাস্তবিদ্যা (Civil Engineering)	৪,১৯২	১০,২৭০
২।	যন্ত্রবিদ্যা (Mechanical ")	২,৩২৫	৪,৫৭০
৩।	তাড়িত যন্ত্রবিদ্যা (Electrical Engineering)	২,৩২৯	৪,৫৮০
৪।	তাড়িত সমাযোজনা বিদ্যা (Electrical Communication Engineering)	৩৭৫	২৪০
৫।	খনিজ বিদ্যা (Mining)	২৯০	৪৫৫
৬।	ধাতু বিদ্যা (Metallurgy)	২৩৯	১০
৭।	রাসায়নিক যন্ত্রবিদ্যা ও রাসায়নিক প্রযুক্তিবিদ্যা (Chemical Engineering and Chemical Technology)	৪৮৫	
৮।	বয়ন প্রযুক্তিবিদ্যা (Textile Technology)	২৮২	৩১১
৯।	স্থাপত্য বিদ্যা (Architecture)	২৮৫	
১০।	অন্যান্য (Other Fields)	৯৭৫	৯৩০
	মোট	১১,৭৭৭	২১,৩৬৬

উপরোক্ত তালিকায় প্রযুক্তিবিদ্যার মোট প্রসার ও তার বিভিন্ন শাখার আনুপাতিক গুরুত্ব বোঝা যাবে। সেই সঙ্গে বোঝা যাবে এ দেশে শিল্পায়নের অগ্রগতির রূপ। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তিন বছর শিক্ষাক্রমের 'নিম্ন প্রযুক্তিবিদ্যার স্কুল' (Junior Technical School) খোলার পরিকল্পনা সম্প্রতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে আরও দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয়: এই শিক্ষার প্রসারে বেসরকারী উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত লোকের চাহিদা তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রায় মিটবে, চতুর্থ পরিকল্পনায় তো বটেই।

শিক্ষিত বেকার সমস্যা

শিক্ষিত বেকারের সমস্যাটি এই সূত্রেই কিছুটা তুলে রাখা দরকার।

তালিকা—ট

বৎসর	'এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' সংখ্যা	বৎসরের শেষে 'চলিত তালিকায়' (Live Register) চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা
১৯৪৭	৭৫	২,৩৬,৭৩৪
১৯৪৮	৭৭	২,৬৯,০৩৭
১৯৪৯	১০৯	২,৭৪,৩৩৫
১৯৫০	১২৩	৩,৩০,৭৪১
১৯৫১	১২৬	৩,২৮,৭১৯
১৯৫২	১৩১	৪,৩৭,৫৭১
১৯৫৩	১২৬	৫,২২,৩৬০
১৯৫৪	১২৮	৬,০৯,৭৮০
১৯৫৫	১৩৬	৬,৯১,৯৫৮
১৯৫৬	১৪৩	৭,৫৮,৫০৩
১৯৫৭	১৮১	৯,২২,০৭৯
১৯৫৮	২১২	১১,৮৩,২৯৯
১৯৫৯	২৪৪	১৪,২০,৯০১
১৯৬০	২৫৬	১৬,২০,২৪২
১৯৬১ (জুন)	৩১২	১৭,৫৫,৪৯১

উপরোক্ত তালিকাটি বিচার করতে গেলে কয়েকটি জিনিস মনে রাখা দরকার: প্রথমত, সকল কর্মপ্রার্থী নাম তালিকাভুক্ত করান না; সুযোগও পান না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের' সংখ্যা বেড়েছে, সুতরাং বেকারের সংখ্যাও বেশি তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলি সব রয়েছে শহরে; সুতরাং উপরোক্ত বেকাররাও প্রধানত শহুরে। গ্রাম্য-বেকারির ছায়া এতে সামান্যই পড়েছে। এবারে এদের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের অংশটা দেখা যাক।

তালিকা—৪

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা

বৎসর	প্রবেশিকা পাশ	ইন্টারমিডিয়েট	স্নাতক: ইঞ্জিনি	স্নাতক: মেডিক্যাল	স্নাতক: অন্যান্য	স্নাতক: মোট	সর্বমোট
১৯৫৩	১,২১,২৮৯	৭,৩৪৪	১,০৮৭	২২৫	১৯,২৩	২০,৫৪৫	১,৬৩,১৭৬
১৯৫৪	১,৪৫,০৮৯	২২,০৭১	৮৫৭	২২৫	২১,০৪	২২,১২৭	১,৮৯,২৮৭
১৯৫৫	১,৬৪,০৬১	২৫,৮৭২	৬২৮	১৭৯	২৫,৪১৭	২৬,২২৪	২,১৬,১৫৭
১৯৫৬	১,৮৬,৯৭৮	৩০,৬৪০	৪৮১	২১৩	২৬,০৮০	২৬,৭৭৪	২,৪৪,১৯২
১৯৫৭	২,৩৬,৫০৯	৩৮,৭৬২	৫১১	১৭১	৩১,৬০৫	৩২,২৮৭	৩,০৭,৫৫৮
১৯৫৮	২,৮৩,২৬৮	৪৪,৫৭৫	৫১৮	১৮৬	৩৫,৮৪৫	৩৬,৫৪৯	৩,৬৪,৩৯২
১৯৫৯	৩,৪৪,৩২৯	৪৯,১৪১	৫৯৮	১৪৩	৩৪,৯০০	৩৯,৬৪১	৪,৩৩,১১১
১৯৬০	৩,৯৯,৮৮০	৬০,৭৫৬	১,১৯০	২৬২	৪৫,১৩২	৪৬,৫৮৪	৫,০৭,২২০
১৯৬১ (জুন)	৪,৪৭,১৩৭	৬৯,৭৪০	৯৩৯	২২৬	৪৯,৫০৫	৫০,৬৭০	৫,৬৭,৫৪৭

বেকার সমস্যা ও শিক্ষিত বেকার-সমস্যার কোনো মৌলিক আলোচনা এখানে খাপ খাবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা নিয়মিত বাড়ছে। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারদের বেকারি সাময়িক। পরীক্ষা-পাশের প্রথম দিকে বেকারের দলে নাম লেখালেও অল্প দিনের মধ্যেই তারা উপার্জনে লেগে যায়। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেকারি বেশি এবং ক্রমবর্ধমান। উচ্চ-মাধ্যমিক ও কলেজী-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনায় যে কথাটা বারবার বলা

হয়েছে, এই বেকারির ক্ষেত্রেও সেটা আবার প্রমাণিত হল। দেশের শিল্পায়ন, শিক্ষার প্রকৃতির রূপান্তর—এ ছাড়া পথ নেই। সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিই, সব কমিটি, কাউন্সিল, কমিশন ও কনফারেন্সই এই কথার পুনরুক্তি করেছেন। কিন্তু অতীতের রেখা ধরে পাদচারণা করা ছাড়া, কিছুতেই আর বেরিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না।

বেরিয়ে কিন্তু আসতেই হবে। স্বাধীনতা এসেছে; গণতান্ত্রিক সংবিধান হয়েছে; শিল্পের ও শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে, সমাজতন্ত্রের আদর্শ স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু বহু প্রত্যাশিত গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসে নি। যে মৌল পরিবর্তন জনমানসকে স্বাধীনতার কামনায় উদ্বেলিত করেছিল, সে পরিবর্তন আজও আসে নি। পুরনো চিন্তা ও নক্সার বাধা ভেঙ্গে নতুন সৃষ্টির জগতে বেরিয়ে আসতে হবে—এই হল আজকের ভারতের দাবি। আগে কৃষির সম্বন্ধে বলেছি। শিল্পায়ন সম্বন্ধে বলতে চাই: দেশের মানুষের শিক্ষা ও চিন্তাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাভিমুখী করে তুলতে হবে শিল্পায়নেরই খাতিরে। কমিশনের দপ্তরে বসে কটা নতুন কারখানায় কত নতুন শিক্ষিত শ্রমিক-কর্মচারী লাগবে, এ হিসেবে পরিকল্পনার অগ্রগতির হার খুঁড়িয়েই চলবে। নতুন চিন্তায় অনুপ্রাণিত মানুষ চাই। ব্যাঙ্ক তো জাতীয়করণ করবেন বলছেন। দেশের কাঁচা মাল, যেমন আকরিক লোহা, বিদেশে পাঠাবার দরকার নেই। শিক্ষিত যুবকদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দিন, ছোট কারখানা, মাঝারি কারখানা, ব্যক্তিগত মালিকানা বা ইনডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ গড়ে উঠতে দিন, শিল্পায়নের কাজে সাধারণ মানুষের উদ্যোগকে বন্ধনমুক্ত করে দিন—শিল্পায়নের হার বাড়বে। আধুনিক অগ্রবর্তী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা সম্ভব হবে। গণতন্ত্রের ভিত্তি হবে দৃঢ়। আজকে তাই শিল্প বিপ্লবের জন্যে, তারই পাশাপাশি চাই শিক্ষা-বিপ্লব—শিক্ষার জন্যে Crash Programme!

অবশ্যই তার জন্য ত্যাগস্বীকার করতে হবে। প্রথম পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে খরচ হয়েছিল ১৬৪ কোটি টাকা বা মোট খরচের শতকরা ৭ ভাগ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তার পরিমাণ ছিল ৩০৭ কোটি টাকা বা শতকরা ৬৪ ভাগ। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছে ৬০ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা ৭·৫ ভাগ। মৌলিক পরিবর্তন আনতে গেলে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন আছে। শিক্ষার বিষয়টা উপেক্ষণীয় এ কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না! প্রশ্ন

হচ্ছে আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে। আমার ধারণা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষা বর্তমানে যে গুরুত্ব পাচ্ছে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি গুরুত্ব তার প্রাপ্য অন্য ক্ষেত্রে সেজন্যে ত্যাগস্বীকার করতে আমরা প্রস্তুত আছি কি ?

নিরক্ষরতার চাপ

আরও দুটি বিষয় উত্থাপন করে এ আলোচনায় ছেদ টানতে চাই। প্রথমটি হল নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানের কাহিনী। সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় 'সাক্ষর', অর্থাৎ, লিখতে-পড়তে-জানা লোকের অনুপাত হল এইরূপ :

তালিকা ড

জনসংখ্যার তুলনায় সাক্ষর লোকের শতকরা অংশ

		১৯৫১	১৯৬১
পুরুষ	...	২৪.৯	৩৩.৯
নারী	...	৭.৯	১২.৮
মোট	...	১৬.৬	২৩.৭

।९, ১০ বছরে লিখনপঠনক্ষম লোকের অনুপাত বেড়েছে শতকরা ৭.১ ভাগ ; এর মধ্যে পুরুষদের মধ্যে বেড়েছে শতকরা ৯ ভাগ এবং মেয়েদের মধ্যে বেড়েছে শতকরা ৪.৯ ভাগ।

এ অবস্থা পরিবর্তনের উপায় ছিল দুটি : প্রথমত, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ; দ্বিতীয়ত, ব্যাপকভাবে গণ-সাক্ষরীকরণ অভিযান (mass literary campaigns) চালিয়ে। স্বাধীনতার পর সরকার কতক কতক এলাকায় দ্বিতীয় কাজটি শুরুও করেছিলেন। কিন্তু সে কর্মতৎপরতা জিইয়ে রাখা যায় নি। বর্তমানে প্রথমটির ওপরই ভরসা রাখা হচ্ছে। অবশ্য প্রাপ্তবয়স্কের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকার এখনও বছরে ৫০ হাজার কেন্দ্র চালান ; তাতে ১২ লাখ লোক ভর্তি হয় ; সরকারের তাতে বছরে গড়ে ৮০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। তবে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি এখন পালটিয়েছে। তাঁরা নিরক্ষরকে শুধুই সাক্ষর করার ওপর জোর দিচ্ছেন না। তাঁরা মনে করেন, লেখা-পড়া শেখানোর পাশে পাশে নাগরিকতা-শিক্ষা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের স্থান সম্পর্কে সচেতনতা,

বৃত্তি-শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ে চর্চার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই কার্যক্রমকে তাঁরা সামাজিক শিক্ষা নামে অভিহিত করে 'কমিউনিটি ডেভালাপমেণ্ট' পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সরকারী কার্যক্রম তার নিজস্ব চালে চলতে থাকুক। সে বিষয়ে এখানে বিশেষ আলোচনা করতে চাই না। শুধু প্রশ্ন জাগে: বেসরকারী পরিকল্পনা এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে না কেন? গণতন্ত্রে বিশ্বাসবান রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন ও সাধারণ শিক্ষিত নাগরিকের এ ক্ষেত্রে কোনো গণতান্ত্রিক দায়িত্ব নেই কি?

স্ত্রীশিক্ষা

এবার সর্বশেষ প্রসঙ্গ: স্ত্রীশিক্ষা!

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে ১৯৬১ সালে ভারতবর্ষে শতকরা ১২·৮ জন নারী লিখতে পড়তে জানেন।

কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা কতটুকু এগিয়েছে তা নিচের তালিকায় পাওয়া যাবে।

তালিকা চ

বিভিন্ন শিক্ষা-ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা

শিক্ষাক্ষেত্র	১৯৪৯-৫০	১৯৫৮-৫৯
প্রাথমিক শিক্ষা (১ম-৫ম শ্রেণী)	৫১,৩২,৬০৭	৯৬,৬৩,৭২৬
মধ্যশিক্ষা (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী)	৪,৬১,৯৬১	১২,৩৯,৯৬৯
উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা (৯ম-১১শ শ্রেণী)	১,৪০,৩৬৬	৪,৩৪,৯২৪
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	৩৬,০৪০	১,২৪,৬৬৭
কৃষি কলেজ	১৩	৯৫
বাণিজ্য কলেজ	১১১	৫৮০
এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৮	১৫০
আইন কলেজ	২২৬	৫৯৭
মেডিক্যাল কলেজ	২০১৬	৫৮৬৭
শিক্ষক-শিক্ষন কলেজ	১৬২০	৮১৭০
প্রযুক্তিবিদ্যা কলেজ	১৯	১৬
পশুচিকিৎসা-বিজ্ঞান কলেজ	৫	১৬৬

শিক্ষাক্ষেত্র	১৯৪৯-৫০	১৯৫৬-৫৯
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	৭৭১	৫৯৭৩
বৃত্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার স্কুল	৩৫,৭৬০	৬৯,৯৪৩
কৃষি স্কুল	১৫	৫৩
চারু ও কারুশিল্পের স্কুল	৬,৩৫৩	১২,০১১
বাণিজ্য স্কুল	১,৯৮৫	৩,৪৭৮
এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	৬	১১৫
প্রযুক্তি ও শিল্পবিজ্ঞান স্কুল	৭,৭৭৭	১৩,৮২৩
শিক্ষক-শিক্ষন স্কুল	১৬,৯৮০	২৪,৬৭১

তালিকা 'ছ'তে আমরা আগেই দেখেছি যে ১৯৬০-৬১ সালে ৬-১১ বছরের মেয়েদের শতকরা ৪০'৪ ভাগ, ১১-১৪ বছরের মেয়েদের শতকরা ১০'৮ ভাগ এবং ১৪-১৭ বছরের মেয়েদের শতকরা ৪'২ ভাগ স্কুলে পড়তে পারছে। এর থেকে বলা যায় যে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মেয়েই ১১ বছরের পরে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। হয়তো বা তারও আগে থেকেই। কারণ, আমরা জানি '৬-১১' বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'অপচয়ের' পরিমাণ যথেষ্ট। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ হয়তো এ হার শতকরা ৮৫-তে দাঁড়াবে। অগ্রগতির এই শামুকের চালে গণতন্ত্রের শক্তির কী অসম্ভব অপচয় তা হিসেব করা শক্ত নয়। সংগঠিত নারী আন্দোলন ছাড়াও, জনসংগঠনগুলিরও কি এ সম্বন্ধে কোনো বক্তব্য থাকবে না ?

তবু তালিকা 'ঢ'-এর গুরুত্ব আছে। ১৪-১৭ বছরের মেয়েদের শতকরা ৩-৪ অংশ যা স্কুলের গণ্ডী পেরোচ্ছে, তাদেরই একটা অংশ কোনো উচ্চ শিক্ষার দিকে যাচ্ছে তার কিছুটা ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে। কিছু কিছু মেয়েরা যে কৃষি, এঞ্জিনিয়ারিং, বাণিজ্য, আইন ও পশু চিকিৎসার কলেজে পড়তে শুরু করেছে, এটা আনন্দের কথা। ভবিষ্যতের ওপর এর ছাপ পড়বে। কলা ও বিজ্ঞান কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও শিক্ষক-শিক্ষন কলেজে মেয়েরা আগেও পড়ত, এখন আরও বেশি-করে পড়ছে। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক স্কুলেও মেয়েদের ভিড় বেশ বাড়তে শুরু করেছে। শুধু পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার নয়, স্বতন্ত্র উপার্জনের ক্ষমতা সমাজে মেয়েদের গণতান্ত্রিক স্থান নিশ্চিত করবে। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থার তুলনায় এগিয়ে চলার গতি কী মন্থর! দেশের এই অর্ধেক মানুষের জন্য গণতন্ত্রের আবাহন হবে কবে ?

টীকা

১. *Central Advisory Bodies :—*

(1) Indian National Commission for Cooperation with Unesco (1949), (2) Advisory Board for Social Welfare (1951, 1954), (3) Board of Scientific Terminology (1950), (4) Central Board of Physical Education (1950, 1956), (5) Hindi Siksha Samiti (1951), (6) National Board of Audio-Visual Education (1953), (7) All India Council for Sports (1954, 1959), (8) National Advisory Council for the Education of the Handicapped (1955), (9) All India Council for Secondary Education (1955), (10) National Council for Rural Higher Education (1956), (11) Central Committee for Educational Research (1957), (12) All India Council for Elementary Education (1957), (13) Children's Literature Committee (1958), (14) National Council for Women's Education (1959), and (15) Central Sanskrit Board (1959).

২. *Annual Publicatians :—*

(1) Education in India (in 2 volumes), (2) Education in the States, (3) Education in Indian Universities, (4) Directory of Institutions of Higher Education.

Quarterlies Published :—(1) Education Quarterly, (2) Secondary Education, (3) Youth, (4) Indian Journal of Educational Administration and Research.

৩. *Universities :—*

(1) Agra University (1927), (2) Aligarh Muslim University (1921), (3) Allahabad University (1887, Re 1921), (4) Andhra University (1926), (5) Annamalai University (1929), (6) Banaras Hindu University (1916), (7) Baroda University (1949), (8) Bihar University (1952, Re 1960), (9) Bhagalpur University (1960), (10) Bombay University (1857, Re 1928, 1953)' (11) Burdwan University (1960), (12) Calcutta University (1857, Re 1951, 1954), (13) Delhi Uninersity (1922, Re 1952), (14) Gauhati University (1948), (15) Gorakhpur University (1957), (16) Gujarat University (1949), (17) Indira Kala Sangeet Vishvavidyalaya (1956), (18) Jabalpur University (1957), (19) Jadavpur University (1955), (20) Jammu and Kashmir University (1948), (21) Kalyani University (1960), (22) Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University (1961), (23) Karnatak University (1949), (24) Kerala University (1937, Re 1957), (25) Kurukshetra University (1956), (26) Lucknow University (1921), (27) Madras University (1857, Re 1904, 1925, 1929), (28) Marathwada University (1958), (29) Mysore University (1916), (30) Nagpur University (1923), (31) Osmania University (1918, Re 1947, 1950, 1950), (32) Punjab University (1947), (33) Patna University (1917, Re 1952,

1960), (34) Poona University (1949), (35) Rajasthan University (1947), (36) Ranchi University (1960), (37) Roorkee University (1949), (38) Sardar Vallabhbhai Vidyapeeth 1955), (39) Saugar University (1946), (40) S. N. D. T. Women's University (1957), (41) Sri Venkateswara University (1954), (42) U. P. Agricultural University (1960), (43) Utkal University (1943). (44) Varanaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya (1958), (45) Vikram University (1957), (46) Visva-Bharati University. (1951).

৪.

(1) National Chemical Laboratory, Poona; (2) Central Food Technological Research Institute, Mysore; (3) Regional Researeh Laboratory, Hydrabad; (4) National Aeronautical Laboratory, Bangalore; (5) Central Indian Medicinal Plants Organisation, New Delhi; (6) National Physical Laboratory, New Delhi; (7) Central Road Research Institute, New Delhi; (8) Indian Institute of Biochemistry and Experimental Medicine, Calcutta; (9) National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur; (10) Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta; (11) Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi; (12) Central Public Health Engineering Research Institute, Calcutta; (13) Central Fuel Research Institute, Jealgora; (14) Central Drug Research Institute, Lucknow; (15) Regional Research Laboratory, Assam; (16) National Botanical Garden, Lucknow; (17) Central Mining Research Station, Dhanbad; (18) Central Scientific Instruments Organisation, New Delhi; (19) Central Salt Research Institute, Bhavnagar; (20) Regional Research Laboratory, Jammu; (21) Central Building Research Institute, Roorkee; (22) Central Electronic Engineering Research Institute, Pilani; (23) Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur; (24) Central Leather Research Institute, Madras; (25) Birla Industrial and Technological Museum, Calcutta; (26) Central Scientific Instruments Organisation, Delhi.

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

অঙ্গন থেকে প্রাঙ্গনে

আমাদের বাল্যকালেই কিন্তু এসব শিক্ষকেরা একে-একে বিদায় নেন। কারণ, সরকারী শিক্ষাবিভাগের নিয়মে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের তুলনায় এঁদের বিদ্যা তুচ্ছ। দেশে শিক্ষার জোয়ার লাগছিল, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৎসরে বৎসরে বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষা বিভাগের নিয়মের ফাঁসও তাই কঠিন থেকে কঠিনতর করে বাঁধা আরম্ভ হয়েছিল—হয়তো তা আরম্ভ হয়েছিল 'ফুলার্রি আমল' থেকেই পূব বাঙলায়। বাল্য ছাড়িয়ে কৈশোরে যখন পৌছচ্ছি তখন স্কুলটার আরও ভাগ্য-বিবর্তন ঘটল। স্কুলের তখন ছাত্রভাগ্যে সুদিন—এই ছাত্র-ঐশ্বর্যবান্ স্কুলটার সামনে এমন সময় সরকারী সাহায্যের প্রস্তাব এল—দুর্দিনে তার নামগন্ধও পাওয়া যায় নি। টোপটি স্কুলের হেডমাস্টার ও পরিচালকরা সোৎসাহে গলাধঃকরণ করলেন। কারণ, কাঁচা টিনের চালার ও বাঁশের বেড়ার ঘরের পরিবর্তে প্রকাণ্ড পাকা বাড়ি উঠবে সরকারী সাহায্যে. মাস্টারমশায়দেরও বেতনের হার এক লাফে অনেক উঁচুতে উঠবে। সত্যই তা হল। কিন্তু তা হতে না হতেই স্কুলের সাহায্য-শর্তানুযায়ী কয়েকজন শিক্ষক বলি গেলেন, তাঁরা 'ট্রেনড্' নন। অনেক নতুন শিক্ষক এলেন। বহুদিনের হেডমাস্টার মহাশয়ের উপরেও আনা হল এক নতুন হেড মাস্টার। কারণ তিনি বি-এও নন, মাত্র সেদিনের বি. এ. ফেল।

বি. জি. নাগরকার মরহাট্টি ব্রাহ্মণ। খ্যাতি ও অখ্যাতিতে ভদ্রলোক মনে রাখবার মতো মানুষ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন; প্রার্থনা সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগদানও করেছিলেন, ছিলেন সেখানে নববিধান সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি খ্যাতনামাদের কনিষ্ঠ সহকারী। কি করে তারপর কি ঘটে

তা অনিশ্চিত। কিন্তু কুড়ি বাইশ বছর পরে পূর্ব বাঙলার এক গ্রামে বি. জি. নাগরকর এসে ঠেকেছিলেন হেড মাস্টাররূপে—খ্যাতি হার্ভার্ডের বি. এ.। খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী, এক খ্রীষ্টান মহারাষ্ট্রীয় ডাক্তার মহিলার স্বামী, গুটি তিন কিশোর কিশোরীর পিতা। এখানে তিনিই প্রথম উদিত হলেন, এ স্কুলের নববিধানের হেড মাস্টার। জীবনযাত্রায় তিনি সাহেব, ইংরাজিতে কেতাদোরস্ত, এমন কি সাহেবদের ক্লাবের একমাত্র ভারতীয় মেম্বর। ইতিমধ্যে তাঁর জীবনে যা ঘটেছিল তাও শীঘ্রই বোঝা গেল—তা বিলিতী আদব-কায়দার সঙ্গে বিলিতী মদের প্রবলতর প্লাবন। আয়টা সাহেবদের মতো নয়, কাজটাও স্কুলমাস্টারি ; তার ওপরে এমন মুহূর্তে যখন একজন সম্মানিত পুরাতন হেড মাস্টার হলেন অপদস্থ, এমন শহরে যেখানে টেম্পারেন্স সোসাইটির রিপোর্টে পড়েছি দশ বৎসরে মাত্র একটি লোক মাতলামোর জন্য গ্রেফতার হয়েছিল। অন্তত আমরা তো ও শহরে মেথরদের ছাড়া বিশেষ কাউকে মাতলামো করতে দেখি নি। মুসলমানদের তো মদ্যপান ধর্মে নিষিদ্ধ, হিন্দু ভদ্রলোকেরও তা সর্বথা পরিত্যাজ্য। নাগরকর মহাশয়ের শাসন শৃঙ্খলা, খেলাধুলায় উৎসাহদান, ইংরেজি বিদ্যা, বিশেষ করে ইংরেজি বাগ্মিতা পুষ্ট ছিল। তাঁর মুখে কেশব সেন বিষয়ে টাউন হলে যে বিস্ময়কর বক্তৃতা শুনি জীবনে তাই আমার শোনা প্রথম উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজি বাগ্মিতা—কিছুতেই কিন্তু শিক্ষিত সমাজে আর তিনি শ্রদ্ধাভাজন হতে পারলেন না। তার ওপরে বছর না ঘুরতেই দেখা গেল—সেই অপদস্থ পুরনো হেডমাস্টার মহাশয় বৈষয়িক দুর্দিনে তাঁরই বিরূপতায় পেলেন অবকাশ গ্রহণের নির্দেশ। এর পরে নাগরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধে সাধারণের ও ছাত্রদের ধূমায়িত বিরূপতা অশোভন আক্রমণে প্রচণ্ড হয়ে দেখা দেয়। তিনিও এ শহর থেকে বিদায় নিয়ে বহরমপুর কলেজে ইংরেজি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর অধ্যাপনায় সুনাম হয়েছিল শুনেছি, কিন্তু গোলযোগ বাধল বিশ্ববিদ্যালয় যখন দেখতে চাইল তাঁর হার্ভার্ড-এর ডিপ্লোমা। এমন দুর্যোগ পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও প্রিন্সিপাল-প্রফেসরের ঘটেছে। কেউ পার পেয়েছেন, কেউ পান নি। নাগরকার সেই যে অন্তর্হিত হলেন আর তাঁর খোঁজ কেউ এদেশে জানে না। আমাদের স্কুলে তিনি ধূমকেতুর মতো এসে ধূমকেতুর মতো মুছে যান—পুচ্ছ তাড়নায় তিনিও রেখে যান একটা কলঙ্করেখা, জ্বালিয়ে যান ছাত্রদের মধ্যেও কয়েকটা অশোভন বিক্ষোভ।

নাগরকারী পর্বে যাঁরা স্কুল থেকে বিদায় নেন তাঁদের মধ্যে দু-একজনার কথা সকলের মনে থাকবে, বিশেষত হেডমাস্টার গিরিজা ঘোষ মহাশয়ের কথা। দাদারা তখন কলেজে পড়েন—হেড্‌মাস্টার গিরিজাবাবুকে সেই ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে সকৌতুক শ্রদ্ধায় বলতেন 'জ্যেঠামশায়'। তাঁরা এই হেড্‌মাস্টার মশায়ের বিদায়-অভিনন্দন দিলেন টাউন হলে অত্যন্ত বড়ো করে সভা ডেকে—তাতে স্কুলের পরিচালকদের অন্যায়ের প্রতি কটাক্ষ করতেও এই কলেজে-পড়া ছাত্ররা ছাড়লেন না। ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁকে উপহার দিলেন সোনার দোয়াত-কলম। বৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য বাগ্‌-নৈপুণ্যহীন হেড্‌মাস্টার মহাশয় অভিভাষণের প্রতিবেদনে যা বললেন তা অত্যন্ত শান্ত, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অনাড়ম্বর। শুধু এই: "তোমরা আমার পুত্র-তুল্য। তাই আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর কালে তোমাদের মনে করিয়ে দিই পিতামাতা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ো না। তোমাদের তিনটি গল্প বলি।" বলে প্রথম বললেন, আলেকজেণ্ডারের কথা। দেশ থেকে সেনাপতি তাঁর মায়ের উগ্রতায় উত্যক্ত হয়ে অভিযোগ করে পাঠালে আলেকজেণ্ডার বললেন, "সেনাপতি জানে না—আমার মায়ের এক ফোঁটা চোখের জলে তার সমস্ত অভিযোগ ভেসে যাবে।" দ্বিতীয় গল্প শিবাজীর—মারাঠী সেনাধ্যক্ষরা মোগল দুর্গ দখল করে শত্রুর পরমা রূপসী নারীকে তাঁর কাছে এনেছেন উপঢৌকন। শিবাজী দেখলেন, বললেন, "মা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি যদি তোমার সন্তান হতাম তাহলে আমিও কত রূপবান হতাম। তুমি যাও—তুমি এদের অপরাধ নিও না।" তৃতীয় গল্পটি অনুরূপ—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃভক্তির একটি কাহিনী। "তোমাদের কাছে এই আমার শেষ শিক্ষা।" বলে হেড্‌মাস্টার মহাশয় বসে পড়লেন। একটি কথা বেশি নয়, একটি কথা কম নয়। সে সময়ে, সে পরিবেশে, এই অনাড়ম্বর মানুষের এই ভাষণের যে ছাপ পড়েছিল এত কালেও তা যখন সেদিনের বালকের মন থেকে মুছে যায় নি, তাতেই তার মূল্য অনুমান করা যায়। মানুষেরও তাতে কিছু মূল্য কি বুঝা যায় না? কিন্তু সত্যই তিনি পড়াতে পটু ছিলেন না, স্কুল পরিচালনারও শ্রী-ছাঁদ কৌশল সবই ছিল অনায়ত্ত। মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজের একটু ছোঁয়াচ তাঁর গায়ে লেগেছিল—কপটতা জানতেন না। তাঁরই আমলে স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়—দেশ তখন শিক্ষার জন্য পাগল, আর এই বেসরকারী স্কুল তাদের জন্য প্রথম দ্বার মুক্ত করে দেয়। পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র বইএর দোকান খুলে এই বৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য হেড্‌মাস্টার বৃহৎ

পরিবারের বোঝা যখন বহন করছেন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন নির্জীব ভাবে,—স্কুল যখন নতুন নতুন শিক্ষক দিয়ে জোর কদমে চলেছে—তখন পৃথিবীর বহু বহু অর্থহীন ট্রাজিডিরই নিঃশব্দ নিদর্শন ছাড়া তাঁকে আর কিছু ভাবা সম্ভব হত না।

যে মাস্টারমশায়রা সরকারী সাহায্যের শর্তে অযোগ্য বিবেচিত হচ্ছিলেন তাদের একজন সংবাদটা শোনামাত্রই পদত্যাগ করে চলে যান। তিনি বয়সের ও অবস্থার জোরে জয়ী হয়ে যান এই কারণে। বিনোদবিহারী দাস নর্ম্যাল পাশ বা পড়া, বাঙলা শিক্ষক, বয়স বেশি নয়। শহরে তাঁর দাদার ছিল হাতা-কড়া থেকে নানা গৃহ-উপকরণের ভালো দোকান। কিন্তু বিনোদবাবুর গুণ ছিল, আর শিক্ষার অনুরাগ ছিল। তাই দোকান চালাতে এসে তা ছেড়ে স্কুলের কাজে লেগেছিলেন। আর যেই সরকারী ব্যবস্থার কথা জানলেন অমনি দোকানে ফিরে গেলেন। যাবার সময় আমাদের ক্লাশে শেষবারের মতো অন্য উপদেশ দেবার সময় বললেন, "আমি দোকান দেখব বলেই এসেছিলাম। তারপর শিক্ষার আকর্ষণে এ কাজ নিই। ভুল আগেই বোঝা উচিত ছিল—দোকান পরিচালনাতেই এখন ফিরে যাব। একটা কথা মনে রেখো—চাকরি যতো বড়ই হোক, তা চাকরের কাজ। স্বাধীনবৃত্তিতে কষ্ট পেলেও অমর্যাদা নেই।" চাকর-রাজার দেশে এই বিদ্যাসাগরী মনোবৃত্তি একটা ব্যতিক্রম, কিন্তু তা ছিল। বিনোদবাবুর স্নেহদৃষ্টি সেই দোকান থেকেও আমাদের অভিসিঞ্চিত করত। বুঝতাম তাঁর মনে খেদ নেই। কিন্তু দেখতাম স্কুলের পুরাতন সহযোগী শিক্ষক ও ছাত্রদের সাহচর্য তখনো তাঁকে আনন্দ দেয়। আমাদের ছাত্রদের রায় যদি কর্তৃপক্ষের নিয়মের কাছে অবান্তর না হত তা হলে বলতাম—বিনোদবাবুর মতো সুযোগ্য শিক্ষক আমরা আর বেশি পাই নি। সেদিনের নর্ম্যাল স্কুল থেকে তাঁরা ইংরাজি বুলি শিখতে পান নি, কিন্তু শিখেছেন তখনকার অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান—আমাদের স্কুল-কলেজে যা শিক্ষার সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। বঙ্গ পণ্ডিতমহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও জ্যামিতির বিদ্যায় সকলকে চমৎকৃত করতেন। বিনোদবাবু যুবক, তখনো ত্রিশের নিচে—কিন্তু দীর্ঘদেহ, গম্ভীর হলেও প্রসন্ন শ্যামবর্ণ এই মাস্টারমশায়ের মুখে ছিল ব্যক্তিত্বের ছাপ। আর কাজে শৃঙ্খলা, সুচারু পাঠন-শক্তি। তিনি বাঙলা পড়াতেন। প্রায় অখাদ্য পাঠ্য বইগুলিকে তিনি সহনীয় করে তুলতেন। সবচেয়ে বড় কথা—স্কুলে তখন দু-একখানা বাঙলা

মাসিকপত্র আসত, সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের 'সাহিত্য' তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতমহাশয় এসব মাসিকপত্রের পাঠক ছিলেন বলাই যথেষ্ট নয়। তিনি পড়ার অবসরে এসব মাসিকপত্র থেকে আমাদের নানা বিষয় পড়ে শোনাতেন। উচ্চারণ স্বচ্ছন্দ, কণ্ঠ গম্ভীর সরস, ছাত্রদের তাঁর পাঠ আকর্ষণ করত। কিন্তু পড়তেন কী বিষয়? রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একাধিক সদ্য-প্রকাশিত প্রবন্ধ। সে প্রবন্ধ কি আমরা বুঝতাম? মুগ্ধ হৃদয়ে সকলে শুনতাম, কৃতার্থ হতাম। আর নিঃসঙ্কোচে বলি কিশোর মনের বুঝবার শক্তিকে অবজ্ঞা না করে বিনোদবাবু যে তার বিকাশের আহ্বান দিয়েছিলেন, তাতে তিনি ভুল করেন নি,—পঞ্চাশ বৎসর পরেও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করব—তিনি অমৃতের বার্তা আমাদের কারো কারো মনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষের নিয়মের শর্তে তিনি অযোগ্য—না হলে আমাদেরও 'সাহিত্যে'র পক্ষে যোগ্য শ্রোতা বিবেচনা করেন!

শিক্ষক নতুন যারা এসেছিলেন নিয়মানুযায়ী তাঁরা যোগ্য। কেউ কেউ তা সত্ত্বেও যোগ্য এবং মানুষ। কিন্তু অনেকেই দু-এক বৎসর পরে অন্যত্র চলে গেলেন। তখন শহরে আরেকটি বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অরুণ স্কুল পাইকপাড়ার জমিদার অরুণচন্দ্র সিংহের প্রতিষ্ঠিত, তাঁরই নামাঙ্কিত। আমাদের ভালো শিক্ষকরা সেখানে অনেকে গেলেন—ছাত্ররাও অনেকে সে স্কুলে গেল। বাবা সে স্কুলেরও পরিচালকমণ্ডলীর একজন। কয়েক বৎসর পরে পরে তিনি ভুলুয়ার কার্যভার নিলে (১৯২০?) তার সম্পাদকও হন—স্কুলটি ক্রমেই খ্যাতিলাভ করে। কিন্তু সরকারী পক্ষের নানা অনুরোধ প্রলোভন সত্ত্বেও সে স্কুলকে তিনি সরকারী সাহায্যের রূপোর শিকল গলায় পরতে দেন নি। জুবিলী স্কুল শেষ পর্যন্ত (১৯২১?) অস্তমিত হলে তার শিক্ষক ও ছাত্ররা অরুণ স্কুলে যোগদান করে—সে আমাদের কালের অনেক পরে। আমরা কিন্তু জুবিলী স্কুলেই থেকে গেলাম। সে স্কুলে পড়াশুনার খ্যাতি নেই, ভালো ছেলেরা ওখানে প্রতিযোগিতার সুযোগ পায় না, ছাত্ররা খ্যাত দুর্দান্ত বলে, শৃঙ্খলা শিথিল আর উপকরণও অপ্রচুর। এমনি একটা শহরের 'গুণ্ডা ছেলের স্কুলে' অভিভাবকরা আমাদের সমর্পণ করে দিয়েছিলেন, ও স্কুলের সঙ্গে সম্পর্কটা ভাঙতে চান নি। মনে হয় তাতে অন্যায় হয় নি—এই ঢিলেঢালা বেসরকারী স্কুলের সেই মুক্ত হাওয়ায় আড়ষ্ট হয়ে থাকি নি, তথাকথিত ডিসিপ্লিন নামীয় জুজুর ভয় ছিল না। কিন্তু সুযোগও ছিল অনেক

দিকে সংক্ষিপ্ত। ম্যাপ, গ্লোব পর্যন্ত স্কুলটায় বিশেষ ছিল না, ভূগোল প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়ানো হত না—অথচ ভূগোল ছিল আমার প্রিয় বিষয়। লাইব্রেরি যৎসামান্য, ছাত্ররা কেন, মাস্টারমহাশয়রা অনেকেই সে সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। আমাদের অবশ্য সে অভাব ভুগতে হয় নি, তা অন্য কারণে। খেলায় ছিল ছেলেদের বিশেষ উৎসাহ, আর তাতে আমরাও ঝুঁকে পড়ি। অবশ্য দেখেছি তাতেও আমরা জিলা স্কুলের কাছে অনেক সময়ে হেরে যেতাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার কাছে এখনো জুবিলী স্কুলের সেই স্বতঃস্ফূর্ত দুরন্তপনায় ক্রমঃস্ফুরিত দিনগুলিই স্কুলের জীবন। সেখানকার সতীর্থ ও শিক্ষকেরা আমার কম দৌরাত্ম্য ভোগ করেন নি। স্কুলের সেই দুরন্তপনার ছাপ তো কলেজে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মুছে গিয়েছিল—সেখানে সন্তর্পণে পা ফেলতে হত। কারণ সেই ক্ষমাশীল শিক্ষক ও সহপাঠীরা তো আর এখানে নেই। কলেজে আমার অশান্তপনার ক্ষমা কে করবে—যে ক্ষমা না চাইতেই জুবিলী স্কুলে পেতাম ?

ত্রিপুরাকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন বাবার সহযোগী শিক্ষক। বি. এ. ফেল এই খ্যাতনামা শিক্ষক মহাশয় অঙ্ক, সংস্কৃত, ইংরেজি তিন-তিনটি বিষয়েই চৌকোস। আর ছেলেদের পাশ করাবার বিদ্যায় অদ্বিতীয়, এই ছিল তাঁর নাম। তা মিথ্যা নয়। অন্য স্কুলের ছেলেরাও সন্ধ্যায় তাঁর টিউশানির ক্লাশে পড়ত। আর আমাদের বাড়ির আমরা সেই সন্ধ্যার টোলেরই ছাত্র। কিন্তু ছেলে বয়সে তাঁর সঙ্গে 'জ্যেঠা' ছেলের মতো অবাধে তর্ক করতাম। তিনি আমাদের দু'টি কথা শুনিয়েছিলেন—সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারতে কী আছে আর কী নেই, দ্বিতীয় কথা ব্যাকরণ বলতে পাণিনি। তৃতীয় একটি বিষয়ও তাঁর মুখে শুনতাম—পুরাতত্ত্ব ও বৈদ্যজাতির মাহাত্ম্য—সম্ভবতঃ তা তাঁর সংগৃহীত স্বর্গীয় উমেশ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসরণে। এইগুলো ছিল আমাদের একই কালে কৌতূহলের ও সন্দিগ্ধ পরিহাসের বিষয়। ক্লাশে পড়বার ইচ্ছা না হলে আমরা তুলতাম গল্প : "স্যর। রাম কি সত্যই বড় বীর ছিলেন ?" "কেন ? তোদের সন্দেহ কিসে ?" ত্রিপুরা গুপ্ত মহাশয় হেসে বলতেন, "মূল রামায়ণ পড়লে দেখবি—" কি দেখব তাতে একঘণ্টা অনায়াসে কেটে যেত। বলতেন, "যত আমাদের দেশের পণ্ডিত দেখিস—সব ঐ কলাপ। পাণিনি চোখেও দেখে নি।" মূল রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধেও ঐরূপই ছিল তাঁর বক্তব্য—ও না পড়লে সংস্কৃত পড়া কেন ? কখনো ক্লাশে তুলতাম যুদ্ধের কথা। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ

চলছে—আমরা সকলেই জার্মান পক্ষ, তিনি ইংরেজ পক্ষ, "স্তর জেপলিন লণ্ডনে বোমা ফেলছে—" "হুঁ! ইংরেজও বড় দুর্ধর্ষ—কখনো হার মানে না।" অমনি যুদ্ধ বর্ণনা আরম্ভ হত। তিনি ন্যাপোলিয়নের ভক্ত—কিন্তু এ্যাবোট্-এর জীবনী না পড়লে কি ন্যাপোলিয়নকে বুঝা যায়? ক্লাশে অবশ্য পড়াশুনা প্রায়ই হত না। কিন্তু ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য তৈরি করতে তিনি জানতেন। খাতা দেখে লেখা শুদ্ধ করতে ছিলেন সুদক্ষ। আমি তো সেই সূত্রে তাঁর এত আপনার হয়ে গিয়েছিলাম যে, পরবর্তী কালেও ছাত্রজীবনের ফলাফল তাঁকে জানিয়েছি। তিনিও তাঁর ছেলেদের থেকে নিতেন আমার কুশলবার্তা। এ শিক্ষকের জাত কি লোপ পেয়ে গিয়েছে?

জাত-শিক্ষক আরেকজনের কাছে আমরা দু ভাই পড়েছি। তিনি জুবিলী স্কুলের শিক্ষক, পরে অরুণ স্কুলেও যোগ দেন। তবে তিনি শুধু শিক্ষক নন, একাধারে আত্মীয়, অভিভাবক আর ক্ষমাশীল পরিচালক। তিনি স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--প্রিন্সিপ্যাল অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতী সন্তানদের পিতা। এই বাড়ুজ্জেদের সঙ্গে কুলগত একটা কুটুম্বিতা ছিল, কিন্তু তা বহুগুণ হয়ে দাঁড়ায় বিদেশে বাদামতলার দীর্ঘ প্রতিবেশিকতায়। বাঁড়ুজ্জেদের আমরুজ গাছ ছিল আমাদের গ্রীষ্মের অবকাশ যাপনের কোটর। অফুরন্ত আমরুজ কচি থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা খেয়ে শেষ করতে পারতাম না। পরে তাঁরা বাসাবাড়ি তুলে পরিবার পাঠিয়ে দেন দেশে, সুরেশদা প্রায় পনের বৎসর বিশ বৎসর আমাদের বাসাবাড়িতেই বাস করতেন—আমাদের দু ভাইর পড়াশুনা তদারক করতেন। সেদিনের এনট্রেন্স উত্তীর্ণ হয়ে অবস্থার বিপাকে তাঁকে প্রথম যৌবনেই জীবিকার্জন করতে হয়—২০।২৫ টাকায় তিনি স্কুলের ক্লার্ক-কাম-টিচার। অভাবের সংসারে তদুপরি দু বেলা টিউশনি ছাড়া পথ নেই। সেই শনিগ্রহে ইচ্ছা থাকলেও ২০ বৎসর এরূপ সামান্য শিক্ষকতাতেই তার দিন কাটে। তারপরে আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা দিলেন, পাশ করলেন। বলাবাহুল্য, তাঁর তখন কিছুটা পদ প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হোল কিন্তু তাঁর বিদ্যার, বুদ্ধির, বহুবিষয়ে সাধারণ ঔৎসুক্যের ও জ্ঞানের যে সুনিশ্চিত পরিধি বহু বহু পূর্বে রচিত হয়েছিল, পূর্বেকার বিশ বৎসরে ও পরেকার বাকী জীবনে তিনি তার আর্থিক সামাজিক কোনো দাম পান নি। একটা কারণ, তিনি আদায় করতে জানতেন না তাই সর্বস্বীকৃত সকলের প্রীতিভাজন, গুরুলঘু সকলের সমাদৃত হলেও তিনি সমাজে সংসারে যেন

ছায়াবৃত হয়েই থাকলেন। অথচ 'দারিদ্র্য নিষ্পিষ্ট ও আজন্ম দুর্বল স্বাস্থ্য এই বিনয় নম্র প্রিয়দর্শন যুবক প্রথমাবধিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠাদের নিকট পরম স্নেহভাজন।—স্কুল সেক্রেটারি বঙ্কিম বসুই হোন কিম্বা হেডমাস্টার নাগরকরই হোন, স্কুলের খাতাপত্র হিসাব-নিকাশ সবাই নিশ্চিন্ত মনে তাঁর হাতে দায়িত্ব অর্পণ করতেন। কারণ সে দায়িত্ব পালিত হবে নিঃসন্দেহ। তা পালনের জন্য কোনো ধন্যবাদও প্রত্যাশা করবেন না সুরেশ দা। নিজেকে যেন সকলের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নিপুণভাবে কাজ করে যাওয়াই তাঁর স্বভাব। হয়তো এইখানেই তাঁর ব্যক্তিত্বের ত্রুটি, স্বাস্থ্যের জন্য হোক অবস্থার প্রতিকূলতায় হোক, তাঁর মধ্যে স্ফুরিত হতে পায়নি তাঁর আত্মপ্রকাশের সাহস, নিজের প্রাপ্য আদায়ের শক্তি, প্রাণ-শক্তির স্বাভাবিক তেজ। তথাপি 'এমন শিক্ষক হয় না,' ছাত্ররা একবাক্যে তা ঘোষণা করতো 'এমন সহযোগী হয় না'—শিক্ষকেরাও অকপটে তা বলতেন। আর—কর্তৃপক্ষ? সুরেশ আছে বলে নির্ভাবনা।' আমার বাবার কাছে সুরেশ ছিলেন পুত্রাধিক —বিষয় কর্ম থেকে তাঁর টাকাকড়িরও কথা একমাত্র সুরেশ দাকেই তিনি জানাতেন। আমার সে যোগ্যতা ছিল না, তিনিও জানতেন আমিও বুঝতাম। আমার মায়ের কাছেও 'সুরেশ' ছিল তাই—এবং সেই কারণেই অনিল আমাদের বাড়িতে আপনার থেকেও বেশি আপনার। যারা প্রিন্সিপাল অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যনিপুণতা, লেখা-পড়ায় সুপটুতা দেখে তাঁর গুণমুগ্ধ—আমিও তাঁর একজন—তাঁরা সুরেশদার কিছু কর্মনিপুণতার ধারণা পাবেন। কিন্তু তাঁরাও জানবেন না আরও অনেক জিনিস—ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নির্লোভ নিরভিমান মানুষের জীবনের সেই সকরুণ শ্রী। আমার পক্ষে তাঁর কথা বলা প্রায় অসম্ভব—জীবনে বাবা ও দাদার মতো আর যে তিনজন মানুষের নিকট আমি শিক্ষা-দীক্ষা ও মূল্যবোধের জন্য ঋণী সুরেশদা তাঁদের একজন—আর লেখাপড়ার কথা বললে আমার মতো দুরন্ত অমনোযোগী ছাত্রকে লেখাপড়া শেখানো যে কী কঠিন কাজ, তা এখন বুঝি।—গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার যে কৃতিত্ব তা যদি সম্ভব হয়ে থাকে—তা হলে সে কৃতিত্ব প্রধানত প্রাপ্য সুরেশদার। এমন শিক্ষকে যে পেয়েছে—যে দেখেছে তাঁর সকল বেদনা—সে বাঙলা দেশের শিক্ষকসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার রুদ্রকোমল সকল দাবিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে সমর্থন না করে পারে না। শিক্ষকদের কথা মনে হলেই মনে পড়ে ভাগ্য প্রবঞ্চিত শিক্ষক সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যাকে

ভাগ্য প্রবঞ্চিত বলা হয়তো ঠিক নয়। কারণ, এমন কৃতী পুত্রদের যিনি পিতা তাঁর মতো ভাগ্যবান কে? সত্যই, সরস্বতী শিক্ষকদের অনেক লাঞ্ছনা দেন, কিন্তু এই পুরস্কারটি দিয়ে হয়তো তাঁদের সকল প্রাপ্য আবার মিটিয়ে দেন। নিজ ভাগ্যে না হোন পুত্রভাগ্যে তাঁরা অনেকেই সার্থক।

স্কুলের জীবনটা স্বল্প নয়—প্রায় ৯ বৎসর। এ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর জীবন যে পর্বে গিয়ে পড়ে তার নাম—প্রথম মহাযুদ্ধ। তার একটা ফল,—আমরা উদগ্রীব হয়ে দৈনিক ইংরেজী সংবাদ পত্র পড়তাম,—প্রথম ইংলিশম্যান, পরে 'বেঙ্গলী।' দেশের জীবনে স্বদেশীর পর্ব শেষ হয়ে বিপ্লবী দুঃসাহসিকতার পর্ব দেখা দেয়, তিলকও হোমরুলের দিন আসে। আমাদের শহরের জীবনে সংক্ষেপে বলতে হবে একদিকে দেখা দেয় জীবন চাঞ্চল্য—মিস্টার জে-এন-গুপ্ত গ্রামে গ্রামে মেয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করতে লাগলেন। এখানে-ওখানে ইংরেজি স্কুল স্থাপনে যত্নপর ছিলেন। নিজে অন্য অফিসারদের নিয়ে স্কুলের ছাত্রদের খেলাধূলায় উৎসাহ দিতেন।—সব সময়েই খেলা, কিম্বা মেলা, কিম্বা একটা কিছু—অফুরন্ত তাঁর তৎপরতা। নিজেই নেমে পড়তেন ছেলেদের সঙ্গে খেলতে। তাঁর পুত্রদের বলতেন পাড়ায় আমাদের ডেকে নিয়ে একসঙ্গে খেলতে—আই-সি-এস্-এর বিলিতিআনার দূরত্ব সরিয়ে বাঙালীআনায় তিনি যেন নিজেও সুস্থ বোধ করতেন, দেশের মানুষকেও তাঁর স্পর্শে সুস্থ করে তুলেছেন। কিন্তু ওদিকে দক্ষিণ থেকে এ সময়েই মেঘনা আসছিল এগিয়ে, শহরে তাই কলেজ স্থাপনে মিস্টার গুপ্ত যখন সংকল্প করেও দ্বিধা করছেন—এমন সময়ে একবার ছোটলাট কারমাইকেল এলেন শহরে। তারপরে—কী রিপোর্ট তিনি পেয়েছিলেন কে জানে—মিস্টার জে. এন. গুপ্তের রচিত সেই মেলমেলার পরিবেশটি চুরমার হয়ে গেল। বড় কর্মচারীরা বিভিন্ন স্থলে বদলি হন—মিস্টার গুপ্ত গেলেন রঙ্গপুরে। তিনি অবশ্য সেখানে আপনার উপযোগী বৃহৎ কর্মক্ষেত্রই পেলেন। কিন্তু নোয়াখালি শহরের গোলডেন এজ্, ফুরোল, সেই জীবন-চাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়ে গেল। এল ব্যুরোক্রাট্‌দের বিচ্ছিন্ন দ্বৈপায়নী জীবন। অন্য দিকে মেঘনাও শহরের প্রান্ত গ্রাস করে একেবারে বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে এল। বৈশাখ থেকে কার্তিক পর্যন্ত মেঘনার 'শরের' 'ডাকে' ও উচ্ছ্বাসে শহর কাঁপতে থাকে। সে বান, সে জোয়ার, সে জলোচ্ছ্বাস দৃশ্য হিসাবে একটা রুদ্র ভয়ঙ্কর আকর্ষণ—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষের। ভাদ্রের আমাবস্যায় স্কুল ছুটি হয়। কাছারি ভেঙে দিয়ে

কর্তৃপক্ষ এসে দাঁড়ান মেঘনার পাড়ে—বহুদূর থেকে দেখা যায় আকাশের পূর্ব-কোণে সমুদ্রের ফেন-রেখা, আধ ঘণ্টা পূর্ব থেকে তার গর্জন শোনা যায়। ক্রমে তা বাড়ে, ক্রমে তা এগিয়ে আসে। দুর্বার তার গতি, সর্বগ্রাসী তার শব্দ। তারপর অকস্মাৎ পূর্বের খাল পার হয়ে এ পাড়ের দিকে যখন 'শর' দেখা দিল তখন চমকে উঠতে হয় তার রুদ্ররূপে—বুক দুড় দুড় করে। পালাতে দেখেছি সভয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোক ও মহিলাদের তখন ছুটে বাড়ির দিকে। মুহূর্তমধ্যে সে শর প্রলয় গর্জনে সাম্‌নে দিয়ে ছুটে চলে গেল পশ্চিম দিকে, পিছনে পিছনে এল পাঁচবাড়িয়ার জলোচ্ছ্বাস। তারপর পূর্ণ জোয়ার, ফেঁপে কূলে কূলে ভরে উঠল নদী। দুপ্‌দাপ ভেঙে পড়তে লাগল পাড়, দুড়মুড় করে হুড়মুড় খেয়ে ভেঙে পড়তে লাগল নদীগর্ভে ছোট বড় গাছ।

এই পরিবেশ দেখতে-দেখতে ভাঙন-মুখী শহরে আমার স্কুলজীবন শেষ হয়ে আসে ১৯১৮-তে। যে প্রাঙ্গনে আমি পদার্পণ করেছিলাম তার পথ চেয়ে আমি চলে আসছিলাম ততদিনে পৃথিবীর দিকে। এই আট-নয় বৎসরে বয়সের নিয়মে আমি বালক থেকে কিশোর হয়েছি আর কিশোর থেকে হয়েছি তরুণ। দেহের হিসাবেও তা একটা মিরাকল্‌। কিন্তু এ তো শুধু দেহের হিসাব নয়, একটা মানসিক বিবর্তনেরও ইতিহাস। তার মধ্যে আছে আরও একটা সত্যেরও জন্মকথা। এই পরিবার প্রাঙ্গন পরিবেশ সকলেরই মধ্যে যার জন্য প্রস্তুতি ছিল গোপনে-গোপনে লুক্কায়িত। আর এই দেশ-বিদেশ এবং এই ক্ষুদ্র নোয়াখালি শহরের আলো-আকাশ থেকে যা প্রাণবায়ু সঞ্চয় করে এনে শত শত বালকের মতো এই বালকেরও সত্তার মধ্যে অঙ্কুরিত করল এক অদ্ভুত প্রকাশ—স্বাদেশীকতা ও সাহিত্যানুভূতি। চৈতন্যের জন্মলাভ সেই তৃণাঙ্কুরের জন্মকথা।

(ক্রমশ)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

দিনগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

শীত শেষ হয়ে ক্ষণস্থায়ী বসন্ত গ্রীষ্মের সীমায় এসে হারিয়ে গেল। পতঝরি হাওয়া এসে একরাত্রে অশথ আমড়ার পাতা ঝরিয়ে ছড়িয়ে উড়িয়ে দিল। হাওয়ায় ধুলো—ধুলোয় উত্তাপ। বেঁটে ইঁট-বেরুনো পাচিলের কাছে মাদার গাছে ফুল ফুটেছে। দুপুর—প্রমত্ত গরম দুপুর—শালপাতা আর ধুলোর ঘুরপাক। রেস্তোরাঁর লোহার চেয়ারে মাছির মেলা। কর্মচারী ঘুমোচ্ছে। মালিক খেতে গেছে। দোকানপাট ঝিমন্ত। রেস্তোরাঁর এক কোণে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শান্তনু বসে আছে। ফাঁকা ঘর। শান্তনু খদ্দের নয় কাজেই পাখা ঘুরছে না। দীর্ঘকাল সুব্রতর সঙ্গে দেখা হয় নি। দেখা করেনি বলাই ভালো। রুচি মাঝে একদিন এসেছিল। হয়তো রুচি চেয়েছিল শান্তনুর বিরূপতাকে ভাঙতে—যে আড়ালটা শান্তনু আর ওদের মধ্যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে সেটাকে নিঃশেষে উড়িয়ে দিতে। শান্তনু কথা বলেছিল, কিন্তু মন থেকে সাড়া দেয়নি। রুচি ওদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করে আড়ষ্ট হয়ে বিদায় নিয়েছিল। শান্তনুর মেজবৌদি আর সেজবৌদি তারপর শান্তনুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রুচি এল, ভালো করে কথা বললে না যে? নিস্পৃহ গলায় শান্তনু মৃদু জবাব দিয়েছিল—ভালো লাগল না। এই উত্তরে উৎসাহিত হয়ে মেজবৌদি আর সেজবৌদি রুচির অস্থির স্বভাবের বিষয়ে পঞ্চমুখ হয়ে একটা মেয়ে মজলিস বসাতে চেয়েছিলেন। নানা মন্তব্যের পর শান্তনুকে উৎসাহিত করতে না পেরে মেজবৌদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—চুপ করে আছ যে? শান্তনু আবারও জবাব দিয়েছিল—ভালো লাগছে না। ভালো লাগছে না সত্যিই। জ্বরটা প্রায় আসে। শরীর অসম্ভব ক্লান্ত।

আর একদিন বাসের জানালা থেকে শান্তনু দেখেছিল সুব্রত রুচিদের পাড়ার মোড়ের বাঁকে মিলিয়ে গেল। শান্তনু সুব্রতকে দেখে কোনো আকর্ষণ অনুভব করল না। সে আজকের মতোই নিজেকে ছেড়ে দিয়েই বসেছিল। আজকের মতোই—এই অর্থহীন জনকল্লোলের তীরে আজ সে যেমন বসে আছে—কারো প্রতীক্ষায় নয়, কারো উদ্দেশ্যে নয়—সেদিনও বাসে করে ঘোষপাড়া রোড ধরে সে নিরর্থক ছুটে চলেছিল কিছু পাবে বলে নয়, কারো সঙ্গে দেখা হবে বলে নয়। রেস্তোরাঁর ছেলেটা তিনখানা চেয়ার এক জায়গায় করে ঘুমোতে ঘুমোতে মাছি তাড়াচ্ছে। শান্তনু ছেলেটাকে চেনে, ওর নাম বেণু। এই কদিন আগে ওকে দেখেছে স্কুলে। সতেরো আঠারো বছরের রিফ্যুজি ছেলে। আজকে দেখছে এখানে রেস্তোরাঁর বয় হিসাবে। ছেলেটা ওকে চেনে। কিন্তু বোধহয় আর কোনোদিন ও স্কুলে যাবে না। তাই শান্তনুকে ও আর গ্রাহ্য করল না। তাতে শান্তনুর কোনো কষ্ট হল না। কেন গ্রাহ্য করবে ও? কাকে করবে?—শান্তনু জানে বেণুরা আর কাউকেই গ্রাহ্য করবে না। ছেঁড়া গেঞ্জি আর খাঁকি হাফপ্যান্ট-পরা বেণুর মুখচোখে এরই মধ্যে ইঁট-পাথর-নোংরা-ধুলোর বি. টি. রোড ছাপ দিতে শুরু করেছে। বেণুর হাতটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মাছি বসতেই লাগল ওর মুখে। শান্তনুর মনে হল ও যেন বলতে চাইছে—মাছি তাড়িয়ে কোনো লাভ নেই, এত মাছি তাড়িয়ে ওঠা যাবে না। তার চেয়ে ঘুমোনো যাক। শান্তনু পারত না। এত মাছি উপেক্ষা করে ঘুমোনো সম্ভব নয়। এরা অগুণতি। অবাধ্য। কুরে কুরে খায় তার ঘুমকে, বিশ্রামকে। একটা বছর সাতেকের কালো ছেলে, রাস্তায় মারামারি করছে। পাতলা কোঁকড়া চুল, মোটা ঠোঁট দেখলে মনে হয় ছেলেটা নিগ্রো। শান্তনু জানে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছেলে—সেই সময়ের সন্তান, যখন ওহিও-র কোনো তুলাচাষী রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছিল পৃথিবীর বুকে—তখনকার। ও ছেলেটার নাম কালুয়া।

শান্তনু চুপ করে বসেই থাকে। ভাবে দেখতে দেখতে এই ছোট্ট জনপদের চেহারাটা কেমন পাল্টে গেল। যুদ্ধের আগের সেই নিরুদ্বেগ মফঃস্বল শহর কোথায় মিলিয়ে গেল। সকাল দুপুর সন্ধ্যায় চটকলের বাঁশী বাজত—সেই সময়টুকুতে যা পাঁচমিশেলি শহরের রূপটা ধরা যেত রবিবার আর শুক্রবার—এতওয়ার আর হপ্তাবারে যা কিছু চনমনে ভাব দেখা দিয়েই মিলিয়ে

যেত। তা নইলে দুধারে মনসাসিজের বেড়া মাঝখানে খোয়া-বাঁধানো ধুলো কাদার রাস্তায় গোণাগুণতি লোক চলা দেখতে দেখতে ঘুম আসত। ক্লেদ ছিল না সে দিনের জীবনে তা নয়—কিন্তু এটা সত্যি যে, জটিলতা ছিল না। টিক্ টিক্ করে পেণ্ডুলাম দুলছে। পাতা ঝরছে পিচের রাস্তায়। দমকা হাওয়ায় শুখনো পাতার রাশি রাস্তায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। মার খেয়ে খ্যা খ্যা করে হাসছে কালুয়া। রাস্তায় একটা শিটি বাজাল কোন্ রকবাজ। আর শিটির শব্দ শেষ হতে না হতেই ধীর পায়ে একটি মেয়ে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকল। শান্তনুকে দেখে মেয়েটি চমকে গিয়ে বোধহয় এক লহমার জন্য থমকে গেল। তার পরে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দোকানের মধ্যে এসে দাঁড়াল। শান্তনু চিনতে পারল মেয়েটিকে। মেয়েটি চিনতে চাইছে না, তবু শান্তনু জিজ্ঞাসা করল :

—তোমার নাম মমতা না?

—হ্যাঁ। বিষণ্ণ চোখ দুটোয় পরিচয়ের জন্য কোনো আগ্রহ নেই। যেন কথা বলতে হয় বলে বলা।

—তুমি আমায় চিনতে পাচ্ছ না?

—আপনাকে দেখেছি। ফটিকবাবুদের বাড়ি।

—এই রৌদ্রে কোথায় বেরিয়েছ?

—বাবাকে খুঁজতে।

শান্তনু বুঝতে পারছিল না যে মেয়েটি বিরক্ত হচ্ছে কিনা। ঝলঝলে ময়লা ফ্রক। রোগা, শির-বেরুনো হাত। চুপসে-যাওয়া মুখ। ফর্সা রঙ প্রায় শাদা হয়ে গেছে যেন। কোঁকড়া জট-পাকানো একরাশ চুল তেল পায়নি কতদিন। শান্তনু দেখল মেয়েটাকে যত বাচ্চা সেদিন ভেবেছিল তত বাচ্চা সে নয়। ফ্রক না পরলেই পারে। চোখের চাউনিতে এমন একটা অভিজ্ঞতার ছাপ মোটেই মানাচ্ছে না। সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে শান্তনুর আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল না। ওর মনে হল মেয়েটি ভয়ানক ক্লান্ত। আর ক্লান্ত বলেই বোধ হয় ও একটা ভয়াবহ ঔদাস্যে ভুগছে। এ কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তনুর নিজের বিষণ্ণতাও যেন আবার দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল।

মমতা শান্তনুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলার কোনো চেষ্টাই করল না। ও এগিয়ে গেল বেণুর দিকে। যে বেণু মাছি উপেক্ষা করে ঘুমোচ্ছিল সে

কিন্তু মমতার এক ডাকেই উঠে পড়ল। চোখ রগড়ে মমতাকে বলল—মমতা, এঃ ঘেমে গেছ যে। বলেই পাখাটা খুলে দিল। একটা চেয়ার ঝেড়ে দিল। মমতা বলল—বেণু বাবা এসেছিলেন?

বেণু জানাল, না তিনি আসেন নি আজ।

মমতা আপন মনে নিচু গলায় কী যেন বলল। একবার বাইরের রোদের দিকে তাকাল। তারপর কারো দিকে না তাকিয়ে আবার রাস্তায় নেমে গেল। বেণু চেঁচিয়ে বলল—এলে আমি খবর দোব তোমায়।

মমতা চলে গেলে পাখাটা বন্ধ করে বেণু শান্তনুর দিকে তাকাল। তারপর নিজে থেকেই বলল—ওর বাবা মাঝে মাঝে বেপাত্তা হয়ে যান। কোনো দিন দুপুরে, কোনো দিন বা অনেক রাতে এখানে এসে বসেন।

হঠাৎ কথার খেই ছেড়ে দিয়ে বেণু বলল—মদে চুর হয়ে থাকেন তিনি, চব্বিশ ঘণ্টাই বলা যেতে পারে। মমতা আমাকে বলে রেখেছে এখানে ওঁর বাবা এলে আমি যেন ওকে খবর দিই।

এই দোকানটাই বা কত বদলেছে। ড্রিকিং অফ লিকার প্রোহিবিটেড লেখা সেই বোর্ডখানি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মমতার বাবা অথবা অন্য অনেকেই এখন ইচ্ছেমতো দোকানের পিছন দিকটায় বসে খেতে পারেন।

বেণু ঘুম ছেড়ে উঠে পড়ল। চোখেমুখে জল দিতে গেল। শান্তনু দেখল ম্যাটিনির ভিড় জমছে রাস্তায়। রিকসার ভেঁপু বাজছে ঘন ঘন। স্টেশনে দুদিক থেকে আপ ডাউনের গাড়ি এল। রেস্তোরাঁ দেখতে দেখতে ভরে গেল। চৌকো খুপরিগুলোর পর্দা সরিয়ে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেরা মেয়েরা ঢুকে পড়ল। একটা হাসিখুশি মেয়ে আর একটা লম্বা ছিপছিপে সটান চেহারার ছেলেকে দেখে শান্তনুর হঠাৎ মনে হল এরা সুখে আছে। হয়তো এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই এখনো। হয়তো কোনোদিন সম্পর্ক হবে। এরা সুখে আছে। ইচ্ছে করলেই সুখে থাকা যায়? পারি না কেন তা হলে? আমার ভাবতে পারার ক্ষমতাই আমাকে নির্বাসনে ফেলে রেখেছে। ক্লান্ত ঘোলাটে চিন্তায় নিজেকে আবার জরো রুগীর মতো মনে হতে লাগল। "কী বই"? "ফল অব বার্লিন", "এন. কে. সির ক্লাস ফাঁকা করে সবাই চলে এলি?" "দূর কী হবে মাথায় কিছু ঢুকবে না আজ"। শান্তনু শুনল সব। চলে যাব সিনেমায়? পকেটে হাত দিয়ে দেখল হয়ে যাবে পয়সায়। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখল কত চেনা লোক। ওইখান

থেকেই দেখতে পেল সুব্রত আর রুচি যাচ্ছে। রুচির হাতে বইখাতা। শান্তনু স্থির করে ফেলল, থাক, যাব না। সুব্রত এদিকে দু-বার তাকাল। শান্তনুকে দেখতে পায়নি ও।

আবার দেখতে দেখতে রেস্তোরাঁ ফাঁকা। রাস্তার গোলমাল থিতিয়ে গেল। একটা কোণে দেওয়ালের দিকে মুখ করে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন তিনি বসেই রইলেন। ময়লা ছেঁড়া পাঞ্জাবীতে তরকারীর দাগ—তালি দেওয়া জুতো—মাথার চুলগুলো কাঁচা পাকায় মেশানো—মুখখানা অস্বাভাবিক লাল এবং থমথমে। বেণু অন্য দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল। ভদ্রলোককে দেখে চমকে গেল ও। কাছে গেল। ডাকল—কাকাবাবু।

ভদ্রলোক সাড়া দিলেন না। বেণুর দিকে মুখ ফিরিয়ে ভালো করে তাকাবার চেষ্টা করলেন। কী যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু মুখের কাছ থেকে কথাটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আবার যেন বুকের মধ্যেই ডুবিয়ে দিলেন। এই কথা এইভাবে ভাবতে ভাবতেই শান্তনু তাকাল ভদ্রলোকের বুকের দিকে। রোমশ বিশাল বুক।

বেণু আবার ডাকল—কাকাবাবু, মমতা এসেছিল।

ভদ্রলোক আবার তাকালেন। শান্তনুর মনে হল এ শুধু তাকানো মাত্র, এতে কোনো দৃষ্টি নেই।

বেণু গায়ে হাত দিয়ে ডাকল—বাড়ি চলুন! বেণু বুঝল কাকাবাবুর ওঠবার হাঁটবার ক্ষমতা নেই। শান্তনু দূর থেকেই বুঝতে পারছিল ভদ্রলোক ভদ্রলোকের মধ্যে আর নেই। বেণু নিরুপায় হয়ে শান্তনুকে জিজ্ঞাসা করল—কী করি বলুন তো?

শান্তনু বলল—তুমি ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দাও।

—দোকান ছেড়ে আমি কী করে যাব? মালিক আসেনি এখনও যে।

—মেয়েটিকে খবর দাও না?

—সে কি একা এঁকে নিয়ে যেতে পারবে? তা ছাড়া মমতাকে দেখলে উনি মারধোর করেন, বিশেষ এ সময়ে।

—তাহলে ওঁর বাড়ি যাবার দরকারটা কী? থাকুন না যেমন আছেন। তুমি বরং ওঁকে দোকান থেকে অন্য কোথাও যেতে বল।

—সে বললে মমতা শুনবে কেন? তাঁর বাবা তো বটে।

কী করা যায়, কী বা বলাই যায় শান্তনু বুঝতে পারল না। বেণু একটু

ত্রস্ত হয়ে পড়ল। মালিক এলে ওকে কথা শুনতে হবে। ওদিকে ভদ্রলোক বেহুঁস। মাছি বসছে ভদ্রলোকের মুখে। হাত নেড়ে মাছি তাড়াতে চাইলেন। হাতটা কাঁপছে। ফর্সা হাত, ময়লা-জমা নীল নখ, পাঞ্জাবীর হাতায় কাদা। মাথাটা দু-হাতে চেপে স্থির রাখার চেষ্টা করে করে শেষে মাথাটাকে ছেড়ে দিলেন সামনের টেবিলে। বেণু বিব্রত মুখে শান্তনুর দিকে তাকাল—কী করি বলুন তো?

—অন্যদিন কী করো?

—অন্যদিন তো এত বেতাল হন্ না। আর হতে করতে নেশা ছুটে যায়। নিজেই আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যান।

এই কথা বলতে উদ্‌ভ্রান্ত মমতা নিজেই আবার এসে হাজির হল। 'বেণু' বলে ডেকে মমতা ঘরের মধ্যে ঢুকল, তারপরেই 'বাবা' বলে এগিয়ে গেল ভদ্রলোকের দিকে। মমতা বাবার দু-কাঁধের ওপর দু-হাত রেখে বাবার হুঁস ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগল। অসীম উৎকণ্ঠায় মমতার মুখখানা টুলটুল করে উঠল। শান্তনু ভাবল মেয়েটিকে সাহায্য করা দরকার। সে উঠে যেই এগিয়ে যাবে সেই মুহূর্তে ভদ্রলোক—'ছেড়ে দে খানকির বাচ্ছা' বলে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মেয়ের গালে জোরে এক-ঘা মেরে বসলেন। বেণু বলে উঠল ইস্। হয়তো শান্তনুর চোখ জ্বলে উঠে থাকবে। মমতা তা দেখেই বাবার মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরল। শান্তনুর ক্রোধ তা দেখে নিবে গেল। মমতা কাঁদছিল বটে—কিন্তু সে কান্না আঘাতের কান্না নয়। তার বাবা এমন হয়ে গেছে এই ক্ষোভের কান্না সেটা। দু-বার ফুঁপিয়ে বলে উঠল—বাবা, বাবা।

ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে দোকানের বাইরে। মজা দেখার ও মন্তব্য করার জন্য সকলে ঠেলাঠেলি করছে। রসালো মন্তব্যের এক আধটা মমতার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ কেউ। "সেই মেয়েটা রে"—"সেই ফোঁস কেউটে"—"এ যে বাবা কাঠামো স্রেফ, একমেটে দোমেটে কিস্যু হয় নি"—মমতার বাবা আর একবার চেঁচিয়ে উঠলেন। ভিড় বলল—"অত জোরে নয়, ইসপিরিং কেটে যাবে দাদা।" আর কাঁদল না মমতা, ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আত্মস্থ হল। কান্না সামলাল। তাকাল ভিড়ের দিকে একবার, একবার ওর বাবার দিকে। এখনো ছেলেমানুষের মতো কোমল ওর চিবুক—কপালে আর সুদীর্ঘ ভ্রূ-দুটোয় কেমন যেন তিক্ততা, ক্লান্তি—যেন অনেক কিছু জানে ও, যা জানতে চায় নি।

—চলো আমি তোমার সঙ্গে যাই। শান্তনু না বলে পারল না। উঠে গিয়ে কাছে দাঁড়াল।

—না, থাক। অবাধ্যের মতো ঘাড় বেঁকাল মমতা। একটু যেন রুক্ষ ওর গলা।

—তুমি একা পারবে না।

—বেণু তুমি চল। মমতা শান্তনুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখল। বেণু দেখল মমতার মুখ লাল। বেণু একবার বাইরের দিকে তাকাল, ওর মালিক আসার সময় হল।

—আমি কী করে যাব মমতা, মালিক এসে পড়বে এখুনি, বিকেলে বেচাকেনার সময়।

—একটা রিক্সা ডেকে তুলে দাও বাবাকে, দেখ যোগেশ আছে কিনা, তাহলেই হবে, আমি একাই পারব।

—যোগেশ কোথা, সে হাঁসপাতালে গেছে, ওর ভাগনের অসুখ।

শান্তনু বলল—বেণু, তুমি একটা রিক্সা ডাক। চল মমতা—কী আর করবে ? এই ভিড়ের হাত থেকে তো রেহাই পাবে। মমতা বললে—চলুন, কিন্তু একটা কথা, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না। তার পর যেন স্বগতোক্তি করল—আমার ভালো করতে হবে না কাউকে।

বেশি দূরে নয়, কাছেই একটা পুরনো গলির মধ্যে এখন মমতার বাবা বাসা করেছেন। একতলার বাইরের দিকের একটা অংশে ওরা থাকে। সে ঘরের দেওয়ালে শ্যাওলার দাগ, বিছানায় চাদর নেই, জানলার পাল্লা ভাঙা। আলনায় স্তূপীকৃত ময়লা কাপড়। দিনের বেলাতেও মশা পন্ পন্ করছে। একটা বিবর্ণ স্টোভ তেলঝুল মেখে পড়ে আছে এক দিকে। কুলুঙ্গিতে একটা অন্ধ দর্পণ। অন্ধ দর্পণ—কথাটাই শান্তনুর মনে হল। মমতা নিশ্চয় নিজেকে দেখে না—কোনোদিন না। এ নিজেকে ঢেকে রেখেছে—মমতার মতোই এও ক্লান্ত। এই ঘরের ধোঁয়া কালি লেগে রয়েছে এর বুকে।

—মমতা।

—আর কিছু করতে হবে না। এবার আপনি—

—এখানেই শুয়ে থাকবেন ইনি ?

—হ্যাঁ।

—তারপর ?

—অনেক রাত্রে ওঁর খিদে পাবে, তখন একেবারে অন্যমানুষ হয়ে যাবেন, বলবেন—মমতা কী খাব ?

—তখন মনে থাকবে না যে তোমাকে—

—মেরেছেন যে সে কথা ? না। সে কথা মনে থাকবে না।

—আশ্চর্য তো।

—উনি আমাকে মারেন না।

—মানে কী তোমার কথার ?

হঠাৎ চুপ করে গেল মমতা। বাবাকে বাড়ি আনা হয়েছে, নির্বিঘ্নে শোয়ানো হয়েছে এই খুশিতে ও একটু বেশি কথা বলে ফেলেছিল। শান্তনুর জিজ্ঞাসার খোঁচা খেয়ে চুপ করে গেল। শান্তনু বলল—

—ঠিক আছে। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না। আমি যাই তাহলে ?

—যাবেন ?

—যাই। একটা কথা শুধু জানা দরকার। তোমার বাবা খেতে চাইবেন খানিক বাদে, খাবার ব্যবস্থা সব আছে।

—হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা আছে। শুধু স্টোভে হাতটা পুড়ে গেছে কাল, এই যা অসুবিধে।

—তাহলে ?

—আপনি বরং যাবার সময় বেণুকে একটু বলে যাবেন। ও নিয়ে আসবে খাবার।

—ও তোমার কেউ হয় ?

—না তবে ও খুব ভালো। আর সকলে গল্প শুনতে চায়, আর—

—আর ?

—কিছু না। দোকানের খদ্দেররা মদ কিনতে দিলে বেণু সেই ছুতোয় চলে আসে একবার। আমার কিছু দরকার থাকলে ওকে বলি।

বেণুকে শান্তনুর ঈর্ষা হল। বেণু স্কুল ছেড়ে রেস্তোরাঁর বয় হয়েছে—এতেই সে ব্যর্থ হয়ে যায় নি। ও কোথাও কাজে লাগে। কেউ একজন ওকে বিশ্বাস করে। যত সামান্যই হোক বেণু একটা কিছু করে যার একটা মানে আছে। আর শান্তনুর নিজের ?

বিকেল হয়ে এল। পড়ন্ত রোদ পলস্তারা-খসা পাঁচিলের অশথ চারার মাথায় তির তির করে কেঁপে গেল। একটা না-খেতে-পাওয়া বিড়াল তারই তলায় বসে খানিকক্ষণ কাঁদল—শালিখের নিবিষ্ট ঠোঁট ডানার পালক সাফ করছে দেখে বিড়ালটার অক্ষমের লোভ যে না হল তা নয়। কিন্তু সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত বিড়ালটি তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না। কাঁচা রাস্তার ধুলোর ওপরে এক ঝলক থুতু ছিটিয়ে শান্তনু বড় রাস্তায় গিয়ে উঠল। পথে চানাচুরওয়ালা লাল টুপী পরে পায়ে ঘুঙুর লাগিয়ে নেচে নেচে ছড়া বলছে। একটা এলুমিনিয়ম শপে বিকেলের শেষ রোদ শেষবারের মতো ঝলসে উঠছে। দূরে পশ্চিমের কাটা-কাটা মেঘে রংরেজিনীর হোলি। বারো হাত কার বেচে যে-লোকটা সে মস্ত বড় লগাটাকে জয়ধ্বজার মতো ধরে রেখেছে—হামাগুড়ি দিয়ে যে-ভিখিরীটা ভিক্ষা করে প্রাণপণে মাথা উঁচু করে সে গালাগাল দিচ্ছে বিকেল—নরম হয়ে এসেছে আলো, ধুলো, আর হাওয়া। বিকেল—অথৈ ভিড় নেমেছে পথে। তিনটে বেওয়ারিশ কুকুর এ ওর ল্যাজ কামড়ে খেলা করছে, ধুলো মাখছে পরম খুশিতে। বৃহৎকায় বপু ধর্মের ষাঁড় তদ্‌গত হয়ে জাবর কাটছে। হঠাৎ অনেকদিন বাদে শান্তনুর ভাল লাগল।

বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে শান্তনু পাড়ার মধ্যে ঢুকল। মেয়েরা ছাদে ছাদে গল্প করছে। ছেলেরা খেলা করছে রাস্তায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মা ডাকছে ছেলেকে। ছায়া নেমে-আসা ঠাণ্ডা রকে বসে তিন বুড়ো দাবা পেড়েছে। একজন একটা মাঝারি গোছের মাছের কানকো ধরে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পাঁচজনে তার দর জিজ্ঞাসা করছে। বেণুকে বলে এসেছে মমতার কথা। বেণুর চোয়াড়ে চিবুক নরম হয়ে গিয়েছিল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল। কোথায় যাবে এখন—এখন কোথাও যাবার নেই। রুচির ওখানে যাবে ?—না, কী হবে ? ঘুরে-ঘুরে, ঘুরে-ঘুরে, ঘুরে-ঘুরে যখন আর হাঁটতে পারল না তখন, তখনই ও ফিরে গেল। তখন অনেক রাত।

সেদিন রাত্রে নিজের ছোট ঘরখানায় শুয়ে শুয়ে মৌন নিশীথিনীর হৃৎস্পন্দনই সে যেন শুনছিল বালিশে মাথা রেখে। শহর ঘুমে চুপ। বাইরে পাতা ঝরার শব্দ। মাঝে মাঝে, বেশি দূরে নয় রেল লাইনের ওপর দিয়ে হু হু করে ঝড়ের মতো মালগাড়ি পাশ করে যাচ্ছে। নিজেকে ঘিরে ঘিরে শান্তনু ঘুরতে লাগল। পুরনো রেকর্ডের ফাটা জায়গায় পিন লাগলে যেমন

একই কথা বারে বারে বেজে চলে, শান্তনুও ঠিক সেই ভাবে পুরনো কথাই বলে চলল আপন মনে। ভাবল সুব্রতর কথা। রুচির কথা। সুব্রত যদি রুচিকে চুমু খায় সুব্রতর কি কিছু মনে পড়বে? রুচির? রুচি কত দূর যেতে পারে? রুচির বাবা মা? অকারণেই ছেলেমানুষের মতো একটা তুলনা করে বসল শান্তনু। মমতা আর রুচির মধ্যে কে বেশি জীবনের কাছে বসে আছে? কে পুড়েছে বেশি?

ভুলি কেন? কে ভোলায়? সময়কে কে দেয় তৃণ গুচ্ছ দিয়ে পায়ে-চলা পথ ঢেকে দেবার সুযোগ? এইসব অকারণ চিন্তার গোলক-ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে বিকেলের মতোই আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ল শান্তনু। তার পরে ঘুমিয়ে পড়ল। ও জানতে পারল না বাইরে অঢেল পাতা ঝরে গেল। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে কলকাতার দিক থেকে হাওয়া আসছে—কলকাতায় সে হাওয়া আসছে বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে। অনেক রাত্রের এই হাওয়ার সমুদ্রের স্বাদ। শান্তনুর শ্রান্ত কপালে সেই হাওয়া হাত রেখে গেল। শান্তনু জানল না। অনেক পাতা-ঝরে-যাওয়া অশথ গাছটায় শেষ রাত্রে একটা কোকিল ডেকে উঠল। সে কথাও শান্তনু জানল না। এই কোকিলটা এখন ডাকতেই থাকবে। এ ওর অভ্যাস। আর কিছু নয়। তারপর কিছুক্ষণ বাদে বি. টি. রোডের ট্রাফিক কল্লোল চড়া সুরের চূড়ান্তে পৌঁছে গেলে হয় কোকিলটা উড়ে পালাবে। আর নয় ওর ডাক হারিয়ে যাবে। ও থাকবে, কিন্তু শোনা যাবে না ওর ডাক।

শেষ রাত্রে সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল ওর। ঘুমের ঘোরে ও তাও জানতে পারল না।

(ক্রমশ)

গ্যোটের "আইন গ্লাইখেস্" থেকে

একই রকম

সকল শৈলশিখর পেল
শান্তি,
সকল তরুর চূড়ায় এল
শান্তি,
শুনবে নাকো বায়ুর কোথাও
স্বনন,
নেইকো বনে পাখির কোথাও
কূজন,
নেইকো দেরি, একটু জিরাও,
তুমিও পাবে শান্তির চির
শয়ন।

মূল জর্মন থেকে অনুবাদ : কানাইলাল গাঙ্গুলী

[১৭৮০ সালে শরৎকালে, অর্থাৎ ৩১ বৎসর বয়সে "ভাইমের"-এর নিকটবর্তী "ইল্‌মেনাও"-এর পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গ্যোতে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, সেই সময় ঐ চূড়ার কাঠের বাড়ির দেওয়ালে এই কবিতা লিখেছিলেন। তার প্রায় ৫১ বৎসর পরে, অর্থাৎ মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে, পুত্রশোকসন্তপ্ত হয়ে উনি দুই নাতিকে নিয়ে এই পাহাড়ের চূড়ায় দ্বিতীয়বার ওঠেন, আর দেওয়ালে এই কবিতা কাঠের উপর লেখা রয়েছে দেখেন। এর দ্বারা তখন তিনি অতিশয় অভিভূত হন। অনুভব করলেন এ যেন তাঁর তখনো অকবরিত মৃত পুত্রের উদ্দেশে লেখা হয়েছে, আর হয়তো তা নিজেরও অনতিদূরে তিরোভাবের ইঙ্গিত তাঁর কাছে বহন করল।—অনুবাদক]

কৃষ্ণ ধর

ভবিষ্যৎ অন্তরীণ, সত্তা শুধু অস্থির দর্শক

প্রতীকের ঘরবাড়ি, স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করে
যারা থাকে নির্মল ফুলের জন্য সাজানো বাগানে
হঠাৎ প্রখর হলে হাওয়া
সর্বনাশ
ঘর ভাঙে, স্বপ্নের ঠোঁটে বসে মাছি
সব মরে, কিছুই থাকে না
শুধু সর্বনাশ
আগুনের বেড়া চারদিকে,
নিষ্ঠুর আগুন
কিছুই থাকে না, থাকে না কিছুই
স্মৃতি নষ্ট হলে, ধুলো মেখে উঠোনে গড়ালে
বড় কষ্ট হয়, বড় অসম্মান
তার চেয়ে বেশি দুঃখ বিপন্ন সময়ে
দুঃখ ছাড়া আমাদের আর কোনো সম্বল থাকে না
কবিতার ভাষা নয়, দেখ চেয়ে উদ্ধত ঘাতক
উপস্থিত, হত্যা করে, নষ্ট করে, ছিন্নভিন্ন করে
ঘরবাড়ি, ভবনশিখির পুচ্ছ,
স্নেহ ও মমতা, প্রতীকের, স্বপ্নের অথবা প্রেমের
প্রয়োজন ধুলোতে ফুরোয়
সর্বনাশ গ্রাস করে সমস্ত বিস্ময়
ভবিষ্যৎ অন্তরীণ, সত্তা শুধু অস্থির দর্শক ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

গত শুক্রবার খুলনা কলকাতা বৃহস্পতিবার

মূলত শ্বাপদবৃন্দ অনায়াসে মুখ দেখাতে পারে,
কিন্তু না, জন্তুর নাম করবো না, জন্তুরা এখন
মানুষ পদবী নিলে ক্ষতি নেই, সম্ভবত আজ
রাস্তার কুকুরগুলো ঢের বেশি ভালোবাসতে পারে,
তাদের প্রেমিক নাম দিলে সৃষ্টি উচ্ছন্নে যাবে না ;
কিন্তু যারা—ভাড়াটে যে সব গুণ্ডা—নিরীহ সরল
অন্ধ আতুর খঞ্জ রমেশ রহিম আহ্‌সান
সুহাসের কুঁড়েঘরে আগুন ধরিয়ে তীর্থসম
গোয়ালপাড়ার পথে নারীমেধ শিশুমেধ সেরে
মৃত নারীদের দেহে প্রবৃত্ত হয়েছে, ভাড়াটিয়া
যে সব দালাল গুণ্ডা মানুষের পুষ্পনাম নষ্ট করে গেল,
মকুফ করবে নাকি বসোরা-গোলাপ মহম্মদ ?
তুমি কি নতুন করে নাম রাখতে নরকের নাম
'ধরণী' দেবে না ? আর ধরণীর নাম রসাতল ?
ভ্রূণমুকুলের মধ্যে আত্মঘাতী শিশুরা ব্যতীত
মানুষ রয়েছে নাকি, গন্ধরাজ-ঈশ্বর আমার ?

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

উপহার

চাও কোন উপহার ? কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধন আমি,
বিপর্যস্ত, পরিত্যক্ত, ভগ্নঊরু অসংগত রণে।
শুনি ঘোর কলরোলে কালনদী ধায় দিবাযামী
অমোঘ অরোধ্য বেগে। ধ্বংসের দারুণ আলিঙ্গনে
আমার নিষ্কৃতি নেই। নির্মূল দম্ভের মহীরুহ ;
আশা, স্বপ্ন ধুলিসাৎ ; ছিন্নভিন্ন অপ্রধৃষ্য সেনা ;
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ হত ; চারপাশে প্রেতাত্মার ব্যূহ।
স্বজন বন্ধুর রক্তে মিটিয়েছি এ-জন্মের দেনা।

তোমায় কী দিতে পারি ? চাই কি দুর্মূল্য আভরণ ?
খুলে দেব রাজকোষ ? হীরা রত্ন স্বর্ণ ভারা ভারা ?
রাজত্ব আমার ? হায় ! ভবিতব্য করাল ভীষণ।
আজ আমি দুর্যোধন ধরাশায়ী, রিক্ত, সর্বহারা।

কিছু নেই, এমন-কি কোনও অনুতাপ, পরিবাদ ;—
যা আছে তা শুধু এই বুকে-ধরা ঠাণ্ডা মরা চাঁদ ॥

বিকাশ দাশ

রক্তের পল্বলে ভাসে

আমরা কেউ সুখী নয়,—না তুমি, না আমি কোনোজন,
অথচ সুখের খোঁজে কাটালাম হাজার বছর।
সুখ যেন দূরগামী মায়াবী হরিণ অনুক্ষণ,
ক্রুদ্ধ সাইক্লোনে ওড়ে পাখি, খড়কুটো, বাড়িঘর!
বিবাদে আচ্ছন্ন গ্রাম, জনপদে হিংসা-দ্বেষ, চতুর ছোবল
সাপের মতন হেনে আরো দ্রুত মসৃণ মুখোসে
ঢেকেছি সমস্ত মুখ। প্রতারণা—অবিবেকী নিপুণ কৌশল,
নিজেরি চাতুর্যে নিজে মুগ্ধ, লুটোপুটি খাই হেসে।

অসাড় চেতনা, নেই প্রত্যয়—সংশয় চারিদিকে,
সৌজন্য, বন্ধুত্ব, দয়া, স্নিগ্ধ অকলুষ ভালোবাসা
অপস্রিয়মান, এই রক্তাক্ত সময়ে আছি টিকে,—
কী করে হৃদয়ে তবু ধ্রুব উত্তরণের প্রত্যাশা
এখনো রেখেছি পুষে? অপ্রেমে, নৈরাজ্যে, অন্ধতায়,
পৃথিবী আচ্ছন্ন, প্রেম রক্তের পল্বলে ভেসে যায়!

বাসুদেব দেব

সময়ের চতুর কোকিল

সময়ের চতুর কোকিল কখনো বা জেগে ওঠে উষ্ণ বাতাসের
করস্পর্শে। তখন আমার বড়ো ভয়
বড়ো ভয় করে। বিশেষত
কৃষ্ণচূড়া শোভিত আকাশ
যখন পতাকা হয়ে নাচে।
লুণ্ঠনকারীকে বড়ো ভয় করি,
সর্বত্রই রাহাজানি সচল, সচ্ছল।
সময়ের চতুর কোকিল মেঘের স্তবক থেকে কখনো হঠাৎ
জেগে ওঠে বহুকাল পরে, রক্তে
হিম কুম্ভকর্ণ মরে গেলে। মনে পড়ে যায় ঐ হাওয়ায় ও
নিসর্গের কশাঘাতে: আমারও সাম্রাজ্য ছিল, অতুল বৈভব,
লাবণ্যপ্লাবিত অন্তপুর······
মুহূর্তে অপরিতৃপ্তি-বিষে নীল তনু,
পরিতাপে জ্বলি।
সময়ের চতুর কোকিল জানি আবার মাথায় পায়ে
কাঠি বদলে, ঘুম পাড়িয়ে যাবে।
তাই এই ক্ষণিকের জাগরণ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদিকে ভয়,
বিশেষত জানা নেই পুষ্পিত কুঞ্জের শেষে কোন্‌খানে আছে
স্বখাত সলিল পদ্ম পাতায় আবৃত।
লুণ্ঠনকারীরা সব চলে গেলে রিক্ততার ধুলো চতুর্দিকে,
অসহায় মনে হয় রক্ত মাংস চেতনা কামনা ইত্যাদিকে,
পুনর্জন্মে বিশ্বাস শিথিল॥

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

উইল শেক্সপীয়র : একটি কল্পনা

চরিত্রলিপি ঃ

উইল শেক্সপীয়র	কিট মার্লো
অ্যান্ হ্যাথাওয়ে	সেক্রেটারী
মিসিজ হ্যাথাওয়ে	স্টেজ বয়
রাণী এলিজাবেথ	স্টেজ হ্যাণ্ড
মেরী ফিটন	পরিচারিকা (রাণীর)
হেন্স্লো	ভৃত্য (রাণীর)
সরাইওয়ালা	ছিউ (বালক ভৃত্য)

অভিনেতৃবর্গ…মাতালগণ…ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক :

স্ট্র্যাটফোর্ডে শেক্সপীয়রের বাড়ির একটি ঘর।

দ্বিতীয় অঙ্ক :

প্রথম দৃশ্য—প্রাসাদ সংলগ্ন একটি ঘর—দশ বছর পরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—থিয়েটার হাউসের অফিস ঘর—তিন মাস পরে।

তৃতীয় অঙ্ক :

প্রথম দৃশ্য—লণ্ডনে শেক্সপীয়রের বাড়ির একটি ঘর—এক মাস পরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—ডেপ্টফোর্ডে সরাইখানার একটি ছোট ঘর—সেই রাতে।

চতুর্থ অঙ্ক :

প্রাসাদ সংলগ্ন একটি ঘর—পরের দিন।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[পর্দা উঠছে—ষোড়শ শতকের মধ্যবিত্ত বাড়ির ঘর। দেওয়াল ও ছাদ কালো শাল কাঠের তৈরি, তার ওপর সাদা চুনকামের প্লাস্টার। বাঁদিকে খোলা ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। তার

Clemence Dane-এর কাব্যনাট্য ; "Will Shakespeare ; An Invention in Four Acts" অবলম্বনে রচিত।

পেছনে দরজা। স্টেজের ঠিক মাঝখানে পেছন দিকে আধ-খোলা জানলা, তার ভেতর দিয়ে বাগানের বেড়া দেখা যাচ্ছে এবং দূরে শীতের আকাশ। ডানদিকে একটা সিঁড়ি উঠে ভেতর দিকে চলে গেছে। সিঁড়ির পাশে ফ্রন্ট স্টেজে লেখার টেবিল, তাতে কাগজপত্র জড়ো করা। দোয়াত-কালি এবং স্যাণ্ড বক্স। সিঁড়ির পাশে দেওয়ালে একটা বুকশেল্‌ফ ও তাতে কয়েকটি বই। শেক্সপীয়র লেখার টেবিলে কাগজের ওপর কনুই রেখে দু-হাতের মাঝখানে মাথা গুঁজে নিবিষ্ট হয়ে বসে আছে। ওর বয়স কুড়ি, কিন্তু দেখায় অনেক বড়, রং শ্যামলা, চেহারা কৃশ, কণ্ঠস্বর নীচু কিন্তু পরিষ্কার। ওর পেছনে অ্যান হ্যাথাওয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে—স্টেজের মাঝখানের বড় টেবিলে খাবার সাজানো। রুগ্ন চেহারা, পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখ, লাল চুল; কণ্ঠস্বর খুব মিষ্টি, কিন্তু সহজেই চীৎকারে পরিণত হয়।]

অ্যান্ : (ইতস্তত করে, কথার মাঝখানে অল্প সময় দিয়ে) উইল, খাবার দেওয়া হয়েছে! উইল, শুনতে পাচ্ছ? জান···মা আজ কোথা থেকে একটা স্কাইলার্ক পাখি ধরে নিয়ে এসেছে···খাঁচার ভেতর রেখেছি তো—কী চীৎকারটাই করছে! আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলে?—অনেক দূর?—তোমার পা ভিজে গেছে? নিশ্চয়ই তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে···আজকাল সন্ধ্যে থেকে কি রকম ঠাণ্ডা পড়ে—আচ্ছা আমি কথা বললে উত্তর দাও না কেন?

[শেক্সপীয়র তাড়াতাড়ি উঠে যেতে থাকে]

কোথায় যাচ্ছ তুমি?

শেক্স : বাইরে!

অ্যান্ : কোথায়?

শেক্স : যেখানে হোক্—

অ্যান্ : আমার কাছ থেকে যেখানে হোক্! তাই না? বল, তাই না?

শেক্স : (দাঁতে দাঁত চেপে) ঈশ্বর আমাকে ধৈর্যের শক্তি দাও!

অ্যান্ : ফিরে এস, উইল! ফিরে এস···আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ফিরে এস।···আমি বড্ড কথা বলি···জানি তুমি চটে গেছ··· ফিরে এস···তুমি তো জান আমি কিছু খারাপ ভেবে বলি নি। খেয়ে যাও লক্ষ্মীটি!

শেক্স : আমি জানি।

অ্যান্　তবে! এস খেয়ে নাও, আর—আর—আমার সঙ্গে একটু কথা বল।

[শেক্সপীয়র লেখার টেবিলে ফিরে যায়]

আবার লিখবে বুঝি? আজ কি লিখছ?

[শেক্সপীয়রের মুখে বিরক্তি]

বল…আমাকে বল উইল!

শেক্স　না!

অ্যান্　আমাকে তোমার স্বপ্নের জগতে নিয়ে যাও!

শেক্স　অ্যান্, স্বপ্ন এক রঙীন বুদ্বুদ—তার সৌন্দর্যের রহস্যের ঠিকানা নেই—ব্যাকুল হয়ে ঐ বুদ্বুদকে তুমি ধরতে যাও—হাতই শুধু ভিজবে, স্বপ্নের জগৎ কোথায় মিলিয়ে যাবে!

অ্যান্　আমাকে তোমার কল্পলোকের পথ দেখাও!

শেক্স　আমিই কি জানি সেই কল্পলোকের ঠিকানা? কোনোদিন… হয়তো কোনোদিন—

অ্যান্　এক্ষুনি!

শেক্স　এখনও সময় হয় নি।

অ্যান্　এক্ষুনি, এক্ষুনি!

শেক্স　তুমি জান, আমি পারি না!

অ্যান্　পার না, না চাও না! চিরকাল তুমি দরজার বাইরে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলে!

শেক্স　আমাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন?

অ্যান্　কেন? চারমাস।

শেক্স　তুমি কি সুখী হয়েছ?

অ্যান্　আমি সুখী,…হ্যাঁ, আমি সুখী…আমি সুখী! (হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে) আমি কেমন করে সুখী হব যখন তোমার চোখে সর্বনাশের কালো ছায়া দেখি! রাতে যখন তোমার পাশে শুয়ে প্রহর গুনি আর অনাগতকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনি তখন হঠাৎ তোমার হৃৎস্পন্দন শুনে আমার চমক লাগে—মনে হয় জীবনের বোঝা তোমার কাছে কত ভারী, ক্লান্তিতে তোমার দম আটকে আসছে! আমার মনটা ছটফট্ করতে থাকে—কেমন করে তোমায় সাহায্য

করব! আর তুমি···তুমি তখন পাশ ফিরে শোও। জানতেও পার না তোমার বেদনায় আমার রাত অতন্দ্র হয়ে ওঠে। তুমি জানো না আমি কত আকুল হয়ে তোমায় সাহায্য করতে চাই!

শেক্স : কে জানে, হয়তো তুমি আমায় সাহায্য করতে পারতে। কিন্তু আমিত তোমায় জানি—তুমি আমায় সাহায্য করবে—নিজের পথে।

অ্যান্ : সেইটেই কি ঠিক পথ নয়?

শেক্স : আমি তোমায় বলেছিলাম না—নিজের পথে?—ছেড়ে দাও, সব চেষ্টা বৃথা।

[শেক্সপীয়র লিখতে শুরু করে; অ্যান্ জানলার ধারে গিয়ে হেলান দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।]

শেক্স : অ্যান্, তুমি আলো আসতে দিচ্ছ না।

[অ্যান্ একপাশে সরে যায়]

অ্যান্ : এখন দেখতে পাচ্ছ?

শেক্স : হ্যাঁ।

[দূরে বাঁশীর শব্দ শোনা যায়]

অ্যান্ : বোধহয় বেদের নাচ।

কণ্ঠস্বর : [গান]

ডাক দিয়েছে লণ্ডন ঐ, আয়রে বোকা মোদের সাথে
চল্ ছুটে ঐ শহর পানে সোজা রে—
থাকবে না তোর ভাবনা কিছুই, ঘুচবে জ্বালা হাতে-নাতে,
বুকের থেকে নামবে দুখের বোঝা রে!

অ্যান্ : বাগানের গেটে মা—সঙ্গে একজন অচেনা লোক!

[অ্যান্ দরজা খুলে দেয়, মিসেস হ্যাথাওয়ে ঢোকেন।

কণ্ঠস্বর : [আরও কাছে]

ব্যাঙের ডাকে সন্ধ্যা নামে, ঝোপঝাড়েতে ভর্তি গ্রামে;
লণ্ডনে সব আলোয় আলো, থাকবি সেথা খুব আরামে,
উঠছে রে গান, দুলছে রে প্রাণ
উচ্ছল লণ্ডন!
আহা, স্বপ্নের লণ্ডন!

অ্যান্ : মা, আমাদের জন্য কি এনেছ ?

মিঃ হ্যাথ : কি আবার আনব বাছা ! ভালো কথা, গলির মুখে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল। সে জিজ্ঞেস করলে উইলের বাড়ি কোথায়— উইলকে নাকি তাঁর ভীষণ দরকার।

অ্যান্ : কি চায়, কে সে ?

শেক্স : [জানলার ধারে] হেন্‌স্‌লো, একজন অভিনেতা। শহরে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কথা বলতে বলতে ওকে আমার নাটকের কথা বলেছিলাম।

অ্যান্ : একজন অপরিচিত অভিনেতাকে বললে তবু তুমি আমাকে বললে না ?

কণ্ঠস্বর : [খুব কাছে]

নাই যদি বা থাকিস গাঁয়ে, বরফ পড়বে বনের ছায়ে,
মুখখানা তোর স্মরণ রেখে দেবে না কেউ দিন ফুরায়ে।
ঘুরবে জগৎ বনবনিয়ে
চলবে রে কাজ হনহনিয়ে
তোকে ছাড়াই, তোকে ছাড়াই—
আয় তবে আয় লণ্ডনে যাই,
চল্‌রে বোকা লণ্ডনে যাই !

[শেক্সপীয়র দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

অ্যান্ : [উইলের পথ আটকে] ও কিসের জন্য এখানে এসেছে ?

শেক্স : আমার জন্য এসেছে। আমার বাড়িতে এসেছে।

[উইল বাইরে চলে যায়]

মিঃ হ্যাথ : কোনো গণ্ডগোল হয়েছে ?

অ্যান্ : গণ্ডগোল ! কার সঙ্গে ?—উইলের সঙ্গে ? কেন ? ও তো আমাকে মারেও নি···উপোস করিয়েও রাখে নি···রাস্তাতেও বের করে দেয় নি !

মিঃ হ্যাথ : একটু বুঝেসুঝে চলতে হয় ! —বাচ্চাটার কথা একটু ভাব।

অ্যান্ : আমি কি করব ?—আমি কি করব বলতে পার ?

মিঃ হ্যাথ : একটু কম কথা বলিস্, আর মনটাকে হাল্কা রাখতে চেষ্টা করিস্।

অ্যান্ : কেমন করে মনকে হাল্কা করব মা। মাগো, তুমি যদি জানতে আমার সামনে কি প্রচণ্ড অন্ধকার! উইলের নৌকোর পালে লেগেছে ঝোড়ো হাওয়া, ওর মনে লেগেছে অচিন্ দ্বীপের নেশা। আর আমি এক টুকরো পলকা দড়ি নিয়ে ওর নৌকোকে ঘাটে বেঁধে রাখতে চাই!

[শেক্সপীয়র এবং হেন্‌স্‌লো কথা বলতে বলতে ভেতরে ঢোকে]

মিঃ হ্যাথ : [ভেতর দিকে যাওয়ার দরজার কাছ থেকে] আয়, ভেতরে আয়, ওদের একলা থাকতে দে।

অ্যান্ : দেখো, উইলকে দেখো—ওর মুখে কি আশ্চর্য রঙ লেগেছে!

মিঃ হ্যাথ : আমার কথা শোন্, আয় ভেতরে আয়।

অ্যান্ : আমার সাহস নেই মা, আমার সাহস নেই!

মিঃ হ্যাথ : এ রকম অবুঝ হলে কি চলে?—একটু বিশ্বাস করতে হয়—

অ্যান্ : আমার ভয় করছে!

[মিঃ হ্যাথাওয়ে ফায়ার প্লেসের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান।]

হেন্‌স্ : [শক্ত চেহারা, হাসি-হাসি ভাব, ঝকঝকে চোখ, চলায় নাচের ছন্দ, চেহারায় বয়সের ছাপ। ওর কানে মাকড়ি। পোশাক এক সময় ভালো ছিল, এখন দুমড়ে মুচড়ে গেছে এবং জায়গায় জায়গায় কাদা ছেটানো। ওর কাঁধে একটা বাঁশী ঝুলছে।] অভিনয় হবে বৈ কি? তোমার নাটক অভিনয় করব বলেই তো এসেছি।

অ্যান্ : [ওদের পেছন থেকে] উইল!

শেক্স : [ঘুরে] এই আমার স্ত্রী।

অ্যান্ : [অ্যান্ কার্টসি করে। প্রায় নিজের মনে] এই লোকটি কে? কোথা থেকে এসেছে? কি চায়?

হেন্‌স্ : [শুনতে পেয়ে] আমি মায়ের অধম সন্তান। ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্র।

[শেক্সপীয়র হেসে ওঠে]

অ্যান্ : বিদেশী?

হেন্‌স্ : হ্যাঁ-ও বলতে পারেন…না-ও বলতে পারেন। এই মুহূর্তে আমি

স্পেনের লোকদের কাঁদিয়ে এসেছি। কিন্তু আমার আস্তানা ব্লাকফ্রায়ার্স। কাজকর্ম কি করি যদি জানতে চান তাহলে বলি শুনুন—ব্যাঙ্কে আমার এ্যাকাউন্ট আছে, লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত লোকেরা এক কথায় আমাকে চিনবে, রাণীর দরজা আমার জন্য সব সময় খোলা। আর আমি কে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলতে হয় আমি কে নই! আর এখানে এসেছি কেন? [উইলকে দেখিয়ে] এই লোকটির কপালে রাজতিলক, ওকে আমাদের রাজা করব বলে!

অ্যান্ : ভাগ্য গণনাও করতে পারেন দেখছি!

হেন্‌স্ : আমার হাতে একটা রুপোর টাকা রাখলেই আমি লোকের ভাগ্য গুনে দিই।

অ্যান্ : বাজে খরচ করার মতো টাকা আমার নেই।

হেন্‌স্ : সাবধান, দেখবেন, বিনে পয়সাতেই কিন্তু বলে দিতে পারি আপনার নিজের ভাগ্যকেই বড় ভয়!

শেক্স : [নিজের হাত এগিয়ে দিয়ে] আমার হাতে কি ভয় করার কিছু আছে?

হেন্‌স্ : এতো অভিনেতার হাত—হুঁ···বেশ বাজে হাত। কথার জাদুকর, তোমার সব কথা একদিন ফুরিয়ে যাবে!

অ্যান্ : আমরা ছা-পোষা লোক, আমাদের সঙ্গে আপনার কি দরকার—আমার স্বামীর ক্ষেতের কাজ দেখে—

হেন্‌স্ : আর গান গায়। সেই গাইয়েকেই তো ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। মহারাণীকে গান শোনাব বলে।

অ্যান্ : কি? কি বললেন?—মহারাণী!

হেন্‌স্ : হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ডের রাণী শুধু যুদ্ধই করেন না, আমাদের মতো গরীব অভিনেতাদের ওপরও তাঁর নজর আছে। তাইতো এসেছি স্ট্র্যাটফোর্ডের হাঁসকে ধরে নিয়ে যাব বলে—রাজপ্রাসাদের সরোবরে খেলা করবে।

অ্যান্ : (নিজের মনে) ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দাও!

হেন্‌স্ : মা, একটা সোজা প্রশ্ন করি—টেম্‌স্ নদী কি আভনের থেকে চওড়া নয়?

শেক্স : কিন্তু টেম্‌সে কাদাও বেশি।

হেন্‌স্ : তা হতে পারে—তবে টেম্‌সের জলের জাদুর ছোঁয়ায় বাচ্চা হাঁসের পালকে দীপ্তি লাগে।

শেক্স : স্ট্র্যাটফোর্ডের হাঁসের রঙ কিন্তু কালো।

হেন্‌স্ : কালো হাঁসই তো বেশি দুর্লভ। লণ্ডন থেকে আসার সময় দেখেছিলাম ঐ রকম এক কালো হাঁস [অ্যান্‌কে] লণ্ডন এক আজব শহর! আপনার স্বামী লণ্ডনে গেলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গোটা পৃথিবীকে একটা ছোট্ট আপেলের মধ্যে ভরে নিয়ে আসতে পারে।

অ্যান্ : আমরা সাধারণ লোক। এই ছোট্ট স্ট্র্যাটফোর্ডে অত বড় পৃথিবীর জায়গা কোথায়?

হেন্‌স্ : কেন? আপনার বাগানে পুঁতবেন, জ্ঞানবৃক্ষের ফুলে-ফলে গোটা বাগানটা ছেয়ে যাবে।

অ্যান্ : [অন্যদিকে ফিরে নিজের মনে] আমার বাগানে আগেই ফল ধরেছে!

হেন্‌স্ : [চাপা গলায়] কালো হাঁস তার সঙ্গী কালো হাঁসকে খুঁজছে।

শেক্স : কোনো মেয়ে?

অ্যান্ : [হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে] ও তোমাকে কি বলল উইল?

হেন্‌স্ : আমি আবার কি বললুম? ও…কিছু বলেছি বুঝি? মানে আমি বলছিলাম কি যে লণ্ডনে একজন পুরুষের মতো যে কোনো মেয়েও রাতারাতি তার ভাগ্য ফেরাতে পারে। এই তো, কিছুদিন আগে একটি মেয়ে রাজসভায় এলো…কতই বা বয়স?—বছর ষোল হবে! কিন্তু আজ?—সমস্ত লণ্ডনের সেরা সেরা লোকগুলো ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে—

অ্যান্ : আর মেয়েরা?

হেন্‌স্ : ওর পায়ের তলায়।

অ্যান্ : রাণী কি বলেন?

হেন্‌স্ : চুপ করে দেখেন আর কালো মেয়ের পায়ের তলায় হাজার পুরুষের রঙ্গ দেখে হাসেন।

অ্যান্ : ওঃ, মা!—

হেন্‌স্ : তোমার স্ত্রী কি অসুস্থ, উইল?

শেক্স : অ্যান্!

অ্যান্ : আমি একটু বসছি। আমার বড্ড দুর্বল লাগছে।

শেক্স : আমি তোমার মাকে ডেকে নিয়ে আসছি। [বেরিয়ে যায়]

অ্যান্ : তাড়াতাড়ি ··উইল আসার আগে শীগ্‌গির বলুন—ঐ মেয়েটির কি নাম?—কেমন দেখতে ওকে?—বলুন···বলুন।—স্ট্র্যাটফোর্ডে এত বাড়ি থাকতে কেন আমাদের বাড়িতে এলেন আপনি? ওঃ ঈশ্বর! আমি বেশ বুঝতে পারছি—আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে—কেন, এত প্রশংসা করলেন এই মেয়েটির, কেন বললেন উইলকে লণ্ডনের কথা?—আপনি কেমন করে বুঝবেন আমার কি ক্ষতি হয়ে গেল আজ?—ঐ মেয়েটিকে কি খুব সুন্দর দেখতে? —বলুন তাড়াতাড়ি বলুন!

হেন্‌স্ : সত্যি কথা বলতে এমনটি আর দেখিনি। ময়ূরপঙ্খী বজরা যখন জোয়ারের সময় ভরা পালে ভেসে যায়—তেমনি এই লণ্ডনের কৃষ্ণকলি। ওর বড় গর্ব প্রত্যেক পুরুষ ওর আঙুলের ইশারায় নাচে। তবে একজন মেয়ে···

অ্যান্ : কোন্ মেয়েকে ভয় করে ও?

হেন্‌স্ : মহারাণীকে।—আমি ওর চোখে ভয়ের আভাস দেখেছি।

অ্যান্ : আমি মহারাণীকে ভয় করি না।

হেন্‌স্ : [মুচকি হেসে] ইংলণ্ডেশ্বরীকে চেনেন না আপনি। যখন তিনি অল্প হেসে আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে থাকেন তখন মুহূর্তের ইশারায় যে কোনো লোকের ভাগ্য নির্ণয় হয়ে যায়।

অ্যান্ : আমি মহারাণীর ছবি দেখেছি। দুশ্চিন্তায় ক্ষয়ে যাওয়া চেহারা··· আমার মতো। রাণীকে আমার ভয় নেই। তিনি নিজের মনের জ্বালা দিয়ে আমার যন্ত্রণা বুঝতে পারবেন।···কিন্তু এই মেয়েটি— এর নাম কি?

হেন্‌স্ : মেরী—

[শেক্সপীয়র মিসেস্ হ্যাথাওয়েকে নিয়ে ঢোকে]

অ্যান্ : মেরী! মেরী!—বহুদিন আগে আর একজন মেরী আমার বোন এলিজাবেথের পথের কাঁটা হয়ে এসেছিল না?

হেন্‌স্ : উইল! তোমার স্ত্রী কি পাগল হয়ে গেছে? ও বলে কি না মহারাণী এলিজাবেথ ওর বোন!

অ্যান্ : আমি পাগল নই···আমি পাগল নই···। কিন্তু উইলকে বলুন 'আমি পাগল'—ও তাহলে আপনাকে মাথায় নিয়ে নাচবে।

হেন্‌স্ : তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে, বন্ধু।—অন্য কোনো সময়···অন্য কোনো জায়গায়—

শেক্স : কি ব্যাপার! তুমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছ?

হেন্‌স্ : তোমার স্ত্রী বোধ হয় খুব অসুস্থ—

শেক্স : হ্যাঁ—এত অসুস্থ যে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু এত অসুস্থ নয় যে—(অ্যান্‌কে চুপি চুপি) অ্যান্! ও চলে যেতে চাইছে কেন? কি বলেছ তুমি আমার বন্ধুকে?

অ্যান্ : তোমার বন্ধু?

শেক্স : হ্যাঁ, আমার বন্ধু!

অ্যান্ : যে লোকটিকে তুমি জীবনে একবার মাত্র দেখেছ, সে তোমার বন্ধু? কি চায় ও এখানে? কেন এসেছে এই ভবঘুরে লোকটা? —কেন?

শেক্স : চুপ কর! আমার বাড়িতে আমার বন্ধুদের সম্পর্কে এ রকম কথা বলার সাহস কোথা থেকে এল তোমার?

অ্যান্ : চুপ করব না আমি!

শেক্স : চুপ কর বলছি!

অ্যান্ : করব না চুপ, কিছুতেই না···কিছুতেই না।···মারলে—তুমি আমাকে মারলে উইল···।

শেক্স : কি বলছ তুমি? আমি তোমাকে ছুঁই নি।

অ্যান্ : এঁ্যা! মারো নি! তবে···তবে·· আমার এত কষ্ট হচ্ছে কেন? এখানে···এখানে এত যন্ত্রণা···

মিঃ হ্যাথ : খুব যন্ত্রণা হচ্ছে? আমার সঙ্গে আয়···। আয় অ্যান্। চিন্তা কোরো না, ভয়ের কিছু নেই···আমি বুঝেছি ওর কি হয়েছে। (শেক্সপীয়রকে) তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

অ্যান্ : মা, মাগো, আমার বুকের এখানটায় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে—(দু-জনে বাইরে যায়)।

শেক্স : ওঃ! আমি পাগল হয়ে যাব। এই মেয়েরা যখন আঁকড়ে ধরে··· ডুবে-যাওয়া মানুষ যখন জলের ওপরে ওঠার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে

তখন যদি কেউ তাকে আঁকড়ে ধরে…ঠিক তেমনি…ওঃ মনে হচ্ছে আমার দম আটকে আসছে!

হেন্‌স্ : বেশি দিন মিশলে সব মেয়েই ঐ রকম করে। আমি বলি কি গান গাও আর ফূর্তি কর।

শেক্স : আমার মা—

হেন্‌স্ : (কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে) হুঁ…তোমার মা—

শেক্স : আমার মা এরকম ছিলেন না। শান্ত, সমাহিত।—ইউক্যালিপটাস্ গাছের মতো—ঝড়ে, দমকা হাওয়ায় অনড়, অচঞ্চল। হেন্‌স্‌লো! তুমি এরকম মেয়েদের দেখেছ?—এরকম কোনো মেয়েকে—

হেন্‌স্ : লণ্ডনে এসো…নিজের চোখ ভরে দেখতে পাবে।

শেক্স : লণ্ডন! লণ্ডন চিরকাল আমার স্বপ্নই থাকবে। হেন্‌স্‌লো, তুমি জানো না…আমার ডানা গেছে ভেঙে, পায়ে আঁট হয়ে লেগেছে বেড়ী। লণ্ডন চিরকাল আমার কল্পলোকের দিগন্তেই থাকবে, কোনো দিন এগিয়ে আসবে না।—তুমি হাসছ?—কেন?

হেন্‌স : আমি ঐ লণ্ডনেই থাকি।

শেক্স : ওঃ! আমি যদি তুমি হতাম! তাহলে দেখতে…লণ্ডনের হাজারো মুখ, অসংখ্য কণ্ঠস্বর আমার কাছে এসে ভিড় জমাত প্রকাশের অনুনয় নিয়ে। আর আমি—সম্রাটের মতো আমার কল্পলোকে ডেকে নিতাম তাদের।—আমার সুরের তালে তালে তারা নেচে উঠত!… তারপর একদিন…কে জানে…হয়তো আমার গানে মুগ্ধ হয়ে ইংলণ্ডেশ্বরী…হ্যাঁ, ইংলণ্ডেশ্বরী…আঃ যদি আমি লণ্ডনে যেতে পারতাম!

হেন্‌স্ : আমাদের সঙ্গে চলে এস। তোমার কাজ তৈরি আছে…আমরা আজ রাতে লণ্ডন রওনা হচ্ছি।

শেক্স : আমার পথ লণ্ডনের পথ নয়! সারা জীবন আমায় ষ্ট্র্যাটফোর্ডের চারপাশের রাস্তায় ঘুরপাক খেয়ে মরতে হবে।…এই গোলকধাঁধাঁ থেকে আমার মুক্তি নেই…।

হেন্‌স্ : যেমন তোমার পছন্দ।

শেক্স : আমার পছন্দ! আমি পছন্দ করব। আমি বিবাহিত এমন একটি মেয়ের সঙ্গে যার জীবনে আমার প্রয়োজন আর সব কিছুর থেকে

বেশি।···আমার বয়স কুড়ি।—কেন, কেন তুমি এলে হেন্‌স্‌লো? সংসারের কাজে ফাঁকি দিয়ে পলাতক আমি সারাদিন স্ট্র্যাটফোর্ডের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম···শিশিরের বুকে পৃথিবীকে দেখে থমকে যেতাম···রডোড্রেণ্ডনের গন্ধে চমক লাগত আমার·· চাঁদের আলোয় মাতাল হয়ে অতন্দ্র চুপ করে থাকতাম···ভাবতাম, একি বিস্ময়! এমনি এক রাতে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল আমার কাছে। আমার হাত ধরে বলল, 'ভালোবাসো, ভালোবাসো, আমায় ভালোবাসো।' ··চাঁদের আলোয় সব কিছু যেন কেমন হয়ে যায়।—নিয়ে এলাম তাকে আমার ঘরে···অন্ধকারে সেই রহস্যময়ী মিলিয়ে গিয়েছে··· পড়ে রয়েছে···। উঃ আমি বড় ক্লান্ত!

হেন্‌স্‌ : তুমি বরং তোমার স্ত্রীকে বল মহারাণী তোমাকে তলব করেছেন···।

শেক্স : সত্যি? সত্যি মহারাণী আমাকে—

হেন্‌স্‌ : ভ্যালা বিপদে পড়লুম। সোজা কথাটা বোঝে না। জগতে কোন্‌ স্ত্রী আছে নিজের স্বামীর আখেরটা বুঝবে না? তোমার স্ত্রীকে যদি বোঝাতে পার মহারাণী তোমায় বড়লোক করে দেবেন···ব্যস্‌ কেল্লা ফতে।

শেক্স : অ্যান্‌কে বলব বলছ···

হেন্‌স্‌ : হ্যাঁ, তাই বলছি। ওকে বুঝিয়ে বল। আমি রাতে আসব, যাবে কি যাবে না তখন বোলো। আমি এখন চলি···দলের সবাই তো সরাইখানায় নরক গুলজার করছে···এখন থেকে তাগাদা না লাগালে আজ রাতে আর যাওয়া যাবে না।

[বেরিয়ে যায়]

শেক্স : আজ রাতে! (চেঁচিয়ে ডাকে) অ্যান্‌! অ্যান্‌! (ইতস্তত পায়চারী করতে থাকে) ওঃ আজ রাতে যদি ঐ কুয়াশায় ভেজা রুপোলি পথ ধরে লণ্ডনের পথে পাড়ি দিতে পারি! (চেঁচিয়ে) অ্যান্‌!

অ্যান্‌ : (ঢুকতে ঢুকতে) তুমি ডাকছিলে? তোমার সঙ্গী চলে গেছে? উইল, তুমি কি এখনও রেগে আছ? লক্ষ্মীটি, এখন রাগ নয়··· আজ আমাদের আকাশে এক নতুন তারা উঠেছে···।

শেক্স : তুমি···তুমি জানলে কি করে?

অ্যান্ : আমি জানি…ওঃ…আমার কি খুশি লাগছে।

শেক্স : অ্যান, মিষ্টি…লক্ষ্মী সোনা…। তুমি তাহলে জানো? তোমার ভয় করবে না? তোমার ভালো লাগবে? অ্যান্ তুমি কি করে জানলে?

অ্যান্ : মা বলল আমায়।

শেক্স : তোমার মা আমাদের কথা শুনেছেন? জানো মহারাণী আমার নাটকের কথা শুনে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আঃ লণ্ডন! লণ্ডন!…আমি লণ্ডন যাচ্ছি তোমার একটুও খারাপ লাগছে না? এই তো…এই তো আমার সোনা মেয়ে…আমার লক্ষী বৌ…

অ্যান্ : আঃ মা! এতো তারা নয়…এ যে উল্কা—হঠাৎ মিলিয়ে গেল… অন্ধকারে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, মা!

শেক্স : তোমার মা তোমাকে কি বলেছেন?

অ্যান্ : কিছু নয়। আঃ ওরকম শক্ত করে তাকাচ্ছ কেন? লণ্ডনে যাচ্ছ তুমি! মহারাণী তোমাকে ডেকেছেন? আমি নিশ্চয় সাহায্য করব তোমায়।…তোমার আনন্দেই আমার সুখ!

শেক্স : অ্যান্, স্ট্রাটফোর্ড থেকে বিদায়…যতদিন না জীবনের লড়াই শেষ হয়।

অ্যান্ : ক্ষেত-খামার তাহলে সব বেচে দিতে হবে।

শেক্স : কেন? বেচতে হবে কেন?

অ্যান্ : বোকা ছেলে! নাহলে আমাদের চলবে কি করে লণ্ডনে?

শেক্স : কি বললে তুমি? আমাদের? ওরা যে পথ দিয়ে যাবে সে পথ বড় কঠিন—

অ্যান্ : আমি ভয় করি না!

শেক্স : তুমি অসুস্থ!

অ্যান্ : ও কিছু নয়। আমি ঠিক হয়ে গেছি।

শেক্স : না! না! না! তা হয় না! আমি জীবনকে একা দেখতে চাই! তোমার ফ্রকের কোণে মুখ ঢেকে আমি সারাজীবন কাটাতে পারব না।

অ্যান্ : আমি তোমার কোনো অসুবিধে ঘটতে দেব না। স্ত্রী হিসেবে না হোক সঙ্গিনী করে নাও আমাকে!

শেক্স : না—আমি বলছি তা হয় না ! পৃথিবীকে নিজের মতো করে আমায় জানতে দাও। তুমি আমার থেকে সাত বছরের বড় বলে তোমার কাছে আমায় জীবনের শিক্ষা নিতে হবে ?

অ্যান্ : ঈশ্বর ! এও ছিল আমার ভাগ্যে !

শেক্স : তুমি জানো না · আমার সমস্ত ইচ্ছেগুলো এই চার দেওয়ালের মাঝখানে ঘুরপাক খেয়ে মরে···ওরা চায় সূর্যের আলো দেখতে··· কিন্তু তুমি···তুমি দরজা বন্ধ করে রেখেছ।

অ্যান্ : আমি এখন কি করব ? কেমন করে আমার দিন কাটবে ? কেন, কেন তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে ?

শেক্স : এই কেন-র উত্তর তুমি নিজেই ভালো করে জানো !

অ্যান্ : জানি বৈকি, খুব ভাল করেই জানি যে তোমার অলস মুহূর্তগুলো কাটানোর জন্য আমায় কাছে টেনেছিলে।

শেক্স : তোমার বোকামির জন্য তুমিই এগিয়ে এসেছিলে—আমি তোমাকে চাই নি।

অ্যান্ : মিথ্যে কথা ··মিথ্যে কথা ! নিজের কাজ ফেলে Shottery-র পথে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে না তুমি ? রবিবার চার্চ থেকে ফেরার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে মেঠো আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে হারিয়ে যেতে না তুমি ? তারপর···তারপর সন্ধ্যে নেমে আসত·· চাঁদ উঠত আকাশে···। কেন, কেন তুমি আমার সঙ্গে থাকতে···আমাকে ভালোবাসাতে আর বিশ্বাস করতে বাধ্য করাতে যে তুমি আমাকে ভালোবাসো।

শেক্স : আমার অলস প্রহর তোমার পূজা নিয়ে কেটে যেত। তুমি সুলভ ছিলে।

অ্যান্ : (চিৎকার করে) মিথ্যে কথা !

শেক্স : মিথ্যে কথা ? আমি সেই দিনগুলোয় তোমার চোখে দেখি নি স্তুতির ভাষা ! করতে না তুমি আমায় পুজো যেন আমি স্বর্গের দেবতা !—সেদিন ভালো লেগেছিল সেই নিবেদিতার নিবেদন···আজ আমার কাছে সে শুধুমাত্র অলস খেলা—আমি অনেক বদলে গেছি।

অ্যান্ : তুমি বদলাতে পার ; আমি পারি না। আমি চিরকালের নারী—আমার পরিবর্তন নেই। তুমি হাত বাড়ালে সমস্ত পৃথিবী হেসে

ওঠে—অন্যদিকে মুখ ফেরালে দু-চোখ ভরে নামে আঁধার। তবু এই কান্নাহাসির দোলার মাঝে সব সময় আমি তোমাকে ভালোবাসি…

শেক্স : অলস কথায় নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। লণ্ডন আমাকে যেতেই হবে—পারলে আজ রাতেই—

অ্যান্ : আজ রাতেই ?

শেক্স : যত তাড়াতাড়ি পারি।—বাচ্চাটি জন্মালেই—কবে বাচ্চাটির জন্ম হবে ?

অ্যান্ : খুব শিগ্‌গির ; আর বেশি দিন নেই—

শেক্স : কবে ?

অ্যান্ : আমি—আমি ঠিক জানি না ··

শেক্স : মার্চে ?

অ্যান্ : কি জানি…বোধ হয়—

শেক্স : তুমি মার্চে বলেছিলে না ?

অ্যান্ : বোধ হয় ঈস্টারে—

শেক্স : ঈস্টার তো মে মাসে—মার্চে হওয়ার কথা ?

অ্যান্ : তাহলে··তাহলে বোধ হয় মার্চেই—

শেক্স : কি ব্যাপার, অ্যান্ ?

অ্যান্ : আমার সঙ্গে আরও কিছুদিন থাক। বসন্তের পরে গ্রীষ্ম আসবে—তখন·· তখন যেও। কিন্তু তখন তুমি আর যেতে পারবে না, আমি জানি।

শেক্স : গ্রীষ্ম ! গ্রীষ্ম কেন ? বসন্তেই হওয়ার কথা ?—

অ্যান্ : আমি এসব প্রশ্নের উত্তর দেব না—আমার গোপন কথা গোপনই থাকুক !

শেক্স : গোপন কথা !

অ্যান্ : গোপন কথা—আমার কি গোপন কথা থাকতে পারে ?—আমি ওকথা বলতে চাই নি !—আর যদি থাকেই…তোমার স্বপ্ন তুমি গোপন করে রাখতে পার আমি পারি না—

শেক্স : বাচ্চাটি কবে হবে ?

অ্যান্ : জুন·· মা বলে জুনে··কি জানি হয়তো জুলাইতে…এসব মেয়েদের কথা তুমি বুঝবে না।

শেক্স : জুলাই ?

অ্যান্ : ওঃ। তুমি তাকিয়ে আছ কেন? ওরকম করে তাকিও না। জুন না, বোধ হয় মে মাসেই···মে তো বসন্তেরি পূর্ণ প্রকাশ—

শেক্স : জুলাই! গত জুলাইতে তুমি আমার কাছে এসেছিলে—আগামী জুলাই-এ পুরো এক বছর হবে! তাহলে তুমি যখন অঝোরে কেঁদে, বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে আমার হাত ধরে বলেছিলে আমি তোমাকে গ্রহণ না করলে আভনের জল ছাড়া তোমার আর কোনো পথ খোলা নেই···তখন···তখন তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে?

অ্যান : আমার দিকে অমন করে তাকিও না।

শেক্স : প্রয়োজন নেই।—মিথ্যে দিয়ে তুমি আমাকে বেঁধে রেখেছ!

অ্যান্ : আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম।

শেক্স : তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে?

অ্যান্ : তোমাকে পাওয়ার জন্য। তোমাকে হারানোর ভয়ে···যন্ত্রণায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম!

শেক্স : তুমি এত নোংরা, নীচ যে যন্ত্রণার জ্বালায় আত্মসম্মান ভুলে গেলে—মিথ্যে কথা বললে! তোমার জন্য হয়তো কষ্ট পেতে পারতাম—কিন্তু তুমি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছ! তোমার একটুও লজ্জা করল না মিথ্যে বলে আমাকে আটকাতে যখন তুমি খুব ভালো করে জানতে আমি তোমাকে ভালোবাসি না!

অ্যান্ : নাঃ, অন্তত সেই একটি মাস চাঁদের আলোয়, কুয়াশার কুহকে···তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে!

শেক্স : কোনোদিন আমি তোমাকে ভালোবাসি নি।

অ্যান্ : মনে কর—যেদিন আমার হাতে বুনো গোলাপের কাঁটা ফুটেছিল··· আমার হাত ধরে মিষ্টি করে ডাক নি 'অ্যান্'?

শেক্স : আমি ভুলে গেছি সেসব কথা।

অ্যান্ : গত বাসন্তী পূর্ণিমায় চাঁদের আলোয় যখন স্ট্র্যাটফোর্ড ভেসে গিয়েছিল··· সেই রাতে আমায় কাছে টেনে···অতি যত্নে···গোপনে তোমার স্বপ্নের কথা বল নি আমায়!

শেক্স : সেই রাতে আমি স্বপ্ন-বিভোল ছিলাম।

অ্যান্ : সেই রাতে—সেই রাতটির জন্য অন্তত তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে,

উইল! সেই পবিত্র চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে একবার তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে!

শেক্স : তুমি জানতে তা আর যাই হোক প্রেম ছিল না।

অ্যান্ : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হ্যাঁ, আমি জানতাম।—আমি জানতাম তুমি আর আসবে না। আমি অপেক্ষা করলাম···ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম দিনরাত···তুমি আর এলে না। আমার লজ্জা করত ভেবে—আমি নিজে যাব তোমার কাছে? রাতের পর রাত।—দিনের পর দিন কাটল অপেক্ষা করে। শেষে আর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গেলাম একদিন তোমার কাছে সব লজ্জা ছেড়ে।

শেক্স : হ্যাঁ, মিষ্টি মিথ্যের উপহার নিয়ে।

অ্যান্ : মিথ্যে বলছ কেন? বল স্বপ্ন—আমার স্বপ্ন, একটি ফুটফুটে বাচ্চা তোমাকে বেঁধে রাখবে আমার সঙ্গে।

শেক্স : তুমি কি পাগল?

অ্যান্ : সেদিন আমি পাগল হয়েছিলাম, এখন নয়।

শেক্স : কেন তুমি এরকম করলে—কিসের লোভে?

অ্যান্ : কিসের লোভে?—তোমাকে পাওয়ার জন্য। বিশ্বাস কর, আমার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না! কেন আমি এরকম করলাম তা বুঝবে না উইল?—আমায় দয়া কর, উইল—আমাকে দয়া কর!

শেক্স : দয়া! তোমাকে আমি চিনি না। তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বললে?

অ্যান্ : নিষ্ঠুর! কি প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বলে আমি এইরকম করেছি তা বুঝলে না?···শুধু এক কথায় রায় দিয়ে দিলে 'মিথ্যেবাদী'!

শেক্স : যত সাজিয়েই কথা বল মিথ্যে সব সময়েই মিথ্যে। এতদিন তোমার সব সহ্য করেছি দাঁতে দাঁত চেপে···ভেবেছিলাম অন্তত বিশ্বাসটুকু আছে আমাদের সম্পর্কে—

অ্যান্ : বলে যাও!

শেক্স : বল। তুমি নিজেই বল।—কবে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি?

অ্যান্ : বলে যাও।

শেক্স : কি দরকার? এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি, একটি কথাও বলি নি।

আজ বলার দরকার ফুরিয়েছে—আমি মুক্ত !···আমি আজ থেকে মুক্ত···আমার আর কোনো পিছু টান নেই।—

অ্যান্ : (উইলের হাত ধরে) তুমি যাবে না !

শেক্স : আমি যাবই—আমার পার্স···কাগজপত্র—

অ্যান্ : উইল !

শেক্স : দেওয়ালকে বল যা বলার আছে। আমার শোনার প্রবৃত্তি নেই।

অ্যান্ : উইল ! একজন খুনী আসামীকেও আমার মতো অবস্থায় লোকে দয়া করে। আর আমি···আমি তোমাকে শুধু ভালোবেসেছি··· আর কোনো অপরাধ তো আমি করি নি। এখন কেন আমাকে ফেলে যাচ্ছ যখন সেদিনের মিথ্যে আজ সত্যে পরিণত হয়েছে— ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতোই আমার সত্তায় ঘুমিয়ে রয়েছে !

শেক্স : আবার নতুন করে মিথ্যে ?

অ্যান্ : মিথ্যে নয় উইল, মিথ্যে নয় !

শেক্স : ছোটবেলায় স্কুলে পড়েছি, যত অভ্যাস করবে ততই ফল পাবে !

অ্যান্ : আমি শপথ করে বলছি—

শেক্স : আগেও যেমন শপথ করেছিলে ! দু-বার আমি ঠকতে রাজী নই, অ্যান্ !

অ্যান্ : আমার সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তে একি অভিশাপ দিলে তুমি, ঈশ্বর।

[ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অসহায় ভাবে ফায়ার প্লেস-এর পাশে অ্যান্ বসে পড়ে। অনেক-গুলো কণ্ঠস্বর কাছে আসতে থাকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গানের কথা শোনা যেতে থাকে।]

অভিনেতার দল (গান) :

ডাক দিয়েছে লণ্ডন ঐ, আয়রে বোকা মোদের সাথে
চল ছুটে ঐ শহর পানে সোজা রে—
থাকবে না তোর ভাবনা কিছুই, ঘুচবে জ্বালা হাতে-নাতে
বুকের থেকে নামবে দুখের বোঝা রে—।
বৈঁচি ভরা বনের ছবি—থাক পড়ে থাক পিছে সবই,
লণ্ডনে যে ফলের মেলা—আস্বাদে তার মাতাল হবি।

এক্ষুনি চল, লণ্ডনে চল,
স্বপ্নের লণ্ডন !
[আহা] উজ্জ্বল লণ্ডন !

[উচ্চগ্রামের গান ধীরে ধীরে গুণগুণানিতে নেমে আসে। হেন্‌স্‌লো জানলা দিয়ে উঁকি মারে]

হেন্‌স্‌ : সূর্য ডুবল বলে···আকাশটা সোনালি হয়ে উঠেছে···। উইল, কি ঠিক করলে ?

শেক্স : সোনালি কুয়াশার ওপারে লণ্ডন···লণ্ডন !

হেন্‌স্‌ : চলে এস তাহলে।

শেক্স : একটু অপেক্ষা কর—আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই।—ও কাদের গলা ?

হেনস্‌ : দলের অভিনেতারা—তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

শেক্স : তুমি ভেতরে এস।

হেনস্‌ : তোমার স্ত্রী কি ভেতরে আসতে বলেন ?

শেক্স : স্ত্রী ? কে স্ত্রী ? [খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে চলে যায়]

[হেন্‌সলো ঘুরে এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়]

হেন্‌স্‌ : ভেতরে আসব ?

অ্যান্‌ : উইল কি বলল তা তো শুনলেন !

হেন্‌স্‌ : আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।

অ্যান্‌ : এটা উইলের বাড়ি—আমার নয়।

হেনস্‌ : (স্বর ভাঁজতে ভাঁজতে)

এক্ষুনি চল্‌, লণ্ডনে চল্‌,
স্বপ্নের লণ্ডন !
[আহা] উজ্জ্বল লণ্ডন !

বড্ড দেরী করছে উইল। চাঁদ উঠে গেছে—এর মধ্যেই কুয়াশা ঘন হয়ে এসেছে—রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়বে।

অ্যান্‌ : (জানলার ধারে গিয়ে) সত্যিই কুয়াশা বড্ড ঘন।

হেন্‌স্‌ : ও কি করছেন ? লোকে বলে কাঁচের ভেতর দিয়ে চাঁদ দেখলে কপাল পোড়ে।

অ্যান্ : আমার কপাল সেদিনই পুড়েছে যেদিন কুয়াশার ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি—আশীর্বাদ চেয়ে !

হেন্‌স্ : আমি আগেই বলি নি ; আপনার নিজের ভাগ্যকে বড় ভয় !

[শেক্সপীয়র সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরের মধ্যে ঢোকে,
হাতে একটা পুঁটলি]

শেক্স : অ্যান, তুমি ঐ যারা বাইরে ঠাণ্ডায় কাঁপছে ওদের ভেতরে এনে বসালে পারতে তো, কিছু খাবার-দাবার দিতে পারতে ওদের।

হেন্‌স্ : (ওদের কাছে এসে) তুমি তৈরি ? চাঁদ অনেকটা ওপরে উঠে গেছে—আমাদের কিন্তু এক্ষুণি রওনা হতে হবে।

শেক্স : তোমরা এগোও ; আমি এক্ষুণি তোমাদের ধরে নিচ্ছি।

[হেন্‌স্‌লো বেরিয়ে যায়। আস্তে আস্তে আবার গান ভেসে আসে···ক্রমে মিলিয়ে যেতে থাকে। উইল টেবিলের ধারে গিয়ে বই গোছাতে থাকে।]

ডাক দিয়েছে লণ্ডন ঐ, আয়রে বোকা মোদের সাথে
চল্ ছুটে ঐ শহর পানে সোজা রে—
থাকবে না তোর ভাবনা কিছুই, ঘুচবে জ্বালা হাতে-নাতে,
বুকের থেকে নামবে দুখের বোঝারে—!
নাই যদি বা থাকিস গাঁয়ে, বাইরে হাওয়া বনের ছায়ে ;
শস্যে ভরে উঠবে রে মাঠ, দেবে সবার প্রাণ জুড়ায়ে—
তোকে ছাড়াই, তোকে ছাড়াই—
আয়রে তবে লণ্ডনে যাই—
চল্‌রে বোকা লণ্ডনে যাই—!

অ্যান্ : উইল !

শেক্স : তোমার প্রয়োজনের জন্য ক্ষেত-খামার সব রইল।

অ্যান্ : উইল ! (উইলের হাত আঁকড়ে ধরে) আমার বড্ড ভয় করছে, এ রকম নিঃসঙ্গ আমায় ফেলে যেও না—আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও ! না, তুমি এইখানেই থাক···দেখ একটু পরেই মনে হবে এতক্ষণ যা ঘটেছে সব দুঃস্বপ্ন।

শেক্স : আমার যে ক্ষতি তুমি করেছ তা আমি কোনোদিনও ভুলব না।

অ্যান্ : ভুলে যেতে তো বলিনি…বিস্মৃতি তো ঘৃণার থেকেও অসহ্য। মনে রেখো আমাকে। আর মনে রেখো- -নানান্ লোকের ভিড়ে তুমি যখন হাঁপিয়ে উঠবে, নানান্ কাজের খেলা যখন ফুরোবে তোমার …তখন…আমি…আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

শেক্স : নাটক শেষ কর…আমাকে যেতে দাও।

অ্যান্ : মনে রেখো জীবন-জীবন খেলা শেষ হলেও জীবনের অনেকটা পড়ে থাকবে তখনও আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য।

শেক্স : আমি চললাম।

অ্যান্ : জীবনের সব প্রয়োজন ফুরোলে. ক্লান্তিতে কারো কোলে মাথা রেখে ঘুমোতে ইচ্ছে হলে মনে রেখো—আমি রইলাম—

শেক্স : কোনোদিন নয়!

[উইল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, একটু পরেই কয়েক মুহূর্তের জন্য জানলা দিয়ে ওর মূর্তি silhouette-এ দেখা যায়]

(দূর থেকে) আঃ লণ্ডন! লণ্ডন! লণ্ডন!

অ্যান্ : (হঠাৎ চিৎকার করে) আঃ আকাশটা এত কালো কেন মা?

মিঃ হ্যাথ : (ভেতর থেকে) অ্যান্! অ্যান্! তুই কোথায়!

[দরজা দিয়ে ঢোকেন]

অ্যান্, অ্যান্! এই অন্ধকার ঠাণ্ডায় একলা কি করছিস তুই!

অ্যান : আমি অপেক্ষা করছি!

—পর্দা—

(ক্রমশ)

কালিদাস দত্ত

স্বর্গারোহণ

জুড়ানের ঘুম ভাঙল আচমকা। বুকে যেন বিছায় কামড় দিল। চতুর্দিক আন্ধার। আকাশ ম্যাঘ-ম্যাঘ। বুক ডলা দিল জুড়ান। জোরের চোটে বুকের গাছ কয় লোম উঠে এল হাতে। না, বিছায় কামড়ায় নাই। জলুনি জলে বুকের অভ্যন্তরে। কামড়ায়, দিবারাত্র কি যেন কামড়ায়। কামড়াইবো না? আইজ-ই তো শ্যাষ দিন। ঈশ্বর, আইজ-ই আমাগো শ্যাষ দিন।

কুসুমকে ধাক্কা দিয়ে ডাকল, অ ছোট বৌ, ছোট বৌ, অ পরাইণ্যার মা, ওঠো না? রওনা দেবা কখন? ওঠো, আর ঘুমাইও না। হের পর পথে লোকজন চলব-ফিরব।

জুড়ানের ইচ্ছা করল, কুসুমকে এই অন্ধকারে, এই বাহু-মেলা বৃক্ষের তলায়, কালো নক্ষত্রখচিত আকাশকে সাক্ষী রেখে শেষবার আদর করে, জীবনের শেষ সুখ ওর শরীরে গেঁথে দেয়। কিন্তু শক্তি নাই, মাথা ঝিম ঝিম করে, পেটে তিন দিন ভাত না পড়লে শরীর কথা শোনে না।

: ওঠলানি?

কোলের শিশুটি ক্ষীণস্বরে আর্তনাদ করে উঠল। কুসুম ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘুম-জড়ানো চোখে আতঙ্ক-মেশানো কণ্ঠে বলল, ভোর হইছে?

: ভোর কই? দেরী আছে ভোরের। অখনই রওনা দিতে হয়। দূর আছে না? এক কোড়শ হাঁটন লাগবো। ওরে অ পরাইণ্যা, ওঠো বাবা। আর ঘুমায় না। বিমলির ঘুম দেহি ভাঙে না। এত চিক্‌খইরেও মাইয়া ঘুমায় ছাহো—

বিমলি আগেই জেগেছিল। মুখ গুঁজে পড়েছিল মাটিতে। পরনের তেনা হাঁটুর ওপর উঠে গিয়েছিল। শীত শীত লাগছিল, আশ্বিন মাস, ভোরের দিকে এখন শীত পড়ে বেশ, এক পা অন্য পায়ে ঘষে পরনের তেনা টেনে নামাবার চেষ্টা করছিল। এবার বুকে আড়াআড়ি ভাবে দু-হাত জড়িয়ে

উঠে বসল, হাঁটুতে মুখ গুঁজে ও কাঁদতে থাকল নীরবে। কী যেন একটা বিভীষিকার ষড়যন্ত্র চলছে। তের বছরের কিশোরী আঁচ করতে পারছে, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছে না। বুকের মধ্যে একটা হুতাশ ঠেলে ঠেলে উঠছে, ও বুঝতে পারছে না। বাবা আর মা তিন দিন ধরে কি যেন একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করছে। দু-দিন হল শহরের আস্তানা ছেড়ে ওরা কেবল হাঁটছে। নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, কেবল হাঁটছে। কোন্ অজানা নিরুদ্দেশ জগতের দিকে ওরা কেবল হেঁটেই চলেছে।

গতকাল ভয়ে ভয়ে ও একবার জিজ্ঞেস করেছিল মাকে, কই যাইত্যাছি মা আমরা? শরীল যে আর বয় না, মা? তোমার পায়ে ধরি, কও, কই চলছি আমরা?

কুসুম উত্তর দিয়েছিল, কইলকাতা।

তারপর একটু থেমে বলেছিল, নারে বিমলি। মিছা কইলাম তোরে। চলছি আমরা স্বর্গে। তুমি বড়ো হইছ মা। পরাইণ্যা যেন ট্যার না পায়। স্বর্গে গেলে তুমি সুখে থাকবা।

স্বর্গ কোথায় কি বৃত্তান্ত কিছুই জানে না বিমলি। তবু অনেক সুখের আশ্বাস সত্ত্বেও ওর কচি বুকের মধ্যে কি যেন এক আথালি-পাথালি চলছিল. কেমন যেন দ্রুত কণ্ঠ শুকিয়ে আসছিল, ঘন ঘন তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল।

দূরে বোধ হয় কোনো গির্জা কিংবা কবরখানা আছে। ঢং ঢং শব্দে রাত্রি দুটো বাজল। কালো আকাশে উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র আড়াআড়ি ভাবে খসে পড়ল। অরণ্যসদৃশ প্রান্তরে পেঁচার কর্কশ মৃত্যুসঙ্গীত শোনা গেল।

বাবার চোখের দিকে পিচুটি-মাখা লাল চোখে অপলক তাকিয়ে পরাণ বলল, মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভাঙাইলা ক্যান্ বাবা?

জুড়ান বোকার মতো হাসার চেষ্টা করল। ওকে কেমন ভীতু এবং দুর্বল বোধ হচ্ছিল। কোথায় যেন কোন্ অশান্তি হৃদয়ের মাটি খুবলে খুবলে সাহস এবং শক্তির শিকড়গুলো আলগা করে দিয়েছে। যেন নেশাতুরের মতো নেশার ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা উচ্চারণ করছে। বললে, আমরা অখন হাঁটা দিমু, বাবা।

: ক্যান্? এত রাত্তিরে ক্যান্? মোটে তো রাইত দুইটা বাজল?

: আরে ছাওয়াল। তকরার করতে নাই। আমি তোর বাবা।

তগো মঙ্গলের জন্যই দিবারাত্র চিন্তা করি। অখন হাঁটা না দিলে ষ্টিমার ধরুম ক্যামনে? কথা বোজছ? আইজই ষ্টিমার ধরন চাই।

কুসুম বুকের শিশুকে বিমলির কোলে দিল। অন্ধকারে নক্ষত্রের আলোয় ভৌতিক, ছায়া ছায়া, আবছা আকারের অদূরবর্তী জুড়ানের চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, কুপিটা ধরাও এট্টু।

: কাম নাই, কাম নাই। অ্যাখনের কিছু লাগবো না। চলো হাঁটা দি। আন্ধারই ভালো।

: ভাত রান্ধুম।

কানের পাশে বজ্রপাত হলেও অতটা চমকে উঠত না জুড়ান মিস্তির। তার মৃত চোদ্দ পুরুষ যেন অট্টহাস্য করে উঠল। ভয়াবহ তমসাবৃত এই কুটিল মধ্যরাত্রে পিশাচের কানে কে যেন ঈশ্বরের প্রেমনাম উচ্চারণ করল।

: কি কইলা কুসুম? ফিরা কও।

: কুপি ধরাও। ভাত রান্ধুম।

: ভাত?? চাউল পাইলা কই?? তিন দিন অনাহারে আমরা পথ চলত্যাছি, তুমি চাউল পাইল্যা কই? আগো, চাউল পাইল্যা কই?

অনাহারে শীর্ণ, বিশুষ্ক, মুখে দীর্ঘদিন অ-কামানো দাড়ি, জুড়ানের দুই চোখে ধিকি ধিকি অঙ্গার জ্বলে উঠল। বললে, চাউল পাইল্যা ক্যামনে? কথা যে কও না? চাউল আনলা কি দিয়া?

কুসুম এবার কাঁদল। অন্ধকারে তার গালের উপর দিয়ে ভোগবতীর দুই ধারার মতো শুভ্র দুটি রেখা চিক চিক করল। বললে, আগো, তুমি কুপিটা ধরাও। কোথায় চাউল পাইলাম শুইনো না। দুঃখ পাবা।

: আমি শুনুম—জুড়ানের গর্জনে পরাণ দাঁড়িয়ে উঠল। বাবার কাছে এসে দাঁড়াল প্রহরীর মতো। লোকটা ভয়ংকর রাগী। কি করতে কি করে ঠিক নাই।

কুসুম পরাণকে বললে, পরাণ, বয় গিয়া ওইখানে দিদির কাছে। ক্ষিধা পাইছে, বাবা? ভাত খাবি? আচ্ছা, বসো গিয়া। আমি ভাত রান্ধুম অখন।

স্নেহের স্বরে পরাণ ভেঙে পড়ল। তেজী ঘোড়ার মতো এতক্ষণ রুখে ছিল। ঠিক সমানে হেঁটে এসেছে দুই দিন। প্রায় জল ছাড়া কিছুই খায় নি। একমুঠ শুকনো চিড়া মুখে ফেলে জল খেয়েছে দু-বার দুই দিনে।

কিন্তু বাবা মা—কাউকে বিব্রত করে নি। এবার স্নেহের স্বরে মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ন বছরের শিশু ডুকরে কাঁদতে শুরু করল: ক্ষিধায় প্যাট জ্বইল্যা যায় মা। না খাওয়াইয়া আমাগো প্রাণ দিবা নাকি মা।

: যাও, দিদির কাছে বসো গিয়া। আমি রান্ধি। না খাইয়া আমরা যামু না।

পরাণ দুর্বল শরীরে হরিণশিশুর মতো লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

: চাউল পাইল্যা কই?

: কাইল ভিক্ষা করছি।

: ত'রে আমি খুন করুম—

উদ্যত মুষ্টিতে জুড়ান লাফিয়ে পড়তে চাইল কুসুমের গায়ে। কিন্তু আঘাতের পূর্ব মুহূর্তে উদ্যত মুষ্ঠি আলগা হয়ে সাড়াশির মতো নেমে এল প্রিয়তমা কুসুমের অবয়বে। কী হবে আঘাত দিয়ে? সবই তো শেষ হবে আর কিছু সময় পরে। শরীরের সমস্ত আক্ষেপ দিয়ে মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো কুসুমের শরীরটাকে শুধু দুই হাতে আঁকড়ে ধরল জুড়ান। আঘাত দিতে না পারার 'জ্বালা' জুড়াতে চাইল আদরের অত্যাচারে। অদূরে অন্ধকারে দুই পুত্র কন্যা। কিছু ভ্রূক্ষেপ নাই জুড়ানের। কুসুমের বুকে গলায় মুখে পাগলের মতো চুমা খেল। হয়তো বা কামড়াল। বললে, আমারে মাপ কইরো ছোট বৌ। বড়ো সুখের এই জীবন। এই পিরথিমী নিমকহারাম, নির্দয়। রান্ধো। আমি কুপি ধরাই। শ্যাষ রান্ধা রান্ধো।

গাছের ফোকরে কুপি ধরাল জুড়ান। অন্ধকারের সমুদ্রে স্তিমিত আলোকস্তম্ভের মতো কুপির শিখা বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠল। সেই মাঝ রাত্তিরে অরণ্যপ্রান্তের প্রান্তরে, গাছের ঢেউ-খেলা শিকড়ে মাটির হাঁড়ি বসিয়ে, অশ্রুর বন্যায় ভাসতে ভাসতে কুসুম ভাত রান্না করল। সেই সামান্য অন্ন ওরা সবাই মিলে ভাগ করে খেল। পরাণ বন্ধুর মতো প্রসন্ন দৃষ্টিতে তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। জুড়ান সেই হাসি দেখে শিহরিত হল। হাসি ফেরত দিতে পারল না।

: এখন হাঁটা দিতে হয়।

: আইজ থাউক। দোহাই তোমার।

: না। চুক্তির খেলাপ কইরো না, কুসুম। হৃদয় বড়ো দুর্বল মানুষের।

পিরথিমীতে আইস্তা এত অপমানের পরেও আবার সাধ যায় সাইধ্যা লাত্থি খাইতে? মানুষের হৃদয় বড়ো দুর্বল, কুসুম। তুমি হের পর রোজ রোজ ভিক্ষা করবা। স্বামীরে যে কথা দিছ কথা রাখতে পারলা না? মরতে এত ভয় পাও কুসুম?

: আস্তে। ওরা শুনবো।

: আর লুকাইয়া লাভ কি?

: থাউক, থাউক। চলো হাঁটা দি। কত দূর আর তোমার নদীর পার। এই হ্যাশে নদী ক্যান ঘরের পাশে নাই? এত কি হাঁটন যায়?

জুড়ান নিঃশ্বাস ছাড়ল। বললেঃ বড়ো নদীতে যাই আমরা। বড়ো নদীতে শান্তি আছে। নিমেষে সব শ্যাষ। কষ্ট পাবা না। আর এক কোড়শ পথ। আরে, পরাইণ্যা, ওইগুলান থাউক। নিতে লাগবো না। কইলকাতায় অনেক হাড়ি কলসী মিলব। চলো বাবা, তাড়াতাড়ি হাঁটা দিই।

জুড়ানের হাতে মোটা এক লাঠি। শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে একটি তীর্থযাত্রী দল চলেছে অন্ধকারের বুক চিরে। শ্লথ গতিতে অনেকেই পিছিয়ে পড়তে চায়। জুড়ান লাঠি দিয়ে তাড়া লাগায়। হঠাৎ জুড়ান যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। প্রাণে আর ফুর্তি ধরে না তার। মনের আতঙ্ক সে উপরের ফুর্তি দিয়ে ঢাকতে না পেরে শেষে শ্যামাসঙ্গীত ধরল, চোখ বাঁধা কলুর বলদের মতো মা আমায় ঘুরাবি কত—

ভোর হতে এখনও দেরী আছে। উঁচু পাড় থেকে নিচে জলের দিকে তাকালে ভয় করে, মাথা ঘুরে যায়। জলরাশি পোয়াতির মতো শরীরে মোচড় দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে ঢলে পড়ছে। জল পাক দিয়ে উঠছে। শুশুকের মতো হঠাৎ পিঠ দেখাচ্ছে, মসৃণ হয়ে উলটে পালটে ছুটে চলেছে। বোধ হয় এখানে ঘূর্ণি আছে। এক নিমিষে সব শেষ হতে পারবে।

: শোনো পরাণ, দিদিরে ডাকো। কইলকাতা যাওয়ার স্টিমার খরচ লাগবো। কইলকাতার এক বাবু আইছিল। বাজী ধরছে—কয় কিনা এখানে তিনজন একসঙ্গে সাঁতর দেওয়া শক্ত। তুমি ভালো সাঁতর জানো। পারবা না? বাজী জিতলে কইলকাতা যামু, তুমি ইস্কুলে পরবা। বড়ো

হবা। একটা কথা কই, বাবা মানুষরে কখনো অপমান করবা না, ঠকাবা না। ভয় পাও নাকি ?

শিশু পরাণ উত্তর দিল, না তো। পরমুহূর্তে জিজ্ঞেস করল, সেই লোক কই বাবা ? যিনি বাজী ধরছে কইলা—

: নদীর ওই পাড়ে। দূরবীণ কারে কয় জানো ? চইক্ষে লাগাইয়া দূরের জিনিস—অনেক দূরের জিনিস দেখন যায়। ওই পাড় থিকা দেখতে আছে।

: মায় কান্দে ক্যান ?

: ভয় পাইছে। ডুইব্যা যাবা সকলে, তাই ভয়ে কান্দে।

: দিদি কান্দে ক্যান ?

: আরে পোলা, তুমিও দেখি ডরাও। মাইয়ামানুষ কান্দবো না ? পুরুষমানুষ কান্দে না। আমি কান্‌ত্যাছি ? তুমি কান্দো ? মায়রে জিগাও দড়িগাছ কই রাখল ?

বালক পরাণ ক্রন্দনরতা কুসুমের কাছে দড়ির খোঁজে গেল। কোলের শিশুকে বুকে চেপে অধীরভাবে কাঁদছে কুসুম।

কাছে বাবার দিকে পিছন ফিরে কিশোরী বিমলা হাতের পিঠ ডলে চোখ মুছছে, আবার চোখে জল উজিয়ে উঠছে। ওর তেনা-পেঁচানো পিঠ থর থর করে কাঁপছে। সব এখন জলের মতো পরিষ্কার।

কুসুম নদীর কিনারা থেকে উন্মাদিনীর মতো ছুটে এল। বললে, থুইয়া আইছি গাছতলায়। দড়ি আনি নাই।

কাপালিকের দৃষ্টিতে জুড়ান তাকাল কুসুমের দিকে।

: কী ? ইচ্ছাটা কি ? ভুইল্যাই থুইয়া আইলা ? সত্যই কি ভুইল্যা ? হারে, মাইয়ামানুষ, কথা রাখতে জান না। খালি ডরাও। এখন উপায় ? দড়ি না হইলে বান্ধ্‌বা কিসে ?

ওরা আগেই ঠিক করেছিল কোলের শিশুকে জুড়ানের কাছে রেখে মা ছেলে এবং মেয়ে একসঙ্গে দড়ি জড়িয়ে নদীতে ঝাঁপ দেবে। শেষে জুড়ান ঝাঁপ দেবে শিশুকে কোলে নিয়ে! কিন্তু দড়ি আনতেই ভুল হয়েছে। কুসুমের মরবার ইচ্ছা নাই। তাই ভুলে সে দড়ি ফেলে এসেছে। দুঃখের চরম মুহূর্তে, দুর্বলতায়, অঙ্গীকার করেছে মরার, এখন আর কথা ফিরানো যায় না। "সোয়ামী কয়, আমি ডরাই। হায়রে।"

জুড়ান তাকাল কিশোরী বিমলার পরনের তেনার দিকে। দৈর্ঘ্যে ছোট, সুপারির লাগান বুকও ঢাকে না। চোখ ফিরিয়ে তাকাল কুসুমের শাড়ির দিকে। দশ হাত। নিজের ধুতির দিকে তাকাল। শত ছিন্ন।

: শোন। তোমার শাড়ির পাইড় চওড়া আছে। ওই পাশে গিয়া পাইড়টা ছিড়া আনতে পারো? এ ছাড়া উপায় কি কও?

চোখের জল মুছে কুসুম বললে, পারুম। তুমি পিছন ফিরা খাড়াও।

: তাড়াতাড়ি কইরো। রাইত আর বেশি নাই। দিনমানে ভয় পাবা। নদীর পাড়ে লোকজন আসব।

কুসুম ঐ যায় কুরুশ আনতে। খেস্টান পাদরী ফাদার স্যামুয়েল বাড়ুইজ্জা একবার কইছিল, যীশুরে আপন কুরুশ আপন স্কন্ধে বহন করতে অয়। আরও কইছিল, পাপের বেতন মৃত্যু। আমরা কী পাপ করছিলাম গ অঃ!

শাড়ির বিবর্ণ লাল পাড় দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা শেষ করল বুকের কাছাকাছি পরাণ বোধ হয় এবার বুঝতে পারছে। চোখের মধ্যে কেমন একটা অবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠছে। বললে, বাবা, হাতশুদ্ধা বান্ধলা ক্যান। সাঁতর দিমু ক্যামনে?

ও জোর করে পাশে-রাখা হাতদুটো বাঁধন ছাড়িয়ে মাথার উপর তুলল, বাঁধনটা ঠিকমতো বুকের উপর বসাল যেন ব্যথা না লাগে, তারপর শূন্যে দুই হাত নেড়ে দেখল সাঁতর কাটায় কোনো অসুবিধে হবে কিনা।

জুড়ান শিশুপুত্রকে কোলে নিল। ক্রন্দনরতা বিমলিকে বললে, কান্দিস না মা। যদি সাতরাইয়া ওপারে যাইতে পারো, তোমার রাঙা টুকটুইকা পুত্তুরের সঙ্গে বিয়া হবে। প্যাটে সন্তান ধরবা। সুখী হবা। আমারে মার্জনা কইরো মাইয়া। জীবনে অনেক পরীক্ষা দিছি। এই পরীক্ষাখান বাকি ছিল।

বিমলা উত্তর দিল, জানি, বাবা।

জুড়ান কুসুমের দিকে ফিরে বলল, আর ক্যান, কুসুম। এইবার আউগাও।

কুসুম চোখের জল মুছল। স্বামীর পায়ে প্রণাম করার জন্য নিচু হবার চেষ্টা করল। একত্র বাঁধা দড়ির চাপে নিচু হতে পারল না। যুক্তকর কপালে

ঠেকাল। বলল, পোলারে আমার কোলে ছাও। আমি কোলে নিয়া লাফ দিমু। তুমি পুত্রঘাতী হবা ক্যান?

জুড়ান শিশুপুত্রকে কুসুমের কোলে দিল। একটা স্থূল প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো ছয় পায়ে গুটি গুটি দলটা খরস্রোতা নদীর উঁচু টিলার মতো পাড়ের দিকে অগ্রসর হল।

জুড়ান পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল বধ্যভূমিতে ম্যাজিস্ট্রেটের মতো। যন্ত্রণায় ওর মাথা নত, এইবার চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে।

নদীর একেবারে কিনারে এসে দলটা ঘাড় ফিরিয়ে নিচে তাকাল। প্রায় হাত পাঁচেক নিচে কালো জলের রাশি পাক দিয়ে ছুটে চলেছে দ্রুত উড়ন্ত মেঘের মতো। ক্ষুরধার স্রোত। কুটো পড়লে দুখান হয়ে যায়।

আকাশ স্তব্ধ নিথর মেঘে ঢাকা, পৃথিবীর মাথায় কালো কংক্রীটের ছাতের মতো হুমড়ি খেয়ে আছে। যেন মনে হয়, এই পৃথিবী নিরন্ধ্র এক জেলখানা, আলো-বাতাসহীন ছাত যেন একেবারে ঘাড়ের উপর। গাছের পাতা নড়ছে না কেন? পাখিরা ভোরের এই পূর্বমুহূর্তে সূর্যের বন্দনায় নিত্যকার মতো কাকলি করে না কেন? নদীর এই খরস্রোত ভিন্ন আর সবকিছু এত স্তব্ধ, শিহরিত, মূর্চ্ছিতপ্রায় কেন? জীবনের ধ্বনি, কলতান, সঙ্গীত সব বুঝি সমাপ্ত হয়েছে।

এইবার ন বছরের শিশু পরাণ সবই বুঝল। মায়ের বাহু ধরে বলল, আমরা মরতে যাই, না মা?

এক হাতে শিশুকে কোলে চেপে কুসুম অন্য হাতে পরাণের মাথায় আদর করল। বলল, না, বাবা, আমরা বাঁচতে যাই। তোমার ভয় করে?

পরাণ মাকে অভয় দিল, না, মা, এট্টুও ভয় করে না। মরলে কি হয় মা?

: বসুন্ধরার ভার কমে, বাবা। দুঃখ বিনাশ হয়। স্বর্গে গিয়া নিত্য অন্নব্যঞ্জন লাভ হয়। সেখানে মানুষ শুধু হাসে, কান্দে না। আর দেরী না বাবা। আইসো, লাফ দাও।

কোলের শিশুটি তীক্ষ্নস্বরে চিৎকার করে উঠল ঠিক সেই মুহূর্তে। লজ্জা ভয় সব অতীত। কুসুম সন্তান, স্বামীর সামনেই শিশুর মুখে স্তন গুঁজে দিল। বাছা আমার। বুকে চেপে ধরল প্রাণপণ শক্তিতে। এই ধরণীরে আর বিরক্ত কইরা কান্দে না, বাবা।

শস্য-কুসুমাচ্ছাদিত, সবুজ, শ্যাম, উজ্জ্বল, বহুবর্ণরঞ্জিত শৃঙ্খলিত এই পৃথিবীতে যেন প্রথম ভূমিষ্ঠ নবজাত এক শিশুর প্রতিবাদ ধ্বনিত হল মৃত্যুর বিরুদ্ধে। যোগনিদ্রা থেকে কে যেন বর্শার ফলা বিঁধিয়ে জুড়ান মিস্ত্রিরকে দু-পায়ে দাঁড় করিয়ে দিল। এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্ন, মায়া এবং মোহের অভিনয় চলছিল। অবাস্তব, অবিশ্বাস্য। রূঢ়তা, ক্রূরতা এবং ঘাতকের পার্ট ওরা ভালো করেছে। সব চাইতে ভালো করেছি আমরা মরার পার্ট। নির্বিরোধ মৃত্যু। বীরতুল্য আত্মহনন। এই যে শিশু ব্রহ্মভেদী, তীক্ষ্ণ, তীব্র, আর্তনাদের প্রতিবাদমুখর বর্শা ছুড়ল তাতে আমি শ্রীজুড়ান মিস্ত্রির বিদ্ধ, রক্তাক্ত এবং জাগ্রত হতে পারলাম। আমাকে আমার বাজে পার্টের জন্যে মাপ কোরো।

জুড়ান মিস্ত্রির ছুটে এসে ছয় পায়ের রজ্জুবদ্ধ দলটিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। নাগাল পাওয়া যায় না। সেই রক্তাক্ত প্রত্যূষে খরস্রোতা নদীর কুটিল সর্বগ্রাসী জলরাশির উপর দাঁড়িয়ে স্তন্যদানরতা, অপূর্বমাধুর্যমণ্ডিত কুসুমের মুখমণ্ডল দুই অঙ্গুলিতে তুলে জুড়ান মিস্ত্রির বলেছিল, "এই সোন্দর পিরথিমিতে আমরা মরি ক্যান, কুসুম ?"

পুস্তক-পরিচয়

নৈরাজ্যবাদ। অতীন্দ্রনাথ বোস। রূপা। দশ টাকা।

বাংলাভাষায় লেখা রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কীয় প্রামাণ্য বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বিশেষ একটি রাষ্ট্রীয় মতবাদ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণ্য বই হিসাবে 'নৈরাজ্যবাদ' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। আড়াই হাজার বছর আগের চীনের 'তাও'বাদ থেকে আরম্ভ করে বিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগের রাসেল প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের মতবাদের উল্লেখ এবং তার ব্যাখ্যা করে নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদের এক ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবেও বইটির গুরুত্ব যথেষ্ট। অনিবার্য কারণে বইখানি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা সম্পূর্ণ করার আগেই লেখকের মৃত্যু হয়। বইখানিকে কেবলমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হিসাবে রচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। নৈরাজ্যবাদের সমগোত্রীয় একটি রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রণয়ন ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ভূমিকায় একথা বলা হয়েছে :

"নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী দার্শনিকের চিন্তা নিয়ে বিভিন্ন পুস্তক রচিত হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় নৈরাজ্যবাদী ভাবনা সংকলিত করে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের এখনও অভাব রয়েছে। লেখক এই অভাব পূরণ করতে চেয়েছিলেন এবং স্থির করেছিলেন সর্বশেষে তিনি ভাবী সমাজ গঠনের তাঁর এক নিজস্ব পরিকল্পনা দেবেন যাতে গণতন্ত্র ও সমাজবাদের এক বাস্তব সমন্বয়সাধন হয়তো বা সম্ভব। অর্থাৎ, বইখানি শুধুমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসে পর্যবসিত না হয়ে হবে একটি নতুন সমাজ-দর্শন। তাঁর সমস্ত জীবনের চিন্তার পূর্ণ পরিণতি আত্মপ্রকাশ করবে এই গ্রন্থে।"

লেখকের এই ঐকান্তিক উদ্দেশ্যের চরিতার্থ রূপ হিসাবে এই গ্রন্থের প্রকাশ হলে হয়তো বাঙালী পাঠক অনেক বেশি উপকৃত হত; হয়তো রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন হত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয় নি। কেবলমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হিসাবেই বইখানি প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু কেবলমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হলেও দুটি বৈশিষ্ট্য বইখানির

গুরুত্ব বাড়িয়েছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মতবাদগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে অত্যন্ত সরলভাবে। বক্তব্যের এই সরলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রত্যেকটি মতবাদের মূল প্রবক্তার নিজের কথা। বিভিন্ন মতবাদের প্রধান প্রধান বইগুলি থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি ভাষান্তর করে উদ্ধৃত করায় মতবাদগুলি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন মতবাদের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও প্রামাণ্য রক্ষা পেয়েছে।

নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম বিভাগ-দুটি কালানুক্রমিক (প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগ)। প্রাচীন যুগের মতবাদগুলির ভেতরে আলোচিত হয়েছে চীনের 'তাও'বাদ, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে বর্ণিত নৈরাজ্যবাদের কথা, আর প্রাচীন গ্রীসের সিনিক ও স্টোইক মতবাদের কথা। মধ্যযুগের পাশ্চাত্ত্য জগতে ধর্মীয় আর রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়—তার বর্ণনা আছে দ্বিতীয় বিভাগের আলোচনায়। শেষ দুটি বিভাগ 'প্রজ্ঞান যুগ' আর 'বিপ্লব যুগ' বলে সূচিত করা হলেও এখানে কালানুক্রম বিশেষ নির্দিষ্ট ভাবে অনুসৃত হয় নি। 'প্রজ্ঞানযুগ'-পর্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি মতবাদের আলোচনা করা হয়েছে—এই মতবাদগুলির প্রবক্তা হলেন গডউইন, প্রুধোঁ ও ম্যাক্স স্টার্নার। 'বিপ্লবযুগ'-এ আলোচিত হয়েছে বাকুনিন, ক্রপটকিন-এর মতবাদ, রুশ-নিহিলিজম, সিণ্ডিক্যালিজম আর আমেরিকার ওয়ারেন, থোরো আর বেঞ্জামিন টাকারের মতবাদ।

দুই

প্রাচীন যুগে নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কীয় যে সমস্ত মতবাদ দেখা যায় সেগুলির উৎপত্তি ঐতিহাসিক কারণে হলেও মতবাদগুলির বক্তব্য ইতিহাসাশ্রয়ী নয়। বাস্তব পরিবেশের প্রতি বিতৃষ্ণ মনের ভাব-কল্পনা রূপায়িত হয়েছে বিগত ইতিহাসের বিস্মৃত অবস্থার চিত্ররূপে। দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আর সামাজিক অনুশাসনের কপটতা উদ্বুদ্ধ করেছিল লাওৎসে আর চুয়াংৎসেকে প্রচলিত সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধকে ধিক্কার দিয়ে এক নতুন ধরনের মূল্যবোধ-এর কথা প্রচার করতে—যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের আদিম অকৃত্রিম স্বভাববৃত্তির ওপর। "আধুনিককালের নৈরাজ্যবাদীদের মতো

সে (তাও-বাদ) আইন ও শাসন, নীতি ও ধর্ম এ সমস্ত ধ্বংস করতে চেয়েছে। কিন্তু এদের বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ বলে সে মনে করে নি। সে জেনেছে এগুলি সভ্যতার বিকৃতি এবং প্রকৃতির দেওয়া সহজ সততাকে ফিরে পেতে হলে এগুলিকে সমূলে নাশ করতে হবে। প্রকৃতির হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে এবং প্রকৃতির সঙ্গে এক হতে পারলে তবেই তার নিয়মকানুন জানা যায়। তাতেই আনন্দ, তাতেই উন্নতি। এই সার কথাটি তাও-এর সুর—আর সব অসার বাকবিতণ্ডা।" (নৈরাজ্যবাদ : পৃষ্ঠা—১৭)

চীনের তাও-বাদে যেমন নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কীয় একটি মতবাদের সুস্পষ্ট রূপায়ণ পাওয়া যায়—ভারতীয় সাহিত্যে তেমন কোনো সুস্পষ্ট মতবাদের প্রণয়ন দেখা যায় না। মহাভারতের শান্তিপর্বে, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের ধর্মশাস্ত্রে—জৈনদের ধর্মগ্রন্থে—এই জাতীয় মতবাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু বেশির ভাগ গ্রন্থেই "আরাজক আদর্শ"কে নিন্দা করা হয়েছে। "ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শনে লোকায়তরা চরম বস্তুবাদ প্রচার করে যেমন অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছিল, রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে উগ্র বিরোধী মত পোষণ করবার জন্য অরাজকদেরও সেই দশা হল।…দণ্ডনীতির ধারকরা বিপক্ষের নিন্দাবাদ করবার জন্যে অরাজক ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন—এই কটূক্তি থেকেই জানা যায় যে অরাজক মতবাদটা একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না।" (পৃষ্ঠা—২)

বিভিন্ন শাস্ত্রে যদিও নৈরাজ্যবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে—তবুও 'অরাজক মতবাদ' যে কেবলমাত্র উপেক্ষণীয় ছিল না—তা নয়; ভারতের তৎকালীন ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে নৈরাজ্যবাদের অনেক ভাবসূত্রই সমাজব্যবস্থায় অনুসৃত হয়েছে। "রাষ্ট্র এখানে এক সর্বশক্তিমান দানবীয় আকার ধারণ করতে পারে নি। তার শক্তি ছিল বহুধা বিকেন্দ্রিত। …এই সমস্ত গোষ্ঠী এবং কুল, বর্ণ, রাষ্ট্র ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হত রাজবিধান দিয়ে নয়, শাস্ত্রবিধান দিয়ে।…সমাজকে শাসন করত দণ্ড নয় ধর্ম। রাষ্ট্রবাদীরা ধর্মকে দণ্ডের কবলে আনতে চেয়েছিল। তাদের সে চেষ্টা সফল হয় নি। ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনে এইটুকুই নৈরাজ্যবাদীদের সার্থকতা।" (পৃষ্ঠা—২৪)

পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় বিভিন্ন ভাবাদর্শ প্রথম রূপায়িত হতে থাকে গ্রীক

চিন্তাধারায়। গ্রীক চিন্তাধারাতেই নৈরাজ্যবাদের মূল ভাবনাগুলির প্রথম আভাস পাওয়া যায়। প্রধানত সিনিক ও স্টোইকদের মতবাদেই এই ভাবনাগুলি দেখা যায়। ভারতবর্ষে যেমন লোকায়ত আর অরাজক মতবাদকে অনেক বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে—সিনিক আর স্টোইক মতবাদও তেমনি বিকৃতরূপে প্রচারিত হয়েছিল বিরুদ্ধ মতবাদের পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা।

'সিনিক' দার্শনিকদের মধ্যে প্রধান দুজন হলেন এন্‌টিস্থিনিস আর তাঁর প্রধান শিষ্য ডায়োজিনিস্। গ্রীক গণতন্ত্রের অসারবত্তা, নগররাষ্ট্রের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব এবং নগররাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় নাগরিকদের বিশেষ সুবিধাভোগ ইত্যাদির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এঁরা রাষ্ট্রের ধারণাটির প্রখর সমালোচনা করেছেন এবং প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। 'আইন ও কমনওয়েল্‌থ্ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে এন্‌টিস্থিনিস্ "গ্রীকদের ধোপদুরস্ত নৈতিক সংস্কার ও আদবকায়দার সঙ্গে আদিম বর্বরদের স্বভাবসঙ্গত সুখী জীবনের তুলনা করেছেন। এ হিসেবে তিনি প্রকৃতিবাদী রুশোর পূর্বসূরী। গ্রীক চিন্তানায়কদের মধ্যে তিনিই প্রথম, যার ধ্যানমানসে ফুটে উঠেছিল অতি পুরাতন নিরাজ সমাজের ছবি, যাতে প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে শাসনহীন বন্যমানুষ ভরা জীবনের আনন্দে বিচরণ করছে।" (পৃষ্ঠা—২৮)

স্টোইকদের রাষ্ট্রচিন্তার আশ্রয় হল তাদের ভগবত তত্ত্ব। এঁদের মতে জ্ঞানীয় অথবা নৈতিক সমস্ত আদর্শের উৎস ব্যক্তি। কারণ ব্যক্তির মধ্যেই ভগবৎ সত্তার প্রতিফলন রয়েছে। ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধি তাই রাষ্ট্রের সমষ্টিগত বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে স্টোইকরা ব্যক্তিবাদী হলেও আরেকদিক থেকে দেখতে গেলে তাঁরা বিশ্ববাদী। কিন্তু এই দুই-এর ভেতর কোনো বিরোধ ছিল না। "কারণ ব্যক্তি ও বিশ্বে কোনো বিবাদ নেই।...যেহেতু প্রজ্ঞান বিশ্বব্যাপী ঐশ্বরিক জিনিস সে-হেতু একজনের প্রজ্ঞান-লব্ধ বিচার অপরের থেকে পৃথক হতে পারে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মূলত একই রকমের কারণ তাঁদের ইচ্ছা এক, অধিকার সমান।" (পৃষ্ঠা ৩৪)

তিন

প্রাচীন গ্রীসের সিনিক ও স্টোইক মতবাদের সঙ্গে মধ্যযুগে বিভিন্ন নৈরাজ্য-বাদী মতামতের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় রোমান স্টোইকদের মতবাদে।

এঁদের মধ্যে সেনকো আর এপিক্‌টেটাস হলেন অন্যতম। সেনকোর মতে পৃথিবীতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীই চূড়ান্ত শাসক নন। পৃথিবীতে একই সঙ্গে ঈশ্বরের এবং রাজার শাসন বর্তমান। যীশু খ্রীষ্টর চিন্তাতেও অনুরূপ মতের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি পুরোপুরি নৈরাজ্যবাদী ছিলেন না। তাঁর মতে "পার্থিব শাসন ও ঐশ্বরিক শাসন উভয়ের সহ-অস্তিত্ব সম্ভব।" কিন্তু উভয়ের সহ-অস্তিত্ব সম্ভব হলেও খ্রীষ্টের মতে পার্থিব শাসনের উৎপত্তি পাপ থেকে। রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে তাঁর বিরোধ না থাকলেও—তার প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। "কিন্তু এই উপেক্ষার মধ্যেই ছিল কম্যুনিজম ও এনার্কিজম-এর বীজ।" (পৃঃ ৪৫) সেণ্ট অগাস্টিনের "ঈশ্বরের নগরের পরিকল্পনায় পার্থিব শাসনের প্রতি ধিক্কার আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পার্থিব শাসনের উৎপত্তি পাপ থেকে। পাপকে সংযম করে যন্ত্রণা লাঘবের জন্য শাসনের প্রয়োজন হল। শাসনের দায় নিল রাষ্ট্র—'পৃথিবীর নগর'। যার জন্ম ও স্থায়িত্ব মানুষের বিকারে তা কখনো শুভ হতে পারে না।" (পৃঃ ৪৭)

পরবর্তীকালে মানবসমাজকে খ্রীষ্টানজগতের সঙ্গে এক করে ফেলা হল। যে-হেতু পার্থিব শাসন শুভ নয়—কাজেই ধর্মীয় শাসন পার্থিব শাসনের উর্ধ্বে। যিনিই ধর্মনায়ক—তিনি রাষ্ট্রনায়কও বটে। "কিন্তু ধর্মনায়ক নিজ হাতে রাজদণ্ড ধারণ করেন না···বাহ্যত রাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র থেকে পৃথক হলেও মূলত ধর্মতন্ত্র থেকেই এর উৎপত্তি।" (পৃঃ ৫০)

"মধ্যযুগের চার্চ ও স্টেটের দ্বন্দ্ব নিরাজবাদী ও রাষ্ট্রবাদীর দ্বন্দ্ব নয়, দুই প্রভুত্বলোভী লৌকিক সঙ্ঘশক্তির দ্বন্দ্ব। খ্রীষ্টান ধর্মোন্মাদনার চরম অবস্থায় চার্চ স্টেটকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল।···সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম-বিশ্বাসের যুগে নৈরাজ্যবাদীর সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে স্টেটের বিরুদ্ধে নয়, চার্চের বিরুদ্ধে।" (পৃঃ ৫১)

ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ইউরোপে মধ্যযুগে যে সমস্ত আন্দোলন দেখা যায়—তার মধ্যে ফ্রান্সের এলবিজেন্সিয়ান বিদ্রোহ, জার্মানীর কৃষাণ বিদ্রোহ, এনাব্যাপটিস্ট আন্দোলন অন্যতম। ধর্মীয় কর্তৃত্বের সর্বাত্মক শাসনের বিরুদ্ধে আর ঘোষণা করলেন ব্যক্তির বিবেকের মুক্তি। ধর্মীয় বিশ্বাস আর আচার অনুষ্ঠানের বিষয়ে রাষ্ট্র অথবা ধর্মীয় কর্তৃত্ব কারোরই কোনো এক্তিয়ার নেই।

তত্ত্বের দিক থেকে এনাব্যাপটিস্ট বা তাঁদের সমগোত্রীয়েরা নৈরাজ্যবাদী ছিলেন না। রাষ্ট্রকে তাঁরা সরাসরি ধ্বংস করতে চান নি। কিন্তু প্রত্যক্ষ

ভাবে বিনাশ না চাইলেও এঁরা রাষ্ট্রের যে রূপ কল্পনা করেছেন বা সাধারণ রাষ্ট্রকে যেভাবে পরিবর্তিত করতে চেয়েছেন—তাতে সাধারণ অর্থে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

চার

"সতের-আঠার শতকের জনবিদ্রোহ ছিল প্রধানত রাষ্ট্র-শাসনের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহীদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন বটে, তাঁরা রাষ্ট্রের আশ্রিত ধর্ম, বিত্ত এবং স্থিত স্বার্থকেও আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন সফল হয় নি।...সুতরাং আবার শুরু হল তীর্থযাত্রা সাম্য ও স্বাধীনতার অন্বেষণে। ধর্মবিপ্লব আঘাত করেছিল চার্চের কর্তৃত্বকে, রাষ্ট্রবিপ্লব রাষ্ট্রের প্রভুত্বকে। · ধর্মীয় মুক্তির স্বপ্ন সার্থক করবার জন্য প্রটেস্টান্ট আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসেছিল উগ্রপন্থী এনাব্যাপটিস্টরা; তেমনি রাষ্ট্রীয় মুক্তির স্বপ্ন সার্থক করবার জন্য জ্যাকবিন দলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এনার্কিস্টরা।...রাষ্ট্রের পোষ্যবর্গের সঙ্গে সঙ্গে তারা ধর্ম, বিত্ত ও শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হল।" (পৃঃ ৭০)

প্রাচীন যুগে নৈরাজ্যবাদ যদি হয় স্বপ্নসাধ, মধ্যযুগে নৈরাজ্যবাদ যদি হয় ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি—তবে 'এনার্কিজম' হল তাত্ত্বিক বিচারে পরীক্ষিত সমাজদর্শন। প্রজ্ঞানশীল নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইংল্যাণ্ডের উইলিয়ম গডউইন, ফ্রান্সের প্রুধঁ আর জার্মানীর ম্যাক্স স্টার্ণার।

গডউইনের মতে "আমাদের সমাজজীবনে ছেয়ে আছে এমন সব নীতিবোধ ও নিয়মকানুন যার সঙ্গে ন্যায়ধর্মের সঙ্গতি নেই, যা বস্তুত অন্যায়"। (পৃষ্ঠা ৭২) শেলীর 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড'—গডউইনের নৈরাজ্যবাদে যে হৃদয়বৃত্তির অভাব ছিল—তা পূরণ করল। আর ওয়েনের সমাজবাদী চিন্তায় এই নৈরাজ্যবাদ আরও পুষ্টরূপে প্রকাশ পেল। গডউইন-এর নৈরাজ্যবাদ আর ওয়েনের সমাজবাদ সমন্বিত হল ফরাসী দার্শনিক প্রুধঁর মতবাদে। "গডউইন ও প্রুধঁর মূল্যবিচারে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সমাজ নিষ্পাপ, রাষ্ট্র যত নষ্টের মূল।...যে দেশে যেমন মানুষ সে দেশে তেমন সরকার," তেমন জনসংঘ, তেমন পৌরসভা। কাঠামো বদলালে মানুষ বদলায় না, প্রশাসনের সংস্কার হয় না। গডউইন ও প্রুধঁ উভয়ের বিশ্বাস ছিল যে বুদ্ধির বিকাশ হলে সব দোষ শুধরে যাবে।" (পৃঃ ১১১-১১২)

ম্যাক্স স্টার্নারের নৈরাজ্যবাদ কেবল সামাজিক কর্তৃত্বের অপচয় অথবা দূষিত সমাজরূপের বিরুদ্ধেই নয়; মানুষের সামাজিক সম্বন্ধকেই তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন। গডউইন বা প্রুধঁ ব্যক্তিবাদী ছিলেন। কিন্তু এঁরা ব্যক্তির সমস্ত রকম সামাজিক সম্বন্ধকে অস্বীকার করেন নি। "গড-উইনের ব্যক্তি অপরের কল্যাণে সার্থক, প্রুধঁর ব্যক্তি অপরের সঙ্গে সহযোগে সম্পূর্ণ স্টার্নারের বিধানে জাস্টিস ও ম্যতুয়ালিতের জায়গা নেই, বিত্তের বিভাগ শ্রমের সংগঠন ইত্যাদি অবান্তর প্রশ্ন।" (পৃঃ ১৩৮)

পাঁচ

যে সময়ে ফ্রান্সে প্রুধঁ আর জার্মানীতে ম্যাক্স স্টার্নারের মত উদ্ভূত হয়েছিল —প্রায় সেই সময়েই রাশিয়ায় মাইকেল বাকুনিন নৈরাজ্যবাদের প্রচার এবং আন্দোলন শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ায় রাজনৈতিক চেতনার এক বিশিষ্ট অংশ জুড়ে রয়েছে নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারা। বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারায় প্রধানত তিনজনের প্রভাব দেখা যায়—ফয়েরব্যাক, মার্কস ও প্রুধঁ। তবে এঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল প্রুধঁর। এবং মার্কসের চিন্তাধারার কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ বিরোধ। তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার বদলে বাকুনিন কল্পনা করেছেন এক যুক্তরাষ্ট্রের— সেই যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে হবে নিরাজ গণতন্ত্র। নৈরাজ্যবাদী দর্শনে বাকুনিনের মৌলিক অবদান তেমন কিছু নেই। "কিন্তু কে অস্বীকার করবে একথা যে তাঁর তেজস্বী ব্যক্তিত্ব ও নিরলস সংগ্রাম নৈরাজ্যবাদকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে, পণ্ডিতের আসর থেকে নিয়ে এসেছে যোদ্ধার কুরুক্ষেত্রে, দার্শনিকের মিনার থেকে নামিয়ে এনেছে পথে-ঘাটে বস্তিতে পল্লীতে?" (পৃঃ ১৭৭) বাকুনিনের বিপ্লবাত্মক মতবাদ উনিশ শতকের রাশিয়ায় নিহিলিস্টদের অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছিল। বাকুনিনের পরে রাশিয়ার আরও একজন নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারাকে পুষ্ট করে তোলেন—আলেকজান্দার ক্রোপোটকিন। "ক্রপটকিনের লেখায় একটা অনবদ্য প্রাঞ্জলতা আছে যা প্রুধঁর রচনায় নেই, যুক্তি ও তথ্যের গাঁথুনি আছে, বাকুনিনে যার অভাব।" (পৃষ্ঠা ২০৫) এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার প্রবন্ধে ক্রপটকিন লিখছেন যে "নৈরাজ্যবাদী দর্শনে তাঁর প্রধান অবদান একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস।" (পৃষ্ঠা ২০৬) ক্রোপোটকিনের নৈরাজ্যবাদে তিনটি

ক্ষমতার হাত থেকে মুক্তির কথা দেখা যায়—ধনতন্ত্রের কবল থেকে উৎপাদনের মুক্তি, সরকারী শাসন থেকে মুক্তি আর ধর্মীয় নীতিশাস্ত্র থেকে মুক্তি। প্রুধঁ প্রভৃতির নৈরাজ্যবাদ ও মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব যুক্ত হয়েছে ফরাসী সিণ্ডিক্যালিস্টদের মতবাদে। নৈরাজ্যবাদ থেকে পৃথক হলেও প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে এঁদের মন্তব্যগুলি নৈরাজ্যবাদীদের মতোই।

ইউরোপে নৈরাজ্যবাদের উদ্ভব হওয়ার প্রায় কিছু আগে থেকেই আমেরিকার ম্যাসাচুস্টেসে নৈরাজ্যবাদী ভাবনা-চিন্তা প্রকাশ পায় যোসুয়া ওয়ারেন-এর মতবাদে। ওয়ারেন ছাড়া আমেরিকার নৈরাজ্যবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন আরও দুজন—থোরো আর টাকার। ওয়ারেনের চিন্তাধারায় সমাজবাদের কোনো কথা ছিল না। তার নৈরাজ্যবাদে ব্যক্তিসর্বস্ব নিঃশাসন সমাজের চিত্র রূপায়িত করা হয়েছে। থোরোর মতে স্বৈরতন্ত্র, লোকনিষ্ঠ রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্রমশ এগোচ্ছে ব্যক্তিপরায়ণতার দিকে। কিন্তু গণতন্ত্রই চরম অবস্থা নয়—এর পরে আসা উচিত নিরাজতন্ত্রের।

ছয়

নৈরাজ্যবাদের অন্তর্গত বিভিন্ন মতবাদগুলির বক্তব্যগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। তবুও যে রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রয়োগ-সিদ্ধ নয়—সেই ধরনের মতবাদগুলির আলোচনা ইতিহাসাশ্রয়ী না হয়ে—তত্ত্বগত হলে তাদের ভাববৈশিষ্ট্যগুলি সুনির্দিষ্টভাবে ধরা পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থে সে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নি। বিভিন্ন মতবাদগুলিকে একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্রে গ্রথিত করে উপস্থাপিত করায় সেগুলির তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয় নি; অথচ, শুধুমাত্র নৈরাজ্যবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টার ফলে বিভিন্ন মতবাদগুলির ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটিও সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট হয় নি। 'প্রজ্ঞানযুগ' আর 'বিপ্লবযুগ' এই দুই ভাগে যে সমস্ত মতবাদের আলোচনা হয়েছে সেই মতবাদগুলি সম্পর্কে ওপরের কথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উনবিংশ শতাব্দী ও তদুত্তর সময়ের সামাজিক-ঐতিহাসিক চিত্রপট অত্যন্ত জটিল এবং সুবৃহৎ। কাজেই এই সময়ের যে-কোনো সামাজিক ভাবাদর্শকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করতে হলে প্রশস্ততর পটভূমির বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। অন্যথায়—সেই ভাবাদর্শের মূল বক্তব্য বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

ভূমিকায় বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হিসাবে বইখানি রচনা করার উদ্দেশ্য ছিল না; যদিও লেখকের উদ্দেশ্য যথাযথ চরিতার্থ হয় নি। তবুও বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী মতবাদের বক্তব্য বলার সময় লেখক দুই-একটি মন্তব্য করেছেন মাঝে মাঝে, যেগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু যে-হেতু এ ধরনের মন্তব্য তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ হওয়াই সঙ্গত, রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে যাঁদের নির্দিষ্ট ধারণা নেই—তাঁদের কাছে এ ধরনের মন্তব্য বিভ্রান্তিকর। এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁদের কিছু ধারণা আছে তাঁদের কাছে—এ ধরনের মন্তব্য যথাযথ সন্নিবিষ্ট নয় বলেই মনে হবে।

বইটির সবশেষে সমীক্ষণ বলে একটি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদটি নিতান্তই অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। সম্ভবত লেখক এই পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ করার সুযোগ পান নি। অন্তত এই পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণরূপে পেলেও পাঠক যথেষ্ট উপকৃত হতেন। এই অংশের প্রথম দিকে নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে দুজন বিশিষ্ট সমালোচকের মতামতের উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা হলেন প্লেখানভ ও শ। বাকুনিনের মতবাদের সমালোচনা (প্লেখানভ কর্তৃক) উদ্ধৃত করে তার প্রতিসমালোচনা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বরং এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্লেখানভের প্রসঙ্গের অবতারণা করে লেখক মার্কসবাদকে কটুকথা বলার সুযোগ করে নিয়েছেন। এ বিষয়ে লেখকের কথাগুলি কতখানি বিচারসিদ্ধ এই প্রশ্ন না তুলেও বলা যেতে পারে যে এ-ধরনের বক্তব্য জোর করে টেনে আনা হয়েছে। নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে শ-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করে লেখক যে সমস্ত কথার অবতারণা করেছেন সেগুলির প্রাসঙ্গিকতাও সহজবোধ্য নয়। হয়তো প্লেখানভ এবং শ-এর মন্তব্যের আলোচনা করে লেখক মার্কসবাদ, নৈরাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু সে চেষ্টাও যথেষ্ট সার্থক হয় নি। সাধারণভাবে নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য এই অংশে লেখক করেছেন—সেগুলিও তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। তত্ত্ব হিসাবে বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী মতবাদগুলির লক্ষণ কি কি—সেগুলি নির্দেশ না করা হলে—যথাযথ সমীক্ষণ সম্ভব নয়।

গৌতম সান্যাল

মৃণাল সেনের "প্রতিনিধি"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শিল্পীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত স্বভাবের পর্দা উঠিয়ে মানুষের অন্তরের লীলাকে উদ্‌ঘাটিত করা, শুধুমাত্র স্বভাবকে নকল করা নয়। মোটামুটি সকলেই স্বীকার করেন যে বাস্তবের নির্জলা দাসত্ব শ্রেষ্ঠ শিল্পের চরিত্র নয়। চলচ্চিত্রকে যারা শিল্পসম্মান দিতে নারাজ—তাদের বক্তব্যের মূল কথা হল এই যে হয় তা বাস্তবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কর্মক্লান্ত অল্পবুদ্ধি দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য শস্তা স্বপ্নজগৎ তৈরি করে—কিংবা বড়জোর বাস্তবের নকলনবীশী করে। অধিকাংশ ছবি—বিশেষ করে ভারতীয় ছবি যে এর বেশি দূরে যেতে পারে না তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু যখন কোনো ছবি সত্যি সত্যি অস্তিত্বের মর্মমূলকে স্পর্শ করতে পারে তখন দর্শক হিসাবে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করি। মৃণাল সেনের 'প্রতিনিধি' আমাদের মধ্যে সেই উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

আমাদের মধ্যে একটা অভ্যাস চালু আছে শিল্পকর্মে পটভূমিকা এবং মূলশিল্পবস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে ধোঁয়াটে ধারণা নিয়ে অযথা বাজে তর্ক তোলা। 'চার অধ্যায়ে' রবীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদকে গালাগাল দিয়ে কতটা অন্যায় করেছেন, নারীস্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে অতএব "পুতুলখেলা"র অভিনয় করা আর উচিত কিনা, "কাঞ্চনজঙ্ঘা"-তে সত্যজিৎ রায় নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে কতটা ওকালতি করেছেন—এই সব প্রশ্ন নিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎসাহে নৈয়ায়িক আলোচনায় আমরা মাতি—শিল্পকর্মের প্রাণকেন্দ্রকে প্রায় বিস্মৃত হয়ে। "প্রতিনিধি"র বেলায় তার ব্যতিক্রম হয় নি। একদল বলেছেন বিধবাবিবাহ বিদ্যাসাগরী আমলের 'টপিক' তাই নিয়ে এত মাতামাতি কিসের—আরেক দল বলেন এসব আমাদের সমাজে চলে না। প্রথমত এ-জাতীয় আলোচনাকে গুরুত্ব দিলেও সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করতে হয় যে বিধবাবিবাহজনিত সমস্যা এখনও আমাদের জীবনে আধুনিক সমস্যা—বিদ্যাসাগর একে আদর্শগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেও এখনও আমাদের সমাজে এটা সহজ হয় নি। ঠিক যেমন ইবসেনের নোরার সমস্যা এখনও আমাদের আধুনিক সমস্যা, (সেটা যথেষ্ট টের পাওয়া যায় পুতুলখেলার অভিনয়কালে তৃপ্তি মিত্র যখন শেষদৃশ্যে সিঁথির সিঁদুর মোছেন), এমন কি 'মহানগরে'র আরতির সমস্যাও—ডালহৌসী স্কোয়ারে মেয়েদের উপস্থিতি সত্ত্বেও একথা সম্পূর্ণ সত্যি, কেননা তত্ত্বগতভাবে নারীস্বাধীনতার বুলি আওড়ালেও পুরুষ-প্রভাবিত সমাজের পুরাতন মূল্যবোধ এখনও আমরা আঁকড়ে আছি—অনেকটা ঐ টাইবাঁধা পুরুষসিংহের সত্যনারায়ণের সিন্নি খাওয়ার মতো ব্যাপার।

কিন্তু এ বাহ্য। "প্রতিনিধি" ছবিতে মৃণাল সেনের মূল উদ্দেশ্য বিধবা-বিবাহের নৈতিক বিচার নয়—তার উদ্দেশ্য নরনারীর সম্পর্কের নিবিড়তম

প্রদেশের উদ্ঘাটন—এবং বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ দুটি চরিত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব থেকে সঞ্জাত ট্র্যাজেডির রূপায়ণ (মৃণাল সেন স্বয়ং একথা বলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি একথাকে প্রকাশ করছি)। নাটকীয় সংঘাতের উপযুক্ত সামাজিক পটভূমিকা হিসাবেই তিনি বিধবা-বিবাহসমস্যার নির্বাচন করেছেন এবং সে নাটকীয় সংঘাত রচনায় বিধবার পূর্বপক্ষের শিশুপুত্র 'catalytic agent'-এর কাজ করেছে এইমাত্র। কিন্তু মূল কথা হল দুটি নরনারীর adjustment-এর সমস্যা এবং তাদেরই চরিত্র থেকে উদ্ভূত কারণে সে বোঝাপড়ার বিফলতা—তাই থেকে নিঃসঙ্গতা —সে নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর জন্য ব্যর্থ চেষ্টার ট্র্যাজেডি।

আলার্ডাইস্ নিকল গ্রীক ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনাকালে বলেছেন যে বাইরে থেকে নাটকের গতি যদিও 'Fate'-কে নির্ধারণ করতে দেখা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় "character is destiny". সত্যিকারের ট্র্যাজেডির স্রষ্টা চরিত্ররা নিজে বাইরের কোনো ঘটনা নয়। "প্রতিনিধি"র ট্র্যাজেডি সম্পর্কে সেকথা প্রযোজ্য। রমার অপরাধবোধ, দুর্বলতা, লজ্জা, নীরেনের চরিত্রেও কোথাও দৃঢ়তার অভাব—ওদের পারস্পরিক সম্পর্ককে গোড়া থেকেই ধীরে ধীরে দুর্বহ করেছে পরস্পরের পক্ষে, নাহলে "একটা বাচ্চা ছেলেকে দুটো বুড়োধাড়ি মানিয়ে চলতে" পারত।

আধুনিক জীবনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের চিত্রণে মৃণাল সেন অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন—চাপা সংঘাত রচনায় এ ছবি এমন একটি শিল্পমানের সৃষ্টি করেছে—যা বাংলা ছবিতে খুব কম দেখা গেছে—শুধুমাত্র "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র কথা বার বার মনে পড়ে। Polanski-র "Knife in the Water" বা Antonioni-র ছবিতে (দেখি নি—পড়েছি)-এর সাধর্ম্য মেলে এবং মৃণাল সেন স্বয়ং বলেন যে পাঠমারফত Antonioni-র শিল্পকর্ম তাকে প্রেরণা দিয়েছে। গভীর রাত্রে বিছানায় স্বামীর কাছে স্ত্রীর নিঃসঙ্গতা জ্ঞাপন এবং সেই নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য চাকরি করতে চাওয়া—স্ত্রীর মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশে স্বামীর ক্রোধ ও বিরক্তির বিস্ফোরণ—মনের রাগকে শরীরী প্রকাশ দেবার জন্য ঘড়ির চাবি দেওয়া,—কিংবা বর্ষার রাত্রে পাশের ঘর থেকে ছেলের ডাকে স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় আলিঙ্গনের আকস্মিক বিচ্ছেদের ভয়াবহতা, ছেলেকে লুকিয়ে জন্মদিনের উপহার দিতে যাবার আগে শাড়িবদলের দৃশ্য, নীরেনের মনোবেদনা—বাসের দৃশ্যকোণ থেকে দেখা চলমান কলকাতা, কিংবা স্কুল থেকে ছেলেকে চুরি করে নিয়ে আসবার সময়ে ট্রামের দৃশ্যকোণ থেকে নেওয়া দ্রুতগতিতে অপস্রয়মান পথের দৃশ্য, হাসপাতালের ছিমছাম ভাবালুতাবর্জিত দৃশ্য, কিংবা মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার দৃশ্যের অপূর্ব সংযম, বন্দুক পরিষ্কার করার সময় শিশুটির সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপনের দৃশ্য, শিশুটির অপূর্ব অভিব্যক্তি—এ সবই খুবই উচ্চমানের শিল্পকৃতির পরিচায়ক।

কিন্তু আগাগোড়া ছবিটিতে এই উচ্চমান রক্ষিত হয় নি। রমার

আগেকার শ্বশুরবাড়ির এপিসোডগুলি, কিংবা পাশের বাড়ির "গ্রাম্য লোক"-গুলির অনাবশ্যক উপস্থিতি যে শুধুমাত্র ছবিটির শিল্পগত ঐক্যকে বিনষ্ট করেছে তাই নয়, ঐ সকল অংশের অভিনয় এবং রূপায়ণ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের এবং ওখানে আমাদের গতানুগতিক বাংলা 'বই' উঁকি মারছে। শুধুমাত্র ট্রেনের আওয়াজের ওপর টাইটেলটি চমৎকার কিন্তু তার আগের পূর্বকথনের অংশটুকু সুনির্মিত হলেও অপ্রয়োজনীয়। এ সবের উপস্থিতি খুব সম্ভবত দর্শকদের সামনে ব্যাপারটিকে যথেষ্ট পরিমাণে সহজগ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করা—যেমন শয্যাগৃহে রমার মুখের কিছু কিছু সংলাপ (বাড়ি ছাড়লাম—চাকরি পেলাম—গেলাম গিরিডি), কিন্তু ছবিটির অসামান্য 'ইকনমি'র পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো বেশ অস্বস্তিকর মনে হয়—অথচ শয্যাতে রমার 'মেমরি-ফ্ল্যাশব্যাক'গুলি অসাধারণ। ছবিটির শেষাংশও কিছু পরিমাণে এর মৌল শিল্পমান থেকে বিচ্যুত। আত্মহত্যাতে নীতিগত ভাবে আপত্তি করবার কিছু নেই—মহৎ-সাহিত্যে আত্মহত্যার সম্মানিত স্থান আছে এবং মৃত্যু মানেই গল্পের জোড়াতালি দেওয়া নয়। কিন্তু তার জন্য চাই উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি—যার অভাবে এ জাতীয় ঘটনা বহিরাগত আকস্মিকতা আনে যা এ জাতীয় চরিত্রকেন্দ্রিক ছবিতে সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। মৃণালবাবু গল্পের ভূমিকা-পর্বকে নির্মমভাবে ছেটে যদি আরো কয়েকটি সিকোয়েন্স মারফত ওদের সম্পর্কের ভেতরকার ভয়াবহতাকে এবং রমার অসহায়তাকে প্রতিষ্ঠিত করতেন—তবে আত্মহত্যাকে যেটুকু আকস্মিক বলে মনে হয় তা হত না। একেবারে ক্লোজিং শটে নীরেনের কোলে বাচ্চাটির বসে থাকার দৃশ্যটি sentimental এবং সেজন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনুপযুক্ত মামুলী সঙ্গীত রচনা অনেকটা দায়ী। এসব কারণে ছবির শেষ সম্পর্কে একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। এর বিকল্প কি ছিল—"আস্তনিয়নি-কায়দায়" অনিষ্পত্তির মধ্যে ছবিটা শেষ করা উচিত ছিল কিনা এবং তাতে ট্রাজিক গভীরতা বৃদ্ধি পেত কিনা—এসব আলোচনা করে বিশেষ লাভ নেই—এবং এ-সম্পর্কে শিল্পীকে কোনো রকম ফতোয়া জারি করা অর্থহীন—তবে যে অবস্থায় আমরা ছবিটিকে পাচ্ছি তা আমাদের শিল্পবোধকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করে কিনা সম্ভবত এইটুকুই আমরা বলতে পারি—সেদিক থেকে বলা যায় ছবিটির শেষ নিষ্পত্তি ছবিটির আসল শিল্পমানের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম।

কিন্তু এ ছবিতে পরিচালক অস্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন —এবং অভিনেতাদের আন্তরিকতা, বিশেষ করে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রসেনজিতের চমৎকার অভিনয় পরিচালককে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। "প্রতিনিধি" সাম্প্রতিক বাংলাচলচ্চিত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ শুভসূচনা করছে এই কারণে যে এর ফলে আশা হয় সত্যজিৎ রায় হয়তো আর নিঃসঙ্গ নাও থাকতে পারেন।

ধ্রুব গুপ্ত

স্বর্ণকমল স্মরণে

স্বর্ণকমল নেই। রোগপাণ্ডুর সেই হাসিমুখটি হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল! হাজার হাজার মানুষের মতো জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে স্বর্ণ এসেছিল এই কোলাহলময় মহানগরীতে। এই মহানগরীতে সে হারিয়ে গেল।

স্বর্ণকমল এ যুগের মানুষ, কমিউনিস্ট। শুধু পুঁথি পড়ে নয়, জীবনের ঘাটে ঘাটে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ধাক্কা খেতে খেতে স্বর্ণ কমিউনিস্ট হয়েছিল এবং প্রত্যয়সিদ্ধ কমিউনিস্ট। কোনো ঝড়ঝাপটায় টলে নি, কোনো বিপদে ভয় পায় নি।

পরাধীনতার বেদনা তার বুকে বেজেছিল, সেই বেদনা থেকেই তার পথের সন্ধান শুরু হয়। কারাবরণ করেছে, দুঃখকষ্টে জীবন কাটিয়েছে আর তারই মধ্যে চলেছে তার জীবনের পাঠ নেওয়া। পাঠ নেওয়া তার সার্থক হয়েছিল। কর্মক্ষেত্রে ফলটা দাঁড়িয়েছিল খারাপ, কারণ, জীবনের পাঠ নিয়ে যে পথ বেছে নেয় এ সমাজে তার ঠাঁই হওয়া কঠিন। তাই স্বর্ণও ভেসে ভেসে বেড়িয়েছে, আজ এখানে, কাল ওখানে। ১৯৩৫ সালের ১লা মে স্বর্ণ, আমি এবং শচীন রক্ষিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় শিক্ষানবীশ-সাংবাদিকরূপে ঢুকি। কিছুকাল পরেই স্বর্ণকে বিদায় নিতে হল, তারপরই শচীনকে। স্বর্ণর খারাপ স্বাস্থ্য ছিল কর্তৃপক্ষের অজুহাত। মাখনবাবু তখন সর্বেসর্বা। তিনি চান 'লৌহদৃঢ় স্বাস্থ্য'। স্বর্ণ তিক্ত হাসি হেসে বলেছিল, "খেতে না পেলে আর স্বাস্থ্য আসবে কোথা থেকে?" তাতে মাখনবাবুর মন গলে নি। ক্ষুব্ধ স্বর্ণকমল সংবাদপত্রের ম্যানেজারদের তীব্র কষাঘাত করে তার 'অন্ত্যেষ্টি' উপন্যাস রচনা করেছিল ঠিক এই ঘটনার পরেই। যাঁদের সে কষাঘাত করেছিল তাঁরা আজও অনেকে বেঁচে আছেন, কিন্তু স্বর্ণকমল চলে গেছে।

টিউসনি, প্রুফ দেখা, পত্রিকা-পরিচালনা—কতরকম কাজ যে স্বর্ণকে করেত হয়েছে জীবিকা অর্জনের জন্যে তার ঠিক নেই।

'যুগান্তর' যখন বেরোয় তখন স্বর্ণকমল সেখানে কাজ পেয়েছিল। কিন্তু সময়মতো মাইনে না দেওয়া ইত্যাদি নানা কারণে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ বাধল। শেষ পর্যন্ত স্বর্ণকমল, সুরেন লাহিড়ী প্রভৃতির

নেতৃত্বে হল কলম-ধর্মঘট (সম্ভবত ভারতবর্ষের প্রথম কলম-ধর্মঘট)। কর্তৃপক্ষ আপস করলেন বটে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যে স্বর্ণকমল ও আরও কয়েকজনের চাকরি গেল।

আবার জীবিকার সন্ধান, আবার লড়াই। যুদ্ধের সময় গ্লোব এজেন্সীতে। 'অরণি'তে এবং পরে কিছুকাল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কাজ করার পর আবার স্বর্ণকমল ভেসে বেড়িয়েছিল। এরই মধ্যে চলে বই-লেখা। 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হলে স্বর্ণকমল প্রুফ দেখে ও অন্যান্য ভাবে বহু সাহায্য করেছে।

'অগ্রণী'তেই সে শেষবারের সাংবাদিক রূপে কাজ করে। 'অগ্রণী'র আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। তবু সসম্মানে যাঁরা তাকে ডেকে নিয়েছিলেন, তাঁদের কাজ সে নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছে। আমি মাঝখানে বেকার ছিলাম। 'অগ্রণী'র কর্তৃপক্ষ ও স্বর্ণকমলের আগ্রহে মাঝে মাঝে 'অগ্রণী'তে লিখতাম। নিজের মাইনে ঠিকমতো জুটত না, তবু আমি যাতে কিছু পাই তার জন্যে ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করতে দেখেছি। 'তাস'-এর চাকরিই তার একমাত্র স্থায়ী চাকরি। যে সোভিয়েতকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত, তারই কাজে ব্রতী থাকতে থাকতেই তার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পেরেছে এ শুধু তার সান্ত্বনা নয়, এ সান্ত্বনা আমাদেরও। কোনো মালিকের দাসত্ব তাকে স্বীকার করতে হয় নি, কোথাও মাথা নিচু করতে হয় নি। স্বর্ণকমল সগর্বে এবং সগৌরবে চলে গেছে। শুধু আমাদের জন্যে রেখে গেছে তার অকালমৃত্যুতে গভীর বেদনা।

সুকুমার মিত্র

সাহিত্যে চিকিৎসাবৃত্তি

এক

কোনো দেশের সাহিত্যে বিশেষ কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায় যদি অসামাজিক জীব হিসাবে চিত্রিত হতে থাকে, বুঝতে হবে, সমাজের মনে গুমরে-ওঠা বীতশ্রদ্ধার আক্ষেপ দেখা দিয়েছে। গ্রামের সুদখোর মহাজন, অত্যাচারী জমিদার বা জমিদারি সেরেস্তার নায়েব গোমস্তা, ধানচালের আড়তদার কিংবা কালোবাজারের মুনাফাখোর বাংলা গল্প উপন্যাসে যদি ঘৃণাই কুড়িয়ে থাকে, তার পিছনে আছে তাদের নিজেদের কৃতকর্ম।

কিছুকাল যাবৎ কিছু কিছু সাহিত্যপত্রে এমনিধারা গ্লানির রং লেগেছে চিকিৎসকের চরিত্রসৃষ্টিতে। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় চিকিৎসাব্যবস্থা এবং চিকিৎসকদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারাবাহিক যে-সব অভিযোগ এতদিন প্রকাশ পাচ্ছিল, তারই অন্য এক অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে গল্পে, উপন্যাসে, রম্যরচনায়। সূক্ষ্ম রচনাশৈলীর গুণে এগুলির প্রভাব নিঃসন্দেহে অনেক বেশি গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী।

ব্যাপারটা গুরুতর এই কারণে যে স্মরণাতীত কাল ধরে সর্বদেশেই চিকিৎসকরা যেন দেবত্বের অংশভাগী। সমাজজীবনে পুরোহিত যদি পেয়ে থাকেন ভক্তির আসন, চিকিৎসককে মানুষ দেখেছে সর্ববিধ মানবিক মূল্যের প্রতিভূরূপে। মানুষের সবথেকে অসহায় অবস্থায় চিকিৎসকের ভূমিকা হল জীবনদাতা ও ত্রাতা হিসাবে, বিশ্বস্ত সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে। সমাজের সর্বস্তরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার সেই অকৃত্রিম এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি যদি কোনো কারণে অবিশ্বাস ও বীতরাগে রূপান্তরিত হয়ে থাকে, সকলের স্বার্থেই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার। কারণ, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যেমন জীবন-মরণের প্রশ্ন, অন্যদিকে মানব সংস্কৃতির একটি প্রাচীনতম উপাদানকে কোনো কারণেই আমরা ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চাই না।

দুই

প্রধানত চিকিৎসাবৃত্তিকে উপজীব্য করে দুটি লেখা আমাদের চোখে পড়েছে। দুটিই ছোট গল্প। দুটিই বিগত 'শারদীয়' সংখ্যাগুলির রচনাসম্ভারের অন্তর্ভুক্ত।

একটি গল্পের নায়ক ডাঃ দস্তিদার একাধারে সার্জারি ও মেডিসিনে অসাধারণ কৃতি। প্র্যাকটিসও জমজমাট। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাকি মার্কসীয় দর্শনেও আকৃষ্ট; আবার গীতাও উপেক্ষা করতে পারেন না। প্র্যাকটিসের ফাঁকে ফাঁকে মার্কসীয় দর্শন ও গীতার মধ্যে "সমন্বয় খুঁজে বের করতেই হবে" যাকে, তার আসল জীবনদর্শন কিন্তু "ইয়োলো গ্লিটারিং গোল্ড।" ব্যাঙ্কের পাশবই একখানা দুখানা তিনখানা, সিন্দুকের কোণে কোণে স্তূপীকৃত হীরে ও জড়োয়ার গহনা। ব্যবহারিক জীবনে এই তার পরমার্থ। সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য ভেদবমিতে অচেতন শিশুর অক্ষম মায়ের গা থেকে গহনা খুলে নিতে তার দ্বিধা নেই, লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছুক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর কাছে ১৬৲ টাকা ফি হাঁকতে সঙ্কোচ হয় না, আয়কর ফাঁকি দিতে ওস্তাদ, আবার ধনপতি ঝুনঝুনওয়ালার সেবাদাস হতে সদাপ্রস্তুত। শেষপর্যন্ত অর্থগৃধ্নু বণিকের অনিদ্রা ব্যাধি সঞ্চয়লিপ্সু ডাক্তারকেও সংক্রমিত করার মধ্য দিয়ে গল্পের পরিণতি। একজন কৃতবিদ্য তথাকথিত সমাজসেবী ডাক্তারের সমাজ বা জনসেবার কোনো ইচ্ছা বা সক্রিয় প্রচেষ্টার, এমনকি কোনো মানসিক দ্বন্দ্বেরও কোনো পরিচয় এ-গল্পে পাওয়া গেল না। ফুটে উঠেছে শুধু এক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর নির্লজ্জ লোভাতুর চরিত্র। এ-গল্প পড়ার পর পাঠকের মনে চিকিৎসাবৃত্তি সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে।

অপর গল্পটির প্লট হচ্ছে একজন চোখের ডাক্তার ও এক দাঁতের ডাক্তারের মধ্যে কূট ব্যবসাগত সম্পর্ক। চড়া দরে চশমা ও দাঁত বিক্রি করেই ক্ষান্ত নয় তারা, বখরাদারি ব্যবসার কৌশল হিসাবে মিথ্যা মৃত্যুভয় দেখিয়ে একে অপরের কাছে রোগী পাঠায়। গল্পের শেষে নিজের জবানীতে লেখক সিদ্ধান্ত টেনেছেন, "দু-মুড়োয় দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুই দোস্ত র‍্যাকেট হাতে নিয়ে। মাঝখানে রয়েছি বেকুব জনসাধারণ আমরা, আর ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে এক হাত থেকে অন্য হাতে চলাফেরা করছি টেনিস বলের মতো। দিচ্ছি তার জন্য জবর আক্কেলসেলামি।" অতি সরল এবং স্থূল বক্তব্য; সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে রচিত। কোনো কল্পিত চরিত্র নয়, "জনসাধারণ" শিকার হয়েছে দুই ঝানু ব্যবসাদারের—যাদের পেশা চিকিৎসার নামে লোক ঠকানো। গল্পের নাম তাই 'মাসতুতো'।

তিন

বাস্তবধর্মী সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হতেই পারে। কিন্তু উল্লিখিত গল্প দুটির রচয়িতাদের উদ্দেশ্যটা কি? যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই রকম ভ্রষ্ট-চরিত্র কোনো ডাক্তারের সংস্পর্শে আসার দুর্ভাগ্য তাঁদের হয়েছে, তবু একথা তো সত্য যে অসাধু লোক সব বৃত্তিতেই দু-চার জন থাকতেই পারে। 'ইয়েলো জার্নালিজম' কথাটা হাওয়ায় ভেসে আসে নি। তাই বলে বিচ্ছিন্ন কোনো দুষ্কৃতিকে বিশেষ কোনো পেশার বৈশিষ্ট্য হিসাবে এমনভাবে চিত্রিত কেউ করে না যাতে সেই পেশা সম্পর্কে পাঠকের মনে বিদ্বেষ বা সন্দেহের অবকাশ ঘটে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে কোনো সামাজিক দুর্লক্ষণ আপাতত ক্ষীণ বা অস্পষ্ট বলে ব্যাধিটা মহামারীরূপে প্রকট না হওয়া পর্যন্ত সে-সম্পর্কে নীরব বা নিশ্চেষ্ট থাকতে হবে। না, তা নয়। দুর্নীতির তীক্ষ্ণতম সমালোচনা হোক। কিন্তু কোনো সামাজিক চিত্র আঁকার সময় সৎ অসৎ সবরকম চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ পটভূমিকায় তুলনামূলক বিচারের সুযোগ থাকা উচিত। সঞ্চয়ের পাপ নেশা যদি কোনো কদাচারীর রাতের ঘুম কেড়ে নেয় তো নিক। কিন্তু তারই পাশাপাশি শোষিত শ্রেণীর অংশীদার যারা জীবনযুদ্ধে একইভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সেবাব্রতের ঐতিহ্যে আজও কায়ক্লেশে অবিচল আছে, তাদের কথাও যদি না থাকে, শুধু মসীলিপ্ত ছবিটি অসম্পূর্ণ হয় নাকি? বহু বিতর্কমূলক বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের ইতিবাচক প্রচেষ্টা হয়েছে বনফুলের 'হাটেবাজারে' উপন্যাসে—মানবপ্রেমিক উদারহৃদয় ও দৃঢ়চেতা ভুজঙ্গ ডাক্তারের আদর্শ চরিত্র সামনে রেখে প্রাইভেট প্র্যাকটিশের অশুভ লক্ষণগুলির সমালোচনা করে।

বিচার আর এক দিক থেকেও হতে পারে। কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিবিশেষের মননক্রিয়ার অনুশীলনে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় একই সাথে আলো-ছায়ার দ্যোতনা—একই মানুষের ভালো মন্দ দুই দিক। কোথাও মহত্ব অতিক্রম করে যায় সকল হীনতাকে, কোথাও বা ক্ষুদ্রতা ও অপরাধ-প্রবণতারই প্রাধান্য; আবার কোনো ক্ষেত্রে হয়তো সুমতি-কুমতির মধ্যে, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের স্ফুলিঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত করে চলে সম্পূর্ণ মানুষটিকে। সেই সামগ্রিক ছবি বুঝতে সাহায্য করে কোন সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে মানুষটার পদস্খলন হল, কিসেই বা তার মুক্তি। এমনি এক আকর্ষণীয় চিত্র আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে।

এখানেও নায়ক একজন পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার যে তার বৃত্তির মহত্ত্বকে কলঙ্কিত করেছে। দারোগার বন্ধুত্বে ভর করে পরস্পরের মধ্যস্থতায় দুজনেরই যেভাবে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল তাকে কোনোক্রমেই সৎপথ বলা চলে না। কিন্তু দেখা গেল আদরিণী একমাত্র কন্যার আকস্মিক মৃত্যুতে কঠিন 'শক্' ডাক্তারের আত্মশুদ্ধিতে সাহায্য করেছে। শুরু হয়ে যায় তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব, অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত। পরিণতি, "শেষ পর্যন্ত ভিটা ছাড়িতে হইল।" একথা মনে রাখা দরকার যে সে-যুগের স্বনামধন্য ও মহানুভব অনেক ডাক্তারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় ও সখ্যতা ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁদেরই পেশাভুক্ত কেউ কেউ মানবতার সুমহান ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে নিছক বৈশ্যবৃত্তি ও অনাচারে আসক্ত হচ্ছেন, এ ইঙ্গিত না দিয়ে তিনি পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে এও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই গল্পে স্বধর্মচ্যুত ডাক্তারের সমস্ত অতীত অপরাধ ছাপিয়ে উঠেছে তার প্রায়শ্চিত্ত প্রচেষ্টা—উৎপীড়িত এক কৃষকের স্বপক্ষে ঘুষখোর দারোগার অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ। হীনতাকে জয় করে মনুষ্যত্ববোধের শুচিস্নানে এই যে মুক্তি, সেই পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গির গুণে পাঠকের মন উৎপীড়িতের প্রতি সমবেদনায় এবং চিরন্তন মানবধর্মের প্রতি নতুন আস্থায় ভরে ওঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে 'ঘুষ' ও 'মাসতুতো' গল্পে অম্লতার ঝাঁঝ থাকলেও সদগুণের সৌরভ নেই।

চার

কথা উঠেছে ডাক্তারদের নীতি-নিষ্ঠার অভাব নিয়ে, নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি সম্পর্কে। অভিযোগের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি বিস্তার করে লাভ নেই এই কারণে যে অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক দেশের মতো ভারতীয় সমাজব্যবস্থাতেও চিকিৎসাকে পণ্য এবং চিকিৎসককে ব্যবসায়ী হতে বাধ্য করা হয়েছে। পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে এথিক্‌স্‌-এর অনুশাসনে আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা এই বৃত্তির মহত্ত্বের একটি অনন্য লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে নিজ দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক নিয়মাবলীর প্রভাব মুক্ত হওয়া তো সম্ভব নয়। ঘটনা হচ্ছে এই যে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে চিকিৎসা ক্রয় করতে হয়, এবং অধিকাংশ চিকিৎসককে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে

জীবিকা অর্জন করতে হয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিক্রয় করে। রাষ্ট্র তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো দায়িত্ব নেয় না; সমাজ তাদের কাছে যে নীতিধর্ম প্রত্যাশা করে, তার উপযোগী পরিবেশ ও উপাদান সৃষ্টি করতে অক্ষম। সেই মূঢ় অবহেলা ও মুখর প্রত্যাশা, সেই পাণ্ডুর নীতিধর্ম ও পৌরাণিক অনুশাসনের সঙ্গে রূঢ় জৈবিক প্রয়োজনের হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতির মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর যা কিছু দোষগুণ নিয়েই প্রাইভেট প্র্যাকটিস চলছে রাষ্ট্র ও সমাজের মৌন সম্মতিক্রমে। হিউম্যানিজম-এর এথিকস শাশ্বত এবং চির-উদ্ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ক্ষয়িষ্ণু সমাজদেহে তার রূপটি খর্বিত ও বিবর্ণ। আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, অসুস্থ মানুষকে ঘিরে পরিজন ও পড়শীরা যখন উদ্বেগে আকুল, প্র্যাকটিশানারকে ছুটে আসতে হয় শুধু মানবিক আহ্বানে নয়, জীবিকার দায়ে পারিশ্রমিকের প্রত্যাশায়। বহু ক্ষেত্রে সে-প্রত্যাশা পূরণ হয় না, এও সত্য। মহৎ বৃত্তির এই গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব আজও সাহিত্যে ভাষা পায় নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে যাঁরা চাকরি করেন তাঁদের মধ্যে নীতিভ্রষ্টতা দেখা যাচ্ছে কেন? চাকুরীজীবি বলতে এক্ষেত্রে আমরা বুঝি প্রধানত হাসপাতাল কর্মীদের। বস্তুতপক্ষে সংবাদপত্রে ডাক্তারদের বিরূপ সমালোচনা হয়ে থাকে অধিকাংশই হাসপাতালের পটভূমিকায়। সৌজন্যহীনতা, কর্মবিমুখতা বা যান্ত্রিক মনোভাব সম্পর্কিত এই সব অভিযোগের কতটুকু সত্য, কতটা ব্যক্তিগত এবং কতটা নিছক প্রশাসনিক বিচ্যুতি প্রসূত, বার বার দাবি করা সত্ত্বেও সে বিচার আজও হয় নি। হয় নি বলেই হতাশার জলাভূমিতে গজিয়ে ওঠে অরাজকতার জঙ্গল। যার ছেলেটি সাপের কামড়ে বা ভেদবমিতে ঢলে পড়েছে তার পক্ষে অস্থির ও আবেগকাতর হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে স্কুল-কলেজ কারখানার মতো হাসপাতাল ও হেল্থ সেণ্টারগুলিও যে আধুনিক সমাজজীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে, শীর্ষে এই বোধ জাগ্রত হয় নি বলেই দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক পটভূমিতে হাসপাতালের প্রকৃত ভূমিকা কি হবে কোনো স্তরেই সে ধারণাও স্বচ্ছ হচ্ছে না। তারই জন্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মহামিলন কেন্দ্রে জরা ও মরণজয়ের তপস্যা এবং আর্তসেবার মানসিক আবেদন চলেছে প্রায় সমান্তরালে।

পাঁচ

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে একথা প্রায় সর্ববাদীসম্মত যে চিকিৎসকের প্রজ্ঞা ও দক্ষতাকে সমাজকল্যাণে সার্থক ব্যবহারের প্রাথমিক এবং আবশ্যিক শর্ত হল সমগ্র চিকিৎসাব্যবস্থার উপর সামাজিক কর্তৃত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। প্রতিদিনের আত্মপীড়ন ও ক্ষুদ্রতা থেকে চিকিৎসকের মুক্তিও এই পথে। ক্রেতার সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল পণ্যমূল্যে বিক্রিত বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তির অবাধ বিকাশ যে কিছুতেই সম্ভব নয়, গত একশ বছরের ইতিহাস তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত করাতেই নীতিধর্ম কিংবা মানবিক মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় না, তাও সত্য। সমাজের শোণিত-স্রোত দুর্নীতির বীজাণু দূষিত হলে বিশেষ একটি প্রত্যঙ্গকে দীর্ঘকাল সুস্থ ও সক্রিয় রাখা দুরূহ।

আসলে সমস্যা গভীর: তার শিকড়ও অসংখ্য এবং বহুবিস্তৃত। আফিস-টাইমে ট্রামে-বাসে প্রচণ্ড ভিড়ে পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে আমরা বিরক্ত হতে পারি; কিন্তু পিছনের লোকটি যে তার পিছন থেকেও ঠেলা খাচ্ছে, এই দৃষ্টিশক্তি না থাকলে আমাদের পারস্পরিক ধৈর্যচ্যুতির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে ভিড়ের জন্য দায়ী সুচতুর মূল আসামীটি। নীতি হিসাবে একথা মানতেই হবে যে কোনো ব্যাধি নিরাময় বা প্রতিষেধ করতে হলে চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অপরিহার্য। সমালোচনাও সহযোগিতার অঙ্গ। তার তীক্ষ্ণতা নিয়ে ততটা উদ্বেগ নেই যদি গল্পে উপন্যাসে ব্যঙ্গ বা সংবাদ-সাহিত্যে সেই সমালোচনা হয় বাস্তবধর্মী ও গঠনমূলক।

সমর রায়চৌধুরী

ষড়বিংশ প্রাচ্যবিদ্যা বিশ্বসম্মেলন

নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা বিশ্বসম্মেলন নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। ইউরোপের বাইরে, ইস্তাম্বুলে আহূত সম্মেলনটি বাদ দিলে বলা চলে, প্রাচ্যদেশে, প্রাচ্যবিদ্যা বিশ্বসম্মেলন এই প্রথমবার আহূত হলো। মস্কোতে, পঞ্চবিংশ অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন পরবর্তী সম্মেলন ক্ষেত্র হিসাবে নয়াদিল্লীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন তখন সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনির দ্বারা সে প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। নয়াদিল্লী অধিবেশন প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনকারী পণ্ডিতদের মধ্যে কতখানি আগ্রহের সঞ্চার করেছিল, তা, অতএব, সহজেই অনুমেয়। অর্ধশতাধিক দেশ থেকে কিঞ্চিদধিক তেরোশো প্রতিনিধি নয়াদিল্লীতে সমবেত হয়েছিলেন। প্রতিনিধিদের এই সংখ্যা পূর্ববর্তী সকল সম্মেলনের তুলনায় অকল্পনীয়। বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন ছয় শতাধিক। এবং ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র এই সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীর বিপুল সংখ্যায় এই মহতী সমাবেশে যোগদানও কম তাৎপর্যমণ্ডিত নয়। সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি।

প্রতিনিধিদের অকৃত্রিম আগ্রহ ও মনোনিবেশের ফলে সপ্তাহব্যাপী এই বিশ্বসম্মেলনটি যথার্থ জ্ঞানসত্রে পরিণত হয়েছিল। জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে প্রতিনিধিদের মনখোলা আলোচনা, প্রশ্ন, বিতর্ক এবং পরস্পরিক সৌহার্দ্য নয়াদিল্লী অধিবেশনের তাৎপর্যকে গভীরতর করেছিল। ধর্মের বা রাজনীতির গোঁড়ামীর উর্ধ্বে সংস্কারমুক্ত অনুসন্ধিৎসু মননশীলতাই সর্বদিক থেকে বড় হয়ে উঠেছিল। সম্মেলনে যোগদানকারী একজন প্রতিনিধি হিসাবে এই ধারণা নিয়েই নয়াদিল্লী থেকে ফিরে এসেছি। সাতদিন ধরে দেশের ও বিদেশের বহু প্রতিনিধির সঙ্গে মেলামেশা ও আলোচনা করার যে সুযোগ পেয়েছি তা থেকেই আমার মনে এ ধারণাগুলি গড়ে উঠেছে।

অবশ্য, একথা স্বীকার করতেই হবে যে অসাধারণ বা অশ্রুতপূর্ব কোন নতুন তথ্য বা তত্ত্ব এই সম্মেলনের আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসেনি। রোমাঞ্চকর কোন নতুন আবিষ্কারের কথাও শোনা যায়নি।

৪ঠা জানুয়ারী বেলা দশটায় বিজ্ঞানভবনের মূল সভাগৃহে সম্মেলনের উদ্বোধন হল বিস্‌মিল্লা খানের সানাই বাজনা দিয়ে। বর্ষীয়ান ভারত-বিদ্যা-গবেষক ডঃ পি. ভি. কানে আহ্বায়ক সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানালেন। তারপর বিদায়ী সভাপতি বি. গফুরফ ভাষণ দিলেন। সম্মেলনের সভাপতি হুমায়ুন কবীরের ভাষণের পর ভারতের রাষ্ট্রপতির স্বাগত বাণীটি পাঠ করে শোনানো হলো। পাঠ করে শোনানো হলো রাষ্ট্র সংঘের সম্পাদকের শুভেচ্ছা বাণী এবং ইউনেস্কোর ডিরেক্টার জেনারেলের তারবার্তা। সন্ধ্যা ছয়টার সময় শ্রীনেহেরু এলেন প্রতিনিধিদের কাছে কয়েকটি বক্তব্য উপস্থিত করবার জন্য। ৫ই জানুয়ারী থেকে সম্মেলন দশটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনায় ব্যাপৃত হলো।

মিশরীয় পুরাতত্ত্ব, সেমীয় বিদ্যা (ব্যাবিলনয়ীয় ও হিব্রু), হিত্তীয় ও ককেশীয় বিদ্যা, আলতাই ও তুর্কবিদ্যা, ইরানীয় বিদ্যা, ভারতবিদ্যা (বেদ ও সিন্ধু সভ্যতা, ক্লাসিকাল সংস্কৃত, দর্শন ও ধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আধুনিক ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব), দক্ষিণপূর্ব এশীয় বিদ্যা, পূর্ব এশীয় বিদ্যা, ইসলামী তত্ত্ব, আফ্রিকান বিদ্যা—এই দশটি বিভাগে প্রতিদিন যে সব প্রবন্ধ পড়া হয়েছে, যে সব আলোচনা হয়েছে তার এমনকি তালিকাটি পর্যন্ত গ্রন্থাকৃতি। অতএব সে সম্বন্ধে দু-চার কথায় কিছু না বলাই সঙ্গত মনে করি। উল্লেখযোগ্য দুটি সাধারণ আলোচনার বিষয় ছিল 'মানববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদ্যার ভূমিকা,' ও 'মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তন'। প্রথমটিতে অধ্যাপক সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ফিলিয়োজা, অধ্যাপক ব্যাশাম এবং অধ্যাপক নর্মান ব্রাউন ও ডঃ পালাত্‌ অংশগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়টিতে যোগ দিয়েছিলেন—মৌলানা সয়ীদ আহ্‌মদ আকবরাবাদী, তুরস্কের মাননীয় রাষ্ট্রদূত সৈফুল্লা এসিন, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মাননীয় রাষ্ট্রদূত আহ্‌মদ হাসান এল ফেকি, অধ্যাপক অ্যাণ্ডারসন ও অধ্যাপক নাসর্‌।

সম্মেলনের শেষ অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় এবং নানা ছোট জটলায় একটি কথাই বার বার শোনা গেল—আবার দেখা হবে। আমেরিকায় ১৯৬৭ সালে সপ্তবিংশ প্রাচ্যবিদ্যা বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। ততদিন প্রাচ্যবিদ্যার অনুরাগী গবেষকগণ আপন আপন প্রতিষ্ঠানে নিমগ্ন হয়ে থাকবেন নিরলস জ্ঞানান্বেষণে। বিশ্বসম্মেলন জ্ঞানের আদানপ্রদান ও মনের বিস্তৃতি ঘটিয়ে বারে বারে এই ভাবেই নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে দেয়।

অনিমেষ পাল

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ৯
চৈত্র, ১৩৭০

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

ভেদবুদ্ধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েচে। তাই অবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্রয়ের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গড়ে তুলি তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আমাদের শুভচেষ্টাও খণ্ড খণ্ড হয়ে দেশকে আহত করচে। আত্মীয়কে আঘাত করার আত্মঘাত যে কি সর্বনেশে সে কথা বুঝেও বুঝিনে। যে শিক্ষা লাভ করচি ভাগ্যদোষে সেই শিক্ষাই বিকৃত হয়ে আমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের অস্ত্র জোগাচ্চে।

এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তার নিঃশ্বাস রোধ করতে প্রবৃত্ত এ পাপ প্রাচীন যুগের, এই অন্ধ বার্ধক্য যাবার সময় হল। তার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জ্বালিয়েচে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দুঃখ পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হয়ে যাক নিঃশেষে ভস্মসাৎ। বহু যুগের পুঞ্জীকৃত অপরাধ যখন আপন প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করে তখন তার দুঃখ অতি কঠোর,— এই দুঃখের দ্বারাই অপরাধ আপন বীভৎসতার পরিচয় দিয়ে উদাসীন চিত্তকে জাগিয়ে তোলে। একান্ত মনে কামনা করি এই দুঃসহ পরিচয়ের কাল যেন এখনি শেষ হয়,

দেশ যেন আত্মকৃত অপঘাতে না মরে, বিশ্বজগতের কাছে বার-বার যেন উপহসিত না হই।

আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক তরুণদের নব-জীবনের মধ্যে। আচার-ভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হয়ে তারা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক। যে দুর্বল সে-ই ক্ষমা করতে পারে না, তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত করে দিক, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সর্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।

সর্ববঙ্গ মুসলিম ছাত্রসম্মিলনীর প্রতি। প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৩৮, পৃঃ ১

ভি. বালাবুশেভিচ

ভারতীয় ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা

ভারতবিদ্যা এবং সেই সঙ্গে ভারতের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও অর্থনীতির কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েত গবেষকগণ গবেষণামূলক বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন ও করে যাচ্ছেন। সে বিষয়ে ম্যুনিকে বিগত চব্বিশতম ও মস্কোয় পঁচিশতম প্রাচ্যবিদ্যা কংগ্রেসে আলোচনা হয়েছে। নয়া দিল্লিতে এই ছাব্বিশতম কংগ্রেসের আলোচ্যও তাই-ই।

সোভিয়েতে ভারতবিদ্যা-বিষয়ক গবেষণার পরিধি বর্তমানে আরও ব্যপ্ত ও সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এ-কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমানে সোভিয়েতে ভারতবিদ্যার গবেষণা ও চর্চার ব্যাপকতা সুপ্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভারতীয় সভ্যতার বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদাবলী সমস্ত কিছুকে জড়িয়েই অগ্রসর হচ্ছে। অতীতের রুশীয় পণ্ডিতসমাজ প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার এক উজ্জ্বল ধারা রক্ষা করে গেছেন। তবে তাঁদের ভারতবিদ্যার গবেষণা প্রাচীন ভারত সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। বর্তমান সোভিয়েত গবেষকগণ প্রাচীন যুগ সম্পর্কেও যেমন কাজ করছেন, তেমনি সমকালীন ভারত সম্পর্কেও তাঁরা পরম আগ্রহভরে তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণা-পত্র প্রস্তুত করে যাচ্ছেন।

সোভিয়েতে ভারতবিদ্যা-গবেষণার উপর এই নতুন ও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, অবশ্যই, আসে ভারতীয় জনগণের নিরন্তর সংগ্রামে ঔপনিবেশিক শাসনের উচ্ছেদের ফলে। এই সংগ্রামের সাফল্যের ঐতিহাসিক তাৎপর্যই তাতে স্বীকৃত এবং তারপর স্বাধীন সার্বভৌম ভারতে যে পুনর্গঠনের ও রূপান্তরের পর্ব চলেছে, তাও প্রতিফলিত হল।

সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদেরা যে ব্যাপক কাজ করছেন, একটি প্রবন্ধের

সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সামগ্রিকতা ধরে দেওয়া অসম্ভব। সেহেতু, বর্তমান আলোচনায় কেবলমাত্র ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সমস্যার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব।

মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত পুরাতাত্ত্বিক তথ্যাবলী

সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের নানান স্থানে খননকার্য চালিয়ে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বহু মূল্যবান বিষয়বস্তু সোভিয়েত গবেষকরা উদ্ধার করেছেন।

এই সব আবিষ্কারাদি মধ্য এশীয় ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সূত্রটিকেই পুনঃপ্রকাশিত করেছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় তাসখন্দের পুরাতত্ত্ববিদ এল. আলবাউমের জাঙ-তেপে আবিষ্কারের কথা। বার্চ গাছের ছালের উপর ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত অনেকগুলি নথীপত্র এখানে পাওয়া যায়। প্রাথমিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, সেগুলি হল সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ অনুশাসন। সোভিয়েত গবেষকরা এই সব নথীপত্র অধ্যয়ন করে একটি খণ্ড প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই সঙ্গে এই সব প্রাপ্ত নথীপত্রাদির অনুলিপি ভারতীয় গবেষকদের নিকটও প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এ কাজ সম্পূর্ণ হলে ভারত ও মধ্য-এশিয়ার মধ্যে সরাসরি সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিষয়ে আরও নতুন আলোকপাত ঘটবে এবং মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কাল ও ধরন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশ পাবে।

ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠি লিপি লিখিত মৃৎপাত্রাদির আবিষ্কারও বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এগুলি আবিষ্কৃত হয় কারা-তেপে, লেনিনগ্রাদের পুরাতত্ত্ববিদ বি. স্তাভিস্কির উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়। আবিষ্কৃত বিষয় ও তথ্যসামগ্রীর যথোচিত বিশ্লেষণে মনে হয় এগুলি কুষাণ যুগের নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেকগুলি স্মারকস্তম্ভ সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় সম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এস. পি. তলস্তফ কর্তৃক খোয়ারেজম-এ এবং এ. এম. বেলেনিৎস্কী কর্তৃক পিয়ানজিখন্দে আবিষ্কারগুলির কথা।

সোভিয়েত পণ্ডিতদের প্রাচীন ভারত বিষয়ে গবেষণার প্রাসঙ্গিক একটি সমস্যা সম্পর্কে আমি কিছু উল্লেখ করব। বিষয়টি 'আর্য অভিযান' সম্পর্কিত।

এই 'আর্য অভিযান'-এর সমস্যাটি বেশ জটিল। সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ

জি. এম. বোনগার্দ-লেভিন এ বিষয়ে যে কাজ করেছেন তাতে তিনি সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার গবেষক ও ভারতের গবেষক—উভয় দেশের পণ্ডিতদেরই সংগৃহীত সাম্প্রতিকতম তথ্যাবলী ব্যবহার করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্যান্য ভারততত্ত্ববিদ গবেষক এবং ভারতীয় গবেষকদেরও দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রাকারে বোনগার্দ লেভিনের সিদ্ধান্তগুলি এই :

(ক) আর্যরা ভারতে মাত্র একবারে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীতে আসে নি, কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে আর্য গোষ্ঠীগুলি তরঙ্গের পর তরঙ্গে অভিযান করে ভারতভূমিতে চলে এসেছে ; (খ) খৃষ্ট-পূর্ব ১৫-১৭ শতাব্দীতে হরপ্পা সভ্যতার প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির অবক্ষয় এবং ঋগবেদ-যুগের (বৈদিক আর্য) ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সমার্থক বলে ধরা হয় যে "চিত্রিত ধূসর পাত্রে"র সংস্কৃতির মানুষদের (খৃষ্ট-পূর্ব ১১-১২ শতক), তাদের আগমন কালের মধ্যে রয়ে গেছে বেশ বড় এক সাময়িক বিরতির কাল। (গ) হরপ্পা সভ্যতার ক্ষয়, প্রধানত, তার আভ্যন্তরীণ কারণেই ঘটে এবং তা প্রত্যক্ষভাবে বৈদিক আর্যদের অভিযানের ফলে হয় নি। এই বৈদিক আর্যদের সংস্কৃতি আঞ্চলিক দিক বা অন্য কোনোদিক থেকেই হরপ্পা সভ্যতার প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না।

পুঁজিবাদী সম্পর্কের আবির্ভাবের লক্ষণগুলি

ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের গবেষণায় সোভিয়েত পণ্ডিতরা ১৭-১৮ শতাব্দীতে ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের মান ও সমস্যাদি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কাজ করেছেন। পরলোকগত অধ্যাপক আই. এম. রেইসনার এবং ভারততত্ত্ববিদ এল. বি. অ্যালায়েফ, ই. এন. কোমারফ, ভি. আই. পাভলফ, এ. আই. চিচেরফ এবং অন্যান্য সোভিয়েত পণ্ডিতগণ প্রমাণিত করেছেন যে মধ্যযুগে ভারতে নিজস্ব বিকাশ কি ধারায় হয়েছিল। মধ্যযুগে ভারতের কোনোরকম প্রগতিশীল বিকাশ ঘটে নি এবং অর্থনৈতিক বদ্ধতা ও রাজনৈতিক নৈরাজ্যই তখনকার ভারতের চিত্র ছিল বলে যে একটা মত চালানো হয়, সোভিয়েত পণ্ডিতরা তা জোরালোভাবে খণ্ডন করেছেন। সোভিয়েত এবং ভারতীয় পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তৎকালীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক এমন কিছু পরিবর্তন হচ্ছিল, যা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই

ইতিহাসের বিকাশের ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছিল। ১৭-১৮ শতকে তখন মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা, সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতাও চলেছে। তৎসত্ত্বেও, পণ্য এবং অর্থ-সম্পর্কগুলি বিকাশ পাচ্ছিল; ভূমির রাষ্ট্রীয় সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা পরিবর্তিত হচ্ছিল ব্যক্তিগত সামন্ততান্ত্রিক মালিকানায়। গ্রাম্য সমাজগুলি ক্রমশ তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা হারাচ্ছিল এবং সমাজের উপরের দিকে এক বিত্তশালী স্তর গড়ে উঠছিল। বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুটির শিল্পগুলির বিকাশ, প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদন কারখানা প্রভৃতি—এইভাবে পুঁজিবাদী সম্পর্কের উদ্ভব হচ্ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর যে সমস্ত পৃথক পৃথক সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, বিভিন্ন আঞ্চলিক জাতিসত্তাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রক্রিয়াও তার মধ্য দিয়েই চলছিল।

ব্রিটিশের ভারত-বিজয় এবং ১৮ শতকের শেষ পাদ ও ১৯ শতকের প্রথম পাদ জুড়ে তাদের আদিম পুঁজিসংগ্রহের পদ্ধতিতে পরিচালিত অবাধ লুণ্ঠন, ভারতের এই নিজস্ব বিকাশের ধারাকে শুধু যে বিঘ্নিত করল তা নয়, তাকে ব্যাহত ও ছেদযুক্ত করল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের দ্বারা ভারতের সামাজিক-আর্থনীতিক এই নিজস্ব ধারার বেড়ে-ওঠা সম্পর্কগুলি ভ্রূণাবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হল এবং সেই সব স্থগিত-থাকা বিকাশ আবার শুরু হতে পারল একেবারে আধুনিক যুগে এসে, ঔপনিবেশিক পরাধীনতার যুগে; অর্থাৎ এমন একটি পরিবেশে যা সামাজিক প্রগতিকে বিকলাঙ্গ করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে রুদ্ধ করে দেয়।

ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয় শক্তিগুলির বিবর্তন

ভারত-ইতিহাসের আধুনিক পর্ব সম্পর্কে সোভিয়েতের ইতিহাস-গবেষকরা বিশেষ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন ও গবেষণা-নিবন্ধসমূহের মর্মবস্তু হল বৃটিশ ঔপনিবেশিক-ব্যবস্থার শাসনাধীনে ভারতের আর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনের ব্যাহতাবস্থার সমস্যা এবং এই ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় শক্তিগুলির উদ্ভব ও ক্রমবিবর্ধনের বিষয়টি।

সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ অনেক পণ্ডিত ও গবেষকের সহযোগে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় 'সমসাময়িক যুগের ভারত-ইতিহাস' গ্রন্থটি। সোভিয়েত

গবেষকদের প্রাগুক্ত ধ্যান-ধারণার সমন্বিত প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থে সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রধানভাবে বিবৃত করা হয়েছে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ভারতের জনগণ ও গণ-আন্দোলনের চূড়ান্ত ও মুখ্য ভূমিকাটিকে। এন. এম. গোল্ডবার্গ, এ. এম. ওসিপফ এবং অন্যান্য ভারত-বিশেষজ্ঞরা এই গ্রন্থে তাঁদের লিখিত অধ্যায়গুলিতে সুস্পষ্ট ভাষায় দেখিয়েছেন সামাজিক ও আর্থনীতিক প্রাক-শর্তগুলি তখন কি ছিল, এবং ১৮৫৭-'৫৯ সালের মহাবিদ্রোহ এবং অনুরূপ আরও অসংখ্য স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রায়-স্বতঃস্ফূর্ত জনপ্রিয় আন্দোলনগুলির প্রকৃত জনভিত্তিক প্রকৃতি এবং প্রগতিশীল ভূমিকা (তৎকালীন বাস্তব অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিতের মূল্যায়নে)। এগুলি প্রধানত ছিল কৃষক অভ্যুত্থান এবং বিদেশী শক্তির শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধেই সেগুলির প্রতিরোধ ছিল।

গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে ১৯ শতকের জাতীয় সংস্থাগুলির কার্যাবলী বিষয়ে এবং সেই সূত্রেই পরবর্তী যুগে ২০ শতকের প্রথম পাদে যে সংগঠিত গণ-আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেল তার পটভূমি ও সামাজিক-আর্থনীতিক বিশ্লেষণও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই অধ্যায়ের রচয়িতা হলেন ই. এম. কোমারফ ও এ. আই. লেভ্‌কোফস্কি। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, ১৯০৫-'০৮ সালে ভারতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উত্থান ঔপনিবেশিক-ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য ভারতীয় জনগণের সচেতন প্রয়াসেরই প্রতিফলন।

১৯০৫-'০৮ সালের মধ্যে ভারতে অনেকগুলি আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এইসব আন্দোলন ও পরবর্তী বছরগুলির আন্দোলনসমূহ স্পষ্টতই সে সময়ের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের গণ-চরিত্রকেই উদ্‌ঘাটিত করে তোলে। ঘটনাবলীর সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত এই তথ্য ও সত্য ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা অবশ্য অস্বীকার করেন। এই সব ঐতিহাসিকরা যথেষ্ট প্রয়াস করে দেখাতে চান যে, ওই আন্দোলনগুলি হল "মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর" কার্যকলাপ, যার পিছনে কোনও জনসমর্থন বা ভিত্তি ছিল না। সোভিয়েত ঐতিহাসিক ও গবেষকরা নথী-তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে ১৯০৫-'০৮ সালের জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে শিল্প-শ্রমিকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই যুগের সংগ্রামে অংশগ্রহণই পরবর্তী যুগে শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় আন্দোলনের সামনাসামনি আসার পথ খুলে দেয়।

ভারত-রুশ সম্পর্ক

সোভিয়েত ভারতবিদ্যা গবেষণার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভারত-রুশ সম্পর্ক। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারত-রুশ সম্পর্ক সংক্রান্ত মহাফেজখানার দলিলের একটি সংকলন সেই সুদূর অতীতে ভারত-রুশ সম্পর্কের কয়েকটি বিশিষ্ট দিকের উপর নতুন আলোকপাত করে। অষ্টাদশ শতাব্দী সম্পর্কে অনুরূপ দলিলের আর একটি সংকলন বর্তমানে ছাপা হচ্ছে।

এই সিরিজের তৃতীয় গ্রন্থ লেনিনগ্রাদের ভারততাত্ত্বিক ই. ওয়াই. লিস্টারনিকের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারত-রুশ আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিষয়ে প্রকরণ-গ্রন্থ। প্রায় ত্রিশটি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত এতাবৎকাল অজানা দলিলের ভিত্তিতে এটি রচিত। এর সাহায্যে লেখক অনেক ভুলে-যাওয়া তথ্য ও ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে পেরেছেন, নানা সময়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে যে সব রুশ বা ভারতীয়রা সাহায্য করেছেন তাঁদের নাম পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ঔপনিবেশিকরাজ যদিও ভারতবর্ষকে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগযোগ স্থাপনে বাধা দিয়েছে তবুও গ্রন্থ-বর্ণিত যুগে ভারত-রুশ সম্পর্ক যে অপেক্ষাকৃত বিচিত্রতর পথে আত্মপ্রকাশ করেছে এই গ্রন্থে তা দেখানো হয়েছে। তখনই ভারত-রুশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। আর এই যোগাযোগই দুই দেশের প্রগতিমনা মানুষদের পারস্পরিক স্বার্থে মানবতাবাদী আদর্শের জন্য একসূত্রে বাঁধতে সাহায্য করেছে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে লিও টলস্টয় ও ভারতীয় দেশপ্রেমিক কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম কামা এবং মহান্ সোভিয়েত লেখক ম্যাক্সিম গর্কির যোগাযোগ কি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে না? বস্তুতপক্ষে, এই প্রকরণ-গ্রন্থে যে সব উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে তার তাৎপর্য কোনোক্রমেই খাটো করে দেখা চলে না। ভারত-রুশ সম্পর্কের ইতিহাস এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের বিচ্ছিন্নতা ঘোচাবার এবং অন্য দেশের অগ্রসর সামাজিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ভারতীয় প্রগতিবাদীদের প্রয়াসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে।

ভারতীয় দর্শন-চর্চা

সোভিয়েত ভারতবিদ্যা গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল ভারতীয় দর্শন-চর্চা। আকাদেমিশিয়ান শ্‌চেরবাটস্কয় ও ওল্‌ডেনবার্গ রুশিয়ায় প্রাচীন

ভারতীয় দর্শন-চর্চায় পথিকৃৎ। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদেরা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তার বিষয়েও বিশেষ আগ্রহী। তাঁদের গবেষণার ফলাফল কয়েকখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে 'ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন' নামে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ-সংকলন-গ্রন্থও আছে। এই সংকলনে সংগৃহীত প্রবন্ধের মধ্যে রামমোহন রায় ও অরবিন্দ ঘোষের দর্শন ও সামাজিক-রাজনৈতিক ধারণা সম্বন্ধে প্রবন্ধও আছে।

রামমোহন রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রবন্ধটিতে (ই. এন. কোমারফ প্রণীত) ভারতের জাতীয় বিকাশে এই অনন্যসাধারণ মনীষীর প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ভূমিকার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়া হয়েছে। ঐ প্রবন্ধ-লেখকের মতে রামমোহন রায়ের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা ঈশ্বর-বিশ্বাসী কিন্তু প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী ও যুক্তিবাদী। তাঁর ধর্ম-সংস্কার প্রয়াস ভারতীয় ইতিহাসে বুর্জোয়া ধরনের ধর্ম সৃষ্টির প্রথম প্রয়াসরূপে পরিগণিত হতে পারে। রামমোহনের ভাবাদর্শ সত্যই 'রিফর্মেশন' ও 'এনলাইটেনমেণ্টের' বিভিন্ন উপাদানের একটা অদ্ভুত সমন্বয়, যাতে আবার শেষোক্ত উপাদানই প্রাধান্য পেয়েছে দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তার বিকাশে উচ্চতর ঐতিহাসিক স্তর হিসাবে। রামমোহন রায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণাগুলি যে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহেরই শুধু বিরোধী ছিল তা নয়, দেশের ঔপনিবেশিক শোষণেরও তা বিরোধী ছিল—যদিও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল্যায়নে সমালোচনার পাশাপাশি কিছুটা প্রশস্তির মনোভাবও তাঁর মধ্যে ছিল। অর্থাৎ, রামমোহন রায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ভ্রূণ অবস্থায় ছিল উনিশ শতকের শেষাশেষি ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সামাজিক চিন্তায় যা থেকে দুটি বিরোধী ভাবধারার সৃষ্টি হয়, যথা—উদারনৈতিক ভাবধারা ও প্রগতিবাদী ভাবধারা।

জাতিসমস্যা

আধুনিক ভারত, সমসাময়িক জগতে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদেরা তার সম্পর্কে যে বিশেষ আগ্রহশীল তা আমি আগেই বলেছি।

'আধুনিক ভারতে জাতিসমস্যা' নামে এ এম. দিয়াকফ যে প্রকরণ-গ্রন্থটি লিখেছেন তাতে আলোচিত দু-একটি সমস্যা সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে দু-এক কথা বলব। এই গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষ একটি বহুজাতিক দেশ কিন্তু এদেশের জাতীয়-সংহতি রক্ষা করাটা সব জাতিরই স্বার্থ, যদিও ভারতের বর্তমান অবস্থায় এই ঐক্য সংরক্ষণের কাজ নানা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে।

অধ্যাপক দিয়াকফ তাঁর গ্রন্থের ইতিহাস-বিষয়ক অধ্যায়গুলিতে দেখিয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (পুঁজিতন্ত্রের উন্মেষের যুগে) একদিকে যেমন সর্বভারতীয় বাজার সৃষ্টি হচ্ছিল অন্যদিকে তেমনি কোনো কোনো একই ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থানীয় শিল্প ও স্থানীয় বাজার গড়ে উঠছিল। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সংস্কৃতি গড়ে ওঠার আর্থনীতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করছিল এই প্রক্রিয়াটি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে দেখা গেল। পুঁজিতন্ত্রের অভ্যুত্থানের যুগে ইওরোপে যে জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ হয়েছিল এই আন্দোলন ছিল তারই অনুরূপ। এই ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের আন্দোলন কিন্তু সর্বভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধী ছিল না—যা ভারতের জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করছিল। এই আন্দোলন বস্তুতপক্ষে শেষোক্ত আন্দোলনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাও পরিচালিত হচ্ছিল ব্রিটিশ প্রভুত্ব ও ঔপনিবেশিক ভারতে জীইয়ে-রাখা কিছু সংখ্যক সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের বিরুদ্ধে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের আন্দোলন অনিবার্য-ভাবেই ব্যাপকতর আকার ধারণ করল এবং সংগঠিত চেহারা নিল। ১৯৫৬ সালে রাজ্যসমূহের পুনর্গঠনের ফলে, লেখকের মতে, প্রধানত দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের ভাষা তথা জাতিসমস্যার সমাধান হয়েছে। কিন্তু অন্য কতকগুলি অঞ্চলে এখনও এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয় নি। ভারতের আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতি নিঃসন্দেহে অনগ্রসর জাতিগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত করবে। এই জাতিগুলির অধিকাংশেরই বাস মধ্যভারতে ও আসামে। কিন্তু কোনো জাতির বিকাশ এবং তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিমাত্রই বিচ্ছিন্নতাকামী ঝোঁক বলে গণ্য করা চলে না। এখনও পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাকামী ঝোঁকের চরিত্র সাম্প্রদায়িক, জাতীয় নয়। লেখকের সর্বশেষ

সিদ্ধান্ত হল এই যে জাতিসমস্যার যদি সুসমঞ্জস গণতান্ত্রিক সমাধান করা হয়, যদি সব জাতিকে বিকাশের সমান সুযোগ দেওয়া হয়, যদি কাউকেই বৈষম্য-মূলক সুবিধা না দেওয়া হয় তাহলে ভারতের জাতীয় ঐক্য রক্ষা এবং তার সুদৃঢ়করণের সমস্ত পূর্বশর্তই বিদ্যমান আছে। এই ঐক্য ভারতের সমস্ত জাতির পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষ চিত্র

যেসব গবেষণা ইতিমধ্যেই হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির এশীয় জাতিসমূহের ইনস্টিটিউট চার খণ্ডে ভারতের ইতিহাস প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে দুটি খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এতে আছে আধুনিক ও সমকালীন, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতেতিহাসের খণ্ড দুটি আমরা আগামী প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের সময় কিংবা তারও আগে প্রকাশ করতে পারব বলে আশা রাখি।

আমরা, সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদেরা আমাদের রচনায় পাঠকদের কাছে ভারতের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার একটি অপক্ষপাত চিত্র দেবার প্রয়াস করি। উপনিবেশবাদী ঐতিহাসিকদের সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তের হেরফের ঘটে। কারণ তাঁরা আধুনিক যুগে ভারতের ঐতিহাসিক অগ্রগতির দায়ভাগ উপনিবেশিক শাসকদের উপর অর্পণ করে তার প্রগতিশীল ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকার গুণকীর্তন করেন এবং ভারতীয় জনসাধারণের মুক্তি-আন্দোলনকে মসীবর্ণে রঞ্জিত করতে চান। এই ঔপনিবেশিক ধারণা ভারতের অসামরিক ইতিহাসকে ব্রিটিশ ইতিহাসের অঙ্গীভূত করে তোলে। ভারতের ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্য দিয়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তার ভিত্তিতে এই ধরনের ব্যাখ্যা এখন সংশোধিত করা হচ্ছে। ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা এখন নতুন দৃষ্টি নিয়ে তাদের দেশের ইতিহাস রচনা করছেন। আমরা তাঁদের এই দেশপ্রেমিক প্রয়াসের সাফল্য সর্বতোভাবে কামনা করি।*

* জানুয়ারী মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ষড়বিংশ প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধের সারাংশ। ইংরেজী থেকে অনুদিত।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বদেশীর স্রোতাবর্তে

সেকালে বিধাতা পুরুষ ষষ্ঠী দিনে কপালের লিখন লিখতেন। একালে বিধিলিপি লেখা হয় তিন থেকে সাত বৎসর জুড়ে। এ লিপি অবশ্য দৈবজ্ঞের অজ্ঞাত, মনোবিজ্ঞানীর পাঠ্য। স্মৃতিতে না দেখে তার দাগ দেখতে হয় বিস্মৃতিতে, চেতন-চিত্তে নয় অ-চেতন মনে। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত আমার সেই বিস্মৃতিলোক মন্থন করবেন একালের সেই সুরাসুরগণ, ফ্রয়েড্-য়ুঙ্-এ্যাড্লার-ও-প্যাব্লব্ গোষ্ঠী। আমার দৃষ্টি স্মৃতিতেই সীমিত।

'চেতনা প্রত্যূষে'

১৯০৫ সাল আমার তিন বৎসরের মনের উপর দিয়ে কী ভাবে বয়ে গিয়েছে, তা আমার অন্তত জানা নেই। স্বদেশী যুগের প্রথম যে স্মৃতি আমার মনে স্পষ্ট তা এই—এখন জানি এটা ১৯০৮ সালের ৩০-এ এপ্রিলের ঠিক পরেকার কথা, বয়স যখন আমার ছয় বৎসর। বাবার বৈঠকখানায় বসেছিলেন সেদিনের পদস্থ একদল ভদ্রলোক, অনেকেই তাঁরা সরকারী কর্মচারী। সম্ভবত আমাদেরই একজন প্রতিবেশী পদস্থ সরকারী কর্মচারীর পুত্রের বা কন্যার বিবাহোপলক্ষে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রিত। আসনের অপেক্ষায় অপেক্ষা করছেন আমাদের বৈঠকখানায়। কারণ, গ্রীষ্মকাল, এ বৈঠকখানার দক্ষিণে আছে বড়ো পুকুর; ঘরের বড়ো বড়ো জানালাগুলো দিয়ে পুষ্করিণী 'শিকরণাং বোঢ়া' দক্ষিণের হাওয়া এসে সেই বৈঠকখানার মস্ত ফরাসটাকে গ্রীষ্মের দুপুরে আরামদায়ক করে। আলাপ-গল্পও তাই জমে উঠছে—যেমন জমে এরূপ স্থলে স্বভাবত। বোধহয় অন্দরে মাকে স্বস্তি দেবার প্রয়োজনেই আমিও ছিলাম এই আসরের এক কোণে বন্দী; নিদ্রা যেতে আদিষ্ট বলেই বিনিদ্র। আমার

কানে গেল—মনেও গেঁথে রইল—সেখানকার একটি আলোচনা : "মোকামা স্টেশনে আত্মহত্যা করেছে—ধরা দেবে না।" "কিন্তু আত্মহত্যা কেন করলে ?" "ধরা দেবে না বলে।" "না, পাছে পুলিশের অত্যাচারে বলে ফেলতে বাধ্য হয়, তাই।"

কী অভাবনীয় কারণে আমার শিশু-মানসে একটি চিত্র ফুটে রয়ে গেল—শার্টপরা বছর আঠারো-উনিশের এক বাঙালী যুবক, জন কয় পুলিশের হাত ছাড়িয়ে আপন কপাল লক্ষ্য করে গুলি করছে। মোকামা জংশন পরে অনেকবার পার হয়ে গিয়েছি—হয়তো আরো যাব ; কোথায় প্রফুল্ল চাকী আত্মবলি দিয়েছিলেন, তা দেখবার কথা প্রায়ই মনে জাগে নি, এখনো জাগে না। কিন্তু আমার স্মৃতিতে বাঙলার স্বদেশী যুগের প্রথম রেখাপাত ঐ আলোচনায়, তার প্রথম রেখাচিত্র ঐ ছবি। কেন তা মুছে গেল না, তা মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করুন। আমি জানি 'স্বদেশী যুগ' মুছে যাবার মতো নয় বলেই সে স্মৃতিরেখাও মুছে যায় নি। সেদিনের সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ভদ্রলোকদের আলোচনায় যে সুরটি ছিল তাও তার যথেষ্ট প্রমাণ। বাঙালী ভীরুতার অপবাদ থেকে পৃথিবীর চোখে মুক্ত হচ্ছে,—আপনার চোখেও। একজনার আত্মদানের শক্তিতে সমূহের আত্মশক্তিও সেদিন কতকাংশে উদ্বুদ্ধ।

আমার স্বদেশী-চেতনার জন্ম বৈঠকখানার সেই ১৯০৮-এর মে মাসের টুকরো-টুকরো কথার আলোচনায়।

কালানুক্রমিকতার নিশানা ঠিক নেই—তবু মনে পড়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিনে বেসরকারী স্কুলের ছাত্র আমার অগ্রজরা স্কুলে গিয়েছিলেন খালি পায়ে, শুধু চাদর গায়ে। মনে পড়ে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সপ্রশংস আলোচনা বাড়িতে, বাজারে, পথে-ঘাটে সর্বত্র—বহুজনের আত্মসচেতনতার তাও এক উজ্জ্বল উপকরণ। বিশেষ করে মনে পড়ে, বাজারে আমাদের ডাক্তারখানায় সাধারণ দোকানী কর্মচারীদের কথাবার্তা। দুনিয়ার অন্যতম আশ্চর্য সেই বাঙালী যুবকের প্রাণশক্তি—কারান্তরালে ফাঁসির অপেক্ষায় যাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, ওজন পায় বৃদ্ধি। ডাক্তারি শাস্ত্রেও নাকি এমন দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। কী সেই প্রেরণা যাতে মানুষকে দেয় মহামানবীয় রূপ, সামান্যকে করে অসামান্য !

অন্য রূপও মনে পড়ে—কুমিল্লায় নবাব সলিমুল্লার আগমনোপলক্ষে হিন্দু-

মুসলমান দাঙ্গা বেধেছে, ঢাকার ভলেন্টিয়াররা কুমিল্লা যেতে চেয়েছে ; পুলিশ তাদের বাধা দেয়। নোয়াখালি শহরে অবশ্য উদ্দীপনার হাওয়া ঢাকা-কুমিল্লার মতো তপ্ত নয়। তবু শুনেছিলাম ছোটলাট ফুলারকে সম্বর্ধনা জানাবার তাগিদে সরকারী উকীল খাঁ বাহাদুরের হাত দিয়ে শহরের মুসলমান সাধারণকে নতুন চটি ও নতুন ফেজ কিনে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ 'স্বদেশীর' সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ। দু-একজন মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন ; কিন্তু সাধারণভাবে তাঁরা নিষ্ক্রিয়। প্রচারে-প্ররোচনায় সেই বিচ্ছেদ ক্রমে বিরোধেও রূপ নেয়। 'স্বদেশীটা' তাই বিশেষ করে হিন্দুরই দায়িত্ব। আশ্চর্য নয় যে, জাতীয়তার শপথ নেওয়া হত পশ্চিমপাড়ায় বৃদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরে। লাঠিখেলারও ব্যবস্থা ছিল তার প্রাঙ্গণে। আমাদের চোখে তাই মনে হত স্বাভাবিক। মুসলমান ধর্মটা দেশের বাইরের ; ওই ধর্মাবলম্বীরাও তাতে বাইরের মানুষ থেকে গিয়েছে। দেশের আপনার হবার তাগিদ তো তাই তাদেরই হওয়া উচিত, আমাদের কী দায় ?

বাড়ির হাওয়া : যুগের হাওয়া

আমাদের বাড়ির আবহাওয়া কিন্তু তপ্ত স্বাদেশিকতার নয়। সাধারণ উৎসাহ আছে, বেহিসাবী উদ্দীপনা নেই। মামা অশ্বিনী ঘোষাল ছিলেন বাড়িতে স্বদেশীর পাণ্ডা। লাঠিখেলায় উৎসাহী। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আমরাও তার প্রাঙ্গণে মাঝে-মাঝে সেই 'শির-মুণ্ডা-তামেচা'র মহড়া দেখতে যেতাম। শুনতাম, তলোয়ার-ডেগারের মহড়াও চলে—তবে গোপনে। স্বদেশীর উত্তেজনার প্রধান উৎস যে ওই গোপনীয়তা, এখন তা বুঝি। তখন বুঝলে হাসতে পারতাম। কিন্তু সবটাই কি তার হাসির ব্যাপার ? লাঠি-ডেগার পর্যন্ত বেআইনী, 'স্বদেশী' মাত্রই তো পুলিশের শিকার। তারপর আছে কয়েদখানায় তাদের উপর অত্যাচার—মারপিট, নখের নিচে সূঁচ ফুটিয়ে গোপন কথা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা। তবু সে তথ্য উদ্‌ঘাটন করলে অবশ্য দলের হাতে মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য। নিষ্ঠুর হলেও, আমরা সেদিন মানতাম, তা ন্যায়দণ্ড। এ সব কথায় হাসতে এখনো তাই পারি না। তবে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে এখন আর নিঃসংশয় নই। মানুষ গেলে আর ফিরে আসে না—এই বোধটা এখন চরম ; ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তার পরে। মামা অবশ্য কিছুকাল পরেই নোয়াখালি ত্যাগ করেন। তার ওপরে পুলিশের তখন নজর পড়েছে।

তিনিও মোক্তারি পাশ করে ফেলেছিলেন; নারায়ণগঞ্জে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু 'স্বদেশীর' সম্পর্কটা ত্যাগ করেন নি। ব্যবসায়েও মন দিতে পারেন নি। যতদূর জানি, অনুশীলন সমিতির কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন, সঙ্গে সঙ্গে গেঞ্জির কল, মোজার কল প্রভৃতি যত রকমের স্বদেশী কারবারে হাত পাকাতে-পাকাতে আর অর্থ নষ্ট করতে করতে ঠিক যখন পরিণত বয়সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে সত্যই একটা গেঞ্জির কল ঢাকায় গঠন করতে পেরেছেন, তখন সাধের স্বাধীনতার মাশুল জোগাতে তাঁকে সপরিবারে পাকিস্তান ছেড়ে আসতে হোল কলকাতায়—আবার নতুন পত্তন। বাড়িতে আমরা বাল্যে একমাত্র তাঁর শাসনেই সংযত থাকতাম, তাঁর লাঠিখেলা-শুদ্ধ স্বাদেশিকতা কৈশোরে তাঁর প্রতি ভীতি ছাড়াও একটা সম্ভ্রম সৃষ্টি করেছিল। তাঁকে মনের সামনে দেখতাম বড়ো করে, স্বভাবতই তাঁর 'কাজ'কে দেখতাম আরো বড়ো করে।

সে 'কাজের' খবর বিশেষ রাখতাম না তখনো। কিন্তু বাড়িতে খবরের কাগজ আসত বাঙলা সাপ্তাহিক, দৈনিকের দিন আসে প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে। প্রকাণ্ড বড়ো কাগজটার মধ্যে যত অদ্ভুত সংবাদ পড়তাম তার মধ্যে সর্বাধিক আকর্ষণীয় স্বদেশী মামলার কথা। পুলিশের দাখিল করা কথা কতটা সত্য কতটা মিথ্যা, তা এখন জেনেই বা কি হবে? আমি কিন্তু অমৃত হাজরার নাম এখনো ভুলি নি, পরে দৈনিকের যুগে 'মোটাবাবু' রাসবিহারী বসু, পিঙ্গলে, শচীন সান্যাল প্রভৃতির নামও। সংবাদপত্রে দ্বিতীয় ধরনের আরেকটা সংবাদ ছিল—সাহেবের লাথিতে দেশী লোকের পিলে ফাটা। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই তা চলছিল। কিন্তু শুনছিলাম বোমার আবির্ভাবের পরে সাহেবরাও নাকি একটু এদিকে সাবধান হচ্ছে। "বোমা না ফাটালে পিলে ফাটানো বন্ধ হবে না," এ মর্মের একটা উক্তি সকৌতুকে মেনে নিয়েছিলাম। অবশ্য তা স্বদেশীর সবটা নয়। শ্বেতাঙ্গের হাতে ভারতের অন্যায় অত্যাচার, নিশ্চয়ই ভারতীয়দের মর্মদাহ জাগায়। কিন্তু স্বদেশীর প্রেরণা শুধু ওই বর্ণবিদ্বেষের নেতিমূলক স্বদেশী প্রতিক্রিয়া এবং সুভাষচন্দ্রের বিপ্লব সাধনারও উৎস তা'—যে বুদ্ধিমান বিদেশী লেখক ভারতীয় স্বাধীনতার সাধনাকে এরূপ প্রতিক্রিয়ারই প্রকাশ বলে ধরে নেন, তিনি নিজেকে ছাড়া কাউকে প্রতারিত করতে পারবেন না। পরেও ওরূপ কত পণ্ডিতী প্রভারণাই শুনেছি—বাঙলার বিপ্লববাদের কারণ যুবকদের অন্-এমপ্লয়মেণ্ট বা বেকার-ব্যাধি। কিম্বা কিশোর ও তরুণদের

'হেলদি' খেলাধুলা, দৈহিক মানসিক অনুশীলনের অবকাশের অভাব। কিম্বা, একেবারেই অজ্ঞাত মনের ঈদিপাস্ কম্‌প্লেক্‌স্—পিতৃবিরোধিতা, অতএব, পিতৃকল্প সরকারের বিরোধিতা। একটা কথাই শুধু তাঁদের জানা নেই—পরাধীনতার মতো বাস্তব সত্য মানুষকে পাগল না করে পারে না। আমরা আবার যে যুগে জন্মেছি তা 'স্বদেশীর যুগ।' আকাশ-বাতাসে তখন উন্মাদনা। সে উন্মাদনা কোনো লর্ড কার্জনের কেন, কোনো লাট-গোষ্ঠীরই সৃষ্টির অসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের ও 'জীবন-স্মৃতির' পাঠক তো জানেন, 'সঞ্জীবনী-সভা' এবং রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো পাগল দেশে অনেক পূর্বেই জন্মেছিলেন। যে মুহূর্তে জাতি পরাধীন হয় সে মুহূর্তে তার মনের কোনো না কোনো কোণে জমে এই পাগলামোর বীজ, জমে পরাধীনতার গ্লানি আর স্বাধীনতার কামনা। আমাদের কাউকে যখন জেলখানায় পোরে তখনি যেমন বুঝি এই লক্ষ্মীছাড়া কলকাতার আবর্জনা-ভরা পথঘাট, মাঠ-মানুষ কত চোখ জুড়োয়। উনবিংশ শতাব্দীর আগেই তাই এ বিক্ষোভেরও চিহ্ন মিলে—তখনো জাতীয় চেতনা জন্মে নি, কিন্তু পরাধীনতার বেদনা জন্মেছে। রামমোহন রায়ের পর থেকে তার রূপটা চোখে ফুটে উঠতে থাকে। তার অর্থ পাগলামোটা কেটে গেল, এমন নয়। তবে স্বাধীনতার তাৎপর্যটা বোধগম্য হতে লাগল—ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে। কেউ গৌণ পথে কেউ মুখ্য পথে সমস্ত শতাব্দী ধরে ওদিকেই পথ হাতড়ান। গৌণ পথটা সংস্কারের পথ, মুখ্য পথটা বিদ্রোহের পথ। সমরশাস্ত্রীরা বলেন—strategy of 'Indirect Approach' যুদ্ধে কম ফলপ্রদ নয়। যেখানে সংস্কারকের ও বিদ্রোহীর পথ এসে মিলে সে হচ্ছে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে, সাধনায়। এই জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সার্থক প্রকাশ আধুনিক বাঙলা সাহিত্য। বছর দশেক পূর্বে 'পরিচয়'-এ একবার আমাকে অত্যন্ত সংক্ষেপে বাঙলা সাহিত্যের মূল সুরটি বাস্তবত কী, তা লিখতে হয়েছিল। সে সুর হচ্ছে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়।' সূত্রাকারে বললে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার দুর্বার প্রকাশ। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে এমন একজন বাঙলা সাহিত্যিকও কি আছেন যিনি এর ব্যতিক্রম? কারো বিদ্রোহের বাণী ফুটেছে আক্রান্ত লঙ্কাধিপতির স্বপক্ষে, কারো সাক্ষ্য আরো স্পষ্ট—যদিও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আবরণে।

বৈঠকখানায় যত আলোচনাই শুনি তাকে ঘিরেও এই বাণীর প্রতিধ্বনিই বাতাসে শব্দায়িত হ'ত। ঘরের বেড়ায় ঝুলন্ত রামমোহন রায় প্রভৃতির

বাঁধানো ছবি। পুরনো 'বেঙ্গলী'র প্রচারিত দীর্ঘপটে ছিল কংগ্রেস সভাপতিদের প্রতিলিপি—ডব্লু.ই. সি. ব্যানার্জি থেকে রাসবিহারী ঘোষ পর্যন্ত। পার্শ্বেই ছিল ওরূপ আরও দুটি দীর্ঘপট—রুশ-জাপান যুদ্ধের উভয় পক্ষীয় সেনাপতিদের ছবি। তাঁদের নামও জানতাম। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতিদের নাম একাদিক্রমে মুখস্ত বলতে বল্লে ভুল হত না। তাঁদের কারো কারো মনীষার ও বাগ্মিতার কাহিনীও ছিল মুখস্ত। সেই সঙ্গেই জানতাম 'লাল-বাল-পাল' ও অরবিন্দ, এঁদের ছবি ঘরে রাখা বিপজ্জনক। স্বদেশীর গান বিশেষ শুনি নি, কিন্তু গানের বই বাবার বাক্সে ছিল; তা পড়তাম আর অনেক গান মুখস্তও ছিল। এরই মধ্যে যখন একদিন বাঙলা সাহিত্যের নেশার ডাকে আমরা দু' ভাই বাবার আলমিরা থেকে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী দু' খণ্ড চুরি করে পড়তে আরম্ভ করলাম, সেদিন সেই নেশার ডাকের সঙ্গে নিশির ডাকও আমাদের পেয়ে বসল। আনন্দ মঠ! স্বপ্ন যখন ভাঙল তখন একবারও মনে হয় নি তার শেষাংশে ইংরেজ রাজ্যের প্রশস্তি প্রয়োজনীয় সাফাই ছাড়া আর কিছু। যে রাজত্বে ঘরে অরবিন্দ ও তিলকের ছবি রাখা নিষিদ্ধ, গীতা বিপজ্জনক, সে রাজ্যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী অন্য রূপে শেষ করা, মুদ্রিত করা ও প্রকাশিত করা যে অসম্ভব, এ কথা আমাদের কিশোর মন অবাধে মেনে নিতে পেরেছিল। অবশ্য বঙ্কিমের মতাদর্শ সেদিন বিচার্য হয় নি, সম্পূর্ণ বুঝতে পারতাম কিনা তাও সন্দেহ। কিন্তু বঙ্কিমের যা জীবন্ত দান তা জাতির জীবনের মধ্যেই তখন জীবন্ত। তার বিচার-বিশ্লেষণ তখনো অসাধ্য।

বঙ্কিম পথ

আজ বলতে পারি, বঙ্কিমের পথটা তবু বঙ্কিম পথ। জাতীয় ইতিহাসে বঙ্কিমের আত্মপ্রকাশে যেমন জাতির আত্মপ্রত্যয় লাভ ঘটেছে, জাতীয় বিভ্রান্তিতেও তেমনি বঙ্কিমের আত্মবিস্মৃতি জুগিয়েছে ভ্রান্তি। সত্যই বঙ্কিম 'হিন্দু জাতীয়তা'র বলবৃদ্ধি করেছেন। অবশ্য 'হিন্দু জাতীয়তা'র বনিয়াদ তিনি পত্তন করেন নি। আমাদের দুর্ভাগা ইতিহাসে সংস্কৃতিতে তা তৈরী হয়ে ছিল। 'বৃদ্ধ হিন্দু' রাজনারায়ণ বসুর বা 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা' তা থেকেই সমুত্থিত। 'হিন্দু মেলা'রই নাম 'জাতীয় মেলা'। 'হিন্দু' ও 'ভারতীয় জাতীয়তা' তাঁদের কাছে সমার্থক। ভারতীয় জাতীয়তার এই স্ববিরোধী উপকরণ ভারতের ইতিহাসের মধ্যেই থেকে গিয়েছিল—আমরা পোষণ করে এসেছি অনেক মেলামেশার মধ্যেও পাশাপাশি দুই বিভিন্ন ঐতিহ্য। সাম্রাজ্যবাদী

শাসকেরা হিন্দু মুসলমানের সেই বিভিন্ন ঐতিহ্যকে বিরোধী বনিয়াদে পরিণত করত, আর করেছেও। যেখানে ভেদ নেই, যেমন কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, সেখানেও ভেদ সৃষ্টি করা তাদের কাজ। আমাদের তো ইতিহাসের মধ্যেই ভেদরেখা ছিল। আমরা বিরোধী না হই অনেক দিকে বিভিন্ন থেকে গেলাম। বিদেশী শাসকদের পক্ষে তাই সুযোগটা তৈরী ছিল, তারা তা কাজে লাগিয়েছে। আর, আমরা তা জুড়ে ফেলবার মতো ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারলাম না, জোড়াতালি দেবার চেষ্টা করতে-করতে একেবারে ফেল করে বসলাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজ্যহারা মুসলমান জাত ওহাবী-উন্মাদনায় 'বিশুদ্ধ ইসলামের' জন্য আগ্রহান্বিত হয়। অন্যদিকে তখনি নবাবিষ্কৃত হিন্দু-সংস্কৃতির মহিমা-ছটায় হিন্দুরা ঝুঁকে পড়ে প্রাচীনতর হিন্দু ঐতিহ্যের দিকে। দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাঁকটা তাতে আরও বাড়ে। আবার, ঠিক তখনি ইংরেজি-শিক্ষার সুযোগ নিয়ে হিন্দু মধ্যবিত্তরা পাঁচ শ' বছর পিছনে থেকে মুসলমানদের থেকে এক শ' বছর এগিয়ে গেল এক কদমে—বিশেষ করে বৈষয়িক জগতে। আর্থিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেই বরাবরের পিছিয়ে-পড়া ও হঠাৎ-এগিয়ে-যাওয়াদের খবরদারি মানবে কেন রাজ্যবঞ্চিত অভিমানী মুসলমান? স্যর সৈয়দ আহমদ চাইলেন মুসলমানের জাগরণ—স্বমর্যাদায়, কিন্তু পৃথক সম্প্রদায় রূপে। তাতে করে সুযোগ-সুবিধার লড়াই আরম্ভ হতে বাধ্য। আরম্ভ হলও। অবশ্য লড়াইটা মূলত 'উপরতলার'—'বাবুজীদের' সঙ্গে 'মিঞা-সাহেবদের' চাকরি ও পদপ্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নিচের তলায় রামা কৈবর্ত ও রহিম শেখ খালি পেটে ধুক্‌তে ধুক্‌তে যে অস্থি-চর্মসার বলদ দুটোকে ঠেঙিয়ে একই ভাবে লাঙল ঠেলছিল, এ কথাটা 'বাঙলার কৃষক'-এর লেখক বঙ্কিমের মতো ভালো করে আর কেউ জানতেন কিনা সন্দেহ। তখন যদি রাজনৈতিক নেতারা এই 'রামা কৈবর্ত ও রহিম শেখ'দের শ্রেণীটাকেই আশ্রয় করে ভারতীয় জাগরণের বনিয়াদ রচনা করতেন তাহলে হয়তো ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলন অন্য পরিণতিতে পৌঁছতে পারত। কিন্তু কার ছিল সেই দৃষ্টি, সেই সাহস? বাঙলার রেনেসাঁসের মধ্যে এই লোকাভিমুখিতার অভাব ছিল। তবু দৃষ্টি বঙ্কিমের থাকবার কথা। প্রথম আন্তর্জাতিক [illegible] রাত্রির সাম্য-স্বপ্ন তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজন [illegible] —জাতীয় আত্ম-মর্যাদাবোধের উদ্বোধন, বিশেষ করে জাতীয় সংস্কৃতির নব-স্থাপনা, তখন বঙ্কিম শ্রেণী-চেতনায় ও শ্রেণী-বিরোধে ভরসা রাখতে পারেন নি।

একবার বঙ্কিমের কীর্তি-অকীর্তি নিয়ে তর্ক হয়েছিল। [illegible]-এর কথা। গোঁড়াদের বিরুদ্ধে তর্ক করতে গিয়ে আমিও কিছু গোঁড়ামি তখন করেছি; তবে আমার মূল বক্তব্যটা এখনো বদলায় নি। তা অনেকটা এরূপ: পরাধীন জাতির পক্ষে জাতীয় উদ্বোধনের উপকরণ খুঁজতে হয় জাতির অতীতে। সেই দৃষ্টিতে ইতিহাসের পুনরাবিষ্কারও করতে হয়। তাতে দেখা দেয় ঐতিহাসিক নাট্য উপন্যাস,—তাকে রোমান্টিক বললেই যথেষ্ট হয় না, তা মহদাশয়ের অভিব্যক্তি, উজ্জীবন—জাতীয় আশার, সাহসের উদ্বোধন। বঙ্কিম ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক ও নাট্যকাররা এ চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের যে পটটি তাঁরা আলেখ্য রচনায় গ্রহণ করেন তা হচ্ছে আক্রমণকারী ও আক্রান্তের সংগ্রামের ইতিহাস, হয়তো মন্দভাগ্য বিজিত ও পরাক্রান্ত বিজেতার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। কিন্তু তাতে বিপদ ঘটল এই যে, এতো শুধু অসুর বৃত্রের বিরুদ্ধে দেবতাদের কথা নয়, আলেকজেন্দারের বিরুদ্ধে পুরুর বিক্রমের কথা নয়—এমন কি, দু-একজন চাঁদ সুলতানার বীরত্ব কাহিনীও নয়। পটটা যে প্রায়ই পরাক্রান্ত মুসলমান বিজেতার সঙ্গে আক্রান্ত হিন্দু রাজাদের দ্বন্দ্বের কথা। পরাধীন ভারতবাসীর সহানুভূতি ও বিরাগ তাতে কোন পক্ষে যায় তা সহজবোধ্য। পেট্রিয়টিজম্‌-ও তাই হিন্দু রঙে রঞ্জিত হতে থাকে; আর, ভারতের মুসলমান পেট্রিয়টের পক্ষে তা সহজগ্রাহ্য হতে পারে না। জাতীয়তার অখণ্ডানুভূতি গড়ে উঠবার পক্ষে এই বহিরাবরণটাও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্কিমের সৃষ্টির সূত্রে অতীতের সেই ঐতিহ্যের বিভেদ লুপ্ত হল না।

জাতীয় আত্মমর্যাদার পাদপীঠ হিসাবে বঙ্কিম যে সাংস্কৃতি-ভূমি রচনা করতে চান তা আরও দুষ্প্রবেশ্য। কোঁৎ-মিল-স্পেন্‌সার-এর সঙ্গে তাল ঠুকে তিনি দেখালেন পাশ্চাত্ত্য কাল্‌চারের যা শ্রেষ্ঠ আদর্শ তা আমাদের গীতাতে বহু পূর্বে ঘোষিত, আর কৃষ্ণচরিত্রে চিরদিনের মতো মূর্ত। মনীষার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তাতে বঙ্কিম, নিজের আন্তরিক আগ্রহেরও। কিন্তু ওরকম অনুশীলন-ধর্মে রামা কৈবর্ত ও রহিম শেখের কি প্রবেশ সম্ভব? এক-আধজন খ্রীষ্টান পি. মিত্র যদি-বা অনুশীলনের মর্মোপলব্ধি করে থাকেন, কোনো শিক্ষিত মুসলমান তাতে প্রভাবিত হবেন কি করে? বরং তাতে করে যা হয় তা হচ্ছে খাঁটি দেশপ্রীতির সঙ্গে চোলাই-করা হিন্দুত্বের রসায়নে হিন্দু মধ্যবিত্তের মনে 'হিন্দু জাতীয়তা'রই পুষ্টি। বঙ্কিম তা করেছেন—এটা তাঁর দুর্ভাগ্য, আমাদেরও দুর্ভাগ্য। তাঁর দুর্ভাগ্য, ঐতিহ্যের বিভ্রান্তি ছাড়িয়ে তিনি

ইতিহাসের সত্যপথ দেখতে পান নি—রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তা স্পষ্ট করে কেউ দেখতে পান নি। আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্কিমের সৃষ্টি-প্রতিভা ও বঙ্কিমের অসামান্য মনীষা এই বঙ্কিম-পথকে একই কালে মোহন ও গ্রাহ্য করে তুলল— অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র কেন, গোটা স্বদেশী আন্দোলনটা তার জের টেনে চলে। প্রতিভা যখন বক্রপথ নেয় তখন জাতির দুর্ভাগ্য, এ প্রসঙ্গেই এ কথা আমি পূর্বে বলেছি। কিন্তু কী কারণ-পরম্পরায় তা সে বক্রপথ গ্রহণ করে, তা বুঝতে না চাওয়াও মন্দবুদ্ধি। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বঙ্কিমের সাক্ষাৎ হলে সেই ভক্তপুরুষ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বঙ্কিম বাঁকা কেন?" বোধহয় গীতা ও কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যায় সরল ভক্তির স্বাদ না পেয়েই সেই মহত্তক্তের বঙ্কিমকে এই পরিহাস। বঙ্কিমের উত্তরও অর্থসূচক। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "জুতোর চোটে।" বঙ্কিম-প্রতিভার বিশ্লেষণের এইটিই মূলসূত্র। পরাধীনতার জ্বালা, জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার অনির্বাণ আশা, জাতীয়-সংস্কৃতি রচনার দুর্বার প্রচেষ্টা বঙ্কিমের প্রতিভাকে বাঁকিয়ে দিয়েছে। রসস্রষ্টা, রূপস্রষ্টা বঙ্কিম নিজের সৃষ্টি-বোধকেও তার প্রভাবে খর্ব করেন; আর শেষ পর্যন্ত আপন প্রতিভাকে উৎসর্গ করেন সেই আদর্শের তাড়নায় ধর্ম প্রচারে।

অনেক বাড়িয়ে বলতে হল—বলা দরকার। এতে ভুল যদি থাকে তবু আমার জীবনোপলব্ধিতে এইটিই সত্য। প্রথম কথা, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, (রবীন্দ্রনাথ এই সঙ্গে গণ্য নন, কিন্তু বিবেকানন্দ গণ্য) প্রভৃতির লেখা পড়ে আমাদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় কথা, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের প্রেরণায় বেশ কিছু পরিমাণে ছিল 'হিন্দু স্বাজাত্য', তখনো তা চোখে পড়ে নি, কারণ স্বদেশী আন্দোলনের শেষ জোয়ারেও হিন্দুত্বের ঢেউ বইত। পরেও তার বিভ্রান্তি কাটাতে চেষ্টা করতে হয়েছে, কিন্তু সে পরের কথা, ১৯২৩-১৯২৭-এর। তৃতীয় কথাও কিন্তু সত্য: স্বদেশীর সেই ভাবাদর্শকে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের প্রেরণা 'হিন্দু স্বাজাত্যের' সঙ্কীর্ণ খাতেই বদ্ধ করে রাখে নি, বরং নিজের নিয়মে তাকে এগিয়ে যাবার জন্য পথ করে দিয়েছে—এইটিই আমার সাক্ষ্য।

আমার পক্ষে আরও একটা কথা আছে। প্রথম থেকেই সাহিত্য আমার কাছে স্বাধীনতার প্রেরণার বড়ো পরিপোষক। তাতে যেমন স্বপ্নে মেতেছি, তেমনি অনুভব করেছি পরাধীনতার গ্লানি। তাই যতই এগিয়ে চলেছি ততই একটা ধারণা দৃঢ় হয়ে উঠেছে—আত্মপ্রকাশই হচ্ছে জাতির ও মানুষের

সাধনা। তাতেই তার আত্মবিকাশ। সেই আত্মপ্রকাশেরই একটা পথ সাহিত্য। রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে যতই নাগপাশে বাঁধা থাক কোনো জাতি, একবার যদি সে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তা হলে সে নিজে পায় আত্মবিশ্বাস, আর পৃথিবীতে তার পরিচয় হয়ে যায় প্রতিষ্ঠিত। তারপরে রাজনীতিতে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ঠেকিয়ে রাখা যায় কতক্ষণ? রবীন্দ্রনাথ নোবল পারিতোষিক লাভ করলে এই এগারো-বারো বছরের বালক তার অগ্রজ অভিভাবকদের মুখে যা শোনে তাতে বুঝেছিল—জাতির সে মর্যাদা কোনো ইংরেজ রাজশক্তির সাধ্য নেই আর খর্ব করে। সেই সঙ্গেই আবার অনুভব করেছি, যতক্ষণ রাজনৈতিক মর্যাদা লাভ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই আত্মপ্রকাশের সাধনাও কিন্তু অসম্পূর্ণ। আমার কথাটা তাই এই—জাতীয় আত্মপ্রকাশের এই সাধনাই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীকে পাগল করে। সকল দিকেই সে পথ খোঁজে। দুটি বিশেষ দিকে সে পথ পায়—সাহিত্য-সাধনা ও স্বাধীনতার সাধনা। শুনেছি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মনে করতেন—এ কালের বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় বাঙলা সাহিত্য। আমি বলি হাঁ, এবং তার স্বাধীনতার আন্দোলন। শুধু তাও নয়। আমার কথাটা এই—বাঙলা সাহিত্যের পরিচয় সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি বুঝেছি, ও বলেছি, "সাহিত্য-সাধনা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম—মূলত একই সত্যের দু' পিঠ।" বিশেষ করে আমার এ অনুভূতি বঙ্কিমের ও রবীন্দ্রনাথেরই দান। আমাদের সাহিত্যিকরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন, আমাদের রাজনীতিকরাও সাহিত্যের উজ্জীবনে হতেন প্রবুদ্ধ। উদ্বোধন-সঙ্গীত ছাড়া আমাদের রাজনীতিক সভাও হয় না, কংগ্রেসও না। অন্য কোনো দেশে এ রেওয়াজ আছে কি? স্বদেশী যুগ তো বিশেষ করে ছিল বাঙলা সাহিত্যের একটা প্রবল প্রকাশের যুগ—কাব্যে গানে দেশের আকাশ মুখরিত হয়েছে তখন। আমরা তার শেষ দিকে এলেও পথে-ঘাটে গল্পে আলোচনায় পেতাম সেই স্বাদ।

(ক্রমশঃ)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

এমনি করেই দিন গড়িয়ে যায় শান্তনুর।

ওর নিজের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ও-একটা অবস্থিতি মাত্র—ভূমিকা-বিহীন চরিত্র।

খাবার টেবিলে কদাচিৎ উপস্থিত থাকে। দাদাদের এড়িয়ে চলে। সুব্রতর সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়। মমতার খবর বেণুর কাছ থেকে মাঝে মাঝে পায়। আর একদিন মমতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথা হয়নি।

বেণুর কথাবার্তায় আর মনে হয় না ও কোনোদিন স্কুলে গিয়েছে। আস্তে আস্তে ওকে গ্রাস করছে ওর দিনকাল। আজকাল ও কেমন ছটফটে হয়ে গিয়েছে। দুপুরের দিকে প্রায়ই থাকে না। শান্তনুর গরমের ছুটি পড়েছে। রেস্তোরাঁর ঘুপচি কোণে শান্তনু এখন অনেক বেশি সময় কাটায়। জ্বর আসার সময়ে ঝিমিয়ে পড়ে।

সেদিন বিকেলে মমতাদের বাসার সামনে বেণু আর মমতার সঙ্গে শান্তনুর দেখা হয়ে গেল। বেণু কিসের পয়সা বুঝিয়ে দিচ্ছে, মমতা গুণে নিচ্ছে। মমতা শান্তনুকে দেখে হাসল। বেণু না হেসে বলল—আসুন। শান্তনু ওদের ঘরে গিয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করল। মমতার বাবা নেই। তবু মমতা বলল।—চা খান। এটা ওটা সে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগল। খানিক-বাদে বেণু চলে গেল। মমতা গল্প করতে লাগল, বেশির ভাগ বেণুর গল্প। ও বলল:

—বেণুকে আমি বলি ওরই মধ্যে সময় করে পড়তে।

—তুমি নিজে পড় না কেন?

—আমার সময় কোথা?

—কী কর সারা দুপুর?

—ডাল ভাজি, বাদাম ভাজি, প্যাকেটে পুরি, চানাচুর বানাই।

—বিক্রি কর ?

—আমি নিজে পারি না। বেণুকে দিয়ে দোকানে দোকানে পাঠাই।

—কেন ?

—না হলে চলবে কী করে ? বাবা তো কাজে যান না আর।

—বাবাকে জানিয়েছ সব ?

—ওরে বাবা, পিঠের চামড়া থাকবে না তা হলে।

—তোমার বাবার ব্যাপার-স্যাপার বোঝা যায় না। না ?

—কী করবে বলুন, বাবার বড় কষ্ট, বোঝানো যায় না বোলে।

—তা অবশ্য—মানে—

—আমার মা ? আপনি জানেন না কিছু ?

—মা নেই তো তোমার ?

—আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। মানে মরে যায়নি। চলে গেছে। তাই বাবা ওইরকম হয়ে গেছে।

—বুঝলাম। তাই মদ খান। কিন্তু তোমার ওপর অবিচার করেন কেন ?

—সেটাও ইচ্ছেয় করেন না। জানেন আমার বাবা আমার মাকে ভুলতে পারে না। কোনোদিন পারবেও না। বাবার ভয়, আমিও তো মায়েরই মেয়ে আমিও হয়তো চলে যাব। মদ খেলেই মায়ের ওপর রাগটা জ্বলে ওঠে—মায়ের মেয়ের ওপর সেই রাগটা পড়ে। সেজন্যেই সেদিন বলেছিলাম যে উনি ঠিক আমাকে মারেন না।

—সেটাই কি ভালো কথা ?

—ভালো কথা তো মায়ের চলে যাওয়াটাও নয়।

কালচে রঙের খানিকটা চা একটা কাঁচের গ্লাসে ঢেলে শান্তনুর দিকে এগিয়ে দিল। নিজে একটা কলাই-করা বাটিতে ঢেলে নিল। শান্তনু দেখল রোগা মেয়েটা। কণ্ঠার হাড় প্রকট—গালের ওপর একটা নীল শিরা কখনো দেখা যায়, কখনো মিলিয়ে যায়। চোখ তুলে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে সে বলল—ভালো কথা তো কোনোটাই নয়। এ বাড়িতে ওদিকটায় এক বড়বাবু থাকে। বৌ বাপের বাড়ি গেছে ছেলে হতে, চারটে ছেলে-মেয়ে। সে যা বলে আমায়, তার একটাও ভালো কথা নয়—বলে আচমকা হেসে গড়িয়ে পড়ল মমতা। তারপরেই গম্ভীর হয়ে গেল, বলল—বেণুকে বলতে হবে একদিন।

—কেন ?

—ও যা খেপে যায় এসব শুনলে না—

—যাক, তুমি এসব লোকের সঙ্গে বেশি কথা বোলো না।

—খুব জানি, আমি অনেক দেখেছি ওসব লোক।

চা খাওয়া শেষ হতে না হতে মমতা আবার গম্ভীর হয়ে গেল। হাসিটা যেন অনেকটাই বাজে খরচ করা হয়েছে এই ভেবে মমতা একটু বেশি করেই চুপ হয়ে গেল। ঘরের জানলা দিয়ে বাড়ির উঠোন দেখা যায়। এক ঝাঁক সা-জোয়ান মানুষ বিড়ি খাচ্ছে, তাস পিটছে। ময়লা ন্যাতা-হয়ে-যাওয়া তাস। কড়ায় ঝামা ঘষছে গা-খোলা বৌ। কেশে দম ফাটাচ্ছে একটা বুড়ো। সেজেগুজে বেরিয়ে গেল একটি মেয়ে। বুড়োটা কাসছে আর ফাঁকে ফাঁকে চেঁচাচ্ছে—ভগবান কোথায় আনলে, চারদিকে একটা মানুষ নেই। রাজ্যের স্মাগলার, ফোরটোয়েন্টি, হাফ-গেরস্ত, মাতাল—আমরা সেনহাটির চৌধুরী, বামুনে পজ্জন্ত সমীহ করে আমাদের সঙ্গে কথা বলত, আর এখানে—বৃথা। কেউ শুনছে না। কেউ দেখছে না। একরাশ স্তূপীকৃত ময়লা কাপড়ের ওপর এক চিলতে সাবান রাখতে রাখতে বুড়োর ছেলের বৌ বোধহয় ধমক দিল বুড়োকে। মেয়েটার মুখ দেখলে মনে হয় যেন ষড়যন্ত্র করছে। সে বলল—উনুনে আঁচ পড়ে না দু-বেলা গলায় দাপট আসে কোথা থেকে ?

—তুই যা নিয়ে আয় ওদের মতো করে দাপটের সামগ্গিরি।

—মুখে পোকা পড়বে, চুপ করো।

—তার আগে যেন তোদের গতরে পোকা পড়ে।

এইসব চেঁচামেচি শুনতে শুনতে মমতা শান্তনুকে বলল—মেয়েটা বুড়োর চতুর্থ পক্ষ।

শান্তনু বলল—বড় নোংরা জায়গা। বাবাকে বলে উঠে যাওয়া উচিত তোমাদের।

—বাজে বকবেন না।

—কেন ?

—ভালো জায়গায় উঠে গেলে রোজ দুপুরে বাবার মাতলামি চলত না, পাড়ার লোক শেষ পর্যন্ত বাবার ওপরেই চড়াও হত ?

—তা বটে।

—শুধু তাই নয় ভালোলোকেরা দল বেঁধে আমাদের সব খবর হাঁ করে গিলতে চাইত, নানা কথা জিজ্ঞাসার ঠেলায় ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকতে হত। সে যে কী যন্ত্রণা জানেন না।

—ঠিকই।

—যখন তখন বেণুর আসা নিয়ে হাঙ্গামা হত। হত না ?

—হত।

—এ তার চেয়ে অনেক ভালো। বড়বাবুকে সবাই জানে। জানা শত্রুতে বিপদ কম। উনি আমার গায়ে হাত দিতে চান একথা বুঝে ফেললে আর বিপদ কিসের ?

শান্তনুর মনে হল যে বলে, তুমি বয়সের তুলনায় বড় পেকে গেছ। মমতা যেন ওর মনের কথাটা শুনতেই পেল। বলল—সব দেখে দেখে আমার চোখে চড়া পড়ে গেছে।

ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর। আনত নিমডালে কাকেদের মেলা। গলির বুকে কোনো পায়ের শব্দ নেই। বড় রাস্তা থেকে বাসনওয়ালার কাঁসর টং টং শোনা গেল। শান্তনুর চোখে দুপুরের ঘোর। মমতাকে যত ছোট ভাবা যায় মমতা তত ছোট নয়। মমতা অন্তরঙ্গতায় অসঙ্কোচ, বলে চলল—দু হাতে আর ঘাড়ে পাঁচড়া হয়েছিল, সে এক রকম ছিল ভালো। ঘেন্না করত সবাই। এখন ফটিকবাবুর ইঞ্জেকসনে সেগুলো আবার সেরে গেছে। সবাই কাছে ঘেঁষতে চায়। ইয়ার্কি দিতে চায় !

তারপর অনেকক্ষণ মমতা রইল চুপ করে। শান্তনু আপন মনে উসখুস করল। একটা ছেঁড়া পুরনো কাগজ আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলে। ফাঁকে ফাঁকে দেখল মমতা ভাঙা তক্তাপোষের ছেঁড়া তোষক বৃথাই ঢাকবার জন্য ব্যস্ত। রিকসায় মাইক বাজিয়ে সিনেমার নতুন বইয়ের প্রচার করে গেল। একটা পাকানো হ্যাণ্ডবিল জানলা দিয়ে মমতাদের ঘরে এসে পড়ল। তারপর আবার চুপচাপ। সব গোলমাল থিতিয়ে গেল যেন। শুধু কাকেদের কর্কশ গৃহস্থালীর কলমল ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের সঙ্গে এক হয়ে মিশে রইল। মমতা তখন আস্তে আস্তে মুখ তুলে শান্তনুকে বলল—আপনি কিন্তু খুব ভালো। 'কিন্তু' শব্দটায় শান্তনু সান্ত্বনা পাবে না দুঃখ পাবে বুঝতে পারল না। শুধু দেখল কোথা থেকে একঝলক রক্ত এসে মমতার মুখখানা লাল করে দিয়েছে।

ফটিকবাবু গম্ভীর হয়েই বললেন—নাও তোমার এক্সরে প্লেট।

—কী দেখলেন? সোফাটায় আরাম করে বসে শান্তনু নিরুদ্বেগ মনে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

—একটু সাবধানে থাকলে, আর এই ইঞ্জেকসনের কোর্সটা নিলে ঠিক হয়ে যাবে। তবে সাবধান হতে হবে কিন্তু।

—তার মানে কিছু হয়েছে?

—না বলতে পারলেই খুশি হতাম। তবে—

—আপনাকে অত সঙ্কুচিত হতে হবে না। কিন্তু আমাকে দেখলে অসুখ আছে বলে মনে হয় না তো।

—মনে হওয়াটাই সব নাকি? আমাকে দেখলে কী মনে হয়?

—ডায়েবিটিস আছে, হার্ট দুবলা হওয়া বিচিত্র নয়, ব্লাডপ্রেসার নির্ঘাৎ,—

—অথচ একটাও নেই। একটা পুরো মুর্গি, এখনো এই ফর্টিফোর চলছে বুঝলে টেরই পাইনে। রাত্রে একবারও উঠিনে।

—কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্‌।

—আর তোমাদের বৌদি মানে আমার স্ত্রী, দেখেছ তো সেদিন, কীরকম?

—সরলভাবে বলতে গেলে পরমাসুন্দরী।

—এ্যাই, সকলেই তাই বলে। অথচ গলায় ফ্যারিন্‌জাইটিস, আর একটু নামো ব্রঙ্কিয়াল প্যাচ, একটু এ্যাজমাটিক, আরো নামো লিভারে গোলমাল, ইউরিনে এ্যালবুমেন—বাট শি ইজ বিউটিফুল, ইজ ন্ট শী?

—নিঃসন্দেহে।

—তাই অসুখ তোমার প্রচ্ছদ পাল্টাচ্ছে কিনা, তোমার মানসিক শান্তি, হাসিমুখ নষ্ট করে দেবে কিনা এটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল তুমি রুগ্ন কিনা. তোমাকে লড়ে যেতে হবে কিনা?

শান্তনু চুপ করে রইল। আমি অসুস্থ অথচ আমি সুন্দর একথার কোনো মানে নেই। রোজই জ্বর হয়। রোজ বিকেল হলেই। ফটিকবাবু ছাই-দানিটায় সিগারেট টিপে ধরে নিবিয়ে ফেললেন। তারপরে আবার বললেন:

—তুমি ভালো অথবা আমার স্ত্রী সুন্দর তাই বলে রোগ পুষে রাখার অধিকার কারো নেই। শান্তনু, ভালোকে ভালোবাসি বলেই তাকে রক্ষা করার লড়াইও করে চলতে হবে। তুমি বাংলাদেশের নদীর বুকে জ্যোৎস্না দেখনি, মাঠের বুকে সূর্য-ডুবে-যাওয়া? শোনো নি ফাল্গুন রাতে আমগাছে

কোকিল ডাকা—সুন্দর না? নিশ্চয়ই সুন্দর। কিন্তু সেই কারণেই তো মুখ ফিরিয়ে থাকা চলবে না। চোরাবাজার, অবিচার, দুর্নীতি, শোষণ একটা সুন্দরী মেয়ের বুকের টি. বি. জার্মের মতো কুরে কুরে খাচ্ছে।

শান্তনু শুনছিল। আর নিজের বুকের এক্সরে ফটোর দিকে নির্নিমেষে তাকিয়েছিল। রোগ কোথায় সে জেনেছে। কিন্তু লড়াই করার কোনো উৎসাহ সে অনুভব করে না। ডাক্তারবাবু জানেন না—আসল রোগ রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছার অভাব। ফটিকবাবু বললেন—আমার ভাবপ্রবণতার কোনো মানে হয় না, কিন্তু এক এক সময় তোমাদের বৌদিকে, আই মিন আমার স্ত্রীকে মনে হয় গোটা বাংলাদেশের রূপক। এত সুন্দর—এত সুন্দর—কিন্তু ব্যাধি তার সর্বাঙ্গে। সব মিলিয়ে ভালোবাসাটা আদর্শে গিয়ে দাঁড়ায়।

পর্দা সরিয়ে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ঢুকলেন।—সেই বুড়োটা কইমাছ এনেছে আবার। সেদিনের মতো খুব বড। দেখবে?

—অফ কোর্স। উঠে পডলেন ডাক্তারবাবু। শান্তনু বলল—এ্যান্টি ক্লাইম্যাকস। হেসে ফেলল সবাই।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে শান্তনু ভাবল এ একরকম হল ভালো। ছুটি। ছুটি সব কিছুর হাত থেকে। ক্ষমতা অক্ষমতা, সফলতা ব্যর্থতা, প্রতীক্ষা প্রত্যাখ্যান—সব কিছুর কাছ থেকে তার ছুটি। খাবার টেবিলে দাদাদের নব নব সাফল্য-মৃগয়ার কাহিনী আর তাকে শুনতে হবে না। বৌদিদের পতিগর্ব আর পিতৃগর্বের প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার সাক্ষ্য আর তাকে বহন করতে হবে না। রুচি রমেনকে ভুলে গেল কিনা, সুব্রত ভুল করছে কিনা, আর কিছুই তার মাথা ঘামাবে না। কদিন ধরে তার নিজের মনের কোণে সঙ্গোপনে অথচ সযত্নে একটা কোমলতার পুতুল নিয়ে সে নাড়াচাড়া করছিল। তার ভাবনা হয়েছে মাঝে মাঝে গ্রীক কিংবদন্তির সেই মর্মরশিল্পীর মতো সে হয়তো নিজেরই গড়া পুতুলের কাছে কিছু চেয়ে বসবে। এখন তা থেকেও মুক্তি। মমতাকে আর তার কোনো ভয় নেই। সে নিঃসঙ্কোচে, বিনা আশায় বিনা ভাবায় মমতার কাছে যেতে পারে। নাও যেতে পারে। দাদাদের কাছে খবরটা দিলে এখুনি হয়তো হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। সেখানেও প্রতিযোগিতা। হয়তো একটা স্যানাটোরিয়ামের ব্যবস্থাও হতে পারবে। কিন্তু না। ওসবের দরকার নেই। বাইরে যাওয়া যে না যায় তা নয়। কিন্তু সে খুব দূরে যাবে না। কাছেই কোথাও পারলে চলে যাবে সে। চলেই যাবে।

পুরোপুরি ব্যর্থ হতে পেরে শান্তনু যেন পরম কৃতার্থ হল। ব্যর্থ হতে ভুলে গিয়েছে বলেই মানুষের এত গ্লানি। ব্যর্থতাকে সবাই ঘৃণা করেছি। কৃপণের মতো সাফল্যের স্বর্ণমুষ্টি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে শান্তনু অনুভব করল একটু চা পেলে ভালো হত। সে স্টেশনের কাছেই এসে পড়েছে। রেস্তোরাঁটা আর একটু দূরে। মোড়ের মাথা থেকেই সে দেখতে পেল রেস্তোরাঁর পাশে লাগানো সিগারেট কাউণ্টার থেকে সুব্রত হাত তুলে ওকে চেনা দিল।

সুব্রত বলল—ভেতরে চল, খুব দরকার। ওরা ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে ছেঁড়া জামার নিচে কী একটা সামলে ধরে দোকানে এসে ঢুকল বেণু। শান্তনুকে দেখে ও যেন একটু কঠিন হয়ে গেল। ওদের উপেক্ষা করেই সে এগুচ্ছিল। সুব্রত চিনত না বেণুকে, তবুও ওর রকম-সকম দেখে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলল—তোর জামার নিচে কীরে?

বেণু বলল ভাঙা কর্কশ ভারি গলায়—মালের বোতল।

শান্তনু আর সুব্রত একটা খুপরির দিকে যাচ্ছিল। বেণু বলল—ওদিকটায় যাবেন না। অন্য খদ্দের আছে।

ওরা আর একটা খুপরির দিকে চলে গেল। সোডার বোতলের ছিপি খোলার শব্দ কানে এল। গেলাসে তরলপদার্থ ঢালার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে বেণুর খিলখিল হাসি। কাকে যেন বলছে বেণু—এই মাল যোগাতেই হিমসিম আবার অন্য—দুটো চা আর দুটো ওমলেটের জন্য বলে দিয়ে শান্তনু আর সুব্রত বসে থাকল। ভেসে আসছে বরফ ভাঙ্গার ভোঁতা আওয়াজ। অরেঞ্জ স্কোয়াশের বোতল রাখার কাচ-কঠিন শব্দ। "দুটো চা—একটায় চিনি নয়।" "তিন নম্বরে কাটলেট দুটো, ডেভিল একটা।" চামচ কাঁটা ছুরির মৃদু ঠন্‌ঠনানি। পাখার সোঁ সোঁ—"পাঁচ নম্বরে দু-টাকা সাড়ে পাঁচ আনা।" বড় রাস্তার মোড়ে কোন্ সেলাই মেসিনের নিওন-আলা বিজ্ঞাপন জ্বলছে নিভছে। রেস্তোরাঁর হাসির হর্‌রা সোডার বুড়্‌বুড়ির মতো দেখতে দেখতে মিলিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পর্দা উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। ওরা অনেকক্ষণ চুপ করে মুখোমুখি বসে রইল—যেন কথা নেই। চায়ে চামচে ডুবিয়ে নাড়তে নাড়তে অনেকক্ষণ পরে সুব্রত বলল—শান্তনু। আর কী আশ্চর্য ঠিক তখনই শান্তনু বুঝতে পারল সুব্রত কী বলবে।

[বলে ফেল্ সুব্রত, কিছু ভয় নেই, বলে ফেল। এই রকমই হয় এই

রকমই হয়ে থাকে। এতে সঙ্কোচের কিছু নেই। ঢোক গিলতে হয় অমন—গোটা ভারতবর্ষে দেখতে পাচ্ছ না, ওতে লজ্জা কিছু কাজের কথা নয়। আমরা যারা ঢোক গিলব না তাদের ফুসফুস ঝাঁজরা হবে শুধু। এ বরঞ্চ ভালোই হল। হয়তো তোমার মনে হচ্ছে ঠিক হল না। রুচিরও তাই মনে হতে পারে। হয়তো এই সেদিনের ঘটনাগুলো এখন আরো তীব্র হয়ে মনে পড়ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে কি তোমাদের যে শান্তনু সাঁচ্চা লোক? তার সমর্থন যদি পাওয়া যায় বিবেক তাহলে পালকের মতো হাল্‌কা হয়ে যাবে? আমাদের অনগ্রসর ভাইবেরাদর এমনি করেই পুরোহিতের পাঁতি আনতে ছুটত, এমনি করেই—]

সুব্রত বলল—শান্তনু আমি রুচিকে বিয়ে করতে চাই।

শান্তনু বলল—রুচি জানে?

—জানে।

—কী বলে ও?

—একটু ইতস্তত করছে। তবে সেটা—

—তবে আর ভাবনা কী?

—ওর-ও, আমারও কেমন যেন মনে হল তোমাকে একবার বলা দরকার।

—রুচির বাবা-মাকে বলা হয়েছে?

—সেই দায়িত্বটা তোমাকে একটু নিতে হবে।

—বেশ। নেওয়া যাবে। তবে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। সামনের মাসের মিড্‌ল-এ আমি বাইরে চলে যাচ্ছি, অনেক দিনের জন্য। তার আগেই বলতে হবে।

আস্তে আস্তে শান্তনু কথাগুলো উচ্চারণ করল।

—কেন?

নিঃশব্দে শান্তনু এক্সরে ফটোটা এগিয়ে দিল। সুব্রতর চোখের সামনে শাদা হাড়-কখানার ছবি শুভ্র, নিরঞ্জন সত্যের মতো স্থির হয়ে রইল।

—কোন দিকটায়?

—ডান দিকটায়। এই ক্যাভিটি।

—আঃ—

—ও কিছু নয়। জেনেছি বলেই কষ্ট। না জানলে পরম সুখ।

—রুচিকে বলব।

—বৃথা মন খারাপ করবে বেচারি। হেসে ফেলত আর একটু হলেই।

—এখনই তোমার অসুখ করল…স্বগতোক্তি করল সুব্রত। পর্দা দুলছে হাওয়ায়। সোডার ছিপি ফট করে খুলে যাচ্ছে। টল্‌টল্‌ করছে গ্লাস। খড়ের রঙের পানীয়—লাল নীল সবুজ বোতলের সরবৎ। কড়া চুরুটের গন্ধ। বেতারে হিন্দী গান। বয়দের ডাকাডাকি। বাইরে বাসের সতেজ গর্জন। রিকসার ভেঁপু। হাসির হৈ হৈ। বেণু আবার ছুটল। দু-হাতে দুটো মেয়ের হাত ধরে রহিস আদমি। মেয়ে দুটো বাঙালী। সোনার দাঁত চীনে সাহেব। পাইপ টানছে একমনে।

—আর বেশি দেবি নেই। পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করবে। চারিদিকে নতুন দরজা খুলে যাবে। আবার আন্দোলনের জোয়ার আসবে। পার্টির নতুন লাইন, নানাদিকে নতুন সম্ভাবনা এনে দেবে। ফিল্ডে থাকার আকর্ষণ এখনই তো সবথেকে বেশি—শান্তনু—

শান্তনু বলল—আই ডু নট্ থিঙ্ক দ্যাট্ দে উইল সিং টু মি।

ওরা বহুক্ষণ বসেছিল সেদিন। সুব্রতর কেন যেন নিজেকেই বড় অপরাধী মনে হচ্ছিল। আর ও কেবলই নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল—আমি কেন নিজেকে দায়ী করতে চাই? রমেন মারা গেছে, প্রিয়ব্রত নন্দিনীকে নিয়ে চলে গেছে, শান্তনুর যক্ষ্মা হয়েছে—তাতে আমি কী করব? এমন কেন হয়, আমাব বিবেকে বাধে কেন? সুব্রত বসে রইল বহু ইণ্টারভিউতে ফেল-করা বেকারের মতো। আর দরখাস্ত করার ইচ্ছে নেই, সুপারিশ ধরার উৎসাহ নেই। ওর কেবলই মনে হতে লাগল কী একটা যেন না করলে কী একটা যেন হত না। কিন্তু সেটা যে কী তা তার নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। অবাধ্য একটা ক্রোধ শান্তনুর ওপর জমে উঠতে লাগল। আমি অপরাধী, আমারই শাস্তি পাওয়া উচিত, এই বোধ সত্ত্বেও বিচারকের বিরুদ্ধে যেমন ঘন হতে থাকে অনাস্থা।

আর শান্তনু সুব্রতর মৌনতায় পরম তৃপ্তি পেল। যেন চরম দণ্ড হানা গেছে। যেন ওর হাতে একটা শাস্তিদানের স্বাধীনতা ছিল সেটা সে ঠিকভাবে প্রয়োগ করেছে। নিষ্ঠুরের মতো মৃদু মৃদু হাসতে লাগল শান্তনু। চায়ের

জুড়িয়ে-যাওয়া তলানিটায় একটা বিস্বাদ চুমুক দিয়ে সে বলল, এবার উঠে পড়া যাক।

সুব্রতকে বাসে তুলে দিয়ে শান্তনু বাড়ির দিকে এগুলো। বুকের ফটোটা বুকের বাঁ-পাশের হাতের তলায় ধরে সে হাঁটতে লাগল। লাল লাল ডিমের ডালনা আর পাতলা ফিনফিনে পরোটার দোকান পেরিয়ে দেহব্যবসায়ী মেয়েগুলোর পাড়ার ভিতর দিয়ে ও হাঁটতে লাগল। রোগা চুপসে-যাওয়া মেয়েগুলো কিলবিল করে উঠছে। ভাঙ্গা মুখের আলোছায়ায় কোনো জটিলতা নেই। এ পাড়ায় ভিড় বেড়ে গেছে। আলো কম। এখানে অন্ধকার বেশি। খবর শোনা যাচ্ছে রেডিওয়—পরিকল্পনা, পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা।

কত পরিকল্পনা পেরুলে মমতাকে নিয়ে আসা যাবে সুস্থতায়—সেও গিয়ে দাঁড়াতে পারবে সেখানে? বেণুকে ডেকে নেওয়া যাবে? মমতা সেদিন বলেছিল—আপনি কিন্তু খুব ভালোলোক। এখন সে কী বলবে। 'কিন্তুর' জায়গায় হয়তো বসাবে 'তাহলেও' শব্দটা। সেটুকুই লাভ। শান্তনুর কষ্ট হল। কিন্তু সে কষ্টটাও মমতার কাণা আয়নাটার মতো। তাতে মুখ দেখা যায় না।

(ক্রমশ)

সিদ্ধেশ্বর সেন

একজন দিবারাতের কাণা

"Ah, close, Ah, close the Eyes of Nswspaper."
—Mayakovsky

চোখ গেলে দাও, চোখ গেলে দাও, চোখ
গেলে দাও, দৈনিকের
'——পত্রিকা' খুলেছি

চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ—
বলে, পাখি

হায়, চোখ ঠিক্‌রে
উপ্‌ড়ে
নিলে বেলঘরিয়ায়

আমি যাই তো নিশিপোহালে কাজে, ফিরি
যে নিশিডাকলে

চোখ গেল, চোখ গেল, আমারই আত্মা
উড়ে এসে
বসেছে ট্রামের তারের আগায়

কর্নওয়ালিসে—
যানবাহন অচল
আর, ছোটে, এদিক-সেদিক চিলপাটকেল

পুলিশ কি কাজে এল আর গেল
আর,
পুলিশে কি কাজে আসে আর যায়, আর
পোড়ে যে ল্যাবরেটরি
গ্যাস-বার্নার জ্বলে একটা গোটা ল্যাবরেটরি

পাখি বলে, চোখ নেই
আর আত্মা বলে, চোখ
খুলতেও শিউরোই

নিউজ-প্রিন্টারে, ব্যানার-লাইনে, আমি,
কিছুই দেখি নি
ওরা কারা, রাউরকেলা, জামসেদপুর, কল্‌কাতায়, ওদিকে ঢাকায়,

বর্ডারে এপারে আর কে, কে
বর্ডারের ওপারে আরও কারা, কারা

পাখি বলে, আমার ডানা পুড়ছে
আমার আত্মা বলে, অন্ধ হলাম

জনপদ, দেশ, আমার কবিতা
সংসার-শুভশ্রী, এই শ্রেণী-
বোধ, মূল্য ও হৃদয়

হায়-হায় ক'রে
তারপর বলে
: সীসের অক্ষরগুলো দৈনিকে যা ছাপে
তার থেকে, নিজেকে, সরাও

সীসের অক্ষরগুলো কত em-এ সাজালে—
একটি সত্যের স্থান হয় !!

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

নীলকণ্ঠ

প্রাঙ্গনের সেই শিরীষশাখায় একটি পাখি ছিল চিরকালের সাথী, তার সঙ্গে
সে নিয়ে আসত প্রত্যেকটি উজ্জ্বল প্রভাত, প্রতিটি নিবিড় সন্ধ্যার মেঘ।
ক্ষুদ্র দুটি ডানার ঝাপটে হু হু করে ছুটে আসত উত্তরের শীতার্ত বাতাস, তার
মৃদু হাস্যে ফুটে উঠত রঙবেরঙের ফুল, বসন্তের দীপ্তি নিয়ে, কখনো বা
তার তীব্র ক্রন্দনের যন্ত্রণায় অস্থির মেঘ ঢেলে দিত বারিধারা।

ঋতুচক্রের আবর্তনের মধ্যেই অবক্ষয়ের বীজ থেকে যায়, শাদা কার্পাসের
গুচ্ছ যেমন বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়ায় নিরুদ্দেশের পানে,
তেমনি একদিন সেই শিরীষগাছটাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ রোদসী
একটি মেয়ের মতো দেখালো। ম্লান রোদ্দুরে সেই রুগ্ন গাছটির
ব্যর্থ ছায়া কেমন ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়লো পূর্বগগনের উদ্দেশে।

সেই পাখিটি আর ফিরে এলো না তার অভ্যস্ত আবাসে। তীব্র
আর্তনাদে বারিধারা ছুটে এলো আকাশগঙ্গা মাথায় করে।
আর, নীলকণ্ঠের মতো শীর্ণ গাছটির রিক্ত গলায়
লেগে রইল শুধু একটু স্মৃতিসূত্রের বন্ধন॥

রাম বসু

কলকাতা : খুলনা : ১৯৬৪

শহরের মাথায় শকুনের মেঘ
কয়েকটা ঝলসানো মুখ, কিছু ধোঁয়া
গলির মুখে ইস্পাতের চকিত বিদ্যুৎ—
আমাকে আর তাকাতে বলো না
আমি পীড়িত, রক্তের কাদা আমার পায়।
আমাকে আর কথা বলতে বলো না
আমি ক্লান্ত, শব্দের কোরকে রক্তের গন্ধ।

ভীরুতার মধ্যে শঠতার মধ্যে আমাদের জন্ম
তাই আমরা বন্য পশুর চেয়েও বর্বর
হায় কলঙ্কিনী স্বাধীনতা,
হায় কল্লোলিনী গঙ্গা।

মুখগুলো সব হিংসার পতাকা
মহাজাগতিক বুদ্ধির আড়ালে প্রস্তর কংকাল
এক বর্ষায় সব কথার বাঁধ ভেসে গেল
আদর্শের আল দিয়ে খেত বাঁচানো গেল না আর
এখনও মানুষকে কত সহজে জন্তু করা যায়
হায় রাষ্ট্র! হায় রে ক্ষমতা!

পরাজিত সভ্যতা কবর খোড়ারও সময় পেল না
তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুন
আর মরা ডালে বসে সিন্ধুপারের শকুন
নখে অস্ত্র জড়িয়ে
পুরাণ কাহিনী শোনাচ্ছে।

মোহরের মা, পরাণের বৌ
আমি অন্ধ হয়ে গেছি
আমি বোবা হয়ে গেছি।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

এপার ওপারের ছড়া

এপার ওপার নামলো আঁধার চোখের কোলে কালি
কাটুম কুটুম বুদ্ধু ভুতুম আলাই বালাই ষাট
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বাজালো হাততালি
মুখ থুবড়ে চাপড়ালো বুক ময়নামতির মাঠ।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে নেড়া মাথায় বেল
ধোঁয়ায় কালো দিন রাত্তির রক্তে ডাকে বান
কাঁধে জোয়াল রাঘব বোয়াল ভানুমতির খেল
ভুল বুঝে কেউ পরাণ কাড়ে কেউ বা কাড়ে জান।

বেনের ঘরে বিবেক বাঁধা অন্ধকারে পা
চোখের জলে বুক ভেসে যায় গণতন্ত্রের জন্যে
ল্যাজ উল্টে ডিগবাজি খায় রামগরুড়ের ছা
মুখে লাগাম বাজিয়ে সেলাম কেউ বাজারে হন্যে।

ভাঙা কুলোয় উলোটপালোট বাসি আখার ছাই
ঘাম ফেলে যায় উল্টোপথে গোটাকয়েক মাথা
সুতোর টানে ভেল্কি দেখায় মাসতুতো সব ভাই
ইতিহাসের অট্টহাসি উল্টিয়ে যায় পাতা।

এপার ওপার হাজার হাজার বিবেকে নির্ভর
আমির হোসেন সমর সেন আর অন্নদাশঙ্কর!

রত্নেশ্বর হাজরা

শর্ত

অগ্নি এখনও জীবনের শর্ত
জ্বালিয়ে দেয়, প্রকাশও দেয়,
কেউ নিজেকে, কেউ দুর্বলতাকে
জ্বালায়, তবু জীবনশর্ত
অগ্নিই হতে পারে—সত্যই হতে পারে।
বারবার বাক্‌চাতুরী বলেও কোনদিন
সত্যকে কেউ মিথ্যা বানাতে পারেনি।

এই সময়—এই দুরূহ সময়, যখন
পুষ্পের কথা বলা অপরাধ,
কপালে হাত দাও উত্তাপ পাবে
কেননা চৈতন্য এখনও জীবনশর্ত।
এবং এই চৈতন্য ভালোবাসাকে প্রেমে,
জ্ঞানকে প্রজ্ঞায় পৌঁছে দেয়।

আমরা গতির কাছে হাত পাতবো, উত্তাপের সঙ্গে সখ্যতায়
বুদ্ধিকে মানবতার মহত্ত্বে পৌঁছে দিতে দিতে
প্রতিটি দুর্যোগে নোয়া হয়ে যাবো, কেননা
ভয়হীনতার পদপ্রান্তে মৃত্যুও বিশ্বস্ত শিষ্যের মতো নতজানু।
তারপর একদিন প্রজ্ঞা ও প্রাণের হাত ধরে ধরে আমরা
মানবতার পথ পেরিয়ে জীবনের দিকে হেঁটে যাবো॥

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

উইল শেক্সপীয়র : একটি কল্পনা

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য

[প্রাসাদ সংলগ্ন একটি ঘর। এলিজাবেথ একটি টেবিলের পেছনে বসে, ঋজু চেহারা, হাতীর দাঁতের মতো রঙ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, চুলের রঙ ঘন লাল। বার্ধক্য ছাপ ফেলেছে চেহারায় কিন্তু সে প্রাচীন ওক গাছের মতো বার্ধক্য—নুয়ে ফেলতে পারেনি একটুও। চাল চলন মাপা, ভ্রূকুটি করেন প্রায়শই কিন্তু যখন হাসেন তখন সে হাসি স্নিগ্ধ। কণ্ঠস্বর ভারী, প্রায় কর্কশ কিন্তু পরিষ্কার। আভিজাত্যের ছাপ আছে চেহারায় কিন্তু মোটের ওপর জাগতিক বুদ্ধি, সাবলীলতার ছাপ নজরে পড়ে। পরণে সোনা ও দামী পাথরের কাজ করা গ্রীণ ব্রোকেডের পোশাক। রানীর পাশে হেন্‌স্‌লো—দশ বছর বয়স বেড়েছে, কিন্তু চেহারায় আরো সমৃদ্ধি ও আয়েসের ছাপ পড়েছে। এক কোণে হার্পসিকর্ড যন্ত্রের তারে আঙুল বোলাচ্ছে মেরী ফিটন। ২৬ বছর বয়স, এলিজাবেথের চেয়ে লম্বা, কালো চুল, হাসি-হাসি মুখ, উজ্জ্বল চোখ। চাল-চলনে বেড়ালের ক্ষিপ্রতা, কণ্ঠস্বর চাপা, মিষ্টি ও ভরাট। মেরীর পরণে কালো-সাদা সিল্কের পোশাক, গলায় মুক্তোর মালা, কানের কাছে বড় লাল গোলাপ গোঁজা রয়েছে।]

এলিজা : টাকা…টাকা…আর টাকা। হেন্‌স্‌লো, আমাকে তোমরা জোঁকের মত শুষছো—জনসাধারণ তোমাদের টাকা দিক…আমি আর পারব না।

হেন্‌স্‌ : জনসাধারণ তাদের পকেট খালি করে টাকা দেবে যদি আপনি একবার আপনার নাম ব্যবহার করতে দেন আমাদের।

এলিজা : না···না · তোমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয় নি। এ পর্যন্ত কি দিয়েছ তোমরা ! ভালো নাটক হয়তো অনেক করেছ কিন্তু স্পেন, ইটালির পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে এমন কোনো নাটক] তোমাদের আছে ? ট্যাসো, পেত্রার্ক, দান্তে—এদের পাশে দাঁড়াতে পারে এমন লোক কোথায় তোমার ?

হেন্‌স্ : 'ফেয়ারী কুইন্' ?

এলিজা : অসমাপ্তই পড়ে আছে ?

হেন্‌স্ : লাইলি, গ্রীণ, পীল, কিড্—

এলিজা : ইংলণ্ডের লোকেদের ভালো লাগবে···কিন্তু গোটা পৃথিবীর সামনে দাঁড়াতে পারে ওরা ? তোমরা নিজেদের মহারাণীর দল বলতে চাও—মুকুট চিহ্ন ব্যবহার করতে চাও তোমাদের থিয়েটারে ! তাই সদলবলে দরবার করতে এসেছ ! বেশ তো···ভালো নাটক দাও আমাকে—যে নাটক নিয়ে স্পেন,···ফ্রান্স···ইটালিকে টেক্কা দিতে পারি।

হেন্‌স্ 'ট্যাম্‌বারলেন' রয়েছে !

এলিজা বাচ্চারা মুগ্ধ হতে পারে—বড়রা কি পাবে ওতে ?

হেন্‌স্ 'ডক্টর ফস্টাস্'···'জ্যু অব মাল্টা' !

এলিজা আমি জানি···আমি জানি এসব।

হেন্‌স্ আরো ভালো জিনিস মার্লো দিতে পারে।

এলিজা তুমি তাই বিশ্বাস কর, হেন্‌স্‌লো ?

হেন্‌স্ না মহারানী।

এলিজা তাহলে আমাকে মিথ্যে কথা বল কেন ?

হেন্‌স্ মহারানী, আমি সময় নিচ্ছি—আমার লোক এখন তৈরি হচ্ছে।

এলিজা আমার কাছে তুমি কতদিন আছো, হেন্‌স্‌লো ?

হেন্‌স্ বারো বছর।

এলিজা এই বারো বছরে কবার আমার কাছে এসেছ ?

হেন্‌স্ চারবার মহারানী।

এলিজা তোমাকে আমি সাহায্য করেছি না বাধা দিয়েছি ?

হেন্‌স্ আপনার দয়ায় আমাদের দিন-গুজরান হচ্ছে···একথা অস্বীকার করি কি করে ?

এলিজা : তাহলে বল—কে তোমার লোক ?

হেন্‌স্ : আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না। এ পর্যন্ত সে প্রায় কিছুই করতে পারে নি—

এলিজা : কে সে ? শেক্সপীয়র ?

হেন্‌স্ : মহারানীর তো কিছুই অগোচর নেই। আপনি কথা বলবেন ওর সঙ্গে···শেক্সপীয়র, মার্লো এসেছে আমার সঙ্গে আপনার কাছে দরবার করতে।

এলিজা : ।।হু···সেই স্ট্রাটফোর্ডের কিশোর ! আমি ভুলিনি ওর কথা।

হেন্‌স্ : কি প্রচণ্ড সম্ভাবনা নিয়েই না এসেছিল···সারা শহরটাকে হাসির হর্‌রায় মাতিয়ে তুলল একদিনে···। ব্যস্ ঐখানেই শেষ···আর ও কিছুই লিখবে না ! অথচ লিখলে ও কি না করতে পারত ! মহারানী, আমি উইলকে আবিষ্কার করেছিলাম···কেন জানি না ওকে আমি খুব স্নেহ করি। তো যখনই ওকে গম্ভীর ভাবে বোঝাতে যাই, হাসি দিয়ে ও আমাকে নিরস্ত্র করে ফেলে। হাসির বর্মে সর্বলোকের কাছে নিজের মনটাকে লুকিয়ে রেখেছে উইল।—

এলিজা : প্রত্যেক মেয়ের কাছেও ?

হেন্‌স্ : লোকে বলে—না, মহারানী—

এলিজা : আমাদের তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

হেন্‌স্ : (মেরী ফিটনের দিকে তাকিয়ে) সবাই বলে তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু রাজসভার একজন মহিলা আর একজন অভিনেতা ! নিছক পাগলামি ! মার্লো হলে ভাবনার কিছু ছিল না।—হাত পা ঝেড়ে শিস্ দিতে দিতে অন্যদিকে চলে যেত। কিন্তু উইল সব বিষয়েই একগুঁয়ে। যদি ওর বায়না থাকে খাবার পাতে চাঁদ পেড়ে দিতে হবে তবে তার অন্যথা নেই···বরং ও উপোস থাকবে তবু চাঁদ না হলে ওর খাওয়া রুচবে না।

এলিজা : তাহলে চাঁদের কাছেই নিয়ে যেতে হবে ওকে। মেরী !

মেরী : (উঠে ওদের কাছে এগিয়ে আসে) মহারানী ?

এলিজা : আমাদের কথা কিছু শুনেছ ?

মেরী : আমি ঐ নতুন সুরটা বাজাচ্ছিলাম যেটা আর্ল আপনার জন্য রচনা করেছেন।

এলিজা : আমার জন্য ? যাক্, তুমি শুনেছ আমাদের কথা ?

মেরী : খুব সামান্যই শুনেছি !

এলিজা : তুমি তো প্রত্যেক নাটক দেখতে যাও। বলতে পারো আগামী দিনের নাট্যকার কে ?

মেরী : আমি মার্লোকে বেশি পছন্দ করি।

হেন্‌স্ : আপনার এরকম ধারণার যুক্তিটা কি ?

মেরী : যুক্তি খুব পরিষ্কার—শেক্সপীয়রকে আমি ভালোভাবে জানি। মার্লোকে আদৌ জানি না—আর আমি সবসময়ই নতুনের পূজারী, বৈচিত্র্যের সাধিকা।

এলিজা : শেক্সপীয়র কে ? সেই যুবকটি—সবসময়ে উৎসাহে টগবগ করছে ?

মেরী : আপনি যার কথা বলছেন সে মার্লো, শেক্সপীয়র অনেক সাধারণ—

হেন্‌স্ : সাধারণ ! হুঁ মার্লো হচ্ছে হাউইয়ের মতো—মুহূর্তের জন্য জলে —সমস্ত আকাশ আলোয় উদ্ভাসিত করে দেয়। আর শেক্সপীয়রের চোখ-ধাঁধানো আলোর ছটা নেই···আছে ভোর রাতের শুকতারার মতো অচঞ্চল দীপ্তি।

এলিজা : আমি মনে করতে পারছি না ওকে কখনো দেখেছি কিনা।

হেন্‌স্ : শেক্সপীয়রকে একবার দেখলে ভোলা বড় কঠিন, মহারানী।—প্রশস্ত কপাল, তীক্ষ্ণ টিকোলো নাক···চাপা ঠোঁট···আজানুলম্বিত বাহু···চোখে বিদ্যুতের ধার অথচ কি গভীর বেদনা···

এলিজা : হেন্‌স্‌লো ! আমি শেক্সপীয়রকে দেখতে চাই—মার্লো···অন্য কোনো সময়—।

হেন্‌স্ : আমি এক্ষুণি ওকে মহারানীর সামনে হাজির করছি।

[হেন্‌সলো বেরিয়ে যায়]

এলিজা : মেরী, এ-কাজ তোমার মেরী !

মেরী : মহারানী ! আমাকে নিষ্কৃতি দিন ! এ যন্ত্র পুরনো···আর বেসুরে বাঁধা।

এলিজা : নতুন সুর লাগাও।

মেরী : আপনার তাই ইচ্ছে, মহারানী ?

এলিজা : হ্যাঁ, আমার তাই ইচ্ছে। মার্লো অপেক্ষা করুক—আর পেমব্রোকও।

মেরী : মহারানী !

এলিজা : নতুন সুর যতক্ষণ বাজাচ্ছ আমি কিছুই বলব না। কিন্তু পেম্‌ব্রোকের আর্লকে আয়ার্ল্যাণ্ডে চলে যেতে হবে। মনে রেখ ভালো জামাকাপড় পরিয়ে রাজসভা আলো করার জন্য তোমাদের আমি রাখি নি। পাশের ঘরে স্পেন আর ফ্রান্সের রাজদূতেরা জরুরী খবর নিয়ে অপেক্ষা করছে—আমি কি কয়েকজন অভিনেতার সঙ্গে শুধু হাসি ঠাট্টা করে সময় কাটাব ?

মেরী : সত্যি ; আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলাম, আপনি ওদের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলছেন !

এলিজা : অবাক হচ্ছ তুমি ? মেরী ! আমি যা করি তা কেন করি··· বুঝলে তুমিই ইংলণ্ডেশ্বরী হতে ! কাজের কথা বলি।—শেক্সপীয়র একজন সামান্য অভিনেতা ; কিন্তু ওর মনের রাজ্যের বিস্তার অনেক ···সেই রাজ্যের শাসনভার তোমার হাতে দিলাম। শুধু একটা কথা মনে রেখ—আমার ইচ্ছা তোমার অজানা নয়, সেই বুঝে চোলো। আমার ইচ্ছে উপেক্ষা করে আরেক মেরীকে অনুতপ্ত হতে হয়েছিল !

মেরী : অভয় দেন তো বলি—আপনার শাসন পদ্ধতি আমার ভালো জানা নেই—

এলিজা : নাবালিকা ! তুমি কি ভাব আমার পদ্ধতিতে তুমি শাসন করতে পারবে ? আচ্ছা, নিজের পথেই চল। কিন্তু একসঙ্গে একের অধিক রাজ্যে লোভ কোরো না !

[এলিজাবেথ বেরিয়ে যান]

মেরী : (টেবিলের ধারে বসে পা দোলাতে থাকে) হুঁ ! পেম্‌ব্রোক তাহলে আয়ারল্যাণ্ডে চলল ! আবার শুরু হল নিরানন্দ বিস্বাদ জীবন ! ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করতে পারব।···শেক্সপীয়র···উইল শেক্সপীয়র···দেখি আমার অলস সময় ও ভরাতে পারে কিনা ? —মার্লো হলে বেশ হত।···"সামান্য অভিনেতা, কিন্তু ওর মনের রাজ্যের বিস্তার অনেক"—দেখা যাক (শেক্সপীয়র ঢোকে) আর। বেচারী মিঃ শেক্সপীয়র ! রানীর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখা পেলেন—

শেক্স : রানীর !

মেরী : চুপ ! প্রাসাদের দেওয়ালেরও কান আছে। তারপর, কি খবর ?

শেক্স : ভালো, খারাপ আর অর্থহীন।

মেরী : খারাপটা দিয়েই শুরু হোক্।

শেক্স : খারাপ ?—গত পাঁচ সপ্তাহ তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি ! ভালো—গত পাঁচ সেকেণ্ড ধরে তোমায় দেখছি ! অর্থহীন—আগামী পাঁচ বছর আমাকে না দেখলেও তোমার কিছু আসবে যাবে না !

মেরী : এত কথা তোমায় কে বলল, বুদ্ধির সাগর ?

শেক্স : আমি কোনো উত্তর পাই নি—

মেরী : পাঁচটা চিঠির আর সাতটা সনেটের।

শেক্স : 'প্রেমের পরিশ্রম দণ্ড'।

মেরী : সত্যি। ঐ নাটকটায় পরিশ্রম বেশি, প্রেম কম।

শেক্স : ঠিক বলেছ তুমি, আমার আর একটা নাটক লেখা উচিত।

মেরী : হ্যাঁ, সনেট লেখার চেয়ে বেশি উপকার পেতে তাতে।

শেক্স : আমার সনেট তুমি পড় ?

মেরী : পড়ি আর হাসি।

শেক্স : হাস কেন ? আমার জগতে তুমি আসতে চাও না।—এলে দেখতে পেতে রূপ-রঙের কি অবিরাম লীলা চলছে সেখানে।

মেরী : খোলো তোমার হৃদয়-দুয়ার—দেখাও সেই জগৎ আমাকে।

শেক্স : আমার স্বপ্নলোকের চাবি চুরি গেছে।

মেরী : আমার চাবির গোছায় আর হাজারটা চাবির মাঝে কি তার হদিশ মিলবে ?

শেক্স : আর হাজারটা চাবি ?—তাহলে ওরা যা বলে—

মেরী : ওরা যা বলে ? ওরা কি বলে ?—পেমব্রোক্ ?

শেক্স : ওরা মিথ্যে কথা বলে ! আমি বিশ্বাস করিনে ওদের রটনা।

মেরী : কি আশ্চর্য ! পুরুষমানুষ অথচ ঈর্ষা নেই ! এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা !—এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা ! এ আমার সইবে না !—

শেক্স : আমি তোমায় ভালোবাসি—

মেরী : আচ্ছা ?

শেক্স : আমি তোমায় ভালোবাসি—

মেরী : ব্যস্‌ ?

শেক্স : আমি তোমায় খুব ভালোবাসি।

মেরী : সে তো কোনো নতুন কথা নয়—সবাই বলে।

শেক্স : তুমি হাসছ। আমি সত্যি কথা বলছি।

মেরী : সবাই সত্যি কথা বলে। যে ফিরিওয়ালা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে 'ভালো গোলাপ,' সে কি তা বিশ্বাস করে না। গোলাপের আর প্রেমের সওদা যারাই করে বিশ্বাস করে বলেই তো এত চিৎকার করে।

শেক্স : আমার বেসাতি হাটের জন্য নয়। আমি বিক্রি করি না।

মেরী : ফিরিওয়ালা ! আমি প্রায় কিনতে যাচ্ছিলাম।

শেক্স : মেরী ! আমি বিকি-কিনির কারবার করিনে--দেওয়া নেওয়ার পশারী আমি।

মেরী : যদি নিতে রাজী হই ; কি দেবে তুমি আমায়।

শেক্স : স্বপ্নলোকের হদিশ।—সে এক রূপকথার দেশ—বসন্ত যেখান থেকে কোনোদিন বিদায় নেয় না—পথের ধারে নাম-না-জানা ফুলের মেলা বসে প্রতিদিন—গোধূলির সোনালী আলোয় পথ খুঁজে পরীরা নামে হাজার তারার পাপড়ি ছড়াতে ছড়াতে—আমাকে জানলে, আমাকে চিনলে সেই পরীর ঠিকানা পাবে তুমি !

মেরী : আমি তোমাকে ভালো করেই চিনি। তুমি 'রোজ' থিয়েটারের অলস মিঃ শেক্সপীয়র। পরীর দেশেই শুধু তোমার আনাগোনা। তাই হাল্কা ; দায়িত্বহীন মিলনান্ত নাটক ছাড়া আর কিছু তুমি পার না। কিন্তু আমি রক্ত মাংসের মানুষ—পরীর দেশের ছেলে-খেলায় আমার মন ভরবে না।

শেক্স : আচ্ছা, আমি তোমাকে দেখাব।

মেরী : কি দেখাবে তুমি আমায় ?

শেক্স : প্রেমের এক নতুন পৃথিবী—আর সেই পৃথিবীতে তুমি আর আমি।—ইটালীর এক প্রেমিকযুগলের কাহিনী পড়েছিলাম বহুদিন আগে—সেই মেয়েটি ঠিক তোমার মতো—আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা—আগুনের রং নিয়ে তাদের প্রেমের মশাল জ্বলে উঠল—তারপর হঠাৎ মৃত্যু—

মেরী : মৃত্যু !

শেক্স : হ্যাঁ। তারা মরে গেল—জলন্ত মশাল জলে ডোবালে যেমন মুহূর্তে মিলায় তার দীপ্তি, তেমনি হঠাৎ!—অত গভীর প্রেম কি এই পৃথিবীতে বাঁচে ?

মেরী : লিখে ফেল উইল, লিখে ফেল। পারবে তুমি লিখতে ?

শেক্স : রোমিওকে আমি জানি। জুলিয়েটকে চেনাও তুমি।

মেরী : আমি পারব ? নিশ্চয় পারব আমি।

শেক্স : বেচারী জুলিয়েট।

মেরী : না···না···বেচারী কেন সে হতে যাবে! মনে রেখো উইল, তাকে যেন কেউ করুণা না করতে পারে। আর মনে রেখো—

শেক্স : কি ?

মেরী : আজ নয়, আজ নয়···অন্য কোনোদিন—কাণে কাণে তোমায় বলব আমার গোপন কথা···। ওঃ। কি একখানা নাটক হবে! তুমি লিখবে তো উইল?—আমার জন্য···আমার জন্য লিখবে, না ? আচ্ছা, কোথায় থাকত ওরা ?

শেক্স : ভেরোনায়—ইটালির এক নগরে।

মেরী : আমার কাছে রোজ আসবে তুমি, উইল—শোনাবে কি, কি কি লিখলে···বেশিদিন লাগবে ?

শেক্স : লাগতে দেব না।

মেরী : কি নাম দেবে নাটকটির ?—'বিচিত্র প্রেম ?'—'ভেরোনার প্রেমিক যুগল' ?—

শেক্স : না, না! অনাড়ম্বর নাম দুটি শুধু পাশাপাশি—'রোমিও আর জুলিয়েট।'

[পরস্পর কাছে ঝুঁকে কথা বলতে থাকে, তখন—]

—পর্দা—

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

['রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' অভিনয়ের প্রথম রজনী : চতুর্থ অঙ্কের শেষ দিক অভিনীত হচ্ছে। পর্দা উঠলে দেখা যাবে ছোট্ট প্রায় আসবাবহীন অফিস ঘর, থিয়েটারের জিনিসপত্র পোশাক ইত্যাদি এলোমেলো ছড়ানো। যতক্ষণ ব্যাক্‌স্টেজের দরজা খোলা থাকছে ততক্ষণ পেছনে পর্দা, ইতস্তত লোকজন ঘুরে বেড়ানো, টর্চের আলো ইত্যাদি দেখা যাবে। দূর থেকে ভেসে আসা গুঞ্জন সব সময় শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে প্রশংসার কলধ্বনি ভেসে আসছে। পর্দা উঠলে দেখা যাবে মেরী পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে, উইল মেরীকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।]

মেরী : যেতে দাও! আমায় যেতে দাও! এই অঙ্কের পর্দা পড়ার আগেই আমাকে গিয়ে বসতে হবে।—মহারানী কি বলেন শুনব।

শেক্স : তুমি আবার ফিরে আসছ তো ?

মেরী : সেটা নির্ভর করছে মহারানী কি বলেন তার ওপর। উনি যদি নাটক পছন্দ না করেন আমার কাছে কিছুই আশা কোরো না।

[আবার প্রশংসাধ্বনি শোনা যাচ্ছে]

শেক্স : শুনতে পাচ্ছ ? নাটক জমছে না মনে হচ্ছে ?

মেরী : ও তো সাধারণ লোকেরা চেঁচাচ্ছে। মহারাণীর প্রশংসার ওপর তোমার নাটকের ভাগ্য নির্ভর করছে।

শেক্স : তোমার নাটক !

মেরী : সত্যি আমার নাটক ?

শেক্স : আমার সত্য : তোমার নাটক। মেরী ! একটা জিনিস চাইব ?

মেরী : ও! তাহলে নিঃশর্ত উপহার নয় ?

শেক্স : একটু ধন্যবাদ অন্তত দিয়ে যাও আমাকে !

মেরী : আগাম ? উঁহু ! আমি মহারানীর বাঁদী। উনি যদি একবার তালি দেন তো আমি দেব হাজারবার···উনি যদি ওঁর হাত এগিয়ে দেন চুম্বন করার জন্য—তাহলে আমি এগিয়ে দেব—ওই যে···পর্দা নেমে গেছে—আমি চললাম।

শেক্স : মেরী !

মেরী : ওই শোন···হাজার মেরীর থেকে ওর দাম বেশি।

[মেরী বেরিয়ে যায়, দরজা খোলা থাকে। অবিরাম উচ্চ করতালি ধ্বনি হতে থাকে।]

শেক্স : সাফল্যের সোনার আপেল এতদিনে হাতে এল আমার ! এর স্বাদ কি মিষ্টি ? কে জানে···দশ বছর আকুল আগ্রহে এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করেছি···দশটি বসন্তের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে শুধু স্বপ্ন দেখেছি···আজ এল সেই আকাঙ্খিত দিন···আমার নাটক দেখছে ওই হাজার হাজার লোক···ওরা কাঁদছে, হাসছে—আমার কথায়···কিন্তু কই আমার তো কোনো পরিবর্তন হয় নি। —সাধারণ মানুষ আমি—উইল শেক্সপীয়র—কি আশ্চর্য !

স্টেজবয় : (দরজার ফাঁকে শুধু মাথা ঢুকিয়ে) আপনি তো কারো সঙ্গে দেখা করবেন না ?

শেক্স : না, নাটক শেষ হলে আমি গ্রীণরুমে যাব। তার আগে কাউকে এনো না আমার কাছে।

স্টেজবয় : আমিও তাই বললাম ঐ মেয়েলোকটাকে। তা সে ঘ্যানর-ঘ্যানর করছে তো করছেই। বলছে ওর অপেক্ষা করার সময় নেই আর আপনি নাকি ওকে চেনেন—চলে যেতে বলে দিই তাহলে ?

শেক্স : কোনো নাম বলে নি ?

স্টেজবয় : কি হ্যাথাওয়ে যেন ! স্ট্রাটফোর্ড থেকে এসেছে।

: অ্যান্ ! এখানে নিয়ে এস ! তাড়াতাড়ি···আমাকে আগে বলনি কেন ? আচ্ছা কেউ ওকে দেখেছে কি ? চুপিচুপি ডেকে নিয়ে এস এখানে···আর শোনো···মার্লো আর হেন্‌স্‌লো ছাড়া কেউ খোঁজ করলে বলবে আমি বেরিয়ে গেছি। দাঁড়িয়ে আছ কেন ? তাড়াতাড়ি যাও।

স্টেজবয় : বাঁচা গেল ! আধঘণ্টা ধরে পথের মধ্যিখানে বসে আছে, কিছুতেই নড়ছে না। (ডাকে) এদিকে এস···আহা···এইদিকে (বেরিয়ে যায়)

শেক্স : অ্যান্ ? অ্যান্ লণ্ডনে ? কি করছে ও লণ্ডনে ?

[মিসেস্ হ্যাথাওয়ে ঢোকেন]

শেক্স : একি ? অ্যান্ নয় ?

মিঃ হ্যাথ : মিঃ শেক্সপীয়র—? উইল ! উইল তুমি !

শেক্স : দশ বছর পরে মানুষ অনেক বদলায়।

মিঃ হ্যাথ : কিন্তু আমার মতো বুড়ি দশ বছরে বদলায় না। আমি সেই অ্যানের মা।

শেক্স : সেটুকু মনে থাকবে না। এতটা বদলাই নি আমি। আপনি কেন এসেছেন আমার কাছে বলুন ?

মিঃ হ্যাথ : খবর এনেছি তোমার জন্য।

শেক্স : সুখবর ?

মিঃ হ্যাথ : ভালো কি মন্দ নির্ভর করবে তোমার ওপর।

শেক্স : মারা গেছে ?

মিঃ হ্যাথ : তাই হলে কি ভালো খবর হত ? না, বাছা, সে সৌভাগ্য ওর কপালে নেই।

শেক্স : আমি সে কথা বলিনি ! ও কি আপনার সঙ্গে এসেছে ?

মিঃ হ্যাথ : না।

শেক্স : ও পাঠিয়েছে আপনাকে ? ও, আমি বুঝেছি—আমার সাফল্যের কথা শুনে সৌভাগ্যের ভাগ নিতে পাঠিয়েছে আপনাকে !

মিঃ হ্যাথ : ছিঃ···ছিঃ···ছিঃ ! এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে ? অ্যান্ তোমার কোনো কথাই জানে না, ওই কালো মেয়েটির কথাও না।

শেক্স : কি বলছেন আপনি ?

মিঃ হ্যাথ : আমি দেখেছি ওকে—আপন মনে বিভোর হয়ে এ ঘর থেকে বেরুতে। ওর মুখে খুশির ছাপ দেখতে আমার ভুল হয় নি। ওকে খুশি করতে চাও কর। আমি বুড়ো মানুষ—আমি লোককে বিচার করি না ! যাক্ আমার খবরের সঙ্গে এ সবের কোনো সম্পর্ক নেই।

শেক্স : আজকের রাত আর পাঁচটা রাতের মতো নয়—এর ওপর আমার ভাগ্য নির্ভর করছে। আজ আমার সময় হবে না—কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

মিঃ হ্যাথ : কাল আমার খবর বাসি হয়ে যাবে।

শেক্স　:　ভালোই তো—আমায় শুনতে হবে না।

মিঃ হ্যাথ :　তুমি কি বলছ তুমি জান না।

শেক্স　:　আমি খুব ভালো করেই জানি আমি কি বলছি। অ্যানের কোনো খবরে আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই! ওর যদি টাকার প্রয়োজন থাকে, পাঠিয়ে দেব—আজ রাতে আমি অনেক টাকার মালিক হব।

মিঃ হ্যাথ :　আজ তুমি বড়লোক হতে পার…কিন্তু আমার কথা না শুনলে কাল তুমি কত গরীব হয়ে যেতে পার তুমি জান না।

[কলধ্বনি ফেটে পড়ে]

শেক্স　:　আপনার কথা শুনব? কেন? আপনি কি ওর থেকে ভালো কিছু আমায় শোনাতে পারেন?

মিঃ হ্যাথ :　কিন্তু অ্যান্ যদি পারে? উইল, আমার এই ষাট বছরের অভিজ্ঞতা দিয়েও বুঝতে পারি না কেমন করে মানুষ নিজের রক্তমাংসের সন্তানের চেয়ে কাজকে বড় করে দেখে!

শেক্স　:　আমিও কি জানি না শুধু কাজ নিয়ে থাকা কত দুঃসহ হয়ে উঠতে পারে! কিন্তু সংসারের ওই ছোট্ট কোণটুকুতে আমার কোনো অধিকার নেই। আপনি জানেন না কেমন করে আমি দিন কাটাই…সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে যখন ঘরে ফিরি তখন কোনো ফুটফুটে বাচ্চা আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে না…কিন্তু রাতের অন্ধকারে; ঘুমের ঘোরে বাচ্চার দল ভিড় করে আসে আমার চার পাশে…আদর করে হাত বাড়িয়ে যখন ওদের কাছে টেনে নিতে যাই তখন ওরা মিলিয়ে যায়…

মিঃ হ্যাথ :　অ্যান্ তবে ঠিকই বলেছিল—ও বলেছিল তুমি কোনো খবরই রাখ না। উইল, তুমি চলে আসার দু-মাস পরেই অ্যানের কোল জুড়ে হ্যামনেট আসে—তোমার ছেলে।

শেক্স　:　এ কথা সত্যি নয়।

মিঃ হ্যাথ :　আঃ, অ্যান্ ঠিকই বলেছিল। ও বলেছিল খবর পাঠালেও তুমি বিশ্বাস করবে না…তার চেয়ে হ্যামনেট যখন বড় হবে তখন তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবে এই ছিল ওর ইচ্ছে। আহা, ওর সে ইচ্ছে বুঝি মিথ্যে হয়ে গেল। আমার সোনার হ্যামনেট গত

শনিবার থেকে…জ্বরের ঘোরে…অচেতন… তাই অ্যান্ পাঠিয়েছে তোমাকে খবর দেবার জন্যে।

শেক্স : নতুন কৌশল—

মিঃ হ্যাথ : তুমি আসবে না?

শেক্স : না, আমি যাব না।

মিঃ হ্যাথ : তোমার ছেলে তোমার জন্য কাঁদছে আর তুমি—

শেক্স : মিথ্যে কথা। ও ওর বাবাকে চেনে না।

মিঃ হ্যাথ : তুমি জান না উইল, হ্যামনেটের কাছে তুমি কি? কেউ ওকে কিছু বললে কচি ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে, "বাবা এলে বলে দেব, আমায় বকেছ"…জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে, আর থেকে থেকে বলছে "আমার বাবা আসবে…আমায় চাঁদটা এনে দেবে"…

শেক্স : আমি যাব।

একটি লোকের কণ্ঠস্বর : (স্টেজের পেছন থেকে) শেক্সপীয়র! উইল শেক্সপীয়র! শেক্সপীয়রকে ডাক!

শেক্স : (মিসেস্ হ্যাথাওয়েকে) শুনুন! আমাদের কখন যেতে হবে?

মিঃ হ্যাথ : ঘোড়ার গাড়ি সরাইখানায় অপেক্ষা করছে।

কণ্ঠস্বর : শেক্সপীয়র!

শেক্স : আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিন। ঠিক রাত বারোটায় আমি লণ্ডন ব্রীজের ওপর অপেক্ষা করব।

মিঃ হ্যাথ : দেরী কোরো না যেন…তাহলে হয়তো বাছাকে আমার আর দেখতে পাবে না।

শেক্স : আপনি কি ভেবেছেন আমি এত বড় পশু? যদি আমি জানতাম তাহলে হয়তো আমি…যদি আমি জানতাম অন্যায় সহ্য করার এ কি রীতি মেয়েদের! ও কি আমাকে আর একটু আগে খবর পাঠাতে পারত না? আমি কি এত নৃশংস যে মরতে বসার আগে ছেলের খবর আমাকে পাঠান হয় নি। এ কখনো হতে পারে না…আমি বলছি হ্যামনেট মরবে না—ওকে বাঁচতেই হবে। নিজের ছেলের জন্য আমি যমের সঙ্গে লড়াই করতে পারব না? দেখি…দেখি…রূপক্ষণ না সোনার হ্যামনেটকে আমি দেখছি ততক্ষণ কেমন করে মরণ আসে ওর কাছে?

মার্লোর কণ্ঠস্বর : শেক্সপীয়র ! মহারানী তোমায় খোঁজ করছেন। উইল ! উইল !

শেক্স : ঠিক মাঝরাতে তাহলে !

[মিসেস্ হ্যাথাওয়ে বেরিয়ে যান]

কণ্ঠস্বর : উইল ! শেক্সপীয়র !

শেক্স : আসছি ! আসছি !

মেরী : (দরজা দিয়ে ঢোকে, পেছনে মার্লো) আচ্ছা শেক্সপীয়র কোথায় ?

শেক্স : ওঃ এখন নয়, এখন নয়, এখন নয় !

মেরী : তুমি কি পাগল হলে উইল ! মহারানী তোমার জন্য সৌভাগ্যের ডালি সাজিয়ে বসে আছেন…আর তুমি এখানে চুপ করে বসে আছ ? ওঁর ফরমাস গ্রীষ্মোৎসবের জন্য নাটক লিখে দিতে হবে। যাও তাড়াতাড়ি যাও—পঞ্চম অঙ্ক শুরু হল বলে ! যাও (শেক্সপীয়র বেরিয়ে যায়) দেখ কি রকম ধীরে ধীরে যাচ্ছে !—হাতের লক্ষ্মী এমন করে পায়ে ঠেলতে আছে !

মার্লো : লক্ষ্মী ও পেছনে ফেলে গেছে।

মেরী : এ দেখি আর এক কথার জাদুকর !—আপনিই কি মিঃ মার্লো ?

মার্লো : আপনিই কি মেরী ফিটন ?

মেরী : আমি আপনার কথা শুনেছি।

মার্লো : আমিও শুনেছি আপনার কথা। আপনি কি শুনেছেন আমার সম্পর্কে ?

মেরী : শুনেছি, আপনি নাকি উইলের শিল্প-সুবাদে ভাই। আমার কথা কি শুনেছেন ; এবার বলুন।

মার্লো : আপনি নাকি ওর শিল্পসুবাদে বোন হন !

মেরী : বোন ?—বড় ভিজে…ঠাণ্ডা সম্পর্ক। তা কি বলে উইল তার বোনের সম্পর্কে ?

মার্লো : বলে, আপনি ওর ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন !

মেরী : যে ভাগ্যকে ও আজ ফিরিয়ে দিচ্ছে !

স্টেজহ্যাণ্ড : (প্যাসেজের ভেতর থেকে) শেষ অঙ্কের অভিনয় শুরু হচ্ছে—আস্তে—আস্তে—

মেরী : আমি দেখব—চললাম।

মার্লো : আপনি জানেন না নাটকটা ?

মেরী : সবটা। কিন্তু ভগ্নীস্নেহ দিয়ে দেখতে চাই।

মার্লো : আর একটু থেকে যান না !

মেরী : যতক্ষণ না উইল ফিরে আসে ? তাহলে আমার আর কিছুই দেখা হবে না—ও আমাকে আটকে রাখবে।

মার্লো : আপনার খারাপ লাগলেও ?

মেরী : না, আমার ভালো লাগবে বলেই।

মার্লো : কি ভালো লাগে আপনার ? উইলকে না ওর নাটক ?

মেরী : সঠিক জানি না।

মার্লো : আমি যদি উইল হতাম কোনো দ্বিধা রাখতে দিতাম না।

মেরী : আচ্ছা !—কেমন করে ?

মার্লো : এখানে এই ব্যস্ততায় বলা যাবে না—আর পর্দা উঠে গেছে।

মেরী : আসবেন একদিন আমার বাড়ি—বলবেন।

মার্লো : ওকি ? একটা কিছু গোলমাল হচ্ছে, মনে হচ্ছে।

হেন্‌স্‌ : (বাইরে থেকে) শেক্সপীয়র ! উইল ! (ভেতরে ঢোকে) সর্বনাশ হয়েছে ! উইল কোথায় ? ওর গ্রীণরুমে থাকার কথা ! কি করি আমি এখন ? শেক্সপীয়র কোথায় ?

মেরী : মহারানীর সঙ্গে কথা বলছে।

মার্লো : পর্দা উঠে গেছে—এক্ষুণি আসবে।

মেরী : কি হয়েছে ?

হেন্‌স্‌ : কি হয় নি ? জুলিয়েট ! সব পাঁঠার দল—কফিন সুদ্ধ জুলিয়েটকে ফেলে দিয়েছে—বেচারা যন্ত্রণায় চিৎকার করছে—বলছে ও আর স্টেজে নামতে পারবে না ! শেষের অংশটুকু আমি বাদ দিয়ে দিতে বলছি !

মার্লো : হাড়-টাড় ভেঙেছে নাকি !

হেন্‌স্‌ : তাই মনে হচ্ছে।

মেরী : ওকে বল মরে গেলেও ওকে অভিনয় শেষ করতে হবে—শেষটুকু বাদ গেলে সমস্ত নাটকটা নষ্ট হয়ে যাবে ! অসম্ভব !

হেন্‌স্‌ : ও সত্যিই পারবে না।

মার্লো : একটা যে লোকটা ছিল ?

হেন্‌স্ : প্যারিসের পার্ট করছে। শেক্সপীয়র কোথায় গেল? আমি এখন কি করি?

মার্লো : উইল প্রচণ্ড আঘাত পাবে।

মেরী : না, উইল আঘাত পাবে না! এ আমাদের দুজনের নাটক! হেন্‌স্‌লো; জুলিয়েটের গা থেকে পোষাক খুলে নিয়ে এসো, আমি জুলিয়েট করব। যাও—

হেন্‌স্ : কি? মেয়েলোক স্টেজে অভিনয় করবে?

মেরী : হ্যাঁ, পুরুষেরা যখন পারবে না! যাও! আমি বলছি আমি জুলিয়েট করবই!

শেক্স : (ভেতরে ঢোকে) শুনেছ? শুনেছ তোমরা?

মেরী : (বেরিয়ে যেতে যেতে) শুনেছি! তোমার জুলিয়েট তুমি পাবে। এ নাটক বন্ধ হবে না!

[মেরী ও হেন্‌স্‌লো বেরিয়ে যায়]

মার্লো : ওর কি জুলিয়েটের পার্ট জানা?

শেক্স : প্রতিটি লাইন; প্রতিটি শব্দ! এ জুলিয়েট তো ওরই সৃষ্টি।

মার্লো : কিন্তু অভিনয়? অভিনয় করতে পারবে ও?

শেক্স : মেরী? যাও গিয়ে দেখ।

মার্লো : তবু! অভিনয়! অভিনয় করা কি এত সহজ?

শেক্স : অনর্থক সন্দেহ করছ; কতটুকু জান তুমি মেরীকে?

মার্লো : তুমি ওকে পুরো চেনো, বন্ধু?

শেক্স : আমি ওকে স্বপ্ন দেখি!

মার্লো : তোমার স্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী হোক্।

শেক্স : মার্লো, আমার স্বপ্নের দিন অতীত—সামনে শুধু কালো ছায়া।

মার্লো : কি হয়েছে? কোন দুঃসংবাদ?

শেক্স : হ্যাঁ, ষ্ট্রাটফোর্ড থেকে। কিটু কিটু! ভাবো দশ বছরের নিস্তব্ধতার পর ঠিক আজকের দিনটিতেই!

মার্লো : ষ্ট্রাটফোর্ড! ওঃ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কি চান সেই মহিলা।

শেক্স : চুপ। শুনতে পাচ্ছ—মেরীর অভিনয়!

মার্লো : খুব মিষ্টি গলা তো!

শেক্স : কিট্ ! পৃথিবীতে কোথায় শান্তি আছে বলতে পার ?

মার্লো : শান্তি ?

শেক্স : হ্যাঁ ! সুখের দিন কেন আসে মানুষের জীবনে যদি ব্যর্থতায় তার পরিণতি ঘটে ? কেন এত বেদনা—এত অনিশ্চয়—

মার্লো : আমি শান্তিতে থাকতে চাই না। এই অনিশ্চয়—এই ব্যর্থতা—এই ধুলো, কালি, মাটি—আমার ভালো লাগে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করতে জীবনের সঙ্গে !

স্টেজহ্যাণ্ড : (ভেতরে ঢোকে) মিঃ হেন্‌স্‌লো আপনাদের ডাকছেন। ওঃ কি নাটক। এত উত্তেজনা আমি আমার দশ বছরের চাকরীতে কোনো নাটকে দেখি নি ! আপনারা আসবেন না !

শেক্স : মার্লো, তুমি যাও।

স্টেজহ্যাণ্ড : ভয়ের কিছু নেই—সব ঠিক চলছে—জুলিয়েট কি সুন্দর মারা গেল—কে বলবে যে একজন মেয়ে—ওই শুনুন লোকেরা পাগল হয়ে উঠছে ! আপনারা চলুন !

মার্লো : ঠিক আছে; তুমি যাও, আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি। (লোকটি বেরিয়ে যায়)

শেক্স : আমি যেতে পারব না ! তুমি যাও ! বল আমি নেই, মরে গেছি—যা খুশি বলে দাও ওদের ! আমি আর পারছি না !

মার্লো : তুমি কি পাগল ? মেরী ঠিকই বলেছিল—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ তুমি।

শেক্স : তুমি জান না—ভাগ্যলক্ষ্মী আমাকে নিয়ে কি নিষ্ঠুর খেলা খেলছেন ! যাও…যাও—ওদের বল; আমি চলে গেছি—সত্যিই আমি চলে যাব মেরীর সঙ্গে একবার দেখা করে।

মার্লো : সত্যি ? অনেক দিনের জন্য ?

শেক্স : অনেক দিন বা অল্প দিন—কি আসে যায় তাতে। আমার পরম লগ্ন আমি হারিয়েছি—এরকম মুহূর্ত দুবার আসে না মানুষের জীবনে !

মার্লো : তুমি কি মেরীকে বলবে কেন যাচ্ছ !

শেক্স : মেরীকে ? পাগল ?

কণ্ঠস্বর : শেক্সপীয়র ! শেক্সপীয়র !

শেক্স : শুনতে পাচ্ছ? যাও···যাও। বল আমি চলে গেছি! আঃ যাও—!

মার্লো : বেশ, তোমার যা ইচ্ছে!

[মার্লো পেছনের দরজা অল্প খোলা রেখে বেরিয়ে যায়। চিৎকার, করতালি ধ্বনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। সিন শিফটারদের চেঁচামেচি, নির্দেশ শোনা যায়। আস্তে আস্তে তাও থেমে যায়। নেমে আসে গভীর স্তব্ধতা]

শেক্স : আমার ইচ্ছে! আমার ইচ্ছে! তুমিও বুঝলে না মার্লো আমার মনে কী ভীষণ ঝড় উঠেছে! কী আশ্চর্য সৃষ্টি এই মানুষ—কত কাছাকাছি অথচ কত দূরে—একটা গোটা জীবন কেটে যায় তবু কেউ কাউকে বোঝে না!···শুনেছি কোনো মেয়ে নাকি পারে হৃদয়রহস্যের কিনারা করতে—সহজেই পেয়ে যায় অতল মনের হদিস···কিন্তু আমি এসব কি ভাবছি?—কেন ভাবছি?—আমার নৌকো অন্য ঘাটে বাঁধা, যতই চাই নড়বার উপায় নেই!

[দ্রুত পদধ্বনি : মেরী জুলিয়েটের পোশাকে ঢোকে। দরজার কাছে আবেগবিহ্বল মুখে দু-হাত মেলে আবাহনের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। ওর পেছনে দরজা সশব্দে বন্ধ হয়, ব্যাক-স্টেজের সব গোলমাল থামিয়ে দেয়]

মেরী : ওঃ, কি বিচিত্র জগৎ আজ তুমি আমাকে দেখালে উইল। হাজার হাজার চোখ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিল আমাকে—দেখছিল প্রেমের দীপ্তদহনে আমার মৃত্যু! প্রেমময়! সত্যি প্রেমে আমার মরণ ঘটাও। তোমার প্রেমে আমায় ধন্য কর—সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে দাও আমাকে।

শেক্স : মেরী! মেরী!

মেরী : এ কী ঝড় তুলেছ তুমি···যে ঝড় আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে—থামতে দিচ্ছে না। কেন আমায় এমন আচ্ছন্ন করলে। সুরের জাদুকর, সুধা-স্বরে আমাকে জাগাও, আমার বহু রজনীর শূন্যতা ভরিয়ে তোলো তোমার প্রেমে—মিলন শতদলে তোমার প্রেমের অরূপমূর্তি দেখাও আমাকে।

শেক্স : এই দুটি হাত এর আগে কোনোদিন প্রেমের অর্ঘ্য নিয়ে আসে নি—অধরের এই সুধাপাত্র এত কাছে। বহু সাধনায় আকাঙ্ক্ষিত লগ্ন এলো আজ। হে স্রষ্টা! লক্ষ যুগের পরিশ্রমে প্রথম যেদিন ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিল, তোমার হৃদয় কি সেদিন এমনি দুরু দুরু কেঁপেছিল?

মেরী : এস, কাছে এস।

শেক্স : কি নিস্তব্ধ দেখছ চারপাশ! কেন জান? ঈশ্বর অবাক হয়ে দেখছেন আমাদের দুজনকে—আমরা দুজনে স্বর্গ রচনা করেছি এই ছোট্ট ঘরে—

অ্যানের কণ্ঠস্বর : এই ছোট্ট ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে আমার ইচ্ছেগুলো ঘুরপাক খেয়ে মরে—

শেক্স : কে? কে?

মেরী : কই? কেউ নেই তো এখানে।

শেক্স : কিন্তু আমি যে শুনলাম কে যেন চিৎকার করে উঠল—(চিৎকার করে) ঐ, ঐ—বাচ্চা ছেলের কান্না!

মেরী : ভুলে যাও সব। আমার কাছে এস।

শেক্স : নাও আমাকে—তোমার কালো চুলের অরণ্যে আমায় আচ্ছন্ন করে দাও। আজ রাতে বসন্তকে শেষ-বিদায় জানাব আমি—তারপর—রাত কত হল?

মেরী : মাঝ রাত পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

শেক্স : ওঃ, আমার জীবন চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হয়ে গেল।

মেরী : আমি তোমার পাশে—যদি এ জীবন অভিশপ্তও হয় তাহলেও কি সুন্দর নয় এই জীবন?

শেক্স : কত সুন্দর ঈশ্বরও বুঝি জানেন না।

মেরী : সুন্দর! এসো তোমার ছন্দ, তোমার সুর নিয়ে—নন্দিত কর আমাকে। তোমার চেতনার রঙে আমাকে রাঙিয়ে দাও। তোমার মাঝে আমায় নিবিড় করে নাও।

শেক্স : আমার সবই নিয়েছ তুমি—এবার আমাকে নাও!

মেরী : (আলিঙ্গন করে) এস!

পর্দা

(ক্রমশ)

সুরঞ্জন সান্যাল

শব্দ-কথা প্রসঙ্গে

কাব্য-সাহিত্যে বিজাতীয় শব্দের সংক্রাম কেবল চসর কেন, স্বয়ং কালিদাস পর্যন্ত এড়াতে পারেন নি। আসলে এ'কথা অন্তত ইদানীং প্রমাণিত যে উপলক্ষ যাই হোক, দু'টি ভাষার মানুষ যখন উভয়ের নিকটবর্তী হয় তারা ভাষা-ঘটিত ব্যাপারে পরস্পরকে প্রভাবিত করে। কদাচ কখনো উন্নত-অবনত ভাষার দ্বৈরথে অবনতকে উদ্বর্তনের তাগিদে বাক-রীতিতে ও শব্দে উন্নতের প্রভাবকে মান্য করতে হয়। চতুর্থ শতকীয় বাইবেলের অনুবাদে বুলফিলার গ্রীসীয় বাক্-রীতিতে গথিককে ঢেলে সাজানো তারই দৃষ্টান্ত, অথবা বাঙলার ক্ষেত্রে ইংরিজির অনতিক্রমনীয় প্রভাব ঐতিহাসিক বলেই স্বীকার্য। তবে বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় যত না প্রকরণ ঘটিত (phonetics, morphology, syntax ইত্যাদি) ব্যাপারে, তার চেয়ে বেশি শব্দের পরিগ্রহণে।[১]

স্বয়ংবশ ভাষা সাধারণত রক্ষণশীল। অর্থাৎ নিজস্ব ধাতু শব্দ প্রত্যয় সহযোগে সে ভাষা প্রয়োজনীয় শব্দ সৃষ্টি করে নিতে পারে, খুব কমই নতুন শব্দের জন্য অন্য ভাষার দ্বারস্থ হয়। তথাপি স্বয়ংবশ ভাষাতেও যে বিজাতীয় শব্দ পরিগ্রহণের দৃষ্টান্ত নেই, তা' নয়। গ্রীক বা সংস্কৃতে গ্রীক, ঈরাণীয় বা দ্রাবিড় অষ্ট্রিক, সেমীয় শব্দও অপ্রতুল নয়। সংস্কৃতে গৃহীত 'কেন্দ্র' (গ্রী-kentron), 'সুরঙ্গ' (গ্রী Surinx), 'পুস্তক' (পো-পোস্ত্)[২] অনার্য (দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক) মূল কজ্জল, তাম্বুল, নগর, সর্ষপ, অরণি,[৩] সেমীয় 'ক্রমেলক'[৪] প্রভৃতি বিজাতীয় হলেও কোন একসময়ে অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছিল। গ্রীকেও 'ব্রাখমানেস্' (সং-ব্রাহ্মন), 'মাস্‌খোস্' (সং-মুষ্ক)[৫] প্রভৃতি সংস্কৃত-মূল শব্দ ছাড়াও সেমীয় ঈরাণীয় ভাষার বহুশব্দ স্বীকৃত (naturalised) হয়ে গেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিজাতীয় শব্দের এইরকম পরিগ্রহণ অল্পবিস্তর সবভাষাতেই বিদ্যমান। বলাই বাহুল্য, এর পশ্চাতে রয়েছে, দেশে দেশে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের লুপ্ত ইতিহাস।

ইংরিজি পশ্চিম-জরমানিক ভাষার রূপভেদে উৎপন্ন। জরমান-যদিচ স্বয়ংবশ ভাষার চারিত্র্য বহন করে, তথাপি জরমান যা পারে অর্থাৎ নিজস্ব ধাতু প্রত্যয়-যোগে প্রয়োজনীয় শব্দ সৃষ্টি করে নেওয়া, ইংরিজি তা পারে না। নতুন শব্দের জন্য ইংরিজিকে তাই বিজাতীয় ভাষার দ্বারস্থ হতে হয়। এই কারণেই আজ সহস্র সহস্র ল্যাটিন ও ল্যাটিন-জাত ফরাসী শব্দ ইংরিজির শব্দ ভাণ্ডারে স্থান লাভ করেছে। এ ছাড়া শত শত গ্রীক, ইতালীয়, স্পেনীয় এবং য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষার তথা পৃথিবীর সকল ভাষার শব্দই ইংরিজি আত্মসাৎ করেছে। অর্থাৎ ইংরিজি আজ পরবশ, borrowing language-ফলত সর্বগ্রাসী। ভাষার নিজের ওপর আস্থা কমে গেলে সাধারণত এইরকম ঘটে। ইংরিজিরও তাই ঘটেছিল বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে। সে-কারণে উচ্চকোটির শব্দের জন্য ইংরিজি গ্রীক ল্যাটিনের দ্বারস্থ হয়েছে, তথাপি নিজে শব্দ সৃষ্টি করে নেয় নি।[৬] যেমন, ইংরিজি যেখানে ব্যবহার করে (ল্যাটিন) Century সেখানে (ইংরিজির নিকট জ্ঞাতি) জরমানে শতবাচক Jhar-hundret (বিশুদ্ধ ইংরিজিতে হলে year-hundred-শত-অব্দ) ; ইংরিজির (গ্রীক) telephone, জরমানে Fern-Sprecher (বিশুদ্ধ ইংরিজিতে Far-Spaker—দূরভাষ) রূপে ব্যবহৃত হয়।[৭]

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে ইংরিজি সকল ভাষার শব্দই অল্প বিস্তর গ্রহণ করেছে। ভারতীয় ভাষার বহু শব্দও আজ ইংরিজিতে চলছে। যেমন, bunglow, cheroot, Lac, Juggernaut, pundit, avatar, curry[৮] প্রভৃতি বাঙলা হিন্দুস্থানী তামিল ভাষা থেকে সোজাসুজি ইংরিজিতে গৃহীত হয়েছে।[৯] কিন্তু এ'সব শব্দ ছাড়াও ইংরিজিতে এমন শব্দ একাধিক আছে যা সোজাসুজি নয়, বিচিত্র পথ-পরিক্রমা করে, বিভিন্ন ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ বিধির চাপে রূপান্তরিত হয়ে ইংরিজিতে জায়গা পেয়েছে বিভিন্ন শতকে।[১০]

যেমন, (১) Sandal < চন্দন (সংস্কৃত)। শব্দটি প্রথমে সেমীয় ভাষা-সম্পৃক্ত আরবীতে 'সন্দল' রূপে গৃহীত হয়। আরবী থেকে ল্যাটিনে শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় Sandalum (তুঃ গ্রী, Sandalion), তারপর ইংরিজিতে Sandal রূপে স্থান লাভ করে।

(২) Sugar < শর্করা (সং)। প্রাচীন আরবীতে শব্দটি Sakkar (তুঃ ফা 'শকর') ল্যাটিনে Zuccar, প্রাচীন ফরাসীতে Sukere-এ রূপান্তরিত হয়ে মধ্য-ইংরিজি স্তরে Sugar রূপে গৃহীত হয়। 'শর্করা' শব্দটি গ্রীকে

গৃহীত হয় 'সাক্খারোন (Saccharion) রূপে, তা' থেকে ল্যাটিনের মধ্য দিয়ে ইংরিজিতে Saccharion শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। ইংরিজি Sugar-candy শব্দের মূলেও সংস্কৃত 'শর্করা খণ্ড' (তুঃ ফা শকর কন্দ') শব্দটি আছে।

(৩) Ivory < ইভরদ্ (সং)। 'ইভ (হস্তী) + রদ (দন্ত) + ইয় (প্রত্যয়)' শব্দের মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা স্তরে রূপ হয় 'ইভরিয়'।[১১] ল্যাটিনে শব্দটি হয় ebur (eboreus), সেখান থেকে প্রাচীন ফরাসীতে Yvoire এবং মধ্য ইংরিজিতে শব্দটি Ivory রূপে স্থান লাভ করে।

(৪) Ginger < শৃঙ্গবের (সং)।[১২] 'শৃঙ্গ (শিং) + বের (দেহ অর্থাৎ আকৃতি, 'আদার' শৃঙ্গ সদৃশ আকৃতি বলে ?)। শব্দটি গ্রীকে 'জিঙ্গিবেরিস্' (Zingiberis), সেখান থেকে ল্যাটিনে 'জিঙ্গিবার' (Zingiber) এবং মধ্য ইংরিজিতে গৃহীত হয় Ginger রূপে।[১৩]

(৫) Brinjal < বাতিঙ্গন (সং)। শব্দটি পোর্তুগীজে পাওয়া যায় ব্রিঞ্জেল্লা (bringella) রূপে (তুঃ স্পে, berengana)। পোর্তুগীজ থেকে শব্দটি ইংরিজিতে হয় brinjal। সং-'বাতিঙ্গন' পারসীকে 'বাদিন্-গান্',—সম্ভবত আদি ইন্দো-ঈরাণীয় কোন একটি শব্দের দুই রূপভেদ।

(৬) Jackal < শৃগাল (সং)। শব্দটি পারসীকে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় Shagal (শগাল), তুর্কীতে হয় chaqal (চকাল), এবং তুর্কী থেকে শব্দটি ইংরিজিতে স্থান লাভ করে Jackal রূপে।

(৭) Tamarind < তিন্তিড় সং। শব্দটি পারসীকে 'তমর' Tamar (—i—hind='সিন্ধু'-শব্দের বিকারে), আরবীতে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় Tamr-hindi (Sour fruit of India), স্পেনীয়তে Tamarindo, ইংরিজি Tamarind।[১৪]

(৮) Rice < ব্রীহিঃ (সং) তামিলে arichi অরিচি (তুঃ আফগানী Vrize), গ্রীক ও ল্যাটিনে aruzu এবং arizum রূপে স্থান লাভ করে। প্রাঃ ফরাসীতে শব্দটি riz, এবং মধ্য ইংরিজিতে rys > rice-এ রূপান্তরিত হয়।[১৫]

(৯) Panther < পুণ্ডরীকঃ (সং)। শব্দটি গ্রীক (Panther), ল্যাটিন (Panthera) ও প্রাঃ ফরাসীর (Panthere) মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে মধ্য ইংরিজিতে Panther রূপ লাভ করে।

(১০) Sapphire < শনিপ্রিয়স্ (সং)। প্রথমে হিব্রুতে শব্দটি (Sappir) গৃহীত হয়। হিব্রু থেকে শব্দটি গ্রীক (Sappheiros), ল্যাটিন (Sapphirus)

ও ফরাসীর (Saphir) মধ্য দিয়ে মধ্য ইংরিজিতে Sapphire রূপে স্থান পায়।

(১০) Beryl<বৈদূর্য (সং)। 'বৈদূর্য' মধ্য-ভারতীয়-আর্য ভাষায় হয় 'বেলুরিয়'। উক্ত শব্দটি গ্রীক ও ল্যাটিনে যথাক্রমে berullos এবং beryllus রূপে গৃহীত হয়। ল্যাটিন থেকে ইংরিজিতে হয় Beryl (মূল্যবান পাথর)।[৬]

যদিচ উচ্চভাবের নয়, তথাপি বিভিন্ন বস্তুবাচক শব্দের নাম হিসাবে উল্লিখিত শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে বিভিন্ন প্রাচীন ও মর্যাদাবান ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ-বিধির চাপে রূপান্তরিত হয়ে যে ভাবে ইংরিজিতে স্থান লাভ করেছে, তা' নিঃসন্দেহে ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহলের বিষয়। শব্দগুলির বিবর্তনের স্তরে নানা দিগ্‌দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের লুপ্ত ইতিবৃত্ত ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসা জাগাক বা না জাগাক, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এ'সব শব্দের বুৎপত্তি ও বিবর্তনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সে ক্ষেত্রে উপার্জিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই ভাষাতাত্ত্বিকের একমাত্র সহায়। কাল্পনিকতায় নিষ্ঠাও স্বীকার্য বটে, কিন্তু তা' কদাচ নৈরাজ্য প্রতিরোধী।[৭]

১. Maris Pei : The Story of Laaguage, p. 128.
২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পৃঃ ১১১।
৩. T. Burrow : Sanskrit Language (Ch. 'Non-Aryan Influence' etc.) pp 373-88.

৪. 'ক্রমেলক' শব্দটি (সংস্কৃতে 'উষ্ট্র' শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও) কালিদাস প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে ('কেলিবনং প্রবেশ্য ক্রমেলক : কণ্টক জালমেব' ch 1.29)। চসরের রচনাতেও nadir, zenith প্রভৃতি সেমীয় শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যাপারটি এই কথাই প্রমাণ করে যে কবিরা ভাবানুষঙ্গের প্রবর্তনায় দেশী-বিদেশী কোন শব্দকেই অবহেলা করেন না। সেখানে একমাত্র মানদণ্ড বোধহয় ভাষার প্রাসঙ্গিকতা (দ্রঃ Skeat : Etymological Dictionary of English Language (EDEL) এবং M. Williams : Sanskrit-English Dictionary (SED)। সেমিয় (হিব্রু) Gamal শব্দটি একদিকে যেমন 'ক্রমেলক', অন্যদিকে তেমনি ইংরিজি Camel শব্দেরও মূল)

৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভারত সংস্কৃতি, পৃঃ ৩৬

৬. ঐ ঐ ভাঃ প্রঃ বাঙলা ব্যাকরণ ('ব্যাকরণের তুলনা') ১৯৬১, পৃঃ ৫১৮। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইংরিজির মত ভারতীয় ভাষাগুলিও অর্থাৎ বাঙলা তামিল হিন্দী প্রভৃতিও পরবশ। প্রয়োজনে তাদেরও আজ অন্যভাষার দ্বারস্থ হতে হয়। উক্ত ভাষাগুলির শব্দভাণ্ডারের হদিস যাঁরা রাখেন, তাঁদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার।

৭. Century প্রভৃতির জয়মান প্রতিশব্দ আসলে এক ধরণের translation loan. বিজাতীয় শব্দের অর্থের অনুসরণে আপন ধাতুপ্রত্যয় সহযোগে শব্দ গঠন। যেমন, বাঙলাতেও ব্যবহৃত হয় স্বর্ণ যুগ (golden age), পাদপ্রদীপ (foot light) ইত্যাদি (দ্রঃ সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১৪৯)। যাই হোক স্বয়ংবশ জয়মান ভাষায় এ ব্যাপারকে বিজাতীয় প্রভাব বলা যেতে পারে।

৮. তামিল curry শব্দের অর্থ 'সব্জী'। বাঙলায় উক্ত অর্থে 'তরকারি' শব্দটি চলে। 'তরকারি'র মূলে আছে ফারসী তরহ্ (সব্জী) + কারি। দু'টি পরস্পর অসম্পৃক্ত অথচ সমার্থক শব্দ মিলিত হয়ে বাঙলায় (একই অর্থে) নতুন একটি শব্দ সৃষ্টি করেছে।

৯. S. Rao : Indian Words in English (App.) p. 100.

১০. 'A loan word may have a long history and travel over long distances' (E. H. Sturtevant : An Introduction to the Linguistic Science, p. 144)

১১. B. C. Majumdar : History of Bengali Language (HBL), 1920. p. 250

১২. (ক) ভাষাবিদ্ Zule মনে করেন 'শৃঙ্গবের' শব্দের মূলে সমার্থক (দ্রাবিড়) inchi (root) + ver, 'ইঞ্চিবের' শব্দটি বিদ্যমান। 'শৃঙ্গবের' শব্দের উৎপত্তি উক্ত শব্দের বিকারে। (খ) ধ্বনি-পরিবর্তনের সহযোগে শব্দার্থ পরিবর্তনের কৌতূকাবহ উদাহরণ 'শৃঙ্গবের' থেকে (১) জাঞ্জিবার (দ্বীপের নাম) (২) স্পেনীয় Dengue (ন্যাকামি-অর্থে) > বাং 'ডেঙ্গু' (রোগ) প্রভৃতি শব্দগুলির উৎপত্তিতে (দ্রঃ ভাষার ইতিবৃত্ত (পাদটীকা) পৃঃ ৪৩) ;

১৩. EDEL (Skeat) এবং SED (M. Williams)

১৪. HBL (Majumdar), p 250.

১৫. Tamil Lexicon (vol. 1) ও EDEL (Skeat)

১৬. অনুরূপ : ইং peper < সং-পিপ্পলি ; camphor < সং-কর্পূর ; opal < সং-উপল ; গ্রীক ও ল্যাটিনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। (দ্রঃ EDEL (Skeat), Hobson-Jobson (yule) ও SED (M. Williams)

১৭. পৃথিবীর তাবৎ প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানেই শব্দের ব্যুৎপত্তিঘটিত আলোচনায় বহু ভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা, অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণগুলিতে বহু বিদেশী ও অজ্ঞাতমূল শব্দের সংস্কৃতরীতিতে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'ময়ূর' শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'মহ্যাং রৌতীতি (মহী + রু) মহীতে ডাকে বলে 'ময়ূর' (কাশিকা দ্রঃ)] অথচ 'ময়ূর' সংস্কৃতে গৃহীত অস্ট্রিক ভাষার শব্দ। হিব্রু পৃথিবীর সকল ভাষার জনক এমন ধারণাও তো দীর্ঘকাল য়ুরোপে প্রচলিত ছিল (দ্রঃ Barfield : History in English Words. p. 15) অবশ্য তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্ম মাত্র এক শতকের ঘটনা।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

পোস্টার

সামনের দেয়ালে আবার একখানা পোস্টার পড়েছে। রাস্তা দিয়ে কত লোক যায়। কেউ কেউ পড়ে দেখে। কেউ দেখেও দেখে না। কারো বা নজরেও পড়ে না। তবু আমাদের এই ফ্ল্যাট বাড়িটার মুখোমুখী রাস্তার ওপারের ঐ দেয়ালের গায় দু'চার দিন পর পর পোস্টার মারে। কে বা কারা মারে জানি না। জানবার চেষ্টাও করি না। ছা-পোষা কেরানী। কে যায় যত সব হাঙ্গামা হুজ্জতের নেপথ্যের কথা জানতে? যার খুশি মারুক, যার ভাল লাগে পড়ুক।

তবু না পড়ে পারি না। এত কাছে, একেবারে মুখোমুখী, তাই। আমার দোতলার শোবার ঘরের মধ্যে থেকে গোটা দেয়ালটা চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ি না কখনো। নরম নিরীহ পোস্টার।

সরবরাহ মন্ত্রী বলেন, কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়াছে। তবে কাপড়ের দাম কমে না কেন? কেন কমে না সে কথা ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে যাই। রোজ সকালে চা খাওয়ার পরে রাস্তার দিকে রকে গিয়ে বসি। পাশের বাড়ির অধ্যাপক পরেশবাবু আসেন তার ইংরেজী সংবাদপত্রখানা সংগে করে। আমারই পাশের ফ্ল্যাটের ইন্‌কাম-ট্যাক্স আপিসের ধনঞ্জয়বাবু আসেন তার দশ বছরের প্রিয় বাংলা খবরের কাগজখানি নিয়ে।

"দত্ত মজুমদারের খাটালের দেয়ালটা দস্তুরমতো একটা সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়াল।"

"তাই তো দেখছি।" ধনঞ্জয়বাবুর পরিহাসের জবাবে বললাম, "ইদানীং একটু বেশী রকম বাড়ছে খবরের সংখ্যা।"

সংবাদপত্র থেকে মুখ তুলে অধ্যাপক পরেশবাবু বলে উঠলেন "এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? হালে খবরের কাগজওয়ালারা নীতি বদলেছেন: ঘটে যাহা সব সত্য নয়। তাই পছন্দসই খবর না হলে—তা সে যত বড় অঘটনই

হোক না কেন—আজকাল তা সংবাদপত্রে অপাঙক্তেয়। ফলে এক ঘরে খবরগুলো ঠাঁই নিচ্ছে দেয়ালে দেয়ালে।"

"যাই বলুন ওসব পোস্টার ফোস্টার মেরে কিছু হয় না।" ধনঞ্জয়বাবু গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করেন, "কী লাভ হয় এতে? কজন লোক পড়ে মশায়?"

"শত হলেও খবরের কাগজ!" বললাম, "ছাপার হরফের একটা যাদু আছে যেন!"

"হ্যাঁ, একেবারে বেদবাক্য—তা সে যত বড় মিথ্যাই ছাপা হোক না কেন।" অধ্যাপক ফোড়ন কাটেন।

শুনে খুসি হই না। অধ্যাপকের মতামত মাঝে মাঝে একটু উগ্র হয়ে ওঠে। তবু আমাদের বন্ধুত্বে কখনো টান পড়ে না। তাঁর সঙ্গে একটা জায়গায় আমাদের দু'জনের স্বভাবের মিল আছে। গোলযোগের গন্ধ পেলে তিনিও দূর দূর দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলেন।

ধনঞ্জয়বাবু না বলে পারলেন না, "আপনি তো বক্তৃতার ঝোঁকে অনেক কথাই বললেন। বিপদের কথাটা একবার ভেবে দেখেছেন?"

"এতে আমাদের ভয় পাবার কী আছে মশায়?" অধ্যাপক প্রশ্ন করেন।

"কে বলতে পারে হঠাৎ একদিন সার্চ টার্চ হবে কিনা। অনর্থক হয়রানী কে চায় মশায়! আমাদের এই বাড়িটাতে ছেলে ছোকরা—তা আট দশজন তো হবেই। ধরে নিয়ে গেলেই হল। আজকাল কি আর আইনটাইন আছে!"

চেয়ে দেখি মই বেয়ে উঠে পোস্টার লাগাচ্ছে দেয়ালে—সিনেমা কোম্পানীর নতুন ছবির সচিত্র বিজ্ঞাপন। "কনট্রোল তুলে দেবার পর তিন মাসে কাপড়ের কলওয়ালারা একশো কোটি টাকা মুনাফা লুটেছে।" দু' তিন দিন আগের সেই বড় বড় হরফের পোস্টারটাকে একেবারে ঢেকে দিল ভারতবিখ্যাত চিত্রতারকার তিন রঙা আবক্ষমূর্তি।

পরদিনই আবার একখানা। এবার পরোক্ষ কায়দার এক উপভোগ্য পোস্টার: পুরোদমে চোরা কারবার চালাও। "ক্ষমতা হাতে পেলেই চোরা কারবারীদের ফাঁসি দেব"—পণ্ডিত জওহরলাল। এক বছরে ক'জন ধরা পড়েছে? মাভৈ নিখিল চোরাকারবার সমিতি।

যথাসময়ে রকের আড্ডায় এসে বসেছি। অধ্যাপক সহাস্যে বললেন,

"পোস্টারওয়ালারা দেখছি নতুন টেকনিকের খেলা দেখাতে স্বরু করল! আজ লোক টানছে মন্দ নয়।" দেয়ালের কাছে ছোটখাটো ভীড় জমেছে। বেশীক্ষণ নয়। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে লোক থামে, দেয়ালের কাছে এগিয়ে যায়। পড়ে, হাসে, টীকাটিপ্পনীও করে।

খানিক বাদে ধনঞ্জয়বাবু এসেই জানালেন, "শুনেছেন তো?"

"কী?"

"যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। এ পাড়ায় টিকটিকির আনাগোনা স্বরু হয়েছে।"

"মানে?"

"কাল দুপুরের দিকে আশপাশের দোকানগুলোর লোকজনেদের তারা—সি-আই-ডি'র লোকই হবে—বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে। রসুল মিঞাকে নাকি শাসিয়ে গেছে—বলে গেছে নজর রাখতে।"

আমাদের এ-বাড়ীরই গায়ে লাগানো রসুল মিঞার বিড়ির দোকান। হাঁক দেই। রসুল হাতের কাজ ফেলে রেখে চলে আসে।

"কাল নাকি পাড়ায় পুলিশের লোক এসেছিল?"

"মালুম নেহি।"

"তোমার দোকানে হে"—ধনঞ্জয়বাবু জোর দিয়ে বলেন।

"নেহি তো বাবু"।

এবার প্রশ্ন করেন পরেশবাবু "ও সব পোস্টার কারা লাগায় জানো? তুমি তো সব সময় সামনেই থাকো।"

"ম্যয় তো হর-বকৃত কাম পরহি রহতা হুঁ বাবু। ঔর বাংলা জবান তো মুঝে মালুম নেহি হোতে হ্যায়।"

"আরে বাংলা বাত হিন্দী বাতের কথা হচ্ছে না।" ধনঞ্জয়বাবু প্রায় রুখে উঠেন, "দিন দুপুরে ও সব কারা এসে মেরে যায় তুমি তার কিছুই জানো না বলতে চাও?"

"কুছ কুছ দেখতা হুঁ। কভি বাবু লোক লাগাতে হে, কভি মজদুর লোক ভি লাগাতে হে।"

রসুল চলে যেতেই অধ্যাপক বললেন, যাই বলুন না, লোকে ওসব পড়তে চায়। দেখছেন তো এত পোস্টার পড়ছে, কৈ ছিঁড়ে ফেলছে না তো কেউ।"

দেয়ালের কাছে আবার একটা ছোট্ট ভীড় জমেছে।

দিন চারেক বাদে। একখানা বড় আকারের তথ্যভারী নীরস পোস্টার:
পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা বেতন পান ও নয় হাজার টাকা ভাতা পান। এ ছাড়া তাঁহার মস্কোর অফিসের জন্য ব্যয় হয় বৎসরে ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা।
এ টাকা কার? তোমার—আমার—কোটি কোটি ভারতবাসীর।

ধনঞ্জয়বাবু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন—পড়ছেন না। পড়ছে জনকয়েক পথচারী: কারখানায় যাবার পথে শশব্যস্ত শ্রমিক, রেশনের থলে হাতে চশমা-পরা কেরানী ভদ্রলোক, এক রাজ্যের সংবাদপত্র বগলদাবা করে এক ছোকরা বয়েসী হকার। ধনঞ্জয়বাবু শঙ্কা প্রকাশ করেন, "এবার নিশ্চয় পুলিশের উৎপাত সুরু হবে। বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

"কেন? নতুন খবর তো কিছু দিচ্ছে না। এসব ফ্যাক্টস্ ফীগারস্ তো সেদিন খবরের কাগজেই পড়েছি।"

তা হলে কী হয়। খবরের কাগজ কী আর এ সব খবর এমন করে চোখে অ ঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।"

"তা বটে।"

অধ্যাপক দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন। বললাম, "কী ভাবছেন পরেশবাবু?"

"ভাবছি—রোলস্ রয়েস্ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন এ বুলক্-কার্ট কানট্রি।" একটু হেসে বললেন অধ্যাপক, "এ উক্তি করেছিলেন সেকালের এক মডারেট নেতা। তিনি আজ ফিরে এলে নিশ্চয় এক্স্ট্রিমিষ্ট লেবর লীডার বলে স্পেশাল পাওয়ার্স এ্যাক্ট-এর বেড়াজালে পড়বেন।"

ধনঞ্জয়বাবু এক টিপ নস্যি নিতে নিতে সেদিনের মতো আবার জোর অভিমত জানান, "এতে কোনো লাভ হয় না। ক'জন লোক পড়ে এ সব? আর পড়েই বা হচ্ছে কী?"

"কী হয় না-হয় জানিনে। তবে আপাতত আমার পনেরো বছরের ছেলেটার মগজে কিঞ্চিৎ স্লোগানের ধোঁয়া ঢুকেছে।" পরেশবাবু হেসে বলেন।

আমার বড় ছেলেটাও ঐ বয়েসী। সুতরাং উৎকর্ণ হয়ে শুনে যাই।

—"গেল মাসে আমাদের ঠিক-ঝি সাতদিন কামাই করেছে। বলে অসুখ করেছিল। আমার তা বিশ্বাস হয়নি। হিসেব করে এ মাসে সাতদিনের মাইনে

কম দিয়েছি বলে আমার পুত্র তার মায়ের কাছে নাকি মন্তব্য করেছে, বাবার বড়ো পেটি বুর্জোয়া মেণ্টালিটি।"

"বলবেন না আর।" বলছেন এবার ধনঞ্জয়বাবু, "আমার কনিষ্ঠ সহোদরের বড় বড় কথার ঠেলায় গায় জ্বালা ধরে। ইদিকে কলেজের পড়া তো সিকেয় উঠেছে। সেদিন বই নিয়ে গুন্‌গুন্ করছে। একটু পরখ করলাম, বলতো স্টক্ আর শেয়ারে তফাৎ কী? বলে কী না ও'সব কথা তোমরা জানবে—আমাদের জন্যে নয়। ভবিষ্যতে স্টক এক্‌চেঞ্জই থাকবে না, তার আর স্টক্ আর শেয়ারে তফাৎ।"

পরেশবাবু আর আমি একসঙ্গে হেসে উঠি। হাসেন ধনঞ্জয়বাবুও, কিন্তু পরক্ষণেই যেন একটু গম্ভীর হয়ে বলতে থাকেন, "আমরাও তো তাই চাই। কে না চায় বলুন। তাই বলে কি আজই সব হবে, না তা হতে পারে? ধীরে ধীরে আসবে সব। এখনই এক্‌ট্রিমিষ্ট হয়ে কোনো লাভ আছে? এক্‌ট্রিমিস্‌ম মানেই ভায়লেন্স, আর ভায়লেন্স বিগেট্‌স ভায়লেন্স!" বলেই ধনঞ্জয়বাবু এতক্ষণে একটা উঁচুদরের কথা বলতে পেরেছেন ভেবে খুশির হাসি হাসেন।

পর পর দিন কয়েক নতুন করে পড়ল আবার পুরনো পোস্টার-গুলো: ছাঁটাই করা চলবে না।……জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই।…… বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত কর। ইত্যাকার।

পড়ে—সবাই বুঝি পড়ে। অন্ততঃ আমার গৃহিণীও যে মাঝে মাঝে পড়ে তার প্রমাণ পেয়েছি। কালোবাজারের প্রসঙ্গে সেদিন বেশ প্রাসঙ্গিক-ভাবেই ঝেঁজে উঠেছিল, "গবর্ণমেণ্ট আমার হাতে দিক না সব ভার বুঝিয়ে। তোমাদের ঐ চোরাবাজার একদিনেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করব দেখে নিয়ো।"

আজকের আসরে নীচের তলার পেছন দিকের ফ্ল্যাটের কালীবাবুও আছেন। বললাম, "বাড়িতে আজকাল গিন্নীরাও যে পলিটিক্স সুরু করে দিলে মশায়।"

"দেবে না!" কালীপদবাবু বললেন, "এতকাল পলিটিক্স ছিল বাইরে বাইরে। হাল আমলে তা ঘরে এসে ঢুকেছে—একেবারে রান্নাঘরের হাঁড়ির মধ্যে।"

"হ্যাঁ, পেটে টান পড়লে ও বস্তু আপনি আসে," টিপ্পনী করলেন অধ্যাপক।

চেয়ে দেখি আধা-বয়েসী লোক দেয়ালে একখানা পোস্টার লাগিয়ে চলে গেল। মফস্বলে কোথায় এক ভুখা-মিছিলের উপর পুলিশ লাঠি চালিয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত খবর।

কালীপদবাবু রসিক লোক। তবে মাঝে মাঝে বড় মাত্রা ছাড়িয়ে যান। আরো একটা দোষ আছে। একবার একটা কথা পেলেই ব্যস্। আর কাউকে কথা বলতে দেবেন না। সুরু করে দিলেন, "আজকাল ঐ এক হিড়িক। কথায় কথায় মিছিল। চাল চাই, কাপড় চাই, হেন চাই, তেন চাই।—কেবল চেয়ে চেয়েই জিততে চায়। ও করে কোনদিন কিছু হয়েছে, না হবে?"

"ও ছাড়া আর কোন্ পথ আছে বলুন।"

কালীপদবাবু তার কৃত্রিম ক্রোধের ভাব এবার দ্বিগুণ চড়িয়ে দিয়ে বলেন, "আছে মশায়। সোজা, স্পষ্ট পথ। সব দেশের সব যুগের যা একমাত্র পথ।"

"যথা?" প্রশ্ন করে তাকে উস্‌কে দিতে চাই।

কালীপদবাবু ফিক্ করে হেসে গরম স্বর হঠাৎ নরম করে আনেন, "পথ মশাই যাই হোক না কেন, তাই বলে এমন সব ছিঁচকাঁদুনের মিছিল। হ্যাঁ, মিছিলের মতো মিছিল বার কর একটা, তবে না।"

"কেমন?"

"—এই ধরুন: ট্যাঁকে টাকা আছে, বাজারে কাপড় নেই। সমস্যাটা তো এই? বেশ তো পাঁচ টাকার আর দশ টাকার নোট গঁদের আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে এক-একখানা দেড়হাতি গামছা তৈরী করে তা-ই পারে যা না চলে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে লাট সাহেবের বাড়ির কাছে। দিগম্বর-দিগম্বরীদের সাইলেন্ট ডেমোস্ট্রেশন! শ্লোগানের দরকার নেই। দেখেই বুঝবে: টাকা আছে কাপড় নেই।"

আমি আর অধ্যাপক সলজ্জ বিরক্তি গোপন করে চুপ করে থাকি। ধনঞ্জয়বাবু কিন্তু একটু রসাল লেজুড় জুড়ে দিলেন, "তা করেও কোনো ফল হবে না মশায়। লাট-বেলাটের প্রাসাদে আজকাল যা কেত্তন-গানের ধুম, তাতে দূর থেকে বাইনোকিউলার চোখে লাগিয়ে মনে করবে নব ভারতের নব বৃন্দাবনের যত গোপিনীরা এসেছে।"

উৎসাহিত হয়ে কালীপদবাবু বোধ হয় আরো একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার মতলবে ছিলেন। বাধা পেলেন।

তেতলার ফ্ল্যাটের ধরণীবাবু আমাদের কাছে এসে সোৎসাহে জানালেন, "শুনেছেন"—

"কী ?"

"কাল সকালে সাড়ে আটটায় আমাদের এই রাস্তা দিয়ে গবর্নর যাবেন—মনোরমা প্রসূতি ভবনের নতুন ওয়ার্ডের উদ্বোধন করতে।"

আমাদের এতদিনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল।

সকালবেলা রকে বসে আমরা খবরের কাগজ পড়ছি। এক পুলিশ কনস্টেবল দেয়ালের পোস্টারগুলো ছিঁড়তে লেগেছে। বুঝলাম তার উপরওয়ালার হুকুম। লাটসাহেবের গমন-পথে কোনোরূপ অবাঞ্ছিত দৃশ্য থাকলে চলবে না।

হঠাৎ রাস্তার একজন লোক কাছে গিয়ে কনস্টেবল-এর হাত চেপে ধরেছে—তাকে কিছুতেই পোস্টার ছিঁড়তে দেবে না। প্রথমে গালাগাল, পরক্ষণেই হাতাহাতি, তারপর ধস্তাধস্তি সুরু হয়ে গেল। হৈ-চৈ শুনে জড়ো হল এক ছোটখাটো জনতা।

রোগাটে লোকটাকে কাবু করতে কনস্টেবলটির বেশী সময় লাগল না। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল থানায়। অদূরে জনতা থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে।

এমন সময় মুহূর্তমধ্যে ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। জনতার মধ্য থেকে জন দশেক লোক বাজপাখির মতো কনস্টেবলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্পষ্ট দেখলাম তাদের মধ্যে আছে রসুল মিঞা, মোড়ের চায়ের দোকানের বয়টি, স্যাকরার দোকানের সেই কানা কর্মচারীটি 'রমা ফার্মেসি'র বাইরের বারান্দায় আমেরিকান লজেঞ্চ-বিস্কুট-চকোলেট বিক্রী করে যে বেঁটে ছোকরা সে-ও এবং আরও জনকয়েক অচেনা অজানা মুখ। বাকী জনতাও টগবগ করছে উত্তেজনায়।

লোকটাকে পুলিসের কবল মুক্ত করে তারা সামনের চৌমাথার দিকে চলল এক বিজয়ী সেনাবাহিনীর মতো।

আমাদের চোখের সামনে চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এমন অনর্থ ঘটবে কে ভেবেছিল।

'গতিক ভালো নয়' বলে অধ্যাপক উঠে দাঁড়ান। আমরা যে যার ঘরে ফিরে যাই। কেন না থানা বেশী দূরে নয়।

দোতলার ঘরের মধ্যে বসে দেখছি সব। দুই গাড়ি সঙ্গিনধারী পুলিস এসেছে। নেমেই প্রথমে তারা দেয়ালটা একেবারে সাফ করে দিলে—সিনেমার বিজ্ঞাপনগুলি শুদ্ধ। তারপর দুভাগ হয়ে একভাগ চলে গেল মোড়ের দিকে। ভাবলাম এবার শুরু হবে ধরপাকড় আর খানাতল্লাস।

মিনিট দশেক বাদে। রাস্তার উপর তোলপাড় কাণ্ড। লাট আসছেন। অসম্ভব ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেছে। ঘন ঘন হুইসিল। হটো, হটো: তফাৎ যাও: খাড়া রহো: ঠাড়ো উধার: হটো।

রাস্তার দু'ধারে নিরুদ্ধ নিশ্বাসের মতো থেমে গেছে সবকিছু। চলন্ত গাড়ি, পথচারী, ভিখিরি, বেওয়ারিশ বেড়াল-কুকুর-ষাঁড়—সব। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটি ভয়ঙ্কর মুহূর্তের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে।

এক, দুই, তিন, চার……

নক্ষত্রবেগে বার হয়ে গেল গভর্নরের গাড়ি।

বিকেলে আপিস থেকে বাসায় ঢুকে সিঁড়ির মুখে প্রশ্ন করি গৃহিণীকে, "তোমার ছেলে বাসায়?"

"হ্যাঁ।"

"আজ কোথাও যায়নি তো?"

"না গো স্কুল থেকে সোজা বাড়ি ফিরেছে।"

নিশ্চিন্ত হই।

সন্ধ্যার পর ধনঞ্জয়বাবু তাদের দোতলার বারান্দা থেকে ডাকলেন। আমাদের বারান্দার এক কোনে গিয়ে রেলিঙে ভর করে মুখ বাড়িয়ে অনুচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করি "মহীতোষ ফিরেছে?"

"না। সে জন্যেই তো ভাবনায় পড়েছি। বলে গেছে খেলার মাঠে যাচ্ছি। হতভাগাকে এত বলি, তবু রোজ রাত করে বাসায় ফিরবে।"

ওপারে দেয়ালের কাছে একজন কনষ্টেবল মোতায়েন রয়েছে সকালবেলার ঘটনাস্থলে। সারারাত পাহারা দেবে নাকি?

তেমনি অনুচ্চকণ্ঠে বলি, "মহীতোষকে এলে বলবেন অবজেক্শনেবল কাগজ-পত্তর কিছু থাকলে আজ রাত্তিরেই যেন সরিয়ে ফেলে।"

"না, সে ভয় নেই।" ধনঞ্জয়বাবু অভয় দেন, "যত বড় বড় কথা ওর

থেকে দেশে বেশ কিছু টাকা নিয়ে যাওয়া। যে সকল চেম্বার অফ কমার্স কলিকাতা অঞ্চলের শিল্প ও বাণিজ্যের বিধাতা তাদের হর্তাকর্তাদের পনর আনাই অবাঙালী। 'Indianness of Content'! মোলায়েম সত্যভাষণের কি সুন্দর নমুনা! ভারতের মোট ব্যাঙ্ক আপিসের মাত্র ছয় শতাংশ পশ্চিম বাংলায় (বেশির ভাগই কলিকাতায়), অথচ ভারতের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের ষোল শতাংশ এবং মোট দাদনের পঁচিশ শতাংশ পশ্চিম বাংলায়। ভারতে একাত্তরটি বিদেশী ব্যাঙ্ক আপিসের একুশটিই রয়েছে শহর কলিকাতায়। ভারতের যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলির আটাশ শতাংশ ও তাদের প্রদত্ত মূলধনের তেইশ শতাংশ পশ্চিম বাংলায়। পশ্চিম বাংলায় সংগৃহীত হয় ভারতীয় আয়করের আটাশ শতাংশ ও সুপার ট্যাক্সের চৌত্রিশ শতাংশ। কিন্তু কলিকাতার প্রধান গৌরব হল কলিকাতা বন্দর। ভারতের প্রায় অর্ধাংশ কলিকাতা বন্দরের উপর স্বাভাবিক ভাবে নির্ভরশীল। ভারতের মোট রপ্তানির পঁয়তাল্লিশ শতাংশ ও মোট আমদানির আটত্রিশ শতাংশ কলিকাতা বন্দর মারফত। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশই অর্জন করে কলিকাতা বন্দর। কলিকাতার শ্রমিকরা কি উচ্ছৃঙ্খল, ফাঁকিবাজ ও অকর্মণ্য? এইরকম একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় বটে। এ সম্বন্ধে অশোক মিত্রের মত উদ্ধৃতিযোগ্য :

"Calcutta's labour has not shed its skill. In fact, despite the stoppages, lockouts and strikes with which Calcutta's labour is often associated, it is generally conceded by industrialists that it more than makes up for lost time once it starts work. What is more, the discipline of the trade unions is good and once an understanding is reached in the Works Committee or adopted in the code of discipline it is respected. Maintenance and repairs are economical. Breakdowns, injury to machinery owing to lack of routine maintenance, so common elsewhere, are low."

কিন্তু কলিকাতা সম্বন্ধে এত কথা বলা কেন? উদ্দেশ্যটা কি অশোক মিত্রের? শুধুই কলিকাতার প্রতি ভারতের ভি. আই. পিদের মনকে প্রসন্ন করে তোলা অথবা কফি হাউসের বিতর্কে কলিকাতা সম্বন্ধে যাতে

দু-চারটে ভালো ভালো কথা বলা যায় তার খোরাক যুগিয়ে দেওয়া ? অবশ্যই নয়। কলিকাতা সম্বন্ধে রীতিমতো উদ্বেগের কারণ আছে এবং কিছু আশু এবং অবশ্য করণীয় আছে। উদ্বেগ প্রধানত এইজন্যে যে কলিকাতা যথেষ্ট বাড়ছে না। এই প্রসঙ্গেই অশোক মিত্র এমন অনেক তথ্য উপস্থিত করেছেন যা বহুলোকেরই অজানা। একদিন ছিল যখন বোম্বাই কলিকাতাকে হিংসা করত। কিন্তু এখন চাকা ঘুরে গেছে। বর্তমানে বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রফল (area) একশত ছিয়াশি বর্গ মাইল, কলিকাতার চল্লিশ বর্গ মাইল এবং কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের (শহর কলিকাতা সমেত) একশত সত্তর বর্গ মাইল। পঞ্চাশ দশকে নানা দিক থেকে কলিকাতার বাড় কি রকম স্তিমিত হয়েছে এবং তুলনামূলক ভাবে কলিকাতা কেমন পিছিয়ে পড়েছে তা ভাবলে সত্যই উদ্বিগ্ন হতে হয়। দশ বছরে পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা বেড়েছে তেত্রিশ শতাংশ, কলিকাতার জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র আট শতাংশ এবং কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের জনসংখ্যা বেড়েছে কুড়ি শতাংশ। এই দশ বছরে বোম্বাইয়ের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় উনত্রিশ শতাংশ। ১৯৫০ সালে ভারতের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ত্রিশ শতাংশ ছিল পশ্চিম বাংলায় কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালে তা দাঁড়ায় ষোল শতাংশ। দশ বছরে পশ্চিম বাংলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ে একশত পাঁচ কোটি ইউনিট থেকে দুইশত চব্বিশ কোটি ইউনিট কিন্তু বোম্বাই রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ে একশত একষট্টি কোটি ইউনিট থেকে চারশত এক কোটি ইউনিট। পঞ্চাশ দশকে রেজিস্ট্রীভুক্ত ফ্যাক্টরিতে দৈনিক কর্মীনিয়োগ বাড়ে পশ্চিম বাংলায় কিছু কম পাঁচ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ এবং গুজরাটে তের শতাংশ। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১, এই পাঁচ বছরে ভারতে শিল্পোদ্যোগের তিন হাজার সাতশত নব্বুইটি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছিল ; তার মধ্যে ছয়শত পঁচিশটি পায় পশ্চিম বাংলা এবং চৌদ্দশত বিয়াল্লিশটি পায় মহারাষ্ট্র ও গুজরাট। পঞ্চাশ দশকে ডেলি প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা বাড়ে বোম্বাই শহরে উনত্রিশ কোটি থেকে বিয়াল্লিশ কোটি এবং কলিকাতা শহরে কিছু কম চার কোটি থেকে ছয় কোটি। ভারতের রেলপথগুলির মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান, ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন রেলপথগুলির সঙ্গে কলিকাতার সম্পর্ক। পঞ্চাশ দশকে এই তিনটি রেলপথে দ্রব্য চলাচলের টন-মাইলত্ব বাড়ে একত্রিশ শতাংশ। ওই দশ বছরে ভারতের সমস্ত রেলপথে দ্রব্য চলাচলের টন-মাইলত্ব বাড়ে নিরানব্বুই শতাংশ।

১৯৫৮-৫৯ থেকে ১৯৬০-৬১, এই দুই বছরে সংগৃহীত আয়কর (বৃহত্তর অর্থে) পশ্চিম বাংলায় চুয়ান্ন কোটি টাকা থেকে কমে দাঁড়ায় সাড়ে উনপঞ্চাশ কোটি টাকা কিন্তু মহারাষ্ট্রে একান্ন কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয় সাড়ে বাহান্ন কোটি টাকা।

তথ্যের উপচার বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। তার শেষই বা কোথায়! মোটের উপর অশোক মিত্র তাঁর প্রধান পয়েন্টটা ভালমতোই দাঁড় করিয়েছেন। পশ্চিম বাংলা পিছিয়ে পড়ছে। শহর কলিকাতা যথেষ্ট বাড়ছে না। কলিকাতা শিল্পাঞ্চল থেকে মূলধনের পলায়নের প্রথম লক্ষণ সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। এসব কথার সঙ্গে একমত হতে কারো এক সেকেণ্ডের বেশি লাগবে না। কিন্তু কেন শহর কলিকাতার এই দুর্গতি? এ সম্বন্ধে অশোক মিত্রের বক্তব্যই এই ছোট্ট বইটির সবচেয়ে মৌলিক, মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক অংশ। বোম্বাই ও কলিকাতার মূলগত পার্থক্য এই যে, বোম্বাইয়ে যে ব্যবসায়ী শ্রেণী উদিত হয়েছিল তা স্থানীয়। তারা বোম্বাইকে আপন শহর বলে মনে করত। নাড়ীর টান ছিল তাদের বোম্বাইয়ের প্রতি, দূরদৃষ্টিও ছিল তাদের বোম্বাইয়ের ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্বন্ধে। সেখানে ফেরোজশা মেহতার মতো বিরাট পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁর ধ্যানধারণার বিষয় ছিল শহর বোম্বাইয়ের উন্নয়ন এবং যাঁর জীবন ছিল বোম্বাইয়ের প্রতি উৎসৃষ্ট। শহর কলিকাতার ইতিহাস ভিন্ন ধরনের। এখানে ব্যবসায়ী শ্রেণীর আগমন বাংলার বাইরে থেকে। বরাবরই তাঁদের লক্ষ্য এখানকার ক্ষীর সর ছানা যতটা পারা যায় ছেঁকে তুলে নেওয়া, পৌর ব্যাপারাদিতে বেশি জড়িয়ে না পড়া, শুধু টাকার জোরে উচ্চ থেকে উচ্চতর মূল্যে যতটা সম্ভব জমি হাতিয়ে নেওয়া বাদে। সমস্ত, স্থানীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ গেড়ে বসে থেকেছে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে। বুরোক্রাটদের সাহায্যে তারা গড়ে তুলেছে রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডারের মাজিনো লাইন। এই তাদের প্রতিশোধ বৃহৎ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে। কলিকাতার প্রতি উৎসৃষ্ট-জীবন লোক খুব বেশি দেখা গিয়েছে কি শহর কলিকাতায়? আর দূরদৃষ্টি? ক্ষুদ্র স্বার্থের অদূরদর্শিতা বিখ্যাত। বুরোক্রাটরা এদিক থেকে তাঁদের উপর দিয়ে যান। কলিকাতাকে ঢেলে সাজানোর, গড়ে তোলার ও প্রসারিত করার মতো উদ্যোগ ও লগ্নীকরণ প্রবৃত্তি? একান্তই অভাব, ঘটেছে এই স্তরের। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট অনেক ভালো কাজ করেছে কিন্তু তার উল্টো দিকে রয়েছে জমির দামের আকাশচুম্বী বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র মানুষের উচ্ছেদ। নিজের

বাসের জন্য বাড়ি করাই কলিকাতায় নিরাপদ। ভাড়া খাটানোর জন্য বাড়ি করার উদ্দীপনা নেই। কি করে থাকবে যখন এক দিকে রয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং অন্য দিকে রয়েছে রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডারে বেঁধে-দেওয়া নীট সওয়া ছয় শতাংশ প্রতিদান? সুতরাং কলিকাতা রয়ে গেছে বহুলাংশে বস্তি, কুঁড়ে, একতলা, দোতলা, জরাজীর্ণ বাড়ির শহর যদিও পৃথিবীর কম শহরেই কলিকাতার মতো এমন চড়া দামে জমি বিকোয়। কলিকাতার নানা প্যারাডকসের অন্যতম। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই অশোক মিত্র কলিকাতার দিকে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। কলিকাতা ভারতের শহর, সর্ব-ভারতীয় শহর। তার সমস্যার সমাধানের জন্য কি দরকার? অশোক মিত্র বলছেন:

"Clearly, a nation-wide lobby is indicated which will be solicitous of the goose that lays the golden egg···this lobby has to appear as much from among the national political parties and the big industrial and commercial interests as from those who own the city and work in it. It should be the Parliament's and the nation's concern."

অশোক মিত্র শহর কলিকাতা সমস্যা এবং আরো অনেক সমস্যা সম্বন্ধে অথরিটি। তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করার মতো বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও সাহস নিজের মধ্যে আদৌ খুঁজে পাচ্ছি না। বিতর্ক করতে ঠিক চাইও না। লেখাটি পড়ে মোটের উপর তাঁর চেলা বনে গেছি। তবু দু-চার কথা বলতে দোষ কি? না হয় ভুল কথাই বলব।

রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডার কেন কলিকাতার বাড়কে ব্যাহত করেছে, এ সম্বন্ধে অশোক মিত্রের এক কথা। জমিবাড়িতে লগ্নীকরণের ওই নীট সওয়া ছয় শতাংশ প্রতিদান। অতি-সরলীকরণ হয়ে গেছে। বাস্তব প্রক্রিয়াটি আরো অনেক জটিল। তার জট ছাড়িয়ে ভিতরকার কথাটিকে টেনে বের করতে তিনি পারেন নি। বোধ হয়, প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য ও পরিসর তাঁকে এই কাজে প্রবৃত্ত হতে দেয়নি। তাই অনেকেই অশোক মিত্রকে ভুল বুঝেছেন, মনে করেছেন বুঝি-বা তিনি বলতে চাইছেন, রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডার তুলে দাও, পুরাতন প্রজাদের ভাড়া তিন চারগুণ বাড়ুক, তাদের উচ্ছেদ ঘটুক, এবং তাহলেই এই নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে

কলিকাতার বাড়বাড়ন্ত ঘটবে। সাংঘাতিক ভুল বোঝা। অবশ্যই অশোক মিত্র তা বলতে চান না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সামরিক উপমাটা এই ধারণাই সৃষ্টি করেছে।

জমিবাড়িতে লগ্নীকরণের প্রতিদান দিল্লীর তুলনায় কলিকাতায় বাস্তবিক কি এতই কম যতটা অশোক মিত্র দেখাতে চেয়েছেন ? তা কিন্তু মনে হয় না। ধরা যাক, দক্ষিণ কলিকাতায় কোনো এক জায়গায় ছয় কাঠা জমির উপর একটি তেতলা মাঝারি গোছের ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করা হল। প্রতি তলায় তিনটি করে ফ্ল্যাট। বৎসরে মোট ভাড়া বাবদ পাওয়া যাবে নীট চৌত্রিশ হাজার টাকার কিছু বেশি তো কম নয়। জমি ও বাড়িতে লগ্নীকরণ হবে, ধরে নিচ্ছি, দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকার বেশি নয়। তাহলে প্রতিদান দাঁড়াচ্ছে সাড়ে বারো শতাংশ। খুব নিরাপদ মার্জিনকেও ঝানু বাড়িওয়ালা আট থেকে দশ শতাংশের নিচে ধরবেন না। দিল্লীর দৃষ্টান্তে অশোক মিত্র ধরেছেন, জমির ও বাড়ির খরচা বাইশ টাকা বর্গ ফুট। অনেক কম করে ধরেছেন মনে হচ্ছে। দিল্লী বুম টাউন।

এক জায়গায় অশোক মিত্র বলেছেন, কলিকাতায় জলের ও স্যানিটেশানের সীমাবদ্ধতাই কলিকাতার জনসংখ্যার স্বল্প বৃদ্ধির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা। তা যদি হয় তাহলে শুধু রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডার সম্বন্ধে এত বিলাপ কেন, বিল্ডিং বুম দেখা যায় নি বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলা কেন ? জলের ও স্যানিটেশানের সীমাবদ্ধতা, পরিবহণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, এই সব দূর না হলে বিল্ডিং বুমের ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিলাস কলিকাতার পক্ষে পোষায় না। বাড়ি তৈরি হচ্ছে না হচ্ছে না করেও যথেষ্ট হচ্ছে। খালি জমি কোথাও প্রায় পড়ে থাকতে দেখা যায় না। ঘিঞ্জিপনা এখনই এমন উগ্র যে তা আরো উগ্রতর হলে অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে তা একটা বিভীষিকা।

হ্যাঁ, কলিকাতার বাড়া দরকার। চাই আরো জল, আরো ভালো ও বড় রকমের স্যানিটেশানের বন্দোবস্ত, বৃহত্তর ও নূতনতর পরিবহণ ব্যবস্থা। বিল্ডিং বুমও চাই। শুধু খালি জমিতে নতুন বাড়ি তৈরিই নয়। পুরাতন জরাজীর্ণ বাড়ি ভেঙে ফেলে সেই জায়গায় আধুনিক ধরনের বহুতলা বাড়ি বানানো দরকার। বস্তি ভেঙে বস্তিবাসীদের এক-কামরা, দেড়-কামরা, বহুতলা ফ্ল্যাট বাড়িতে সরানো দরকার কিন্তু আগেকার মতো ভাড়ায় বা তার চেয়ে দু-এক টাকা বেশি ভাড়ায়। কলিকাতায় জমির দাম বাড়তে বাড়তে

যাতে জ্যোতিষিক স্তরে না পৌঁছয়, তার জন্য জমির দামের উপর সীলিং স্থাপন করা দরকার। অনেক দিন আগেই তা করা উচিত ছিল। লজিকের দিক থেকে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের আটাশটি ছোট শহরের সঙ্গে শহর কলিকাতার পৌর একীভবন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কি করে এসব হবে। "নেশুন-ওয়াইড লবি"? সেই কবিতার লাইন মনে পড়ে যাচ্ছে, 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'। সেই তিনিটি কে? এবং মেলানোই কি তাঁর কাজ? ন্যাশুনাল পলিটিক্যাল পার্টিজ, কথাটা শুনলেই আমি ভয় পাই। সম্প্রতি পাচ্ছি। যাঁদের ধর্মই হল নিজেদের মধ্যে 'সীনথেটিক' ও কিঞ্চিৎ 'ফোনি' ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করা তাঁরা কলিকাতার মঙ্গলামঙ্গল ও হ্রাসবৃদ্ধি সমস্যা, এমন একটা ব্যাপার সম্বন্ধে একমত হবেন, এই উদ্ভট কল্পনার কাছে হার মানলাম। 'দুর্বলের অত্যাচার' শহর কলিকাতাকে বাড়তে দেয় নি। হ্যাঁ, নগ্ন সত্য এবং একথা বলার সাহস অশোক মিত্রের আছে। আবার বৃহৎ ব্যবসায়ী স্বার্থ কলিকাতাকে কেবল চমৎকার মৃগয়াভূমি রূপেই দেখে এসেছে এবং দখল করবার তালে থেকেছে, এটাও সমানই নগ্ন সত্য এবং এ সম্বন্ধে সচেতনতা অশোক মিত্রের মনে নেই তা নয়। তাই অবাক হই যখন দেখি, অশোক মিত্র এই মিরাকল প্রত্যাশা করেন যে একটা "নেশুন-ওয়াইড লবি" গড়ে উঠলেই কলিকাতায় বৃহৎ ব্যবসায়ী স্বার্থের ও ক্ষুদ্র স্বার্থের কোলাকুলি ঘটবে এবং তা দেখে আমাদের সকলের চোখ জুড়োবে। ততদিন কি আমরা বেঁচে থাকব? ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে, প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগ ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ব্যতীত নতুন ও বৃহত্তর কলিকাতা সম্বন্ধে যে স্বপ্ন অশোক মিত্র দেখেছেন তা সিদ্ধ হবে না। অবশ্য সি. এম. পি.-ও খাড়া করা হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে ওই স্বপ্নের সিদ্ধি ঘটবে কি? অনেক জিনিস হঠাৎ বিশ্বাস করে ফেলার চেয়ে অবিশ্বাসী থাকাই ভালো।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

Their Majesties the Mob : **John W. Caughey ; University of Chicago Press ; Chicago.**

পরিচ্ছন্নমনা নির্ভীক তরুণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যাকাণ্ডে বেদনা-বিমূঢ় জগতের জিজ্ঞাসা ছিল, কে এই হত্যাকারী, কেন এই হত্যা? এ-দুটি প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর জগতের কাছে এখনও পৌঁছয় নি ; তবে আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগ F. B. I নাকি হত্যাকারী কে, এই প্রশ্নে নিশ্চিত হয়েছে। সে নাকি লী অসওয়াল্ড। এই হত্যাকাণ্ডকে প্রগতি-বিরোধী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছে, তবে সংগৃহীত তথ্য এত অনির্ভরযোগ্য যে ও-দেশের সাম্যবাদী সংগঠন বা সাম্যবাদকে কাঠগড়ায় উপস্থিত করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। কিন্তু এই সূত্রে 'মুক্ত-দুনিয়া'র পীঠস্থান আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থাকেই যে হয়তো বিশ্ব-বিবেকের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে সে সম্ভাবনা হয়তো এখনও অনেকের মনে ওঠে নি।

অত্যন্ত দুঃস্থ পরিবারের ছেলে লী অসওয়াল্ড বাল্যকালেই অপরাধ-প্রবণতা অর্জন করে। তাকে মনস্তাত্ত্বিকরা বিপজ্জনক বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন ও কোনো মানসিক হাসপাতালে রাখার নির্দেশ দেন। সেটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। আমেরিকায় যে সামাজিক পরিবেশ বিদ্যমান, তার ফলে তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ও হিংস্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে, একমাত্র সাম্যবাদী আন্দোলন ও প্রগতিমূলক সংগঠনগুলি ছাড়া প্রায় সব কিছুই অনিয়ন্ত্রিত, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে সংযত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই প্রায়-অরাজকতা বর্তমান*। ১৯৫৭ সালে অপরাধের জন্য ২০ লক্ষ ৭০ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। প্রত্যেক বছর এই হার বেড়ে চলেছে। ১৯৫৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে সেই রাজ্যে ১৭ বছর বয়স্ক প্রতি চারজন ছেলের মধ্যে অন্তত একজনকে কোনো না কোনো অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। Frederic Wertham তাঁর Seduction of Innocent বইটিতে কি ভাবে তরুণদের মন বিবেকবর্জিত

---

* মার্কিন সমাজব্যবস্থা বর্তমানে কি মাত্রায় 'মগের মুলুকে' পরিণত হয়েছে তার পরিচয় পেতে হলে Daniel Bell লিখিত 'The End of Ideology গ্রন্থের ৭ম (Crime As An American Way of Life') এবং ৯ম ('The Racket-ridden Longshoremen) পরিচ্ছেদ দুটি অনুধাবনযোগ্য।

তথাকথিত 'কমিক-বুক' প্রকাশকারী ব্যবসায়ীরা কলুষিত ও অপরাধপ্রবণ করে তুলছে তার চাঞ্চল্যকর আলোচনা করেছেন। একটা সমাজব্যবস্থা কি ভাবে অপরাধীদের সৃষ্টি করে, আমেরিকা তার উদাহরণ। শুধু লী অসওয়াল্ডকে দোষ দিলে চলবে কেন? অসওয়াল্ড সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে, সে আজীবন নৈরাশ্য-প্রবণ, ক্ষুব্ধ ও সমাজ-বিরোধী ছিল। সুস্থতর সমাজে তার হয়তো অন্য চেহারা দেখতাম।

গোবরের আর একপিঠের 'হিরো' জ্যাক রুবি বা রুবেনস্টীন-এর দিকে তাকালেও সেই একই প্রশ্ন ওঠে। শিকাগো নগরীতে 'Bloody Twentieth' পাড়াতে জাত ও বর্ধিত বখাটে ছেলে রুবি স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে নি। তবে আমেরিকায় এই ধরনের 'চালু' ছেলেদের জীবনে 'প্রতিষ্ঠিত' হতে অসুবিধা হয় না। গুণ্ডা এবং জুয়াড়ীদের সাহায্যে এবং পুলিশ ও শাসন কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় ডালাস শহরে সে প্রমোদসুন্দরীদের নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে মধুচক্রের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। অপরাধী জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ। হঠাৎ কেনেডির হত্যাকাণ্ডে তার দেশপ্রেম এবং মানবতাবোধ নাকি উথলে উঠেছিল, যার ফলে সে কমিউনিস্টদের (লী অসওয়াল্ডকে প্রথমে কামউনিস্ট এবং কাস্ট্রোপন্থী বলে চিহ্নিত করা হয়) হাত থেকে পবিত্র গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য চরম আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয়ে অসওয়াল্ডকে হত্যা করে। (ফলে অবশ্য অসওয়াল্ডের জবানবন্দী থেকে আসল সত্য উদ্ঘাটিত হবার যে সম্ভাবনা ছিল তা ভ্রূণে বিনষ্ট হল) অসওয়াল্ড দোষী কি নির্দোষী, কিম্বা আসলে রুবিকে ঘিরে একটা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রই কেনেডিকে হত্যা করেছে কি না সে প্রশ্নে আমরা যেতে চাই না। আমাদের প্রশ্ন বর্তমান আমেরিকায় এমন পরিস্থিতি রয়েছে কিনা যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সমাজবিরোধীদের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য এবং যখনই প্রয়োজন হয় তখনি তারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়। হয়তো আমাদের এই সন্দেহ বিশ্বাসের উপকণ্ঠে এসে হাজির হত না যদি না মার্কিন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অধুনা-লিখিত কয়েকটি বই আমাদের হাতে এসে না পড়ত। আলোচ্য বইটি তাদেরই একটি।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন কাফি একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক। তিনি গত এক শতাব্দীর সরকারী এবং নির্ভরযোগ্য নথীপত্র থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি সংকলিত করে আমেরিকায় vigilantism-এর সূত্রপাত এবং

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। Vigilantism-এর সঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় বিরল। এদেশেও চুরি-ডাকাতির প্রতিরোধে বা দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় যে ধরনের রক্ষীদল, অথবা অধুনাতম উদাহরণ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধে যে ধরনের সব সংগঠন গড়ে ওঠে, তেমনি ও-দেশেও গত শতাব্দীর মাঝামাঝি যেখানে যেখানে শাসনব্যবস্থা শিথিল ছিল, সেই সব জায়গায়, বিশেষত পশ্চিম প্রান্তে স্বর্ণ ও তৈল-সম্পদ সন্ধানীদের মধ্যে Vigilant Committee গড়ে ওঠে। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি বা অন্যান্য বিবাদে আদালতের বিচার প্রার্থনা করা দূরত্ব এবং অন্য নানা কারণে প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই অভাব পূরণের জন্যই এই ধরনের কমিটিগুলি আপাতদৃষ্টিতে বে-আইনী হলেও বিচারের ভার নিজেদের হাতেই তুলে নিয়েছিল। ১৮৫৬ সালে সানফ্রান্সিসকো নগরীর শাসনব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় একই উদ্দেশ্যে বিখ্যাত Sanfransisco Committee গঠিত হয়েছিল। সূত্রপাতে উদ্দেশ্য যতই ন্যায্য হোক, ক্রমপরিণতিতে এই Vigilantism বা প্রহরীবাদ যে রূপ নিয়েছে তাকে গুণ্ডারাজ বললে অসঙ্গত হয় না, যার উদাহরণ হল Ku Klux Klan জাতীয় সংগঠন। Vigilantism-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা বা অযোগ্যতার জন্য নিজেদের হাতে কর্তৃত্ব বা আইন তুলে নেওয়া। এই ধরনের মতবাদ বা সংগঠনকে উৎসাহিত করা দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অস্বাভাবিক। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে এই ধরনের আইন-উপেক্ষাকারী সংগঠনে বড় বড় কর্তাদের প্রকাশ্য যোগাযোগ ছিল এবং বর্তমানেও আছে। ("It is wellknown, however, that at its peak, the Ku Klux Klan enrolled Mayors, Governors, State Legislators, Members of Congress and Judges."—p. 16)

অধ্যাপক কাফি কর্তৃক উদ্ধৃত তথ্যগুলি আমাদের কাছে এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত করে যে, আমেরিকাতে শুধু সামাজিক অরাজকতাই বর্তমান তাই নয়, ও-দেশের সর্বোচ্চ শাসকমণ্ডলীও সময় সময় আইন-উপেক্ষাকারী vigilantism বা 'প্রহরী-বাজি'-র সামনে অসহায় বোধ করে। বস্তুত Senator McCarthy এবং House Un-American Activities Committee-র প্রতাপে কিছুদিন পর্যন্ত আইজেনহাওয়ারের মতো বিপুল ক্ষমতাশালী মার্কিন রাষ্ট্রপতিকেও কি পরিমাণ বিচলিত হতে হয়েছিল তা হয়তো অনেকেরই

স্মরণে আছে। Un-American Committee-ও যে একটি Vigilant কমিটি সে তথ্য বোধহয় সকলের জানা নেই ; অবশ্য অন্যান্য 'প্রহরী সংগঠন'-এর সঙ্গে এর তফাৎ এই যে, এই সংগঠন অনেকটা সরকারী সমর্থনপুষ্ট ছিল।

সেনেটর ম্যাক্কার্থির গুরু হলেন মিচেল পামার। এই মিচেল পামার উড্রো উইলসনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। পামার প্রগতিবাদীদের নির্মূল করার জন্য যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন তার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ অধ্যাপক কাফি উদ্ধৃত করেছেন। নিচে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :

> "The essential lawlessness of the procedure—arresting cltizens and aliens on suspicion of membership in an organization *thought* to be subversive, search and seizure without warrant, detention in incommunicado, delay and inadequacies in the hearings on deportation and so forth—these features illustrate how executive branch of government descended to methods of extra-legal trial and punishment. The courts so found."

মিচেল পামারের সন্ত্রাসরাজই সেনেটর ম্যাক্কার্থির নেতৃত্বে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আজও প্রচ্ছন্ন ভাবে হলেও সেই রাজই মার্কিন দেশে কায়েম। সর্বপ্রকার প্রগতিবাদী আন্দোলন ও সংগঠনকে বিনষ্ট করাই বর্তমানে মার্কিনী vigilantism-এর লক্ষ্য। এ সম্পর্কে ১৯২০ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐ সালে নিউইয়র্ক বিধানসভায় সম্পূর্ণ বৈধভাবে নির্বাচিত পাঁচজন সোশ্যালিস্ট সদস্যের সদস্যপদ খারিজ করে সভা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়, কারণ তাঁরা নাকি "রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী" দলের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের বহিষ্কৃত করার জন্য প্রচণ্ড জনমতের হল্লা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে অধ্যাপক কাফি কর্তৃক উদ্ধৃত Z. Chafee-র মন্তব্য থেকে আমরা মার্কিনী গণতন্ত্র সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারি :

> "Since the 15th day of June 1917 the nation had been led by its panic-stricken fear of adverse opinion to abandon one national tradition after another···. One

by one right of freedom of speech, the right of assembly, the right of petition, the right to protection against unreasonable searches and seizures, right against arbitrary arrest, right to a fair trial···had been sacrificed and ignored···. And now the waves of hysteria dashed against the very foundation of American life, the right of people to elect their own rulers."

বলা বাহুল্য যে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকার এই ছবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও বিন্দুমাত্র বদলায় নি। তার প্রচুর সাক্ষ্য আলোচ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। মার্কিনদেশে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বা শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায় না তা নয়, কিন্তু শাসকশ্রেণী এমন এক সমাজ ও সমাজ-মানসিকতার সৃষ্টি করেছে যার কাছে এই সব কণ্ঠস্বর অরণ্যে রোদন মাত্র।

যে প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল, কেনেডি-হত্যা এবং তৎপরবর্তী অসওয়াল্ড-হত্যা নিতান্তই সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ অহেতুক নয়।

প্রগতি-বিরোধিতা ছাড়াও মার্কিন 'প্রহরী-বাজি' নিগ্রোদলন ও অনুরূপ জাতি-বিদ্বেষের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অধ্যাপক কাফি নানা তথ্য ও ঘটনা উদ্ধৃত করে প্রহরী-বাজির নানা দিক তুলে ধরেছেন। ভারতেও এই ধরনের সম্ভাবনার আভাস যে আমরা পাই নি তা নয়। এই ধরনের বই তাই আমাদেরও সতর্ক করে দেয়।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা। করুণাসিন্ধু দে। দাম দু' টাকা।
মানুষ শহর সমুদ্র। কমলেশ সেন। দাম দু' টাকা।

আলোচ্য দুজন কবিই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখে বেশ পরিচিতি অর্জন করেছেন। এঁদের দুজনের দুখানি বই পড়ার পর কবিতা রচনায় এঁদের সচেতন প্রয়াস এবং নিষ্ঠা বেশ উপলব্ধি করা গেল।

করুণাসিন্ধু দে তাঁর এই গ্রন্থে ধৃত একষট্টিটি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিতে সার্থকতা দাবী করতে পারেন। অধিকাংশ কবিতাই ভাববৈশিষ্ট্য ও বর্ণনাভঙ্গির চমৎকারিত্বে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। ছন্দোব্যবহারে এবং শব্দচয়নেও কবির নৈপুণ্য লক্ষ্য করা গেল। অথচ, তাঁর কবিতার একজন আগ্রহী পাঠক হিসেবে একথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এ বই-এর প্রায় সবগুলি কবিতাই "ভালো কবিতা" হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্য স্বকীয় দীপ্তিমণ্ডিত "অবিস্মরণীয় কবিতা" হয়ে উঠতে পারে নি। কবিতাগুলি তাই সুখপাঠ্য হয়েছে মাত্র—মুখে মুখে আবৃত্তিযোগ্য পংক্তির সংখ্যা পরিমাণে অনেক কম। অথচ এই প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ কবির কাছে কয়েকটি প্রথমশ্রেণীর কবিতা আশা করা অসঙ্গত নয়।

কিন্তু কবির নিষ্ঠাবান অনুশীলনের যে ছাপ বইটিতে পাওয়া যায় তাও নিতান্ত সাধারণ স্তরের নয়; তরুণতম কবিদের মধ্যে এমন সনিষ্ঠ কাব্যপ্রচেষ্টা বড়ো একটা দেখা যায় নি। সেদিক দিয়ে তাঁর এই বই-এর প্রচার আরো বেশি কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই ভালো। পূর্ণেন্দু পত্রী রচিত প্রচ্ছদ বইটির মর্যাদা বাড়িয়েছে।

কমলেশ সেন আদর্শবাদী কবি। নিবিড় অস্তিত্ববোধ তাঁর এই বই-এর সংকলিত প্রত্যেকটি কবিতার উৎস। কবিতাগুলি গদ্যছন্দে রচিত। এবং পড়ে একথা মনে হল গদ্যছন্দের সার্থক প্রয়োগরীতি কবির আয়ত্তাধীন। শব্দচয়নেও তিনি গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু কবিতাগুলির মধ্যে কবির স্বকীয়তার পরিচয় বড় একটা পাওয়া গেল না। বক্তব্যের ক্ষেত্রে সিরিয়াস মনোভাবের প্রকাশ থাকলেও রচনারীতির দিক দিয়ে কোনো কোনো কবিতায় একজন অগ্রজ কবির অস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। যেমন —'বন্দুকের কুঁদোর মতো মানুষ' কবিতাটি। তা সত্ত্বেও মোটামুটি কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ ও সুখপাঠ্য। বিশেষ করে 'মহাকাব্য' 'প্রিয়তমা বধূ আমার',

'আত্মজকে', 'তোমার হাতে', 'পুতুলের সংসার' ও 'সন্দীপের গান' প্রভৃতি কবিতা বেশ ভালো রচনা। সাম্প্রতিককালে কিছু কবিযশঃপ্রার্থীর উদ্দাম চীৎকার ও যৌনবিকারগ্রস্ত প্রেমের ইয়াংকী-ধরনের বহিঃপ্রকাশের পাশাপাশি বলিষ্ঠ জীবনবোধে দীপ্ত, অস্তিধর্মী প্রত্যয়জাত এই কবিতাগুলি পাঠকের চিত্তে এক নতুন স্বাস্থ্যকর আস্বাদ এনে দিতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস। হরেন্দ্রচন্দ্র পাল। ডি. এম্. লাইব্রেরী। ৪·২৫

মুখে আমরা জাতীয় সংহতির কথা বলি, কিন্তু কার্যত আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে চিনি না। প্রতিবেশীদের ভাষা, সাহিত্য, আচার, ব্যবস্থা—আমাদের কাছে অজ্ঞাত। অথচ এইগুলোই তাদের মনে প্রবেশের দরজা। যতটুকু আমরা অন্য প্রদেশের লোককে জানি, তা ঘটনাচক্রে মাত্র। ভারতের গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত চৌদ্দটি ভাষার সাহিত্য আমাদের কাছে সম্পূর্ণ গ্রীক (নিজের মাতৃভাষা ছাড়া)। কিন্তু প্রতিদিন এই ভাষাগুলিতে আমাদের কোটি কোটি স্বদেশবাসীর মন মুখর হয়।

এ বিষয়ে বাংলাদেশের চিত্ত একটু উচকপালে। তার চোখ প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আড়ি করে বসে আছে। তার ভাব সাগরপারের দূর দেশের সঙ্গে। তাতে লাভ হয়েছে নিশ্চয়ই, সাগরপারের মণিমাণিক্য কিছু আমরা ঘরে তুলেছি। কিন্তু লোকসানও হয়েছে; দেশকে আমরা কম চিনেছি। সে ক্ষতি সামান্য নয়।

বাংলা ভাষায় ভারতীয় অন্য ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রায় চোখেই পড়ে না। এ হেন সময় প্রায় চারশো পাতার একটি উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস দেখলে বিস্মিত ও আনন্দিত হতে হয়। লেখক—হরেন্দ্রচন্দ্র পাল। মুসলমানরা নানা কারণে একটু উর্দুপ্রেমিক হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের অনেকের সময় কেটেছে কি করে বাংলার মধ্যে একটা আরবি শব্দ বসিয়ে দেব এই চিন্তায়। একটা মনীষা-সমৃদ্ধ বই লিখে বাঙ্গালীর সঙ্গে উর্দু সাহিত্যের পরিচয় ঘটাবার উত্তোগ তাঁরা কেউ দেখান নি। এই বিশেষ কাজের জন্যই ডঃ পাল প্রশংসার্হ। তিনি কৃতবিদ্য ব্যক্তি। তিনি ফারসি,

বাংলা ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এম. এ. এবং রুমী সম্পর্কিত গবেষণা করে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্‌। এই থীসিস্ কেম্ব্রিজের বিখ্যাত ইরানোলজিস্ট অধ্যাপক আরবেরীর অনুমোদিত। বাংলাতেও ডঃ পাল আগেই 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস' লিখে স্যার যদুনাথের মতো লোকের প্রশংসা পেয়েছেন এই ভাষায়: ডঃ পাল "একজন বিশেষজ্ঞরূপে প্রকৃত তথ্য দ্বারা বঙ্গভাষার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন।" এর পরে 'উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস' লিখে তিনি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর অভাব দূর করলেন। বিশাল এই গ্রন্থে লেখকের পাণ্ডিত্যের ও রসবোধের পরিচয় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে সুন্দর ও প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতার উদ্ধৃতি থাকায় স্বল্পজ্ঞানী পাঠকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হবে। উর্দু সাহিত্যে একেবারে আদি যুগ থেকে প্রায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত লেখক এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। বিপুল পরিশ্রমের স্বাক্ষর গ্রন্থের সর্বত্র। লেখকের এই প্রয়াস সর্বপ্রথম পুরস্কৃত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা। এই পুস্তক প্রকাশে সরকার বিশেষভাবে অর্থানুকূল্য দেখিয়েছেন। ফলে খুব সুলভ মূল্যে গ্রন্থটি প্রাপ্য। সরকারের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে যোগ্য লোকের ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

বাঙালী পাঠকদের উর্দু সাহিত্যের দিকে আকর্ষণ করবার জন্য অন্তত দুটি প্রলোভন সামনে উপস্থিত করা যায়।

প্রথমত, উর্দুভাষা কঠিন নয়। কেবল লিপির কথা বাদ দিলে আর্য-ভারতীয় বর্গের এ ভাষা প্রতিদিন হাটে-বাজারে শোনা হিন্দুস্থানী ভাষারই ঈষৎ মাজাঘষা রূপ।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যসম্পদের দিক থেকে বর্তমান ভারতে বাংলার পরেই বোধহয় আধুনিক উর্দু সাহিত্যের স্থান। সুতরাং কোনো সাহিত্যরসিক বাঙালী পাঠকই ঠকবেন না।

এ বই পড়তে পড়তে বার বার সেই পুরাতন কথাটা মনে হয়েছে: সারা ভারতের জন্যে কি একটি লিপি প্রবর্তন সম্ভব নয়? তা সম্ভব হলে কোনো আঞ্চলিক সাহিত্যই আর অন্য কোনো অঞ্চলের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে থাকত না। ঐ সাধারণ লিপির পথেই বিভিন্ন অঞ্চলের মনের আনাগোনা চলত।

ইকবাল হোসেন

পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৬৪

১৯৬১ সালে কলকাতায় সিনে ক্লাব পরিবেশিত প্রথম পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবে এই নতুন ঘরানার চলচ্চিত্ররীতি হঠাৎ আমাদের ধাকা দেয়। উৎসবের আগেই দেখা পাসেনভর্কারের 'আন্সার টু ভায়োলেন্স' এবং ওয়াইদার 'কানাল'-এর সঙ্গে এই নতুন ছবিগুলিকে মিলিয়ে দেখা মাত্রই পোলিশ সিনেমার স্বকীয় চরিত্রের একটা আভাস ধরা পড়ে। প্রথম দর্শনে এই ধারণা জন্মায় যে, বুদ্ধিনির্ভর চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পোলিশ চিত্রনির্মাতারা চলচ্চিত্রের ভাষাকে সহজ রেখেও চিন্তাসঙ্কুল পথে বিচরণ করতে ভয় পান না। ওয়াইদা নিজেই বলেন, "চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমি এক-একটা সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে চাই, গুরুত্ববহ সমস্যা তুলে ধরতে চাই, এবং সেই সমস্যাকে দর্শকমণ্ডলীর কাছে সহজে পৌঁছে দেবার জন্যই আমার ছবিকে তার বিশেষ রূপ দিতে হয়।" এ প্রয়াসে ভয় থাকে; চলচ্চিত্রের ভাষার বৈশিষ্ট্যের শক্তিতে দর্শকমনকে চিন্তার বৃত্তে বাঁধতে না পারলে সে মনকে প্রশ্নবিশেষের জটিলতায় বাঁধা যায় না। কিন্তু পোলিশ পরিচালকদের কৃতিত্ব সেইখানেই। ধূসর মনোলোকের পটভূমি (কাওয়ালেরোভিচ্-এর 'নাইট ট্রেন'-এর থীম্-সঙ্, 'অ্যাশেজ্ অ্যাণ্ড্ ডায়োমণ্ড্'-এ শেষরাত্রের নাচ-গান, 'কানাল'-এ পাওলিকাউস্কি অভিনীত সুরকারের ইন্‌ফার্নো-যন্ত্রণার কথা মনে আসে) এবং মাঝে মাঝে নির্মমতার চাবুক ('কানাল' বা 'অ্যাশেজ্ অ্যাণ্ড্ ডায়োমণ্ড্'-এর শেষ দৃশ্য স্মরণীয়)—এই দুয়ের সতর্ক প্রয়োগে তাঁরা দর্শকের মনকে ভাবনার শৃংখলায় বেঁধে রাখতে পারেন।

সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা আয়োজিত এবারকার দ্বিতীয় পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবেও (নিউ এম্পায়ার, ১৪-২০ ফেব্রুয়ারি) দেখা গেল, বিগত মহাযুদ্ধই এখনও পোলিশ শিল্পীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গক্ষেত্র। অথচ এ প্রসঙ্গক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের অভাব নেই; পরিচালকেরা এই সব চিত্রে যুদ্ধের বহুবিচিত্র তাৎপর্যকেই প্রকাশ করেছেন। নিছক মৃত্যু, ধ্বংস বা জয়-পরাজয়েই যুদ্ধের অর্থ সীমিত নয়। ওয়াইদা এবং মুক্ বারবার নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মহাসমরকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

এবারকার উৎসবে ওয়াইদার 'লোৎনা' (১৯৫৯) আধুনিক যুদ্ধে রোম্যান্টিক আর্তিকে স্থান দিয়েছে। সশস্ত্র ট্যাঙ্কের অমানুষিক অভিযানের

মুখে ঘোড়সওয়ারদের আক্রমণের মধ্যেই একটা ওল্ড ওয়র্ল্ড্‌ নস্ট্যালজিয়া ধরা পড়ে। শাদা ঘোড়াকে পাওয়ার সাধ এবং সেই স্বপ্নকে ঘিরে হিংসা, সন্দেহ এবং মৃত্যুর যে জাল রচিত হয়, তাতে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবিদের স্বপ্নসাধের কথাই মনে আসে। দৃশ্যপরিকল্পনায়ও এই কবিদেরই কণ্ট্রাস্টের রীতি—প্রচণ্ড যুদ্ধের টালমাটাল তাণ্ডবের মধ্যেই 'কাট্' করে শাদা ফ্রেম—এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে অন্য প্রান্ত থেকে প্রথমে ফ্ল্যাগস্টাফ এবং পরে ক্লোজ মিডিয়ম শটে আরোহীর প্রবেশ—তারপর ক্রমশ অপসৃয়মান লং শটে সমগ্র বাহিনীর আক্রমণ। ওয়াইদার রঙের ব্যবহার মূল তাৎপর্যে প্রবেশ করে। লাল রঙ, লাল আগুন, লাল ফুল, তামাটে পোশাকের মধ্যে শাদা ঘোড়া লোৎনা অন্য কোনো স্বপ্নের, অন্য কোনো জীবনের রূপকল্প হয়ে দাঁড়ায়। আতিশয্যবিহীন অথচ অর্থপূর্ণ দৃশ্যপরিকল্পনা ও রঙের সূক্ষ্ম কম্বিনেশন (লাল রঙ ও লাল চেরিফুল, শাদা ঘোড়ার পাশে ইভার শাদা পোশাক) ওয়াইদার ছবিতে এমন অর্থবহ হয়ে উঠেছে যে, ব্যক্তিগত অভিনয় এবং কাহিনীর টেন্‌শন এবারে গৌণ হয়ে গেছে। সেই কারণেই হয়তো 'লোৎনা'-র আবেদন 'কানাল' বা 'অ্যাশেজ্‌ অ্যাণ্ড্‌ ডায়মণ্ড্‌'-এর মতো সহজ ও ব্যাপক হয় নি।

মুঙ্ক্‌-এর 'এরোইকা' (১৯৫৮) দুটি ভিন্ন কাহিনীতে আধুনিক যুদ্ধে ব্যক্তিগত শৌর্যের চরিত্রকে পরীক্ষা করেছে। একালে যুদ্ধ এমনই অ্যানাক্রনিজ্‌ম্‌ যে শৌর্যের চরিত্র পাল্টে গেছে। মদের বোতল হাতে দজিদ্‌জিউসের বীরত্বে মহত্ব নেই, চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই; বউয়ের ভয়ে লড়াই করতে যাওয়াতেও সেই একই কথা। শৌর্যে যেন একটা মাতলামি কিংবা নিতান্তই ইম্‌পাল্‌সের প্রাধান্য। অথচ এই শৌর্যকে শৌর্য বলে মানতে ভুল হয় না। একটি ঢিবির পাশে উত্তেজিত সৈনিক ও সিভিলিয়নদের ছুটোছুটি এবং গোলাগুলির মধ্যে দজিদ্‌জিউসের অটল স্থৈর্য; শেষে মদের বোতল চুরমার, অথচ তখনও সেই শান্তি—প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যে স্থৈর্য; তারপর বিপৎসঙ্কুল শান্তির মধ্যে স্থৈর্য—সশস্ত্র ট্যাঙ্কও প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। এই দুটি দৃশ্যে টেন্‌শনের তারতম্যে শৌর্যের বিচিত্র প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় কাহিনীতে শৌর্য মিথ্যা 'মিথ্‌'। একদিকে জাউইস্‌টাউস্কির কাহিনী, অন্যদিকে সময় কাটানোর দুঃসহ প্রচেষ্টা; একদিকে ইয়ার্ডের ছককাটা ভূমিতে সুরহীন তালহীন নৃত্যের গতিতে বন্দীদের পদচারণা;

অন্তদিকে ছাদের উপর বয়লারের রাশের মধ্যে একটি মানুষ বিরাট মিথ্যার উপর বেঁচে আছে। এই মিথ্যা যে মাত্র একজনের কাছে স্পষ্ট সেই জাক্-এর নিঃসঙ্গতার সঙ্গে জাউইস্‌টাউস্কির নিঃসঙ্গতার মিল আছে; মিথ্যাকে চোখ ঠেরে এরা বাঁচতে পারে না। তাই দুজনের মৃত্যুই আত্মহত্যা এবং পরস্পর-সম্পর্কিত। মুঙ্ক্ নিজেই বলেন, "আমার মতে, চিত্রনির্মাতার তাঁর কাজের শৈলী বা রচনারীতিতে মনঃসংযোগ করা অর্থহীন। তিনি তাঁর সমগ্র দৃষ্টি প্রয়োগ করবেন, দর্শকের সঙ্গে যে সমস্যা আলোচনা করতে চান, তারই উপর।" ঘটনা, দৃশ্য ও চরিত্রের সূক্ষ্ম ইণ্টার-রেলেশনের উপর মুঙ্ক্ তাঁর ছবিকে দাঁড় করিয়েছেন।

রোমান পোলান্‌স্কির বহু-আলোচিত 'নাইফ্ ইন্ দি ওয়াটার' (১৯৬২) এবারকার উৎসবে যুদ্ধের পরিবেশমুক্ত একমাত্র পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি। পোলান্‌স্কি সমগ্র পরিকল্পনায় প্রতীকতার উপর নির্ভর করেছেন। সংলাপের মাধ্যমেও প্রতীকের ভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংলাপে প্রায় কবিতার মতো এক-একটি অংশ অনাবৃত প্রকৃতি ও অনাবৃত দেহের সেন্‌সুয়স্ পরিবেশে জীবন, প্রেম ও বিবাহের তাৎপর্যকে ধরতে যায়। প্রতীকরচনায় পোলান্‌স্কির আদি উৎস ইয়োরোপীয় চেতনায় ভবঘুরের ইমেজ-এ, এবং সেই ইমেজ্‌কে কেন্দ্র করে সংসারের স্থির নিরাপত্তা ও প্রেমের বাধাবন্ধনহীন মুক্তির দোটানায় (সিঙ্-এর 'দি শ্যাডো অফ্ দি গ্লেন' নাটকেরও উৎস এই চেতনায়)। রাস্তার মোড়ের অনিশ্চয়তায় কাহিনীকে শেষ করে পোলান্‌স্কি মিকোবরীয় আশাবাদের আশঙ্কা থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন। সময়ে সময়ে মানসিক সংঘাতকে শব্দের বিকৃত যান্ত্রিকতায় তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন (জলের শব্দ, নৌকোর শব্দ, পাখির কর্কশ ডাক)। গাড়ির সামনে অতর্কিত আবির্ভাব থেকেই যে সংঘাতের শুরু হয়ে গেছে, তাকে শান্ত অনড় আপাতস্বাভাবিক জীবনযাত্রার আড়ালে (ক্রিস্টিন ও আন্দ্রেই-এর উদ্ধত আত্মনির্ভর অন্তরঙ্গতা—আন্দ্রেই স্ত্রীকে তেল মাখিয়ে দেয়; আন্দ্রেই ও ক্রিসের গুণগুণানি; কিংবা কাঠি নিয়ে সেই খেলা) লুকিয়ে যে টেন্‌শন্ রচিত হয়, সেই টেনশন্ ক্রমশই তীক্ষ্ণ ও অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে, এবং সেই চাপা টেন্‌শন ছেলেটির জলে ডোবার অভিনয়ের মুহূর্তে বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। অতঃপর কাহিনীর প্রায় অবশ্যম্ভাবী গতি। টেন্‌শনের চরমবিন্দুর পরে আবশ্যিকতার ভিত্তিভূমিতে ক্রিস্টিন ও ভবঘুরে ছেলেটির প্রেমে এমন একটা কম্প্রস্পন্দনের ভাব

আছে, যাতে তার অতৃপ্তি ও অর্থহীনতা গোপন থাকে না। চুম্বনের পরেই লেকের লং শট্ এবং তারপরেই দুজনের দুটি হাফ ক্লোজ-আপে অতৃপ্তির বিষাদের ছায়া আছে। লিঅন নিয়েমজিকের অভিনয়ে ('নাইট ট্রেনে'র ডাক্তারকে চিনতে কষ্ট হয় না) এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি হয় যার প্রতি সহানুভূতি অনুভব না করে পারা যায় না, যাকে দোষী সাব্যস্ত করতে মন চায় অথচ পারে না। অভিনয়ের শক্তিতে এই জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় পোলানস্কি সমাজের টানাপোড়েনে ম্যারিওনেট্‌দের এই তিক্ত খেলার ইমেজ রচনা করতে পারেন।

উৎসবের বাকী ছবিগুলির মধ্যে 'বার্থ সার্টিফিকেট' ও 'প্যানিক্ ইন্ দি ট্রেনে'র মানবিকতা সহজেই স্পর্শ করে; প্রথমোক্ত ছবিটি মাঝে মাঝে অবশ্য সেন্টিমেন্টালিটির ধার ঘেঁষে যায়। 'বার্নিং মাউন্টেন'-এর দৈর্ঘ্য আক্ষেপের কারণ। অবশ্য মাঝে মাঝে ক্যামেরার চোখে চিত্রসদৃশ প্রাকৃতিক দৃশ্য ধরা পড়েছে।

গতবারের মতোই এবারও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিগুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইয়ান লেনিকার 'ল্যাবিরিন্থ্' সুর্রিয়্যালিস্ট শিল্পীদের রীতিকে চলচ্চিত্রে প্রয়োগ করেছে। শহরের স্থাপত্যে ও পরিকল্পনায় দে শিরিকোর মেটাফিজিকাল ছবিগুলিকেই যেন দেখা যায়। এই রীতির ধারা অনুসরণ করে লেনিকা যুদ্ধাশ্রয়ী এই সভ্যতার বীভৎসাকে প্রকাশ করেছেন। ডাইমেন্‌শনকে ভেঙে এবং বস্তু ও প্রাণীর অবয়বকে ভেঙে মিশিয়ে ম্যাক্স্ আর্ন্স্ট্, গ্রোৎস বা মাগ্রিৎ-এর মতোই লেনিকা সুর্রিয়ালিজ্‌ম্-এর দুর্বোধ্য জগতে পৌঁছে গেছেন। ইয়ান লোমনিকির 'পোলিশ সুইট' মূলত টুরিস্ট ছবির পর্যায়ে পড়লেও শব্দ ও গতির তারতম্যে স্থানে স্থানে বিস্ময়কর সার্থকতা লাভ করে। গিয়েৎর্স্-এর 'দি লিট্‌ল্ ওয়েস্টার্ন' কার্টুন ছবির রূপের মধ্যে থেকেও অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মেজাজকে ধরেছে।

মাকারজিন্‌স্কির দুটি ছবিই স্বতন্ত্র আবেদনের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আগের উৎসবে মধ্যযুগীয় ডান্‌স্ ম্যাক্যাব্র্-এর ফ্রেস্কো, বুখেন্‌ওয়াল্ডের কঙ্কালের সারি, মিউজিক হলের উদ্দাম নাচ-গান ইত্যাদি উপাদানের সুচিন্তিত সমাবেশ, গতির পরিবর্তন এবং শব্দের বৈচিত্র্যে রচিত 'লাইফ্ ইজ্ ওয়াণ্ডারফুল' দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবারে জানলায় অপেক্ষমান মুখকে ঘিরে অর্থদ্যোতক কম্পোজিশনে এবং 'অ্যাটেনশন, আতাসিয়োঁ, আখ্‌তুঙ্' শব্দত্রয়ের মুহুর্মুহু

উচ্চারণে 'নাইট' ছবির নায়িকাকুলের মনোজগৎকে রচনা করেছেন। 'দি ম্যাজিশিয়ান' ছবিতে স্টাইলাইজেশন প্রায় বর্জন করেও অভিনয়ের উপর নির্ভর করে, গুলিবিদ্ধ পুতুলের ইমেজ-এ বৈনাশিক যুদ্ধের রূপকে প্রতিষ্ঠা করে মাকারজিনৃস্কি একালের যুদ্ধের এক অর্থপূর্ণ রূপকল্প রচনা করেছেন। গিয়েৎ'স্ এবং পেরুস্কির 'অ্যাওয়েটিং' রেস্তোরাঁর টেবিলের উপর কাগজের ন্যাপ্‌কিন, অ্যাশ ট্রে, দেশলাইকাঠি, কফির কাপ, এবং একটি লাল ফুল—এই সামান্য উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে অপেক্ষমান প্রেমিকের দুশ্চিন্তার নাটককে প্রতিফলিত করেছে। কাজিমিয়েৎ'স্ কারাবাজের 'মিউজিক মেকার্স' বিষয়ে ও আঙ্গিকে কোনোভাবেই অভিনবত্বের দাবী করতে পারে না; তবে পরিচালকের পরিমিতিবোধের এবং শব্দচেতনার প্রশংসা করতে হয়; বেসুর থেকে সুরে অতিক্রমণ ও হার্মনির রচনাই ছবির বিষয়বস্তু।

পরিশেষে, সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাব। উৎসব উপলক্ষে বিশেষ সদস্য গ্রহণের যে রীতি তাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাতে বিরাট দর্শকমণ্ডলী ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সহযোগী হবার সুযোগ পাচ্ছেন। সিনে ক্লাবের সদিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম পরীক্ষা হয়তো পুরোপুরি সফল হয় নি। 'এরোইকা' চলাকালে যাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, সুইডিশ ছবি 'ফেস্'-এর মধ্যরাত্রে অ্যাটিকের ভাবগম্ভীর দৃশ্যে যাঁরা ইতর হাসি হেসেছেন, বিভিন্ন ছবি সম্পর্কে সু-উচ্চ কণ্ঠে উদ্ধত অর্বাচীন উক্তি করেছেন, তাঁরা চলচ্চিত্র উৎসবের সুস্থ আবহাওয়াকে নষ্ট করেছেন। সে-দোষ পুরোপুরি সংগঠকদের নয়।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লেখাপড়া

(সারা বিকেল দৌড়ঝাঁপ আর খেলাধুলো করে, সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বসে তন্দ্রায় ঢোলা আর সামনে বই খুলে রেখে ঘুমে কাতর হয়ে পড়া—ছেলেবেলায় এ অভিজ্ঞতা সর্বজনীন। সেই বয়সে আমরা কে-না ভেবেছি—ঘুমের মধ্যেই যদি পরদিনের ইস্কুলের পড়াটা হয়ে যেত, "হোমটাস্ক্"-এর অঙ্কগুলো সব আপনা-আপনি কষা হয়ে যেত, তাহলে কি মজাটাই না হত !

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়াশোনা করা সত্যিই সম্ভব কিনা—এ প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞান আজ রীতিমতো মাথা ঘামাচ্ছে। এক্ষেত্রে যেসব গবেষণা চলেছে, তার ফলে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার নাম 'হিপ্‌নোপেডিক্‌স্'—যার বাংলা প্রতিশব্দ করা যেতে পারে 'নিদ্রানুশীলন'—অর্থাৎ, নিদ্রিতাবস্থায় পড়াশোনা করা। এই প্রবন্ধে নোভোস্তি প্রেস এজেন্সির বিজ্ঞান-ভাষ্যকার ভি. মিলাশেভিচ বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।)

আজকের দিনে 'যান্ত্রিক শিক্ষক', সাইবারনেটিক শিক্ষাদানের যন্ত্র আর 'ইলেকট্রোনিক টীচার'-এর এই যুগে, স্কুলঘরে ঘুমের মধ্যে কিংবা সংবেশনের (হিপ্‌নোসিস) অবস্থায় শিক্ষাদানের ধারণাটাই অনেকের কাছে হাস্যকর বলে মনে হবে। কিন্তু বহু বিজ্ঞানীর মতে, "হিপ্‌নোপেডিক্‌স্" অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী। মানসিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে, নানা ধরনের বিমূর্ত ধারণার বিষয়ীকরণে এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে ও লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধারে 'নিদ্রা-চিকিৎসা'র এবং হিপ্‌নোটিক্‌স্ বা সংবেশনের কার্যকারিতা ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং এর ক্ষেত্রবিস্তার ঘটিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও একে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব।

.৯৪০ সালে কারাগান্দা শহরের পাভলফ মনোবিজ্ঞান ইনস্টিট্যুটের বিজ্ঞানী ডঃ এম. সিয়াদোশ্‌চ্ ইভান পাভলফের তত্ত্বকে কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করে ২৭০ জন নরনারীকে নিয়ে পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা চালান। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল—ঘুমের মধ্যে বাক্-বোধের (স্পীচ পার্সেপ্‌শন) শারীরবৃত্তগত প্রক্রিয়া অনুধাবন করা। ডঃ সিয়াদোশ্‌চ্-এর এই গবেষণাকে

বলা যেতে পারে নিদ্রানুশীলন বা হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌-এর ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। তিনি এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেন, তার ফলে ওই দুশোজন নরনারীর বুদ্ধির মাত্রা, শব্দভাণ্ডার, প্রকাশক্ষমতা ও বিশ্লেষণক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয়। অবশ্য সিয়াদোশ্‌চ্‌ তখন ওই দুশো ব্যক্তির শুধু নিদ্রিতাবস্থাতেই তথ্য সংগ্রহ করেন—টেপ রেকর্ডার, এন্‌কেফালোগ্রাফ (মস্তিষ্কের তরঙ্গ লিপি), কার্ডিওগ্রাফ (হৃদ্‌পিণ্ডের তরঙ্গলিপি) ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে। তিনি তাদের ঘুমের মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে, সেটা করেছিলেন তাদের সচেতন জাগ্রতাবস্থায়।

যুদ্ধের পর থেকে এ বিষয়ে বহু দেশেই বেশ ভালো রকম গবেষণার কাজ চলেছে। বর্তমানে হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌-এর অনুশীলনে দুটি প্রধান দিকের ওপরে জোর পড়ছে: স্বাভাবিক নিদ্রাকালে শিক্ষাদানের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা এবং সংবেশনের সাহায্যে ঘুম পাড়িয়ে সেই অবস্থায় শিক্ষাদানের পদ্ধতি।

একদিক থেকে, শিক্ষার্থীর নিদ্রিতাবস্থায় তাকে শিক্ষা দেওয়ার কাজটি সহজতর। কারণ, জাগ্রতাবস্থায় নিজের পরিবেশ সম্পর্কে সব সময়ে সচেতন থাকার ফলে তার মন বিক্ষিপ্ত হবার সুযোগও থাকে ঢের বেশি। সেই অবস্থায় শিক্ষকের প্রতি মনঃসংযোগ করার জন্যে তাকে বেশ কিছুটা মানসিক এনার্জি ব্যয় করতে হয়। নিদ্রিতাবস্থায় সেই চিত্তবিক্ষেপের কারণগুলি প্রায় থাকে না বললেই চলে। ঘুমের মধ্যে শিক্ষার্থীকে তাই কোনো পাঠ উপলব্ধি করার জন্যে ও স্মৃতিতে গেঁথে রাখার জন্যে ঢের কম প্রয়াস করতে হয় এবং অনেক কম মানসিক এনার্জি খরচ করতে হয়—যদি তার উপলব্ধির ক্ষমতাকে আর বোধশক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করে তোলা যায়। দেখা গেছে, যাদের অনুভূতি, বোধশক্তি ও স্মৃতিশক্তি স্বভাবতই উন্নত তাদের ক্ষেত্রে নিদ্রানুশীলন যেমন কার্যকরী, ঠিক তেমনি যারা এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর তাদের ওই গুণগুলিকে বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারেও হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌ বেশ সুফলপ্রসূ। বিশেষ করে যখন কোনো কিছুকে স্মৃতিতে গেঁথে রাখা একান্ত দরকার, তখন হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌ খুবই কাজ দেয়।

ইতিমধ্যে, উক্রাইনের বিজ্ঞান আকাদমির ভাষাবিজ্ঞান ইনস্টিট্যুটের বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে যেসব গবেষণা করেছেন, তার খুব উল্লেখযোগ্য ফলাফল জানা গেছে। এখানকার গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে নিদ্রাবস্থায় যেসব

তথ্য মাথার মধ্যে "ঢুকিয়ে দেওয়া হয়", মানবমস্তিষ্ক তার শতকরা ৯২ থেকে ১০০টি তথ্যই ধারণ ও আত্তীকরণ করতে সমর্থ। মোট ৫০০টি ক্ষেত্রে পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। একজন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র যেখানে ক্লাসে বসে পাঠ নিয়ে বছরে সবচেয়ে কমপক্ষে ২৫০টি বিদেশী শব্দ মনে করে রাখে, সেখানে সে সংবেশন দ্বারা হালকা ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় মাত্র ৬ থেকে ৮ ঘন্টার মধ্যেই ২০০ থেকে ৪০০ শব্দ স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌-এর প্রয়োগফল খুব আশাজনক। রোগীর নিদ্রিতাবস্থায় মৌখিক ভাবে তার রোগ নিরাময়ের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে সারিয়ে তোলার পেছনে মূল নীতিটা হল রোগীর মনে এক স্থায়ী অকাট্য বিশ্বাস জন্মে দেওয়া—যাকে শারীর-মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে 'ডাইন্যামিক ষ্টিরিওটাইপ' সৃষ্টি করা।

হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌-এর প্রসঙ্গে আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার। মানুষের বিশেষ বিশেষ বয়সে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রকাশ পায় এবং লোপ পেয়ে যায়। সকলেই জানেন, পরিণত ও প্রবীণ বয়সে নতুন করে কোনো বিদেশী ভাষা শেখা তাই কষ্টসাধ্য। হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌-এর সাহায্যে এই বয়সের বাধা বেশ সহজে অতিক্রম করা যায়। উক্রাইনের ভাষাবিদ্যা ইনষ্টিট্যুট যাঁদের নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সব বয়সের লোকই ছিলেন।

বলা বাহুল্য, হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌ এখনও পর্যন্ত নিতান্ত নতুন একটি বিজ্ঞান এবং নতুন বলেই, অসংখ্য তথ্য সংগ্রহের ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের অবকাশ আছে। অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও তাই এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে গবেষণায় নেমেছেন।

ঢোকরা শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন

ঢোকরা শিল্পকলার যে প্রদর্শনীটি কিছুকাল আগে অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় লোকসংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় শিল্প-ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সার্থক উদাহরণরূপেই তাকে চিহ্নিত করা যায়। নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় নক্সা কেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রীপ্রভাস সেন ঢোকরা শিল্পকলার নিদর্শনকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে, শিল্প এবং শিল্পীকে পুনরুজ্জীবিত করেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন।

বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এই ক্ষুদ্র শিল্পী-গোষ্ঠী স্মরণাতীতকাল থেকে যাযাবরের ন্যায় ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। বিশেষ করে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের সীমান্ত অঞ্চলেই ঢোকরা শিল্পীদের কয়েকটি ছোট গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিককালে এরা যাযাবরী বৃত্তি বহুলাংশে বর্জন করে নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসের চেষ্টাও করছে। বর্তমানে বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের কাছাকাছি একটি জায়গায়, বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে, আসানসোলে এবং উড়িষ্যা-মেদিনীপুরের সীমান্ত অঞ্চলে এই অবহেলিত, নিঃস্ব শিল্পী-সম্প্রদায়ের বসতি দেখতে পাওয়া যাবে। বাঙলা দেশে এই ঢোকরা শিল্পীদের সংখ্যা সমস্ত পরিবার মিলে অর্ধশতের সীমানা অতিক্রম করবে কিনা সন্দেহ। বাঙলা দেশ ছাড়াও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতেও এই ঢোকরা শিল্পীদের কয়েকটি গোষ্ঠী এখনো টিঁকে আছে। ঢোকরা শিল্পীদের কাজের ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য হয়তো আছে কিন্তু এদের পদ্ধতি-প্রকরণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অভিন্ন। এদের তাই বাঁকুড়া কিংবা আউশগ্রামের শিল্পী (বাঙলা দেশ), ময়ূরভঞ্জ (উড়িষ্যা), বস্তার (মধ্যপ্রদেশ) কিংবা দক্ষিণ ভারতের ঢোকরা শিল্পী নামে স্বচ্ছন্দে চিহ্নিত করা যায়।

ঢোকরা শিল্পীরা সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে যে-সব জিনিসের প্রয়োজন হয় মূলত সেই সব নিদর্শনই প্রস্তুত করে আসছেন। বংশ-পরম্পরায় এই ঐতিহ্যই এখনো পর্যন্ত অনুসৃত হচ্ছে। যে শিল্পবস্তুটি এঁরা গড়তে চান সে-সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেই তবে অগ্রসর হন। তাদের এই ধ্যান-তন্ময় শিল্পচেতনা সত্যি এক বিস্ময়ের বিষয়। এই সহজাত শিল্পচেতনা এবং তন্ময়তার সাহায্যে ঢোকরা শিল্পী তার ঈপ্সিত শিল্পবস্তুটির

আদল থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কিভাবে সেই বস্তুটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে হবে সে-সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা মনে মনে গড়ে নিতে পারেন।

ঢোকরা শিল্প-কর্ম প্রধানত ধাতব মূর্তিনির্মাণ পদ্ধতিরই এক বিশিষ্ট রূপ। অথচ ঢোকরা শিল্পীরা তাদের বিষয়বস্তু নির্মাণে কোনো ছাঁচের সাহায্য গ্রহণ করেন না। ঢোকরা শিল্পীরা প্রথমে এঁটেল মাটি আর তুঁষ মিশিয়ে সেই মাটির সাহায্যে ঈপ্সিত বস্তুর একটি কাঠামো গড়ে নেন। এই কাঠামোটিকে পরে দো-আঁশলা মাটির প্রলেপ দিয়ে মসৃণ করা হয়। তারপর তেল আর ধুনো জ্বালিয়ে, এক ধরনের পেস্ট প্রস্তুত করে, সেই পেস্টের তারের সাহায্যে যে বস্তুটি প্রস্তুত করা হবে তার নক্সা ধীরে ধীরে ঐ মাটির কাঠামোটির উপরে ঢোকরা-শিল্পী সযত্নে গড়ে তোলেন। এইভাবে মাটির কাঠামোটি তেল-ধুনোর পেস্টের তারে ঢেকে দেওয়ার পর গোবরমাটির প্রলেপে এবং তুঁষ-মাটি ও বালির আস্তরণে আচ্ছাদিত করে একটি বড় ছিদ্রপথ রাখা হয়। সাধারণত এই ছিদ্রটার মুখে পিতলের টুকরো ঢেলে গোটা বস্তুটাকে আগুনের উত্তাপে এমন ভাবে গরম করা হয় যাতে গলিত ধাতু ঐ ছিদ্রপথে প্রবেশ করে ধুনো বা মোমের তারকে ভস্মীভূত করে সেখানে নক্সা অনুযায়ী শিল্পরূপ সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'Lost wax process'। এই সমগ্র পদ্ধতিটার সঙ্গে অন্যান্য ধাতুমূর্তি নির্মাণ-পদ্ধতির পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে ঢোকরা-শিল্পী প্রতিটি শিল্পবস্তুর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নির্মাণ-পদ্ধতির সঙ্গে এককভাবেই যুক্ত থাকেন।

এই শিল্পীগোষ্ঠী এবং এদের সৃষ্ট শিল্প-নিদর্শন বাঙলার লোক-সংস্কৃতির এক পরম সম্পদ। একদা এদের কারু-নৈপুণ্যের স্বীকৃতিদানেও বাঙলা দেশ কার্পণ্য করে নি। বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে এদের অপূর্ব সুন্দর শিল্প-কর্মের নিদর্শন এখনো সযত্নে সংরক্ষিত। বাঙলার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, এমনকি লৌকিক ক্রিয়া-কর্মেও এদের শিল্পকর্মের নিদর্শন বহুল পরিমাণে একদা ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক দেব-মন্দিরে কিংবা সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারে ঢোকরা কামারের তৈরি দেব-দেবীর মূর্তি, কারুকার্যখচিত পঞ্চ প্রদীপ, কাজললতা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি ইত্যাদি একটু লক্ষ্য করলেই দৃষ্টিগোচর হবে বলে আমার ধারণা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চাপে ঢোকরা শিল্পীদের শিল্পকর্ম অনাদৃত হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁচেছিল যে, এই শিল্পী-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি স্বাধীনতার পরবর্তীযুগেও এইরূপ,

শিল্পী-গোষ্ঠীর সঠিক অবস্থান সম্পর্কেও আমাদের কোনো সম্যক ধারণা নেই। শুনেছি, আসানসোলে যে কয়টি ঢোকরা শিল্পী পরিবার এখনো পর্যন্ত বেঁচে আছেন বহু চেষ্টা করেও হস্তশিল্প সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় নক্সা কেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রীযুক্ত প্রভাস সেন তাদের সঙ্গে আজও কোনো যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন নি। এমনকি তাদের সঠিক অবস্থানও নাকি অজ্ঞাত। জনৈক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার স্বার্থে এই শিল্পী পরিবারগুলিকে নাকি এখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রেখে অবাধে শোষণ করে চলেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এই ঘটনা থেকেই আমরা ঢোকরা শিল্পীদের সামগ্রিক অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে, আউশগ্রাম, বাঁকুড়া কিংবা মেদিনীপুরের শিল্পী-গোষ্ঠীর দৈন্য-দশা বছর পাঁচেক আগেও ছিল বর্ণনাতীত। শ্রীযুক্ত প্রভাস সেনের কাছে শুনেছি, তিনি যখন এই শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন-মানসে বছর চারেক আগে আউশগ্রামের ঢোকরা পল্লীতে যান তখন গ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত, ক্ষুধাতুর এই মানুষগুলি দেখে তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন নি এরা আবার তাদের লুপ্ত শিল্প-ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে। কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তিনি তাঁর নক্সা কেন্দ্রে দুজন ঢোকরা শিল্পীকে নিয়ে এসে সমগ্র আউশগ্রামের ঢোকরা শিল্পীদের মনে নতুন উৎসাহ সঞ্চার করে তাদের দিয়ে অসাধ্য সাধন করছেন। নক্সা কেন্দ্রের সরবরাহকৃত উপাদানে, উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিবেশে এইসব ঢোকরা শিল্পীরা যে সব আশ্চর্য শিল্পসম্ভার প্রস্তুত করেছেন মূলত তাই ছিল এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে দ্রষ্টব্য নিদর্শন। একটি লুপ্তপ্রায় শিল্প-ঐতিহ্যের এই পুনরুজ্জীবন নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় ঘটনা।

এই প্রদর্শনীর নিদর্শনের মধ্যে বাঙলার ঢোকরা শিল্পীর হাতে গড়া গণেশ, পঞ্চপ্রদীপ, সন্ধ্যামণি প্রদীপ, কৃষ্ণ, শিব, কৃষ্ণলীলা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি ইত্যাদির পাশাপাশি উড়িষ্যা ও বস্তারের ঢোকরা শিল্পীদের শিব-সুন্দরী, রাম, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-দেবীর অপূর্ব কারু-নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। লৌকিক শিল্প-চেতনার এমন বলিষ্ঠ স্বাক্ষর সত্যিই দুর্লভ। উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা পেলে বাঙলার অন্যান্য লুপ্তপ্রায় শিল্প-ঐতিহ্যকে যে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, এই প্রদর্শনী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমাদের অন্ধ ভাগ্যবিধাতারা কি এ-পথে অগ্রসর হবেন?

নিখিলেশ দাশের চিত্রকলা

সম্প্রতি পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে তরুণ শিল্পী নিখিলেশ দাশের প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীতে তেলরঙ ও জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত তাঁর চুয়াল্লিশখানি চিত্র-নিদর্শন আমরা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। শিল্পী দাশ এই প্রদর্শনী উপলক্ষে এক ঘোষণায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করে লিখেছিলেন: "আমি মত্ততাকে আলিঙ্গন করতে চাই—মত্ততার মুক্ত রৌদ্রে অবগাহন করতে চাই,…বস্তুবাদিতা বা প্রত্যক্ষবাদিতার কোনো গভীর অর্থ নেই। মানুষের ভিতর যে চরমবস্তু আছে তারই সঙ্গে বোঝাপড়া করে আত্মসমর্পণ করতে হয়…" ইত্যাদি।

শিল্পী দাশের এই উপলব্ধি নিঃসন্দেহে তাঁর তারুণ্যেরই শুভ সূচনার স্মারক। এবং এ-কথাও ঠিক যে, বাঙলার তরুণ শিল্পীরা চিত্রবিদ্যার প্রথাগত রীতি পরিত্যাগ করে বিমূর্ত চিত্ররচনার দিকে যেভাবে ক্রমধাবমান তাতে শিল্পী দাশ তাঁর বক্তব্য এবং চিত্র রচনায় যদি সে-দিকে আকৃষ্ট হন তবে তাঁকে খুব বেশি দোষ দেওয়াও যায় না। প্রকৃতপক্ষে শিল্পী নিখিলেশ দাশ বিমূর্ততারই পূজারী। তাঁর প্রদর্শিত চিত্রে এই চেতনা স্পষ্টভাবেই বিধৃত। কিন্তু অবয়ব ভাঙতে গেলে অবয়ব গঠন সম্পর্কে যে দক্ষতার দরকার, বিমূর্ত শিল্প-চেতনায় অবগাহন করতে হলে মূর্ততার যে সম্যক ধারণার একান্ত প্রয়োজন তার আভাস কিন্তু শিল্পী দাশের চিত্রে সহজলভ্য নয়। তাঁর তেলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রের জমিন সৃষ্টি কিংবা নক্সা সাজানোর কাজে মুন্সিয়ানা থাকলেও সব মিলে চিত্র-বক্তব্য কিন্তু আমাদের তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। অবশ্য তাঁর ১৬,২০, ও ২২ নং চিত্রের ভাঙা অবয়ব সংস্থাপন মন্দ নয়। ১নং চিত্রের জমিন সৃষ্টিতেও শিল্পীর দক্ষতা প্রশংসনীয়। তেলরঙের চিত্রের তুলনায় শিল্পীর জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রের কাজ তুলনামূলকভাবে ভালো। কারণ, জলরঙের কাজে তিনি অবয়বের কিঞ্চিৎ আভাস যেমন চিত্রপটে তুলে ধরেছেন তেমনি অনেকগুলি চিত্রে তাঁর বর্ণপ্রয়োগের কৌশলও দৃষ্টিসুখকর। জলরঙের চিত্রগুলির মধ্যে ২৪, ২৫, ৩১ ও ৩২ নং চিত্র আমাদের ভালো লেগেছে।

আশা করি তরুণ শিল্পী নিখিলেশ দাশ ভবিষ্যতে আমাদের আরও সুন্দর চিত্রকলা উপহার দেবেন।

ধনঞ্জয় দাশ

সংস্কৃতি-সংবাদ

১৯৬৪ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া আইন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য শ্রীবিধুভূষণ মালিক নতুন একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করেছেন। ১৯৫১ সালের এ্যাক্ট অনুযায়ী এগার বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়েছে। ফলে এই আইনের সুবিধা-অসুবিধা বিচার করবার যথেষ্ট সুযোগ শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ পেয়েছেন। ১৯৫৩ সালের আইন অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন পুনর্গঠিত হল তারপর বাংলাদেশের শিক্ষাজগতের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কলেজের সংখ্যা ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা স্ফীত হচ্ছে। সরকারী দাক্ষিণ্যের পরিমাণ ও মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্য অনেকখানি বেড়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও 'বহিরঙ্গ' (External) প্রার্থী হিসাবে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন পরীক্ষায় বসেছে, অনেকে পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা কিম্বা সার্টিফিকেট পেয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে দেখা গেছে নানা ধরনের অসঙ্গতি। অসংখ্য 'অথোরিটি', অসংখ্য বোর্ড ও কাউন্সিল, তারপর সিনেট, সিণ্ডিকেট, আকাডেমিক কাউন্সিল হয়ে আইনত সিদ্ধান্ত নিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে বেগ পেতে হয়েছে, দক্ষতার সঙ্গে ও দ্রুততালে কাজ করার পথে দেখা দিয়েছে নানা বাধা। ফলে নতুন আইনরচনার প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক ভাবেই উঠেছে।

শ্রীযুক্ত মালিক যে খসড়া আইনটি রচনা করেছেন সে আইনটির অন্তর্নিহিত নীতিগুলি তিনি ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের শিক্ষাব্রতীদের রিপোর্ট থেকে গ্রহণ করেছেন। সংক্ষেপে নীতিগুলি এই :

১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাজগতের নেতৃত্ব নিতে হবে, নতুন দায়দায়িত্ব, বিশেষত কলেজীয় স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার বিবিধ দায়িত্ব নিতে হবে।

২। ১৯৫১ সালের আইনের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি নতুন আইনের সাহায্যে ঢেলে সাজাতে হবে। এই পুনর্বিন্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে একদিকে নানা কর্তৃত্বের নানা বিধি-বিধানের গোলকধাঁধা থেকে যেমন নিষ্ক্রান্ত হতে হবে তেমনি বিভিন্ন স্তরে সহজ, সরল, সুস্পষ্ট বিধি-বিধানের সাহায্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, ফাংশনাল গণতন্ত্র চালু করতে হবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এই ব্যবস্থায় নীতিনির্ধারক, উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে কাজ করবে, প্রয়োজনমতো সিণ্ডিকেটের ও অন্যান্য সংস্থার কার্যকলাপের পর্যালোচনা করবে কিন্তু কার্যকরী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে না।

৪। সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সংস্থা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনব্যবস্থার ভার সিণ্ডিকেটের উপর ন্যস্ত হবে।

৫। আকাডেমিক কাউন্সিল শুধু শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে গঠিত হবে এবং শিক্ষা বিষয়ে এই সংস্থার বক্তব্যই শেষ বক্তব্য হবে।

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্বিন্যাসে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রাজনীতির অবৈধ প্রভাব যেন না পড়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত কোনো সংস্থাও যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারায় হস্তক্ষেপ না করে।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারায় কলেজীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে, স্নাতকোত্তর ও প্রাক্-স্নাতক, এই দুই পর্যায়ের শিক্ষাকেই সম-মর্যাদা দিতে হবে।

এইসব নীতির উপর নির্ভর করে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মালিক যে খসড়া আইন রচনা করেছেন তার রূপরেখা এই প্রকারের :

অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
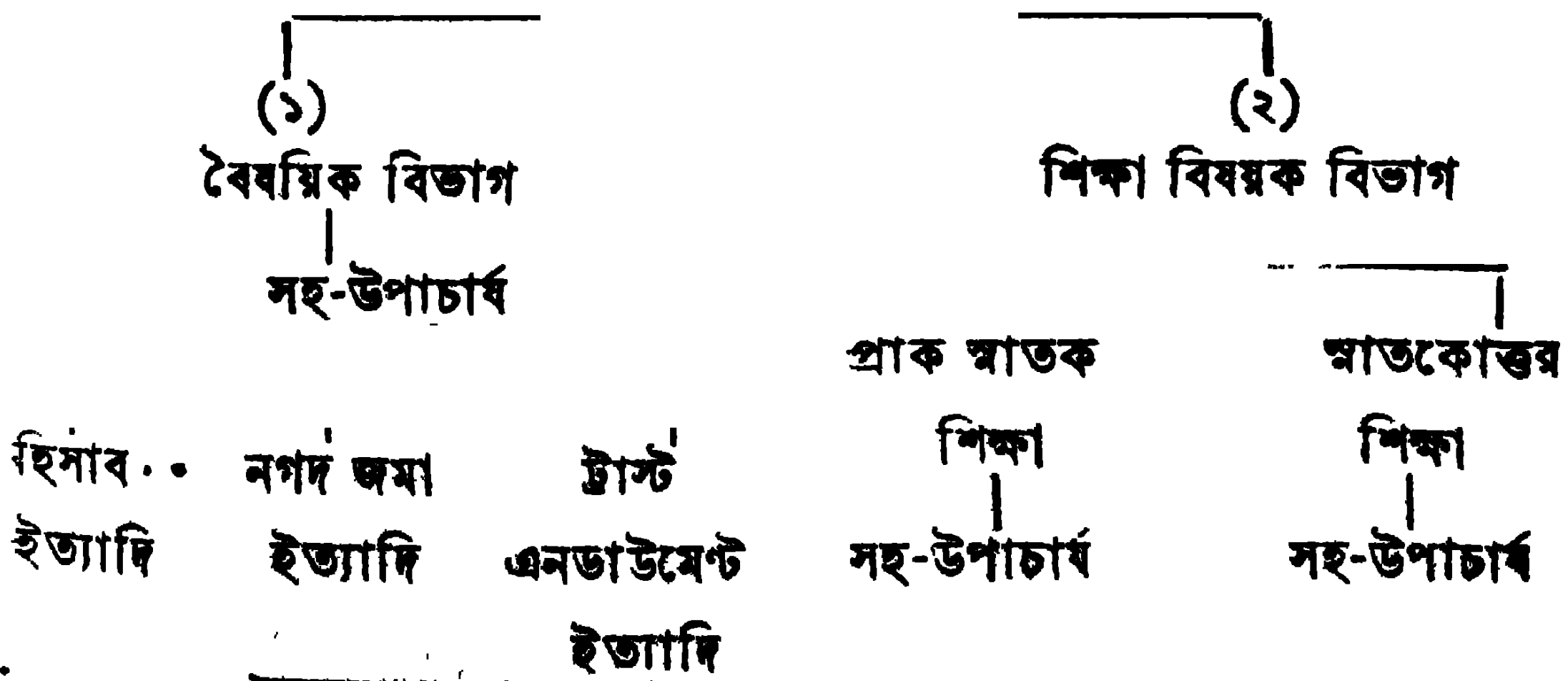
ফ্যাকাল্টিসমূহ

প্রাকস্নাতক কলেজ
কাউন্সিল যথা
কলা, বিজ্ঞান, কারিগরি,
চিকিৎসা ইত্যাদি
বোর্ড অব স্টাডিজ্

স্নাতকোত্তর কলেজ
কাউন্সিলসমূহ
যথা কলা, বিজ্ঞান
কারিগরি ইত্যাদি
বোর্ড অব স্টাডিজ্

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বাঙলাদেশ এ বছর আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করছে।

উনিশ শতকের রেনেসাঁস বা নব-জাগরণের পূর্ণ পরিবেশে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম, সে পূর্ণতার আভাস নিয়ে তিনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। তাই, রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক কার্যকারণেই তিনি ছিলেন 'পরিপূর্ণ মানুষ'। তিনি ছিলেন—বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছিলেন: "দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানবচিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল।"

সেই ত্রিবেণী-সঙ্গমের পূর্ণতর পরিচয়ও নিশ্চয়ই প্রয়োজন—সেই জন্য এই প্রস্তাব।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞানশাখার সভাপতির অভিভাষণে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন: "বাংলা ভাষার এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে। কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। আমাদের বাংলা ভাষা বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র হউক এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞানবিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।" তৎকালীন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-প্রচার ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধরচনা করা যে সম্ভব, তিনিই তা প্রমাণ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে সে যুগের শ্রেষ্ঠ ছাত্র আচার্য

রামেন্দ্রসুন্দর শুধু অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই লেখেন নি, তাঁর লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের একই পঙক্তিতে ন্যায়সঙ্গতভাবেই স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনায় আড়ষ্টতা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই—সে লেখা হাস্যময়, কৌতুকময়, উচ্ছল উদ্বেল তার গতি। তাই, রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম-পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বলেছিলেন: "আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরসে চিরসঞ্চিত। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর,—হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।"

আচার্য রমেন্দ্রসুন্দরের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'প্রকৃতি'। তারপর 'জিজ্ঞাসা' 'কর্মকথা', 'চরিতকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'শব্দকথা', 'বিচিত্র জগত', 'যজ্ঞকথা', 'নানাকথা', 'জগতকথা', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

সরকারী চাকুরী নিলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, তাই রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে অধ্যাপকের কাজ নিলেন। পরে অবশ্য অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তিনি 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পুস্তিকা লেখেন। তাতে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে একতাবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের হীন কৌশলকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার জন্য বাঙলার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশপ্রেমিক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙলা দেশকে হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমিরূপেই জেনেছিলেন। আজকের বিভক্ত বাঙলায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরকে নতুন করে স্মরণ করা প্রয়োজন।

চিররুগ্ন রামেন্দ্রসুন্দর কখনও সংগ্রামে বিমুখ ছিলেন না। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সংগ্রাম করার ক্ষমতারও সীমা আছে।

১৯১৯ সাল। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর মৃত্যুশয্যায়। ডায়ারের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এলেন। শয্যার পাশে বসে তাঁকে এই খবর জানালেন। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ফলে তিনি তখন খুবই উত্তেজিত। এই উত্তেজনার রেশ কাটিয়ে উঠবার আগেই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন : "আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।"

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

গ্যালিলিও স্মরণে

এ বছর পৃথিবীর দুজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে। একজন শেক্সপীয়র, অন্যজন গ্যালিলিও গ্যালিলি। ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান নায়ক গ্যালিলিও—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বপ্রধান অবদান পরীক্ষামূলক বিচারপদ্ধতি ও আঙ্কিক বিশ্লেষণের প্রবর্তন।

১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইটালীর পিসাতে গ্যালিলিওর জন্ম। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে গ্যালিলিও ধর্মশাস্ত্রে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ কাজ হয় নি। সঙ্গীত ও চিত্রকলা ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। কিন্তু সে বৃত্তিও তার গ্রহণ করা হল না। ডাক্তারি পড়তে শুরু করলেন এরপর। এই সময়েই তাদের পরিবারের পরিচিত একজন অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের কয়েকটি ক্লাসে যোগ দেবার সুযোগ তিনি পান। মুগ্ধ হলেন তিনি, শুরু হল মনের বিরাট পরিবর্তন। ডাক্তারি পড়ায় আনন্দ আর পান না, গণিতের অধ্যয়ন-বাসনাই প্রবল হয়ে উঠল। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী ও গণিতবিদের জীবনের সূত্রপাত এভাবেই হয়েছিল।

গ্যালিলিও ক্রমে এ্যারিস্টটল, টলেমি ও অন্যান্যদের বস্তু ও প্রকৃতিজগৎ সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার বিরোধী হয়ে উঠছিলেন। শুধু মনের ধারণাপ্রসূত বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব, গ্যালিলিও তাকে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। তাঁর মতে বাস্তব পরীক্ষা ও গাণিতিক যুক্তিকাঠিন্যই একটি তত্ত্বের সমর্থনের ভিত্তি বলে বিবেচিত হতে পারে।

পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে গ্যালিলিও পতনশীল বস্তুর সমস্যাদি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। অ্যারিস্টটেলীয় মতে, বায়ুমণ্ডলে উড্ডয়নশীল একটি বস্তুর গতির মূলে রয়েছে, বস্তুটির ওপর বায়ুর ক্রমাগত চাপসৃষ্টি। গ্যালিলিও তাঁর পরীক্ষা শুরু করলেন এই ধারণার ভিত্তিতে যে একটি উড্ডয়নশীল বস্তু তার গতিসৃষ্টির সূচনা থেকেই চলবার বেগ লাভ করে থাকে। তিনি ভূমিতলের সঙ্গে বিভিন্ন গতি-বিশিষ্ট ঢালুক্ষেত্রের গা বেয়ে নানা ওজনের ছোট

ছোট গোলাকার বস্তুকে গড়িয়ে যেতে দিলেন ; তারপর তাদের সেই ঢালুতলের গা বেয়ে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দেখলেন কতটা উচ্চতায় তারা গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। এখানে গ্যালিলিও পরীক্ষা করছিলেন সম্পূর্ণ একটি আধুনিক পদ্ধতিতে, যার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল এমনভাবে যাতে গাণিতিক পরীক্ষাকাজ চালানোর মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়। গাণিতিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রতি গ্যালিলিওর এই যে আকর্ষণ, তা তাঁর 'Il saggiatore' গ্রন্থের এক জায়গায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

"Philosophy is written in that vast book which stands forever open before our eyes, I mean the universe ; but it cannot be read until we have learnt the language and become familiar with the characters in which it is written. It is written in mathematical language, and the letters are triangles, circles and other geometrical figures, without which means it is humanly impossible to comprehend a single word."

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্যালিলিওর অবদান ছিল পূর্ববর্তী সমগ্র ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহ। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় হল্যাণ্ডে। আট বছর বাদে গ্যালিলিও নিজের হাতে আরো উন্নত, সমৃদ্ধ রূপে যন্ত্রটিকে তৈরী করলেন। গ্যালিলিও ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ, যার দৃষ্টিতে দূরবীণের মাধ্যমে মহাকাশের বিরাট ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত হল। সূর্যবক্ষে সৌরকলঙ্কের সন্ধান পেলেন তিনি ; মহাজাগতিক বস্তুর দেহেও পরিবর্তন সূচিত হতে পারে—গ্যালিলিওর এই আবিষ্কার ছিল মধ্যযুগীয় চার্চের প্রচারিত তত্ত্ববিরোধী। গ্যালিলিওর দূরবীণে ধরা পড়ল বৃহস্পতির চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান চারটি চাঁদের অস্তিত্ব। গঠনগত বিচারে পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদ ও শুক্রের অনেক মিল তিনি খুঁজে পেলেন—অ্যারিস্টটলের ধারণায় যা কোনোমতেই হওয়া উচিত নয়, যে-বিচারে প্রতিটি মহাজাগতিক বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে গড়া এবং পরিবর্তনহীন। বহু নতুন নক্ষত্রলোকেরও সন্ধান পেলেন গ্যালিলিও। তাঁর সমগ্র আবিষ্কার কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক জগতের যে ধারণা, তাকে আরো শক্তিশালী করে তুলল। ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী মত প্রচারের জন্যে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও অভিযুক্ত হলেন। এবারের মতো তিনি রেহাই পেলেন,

তবে কোপার্নিকাসের অনুকূলে যেন তিনি কোনো মত প্রকাশ না করেন সেভাবে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হল।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে Two principal systems নামে গ্যালিলিও একটি বই প্রকাশ করেন—যেখানে তিনটি চরিত্রের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে কোপার্নিকাস ও টলেমি, উভয়ের বিশ্ববিন্যাসের গুণাগুণ সম্বন্ধে যুক্তিবহুল আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। (গ্যালিলিও তাঁর সব বই ল্যাটিনের পরিবর্তে ইটালীয়ান ভাষায় লিখতেন, যাতে অনেক বেশি মানুষ সহজে তার বক্তব্য গ্রহণ করতে পারেন।) খুব কৌশলে কোপার্নিকাসের তত্ত্বকেই জয়যুক্ত করা হয়, যদিও তা ছিল খুবই প্রচ্ছন্ন। গ্যালিলিও আবার চার্চের কোপদৃষ্টিতে পড়লেন। বিরাট বিচার হল তাঁর। সে বিচার নিয়ে বহু কাহিনী রচিত হয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গ্যালিলিও স্বগৃহে অন্তরীণ হয়ে থাকবার শাস্তি পেলেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোনো গবেষণা-কাজ তাঁর পক্ষে হল নিষিদ্ধ! তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ নিয়ে বহ্যুৎসব করা হল।

অন্তরীণ অবস্থায় গ্যালিলিও গতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষ নয় বৎসর গ্যালিলিওর দুঃখকষ্টে কেটেছে। শেষ অবস্থায় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ৮ই জানুয়ারী ১৬৪২ সালে ৭৭ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী

পরিচয় ভাদ্র (বিশেষ সমালোচনা) সংখ্যায় শ্রীস্বকুমার মিত্রের লেখা "লাফার্গ দম্পতি" প্রবন্ধটিতে একটি মন্তব্য পড়ে আশ্চর্য হলাম। তিনি লিখেছেন যুগো ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। জানিনা তিনি এই খবরটি কোত্থেকে সংগ্রহ করেছেন। যৌবনে রাজতন্ত্রের সমর্থক থাকলেও যৌবনোত্তর জীবনে তাঁকে আমরা গণতন্ত্রের স্বপক্ষেই সবসময়েই পেয়ে এসেছি। যুগোর সাহিত্যেও কোথাও রাজতন্ত্রের সমর্থন-সূচক কোনো কিছু পাওয়া যায় বলে আমার জানা নেই। অন্তত Les Miserables, Ninety-Three এবং কবিতাবলীতে নয়। ফরাসী রিপাবলিকের সমর্থক বলেই তাঁকে আমরা জানি। তা ছাড়া তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য যেসব বই পড়েছি তাতেও শ্রীমিত্রের মন্তব্যের সমর্থনসূচক কিছু চোখে পড়ে নি আমার। Andre Maurios লিখিত Victor Hugo বইটিতে আমার বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। 1848 সালে লুই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে Hugo-র চেহারাটা দেখা যাক :

> "He (Hugo) admitted that he had long hesitated before accepting the Republic but that then, seeing it 'treacherously seized, bound, pinioned and gagged', had fallen to his knees in front of it. 'Be careful, he was told, 'you will share its fate'—"All the more reason', he replied, "for my acting as I am doing ! Republicans, open your ranks and let me in ! I am one of you !"

এ ছাড়া আরও আছে—বাহুল্যবোধে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করলাম না। এ-সম্পর্কে গর্কির Articles and Pamphlets-এর 'La Belle France' রচনাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা বোধহয় অযৌক্তিক হবে না। রচনাটি পড়ার পর যুগোকে রাজতন্ত্রের সমর্থক বলে কিছুতেই মনে করতে পারি না। যেভাবে জনগণের ফ্রান্সকে যুগোর ফ্রান্স বলে গর্কি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তাতে যুগোকে গণতন্ত্রেরই বন্ধু বলে মনে হয়। একই সঙ্গে রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং গণতন্ত্রের বন্ধু হওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই।

১৮৭১ সালে প্যারী কমিউনেও তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। এর সমর্থনে পণ্ডিত

নেহেরুর 'Glimpses of World History' থেকে উদ্ধৃতি দিলে বোধহয় আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হবে :

> "He had a varied career both as a writer and as a politician. He started life as an aggressive royalist and almost a believer in autocracy. Gradually he changed step by step till he became a republican in 1848. Louis Napoleon, when he became president of the short-lived Republic, exiled him for his republican views. In 1871 Victor Hugo favoured the the Commune of Paris. From the extreme right of conservatism he had moved gradually but surely to the extreme left of socialism."

এর পরেও কি বিশ্বাস করতে হবে যে য়ুগো রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন? য়ুগো বুর্জোয়াদের (শুধুমাত্র বুর্জোয়া ?) প্রিয় ছিলেন বলেই পল লাফার্গের সূত্র অনুযায়ী তাঁকে রাজতন্ত্রের সমর্থক হতেই হবে? লাফার্গের য়ুগো সম্পর্কিত কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক পত্রের ব্যাখ্যার জন্যে তাঁকে রাজতন্ত্রের সমর্থক হতে হল এটাই আশ্চর্য! আর লাফার্গের ব্যাখ্যাই যে অভ্রান্ত তারই বা প্রমাণ কোথায়? তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলে নস্যাৎ করে দেবার একই ভ্রান্ত নীতিতে এই ধারণার মূল অনুসন্ধান করতে হবে।

শ্রীকুমার সেন

শেক্সপীয়র সংখ্যা

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ১০
বৈশাখ, ১৩৭১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট—সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

উইলিয়ম শেক্সপীয়র

জন্ম : ২৩শে এপ্রিল, ১৫৬৪ মৃত্যু : ২৩শে এপ্রিল, ১৬১৬

শেক্সপীয়র-স্মরণে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধু পারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন ; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছু কাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গনে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠেনি জেগে কবিসূর্য-বন্দনা-সঙ্গীতে।
তারপর ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে ;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্র দেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া ; তাই হেরো যুগান্তর-শেষে
ভারত সমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেল কুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

বাঙালীর শেক্সপীয়র প্রেম

'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি'—এই বলিয়া শেক্সপীয়রকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের একজন প্রধান কবি। ভারত সাম্রাজ্য ও শেক্সপীয়রের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলে ইংল্যাণ্ড শেষোক্তকেই বাছিয়া লইবে কারলাইলের এই ব্যবসাদারী হিসাব অপেক্ষা ইংল্যাণ্ড ও ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূক্ষ্মতর উপলব্ধি প্রতিভাত হইয়াছে এই বাক্যে। ইহা তো সুবিদিত বঙ্গীয় রেনেসাঁস এমন এক কূলপ্লাবী ভাবাবেগের ফল যাহাতে দুইটি লক্ষ্য একাকার হইয়া গিয়াছিল। তাহার একটি হইল পশ্চিম হইতে আনীত নতুন বিজ্ঞান ও মানববাদের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠা আর অপরটি পরাধীনতা সম্পর্কে তেমনই সুতীব্র জ্বালাবোধ যাহারই ফল পরিণাম ভারতের অতীত গৌরবের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত। শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে কালিদাসের উল্লেখ তাই আকস্মিক নয়। নাট্যকার হিসাবে কালিদাসও বিশ্ব-পরিচিতি দাবি করিতে পারেন। গ্যয়টে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠতম শ্লোকে কালিদাসের 'শকুন্তলা'র প্রতি এই বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন :

Willst du die Blute des fruhen
    die Fruchte des spateren Jahres,
Willst du was reizt und entzuckt
    willst du was sattigst und nahrt,
Willst du den Himmel, die Ende,
    mit einen Namen begreifen
Nenn'ich Sakuntala, Dich
    und so ist Alles gesaget.

(কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।)*

বাঙালী কবির কাছে অবশ্য কালিদাস তাঁর শত মাধুর্য সত্ত্বেও বিগত যুগের প্রতিনিধি, শেক্সপীয়র মহত্তর কেননা তাঁর রচনায় জীবন্ত বাস্তবের হৃদস্পন্দন অনুভব করা যায়।

শেক্সপীয়র সম্পর্কে এই গভীর শ্রদ্ধা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম চারিত্র্য-লক্ষণ আর তা পুষ্ট হইয়াছিল কলিকাতা হিন্দু কলেজ ও তার শিক্ষার প্রভাবাধীনে। আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অনিবার্য সীমা নির্দেশক হইল এই শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা। "হিন্দু সম্প্রদায়ের শিশুদের উদারনৈতিক শিক্ষা দানের" জন্য বহু ব্যক্তির চাঁদায় এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। পরিকল্পনাটির প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি ইহার সমর্থনে দাঁড়ান নাই। তাঁহার ভয় ছিল তাহা হইলে "রক্ষণশীল দেশবাসীর সংস্কার আহত হইবে এবং তাহার ফলে সমগ্র কাজটিই পণ্ড হইবে।" ১৮১৬ সালের ২৭শে আগস্ট দাতাদের এক সাধারণ সভায় পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেটা ছিল শেক্সপীয়রের মৃত্যুর দ্বিতীয় শতবার্ষিকী বৎসর। মাত্র কুড়িজন ছাত্র লইয়া কলেজটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় সোমবার, ২০শে জানুয়ারি, ১৮১৭। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের তখন দুইটি ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। তাহার মধ্যে ইংরাজী ছিল আবশ্যিক। ফলতঃ পরবর্তী দশ বছরে ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার হইল। ১৮২৭ সালে কলেজের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের পড়িতে হইত পোপ-এর কবিতা-সংগ্রহ, 'ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড', 'প্যারাডাইজ লস্ট' ও শেক্সপীয়রের নাটকাবলী। ১৮৩১ সালে জেনারেল কমিটির বিবরণীতে লেখা হইল "ইংরাজী ভাষার উপর এতটা দখল অর্জিত হইল এবং ঐ ভাষার সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এতটা পরিচিতি সাধিত হইল যে ইওরোপের বিদ্যালয় সমূহে কদাচিৎ তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে।"

এই চমকপ্রদ সাফল্যের জন্য অনেক পরিমাণেই দায়ী ছিল ১৮২৮ সালের ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও'র নিয়োগ। এই পদ যখন লাভ করেন তখন ডিরোজিও'র বয়স মাত্র উনিশ

* রবীন্দ্রনাথ কৃত সারানুবাদ

বছর। কিন্তু শিক্ষক হিসাবে তিনি অচিরাৎ সাফল্য লাভ করিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁর জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন, "তাঁর সময়ের আগে বা পরে ভারতবর্ষের কোনো দেশীয় শিক্ষায়তনের কোনো শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের উপর এতটা প্রভাব কোনোদিন বিস্তার করিতে পারেন নাই। শুধু ক্লাশঘরে শিক্ষাদানের সময়েই নয়, ডিরোজিও'র অমায়িক স্বভাব, অদম্য উৎসাহ, পরিহাসবোধ, অধ্যয়নের ব্যাপ্তি, শিক্ষাদানের আগ্রহ, ধৈর্য ও সৌজন্যবোধ ছাত্রদের হৃদয় জয় করিয়াছিল, অর্জন করিয়াছিল তাহাদের গভীর শ্রদ্ধা। শিক্ষাদানের অবসর সময়েও তিনি আলাপ-আলোচনায় ছাত্রদের অধ্যয়নে সাহায্য করিতে সদা-প্রস্তুত ছিলেন, ক্লাশঘরের পড়া-শুনার মধ্যে যে-সব প্রসঙ্গ উঠিত সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে ছাত্রদের তিনি উৎসাহ দিতেন। ক্লাশ শুরু হইবার আগে, কখনও বা দিনের কাজের শেষে ক্লাশের পড়া ছাড়াও ইংলণ্ডের সাহিত্য ও চিন্তার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ব্যাপকতর ও গভীরতর করিবার জন্য ডিরোজিও ইংরাজী সাহিত্য হইতে ছাত্রদের পড়িয়া শুনাইতেন। হিন্দু কলেজের যে-কোনো ছাত্রই তাহার এই "স্বেচ্ছাবৃত কর্মভারের সুযোগ লইতে পারিত।" ইতিহাসের এক নির্মম পরিহাস এই যে শিক্ষক হিসাবে তাঁহার সাফল্যই ডিরোজিও'র পতনের কারণ হইল। মুক্ত চিন্তায় তাঁহার উৎসাহদান হিন্দু প্রতিক্রিয়াকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তাঁহার বিরুদ্ধে নীতিহীনতার এক আজগবি অভিযোগ আনা হইল। প্রতিবাদে ১৮৩১ সালে ডিরোজিও পদত্যাগ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সম্ভ্রমবোধ ও চারিত্র্যগুণে চেস্টারফিল্ডকে লেখা ডঃ জনসন বা ১৯১৯ সালে ভাইসরয়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রের মতো ইংরাজী ভাষার সুবিখ্যাত পত্রগুলির সঙ্গে তাহা তুলিত হইতে পারে।

হিন্দু কলেজের সহিত তাঁহার সাহচর্যের কথা বাদ দিলেও, ডিরোজিও বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব। তাঁহাকে বাদ দিয়া বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কোনো বিবরণ রচনা করিতে গেলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে। এক পর্তুগীজ ব্যবসায়ী আর বিহারের জনৈক নীলকরের ভগিনী এক ইংরাজ রমণীর পুত্র ডিরোজিও তাহার প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হইতে না হইতে বিখ্যাত হইয়া পড়েন। তখন তাহার বয়ঃক্রম মাত্র অষ্টাদশ বৎসর। সেই হইতে যৌবনের সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া তিনি সাহিত্য-সেবায়

মনোনিবেশ করিলেন। সেকালে যে সমস্ত বিষয় মানুষের চিত্ত আলোড়িত করিত তাহার প্রায় সবগুলি লইয়াই তিনি গদ্য ও পদ্য রচনা করিয়া চলিলেন অবিশ্রান্তভাবে। আশ্চর্যের বিষয়, কলিকাতার কোনো একটি বে-সরকারি বিদ্যালয়ে ছয় হইতে চৌদ্দ, মাত্র এই আট বছর, তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তবু কবি হিসাবেই ডিরোজিও অমরত্বের দাবি করিতে পারেন। কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী কাল অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহার সেই আবেগবিদ্ধ বাক্যের জ্যোতি কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। ১৮৩১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে ডিরোজিও পরলোক গমন করেন। কিন্তু কে ভুলিতে পারিবে ভারতবাসীর কাছে স্বাদেশিকতার তাঁর সেই উদ্দীপনাময় আহ্বান? তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম কবি-পথিকৃৎ, কাব্যিক রেনেসাঁসের যা ছিল একটি মূল সুর।

TO INDIA—MY NATIVE LAND

My Country ! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou ;
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery.
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! One kind wish from thee !

মধুসূদন দত্ত যখন ছাত্র হিসাবে হিন্দু কলেজে আসিলেন তখন ডিরোজিও আর সেখানে ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি তখনও জাগরুক ছিল। হিন্দু কলেজের এই সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ছাত্রটির, যিনি পরবর্তী জীবনে আধুনিক

বাংলা কবিতার জনক হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত এই মহান শিক্ষকের কি যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্র ছিল। মাইকেল যেহেতু মুক্ত ছন্দে বীররসাক্রান্ত মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন সেহেতু সাধারণত তাঁহাকে মিলটনের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু মেজাজ এবং জীবনযাত্রার ধারার দিক হইতে মার্লোর সহিতই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তিনি আবার, আধুনিক অর্থে, আমাদের প্রথম নাট্যকারও এবং বাঙলায় জাতীয় রঙ্গশালা আন্দোলনের একজন প্রধান পুরোধা। ছাত্র হিসাবে মধুসূদন কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল ক্যাপটেন ডি. এল. রিচার্ডসনের প্রভাবাভিভূত হন। রিচার্ডসন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ১৮১৯ সালে বেঙ্গল আর্মির ক্যাডেট হিসাবে কিন্তু দশ বছর পরে শারীরিক অসামর্থ্যের দরুন অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সাহিত্যচর্চায় আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, নিবন্ধকার ও সাংবাদিক আর শিক্ষণ-প্রতিভা যে তাঁহার সহজাত ছিল তিনি অচিরাৎ তাহারও প্রমাণ দিলেন। একদিন হিন্দু কলেজের ছেলেদের তিনি যখন ওথেলো পড়াইতেছিলেন মেকলে তাহা শোনেন। তিনি পরে রিচার্ডসনকে বলিয়াছিলেন : 'আমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে আর সব কিছুই হয়তো ভুলিয়া যাইব কিন্তু কখনও ভুলিব না তোমার শেক্সপীয়র পড়ান।' মধুসূদন ছিলেন ডি. এল. আর-এর—ছাত্র-মহলে তিনি ঐ প্রীতিপূর্ণ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন—একনিষ্ঠ শিষ্য। আর অনুকরণ যদি সনিষ্ঠ অনুরাগের নিরিখ হয় তবে সে পরীক্ষায়ও তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবেন। গুরুর হস্তাক্ষর অনুকরণ করিতে না পারা পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। নিজের কবিত্ব-প্রতিভা সম্পর্কে সদা-সচেতন এবং রিচার্ডসনের মতো শিক্ষকের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ মাইকেল শেক্সপীয়রের প্রতি আজীবন অনুরাগ পোষণ করিতেন। চাহিলে শেক্সপীয়র নিউটন হইতে পারিতেন সতীর্থদের কাছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সহজাত অনীহা সত্ত্বেও গণিতের রহস্যভেদের জন্য একবার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন এবং সত্য সত্যই এক পরীক্ষায় অঙ্কে বহু নম্বর পাইয়া বন্ধু ও শিক্ষকদের তাক লাগাইয়া দিলেন। পরে তিনি ল্যাতিন, গ্রীক, ইতালিয়ান ও ফরাসী ভাষা সহ আট-নয়টি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী দারিদ্র্য-নিপীড়িত মাইকেল যখন তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী, ফরাসী রমণী যাহাকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসিতেন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন তখন তিনি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন

শেক্সপীয়রের সেই সুপরিচিত পংক্তিগুলিতেই, লেডি ম্যাকবেথের আকস্মিক মৃত্যুর পর ম্যাকবেথ যাহাতে জীবন-মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনপ্রয়াসী হন।

রিচার্ডসনের প্রাণবন্ত শেক্সপীয়র পাঠন খুবই সুফলপ্রসূ হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্রেরা শুধু পরীক্ষা-পাশের জন্য শেক্সপীয়র অধ্যয়ন করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, তাহারা ঘরোয়াভাবে শেক্সপীয়র আবৃত্তি করিতেন, আয়োজন করিতেন শৌখিন অভিনয়ের। এমন কি রিচার্ডসনের আগেও বাংলার শিক্ষিত-সমাজের যাহারাই হিন্দু কলেজ মারফৎ শেক্সপীয়র ও ইংরাজী নাটকের সহিত পরিচিত হন এবং ইংরাজী রঙ্গশালার অভিনয় দেখেন তাহারাই নাটক সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হইয়া উঠেন। ইহারই ফলস্বরূপ জন্ম হইল 'হিন্দু থিয়েটার'-এর। ১৮৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জুলিয়াস সীজারের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী লইয়া এই রঙ্গশালার দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এই রঙ্গশালা ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল কিন্তু ইহার প্রেরণা সহসা নির্বাপিত হয় নাই। ১৮৪৮ সালে আমরা দেখিতে পাই একজন বাঙালী অভিনেতা বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য কলিকাতার ব্রিটিশ থিয়েটার Sans Souci-তে ওথেলোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ১৮৫৩ সালে দেখি বাঙালী তরুণদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার ওথেলো নাটকের ইয়াগোরূপী বাবু প্রিয়নাথ দে দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করিলেন। পরবর্তী বৎসরে তাঁহারা 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। পোর্সিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন মিসেস গ্রীগ নামে এক ইংরাজ মহিলা। ১৮৫৫ সালে তাঁহারা আবার দর্শক সাধারণের সামনে উপস্থিত হইলেন—এবারে একটি অচলিত নাটক লইয়া। তাহা হইল শেক্সপীয়রের 'হেনরি দি ফোর্থ'।

১৮৫৫ সালের বাংলার শিক্ষা-ইতিহাসে এক রূপান্তরের যুগ শুরু হইল। এই বছর শুধু হিন্দুদের জন্য বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু কলেজের অস্তিত্বের অবসান ঘটিল। সরকার ইহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইহার দরজা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ১৮৫৫ সালের ১৫ই জুন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হইল। প্রায় একই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও পূর্ণরূপ গ্রহণ করিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইল ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ২৩ জন ছাত্র এই পরীক্ষায় বসিলেন এবং সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন। ইহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

মধুসূদন যেমন ছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জনক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক। মধুসূদনের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও মাতৃভাষা ব্যবহারের পূর্বে ইংরাজী ভাষায় সাহিত্যরচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৬৫ সালে প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার পর হইতে ১৮৯৪ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁহার প্রথম উপন্যাসের সহিত 'আইভ্যানহো'র আপাতসাদৃশ্যের কারণে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহাকে সাধারণত স্যার ওয়াল্টার স্কটের সঙ্গে তুলনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তাঁহার উপন্যাস শেক্সপীয়রের নাটকের নিকটতম। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসেরই নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। অদ্যাপিও তাহারা প্রভূত জনসমাদরধন্য। বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন (কপালকুণ্ডলা) "বিশুদ্ধ" নারীত্বের চিত্ররূপ হিসাবে যাহা শেক্সপীয়রের মিরাণ্ডার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে।

বাংলা অনুবাদে শেক্সপীয়রের নাটক পরিবেশনের কিছু কিছু প্রয়াস সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কখন-সখন করা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই প্রয়াসের সাফল্য খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙালী শিক্ষিতসমাজ যে কারণেই হউক বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। ইহার একটা কারণ হয়তো এই যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শেক্সপীয়র পাঠন ও শৌখীন ও পেশাদার দলের অভিনয় বিপরীতমুখী খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। কোলরিজ ও ল্যাম যে ঐতিহ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ব্র্যাডলের কাছে যাহা অবিসংবাদী প্রামাণিকতা লাভ করিয়াছে তাহার অনুসরণে শেক্সপীয়রের নাটকাবলী আদর্শ নাটকীয় কাব্য হিসাবেই পড়ান হইত—যাহার রসগ্রহণ করিতে হয় এককভাবে অনুভবের মধ্য দিয়া—রঙ্গমঞ্চে পরিবেশনের বাস্তব সমস্যা ও দর্শকসাধারণের সমবেত প্রতিক্রিয়ার সহিত তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবিবর্জিত। ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনেতাদের প্রতি অধ্যাপক এইচ. এম. পার্সিভালের মনোভাব। কোনো এক ছাত্রের কাছে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন: "রঙ্গালয়ের লোকেদের শেক্সপীয়র

সমালোচনায় আস্থা স্থাপন করিও না। তুমি-আমি শেক্সপীয়র পড়ি ও অনুভব করি ; উহারা শেক্সপীয়র অভিনেতা, উহারা অনুভবের ভান করে।"

অধ্যাপক পার্সিভাল ভারতবর্ষে শেক্সপীয়র-বিদ্যার শীর্ষস্থান অধিকারী। ১৮৫৫ সালে চট্টগ্রামে এক ভারতীয় খ্রীষ্টান পরিবারে তাহার জন্ম। তিনি বিলাত যান ১৮৭৭ সালে। সেখানে ধ্রুপদী বিদ্যায় ও ফরাসী ভাষায় উচ্চসম্মান লাভ করিয়া তিনি স্নাতক হন। লণ্ডনে ধ্রুপদী বিদ্যায় এম. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে অধ্যাপক ব্ল্যাকির উচ্চতর গ্রীক ক্লাস ও এডিনবরায় অধ্যাপক সেলারের "অগ্রসর ছাত্রদের" ল্যাতিন ক্লাসে যোগ দেন। ১৮৭৯ সনে তিনি এই পরীক্ষায় সোনার পদকের ঠিক পরবর্তী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি হেনরি মর্লে'র অধীনে ইংরাজী সাহিত্য ও ক্রুম রবার্টসনের অধীনে দর্শনের ক্লাসেও অধ্যয়ন করেন। তদুপরি তিনি নিয়মিত পাঠের অবসরে এডিনবরায় প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার পাঠক্রমও শেষ করেন এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন হইতে সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেন। ক্লাসে লেকচার দিবার সময় অবশ্য বিদ্যা জাহীর করিবার কোনোরূপ চেষ্টা তিনি করিতেন না। দুর্বোধ্য অংশকে বা সুদূরতম অনুষঙ্গও তিনি কখনও এড়াইয়া যাইতেন না। যদিও তিনি শেক্সপীয়র বিশেষজ্ঞরূপেই সমধিক পরিচিত ছিলেন তথাপি বিখ্যাত অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির পূর্বে প্রকাশিত তাঁহার-কৃত মিলটনের স্যামসন অ্যাগনিষ্টিস ও স্পেনসরের ফেয়ারী কুইন-এর সংস্করণগুলি হইতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার সাহিত্যগত ও ভাষাতাত্ত্বিক গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শেক্সপীয়ার বিষয়ে তাঁহার লেকচারগুলি ছাত্রদের এক নতুন সৌন্দর্যের জগতে লইয়া যাইত, যে জগতে নিকৃষ্ট সমালোচকদের প্রবেশাধিকার নাই। তিনি কখনও অন্য লোকের অভিমতের বাহক ছিলেন না। বলিতে কি তিনি ১৯২৬ সালের পূর্বে শেক্সপীয়র সম্পর্কে ক্রোচে বা ব্রাডলের বই পড়েন নাই। তখন তিনি কর্মে অবসর লইয়া লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন। "ইণ্ডিয়ান শেক্সপীয়র" সিরিজের বইগুলি প্রকাশের দায়িত্ব লইবার পরই তিনি ঐগুলি পড়িয়াছিলেন। পড়িবার সময় তাঁহার মনে সংশয় ছিল হয়তো তাঁহার এতদিনকার ধ্যানধারণা সব নস্যাৎ হইয়া যাইবে। তাই কিছুটা স্বস্তির সঙ্গেই পরে তিনি

বলিয়াছিলেন: "তাহা হয় নাই।" ক্রোচে এবং ব্রাডলে সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যগুলি উদ্ধারযোগ্য:

"Croce's biggest fault is that he forgets his own standard—to judge Shakespeare by our emotions—and becomes metaphysical now and then (he is a Hegelian). But so is Bradley now and then, without rising to any height that Croce reaches. Bradley is painstaking, has read Shakespeare carefully, draws his conclusions conscientiously ; but what he so draws and states might have been stated effectively in one-fourth of the space he takes up. He does not understand the minor character in *Macbeth* and misunderstands the scene between Macduff and Malcolm. I see he uses those crutches, the tests, (down to decimals on the subject of "stopped" an "unstopped" I think)—crutches that people who can walk reverently on their own two legs behind Shakespeare should disdain to use."

একুত্রিশ বছর একাদিক্রমে চাকুরী করিবার পর অধ্যাপক পার্সিভাল ১৯১১ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গুরুর প্রতি তাঁহার একাগ্র নিষ্ঠার মধ্য দিয়া তাঁহার স্মৃতি পরবর্তীকালের ছাত্রসমাজের মধ্যে জাগাইয়া রাখেন। ১৯১৫ সাল হইতে পরবর্তী পঁচিশ বৎসরকাল তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে শেক্সপীয়র অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক ঘোষ অবশ্য অধ্যাপক পার্সিভালের মতো মহাকোষিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন না কিন্তু তাঁহার এমন একটি গুণ ছিল যা তাঁহার গুরুর ছিল না। তিনি শেক্সপীয়র পড়িতেন চমৎকার। এদিক দিয়া তিনি রিচার্ডসনের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। এই গুণটি আরও চমৎকৃত করে যখন মনে করি তাঁহার অধিকতর বিখ্যাত পূর্বস্থরী ডিরোজিওর মতো তাঁহার শিক্ষা হইয়াছিল পুরাপুরি কলিকাতাতেই। পার্সিভালের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও অধ্যাপক ঘোষ তাহার ক্লাশকে রঙ্গমঞ্চের নিকটতর করিয়াছিলেন, নাটক পাঠনের প্রাণস্পন্দিত অন্তঃস্থলে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নাই কিন্তু বাংলা দেশের

বিভিন্ন কলেজে আজ যাঁহারা শেক্সপীয়র পড়ান তাঁহাদের অধিকাংশই তাঁহার ছাত্র এবং ছাত্র বলিয়া গর্বিত।

বিদ্যালয়ের বাহিরেও বাংলাদেশে একনিষ্ঠ শেক্সপীয়র অনুরাগীর সংখ্যা কম নহে। আমাদের নাট্যকারেরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শেক্সপীয়র অনুরাগ তাঁহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ যাঁহারা তাঁহার মূল রচনা পাঠ করিয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা তাঁহার রচনাবলীর যথাযথ অনুবাদ আজ অবধি হয় নাই। অনুবাদ কিছু আছে কিন্তু তাহা প্রায়শই সন্তোষজনক নহে। শ্রীঋষি দাস-কৃত তাঁহার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত মাত্র কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হইয়াছে। দেরীতে হইলেও ইহাকে শুভ সূচনা বলিতে হইবে। কয়েক বছর আগে বঙ্গীয় শেক্সপীয়র পরিষদও স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিষদের উদ্দেশ্য :

শেক্সপীয়রের রচনাবলীর যথাযথ বাংলা তরজমা প্রকাশ করা ;

বাংলা টীকা, টিপ্পনি ও ভূমিকা সহ সম্পাদিত শেক্সপীয়রের রচনাবলী প্রকাশ ;

স ধারণ রঙ্গমঞ্চে বাংলা তরজমায় শেক্সপীয়রের নাটক পরিবেশন ;

বিভিন্ন নাটকদলের সহযোগিতায় বাংলা এবং ইংরাজীতে শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা।

এই সমিতির প্রস্তুতি কমিটিতে যোগ দিয়াছিলেন কয়েকজন প্রথম সারির অভিনেতা। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী যিনি কলেজে শেক্সপীয়র অধ্যাপনা ছাড়িয়া সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক হইয়াছিলেন এবং শেক্সপীয়র সাহিত্যের তন্নিষ্ঠ ছাত্র উৎপল দত্ত যিনিও রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রকে বরণ করিয়াছেন। আর ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, লীলা মজুমদারের মত সাহিত্যিকবৃন্দ, অধ্যাপক পি-কে গুহ, ডঃ এম. এম. ভট্টাচার্য, ডঃ এস. সি. সেনগুপ্ত প্রমুখ অধ্যাপকেরা। সমিতি বিশেষ সাফল্যের সহিত কয়েকটি শেক্সপীয়র পাঠের বৈঠক আয়োজন করেন। ভারতের সঙ্গে শেক্সপীয়রের যোগাযোগের যে স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন সমিতি তাহাদের কর্মকাণ্ডে তাহাকে রূপ দিতে পারিবে বলিয়া আশা রাখে।

শেক্সপীয়রের মৃত্যুর তৃতীয় শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯১৬ সনে যে Book of Homage to Shakespeare প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ তাহাতে ইংরাজী অনুবাদ সহ একটি বাংলা সনেট রচনা করিয়া

দিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার ইংরাজী রচনাবলীর মধ্যে এই ইংরাজী তরজমাটি স্থান পায় নাই :

"When by the far-away sea your fiery disk appeared from behind the unseen, O poet, O Sun ; England's horizon felt you near her breast, and took you to be her own.

"She kissed your forehead, caught you in the arms of her forest branches, hid you behind her mist mantle, and watched you in the green sward where fairies love to play among meadow-flowers.

"A few early brids sang your hymn of praise while the rest of woodland choir were asleep.

"Then at the silent beckoning of the Eternal you rose higher till you reached the midsky, making all quarters of heaven your own.

"Therefore at this moment after the end of centuries, the palm groves by the Indian seas raise their tremulous branches to the sky murmuring your praise."*

* মূল ইংরাজী হইতে লেখকের অনুমতিক্রমে অনূদিত

শীতাংশু মৈত্র

বাংলায় শেক্সপীয়র-চর্চা

বাংলায় শেক্সপীয়র-চর্চা বড় একটা হয় নি। শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদের প্রয়াস সেই 'ভানুমতীচিত্তবিলাস'-এর যুগেই শুরু হয়ে আজও চলেছে কিন্তু শেক্সপীয়র আলোচনার কোনো ধারা তো এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ই নি, এমনকি কোনো একজন সমালোচকও শেক্সপীয়রের নাট্যকলার পূর্ণাঙ্গ কি খণ্ডিত আলোচনা করেন নি। স্তুতি, বিশেষ করে পদ্যে, কিছু কিছু আছে; অন্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে কোথাও কোথাও একটু-আধটু শেক্সপীয়র বা রেনেসাঁস সাহিত্যের কথা উঠেছে; আর যাঁরা তাঁর নাটকের অনুবাদ করেছেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই একটি করে ভূমিকা লিখেছেন। মধুসূদনের যুগের আগে থেকেই বাংলার নাট্যকারদের কাছে শেক্সপীয়র প্রিয়। পণ্ডিত নাট্যরসিকেরা তাঁকে অনুবাদ করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপকেরা শেক্সপীয়র-পাঠনে কৃতিত্ব অর্জন করা গৌরবের মনে করে থাকেন এখনও। তাই D. L. Richardson থেকে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পর্যন্ত এখনও বিদগ্ধজনের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়র কখনও স্থায়ী প্রবেশাধিকার লাভ করলেন না— না মূলে না অনুবাদে। তাই শেক্সপীয়র-চর্চাও এখনও কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—তাঁকে নিয়ে কোনো আলোচনা-সাহিত্য গড়ে উঠল না।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন, আধুনিক রঙ্গমঞ্চ ও আধুনিক নাটকের গোড়াপত্তন তখন একদিকে প্রতীচ্য (অর্থাৎ ইংরেজি) প্রভাব আর একদিকে সংস্কৃত প্রভাব ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল এবং প্রতীচ্য প্রভাবের প্রধান অঙ্গ ছিলেন শেক্সপীয়র। তাঁকে অনুবাদ করা থেকে আরম্ভ করে, তাঁর নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের কথা, চরিত্র, এমনকি নাটকের ঘটনা-সংস্থানও অনুকরণ করা ডি. এল. রায়, এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত চলে এসেছে।

যদিও সংস্কৃত নাটকের রূপকল্পনার সঙ্গে প্রতীচ্য নাটকের রূপকল্পনা মেলে না—(ভরতের সঙ্গে এ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার আপাতদৃষ্টিতে মিল খুঁজে পাওয়া ভার—এবং শেক্সপীয়রের নাট্যকলা এ্যারিস্টটেলিয়ানও নয়, সেনেকানও নয়, গুয়ারিনির তত্ত্বানুসারীও নয়) তবু এই দুই ধারার নাটকই কিছুদিন পাশাপাশি চলে, ইংরেজি-শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে প্রতীচ্য প্রভাবই বাংলা মঞ্চে স্থায়ী হল। নাটকের বাহ্যিক গঠনে তো বটেই, আন্তর বস্তুতেও সে প্রভাব পরিস্ফুট। এই ধারার প্রথম সার্থক মৌলিক প্রয়াস মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী নাটক। এই প্রতীচ্যায়ন সম্পর্কে মধুসূদন সচেতন তো ছিলেনই, এর নূতনত্ব এবং সম্ভাবনা তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। তবু প্রতীচ্যের নাটক, বিশেষ করে ট্র্যাজিডি আমাদের এই নরম মাটির দেশে যে কিঞ্চিৎ শ্লথ হয়ে পড়তে পারে তাও তিনি বুঝেছিলেন। বিখ্যাত নট কেশব গাঙ্গুলিকে তাঁর লেখা একখানি চিঠিতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে :

"We Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean drama. If you leave out the *Midsummer Night's Dream, Romeo & Juliet* and perhaps one or two more, what play would deserve the name of *Romantic?* Romantic in the sense in which *Sacoontala* is romantic? In the great European drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the *Sarmista,* I often stepped out of the path of the dramatist, for that of the mere poet. I often forget the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself...I

shall endeavour to *create* characters who speak as nature suggests and not mouthmere poetry...As for the language, the drama to be written in. I shall follow Dr. Johnson's advice : 'If there be', says he, 'what I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance.' And commends Shakespeare for having adopted this language······

"If this tragedy (অর্থাৎ কৃষ্ণকুমারী) be a success, it must ever remain as the foundation-stone of our National Theatre." কিন্তু কৃষ্ণকুমারী বাংলা রঙ্গমঞ্চে কোনোদিন প্রতিষ্ঠা পায় নি এবং যদিও এক ধরনের বিষাদান্ত নাটকের (যেমন প্রফুল্ল, শাজাহান, নূরজাহান) সৃষ্টি ও জনপ্রিয়তা প্রতীচ্য-প্রভাবের ফলেই ঘটেছে তবু 'ওথেলো' কি 'ম্যাকবেথ' শুধু যে সৃষ্টিই হয় নি তা নয়, সেগুলি মূলে কি অনুবাদে এ পর্যন্ত বাঙালীর মন হরণ করে নি মঞ্চের মাধ্যমে। যাঁরা বাংলা ট্র্যাজিডি লিখলেন তাঁরা তাঁদের আদর্শ শেক্সপীয়রকে বাঙালীর কাছে পরিবেশনে সার্থকতা অর্জন করতে পারলেন না। গত ১৯৫৪ সালে যখন বঙ্গীয় শেক্সপীয়র পরিষদ স্থাপিত হয় তখন তার অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল বাংলায় শেক্সপীয়রকে জনপ্রিয় করা—অভিনয় করে, সমালোচনা করে, সটীক সংস্করণ বের করে এবং বৈঠক করে। এর আগেও অন্তত দুটি শেক্সপীয়র সমিতি বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছিল—একটি বাগবাজারে, তৎকালে বিখ্যাত 'ফানিম্যান' এস. সি. মুখার্জির বাড়িতে। সে বাড়ির গায়ে মর্মর-ফলকটি এখনও তার সাক্ষী। আর একটি ১৯১৯ কি ১৯২০ সালে, ঠিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা চলে কি না জানি না তবে, প্রচারিত হয়েছিল। এই ব্যাপারে কিছু উৎসাহ সঞ্চার করেছিলেন অধ্যাপক ক্লিমজার এবং অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। এই সমিতির প্রথম অধিবেশনে

স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক সভাপতিত্ব করেছিলেন। বর্তমান শেক্সপীয়র পরিষদ এবং এই দুই পূর্বতন পরিষদ বাংলা মঞ্চে এখনও শেক্সপীয়রের স্থান করে দিতে পারেন নি এবং শেক্সপীয়র-আলোচনারও কোনো প্রাণবান ধারা বইয়ে দিতে পারেন নি।

শেক্সপীয়রীয় নাটক মূলে অভিনয় ক্বচিৎ কখনও বিদগ্ধদের জন্যে হতে পারে; মাঝে মাঝে ওদেশ থেকে খ্যাত-অখ্যাত নট-নটীরা এসে তাঁদের মাঝে মাঝে মুগ্ধ করে যেতে পারেন, কিন্তু সোজা প্রশ্ন হল এই যে, কেন অনুবাদে শেক্সপীয়র জনপ্রিয় হবেন না? তাঁর ট্র্যাজিডি, কমিডি কিছুই এখানে মঞ্চে স্থান পাবে না অথচ উচ্চশিক্ষা যারা নেবে তারা সবাই শেক্সপীয়রের মহত্ত্ব আপ্ত-বাক্যের মতো মেনে নেবে—এ কেমন স্বতোবিরোধ? যদি বাঙালীমন, বিজাতীয় বলে, শেক্সপীয়রীয় রসে সিক্ত না হতে পারে তাহলে শেক্সপীয়র-পাঠে সে মন এত মুগ্ধ হয় কেমন করে? আজ যদি ইবসেনের 'এ ডল্‌স্ হাউজ' বা 'এ্যান্ এনিমি অব্ দি পিপ্‌ল্' অনুবাদে এত মঞ্চ-সফল হতে পারে তাহলে আর প্রতীচ্য-প্রাচ্যের মানস-সংস্থানের পার্থক্যের দোহাই দেবার অর্থ কি? একটি যুক্তি অবশ্য দেওয়া যায়। শেক্সপীয়রের মহত্তম কাব্য অনুবাদে বিনষ্ট হয় বলে অনুবাদের পরে যা থাকে তা শেক্সপীয়রও নয়, সাধারণ সুখপাঠ্য নাটকও নয়; অতএব তিনি মঞ্চে পরিহার্য। এ কথায় সত্য কিছু আছে। শেরিডানের 'দি রাইভাল্‌স্' যেমন অনুবাদ্য বা বার্নার্ড শ'-এর 'মিসিজ্ ওয়ারেন্‌স্ প্রফেশন্', সেরকম নয় শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' বা মলিয়ের-এর লা মিসান্‌থোপ বা ইবসেনের ব্র্যাণ্ড। তবু তো অনুবাদ হচ্ছে। ইস্‌কাইলাসের, সফোক্লেসের নাটক ইউরোপের তাবৎ ভাষায় অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদক, ভিন্ন যুগে, পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একই নাটকের অনুবাদ করেন, মূলের কাছে পৌছাবার আশায়। এই সেদিনও ফাউস্টের নতুন অনুবাদ হয়েছে ইংরেজিতে। এবং অত্যন্ত আনন্দের কথা যে মূল জর্মন থেকে ফাউস্টের প্রথম খণ্ড বাংলায় অনূদিত হয়েছে গত বছর। অতএব মহৎ কাব্যের (বা নাটকের) অননুবাদ্যতা absolute বা আত্যন্তিক স্বীকার করে নিলেও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সবই অনুবাদ্য এবং কাজেও তাই হচ্ছে। এ যুক্তিতেও সেইজন্যে শেক্সপীয়রকে দূরে রাখা যায় না।

ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন অবশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ওথেলো

দুঃসহ ঠেকেছিল। শকুন্তলা আর টেম্পেস্টের এক তুলনামূলক আলোচনায় শকুন্তলার প্রতি তাঁর পক্ষপাত তিনি অকপটে প্রকাশ করেছেন। দুষ্মন্তের বিস্মরণকে দুর্বাসার অভিশাপ-জাত বলে রূঢ় বাস্তবকে কালিদাস যে-ভাবে নাট্যায়িত করেছেন সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথা হল: "য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন—সংসার ঠিক যেমন নাটকে তাহাই ঘটাইতেন। শাপ বা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা কিছুই আবৃত করিতেন না। যেন তাঁহাদের পরে সমস্ত দাবী কেবল সংসারের, কাব্যের কোনো দাবী নাই। কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই—পথে ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে নকল করিতেই হইবে, এমন দাস-খৎ তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই—কিন্তু কাব্যের শাসন কবিকে মানিতেই হইবে।...তিনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তিকে অক্ষুন্ন রাখিয়া সত্যের বাহ্যমূর্তিকে তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্যের সহিত সঙ্গত করিয়া লইয়াছেন।...শকুন্তলা নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে—একটি শান্তিসৌন্দর্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এরূপ না করিলে তাহা বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। সংসারের নকল ঠিক হইত কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী সুকঠোর আঘাত পাইতেন।" এখানে জীবন-সত্য ও কাব্য-সত্য নিয়ে যে বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথ অবিসংবাদিত সত্য বলে মেনে নিচ্ছেন তার বিচারে না গিয়েও আমরা যে উদ্ধৃতিটি আগে দিয়েছি তার একটু পরেই, 'টেম্পেস্ট' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে চূড়ান্ত মতামত ঐ প্রবন্ধেই পাচ্ছি, তার থেকে মনে করা অসমীচীন নয় যে, রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের সৃষ্টিকে এবং প্রতীচ্যের তাবৎ মহৎ সাহিত্যকে, প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের তুলনায়, হীনমূল্য বলে করতেন এবং প্রতীচ্যের সাহিত্যে বাস্তবের রূঢ় অবলেপ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ইউরোপের কবিদের সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ এই যে তাঁরা "সাংসারিক সত্যের নকল" করেন। কিন্তু বাস্তবের নকল যে সাহিত্য নয় এ-কথা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি কারও জানবার কথা নয়। এবং শেক্সপীয়র যদি তাই করে থাকেন তাহলে তিনি সাহিত্যিকই নন। এই কথাপ্রসঙ্গেই 'টেম্পেস্ট' নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল:

"টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি; টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি; টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। টেম্পেস্টে মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার

প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপরে,—শকুন্তলার সরলতা অপমানে দুঃখে অভিজ্ঞতায় ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ব, গম্ভীর স্থায়ী। গেটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি—শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।"

এর থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না কেন রবীন্দ্রনাথ ওথেলো সহ্য করতে পারেন নি এবং রবীন্দ্রনাথের এই মানস-সংস্থান যদি ভারতীয় অতএব বাঙালীর মানসপ্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে সত্যিই মধুসূদনের কথা না মেনে উপায় থাকে না: "With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairylands." এই world of reality-কে দেখার ধরনে প্রতীচ্য আর প্রাচ্যের, ইংরেজ আর বাঙালীর এই পার্থক্যের ফলেই কি বাঙালী জনসাধারণ মনের গভীরে শেক্সপীয়রকে গ্রহণ করতে পারে নি, শুধু ক্লাসরুমে আর বক্তৃতামঞ্চে তাঁকে "মাথায় রেখেছে?" কিন্তু তাই বা বলি কেমন করে। মধুসূদনও তো মনেপ্রাণে বাঙালী ছিলেন এবং যিনি বলেছিলেন "জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'" সেই বঙ্কিমও, এই বাংলাদেশে, মধুসূদনের পরে, শেক্সপীয়রের সৃষ্টিতে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, হয়তো অজ্ঞাতেই, কপালকুণ্ডলার রূপকল্পনায় টেম্পেস্ট এবং ওথেলোর দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ প্রভাব শুধু উপরিতলের দু-একটা theme বা situation বা stage-trick-এর নয়। সে হিসেবে তো রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' এবং 'শেষ রক্ষা' প্রত্যক্ষভাবে শেক্সপীয়র-প্রভাবিত। কপালকুণ্ডলার ওপর টেম্পেস্ট-এর এবং ওথেলোর প্রভাব একেবারে মূলগামী। এবং বঙ্কিমের মন সে প্রভাবের একান্ত প্রত্যাশী। শকুন্তলা এবং টেম্পেস্ট সম্পর্কে এবং শকুন্তলা ও মিরান্দা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও তাই রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বিপরীত:

'উভয়েই ঋষিকন্যা।...উভয়েই ঋষি-পালিতা।...উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ।... কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা।...মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা

হইবে ?···সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই।···অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রী-চরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য অধিক।···মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী ; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।···দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, একপ্রকার লুকোচুরি খেলা।···মিরন্দার সে সকল নাই।···মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখি—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না ; নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে···

> I would not wish
> Any companion in the world but you ;···

পুনশ্চ

> Hence, bashful cunning !
> And prompt me, plain and holy innocence !
> I am your wife, if you will marry me ;···

···উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়-সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পুরাতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালোবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর", মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্তপর্য্যন্তপ্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ এই "টল টল চঞ্চল বীচিমালা"-র অশান্তি সইতে পারেন না। বঙ্কিম-মানস, রেনেসাঁস-ভাব-পরিমণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থিত বলে, শুধু জীবনমুখীই নয়, ইহকালকেই শুধু মুখ্য মূল্য দেয় না, জীবনের কুৎসিত-সুন্দরে, ক্লেদে-অমৃতে, দেবত্বে-পশুত্বে সমান কৌতূহলী। জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিলাসই সে

মনের কাম্য। সে মন প্রস্‌পেরোর নিরাসক্ত জীবন-প্রীতি থেকে ম্যাকবেথের পৈশাচিকতা পর্যন্ত—জীবনের সমগ্র বিস্তারকে গ্রাস করতে চায়, কিছু রেখে-ঢেকে চলতে সে নারাজ। প্রস্‌পেরো যে বৈরাগ্যে বলেন :

"......I'll break my staff,
Bury it certain fathoms in the earth,
And deeper than did ever plummet sound
I'll drown my book"

তাও এই রেনেসাঁস-মন যেমন স্বীকার করে তেমনি স্বীকার করে Sir Toby-র কথা : "Dost Thou think because thou art virtuous, there shall be no cakes and ale ?" আবার তেমনি সে মনের সহানুভূতি Isabella-র সঙ্গে যখন সে মানুষের আত্মম্ভরিতায় আর আত্মাদরে মানুষের ওপরেই আস্থা হারিয়ে ফেলে :

...But man, proud man,
Dressed in a little brief authority,
Most ignorant of what he's most assured,
His glassy essence, like an angry ape,
Plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep.

এই হল জীবনের "টল টল চঞ্চল বীচিমালা।" রবীন্দ্রনাথ "cakes and ale"-কে বাদ দিয়ে জীবনকে দেখতে চান এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিই যদি খাঁটি ভারতীয় তাহলে বঙ্কিম কোথায় থাকেন আর বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইল এবং বিষবৃক্ষ-ই বা কোথায় থাকে ? বঙ্কিমেরও মনে সনাতনী ছিল কিন্তু সে সনাতনী চাইত ঐহিক জীবনের কল্যাণ ; তাই বঙ্কিমের দেবতা কুরুক্ষেত্রের নায়ক কৃষ্ণ ; বৈষ্ণবের ভাবৈকসর্বস্ব রসময় নন। শেক্সপীয়রের অকুণ্ঠ মর্ত-প্রীতি এবং জীবনকামনা তাই বঙ্কিমকে এত নাড়া দিয়েছিল, দিয়েছিল মধুসূদনকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নয়। সেইজন্যে ঐ প্রবন্ধেরই শেষে বঙ্কিম যখন বলেন, "ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র ; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্য-হৃদয়ই থাকে" তখন সে কথা মানতে দ্বিধা লাগে। রবীন্দ্রনাথ কি কখনও ওথেলো সম্পর্কে বঙ্কিমের এই বিচার গ্রহণ করবেন ?—

"শেক্সপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্যাপ্ত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ শেক্সপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষাদি বাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত বিলোল কোলাহল, উর্ম্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ-প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীত—সাহিত্য-সংসারে দুর্লভ।" অর্থাৎ কালিদাসে বাছাবাছি, বর্জন-নির্বাচন আর শেক্সপীয়রে সমগ্রতা।

এই সমগ্রতাকে গ্রহণ করতে কি বাঙালী পরাঙ্মুখ? সমাজ-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় এখনও অসাধ্য ব্যাপার। সামাজিক জীবনে মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলেই যে সাহিত্যও স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে তার যেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই তেমনি সমাজ-জীবন দুর্বহ বা অধোগামী হলেই যে সাহিত্যেরও অধোগতি ঘটবে তারও কোনো স্থিরতা নেই। দান্তে ডিভাইন কমিডি লেখেন নির্বাসনে বসে আর টলস্টয় তাঁর মহৎ উপন্যাসরাজি রচনা করেছিলেন জারিস্ট রাষ্ট্রে। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাম্যবাদী রাষ্ট্রে তাঁর ধারে-কাছে যেতে পারে এমন সাহিত্যিকের জন্ম হল না। গোর্কির কথা আলাদা, তাঁর সাহিত্যজীবনের আরম্ভ প্রাগ্‌বিপ্লব যুগে। আবার ভিক্টোরীয় যুগে ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছালেও দ্বিতীয় শেক্সপীয়রের জন্ম হয় নি। অবশ্য উপন্যাসে ডিকেন্স ছিলেন। আমাদের দেশও স্বাধীন হয়েছে কিন্তু সাহিত্যে কি সমাজ-জীবনের বহু-বিজ্ঞাপিত সাংগঠনিক জোয়ার প্রতিফলিত হচ্ছে? সমাজজীবনের পরিবর্তমান রূপের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য কারণ বাস্তব-জীবনই সাহিত্যের উৎস, কিন্তু কোন সামাজিক পরিবেশে সাহিত্য কেমন রূপ নেবে, তার বিকাশ ব্যাহত হবে না পুষ্ট হবে, তা নিরূপণ করা এখনও অসাধ্য হয়েই রয়েছে। তাই বাঙালীর বাস্তব জীবনে, সেই উনিশ শতকের রেনেসাঁসের সময় থেকে এমনকি স্বতোবিরোধ জন্মাল যার ফলে বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথের পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটল পৃথিবীর মহত্তম নাট্যকার সম্পর্কে এবং সমাজ-জীবনের কি অন্তর্বাহিনী ধারার, জাতীয় জীবনের কি বৈশিষ্ট্যের প্রবর্তনায় বাঙালী

'প্রফুল্ল' নিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিল কিন্তু বঙ্কিমোত্তর যুগে ওথেলোকে সহ্য করতে পারল না; শেক্সপীয়রকে ওপরে ওপরে অনুকরণ করল কিন্তু তাঁর নাটকের আস্বাদনে বিমুখ হয়ে রইল? আর এ বিমুখতা কি শুধু বাঙালীর আর ভারতীয়ের? না চীনে, জাপানেও আছে? লাফকার্ডিও হার্ন তো বলেছিলেন তাঁরা শেক্সপীয়রকে গ্রহণ করতে পারেন নি। চীনের অভ্যন্তরে, প্রতীচ্য-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশই ঘটে নি। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব কি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর রুচিবৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়ে এই বিমুখতার ব্যাখ্যা করবে? সেও তো একটি অনিশ্চিত প্রকল্প মাত্র। এবং তারও প্রচুর ব্যতিক্রম। অনেকে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদির সাহায্যে বাঙালী চরিত্রের একটি রূপরেখা আঁকবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ঐ অবরোহ বা deductive পদ্ধতিতে না গিয়ে আরোহ বা inductive পদ্ধতিতে বিচার করলে, অর্থাৎ বর্তমানের বাঙালীর সবচেয়ে রুচি-সম্মত একখানি নাটকের বিশ্লেষণ করে, দেখা যেতে পারে, কি কি উপাদান তাতে আছে এবং কি প্রকারের ঔপাদানিক মিশ্রণ বাঙালীর মনোহরণ করেছে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের কথাই বলছি। এই নাটকের মূল motif হল Othello নাটকে Cassio-র সেই উক্তি: "O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, let us call thee devil!" নাটকের মূল চরিত্র যে villain রমেশ সে Iago-র ভিত্তির ওপরেই কল্পিত, তবে শেক্সপীয়রের অন্যান্য villain-র ছাপও পড়েছে। লেডি-ম্যাকবেথের somnambulism অনুকৃত হয়েছে উমাসুন্দরীর ক্ষেত্রে। নাটকের মূল ঘটনাটি আকস্মিক—ব্যাঙ্ক ফেল। যোগেশ মহাদাশয় ব্যবসায়ী; ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার ফলে তাঁর মনে যে আঘাত লাগে তারি সুযোগে, তাঁর মদ্যের প্রতি দুর্বলতাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগিয়ে রমেশ তাঁর সব সম্পত্তি হাত করে, সেই সম্পত্তি রক্ষার সব ব্যবস্থা পাকা করবার চেষ্টায় যোগেশের একমাত্র পুত্র যাদবকে খুন করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু তার আগেই সে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছে এবং অন্যান্যের মৃত্যুর কারণও হয়েছে! সে unmitigated villain.

এই নাটকে যোগেশ প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত শুধু খেদোক্তি করছেন এবং মদের ঝোঁকে সব ভুলে থাকতে চাচ্ছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" চতুর্থ অঙ্কের শেষে না এসে প্রথম দৃশ্যের শেষেই আসতে পারত।

ট্র্যাজিডি দেখে যে আমরা অপূর্ব চিত্তপ্রসার ও গৌরব বোধ করি (শুধু সুখ বা আনন্দ নয়) তার মূল কারণ হল এই যে ট্র্যাজিডি আমাদের কাছে মানবাত্মার আত্যন্তিক মূল্য প্রকট করে—যে মানবাত্মা শত ভাগ্যবিপর্যয়ে, নিপীড়নে আপন dignity বা আভিজাত্য বিসর্জন দেয় না—সব সহ্য করে কিন্তু হারে না। ওথেলো যখন বুঝল তার মর্মান্তিক ভুল তখন সে আত্মহত্যা করল। যাকে বিনাশ করেছে তার বিনাশের পরেও বাঁচা মানে সেই অমূল্য সম্পদের অমূল্যতাকেই অস্বীকার করা। এইখানেই মানুষের গৌরব। এ-কথা জগতের যে কোনো মহৎ ট্র্যাজিডি সম্পর্কে সত্যি। Antigone মৃত্যুবরণ করেছিল শুধু ভাই-এর প্রতি স্নেহবশে নয়, যে রাষ্ট্র বা রাজা মানুষের অপমান করে তার বিরুদ্ধতা করে। এইজন্যেই সে গৌরবান্বিতা। যোগেশে এই human dignity-র একান্ত অভাব। সে বিরুদ্ধ শক্তির কাছে একেবারে পরাজয় স্বীকার করেছে। সে মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে কেবল কেঁদেছে—কেবল আমাদের করুণা ভিক্ষা করেছে। Sentimentality হল দুর্বলতা ; কোনো চরিত্রের এইটিই যদি বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে সে চরিত্র tragic আয়তন লাভ করতে পারে না তবে দুঃখবিলাসী সাধারণ মানুষকে কাঁদাতে পারে—সেই কান্নায় কিছু relief আছে। বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি যাতেই একটু নাড়া খায়—সে হাসিতেই হোক আর কান্নাতেই হোক—তাই বেশ লাগে—শুকতুনি-খাওয়া মুখে কালেভদ্রে একদিন মাংসের উগ্র ঝালে নাক দিয়ে জল পড়ার মতো। আসল কথা যোগেশের চরিত্রে ট্র্যাজিডির নায়ক হবার মতো আত্মিক শক্তি নেই। সে নির্বীর্য। কারও যদি মনে হয় সহ্য করার শক্তিতেই বীর্যের প্রকাশ তাহলে সে-কথা অবশ্য-স্বীকার্য। সহ্যের সেই অপরিসীম শক্তির বিকাশ আছে Œdipus the King-এ, Œdipus at Coloneus-এ, এমনকি Synge-এর একাঙ্ক নাটক *Riders To The Sea*-তে। কিন্তু যোগেশ তো সহ্য করছে না—সে ভারসাম্য হারিয়ে অমানুষ হয়ে গিয়েছে—আপন পূর্ব-ব্যক্তিত্বের এতটুকু তার অবশিষ্ট নেই এবং তার কোনো পরিচয়ও নাট্যকার আমাদের দেন নি। এ-ক্ষেত্রে তাই সে কথাও ওঠে না। ফলে এ-চরিত্র আমাদের মনে কোনো শ্রদ্ধা, কোনো বিস্ময় জাগাতে অক্ষম। Galsworthy-র নাটক Justice-এর নায়ক একজন সাধারণ কেরাণী তবু তার একটু চরিত্র-চ্যুতি, সেই tragic error, সেটি যে নৈতিক চ্যুতি নয় তাই প্রমাণ করবার জন্যে এবং নায়কের দুঃখ সইবার শক্তিকে দর্শকের কাছে

উদ্ঘাটিত করবার জন্যে Galsworthy-র কি প্রস্তুতি। গিরিশচন্দ্র এ সব দিকে মনই দেন নি। এবং catastrophe-টি প্রথম দৃশ্যেই ঘটিয়ে দিয়ে আর নায়ককে মদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গিরিশচন্দ্র villain-এর ফন্দি, ফেতরাজি এবং নানারকম আইনের মারপ্যাচ দেখাতে ব্যস্ত। শেষে শিশুহত্যার মর্মন্তুদ দৃশ্য অবতারণা করে তিনি আরও চোখের জল দাবী করছেন এবং প্রফুল্লের গলা টিপিয়ে তিনি villain-এর চূড়ান্ত পৈশাচিকতা প্রদর্শন করছেন। তাতে দর্শক কিছু বীভৎস রসের আস্বাদন পাচ্ছে। কিন্তু যোগেশের ট্র্যাজিডিতে এর কি প্রয়োজন ছিল? সে ত স্ত্রীকে পথে মরতে দেখে মদের সন্ধানে গিয়েছে এবং ছেলের হাত মুচড়ে চারটি পয়সা কেড়ে নিয়েছে। তবে আর কেন? নাটক রচনায় কোনো economy বা পরিমাণবোধ গিরিশের নেই। অন্য পক্ষে নায়কের যে বৈশিষ্ট্য দর্শকচিত্তকে শুধু উদ্বেলিতই করে না, মানব মনের গভীরতর স্তর-স্তরান্তরকে অবারিত করে মানুষের চরিত্রের দুর্লক্ষ্য, দুর্জ্ঞেয় মূলের রহস্যময়তার দিকে ইঙ্গিত করে, আবার নায়কের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও জটিলতাও প্রকাশ করে সেই inner conflict বা অন্তর্দ্বন্দ্ব যোগেশে একান্ত অনুপস্থিত। ফলে নাট্যরস জোলো হয়ে গেল। আর ভজহরির আকস্মিক দয়ায় যাদব রক্ষা পাওয়ায় দর্শক চোখের জল মুছে 'ভগবান, তুমি আছ' বলতে বলতে বাড়ি গেল। এ-রকমটা ঘটতে দেখেছি England-এ অষ্টাদশ শতকের domestic tragedy-তে। সেটা ছিল sentimental নাটকের যুগ—ঐ নামেই তা চিহ্নিত। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ও সেখানে দেখা গিয়েছে ঐ যুগেই। মধ্যবিত্তের নীতিবোধের সঙ্গে এই নাটকের উদ্ভবকে সংযুক্ত করা হয়ে থাকে।

কিন্তু 'প্রফুল্ল'—অর্থাৎ ঐ poetic justice নির্ভর, sentimental, মধ্যবিত্তের দুর্বলতা-সর্বস্ব নাটকখানি যদি বাংলায় আদর্শ ট্র্যাজিডি হয় এবং বাঙালী মঞ্চ-পৃষ্ঠপোষকদের প্রিয়তম নাটক হয় তাহলে শেক্সপীয়রের সে মঞ্চে অবতারণ করা বিপদ। খাস ইংলণ্ডেও, নিজের জীবদ্দশাতেই শেক্সপীয়র দেখেছিলেন, লোকে ওথেলো আর তেমন পছন্দ করছে না, চাইছে Beaumont and Fletcher-এর *The Maid's Tragedy* এবং Welster-এর স্থূল, বিকৃত, ত্রাস-সর্বস্ব *The Duches of Malfi* বা কিছু পর Ford-এর *It's Pity She is a Whore.* কিন্তু এঁরা রেনেসাঁস নাটকের decadence বা অবক্ষয় সূচিত করছেন। আর বাংলাদেশে নাটকের উঠতি কালেই এই দশা। শেক্সপীয়রের

সার্থক আলোচনা বাংলায় হবে কেমন করে। তবু এক ইংরেজ অধ্যাপকের (Humphry House) এক ইংরেজি প্রবন্ধে (যার স্বর্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত অনুবাদ পরিচয়-এ বেরিয়েছিল) বাঙালী মেয়ের (এবং মা কালীর) শেক্সপীয়রীয় স্বীকৃতি প্রমাণিত দেখে 'বিষাদে হরিষ' ঘটে। শেক্সপীয়ারের সনেটে সেই বিখ্যাত 'Dark Lady' না কি বাঙালী শ্যামাঙ্গী।

বাংলা মঞ্চে শেক্সপীয়র বর্জিত—সে প্রমথ চৌধুরী (বীরবল নন), দানী বাবু, গিরিশ ঘোষ প্রমুখের চেষ্টা সত্ত্বেও। কিন্তু শেক্সপীয়র বাঙলাদেশে, সেই ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ির মঞ্চে, *Julius Caeser*-এর দৃশ্যাবলী দেখানোর সময় থেকে আজ পর্যন্ত বেঁচে আছেন শুধু শখের নাট্যগোষ্ঠীদের চেষ্টায়। এঁদের চেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে কোনো সজীব সমালোচনার বিচিত্র ধারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে নি ঠিক, কিন্তু কৌতূহলী মহল মাঝে মাঝে, মূলে হোক, অনুবাদে হোক, শেক্সপীয়রকে পেয়েছেন। এই শখের গোষ্ঠীগুলি অবশ্য শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠান এবং এঁরা যে রুচির অনুশীলন করেন তা সাধারণ থিয়েটার দর্শকের রুচির চেয়ে অনেক উন্নত। তাহলে কি শেক্সপীয়রপ্রীতি নির্ভর করে রুচির মান উন্নয়নের ওপর? না কি প্রতীচ্য শিক্ষার প্রসারের ওপর? তাহলে তাঁর বা যে-কোনো মহৎ সৃষ্টির সর্বজনীনতার তত্ত্বটি নতুন করে ভাবা দরকার।

উনিশ শতকের চোখে শেক্সপীয়র

শেক্সপীয়রের নাটকে হত্যা রসভঙ্গদোষ দুষ্ট

বর্বরস্বভাব এবং রক্তপ্রিয় অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণ গ্রীক ট্র্যাজিডিকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা তাঁহাদিগের প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল। তাই ইংরাজি সাহিত্যেও এই ট্র্যাজেডি অনায়াসে প্রবেশলাভ করিয়াছে। সেক্সপীয়রের অতুল্য প্রতিভা ট্র্যাজেডির আনন্দে মাতিয়াছিল। তাঁহার রুচি এমন পরিশুদ্ধ হয় নাই যে, সেই ট্র্যাজেডির দোষ দর্শন করিয়া তাহা পরিবর্জন করে। তিনি তাঁহার সমস্ত গুণপনা ও কবিত্বশক্তি সেই ট্র্যাজেডির মধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। সেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডি সুতরাং জগতের এক অতুল্য পদার্থ হইয়া পড়িয়াছে। লোকে সেক্সপীয়ারের প্রতিভাসম্পন্ন কবিত্বের স্বর্ণময় নল দিয়া বিষপান করিয়াছে। আজি আমরাও সেক্সপীয়ারের পাঠক, পাঠক কি! তাঁহাকে পূজা করিতেছি।

…প্রাচীন আর্যসাহিত্যে যদিও ইউরোপীয় বিয়োগান্ত রীতি অবলম্বিত হয় নাই বটে, কিন্তু বিয়োগান্ত রীতির যাহা প্রধান গুণ তাহা আর্যসাহিত্যে ছিল। যে করুণ রস বিয়োগান্ত রীতির প্রধান গুণ তাহা আর্যসাহিত্যে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা সেক্সপীয়ারের ডেসডিমোনার জন্য যেরূপ সন্তপ্ত হই, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, শকুন্তলা প্রভৃতি কবিকল্পিত নায়িকার জন্য কি তদপেক্ষা অনধিক পরিমাণে সন্তপ্ত হইয়া থাকি? অথচ তাঁহারা কেহই ডেসডিমোনার ন্যায় নৃশংসরূপে নিহত হন নাই। বাল্মিকী মহাকবির ন্যায় কেমন কাল্পনিক সুন্দর দৃশ্যে সীতাকে আপন কার্য হইতে অপসারিত করিয়াছেন। সরলা; নিষ্পাপিনী ডেসডিমোনা নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়া স্বর্গে যাইলেন; সীতা কবি-কল্পিত স্বারিথে দেবতাগণের পুষ্পবৃষ্টি ও আনন্দধ্বনি সহকারে স্বর্গারোহন করিলেন।…

ভবভূতি বা বাল্মীকির সহিত এখানে সেক্সপীয়ারের তুলনা হইতেছে না। আমরা জানি, সেক্সপীয়ারের অনেক গুণ আছে, সে জন্য তিনি চিরস্মরণীয়

হইবার যোগ্যপাত্র। তিনিও একজন মহাকবি। কিন্তু এখানে tragic রসের বিচার হইতেছে; সন্তাপের স্থায়ী ফলের কথা হইতেছে। এ প্রস্তাব কবিত্বের বিচার নহে। তাহা স্বতন্ত্র কথা। সীতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, দময়ন্তী সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। চিরদুঃখিনী হইয়া তাঁহারা জগজ্জনের হৃদয়মন্দির চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়া আছেন। নিহত না হইয়াও তাঁহাদের বিয়োগ জগতের নিকট চিরসন্তাপের কারণ হইয়াছে। সকলেই তাঁহাদের জন্য কাতর। তবে ত হত্যা ব্যতীতও সন্তাপ সমান স্থায়ী হইতে পারে।

সে যাহা হউক, অনেকে হয় তো বলিবেন, ডেসডিমোনার জন্য কি আমাদের হৃদয় কাঁদে না? হৃদয় কাঁদে বটে, কিন্তু হত্যাকাণ্ড দ্বারা নিহত হইলে যে অশ্রুপাত হয়, তাহার সহিত সীতার মত বিয়োগহেতু অশ্রুপাতের একটু স্বতন্ত্রতা আছে।

সেক্সপীয়ারে আমরা আইমজিন এবং ডেসডিমোনার মত পতিপরায়ণতা ও প্রেমের দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাই। ডেসডিমোনার প্রেম জুলিয়েটের মত 'বুকচাপড়ানি' প্রেম নহে। তাহা অতি গভীর, অতি শান্ত ও হৃদয়ব্যাপী, অথচ তেমনই উগ্র, উষ্ণ ও প্রবল। সে প্রেম চক্ষের নেশা নহে। সেই প্রেমভূষিতা ডেসডিমোনা সর্বজনমনোহরা, তাঁহার হৃদয়মাধুরীতে তিনি সকলের মন হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চিত্র আঁকিয়াই সেক্সপীয়ার মূরের চরিত্র ফুটাইতে ফুটাইতে ডেসডিমোনার খুনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে বসিলেন। তারপর পাঠক ডেসডিমোনার খুনের নিমিত্ত ষড়যন্ত্রে ও ঘোর হত্যাব্যাপারে নিমগ্ন হইলেন। ডেসডিমোনা নির্দয়রূপে নিহত হইলেন। ডেসডিমোনার সৃষ্টি কি কেবল এইরূপ ঘোর হত্যা-ব্যাপারের নিমিত্ত? তাঁহার হত্যা-ব্যাপার দেখিয়া কি অশ্রুপাত হয়? না শরীর শিহরিয়া ওঠে? ডেসডিমোনার পর এমেলিয়া নিহত হইল। মনে হয়, সেই ছুরিকাঘাতে যেন নিজ বক্ষ বিঁধিল। কি ভয়ানক!

ম্যাকবেথ আরও ঘৃণিত ব্যাপার। ম্যাকবেথের সর্বত্র হত্যা;—তাহার গোড়ায় হত্যা, তাহার মধ্যে হত্যা, তাহার শেষে হত্যা। নাটকের প্রায় সমুদায়ই কসাইখানা; মধ্যে যখন লেডি ম্যাকবেথ উদয় হইয়া বলিতেছেন, আমার রক্তহস্ত যে কিছুতেই স্খলিত হইতেছে না, তখন যেন সেই কসাইখানা আরও দেদীপ্যমান হইতে থাকে। তাঁহার সামান্য অনুতাপের চিত্র সেই

রক্ত-গঙ্গাকে আরও উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়া দেয়। প্রকাণ্ড গৃহদাহে দু ফোঁটা জলের মত সেই অনুতাপ অগ্নি-শিখাকে আরও যেন প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। সে অনুতাপ বিষকুম্ভে ক্ষীর মাত্র। হত্যা, নাটকের সর্বত্র; অনুতাপ একস্থানে মাত্র। সে অনুতাপচিত্র রক্ত-গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। তাহা ঘোর হত্যাপূর্ণ নাটকের প্রলোভনস্বরূপ।

সেক্সপীয়রের সমস্ত বড় বড় নাটকে এই বীভৎস ব্যাপার। হ্যামলেটের শেষ অঙ্কও কসাইখানা। রিচার্ড দি সেকেণ্ড এবং থার্ড, জন, লিয়ার কোরাইওলেনাস প্রভৃতি সকল নাটকই হত্যাকাণ্ডে পরিপূর্ণ। জুলিয়স সিজরে কি ভয়ানক রবে এই কথাগুলি প্রতিশব্দিত হয়—Beware the ides of March! সিজরের হত্যার পর এই শব্দগুলি মনে হইলেই হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে! কোথায় নাটকীয় করুণ রস! আজিও আমরা ম্যাকবেথের নাম করিলে শিহরিয়া উঠি, রিচার্ড দি থার্ডের ঘৃণিত ব্যাপার হইতে শত হস্ত দূরে যাই! নাটক পড়া দূরে থাক, মনে হয় Tragedy আর পড়িব না।

সেক্সপীয়ার কি শুদ্ধ তাঁহার ট্র্যাজেডিতেই শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়াছেন? লিখিতেছেন Comedy, সেখানেও সেই ছুরিকা। Merchant of Venice পাঠ কর, সেখানেও তোমার চক্ষু সমক্ষে সেই ছুরিকা শাণিত হইতেছে। নাটককে কসাইখানায় পরিণত করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ এবং অতি ঘৃণিত ব্যাপার।···নাটক নবরসের আশ্রয়ভূমি। Tragedy করুণ ও ভয়ানক রসের আশ্রয়। হত্যা বা খুন কখন ভয়ানকের চরম সীমা নহে। রসের পরিপুষ্টিসাধন করিতে হইলে তাহাকে আনন্দজনক করা চাই। যাহা আনন্দজনক না হয় তাহা রসের পরিচায়ক নহে। নাটককে কসাইখানায় পরিণত করাতে রসের পরিপাক হয় না, তাহা কবিত্বের হানিজনক এবং রসভঙ্গদোষে দুষ্ট হয়। Butchery is not poetry.

আমরা একথা বলাতে, সেক্সপীয়ারের সকল ট্র্যাজেডিতেই যে একেবারেই কবিত্ব নাই, এমন কথা বলিতে চাই না। আমরা সাহিত্যে শুদ্ধ খুনেরই নিন্দা করিতেছি। খুন না করিলে কি করুণ রসের পরিপুষ্টিসাধন করা যায় না? যিনি না করেন, তিনি বিভাবাদি দ্বারা রসের পরিপাকসাধনে নিতান্ত অসমর্থ। খুনের প্রতি মানুষের স্বভাবতই ঘৃণা। খুনের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিবার জন্য নাট্যসাহিত্যের সাহায্য আবশ্যক হয় না। প্রকৃত

প্রস্তাবে ওথেলোর ন্যায় কয়জন লোক দেখা যায়? বাস্তবিক সেক্সপীয়ার ওথেলোকে যেরূপ অতিরঞ্জন করিয়াছেন, তাহাতে ওথেলোও যেন কিয়ৎ পরিমাণে অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। লোক ততদূর নির্বোধ হয় কি না সন্দেহ,—বিশেষতঃ ওথেলোর মত একজন বীর সেনাপতি। সেক্সপীয়ারের কিং জনে যে স্থলে হিউবার্ট উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা আর্থারের চক্ষু উৎপাটন করিতে আসিয়াছে এবং সেই কার্যের উদ্যোগ হইতেছে, সে স্থলের অভিনয় কতই না ঘৃণার উৎপাদন করে। রক্ষা এই শেষে সে কার্য ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু দেখা গেল নৃশংস জনের পীড়নের জ্বালায় সেই রাজপুত্র কারাবাসের উচ্চপ্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া মরিল। তাহার আত্মহত্যা কাহার না হৃদয়ে অনর্থক বেদনার উৎপাদন করে? এরূপ বীভৎস চিত্রের ফল কি? রাজ্যলোভের ঘৃণিত পাপ-চিত্রে দেখাইবার জন্য কি এই চিত্রের অবতারণা? কয়জন রাজাই বা সেরূপ ঘৃণিত হইতে পারেন? তবে সে চিত্র সাধারণ লোকের সম্মুখে কেন? নাটক কিছু ইতিহাস নহে। ইতিহাসের সম্পত্তি ইতিহাসে রাখিয়া দিলেই ভাল ছিল। সেক্সপীয়ার যেখানে butchery না করিয়া ট্র্যাজেডি রচনা করিয়াছেন, আমরা সে রচনার যারপরনাই প্রশংসা করিয়া থাকি। তাঁহার অনেক tragi-comedy এই ধাতুতে গঠিত। সেরূপ রচনাকে আমি ট্র্যাজেডি শ্রেণীভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত নহি। আইমজিন তত কষ্ট সহ্য করেন নাই যে, তিনি চিরদুঃখিনী দময়ন্তী বা সীতার মত জগতের সন্তাপভাজন হইতে পারেন। সিম্বেলিন বিয়োগান্ত হইলে যদি আইমজিনের সহিত লিয়নিটসনের মিলন না ঘটিত, তাহা হইলে আইমজিনেতে লোক অধিকতর কাতর হইত। বিয়োগে কাতরতা উৎপাদন করে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডে বীভৎস রসের সঞ্চার হইয়া রসভঙ্গ ঘটে। ডেসডিমোনাকে মনে হইলেই তাঁহার খুন মনে হয়, অমনি হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। সুতরাং রসভঙ্গ ঘটে।

পূর্ণচন্দ্র বসু। সাহিত্যে খুন। সাহিত্য, ১৩০২।

নাটকের নায়ক বিরাটচারী

আমার বিশ্বাস যে নায়ক সর্বগুণান্বিত হওয়া চাই, এই যে নিয়ম, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, নাটকের বিষয় মহৎ হওয়া চাই। এই জন্য প্রায় অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকেরই নায়ক রাজা, বা রাজপুত্র। Shakespeare-এর সর্বোৎকৃষ্ট

নাটকগুলির নায়ক হয় সম্রাট, নয় রাজা, বা রাজপুত্র; (Macbeth পরে রাজা হইয়াছিলেন, এবং Othello একজন General)।

…নায়ক সর্বগুণসম্পন্ন বা দোষবিরহিত হইবেন, ইহা একটু বেশি রকমের বাঁধাবাধি নিশ্চয়। তাহাতে দোষশূন্য মানুষকে নায়ক করিলে অপ্রাকৃত নায়ক হয়।…

মহাকবি Shakespeare এ নিয়ম মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের বিষয় মহৎ বটে, কিন্তু তাঁহার নায়কগণের বিশেষ কোনও গুণ নাই। Hamletএর গুণের মধ্যে পিতৃভক্তি। কিন্তু তিনি সমস্ত নাটকখানিতে কেবল ইতঃস্তত করিয়াছেন। King Lear ত উন্মাদ। সন্তানের পিতৃভক্তির পরিচয়স্বরূপ তিনি জানেন কেবল মৌখিক উচ্ছ্বাস। তাহার পরে তাঁহার প্রধান দুঃখ Regan ও Gonerill তাঁহার পার্শ্বচর কাড়িয়া লইয়াছেন। পিতৃভক্তির অভাব দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার আক্ষেপ উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। Othello ঈর্ষাপরবশ হইয়া এতদূর অন্ধ হইলেন যে, প্রমাণ না চাহিয়াই সাধ্বী স্ত্রীকে বধ করিলেন। Macbeth তো নিমকহারাম। Antony কামুক। Julius Caesar দাম্ভিক। কিন্তু Shakespeare এই নাটকগুলিতে সেইসব চরিত্রদৌর্বল্যের বা পাপ-প্রবৃত্তির ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছেন। সব ক্ষেত্রেই পাপের নিষ্ফলতা বা আত্মহত্যা দেখাইয়াছেন। Goethe-র Faust-এও তাই।

কিন্তু Shakespeare এই গ্রন্থগুলিতে এত উচ্চ চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার নায়কদিগের চারিদিকে তাহারা একটি জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সেই নাটকগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছে। Hamlet-এ Horatio, Polonius, Ophelia; Lear-এ Kent, Fool, Cordelia; Othello-তে বিশুদ্ধচরিত্রা Desdemona ও তাঁহার সহচরী; Macbeth-এ Banquo ও Macduff; Antony and Cleopatra-তে Octavious; Julius Caesar-এ Brutus ও Portia নায়কদিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

তথাপি Shakespeare কেন এরূপ করিলেন? তাহার কারণ বিবেচনা করি এই যে, তিনি ধন ও ক্ষমতায় গর্বিত ইংরাজ। পার্থিব ক্ষমতাই তাঁহার কাছে সমধিক লোভনীয়। তিনি মহৎ চরিত্রের অপেক্ষা বিরাট চরিত্রে সমধিক মুগ্ধ হইতেন। বিরাট ক্ষমতা, বিরাট বুদ্ধি, বিরাট বিদ্বেষ, বিরাট

অসূয়া, বিরাট প্রতিহিংসা, বিরাট লোভ তাঁহার কাছে সমধিক লোভনীয় ছিল। নিরীহ শিশু, পরদুঃখকাতর বুদ্ধ বা ভক্ত চৈতন্য বোধহয় তাঁহার মতে অতি ক্ষুদ্র চরিত্র। স্বার্থত্যাগের মহত্ব তিনি যে একেবারে বুঝিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু চরিত্রের মাহাত্মকে তিনি ক্ষমতা ও বাহিরের জাঁকজমকের নীচে স্থান দিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কালিদাস ও ভবভূতি। ১৩২২

শেক্সপীয়রের নাটকে প্রকৃতির উপরে মানুষের আধিপত্য

শেক্সপীয়রের নাটক পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হয় যে, শেক্সপীয়র সমস্ত হৃদয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসিলেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার সামাজিকতা বড় নাই। এবং তাঁহার নাটকে নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনাবলীর উপর প্রকৃতির যে প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহা কেবল ছায়ার মত চতুর্দ্দিকের মানব-হৃদয়ে ও ঘটনার উপরে ঘনাইয়া আসে মাত্র ; কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যের ন্যায় প্রকৃতি সেখানে মানবজীবনের সহিত বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া মানবহৃদয়ের সহমর্মিনী সঙ্গিনী হইয়া উঠে নাই, এবং মানবী সখীর সুখে দুঃখে মানবীর ন্যায় সে বিচলিত হয় না বা মানবীর বিরহে একান্ত সন্তপ্ত ও মিলনে অতিমাত্র হৃষ্টও হয় না।

যেখানে সমগ্র নাটকটিকে শেক্সপীয়র লোকালয় হইতে বহু দূরে এক জনহীন দ্বীপে লইয়া ফেলিয়াছেন, সেখানেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার পারিবারিক প্রীতি সংস্থাপিত হয় নাই—প্রকৃতির অনেকগুলি দানবী শক্তি যেখানে নির্বিবাদে আধিপত্য করিতেছিল, সেইখানে তিনি এক মহামহিম মানব প্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। এই মানব প্রভু প্রস্পেরোকে বন্য শক্তি আরিয়েল ও ক্যালিবান যমের মত ভয় করিয়া চলে এবং যদি কালক্রমে এই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আপন স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়, এই আশায় দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রস্পেরো অথবা মিরান্দার সহিত এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির কাহারও কোনরূপ সমকক্ষতা নাই এবং বহুদিন একত্র বাসে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাও জন্মে নাই। কেবল প্রস্পেরো আদেশ করেন, আরিয়েল ও ক্যালিবান—প্রকৃতির দুই বিভিন্ন শক্তি—স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই আদেশ পালন করে। প্রস্পেরো বলেন ঝড় উঠাও ; প্রকৃতির সমস্ত শক্তি সাগরে তরঙ্গ তুলে, আকাশে বজ্রধ্বনি করে, পৃথিবীতে প্রলয়ের

রোল উঠাইয়া দেয়। প্রস্পেরো বলেন, এই চাহি—দাসেরা তাহাই সংসাধন করে। শেক্ষপীয়রে প্রকৃতির উপর মানব জয়ী হইয়াছে—প্রকৃতির উপর সে কর্তৃত্ব করে, প্রকৃতির সহিত ঘর করে না।…

শেক্ষপীয়রে প্রেমের সহিত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না। সেখানে সুখসুপ্ত চন্দ্রালোকে প্রণয়িযুগলের মনে পূর্ব পূর্ব কালের বহু প্রণয়কাহিনী আসিয়া উদয় হয় এবং পুরাতন কালের সমস্ত প্রেম এই নবীন প্রেমে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এবং এইরূপে যুগযুগান্তের মানবপ্রেম আসিয়া মানবকে আপনার মহিমায় অধিকতর ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু প্রকৃতি সেখানে মানবের সখীরূপে ফুটে না, হয় ছায়ার মত, নয় মানবের আজ্ঞাধীন সেবকরূপে অবস্থিতি করে। যেমন, মার্চ্যাণ্ট অফ ভেনিসে লোরেঞ্জো ও জেসিকার প্রণয়দৃশ্যে, অথবা টেম্পেস্টে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয় ঘটনায়।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্র ও কাব্য। ১৮৯৪

শেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্র চিত্ররূপময়

সেক্ষপীয়রের পাপের ছবিই সর্বাপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। আমরা কালিদাসে শ্মশান-বর্ণনা পাই না, নরকবর্ণনা পাই না, ম্যাকবেথ পাই না, ইয়াগোও পাই না। কিন্তু সেক্ষপীয়রের অদ্ভুত পাপসৃষ্টি ক্যালিবনের প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না।…

…যেখানে দশপনরটি পরস্পরবিরোধী ভাব যুগপৎ উদয় হইয়া অন্তরাকাশকে অন্ধকার করে, যেখানে হৃদয়ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত, যেখানে ভাবসন্ধি ভাবসবল হইবার কথা, সেখানে সেক্ষপীয়র ভিন্ন গতি নাই। একদিকে দুর্জয় দুরাকাঙ্খা রাশি রাশি পাপকার্যে রত হইতে বলিতেছে, আর একদিকে স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা বাধা দিতেছে। একদিকে পাপের স্মৃতি অনুতাপের ভরে হৃদয় ভারাক্রান্ত করিতেছে, আর তখনই সেই পাপ ঢাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, তখনই সে ভাব গোপনের জন্য কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যেন সে নয়, এইরূপ দেখাইতে হইতেছে; এসব হৃদবৃত্তির জটিলতা, মনুষ্যস্বভাবের অস্থিরতা, পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহের যুগপৎ বিকাশ, সেক্ষপীয়র ভিন্ন আর কেহ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারেন নাই, পারিবেনও না। সেক্ষপীয়র মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন। তুমি যেমন মানুষ চাও, সেক্ষপীয়র তেমনি মানুষ তোমায় দিবেন। তুমি শকুন্তলার মত সরলা মুগ্ধহৃদয়া

সামাজিক কুটিলতানভিজ্ঞা বালিকা চাও, মিরন্দা দেশদিমোনা লও। পাকা গিন্নী ঘরকন্নায় মজবুত, ভাঙে না, মচকায় না, এমন মেয়ে চাও, আচ্ছা, তোমার জন্য ডেম কুইকলি আছে। পতিপরায়ণা পতিব্রতা যুবতী চাও, পোর্সিয়া আছে; জগৎ মোহিত করিবার জন্য মায়াজাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, যে জালে পা দিতেছে, তাহারই সর্বনাশ করিতেছেন, এমন দুর্বুদ্ধিশালিনী ভুবনমোহিনী চাও, ক্লিওপেট্রা আছে। দুরাকাঙ্খায় জর্জরিত হৃদয়া, লোকের উপর আধিপত্য করিবার ইচ্ছায় পাষাণবৎ দৃঢ়সঙ্কল্পা, পুরুষকে পাপে প্রেরণ করিবার জন্য শয়তানরূপিণী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও, লেডি ম্যাকবেথ আছে। দেখিবে, এগুলি সব মানুষ। অমন যে পাষাণহৃদয়া ম্যাকবেথপত্নী, যে রাজ্যলোভে ক্রোড়স্থিত স্তন্যপায়ী আপন শিশুকে আছড়াইয়া মারিতে ক্ষুব্ধ হয় না, সেও স্ত্রীলোক। রাজার মুখ আপন পিতার মুখের মত বোধ হওয়াতে স্বহস্তে রাজহত্যা করিতে পারিল না।···নাটক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র লইয়াই ব্যস্ত। সে চিত্রে অনেক সৌন্দর্য কালিদাস দেখাইয়াছেন। কিন্তু আরও অনেক বাকী আছে। সেগুলি কালিদাসে মিলিবে না, তাহার জন্য সেক্ষপীয়রের শরণ লইতে হইবে। কালিদাসগ্রথিত সৌন্দর্য সেক্ষপীয়রেরও আছে। কালিদাসের পুরূরবা, শকুন্তলা অন্যত্র মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু সেক্ষপীয়রের প্রসপেরো আর কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রসপেরোর স্বভাব মনুষ্যহৃদয়গত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। প্রসপেরো মূর্তিমান শান্তি, পরোপকার ক্ষমতা তাঁহার আভরণ। প্রসপেরোর চরিত্র পাঠ করিলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এ একরকম সৌন্দর্য। আবার যখন ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধিতে বিবাদ হয়, সে সময়ের বর্ণনা কি সুন্দর নয়? ব্রুটস, এণ্টনি, হ্যামলেট, এমন কি, ম্যাকবেথ এই বিবাদহেতু কোন কাজই করিতে পারিতেছে না, একবার এদিকে একবার ওদিকে করিয়া দোলাচলবৃত্তি হইয়া রহিয়াছে, ইহা কি সুন্দর নয়? উহাদের জন্য কি আমাদের ক্ষুদ্রজীবী মনুষ্যের সহানুভূতি হয় না? ওরূপ সৌন্দর্য কালিদাসের কোথায়?···

সেক্ষপীয়রের হাস্যরসাকর চরিত্রবর্ণনা এক আশ্চর্য জিনিস। এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ফলস্টাফ কতবার অপ্রস্তুত হইল, কিন্তু সে অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নহে। যতবার তাহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ততবারই সে নতুন নতুন চালাকি বাহির করে, ঠকিবার পাত্র ফলস্টাফ একেবারেই নহে। প্যারোনস্ ফলস্টাফের সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাসের

বিদূষকগুলি কোনো কর্মেরই নহে। জীবনশূন্য প্রভাশূন্য খোসামুদে বামুন মাত্র।···

···কালিদাসের বাহ্যজগতে যেরূপ অসীম আধিপত্য, সেক্ষপীয়রের অন্তর্জগতে তেমনি। অন্তর্জগতেরও এক অংশে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন নহেন। যেখানে হৃদয়ের সুন্দর ও কোমল ভাবগুলি বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে বোধহয় কালিদাস অনেক অধিক মিষ্ট লাগে। কিন্তু অন্য সর্বত্র সেক্ষপীয়র উপমাবিরহিত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কালিদাস ও শেক্সপীয়র। বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ বৈশাখ

···তুমি বলেছ, সাহিত্য যদি লেখকের আত্মপ্রকাশই হবে, তবে শেক্সপীয়রের নাটককে কী বলবে।

শেক্সপীয়রের অনেকগুলি সাহিত্যসন্তানের এক একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে শেক্সপীয়রের আত্মপ্রকৃতির কোনো অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারিনে। ভালো নাট্যকাব্যে লেখকের আত্ম-প্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা করে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য। অন্তরে বাহিরে এই রকম একীকরণ না করতে পারলে কেবলমাত্র বহুদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তি-বলে কেবল রাফুকো প্রভৃতির ন্যায় মানবচরিত্র ও লোকসংসার সম্বন্ধে পাকা প্রবন্ধ লিখতে পারা যায়। কিন্তু শেক্সপীয়র তাঁর নাটকের পাত্রগণকে নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, অন্তরের নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত মাতৃরস পান করিয়েছিলেন, তবেই তারা মানুষ হয়ে উঠেছিল; নইলে তারা কেবলমাত্র প্রবন্ধ হত। অতএব এক হিসাবে শেক্সপীয়রের রচনাও আত্মপ্রকাশ, কিন্তু খুব সম্মিশ্রিত বৃহৎ এবং বিচিত্র।

শেক্সপীয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত ভাবশরীরী শেক্সপীয়রকে পাওয়া যায় যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মতো চতুর্দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে; যেখান থেকে ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেসডিমোনার প্রতি প্রীতি, ফলস্টাফের প্রতি সকৌতুক সখ্য, লিয়রের প্রতি সসম্ভ্রম করুণা, কর্ডেলিয়ার প্রতি সুগভীর স্নেহ শেক্সপীয়রের মানবহৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করছে।

…যেমন করেই দেখি, আমরা মানুষকেই চাই, সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে।

শেক্সপীয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে শেক্সপীয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে দিয়েছেন। তার অশ্রুজল চোখের প্রান্তে ঈষৎ বিগলিত হয়ে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্ছে না, তার হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে কেবল মুক্তাদন্তগুলিকে মাত্র বিকাশ করছে না—কিন্তু বিদীর্ণ প্রকৃতির নির্ঝরের মতো অবাধে ঝরে আসছে, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির ক্রীড়াশীল উৎসের মতো প্রমোদে ফেটে পড়ছে। তার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শনশিখর আছে যেখানে থেকে মানবপ্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

রবীন্দ্রনাথ। লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লিখিত পত্রাংশ। ১২৯৯

সংকলক : পার্থ বসু

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

শেক্সপীয়র: পূর্বাভাস

'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি' এই বলে যখন বাঙলার কবি শেক্সপীয়রকে প্রশস্তি নিবেদন করেছিলেন তখন তিনি কালিদাসের প্রতি হয়তো অবিচার করেছিলেন কিন্তু শেক্সপীয়রের প্রতিভা সম্পর্কে কোনো অত্যুক্তি করেন নি। কবি-প্রকৃতি সম্পর্কে ডে লা মেয়ার লিখেছেন,—"It shares the life that is common to all men, but it possesses life in this kind more acutely and abundantly, and it has the faculty of communicating it." জীবনের সঙ্গে এই গভীর যোগ শেক্সপীয়রের মধ্যে আমরা পরিপূর্ণভাবে পাই, তাই তিনি শুধু মহৎ কবিই নন, আন্তর্জাতিক আবেদনের দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ আর কোনো লেখক আছেন কিনা সন্দেহ। বড় কবি মাত্রই মানুষের কবি। তবে শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে এ-কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যে মানুষ এক দিকে paragon of animals ও অন্য দিকে quintessence of dust সেই মানুষের মনের গভীর গহনে যাঁরা কিছুটা প্রবেশাধিকার পেয়েছেন শেক্সপীয়র তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। তাই সত্যই বলা যেতে পারে যে শেক্সপীয়র রোম-নগরীকে টাইবার-নদের তীরে আবিষ্কার করেন নি, মানুষের দুর্গম অন্তর প্রদেশে তিনি রোমকে খুঁজে পেয়েছেন। এই জন্যই শেক্সপীয়র সব যুগের সব দেশের পাঠকের কাছে সমানভাবে বরণীয়।

যে যুগে শেক্সপীয়র জন্মেছিলেন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে সে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়—Renaissance। মধ্যযুগের সংকীর্ণতার অবসান ঘোষণা করল এই নতুন যুগ। ধর্মতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের বাইরে কোনো কিছুই মধ্যযুগে বিকাশ লাভ করতে পারে নি। সাহিত্য ও ললিতকলা ধিক্কৃত হওয়ার ফলে লুপ্ত হতে চলেছিল। রেনেসাঁস্ নতুন করে তাদের স্বীকৃতি দিল। মনুষ্যত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করল। মানুষের মনকে অবদমিত রেখে ও তার দেহকে যন্ত্রণা দিয়ে যে রুদ্ধদ্বার জীবনকে মধ্যযুগে আদর্শ ধরা হত সে যে

কত বড় মিথ্যা তাও প্রমাণ করল। বুঝিয়ে দিল, বেঁচে থাকার অর্থ মরে থাকা নয়; যে আনন্দে গড়া মানুষের অঙ্গ তার কোনো অন্ত নেই। এই আনন্দকে অস্বীকার করে নয়, এই আনন্দকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে জীবনের সার্থকতা। মানুষের মন অসংখ্য বন্ধনের মাঝে সংকুচিত হতে থাকে, বাধা-নিষেধের নিগড় সরিয়ে নিলে তবেই তার স্বাভাবিক বিকাশ। আর বিকাশের অভাবে কিছুতেই মানুষ শান্তি পেতে পারে না। (রেনেসাঁস্ মানুষের দেহমনকে বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে শিখিয়েছে। নতুন যুগের সবচেয়ে বড় আদর্শ তাই—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।)

এ-বাণী শেক্সপীয়রের নাটকের পাতায় পাতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি নিজে মহানগরের কোনো ধনী পরিবারের ঐশ্বর্যের মধ্যে যদি প্রতিপালিত হতেন তাহলে তাঁর মানুষের জন্য এত দরদ থাকত কি না সন্দেহ। যাই হোক, তাঁর জীবন-কাহিনীর অনেকটাই এখনও রহস্যাবৃত হয়ে আছে। তাঁর যুগে সাহিত্যিকদের জীবনী লেখার বিশেষ প্রথা ছিল না। শেক্সপীয়রের জীবন সম্পর্কে যা জানা যায় তা সামান্য আর সে সম্পর্কেও সব সময় শেক্সপীয়র-বিশেষজ্ঞগণ একমত নন। De Quincey অনেক দিন পূর্বে যে-কথা বলেছিলেন তা এত দিন পরেও বলা চলে : "That he lived, and that he died, and that he was a little lower than the angels : these make up pretty nearly the amount of our undisputed report."

ওয়ারইক্‌শায়ারের অন্তর্গত এভন্-নদীর তীরে স্ট্রাট্‌ফোর্ড শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারের তৃতীয় সন্তানরূপে উইলিয়াম্ শেক্সপীয়রের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের তর্ক আজও শেষ হয় নি। (সম্ভবত ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তাঁর জন্মদিন।) (স্ট্রাট্‌ফোর্ডের হোলি ট্রিনিটি চার্চে ২৬শে এপ্রিল তারিখে এই জন্মের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সাধারণত জন্মের কয়েকদিন পরেই এটা করা হত।) তাঁর পিতা জন্ শেক্সপীয়র শুধু বিচক্ষণ ব্যবসায়ীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্ট্রাট্‌ফোর্ডের এক বিশিষ্ট নাগরিক। শেক্সপীয়রের মা মেরি আর্ডেন্-পরিবার থেকে এসেছিলেন। শেক্সপীয়র তাঁর *As you Like It* নাটকে এই Arden নামকে অমর করে রেখে গেছেন।

স্ট্রাট্‌ফোর্ডের স্কুলে শেক্সপীয়র শিক্ষালাভ করেন। লাটিন ভাষা তিনি নিশ্চয়ই মোটামুটি শিখেছিলেন, তবে গ্রীক বোধ হয় বিশেষ শিখতে পারেন নি। ১৫৭৭ সালের কাছাকাছি শেক্সপীয়রের পিতা আর্থিক অসুবিধায় পড়েন।

প্রচলিত আছে যে শেক্সপীয়রের স্কুলের পাঠ এই সময় বন্ধ হয় যাতে তিনি পিতার ব্যবসায়ে যোগ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। ১৫৮২ সালে ১৮ বছর বয়সে তিনি অ্যান্ হ্যাথওয়েকে বিবাহ করেন। সম্ভবত ইনি পার্শ্ববর্তী শটারিগ্রামের রিচার্ড হ্যাথাওয়ের কন্যা। (এঁর বাড়ীর একাংশ এখনও আছে এবং 'অ্যান্ হ্যাথাওয়ের কুটীর' নামে পরিচিত।) অ্যান্ শেক্সপীয়রের চেয়ে আট বছরের বড় ছিলেন। *Twelfth Night* নাটকে অর্সিনো ভায়োলাকে বলেছে, স্ত্রী যদি স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় হয়, তাহলে তার স্বামীর ভালোবাসা হারাবার ভয় থাকে। কেউ কেউ এই উক্তির মধ্যে শেক্সপীয়রের ব্যক্তিগত মত প্রচ্ছন্ন দেখেন। তাঁরা মনে করেন শেক্সপীয়রের নিজের বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয়নি। তাঁর প্রথম সন্তান একটি মেয়ে, নাম সুজানা। জন্ম ১৫৮৩ সালের মে মাসে। ১৫৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেক্সপীয়রের দুটি যমজ-সন্তান হয়, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলে হ্যাম্নেটের মৃত্যু হয় ১৫৯৬ সালে। মেয়ে জুডিথ শেক্সপীয়রের মৃত্যুর পরও বেঁচেছিলেন।

১৫৮৪ থেকে ১৫৯২ সাল পর্যন্ত শেক্সপীয়রের জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনা জানা যায় না। কিংবদন্তী আছে, শেক্সপীয়র একবার সার্ টমাস লুসির হরিণ চুরি করেন। ১৫৯২ সালে শেক্সপীয়র লণ্ডনে এসেছিলেন জানা যায়, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে তিনি এখানে এসেছিলেন জানা যায় না। জীবনের বহু বিচিত্র দিকের অভিজ্ঞতার পরিচয় আমরা শেক্সপীয়রের নাটকে পাই। সেই সব অভিজ্ঞতা শেক্সপীয়র এই কয় বছরে আহরণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সমসাময়িক যে সব খ্যাতনামা নাট্যকারেরা এই সময় নাটক লিখছিলেন (Marlowe, Psele, Nashe প্রভৃতি), শেক্সপীয়র ক্রমশ তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। ১৫৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাট্যকার গ্রীণের মৃত্যুশয্যা থেকে লেখা এক চিঠি থেকে এ খবর আমরা জানতে পারি। প্লেগ-রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য যে সময় রঙ্গালয় বন্ধ থাকে সেই সময় শেক্সপীয়র তাঁর কাব্য রচনা করেন, ১৫৯৩ সালে '*Venus and Adonis* ও ১৫৯৪ সালে *The Rape of Lucrece*। এই দুটি কাব্যই শেক্সপীয়র সাদাম্পটনের আর্লকে উৎসর্গ করেন। ১৫৯৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শেক্সপীয়র লর্ড চেম্বারলিনের অভিনেতৃদলের অংশীদার হন। ১৫৯৯ সালের পর শেক্সপীয়রের অধিকাংশ নাটকই গ্লোব-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ১৫৯৫ থেকে ১৬০০ সালের

মধ্যে শেক্সপীয়র তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। তবে ১৬০৯ সালের পূর্বে এগুলি মুদ্রিত হয় নি। ১৫৯৬ সালে শেক্সপীয়র পরিবারের কুল-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাঁরা নিজস্ব প্রাবরণ-চিহ্ন (coat-of-arms) লাভ করেন। এর পরের বছর শেক্সপীয়র New Place নামে বাগান-বাড়ি কেনেন। কিন্তু ১৫৯৭, ১৫৯৯ ও ১৬০৪ সালে তাঁকে লণ্ডনে থাকতে দেখা যায়। শেক্সপীয়র নিজেও মাঝে মাঝে অভিনয় করেছেন, প্রধানতঃ ১৫৯৮ সালের আগে। কথিত আছে, তিনি যে সব ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তার মধ্যে *As You Like It* নাটকের ভৃত্য Adam-এর চরিত্র অন্যতম। ১৬১০ সালের কাছাকাছি শেক্সপীয়র ষ্ট্রাটফোর্ডে ফিরে আসেন। ১৬১৩ সালের পরে বোধ হয় তিনি আর কিছু লেখেন নি। ১৬১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল শেক্সপীয়রের মৃত্যু হয়। প্রচলিত আছে, ড্রেটন্, বেন্ জন্সন্ প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে এক প্রমোদভোজনে অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন ও সেই জ্বরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধির উপর এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উৎকীর্ণ আছে :

> Good friend, for Jesus' sake forbear
> To dig the dust enclosed here ;
> Blest be the man that spares these stones,
> And curst be he that moves my bones.

এগুলি শেক্সপীয়রের নিজের লেখা হওয়া অসম্ভব নয়।

শেক্সপীয়রের বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে।

শেক্সপীয়রের নাটকগুলি রচনাকালের পৌর্বাপর্ব অনুসারে সাধারণত চারিটি যুগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম যুগের পরিধি হল ১৫৮৮ থেকে ১৫৯৫ সালের কাছাকাছি। এ যুগের লেখা নাটকগুলি হল ঐতিহাসিক নাটক, কমেডি ও ট্র্যাজেডি। উদাহরণ স্বরূপ *Richard II*, *A Midsummer Night's Dream* ও 'Romeo and Juliet' এর নাম করা যেতে পারে। নাট্যরচনার প্রথম যুগে শেক্সপীয়র কিছুদিন অন্য লেখকের লেখা সম্পাদন, সংশোধন ও মঞ্চোপযোগী করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্য কতকগুলি নাটকে কতটা অংশ তাঁর লেখা তা অনিশ্চিত। রচনা-শৈলী সব সময় এক নয়, এবং

Richard III প্রভৃতি কয়েকটি নাটক পরীক্ষামূলক ভাবে লেখা হয়েছে মনে হয়। এই যুগের অন্যান্য নাটক হল—ঐতিহাসিক: *1 Henry VI, 2 Henry VI, 3 Henry VI*; কমেডি: *The Comedy of Errors, Love's Labour's Lost, Two Gentlemen of Verona*; ট্র্যাজেডি: *Titus Andronicus.*

১৫৯৫ থেকে ১৬০১ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। বিখ্যাত কমেডিগুলি ও ফলস্টাফের ভূমিকা সংবলিত ঐতিহাসিক নাটক দুটি এই যুগের রচনা। এ যুগের নাটকগুলির মধ্যে ট্র্যাজেডি নেই। এ যুগটিকে তাই সাধারণতঃ 'comic' যুগ বলা হয়। নাটকগুলির ছন্দ সাবলীল ও সুর সুললিত। এই যুগের নাটক—ঐতিহাসিক: *King John, 1 Henry IV, 2 Henry IV Henry V*; কমেডি: *The Merchant of Venice, The Taming of the Shrew, Much Ado about Nothing, As You Like It, The Merry Wives of Windsor, Twelfth Night.*

তৃতীয় যুগে (১৬০১-১৬০৮) রয়েছে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি চারটি—*Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth,* রোমান্ নাটকগুলি, আর কয়েকটি তথাকথিত কমেডি, যেগুলিতে ভালোর আলোর চেয়ে মন্দের আঁধার অনেক বেশি। এই যুগের শেষের দিকের নাটকগুলিতে কবিতার শৈলীতে দৃঢ়তা এসেছে আর একটা অসংলগ্নতার ভাব আছে। যেন শব্দের যেটুকু অর্থ বোধগম্য করার সামর্থ্য আছে জোর করে তার চেয়ে বেশি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ যুগের অন্যান্য নাটক হল—কমেডি: *All's well that Ends well, Troilus and Cressida, Measure for Measure*; ট্র্যাজেডি: *Julius Caesar, Timon of Athens, Antony and Cleopatra, Coriolanus.*

শেষ বা রোমান্টিক যুগ হচ্ছে ১৬০৮ থেকে ১৬১২, এই চার বছর। *Cymbeline, The Winter's Tale, The Tempest* এই তিনটি নাটক ও *Pericles*-এর খণ্ডাংশ এই সময়ের লেখা। কবিতার শৈলীর দিক থেকে শেষের দিকের ট্র্যাজেডিগুলির সঙ্গে এই রোমান্সগুলির বিশেষ পার্থক্য নেই। কাব্যিক সৌন্দর্যই এগুলির প্রধান আকর্ষণ। শহর থেকে দূরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ এই নাটকগুলির প্রাণকেন্দ্র। মিরাণ্ডা, পার্ডিটা, ইমোজেন প্রভৃতি নায়িকাদের স্বাভাবিক রমণীয়তা নিসর্গের আলোয় উজ্জ্বলতর হয়ে

উঠেছে। নাটকীয় দিক থেকে দেখলে অবশ্য এই রোমান্সগুলিতে গঠনগত শৈথিল্য দেখা যায়। অনেক ভুলত্রুটি চোখে পড়ে।

শেক্সপীয়রের জীবনদর্শন কি ছিল তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। নাট্যকার দার্শনিক নন, আর তাঁর উদ্দেশ্যও নীতিশিক্ষা দেওয়া নয়। জীবনতীর্থের পথে অনেক তীর্থযাত্রীর ভিড়। পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে শেক্সপীয়র তাঁদের দেখেছেন। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে, সমালোচকের ভূমিকায় নয়। এই পথ-চাওয়াতেই তাঁর আনন্দ। রোমিওর ভাষায় তিনি বলতে পারতেন: "I shall be the candle-holder and look on." নিজের মত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করার কোনো প্রকৃত পথ নাট্যকারের নেই। তাঁর চরিত্রগুলির উক্তিকে তাঁর উক্তি বলে ধরে নেওয়া সমীচীন নয়। আর তাছাড়া একটি চরিত্রের কোনো উক্তিতে যে-মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে, অন্য আর একটি চরিত্রের কোনো উক্তিতে অনেক সময় তার বিপরীত মত পোষণ করা হচ্ছে। দুটি চরিত্রই শেক্সপীয়রের সৃষ্টি। দুটি উক্তিই তাঁর নিজের রচনা। এর মধ্যে কোন্ উক্তিটি শেক্সপীয়রের নিজস্ব মনোভাবের অভিব্যক্তি বলে ধরা হবে? 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে ব্রুটাসকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের দুর্দশার জন্য দোষী আমরা নিজেরা, আমাদের ভাগ্যতারকারা নয়। আবার ডেন-রাজকুমার বলছেন, এক ঐশী শক্তি রয়েছে যার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্যগুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। শেক্সপীয়র দৈবকে সার্বভৌম মনে করেন, না পুরুষকারকে? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। হ্যামলেটের উক্তি "Frailty, thy name is woman!" শেক্সপীয়রের মনের কথা, না তিনি অরসিনোর সঙ্গে বলবেন :

> ···however we do praise ourselves,
> Our fancies are more giddy and unfirm,
> More longing, wavering, sooner lost and worn,
> Than women's are—?

তবে মানুষের ভাবপ্রবণ মন সব সময় যুক্তিতর্ক মেনে চলে না। তাই শেক্সপীয়রের নাটক থেকে তাঁর জীবনদর্শন খুঁজে বার করার চেষ্টার অন্ত নেই।

প্রসপেরো বলেছেন শেক্সপীয়রের শেষ লেখায় :

> "···We are such stuff
> As dreams are made on and our little life
> Is rounded with sleep."

এই উক্তিটিকে অনেক সময় শেক্সপীয়রের উক্তি বলে ধরা হয়। গ্রীক কবি পিন্‌ডার বলেছেন, জীবন ছায়ার স্বপন। স্প্যানিশ নাট্যকার ক্যাল্‌ডেরোন-এর কাছে জীবন একটা স্বপ্ন। ক্যাল্‌ডেরোন-এর কাছে জীবনটা স্বপ্ন, আর প্রসপেরোর কাছে আমরা সকলেই স্বপ্ন। (স্বপ্ন আবার স্বপ্ন দেখে।) *All's Well that Ends Well* নাটকে একটি উক্তি আছে, সেটি শেক্সপীয়রের নিজস্ব হওয়া বেশি স্বাভাবিক মনে হয়। সেটি হচ্ছে : "The web of our life is of a mingled yarn, good and ill together." সংসারে ভালো-মন্দ দুই আছে, এবং এইজন্যই আমাদের সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। সকল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আর এটা সম্ভব হয় যখন আমরা স্বার্থ ভুলে গিয়ে অন্যকে ভালোবাসতে পারি। নিজের ক্ষুদ্র সুখ বিসর্জন দিতে পারি কোনো মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য। তখনই মানুষের চিত্ত শত দুর্বিপাকেও অপরাজিত থাকতে পারে। মৃত্যু থেকে সে ভয় পায় না, মৃত্যু তার জীবনকে দেয় নতুন মহিমা। সে বলতে পারে :

I will play the swan,
And die in music.

হ্যামলেট বলেছেন : "Readiness is all"। এই বোধ হয়, শেক্সপীয়রের মতে, মানুষের ধর্ম।

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

হম্‌ফ্রে হাউস

শ্যামা

আমার বিশ্বাস, আধুনিক যুগে যদিও কবির অভাব নেই, তবু কবিতা-পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। সেইজন্যই বর্তমান প্রবন্ধ একেবারে অসার্থক নয়, কেবল কালাতিক্রান্ত। কারণ এখানে আমি যে কাব্যসংগ্রহের গুণগানে উদ্যত, সেই প্রণয়সংক্রান্ত কবিতাবলী কিছুদিন আগে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তার বিষয়ে ইদানীন্তন সুধীসমাজের ঔৎসুক্য যতটা মৌখিক, ততটা চাক্ষুষ নয়; এবং সঞ্চয়নখানির প্রণেতা অনামিক ও অজ্ঞাতকুলশীল হলেও, রচনাগুলির উৎকর্ষ, আমার মতে, এতই নিঃসন্দেহ যে সে-সম্বন্ধে জনসাধারণের নিরাগ্রহ সর্বতোভাবে শোচনীয়।

কিন্তু, পুস্তকখানি নামেই সঙ্কলন, আসলে তার মধ্যে কোনো আনুপূর্বিকতা নেই, কোনোমতেই বলা যায় না যে সকল কবিতা একমাত্র রমণীকে উৎসর্গিত। এবং যদি বা একাধিক কবিতা একই নারীর উদ্দেশে লেখা হয়ে থাকে, তবু সেগুলির রচনাকাল নিশ্চয়ই বিভিন্ন। তাতে প্রেমানুভূতির নানারূপের সঙ্গে বিষম বিদ্বেষের প্রকারভেদ ফুটে উঠেছে; এবং কবির প্রিয় বা প্রেয়সী-পরম্পরার মতিগতিও সেখানে এক নয়, বিচিত্র ও বিবিধ।

তবে শুধু বৈচিত্র্যের খাতিরেই আমি আজ এ প্রসঙ্গের অবতারণা করি নি। এতদিন পরে এ বিষয়ে বাক্যব্যয়ের বিশেষ কারণ এই যে উক্ত কবিতাগুলি নিশ্চয়ই কোনো ইংরেজের লেখা বটে, কিন্তু কোনো ইংরেজ স্ত্রীলোক সেগুলোর উপলক্ষ্য নয়। সম্প্রতি বইখানা আবার পড়তে পড়তে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কবির প্রিয়তমারা ভারতবর্ষীয়া। কবিতার পর কবিতায় প্রেমিক রূপসী নায়িকার শ্যাম সমারোহের গুণ গেয়েছেন:

> ……my mistress' brows are raven black,
>
> Her eyes so suited……
>
> ……every tongue says beauty should look so.

অতএব এতে সন্দেহ নেই যে কবির বাঞ্ছিতা প্রায় নিকষ কালো ছিল এবং

কৃষ্ণকান্তিই কবিকে অনিবার্য আকর্ষণে টানত। সুন্দর আর শ্বেতবর্ণের মধ্যে যে-শব্দগত সংযোগ এদেশের একাধিক ভাষায় পরিস্ফুট, আমাদের লেখক সেই সাধারণ কুসংস্কার এবং অন্তত আমার মতে, ভ্রান্ত গৌরীপ্রীতির পৃষ্ঠপোষক নন। তাঁর অকপট প্রেয়সী যেহেতু আধুনিকাদের মতো পাউডার প্রলেপে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে নি, তাই তার অঙ্গরাগ থেকে বেগুনী রঙের হাস্যকর আভাও হয়তো ফুটে বেরোত না :

Then will I swear beauty herself is black,
And all they foul that thy complexion lack.

আমার অনুমান, কাব্যোল্লিখিত ভারতবাসিনীদের মধ্যে অন্তত একজন ছিল বাঙালী। কারণ নারীদেহের একটি বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সদাসর্বদা আকৃষ্ট ও উত্তেজিত করত ; প্রেয়সীর চোখের বর্ণনায় কখনও তার ক্লান্তি আসে নি। নিবিড় কালো চোখের সে-রকম রোমাঞ্চকর জৌলস শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব ; এবং সে সম্মোহনে স্বয়ং বাঙালী কবিদের মনও বারম্বার মজেছে। অবশ্য আমি রবীন্দ্রনাথের সেই মেয়েটির কথাই ভাবছি, যে একদিন ময়নাপাড়ার মাঠে কালো হরিণ চোখ আকাশে তুলে আসন্ন বর্ষার মেঘসমাগম দেখেছিল ; কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠক এখনই আরো হাজারটা দৃষ্টান্ত ভেবে নেবেন।

সে যাই হোক, আমাদের কবি উদ্ধৃতাংশে বলেছেন :

·· ·· my mistress' brows are raven black,
Her yes so suited····· '.

অন্য একটি কবিতার শুরুতেই তিনি লিখেছেন :

Thine eyes I love······'

অন্যত্র দেখতে পাই তিনি

Commanded by the motion of her eyes,

এবং উপান্ত কবিতাতে মদন নিজে তার সংক্রামক উদ্দীপনার আগুন কবিপ্রিয়ার চোখের আলোয় জ্বালিয়ে নিয়ে যান। অতএব আমাদের কবি স্বভাবতই চোখের জন্যে পাগল। এমন কি উপমিতির প্রসাদে নিজের চোখ সম্বন্ধেও তাঁর উদ্বেগের অন্ত নেই। এবং চোখের প্রবঞ্চনায় বারম্বার প্রতারিত তিনি শেষ পর্যন্ত সেই চোখেরই অন্ধ স্তাবক :

O ! how can love's eyes be true
That is so vex'd with watching and with tears ?

উপরন্তু প্রত্যাখ্যানের ফলে তাঁর প্রেম যখন বিদ্বেষে বদলায়, তখন তিনি যদিও কবিতার প্রারম্ভেই লিখে বসেন :

My mistress' eyes are nothing like the sun,

তবু চাহনির আস্ফালন্ড্যন তাঁর সামর্থ্যে কুলোয় না, বরং ক্রয়েডী দুরুক্তির আড়াল থেকে আপনার হাস্যকর দাসত্বই ফুটে বেরোয় :

If hairs be wires, black wires grow on her head.

এখানে পদটির অনিশ্চয়তা দ্রষ্টব্য: আসলে নরম চুল একাধারে আধি-ব্যাধির লক্ষণ 'এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতীক'। তাঁর অভিসার নিশ্চয়ই সমতল পথে চলত না।

আমার বিশ্বাস, ফ্রীডাসে প্লেটো ঐশী উন্মাদনার যত রকম প্রকারভেদ লিপিবদ্ধ করেছেন, সেগুলির সর্বসাধারণ লক্ষণ আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা; এবং ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন যে ঐ জাতীয় উত্তুঙ্গ মনোভাবের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের অকিঞ্চিৎকর সমভাবের বিরোধ বাধে বলেই উক্ত ব্যাধি অতখানি অসহ্য লাগে। তা হলেও মানুষের সকল দুর্মূল্য অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই পতন-অভ্যুদয়ের ডায়ালেকটিক অন্তর্নিহিত থাকে; এবং আজ পর্যন্ত কোনো প্রেমার্ত ব্যক্তিই এই উভবল দ্বৈতবোধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। যারা শুধু কবি নয়, সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রেমিক, তাদের ক্ষেত্রে দ্বিবিধ উন্মাদনা যেহেতু একত্র বর্তমান, তাই সাংঘাতিক অন্তর্বিরোধেও তারা অদ্বিতীয়; তাই পার্থিবাকে সম্পূর্ণভাবে সমাজাতিরিক্ত ভাবা তাদেরও সাধ্য নয়। আলোচ্য সঙ্কলনে এই মর্মান্তিক দ্বন্দ্বসমাসই একাধিক উৎকৃষ্ট কবিতার অবলম্বন। নিম্নলিখিত পংক্তি কটায় আমাদের কবি শুধু অবজ্ঞাত, প্রত্যাখ্যাতই নয়, এমন কি হয়তো প্রাণাধিকার সাক্ষাৎকারেও প্রতিষিদ্ধ; তবু তার উপরে চোখ পড়তেই প্রেমিক উত্তেজনায় কি: মৃতপ্রায় কোনো এক জনবহুল স্থানে উভয়ের অপ্রত্যাশিত সন্নিকর্ষ ঘটায় চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য কারো দিকে তাকাতে কবি বলেছেন :

ah, my love well knows
Her pretty looks have been my enemies,
And therefore from my face she turns my foes,
That they elsewhere might dert their injuries :
Yet do not so ; but since I am near slain,
Kill me outright with looks and read my pain.

পরবর্তী কবিতা আরো বেশি কৌতূহলপ্রদ : এটিও সম্ভবত একই স্ত্রীলোকের উদ্দেশে লেখা, এবং সে-নারীর উপেক্ষা এখনো অবিকৃত : বোধহয় কবি কিছুদিন আগে তাকে চিঠি বা কবিতা পাঠিয়ে আজও কোনো জবাব পান নি :

Be wise as thou art cruel ; do not press
My tongue-tied patience with too much disdain ;
Lest sorrow lend me words and words express
The manner of my pity wanting pain.
If I might teach thee wit, better it were,
Though not to love, yet, love, to tell me so ;
As testy sick men, when their death be near,
No news but health from their physicians know ;
For if I should despair, I might grow mad,
And in my madness might speak ill of thee :
Now this ill-wresting world is grown so bad,
Mad slanderers by mad ears believed be.
Thal I may not be so, nor thou belied,
Bear thine eyes straight, though thy proud
heart go wide.

সহজ ভাষায় এর অর্থ এই যে কবি তাকে দুর্নামের ভয় দেখিয়ে অভীষ্ট-সিদ্ধির আয়োজনে অগ্রসর ; এবং যেস্থানে তাঁর বাস সে স্থান যে রটনার পক্ষে অতিশয় উর্বর, তাও তার অজ্ঞাত নয় :

Now this ill-wresting world is grown so bad
Mad slanderers by mad ears believed be.

নায়িকা যদি জবাব না দেয়, এবং তার উত্তরে যদি অন্তত প্রেমের ভান না থাকে, তবে কবি তার বিরুদ্ধে কুৎসাপ্রচারে নামবেন। এবং সে-কুৎসা কি ? তিনি লোকসমাজে শুধু এটুকুই বলবেন যে মেয়েটি নিতান্ত নির্বোধ :

Be wise as thau art cruel….

এবং If I might teach thee wit ··

এই কবিতাটি রচনাকালে তিনি নির্ঘাত ভেবেছিলেন যে সে বস্তুতই অত্যন্ত নির্বোধ ; এবং তার দীর্ঘায়িত নীরবতায় ভিতরে ভিতরে বিষিয়ে উঠে তিনি

লোকসমক্ষেও সে সত্য ঘোষণার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন, যাতে সারা সমাজ তার প্ররোচনায় মেয়েটির বিপক্ষে যায়। অর্থাৎ অভীপ্সা আর নীচতার দোটানায় তিনি শত্রুদলে যোগ দিতেই বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাঁর নিরাশার কবিতাগুলিও বাঙালী জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এদেশে কৃষকরমণীরাই এ চিত্রকল্পের নির্ভর :

Lo, as a careful houswife runs to catch
One of her feathered creatures broke away,
Sets down her babe and makes all swift dispatch
In persuit of the thing she would have stay,
Whilst her neglected child holds her in chase.
Cries to catch her whose busy care is bent
To follow that which flies before her face,
Not prizing her poor infant's discontent
So run'st thou after that which flies from thee,
Whilst I thy babe chase thee after behind,
But if thou catch thy hope, turn back time
And play the mother's part. kiss me, be kind,···

প্রেয়সীর সঙ্গে তার নিজের সম্বন্ধ আর মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ, এই দুই সম্বন্ধের তুলনা পূর্বোক্ত কবিতার "pity wanting pain"-এর অভিব্যক্তি ; এবং যাঁরা এখনও ঈডিপাস গ্রন্থিতে আস্থা রাখেন, তাঁরা উল্লিখিত পংক্তিগুলোয় সে-মনোব্যাধির প্রকৃষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাবেন। এ-প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রের নাম নেওয়া যদি মার্জনীয় হয়, তবে অন্যান্য মনোবিদেরা বুঝবেন যে এখানে আমাদের কবিও শেক্সপীয়রের মতোই গর্ভগৃহকে সমাধিমন্দিরে পরিণত করছেন—making his tomb the womb wherin he grew। যাঁরা মনোবিজ্ঞানী নন, তাঁদের কাছে এ-কবিতার সমাজতাত্ত্বিক অর্থ হচ্ছে এই যে সমাজব্যবস্থায় মাতৃ-প্রাধান্য সত্যই দুর্মর ; এবং আমার মতো মামুলী মানুষের কাছে কবির সুপ্রকট দৈন্যগ্রন্থি এই সাধারণ সত্যেরই সাক্ষ্য যে পুরুষমাত্রেই স্ত্রীজাতির অঞ্চলাশ্রয়ী।

কবিতাটির যে ব্যাখ্যাই করা যাক না কেন, এতে সন্দেহ নেই যে কালীপূজার মূলেও অনুরূপ প্রত্যয়ই ক্রিয়াশীল ; সেই মসীবরনা বিশ্বজননীর

প্রতীকে সৃষ্টি ও ধ্বংসের স্বতোবিরোধী সমন্বয় আরও সুপ্রকট ; এবং আলোচ্য কবিতাসমূহের একটাকে, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, কালীস্তোত্র বলেই বোধ হয়। আমাদের কবি যে বাংলাদেশকে জানতেন তার অকাট্য প্রমাণ এই কবিতাটি, এবং সেই জন্যে এটিকে আমি আগাগোড়া উদ্ধৃত করছি :

Thou art as tyrannous ; so as thou art,
As those whose beauties proudly make them cruel :
For well thou know'st to my dear doting heart
Thou art the fairest and most precious jewel.
Yet, in good faith, some say that thee behold
Thy face hath not the power to make love grown :
To say they err, I dare not be so bold,
Although I swear it to myself alone.
And, to be sure, that is not false I swear,
A thousand groans, but thinking on thy face.
One on another's neck, do witness bear
Thy black is farest in my judgement's place
In nothing art thou black save in thy deeds,
And thence this slander, as I think, proceeds.

এই কবিতাটি যে কালীর বন্দনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিশ্চয়ই এই অংশটুকু :

A thousand groans, but thinking on thy face,
One on another's neck, do witness bear
The black is farest……

অন্বয়ের খাতিরে পংক্তি কটার এইরূপ ব্যাখ্যা করাই বোধ হয় সমীচীন : "কেবল তোমার মুখের ধ্যান করলেও আমার হৃদয় সহস্র দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিদীর্ণ হয় ; এবং সে দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলোর মধ্যে তিলার্ধ ব্যবধান থাকে না, একটা আসে আগেরটার গলায় ভর দিয়ে।" এ ব্যাখ্যা সকলেই নিশ্চয় নির্বিবাদে মেনে নেবে। কিন্তু কী অদ্ভুত ভাবচ্ছবি—দীর্ঘনিঃশ্বাসের গলা! তবু এখানে শব্দবিন্যাস দ্রষ্টব্য ; এবং যুক্তি-শৃঙ্খলার কথা বাদ দিলে "One on another's neck—" পদটার স্থান, 'groans'-এর পরে নয়, 'face'-এর অব্যবহিত পরে। এখন আমরা যদি ভাবতে পারি যে এখানে কবির মানসপটে কালী-প্রতিমা

ফুটে উঠেছিলো, তবেই তাঁর চিন্তাধারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়; কারণ কালীর যে মূর্তি আবালবৃদ্ধবনিতার উপাস্য, তাতে তিনি নরমুণ্ড-মালিনী, এবং এই কপালমালায় মাথাগুলো বাস্তবিকই গলাগলি করে আছে। সুতরাং কাব্য রচনার একটা অতিসাধারণ ঘটনার নিদর্শন এই পংক্তি কটায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: যে চিত্রকল্প মুখ্যত চক্ষুসম্পর্কিত, তার অঙ্গবিশেষ মূল অর্থ হারিয়ে, নিকটবর্তী বাক্যে নিহিতোপমার পদে প্রতিষ্ঠা পেয়ে অনধিকার চর্চা করছে। কাব্য রচনার সাম্প্রতিক বিশ্লেষণমাত্রেই দেখিয়েছে যে এই জাতীয় রূপান্তর সকল কবিতাতেই সুলভ। এবং এখানে যখন ছন্দের প্রয়োজনে শব্দবিন্যাস এই রকম ন্যায়াতিরিক্ত অর্থের অনুকূল, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাসের গলা দেখেও আশ্চর্য হওয়া অনুচিত।

ফলত আমরা মানতে বাধ্য যে কবির মনে কালীমূর্তি মুদ্রিত ছিল। কিন্তু দেবী আর মানবীর মধ্যে তিনি স্পষ্টত বিশেষ পার্থক্য করেন নি; অসংখ্য ভারতীয় লেখকদের মতো তাঁর ক্ষেত্রেও একজন অপরের বাদ সাধেনি, একই পাত্রে উভয়ের সাযুজ্য ঘটেছিলো। তবে উদ্ধৃত কবিতার শেষের দু লাইন থেকে বোঝা যায় যে কালীপূজার অন্তর্নিহিত ধর্মতত্ত্বটুকুর অনেকখানিই তাঁকে এড়িয়ে গেছে, সে-সর্বনাশীর মধ্যে সৃষ্টির আকুতি তিনি বড় একটা দেখতে পাননি, সাধারণত তার থামকা খেয়ালই লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি বলেছেন "Black in thy deeds"; এবং সে উক্তির মধ্যে হয়তো বিদেশ সম্বন্ধে আগন্তুকের প্রথম ভুল-চুকগুলোই টিঁকে আছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ইচ্ছাকৃত অবিদ্যাই তাঁর সাময়িক অবস্থাকে বেশি মানায় ভেবে তিনি এই কবিতায় পূর্ণ জ্ঞানের দিকে এগোতে চাননি। কারণ শুনেছি যে কালবিনাশিনী মহাকালীর সংহার মূর্তি মায়াজালমাত্র, প্রকৃত ভক্ত সে বাধা মানে না; বিশ্বজননীর নির্দেশে সে শেষ পর্যন্ত মোক্ষের জ্যোতির্ময় শান্তিতেই পৌছায়। নিম্নোক্ত পদ রচনার সময় আমাদের কবিও একথা নিশ্চয় বুঝেছিলেন:

> So runn'st thou after that which flies from thee
>
> Whilst I thy babe chase thee after behind,

আশা করি উদ্ধারের সাহায্যে আমি দেখাতে পেরেছি যে এই কবিতাগুলির অন্তর্দৃষ্টি বিশ্ব-বিস্তৃত আবেগ প্রভৃত শক্তিশালী, পদ নির্বাচন ও পদান্বয়ের প্রতিভা অসাধারণ এবং বিষয়বস্তু কবির অতিগভীর ও বহুবিচিত্র ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা। সঙ্গে সঙ্গে আমরা হয়তো এই শ্যামাঙ্গিনী কে, সে সমস্যারও সমাধান করেছি। সে রমণী কোন একজন স্ত্রীলোক নয়, অনেক বাঙালী মেয়ের সমন্বয়ে তার উদ্ভব। তাদের মধ্যে কেউ সুন্দরী, কেউ কুরূপা, কেউ দয়াবতী, কেউ মর্মান্তিক, কিন্তু তারা সকলেই মহাকালীর অংশভাক্, যার মধ্যে সেই পরস্পরবিরোধী কৃষ্ণার দল সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য পায়।

কিন্তু আমার পাঠকেরা নিশ্চয়ই কবি পরিচিতির জন্যে উৎসুক হয়েছেন। অনেক বছর ধরে অবিবেকী কাব্যবিবেচকেরা বিশ্বাস করতেন যে এই কবিতা সমষ্টির রচয়িতা শেক্সপীয়র, কারণ কবিতাগুলিকে একত্রে সংগ্রথিত করে টমাস থর্প নামক কোনো এক কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি এই অনামাঙ্কিত কাব্য-সঙ্কলনখানি 'পরবর্তী সনেটসমূহের একমাত্র জনক'—The onlie begetter of these insuing sonnets Mrs. W·H'-কে উৎসর্গ করেন। এখনও শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত কবিতাগুলো ১২৭ থেকে ১৫৪ নম্বরের সনেট বলেই স্থান পায়; কিন্তু আজ আর নামকরা এমন কোন পণ্ডিত নেই যিনি নিঃসন্দেহে সবগুলোকে শেক্সপীয়রের রচনা হিসাবে দেখেন। এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। কারণ অত্যাধুনিক শেক্সপীয়র সমিতিগুলোও এখনো এ অনুমানের কোন প্রমাণ পাননি যে শেক্সপীয়র ইংল্যাণ্ডের বাইরে খুব বেশি বেড়িয়েছিলেন অথবা ৯৮ নম্বরের সনেটটি ব্রাউনিং-এর Home Thoughts from Abroad কবিতাটির পূর্বাভাস। এ ধারণার পক্ষেও কোন সাক্ষ্য নেই যে শেক্সপীয়র যদি এ দেশে এসেই থাকেন, তবে ভারতের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবেশ করতে হলে যতদিন এখানে থাকা দরকার তিনি ততদিন প্রবাসে কাটিয়েছিলেন। সুতরাং অগ্রগামী গবেষণার আশাপথ চেয়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে Times Literary Supplement যে দেশকে কবিতার লীলাভূমি বলেছে সে দেশের সম্মোহে অভিভূত একজন ইংরেজের সম্বেগ, প্রজ্ঞা, আত্মনিগ্রহ ও তিক্ততার সার্বজনীন অভিব্যক্তিই রসিকের পিপাসা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট।

[এই প্রবন্ধের প্রকরণ জনসন্, কোল্‌রিজ, সুইনবর্ন, রিচার্ডস, গ্রেভস্ ও এম্‌সন ইত্যাদি একাধিক মনীষীর দ্বারা উদ্ভাবিত, এর বক্তব্যের একমাত্র জনক, the onlie begetter, আমি।]

॥ পৌষ ১৩৪৪ ॥

শেক্সপীয়রের সনেট

অতিদৈব

আমার ভয়ার্ত বুদ্ধি, কিংবা সেই চিন্ময় পুরুষ,
যার স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টি সমাহিত অনাগত কালে,
জানে না আমার প্রেম কি সত্যের গুণে নিরঙ্কুশ,
কেন তার পরমায়ু ন্যস্ত নয় ভাগ্যের খেয়ালে।
রাহুমুক্ত পূর্ণচন্দ্র প্রত্যাগত অমৃতে আবার ;
দুঃখবাদী গণকেরা উপহাস্য নিজেদের কাছে ;
সংশয়ের নিপাতনে অব্যাহত প্রমার উদ্ধার ;
যে শান্তি আরব্ধ আজ, অনন্তের স্ফূর্তি তাতে আছে।
উপস্থিত সন্ধিলগ্ন, সুযোগের দিব্য রসায়নে
পুনরুজ্জীবিত প্রেম ; মৃত্যু মোর পদানত দাস।
নির্বাক নির্বোধ যারা, অভিভূত তারাই মারণে ;
এই অকিঞ্চন কাব্যে অপরাস্ত আমি, অবিনাশ।
সেদিনও তোমার স্মৃতি প্রকীর্তিত রবে এ সঙ্গীতে
রাজাদের জয়স্তম্ভ মিশে যাবে যেদিন ধূলিতে ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

(৬৬)

মৃত্যুর বিশ্রাম চাই, পরিশ্রান্ত আমি এই সবে :
যোগ্যতা জন্মায় কত দেখেছি যে ভিখারীর ঘরে,
আর দীন নেতি ধড়াচূড়া পরে দেখেছি উৎসবে,
আর শুদ্ধ বিশ্বস্ততা কর্দমাক্ত গ্লানির গহ্বরে,
আর স্বর্ণময় মান লজ্জাকর অপাত্রে গচ্ছিত,
আর সতী গুণাবলী পণ্যস্ত্রীর মত উপগত,

আর ন্যায্য শ্রেষ্ঠত্বও অন্যায়ের তাচ্ছিল্যে লাঞ্ছিত
আর শক্তি বিকলাঙ্গ খঞ্জের প্রতাপে অপহৃত,
আর শিল্পকলা মূক শাসকের দুরন্ত দাপটে,
আর আচার্যের মতো নির্বুদ্ধিই নৈপুণ্য চালায়,
আর স্বচ্ছ সত্য দেখি স্থূলবুদ্ধি অপনামে রটে,
আর ক্রীতদাস সৎ মালিক মন্দের পিছু ধায় :
পরিশ্রান্ত এই সবে, এ সবের থেকে যেতে চাই,
শুধু জানি মৃত্যু সে যে ফেলে যাওয়া প্রিয়াকে একাই ॥

বিষ্ণু দে

(৬২)

সম্পূর্ণ আমার চোখে ভর করে পাপ আত্মরতি
সমগ্র আত্মায় আর অঙ্গে অঙ্গে তাহার নির্ভর ;
অন্তরের অন্তস্তলে তার হেন সুবদ্ধ বসতি
প্রতিকারহীন তাই সে-কল্মষ। ভাবি অতঃপর
আমার মুখের তুল্য নাহিক' সুঠাম মুখচ্ছবি
নাই মূর্তি এত সত্য, নাই সত্য এত মূর্তিমান
এবং নিজের মুখে স্বীয় স্বস্তিরচন সম্ভবই
আমি যথা সর্বগুণে সবা হতে পরিবর্ধমান।
তবুও দর্পণ যেই স্বমূর্তিতে দেখায় আমাকে
লাঞ্ছিত খণ্ডিত খিন্ন পোড়-খাওয়া প্রৌঢ়ির প্রহারে
তখন সে-আত্মপ্রেম বিপরীতবুদ্ধি, দেখি তাকে
আত্মরতিতৃপ্ত সত্তা, মনে হয়, অপরাধ কাড়ে।
যে-আমির প্রশংসায় আমি পঞ্চমুখ, সে তো তুমি,
তোমারই যৌবনরঙে রাঙালাম মম বয়োভূমি।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

(২৭)

শ্রমে পরিশ্রান্ত আমি ছুটে যাই আমার শয্যায়,
পর্যটনক্লান্ত পদ পেতে চায় প্রশান্তি মধুর ;
তখন মস্তিষ্কে ঢেউ অন্য এক নবীন যাত্রায়,
হৃদয়ের কাজ শুরু দেহ যবে শ্রান্তি ভরপুর।
যেহেতু আমার চিন্তা তখন আবাস ছেড়ে দূরে
তোমার সন্ধানে ধায় তীর্থযাত্রী উদ্যোগপ্রসূত,
এবং আমার দুটি শ্রান্ত চোখ উন্মোচিত ক'রে
ছাখে সেই অন্ধকার অন্ধ ব্যক্তি যা ছাখে অন্তত।
আমার হৃদয় শুধু প্রসারিত কল্পনাদৃষ্টিতে
তোমার ছায়াকে আনে দৃষ্টিহীন দৃশ্যের সমুখে
সে-মূর্তি হিরকসম দেখা গেলে ভয়াল রাত্রিতে,
কালরাত্রি রূপময়, নব্যকান্তি তার জীর্ণ মুখে।
ছাখো সর্ব অঙ্গ দিনে রাত্রিকালে আমার হৃদয়
তোমার আমার জন্যে নিমগ্নতা খুঁজেও না পায়॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

(১)

এক থেকে বহু হোক এ সংসারে যারা কান্তিমান,
সৌন্দর্যগোলাপ যাতে চিরদিন মর্ত্যে বেঁচে রয়,
প্রৌঢ় থেকে ক্রমে বৃদ্ধ তারপর মৃত্যুতে শয়ান,
তবু তার স্মৃতিটুকু রয়ে যাক সন্তানে অক্ষয়।

কিন্তু হায় তুমি দেখি আপনাতে আপনি বিভোর
তোমার উজ্জ্বল চোখ তোমারি সে রূপের দর্শক,
যেখানে প্রাচুর্য ঠিক সেইখানে কী দুর্ভিক্ষ ঘোর
তুমিই তোমার বৈরী দয়াহীন হে আত্মধর্ষক।

তুমি আজ পৃথিবীর অলঙ্কার সুন্দর শোভিত,
রঙ্গীন বসন্ত সে তো তোমাতেই আভাসিত রয়
আপন অঙ্কুরে তবু আপনারে রাখো আবরিত
কঞ্জুষ কুমার করো কার্পণ্যে নিজেকে বৃথা ক্ষয়।

পৃথিবীকে দয়া করো নহিলে এ লোলুপ সংসার
তোমার কবরে নেবে শোধ করে সব ঋণ তার।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

(৩২)

যদি তুমি বাঁচো, যবে আমি চিরপ্রশান্তির কোলে
হীন মৃত্যু অস্থি যবে ধূলি তলে ঢেকে দেবে,—ফের
অমার্জিত এই পদাবলী যদি পড়ো ভাগ্যবলে
লেখনী-প্রসূত যারা তোমারই গতায়ু প্রেমিকের।
সাধু নব কাব্যরীতি সাথে তার দিলেও তুলনা,
কালের গতিকে তার ঘটে যদি কোনো পরাজয়—
শ্রেয়তর কবিত্বের পাশে ম্লান হলেও, ভুলো না
প্রেমের খাতিরে সেই পদাবলী ; অন্য হেতু নয়।

আবার আমারে স্মরি মগ্ন হয়ো এ প্রিয় চিন্তায়—
—'যে বন্ধু রইলো বেঁচে, প্রতিভাও হতো বিকশিত,
সময়ের সাথে ; তার প্রেম মুঞ্জরিত কবিতায়
হয়ে তাকে শ্রেষ্ঠতর কবিদের পাশে ঠাঁই দিত।
আসর জাঁকায় পটু নবীনেরা, সে নেইক যবে ;
এদের তারিফ করি, তাকে পড়ি প্রেমের গৌরবে।'

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

(৮১)

হয়তো বাঁচবো আমি স্মৃতিশিলা তোমার গড়াতে,
নয়তো তুমিই থাকবে, ধূলিতলে যাবো আমি মিশে ;
তোমার স্মৃতিকে মৃত্যু পারবে না আর কেড়ে নিতে,
যদিও আমার সত্তা বিস্মৃত হবে সব শেষে।

এখন তোমার নামে উপার্জিত অনন্ত জীবন,
একবার চলে গেলে মৃত বলে জানবে আমাকে,
আমাকে কি দিতে পারে, এই মাটি, সমাধি শয়ন
চিরোজ্জ্বল থাকবে তুমি, মানুষের অগণিত চোখে।

তোমার স্মরণচিহ্ন হবে কান্ত কবিতা আমার,
অনাগত মানুষেরা বারবার পড়বে কৌতূহলে,
উচ্চারিত হবে কণ্ঠে চিরকাল তোমার সত্তার
পৃথিবীর মানুষেরা মৃত হয়ে সব চলে গেলে।

তখনো বাঁচবে তুমি, এ কবিতা এত গুণ রাখে
উচ্ছ্বলিত শ্বাস বহে, এমনকি মানুষের মুখে।

কৃষ্ণ ধর

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব

১৯৬৩ সালে আমেরিকা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপককে আমাদের দেশে শেক্সপীয়র-চর্চার পরিপূর্ণ বিবরণী পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের শেক্সপীয়র-চর্চার তথ্যকে একত্রিত করে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করা. অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ডক্টর অমলেন্দু বসু সেদিন কোনো তথ্যই পাঠাতে পারেন নি। এই সামান্য ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে একটি অসামান্য বেদনাদায়ক সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত শেক্সপীয়র আমাদের জন-জীবনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত। অথচ এই বিশেষ মূল্যবান ঘটনাটির সম্যক্ বিশ্লেষণ এতাবৎ স্পষ্টতই করা হয়নি। অবশ্য একেবারে কিছুই যে হয়নি তা নয়। কোনো কোনো নাটকের ইতিহাসে এই জাতীয় প্রচেষ্টা চোখে পড়ে, এখানে ওখানে কখনো কখনো দু-চারটি প্রবন্ধও যে লেখা হয়নি তা নয়। কিন্তু শেষ বিচারে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, যা কিছু হয়েছে তা নিতান্তই সামান্য, ছড়ানো-ছিটানো; এবং সর্বোপরি এই প্রচেষ্টাগুলিতে সব সময়েই পরিকল্পনার অভাব থেকে গেছে। মোটের ওপর এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের ভাবটি মুগ্ধ-ভাব। গদগদ কণ্ঠে "Others abide our question, thou art free" আবৃত্তি করে, চোখ বন্ধ করে, মুগ্ধবৎ বসে থাকা বিপজ্জনক। বিশ্লেষণ না করে মুগ্ধ হয়ে থাকলে মোহের রসে পচন ধরে যেতে পারে একথাটি মনে রাখা উচিত।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় বাংলা নাটকের উপর শেক্সপীয়রের প্রভাব। বাংলা নাটকের সৃষ্টি ও প্রাথমিক পর্যায়ের বিবর্তনের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের নাটকগুলির রচনাকাল পর্যন্ত এদেশে নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে শেক্সপীয়র যে কত নিবিড়ভাবে জড়িত, তা অনুমান করা এই ১৯৬৪ সালের কোনো সাধারণ নাট্যরসিকের পক্ষে কষ্টকর, কিন্তু

ইতিহাসের সাক্ষ্য নিলে দেখা যাবে যে বাংলা নাটকসৃষ্টির পিছনে বিশ্বজনীন নাট্যপ্রীতি ছাড়া বৃহত্তম ঘটনা বাংলাদেশে শেক্সপীয়র-চর্চা। কয়েকটি সুপরিচিত তথ্যের পুনরাবৃত্তি করলেই এই বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করা যাবে। আঠের শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে (Calcutta Theatre, Chandernagore Theatre, The Athenaeum Theatre, Dumdum Theatre, Baitokh-khana Theatre, Kidderpore Theatre, Chowringhee Theatre, Sans Souci Theatre, Hindoo Theatre) অভিনীত নাটকের অধিকাংশই শেক্সপীয়রীয় নাটক। লেবেদেফের থিয়েটার প্রতিষ্ঠাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করলে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের Hindoo Theatre-ই প্রথম বাঙালী পরিচালিত রঙ্গালয়। এটির শুরুও শেক্সপীয়র অভিনয় করে। ইংরাজী সাহিত্যে শিক্ষিত তৎকালীন ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও শেক্সপীয়র অভিনয়ের প্রবল ঔৎসুক্য এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। শেক্সপীয়র-চর্চা অভিনয়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন, এইচ. এইচ. উইলসন, আলেকজেণ্ডার ডাফ, প্রোফেসর কাওয়েল প্রভৃতি শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহে বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে শেক্সপীয়র পাঠের যে আগ্রহ সেদিন দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনেও তা ভোলা যায় না। শেক্সপীয়র অভিনয় এবং শেক্সপীয়র পাঠের এই পটভূমিকাতেই বাংলা নাটকের সৃষ্টি। অতিরঞ্জন দুষ্ট না হয়েও আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, শেক্সপীয়রীয় প্রভাব সবিশেষ কার্যকর না হলে বাংলা নাটক সৃষ্টি সম্ভবত বিলম্বিত হত এবং তার চেহারাও নিশ্চিত অন্যরকম হত।

বাংলা নাটক সৃষ্টি যতটা শেক্সপীয়র প্রভাব-সঞ্জাত, তার প্রারম্ভিক বিবর্তনও সেই অনুপাতে শেক্সপীয়র-নির্ভর। বাংলা নাট্যসাধনার আদি ও মধ্যযুগের প্রধান নায়কবৃন্দ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের বিভিন্ন নাট্যপ্রয়াসে মহাকবি শেক্সপীয়রের কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য নিয়েছেন। শুধু তাই নয়। সমকালীন অপেক্ষাকৃত কম উল্লেখযোগ্য নাট্যকারবৃন্দ—কালীপদ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, উমেশ-চন্দ্র গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ দাস, রাজকৃষ্ণ রায় ইত্যাদি—শেক্সপীয়রের কাছে অল্পাধিক ঋণী। এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বাংলা নাটকের প্রথম মৌলিক

রচনা 'কীর্তিবিলাসে'ও মহাকবির প্রভাব পরিদৃশ্যমান। 'কীর্তিবিলাসে' জি. সি. গুপ্ত সংস্কৃত নাট্যরীতির বিরোধিতা করে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিকে যুক্তিরূপে উপস্থাপিত করে। এ ছাড়াও এই নাটকটিতে 'হ্যামলেট'-এর অনুকরণ-প্রচেষ্টা আছে, এবং নায়ক কীর্তি-বিলাস 'হ্যামলেট' চরিত্রের ছায়ায় পরিকল্পিত।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্য পদবাচ্য নাট্যকার মধুসূদন। বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতার ফলে তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের দৈন্য স্বভাবতই তাঁর চোখে পড়ল। নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, সংস্কৃত নাট্যকলার বিধিনিষেধ বাংলা নাটককে বাড়তে দিচ্ছে না। স্বভাবতই তিনি অনুপ্রেরণার জন্য চোখ ফেরালেন পশ্চিমের দিকে এবং এরই ফলশ্রুতি-স্বরূপ বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রের স্থান পাকাপাকি হল। এর আগেও যে শেক্সপীয়র বাংলা নাটকে তাঁর প্রভাব ফেলেছেন তা আমরা 'কীর্তিবিলাস' থেকে জানতে পারি। কিন্তু মধুসূদনের নাটকেই শেক্সপীয়র সর্বপ্রথম সাহিত্যিক স্বীকৃতি পেলেন। অবশ্য একথা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই যে, মধুসূদনের নাটকের সর্বত্র শেক্সপীয়রমনস্কতার ছাপ পরিদৃশ্যমান। শেক্সপীয়রের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর নাটকে সামান্যই। কিন্তু পরোক্ষ বিচারে দেখা যাবে যে, মহাকবির কতকগুলি মৌলিক গুণ মধুসূদনের নাটকে কার্যকর হয়েছে। শেক্সপীয়রীয় চরিত্র-নির্ভর ট্র্যাজেডি পরিকল্পনা, নাটকে শেক্সপীয়রীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার, ট্র্যাজিডিতে 'Comic' (কৌতুক-রসের) যথাযোগ্য স্থান দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে মধুসূদন শেক্সপীয়রের কাছে ঋণী।

মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই নাটক রচনাকালে সংস্কৃত নাট্যরীতির অপ্রতুলতা সম্পর্কে সজাগ থাকা সত্ত্বেও এই নিষেধের বেড়া তিনি পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারেন নি। 'শর্মিষ্ঠা'র পরবর্তী রচনা 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটক দুটিও শেক্সপীয়র প্রভাবমুক্ত। এর পরের রচনা 'পদ্মাবতী' নাটকে প্রথম স্পষ্ট শেক্সপীয়রীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই নাটকটির কল্পবস্তু একটি গ্রীক Myth-এর পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণে পরিকল্পিত হলেও কলির স্বগতোক্তির মধ্যে শেক্সপীয়রীয় স্বগতোক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনের পূর্বাপর বিশ্বাস ছিল যে, "No real improvement in the Bengali

drama could be expected until blank verse was introduced into it." সেই বিশ্বাসকে ফলপ্রসূ করার প্রথম চেষ্টা 'পদ্মাবতী' নাটকে কলির সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার।

'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক এবং সাহিত্যবিচারে (ঐতিহাসিক বিচারে নয়) বাংলা ভাষায় প্রথম ট্র্যাজেডি। 'কৃষ্ণকুমারী' রচনাকালে মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন এবং এই নাটকে শেক্সপীয়রীয় নাট্যশৈলীর বিভিন্ন দিক সাঙ্গীকরণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁর লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রে বারবার শেক্সপীয়রের উল্লেখ চোখে পড়ে। তিনি নিজে বলেছিলেন যে 'কৃষ্ণকুমারী'-তে তিনি একটি রোমান্টিক ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে চান। তাঁর সেই প্রচেষ্টার ছাপ এই নাটকটির বহু অংশে স্বপ্রকাশ। আলোচ্য নাটকটির ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়র-ধর্মী। চরিত্র-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও মহাকবির প্রভাব সুস্পষ্ট। ভীমসিংহ চরিত্রটির অংশবিশেষ—তার কন্যাশোকে উন্মত্ততা—লীয়র চরিত্রের অনুবর্তী। রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহের চরিত্রটি মূলতঃ 'কিং-জন্'-এর জারজ ফিলিপ্-এর চরিত্র অনুকরণে পরিকল্পিত। মধুসূদন স্বয়ং এই ঋণের কথা তাঁর একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। এই নাটকে শেক্সপীয়রের কাছে মধুসূদনের ঋণ পূর্বোল্লিখিত ক্ষেত্রবিশেষেই সীমাবদ্ধ নয়। মদনিকার পুরুষের ছদ্মবেশ গ্রহণ শেক্সপীয়রীয় নারী চরিত্রের ছদ্মবেশ ধারণের মতো কৌশলের অনুকৃতি। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, এই সময়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে এলিজাবেথীয় যুগের মতো পুরুষেরাই মহিলার ভূমিকা অভিনয় করত। ফলত পূর্বোক্ত শেক্সপীয়রীয় কৌশলটি কাজে লাগানো মধুসূদনের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সঙ্গত হয়েছিল। সর্বোপরি, ট্র্যাজেডি রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন যে ধ্রুপদী নাট্য-রীতির চেয়ে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির অনুগামী ছিলেন তা বোঝা যায় 'কৃষ্ণ-কুমারীতে' কৌতুকের ব্যবহারে। মধুসূদন বিশ্বাস করতেন যে: "The most beautiful plays in the world are combination of Tragedy and Comedy." তাঁর একটি চিঠিতে মধুসূদন লিখেছেন, "Never strive to be comic in a tragedy, but if an opportunity presents itself un-sought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to make an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan." এই ধারণাকে মধুসূদন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারীতে'

অল্পাধিক কার্যকর করেছিলেন। মদনিকার রঙ্গপ্রিয়তা এবং চপলতা একদিকে বৈচিত্র্য আনে, অপরদিকে কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডিকে তীব্রতর করে তোলে। পরিশেষে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। কোনো শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিতে বিষাদের চরম মুহূর্তে যবনিকা পড়ে না। নাটক শেষ হওয়ার আগে ট্র্যাজেডির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম জড়িত কোনো চরিত্রকে দিয়ে শেক্সপীয়র কতকগুলি কথা বলান যার ফলে দর্শকেরা ট্র্যাজিকবৃত্ত থেকে মোটামুটি বাস্তব জগতের সংস্পর্শে ফিরে আসতে পারে। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মধুসূদন এই রীতির অনুসরণ করেছেন। মন্ত্রী সত্য দাসের বিবেচনাপূর্ণ সমাপ্তি-সংলাপ ("রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক। আর আসুন, এ বিষয়ে যা কর্তব্য, দেখা যাকৃগে। এদিকের তো সকলি শেষ হল। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তোমার কি অদ্ভুত লীলা। আসুন, রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি।" [যবনিকা পতন] উদয়পুরের ট্র্যাজিক জগৎ এবং আমাদের প্রাত্যহিক জগৎ—এই দুয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ।

মধুসূদনের শেষ নাটক 'মায়াকানন' রচনাকালে তাঁর প্রতিভা স্তিমিত-মনস্ক। এই নাটকটিতেও শেক্সপীয়রের সামান্য প্রভাব লক্ষণীয়। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে মৃত মহারাজার আত্মার আবির্ভাব হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার আবির্ভাব-দৃশ্য বা ব্যাঙ্কোর আত্মার আবির্ভাব-দৃশ্যের কথা স্মরণ করায়।

মাইকেল মধুসূদন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের প্রথম নাট্যকার যাঁর নাটক সাহিত্যপদবাচ্য। কিন্তু মঞ্চসফল নাট্যকার বলতে যা বোঝায়, মধুসূদন তা নন। দীনবন্ধু মিত্রই যথার্থ বাংলা নাটককে অভিজাতদের বাগানবাড়ি থেকে থেকে জনসাধারণের আঙিনায় হাজির করলেন। বাংলা মঞ্চেরও শুরু দীনবন্ধুর নাটক অভিনয় করে। তাঁর 'নীলদর্পণ' শতাধিক বছর পূর্বে জনমনে যে-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, পরিবর্তিত পটভূমিকা সত্ত্বেও আজকের দর্শকের মনে তা অপরিম্লান। বাংলা নাটকের আদিযুগের এই অসামান্য প্রতিভাবান নাট্যকার দীনবন্ধুর নাটকেও শেক্সপীয়রের প্রভাব অল্পাধিক পরিলক্ষিত হয়। দীনবন্ধু হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষ করে শেক্সপীয়রের সঙ্গে, তাঁর সবিশেষ পরিচয় ছিল। শেক্সপীয়রের নাটক যে তিনি কত আন্তরিকতার সঙ্গে পড়েছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর বিভিন্ন নাটকের চরিত্রের সংলাপের যত্রতত্র শেক্সপীয়রের উদ্ধৃতি বাহুল্যে। কিন্তু মহাকবির

সঙ্গে এই সুগভীর পরিচিতি সত্ত্বেও দীনবন্ধুর নাটকে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব ঠিক সেই ধরনের নয় যেমনটি আমরা দেখি মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'তে বা গিরিশ-চন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল'-এ বা দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান'-এ। শেক্সপীয়রীয় প্রভাব দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে গুণগত নয়, তাঁর নাট্যশৈলী একান্ত নিজস্ব। মহাকবির প্রভাব তাঁর নাটকে সব সময়েই বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা বা সিচুয়েশন বা সংলাপ বা কোনো theatrical convention-এর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ এবং এই জাতীয় প্রভাব দীনবন্ধুর বেশ কয়েকটি নাটকেই অল্পাধিক পরিলক্ষিত হয়।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী'তে শেক্সপীয়রের *Merry Wives of Windsor* নাটকটির প্রভাব সবিশেষ সক্রিয়। 'জলধর-জগদম্বা-মল্লিকা মালতী' episode-টি ঘটনা ও চরিত্র-পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রায় পুরোপুরি শেক্সপীয়র-নির্ভর। জলধর চরিত্রটি Falstaff-এর ছায়ায় রচিত, Falstaff-এর মতো সেও নিজের রূপগুণ ও রসিকতায় নিজেই বিভোর। মল্লিকা ও মালতী Mrs. Ford এবং Mrs. Page-এর মতোই witty এবং রসিকা। চরিত্রগত সাদৃশ্যের চেয়ে ঘটনাগত সাদৃশ্য কোনো অংশে কম নয়। জলধর তার প্রণয়াধিক্যের জন্য Falstaff-এর মতোই দু'বার নিগৃহীত হয় এবং সেই নিগ্রহও একই ধরনের। জলধর-নিগ্রহের ব্যাপারে মল্লিকা ও মালতীর ভূমিকা Mrs. Ford ও Mrs. Page-এর ভূমিকারই অনুকৃতি। আবার শেক্সপীয়রের নাটকের Mr. Ford-এর মতোই রতিকান্তও স্ত্রীর সতীত্বে অনর্থক সন্দেহ করে একই ভাবে বোকা প্রতিপন্ন হচ্ছে। সর্বোপরি, কোনো কোনো জায়গায় সংলাপের সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে "কমলিনীকে অন্য আখ্যায় ব্যাখ্যা করলে, কমলিনীর সৌন্দর্য-সৌগন্ধের অন্যথা হয় না" *Romeo and Juliet*-এর স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিতে "The Rose, call it by any name, would smell as sweet" লাইনগুলির ভাষান্তর মাত্র। অবশ্য সংলাপগত এই সাদৃশ্য খুবই কম। পুরো episode-টির মধ্যে Fairy-রা অনুপস্থিত এবং জগদম্বা চরিত্রটি মৌলিক সৃষ্টি।

'লীলাবতী' নাটকেও শেক্সপীয়রের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন প্রভাব চোখে পড়ে। ললিত-লীলাবতীর প্রণয়দৃশ্যটি সম্ভবতঃ *Romeo and Juliet*-এর ছায়ায় পরিকল্পিত। অবশ্য এই সাদৃশ্য নিতান্তই বহিরঙ্গ, কারণ শেক্সপীয়রের প্রণয়দৃশ্যটিতে যে আবেগ এবং সূক্ষ্ম শিল্পবোধ আছে, বাংলা নাটকটিতে তা

নেই বললেও চলে। ফলত ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপ নিছক বাগাড়ম্বরের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। আলোচ্য নাটকে শেক্সপীয়রের কাছে দীনবন্ধুর ঋণ একটি ঘটনা-সংস্থাপনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মহাকবির বহু ব্যবহৃত sex-concealment device-এর অনুকরণেই দীনবন্ধু চাঁপাকে সন্ন্যাসী, অরবিন্দ ইত্যাদি সাজিয়েছেন।

'সধবার একাদশী' নাটকের প্রধান চরিত্র নিমে দত্তকে কখনো কখনো Falstaff-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। নিমে দত্ত চরিত্রটির ট্র্যাজিক পরিণতি বা তার তীব্রতা হয়তো বা শেক্সপীয়র প্রভাবপুষ্ট হতে পারে; কিন্তু Falstaff-এর সঙ্গে তার সাদৃশ্য নিতান্তই কষ্টকল্পিত। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকটিতে নিমে দত্তর সংলাপে মহাকবির নাটক থেকে কিছু উদ্ধৃতির ব্যবহার ছাড়া অন্য কোনো শেক্সপীয়রীয় প্রভাব অনুসন্ধান করতে গেলে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন।

'কমলে-কামিনী' নাটকটিতে দীনবন্ধু *Macbeth*-এর কয়েকটি লাইন motto রূপে ব্যবহার করেছেন (Duncan-dismay'd not this/Our Captains, Macbeth and Banquo ?/Sergeant—Yes ;/As sparrows eagles, or the hare the lion.)। এর থেকে পাঠকের ধারণা করা স্বাভাবিক যে, দীনবন্ধু এই নাটকটিকে বীররসাত্মক করতে চেয়েছিলেন, শিখণ্ডীবাহনের বীর্যের সঙ্গে Macbeth বা Banquo-র বীরত্বের সাদৃশ্য দেখাতে চেয়েছিলেন। হয়তো তাই, কিন্তু পাঠকের সেই আশা নাটকটি পূর্ণ করতে পারে নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাটকের আদিপর্বের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সুগভীর পরিচয়ের কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর রূপান্তর ও অনুবাদের মাধ্যমে বাঙ্গালী পাঠক বিভিন্ন দেশের ও ভাষার সাহিত্যরত্নের সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনাবলীতে ফরাসী বা সংস্কৃত সাহিত্যের যত বেশি স্থান, সে তুলনায় ইংরাজী সাহিত্যের, বিশেষত শেক্সপীয়রের স্থান নিতান্তই স্বল্প। তবুও উনিশ-শতকী সাহিত্যের যে সাধারণ শেক্সপীয়রমনস্কতা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। শেক্সপীয়র অনুবাদের যে ধারাটি স্তিমিতপ্রায় হয়ে এসেছিল, ১৯০৭ সালে *Julius Caesar* অনুবাদ করে তিনি সেটিকে আবার বেগবতী করে তুললেন। শেক্সপীয়রের অনুবাদ ছাড়া তাঁর মৌলিক নাটকেও মহাকবির প্রভাব অল্পাধিক পরিলক্ষিত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটকটির দুটি প্রধান চরিত্র এবং ঘটনার পরিণতি শেক্সপীয়র-প্রভাবপুষ্ট। সেলিম চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্বে Othello-র অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা স্মরণে আসে। Othello-র মতো তার মনেও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়েন, Othello-র মতোই সে ঈর্ষার জ্বালায় নিজের প্রণয়িনীকে হত্যার চেষ্টা করেছে এবং পরে নিজে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে। আলোচ্য নাটকেই ফরিদ চরিত্রটি Iago-র ছায়ায় রচিত। Iago-র মতো ফরিদের কুটিলতাই নাটকটিকে ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। 'অশ্রুমতী'র পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'মানময়ী' নামে একটি ছোট গীতিনাট্য লেখেন। উনিশ বছর পরে এই নাটকটিই পুনর্লিখিত হয়ে 'পুনর্বসন্ত' নামে প্রকাশিত হয়। 'পুনর্বসন্ত'-এর স্বল্প কাহিনী শেক্সপীয়রের *A Midsummer Night's Dream*-এর ছায়ায় পরিকল্পিত।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত নামগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। তিনি বাংলা নাটকের আদিযুগ ও মধ্যযুগ উভয়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ; কাজেই তাঁর নাটকে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব কতটা কার্যকর হয়েছে তা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। গিরিশচন্দ্র নিঃসন্দেহে তাঁর কথায় এবং কাজে শেক্সপীয়রের অনুগামী। তিনি নিজেই বলেছেন, "মহাকবি শেক্সপীয়রই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি।" ছেলেবেলা থেকেই গিরিশচন্দ্রের শেক্সপীয়রে প্রবল আগ্রহ। শেক্সপীয়রের নাটক তিনি যেমন পড়েছিলেন এবং আয়ত্ত করেছিলেন, তৎকালীন কোনো দেশীয় অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ বোধহয় তা করেন নি। মহাকবির সঙ্গে বাল্যাবধি গড়ে-ওঠা এই সুগভীর পরিচিতির ছাপ গিরিশ নাট্যাবলীর সর্বত্র স্বপ্রকাশ। তাঁর নাটকের ভাষা, ঘটনা-সংস্থাপনা ও প্লট, আংশিক বা সামগ্রিক চরিত্র-পরিকল্পনা, বিভিন্ন theatrical convention-এর ব্যবহার, এমনকি কখনো কখনো ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও শেক্সপীয়রের প্রভাব সুস্পষ্ট।

প্রথমেই আলোচিত হওয়া প্রয়োজন গৈরিশি ভাষা। গিরিশচন্দ্রের ভাষা বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁর স্মরণযোগ্য দান। যেখানে যে-ভাষা যেমন ভাবে প্রযোজ্য, সেখানে তিনি সেই ভাষাই ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রের কাছে ঋণী। Macbeth বা King Henry কাব্যিক সংলাপে নিজেদের ভাব প্রকাশ করে, Porter বা Falstaff কথা বলে গদ্যে।

গিরিশচন্দ্রও, তাঁর সংলাপের ক্ষেত্রে অল্পাধিক এই রীতিরই অনুবর্তী। তাঁর 'জনা' নাটকে একই দৃশ্যে বিদূষক গদ্যে ও জনা পদ্যে ভাব প্রকাশ করে। আবার শেক্সপীয়রের মতো গিরিশচন্দ্রও হাল্কা ও হাস্যরসাত্মক ভাব প্রকাশের জন্য পদ্য ব্যবহার করেছেন। সর্বোপরি, গৈরিশিছন্দ শেক্সপীয়রীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে পৃথক হলেও তার সৃষ্টি একই অনুপ্রেরণা-সঞ্জাত। উভয়েরই উদ্দেশ্য মূলত অভিন্ন: ভাষাতে সর্বাত্মক নাটকীয়তা আরোপ করা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবানুভূতির বাহন করে তোলা।

শেক্সপীয়রের কাছে হলিনশেড বা প্লুটার্চ বা সিন্থিও যা ছিল, গিরিশের কাছে শেক্সপীয়রও বহুলাংশে প্রায় তাই ছিলেন। শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকের ছায়া অবলম্বনে তাঁর কয়েকটি নাটক রচিত। পারস্য উপন্যাসকে ভিত্তি করে রচিত মিলনান্ত নাটক 'মনের মতন'-এর শেষদিকটি *As you Like It*-এর ছাঁচে গড়া। 'স্বপ্নের ফুল' গীতিনাট্যখানিও পরিবেশ-পরিকল্পনায় *A Midsummer Night's Dream*-এর কাছে ঋণী। এ ছাড়া শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাট্যাংশ তো গিরিশচন্দ্র নিজের প্রয়োজনমতো যথেচ্ছ কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর বহু চরিত্রের সঙ্গে শেক্সপীয়রীয় চরিত্রাবলীর অবস্থাগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। Caesar-এর মৃত্যুর পর তার 'spirit'-এর মতো 'চণ্ড' নাটকে রঘুদেবজীও মৃত্যুর পরে অন্যান্য সব কটি চরিত্রকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে। 'জনা' নাটকের কোনো কোনো স্থানে *Coriolanus*-এর প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। জনা যখন পুত্রবধূ মদনমঞ্জরীকে বীরজায়ার কঠোর কর্তব্য বোঝাচ্ছে স্বামীর অকল্যাণে আশঙ্কিতা পুত্রবধুকে উৎসাহিত করছে ("ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ", "উচ্চকার্যে স্বামীকে উৎসাহ কর দান" বা "এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হতে?") তখন স্মরণে আসে *Coriolanus*-এর সেই দৃশ্যটি যেখানে Volumnia বিচলিতা পুত্রবধূ Vergilia-কে বলছে, "Away, you fool! It more becomes a man/Than gilt his trophy. The brearsts of Hecuba,/when she did suckle Hector, look'd not lovelier/Than Hector's forehead when it spit forth blood/At Grecian sword, contemning.

'সিরাজুদ্দৌলা' নাটকটি পড়লে *Richard II*-এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য উপেক্ষা করা যায় না। দুটি নাটকেই নিরীহ রাজা বিশ্বাসঘাতক আত্মীয় বা বন্ধুবর্গের ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত ও নিহত। কখনো কখনো সিরাজের সংলাপে Richard-

এর কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। Richard-এর আক্ষেপ: "O that I were a mockery king of show" সিরাজের আর্তি: "প্রিয়ে ফুরায়েছে রাজ অভিনয়" থেকে কিছুমাত্র পৃথক নয়। 'মিরকাশিম' নাটকেও এই আংশিক অবস্থাগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মিরকাশিম-বেগম যখন নবাবকে বলছে, "আমি তোমার পত্নী, তুমি আমাকে বিলাসিনী রমণীজ্ঞানে উপেক্ষা করো না", তখন মনে পড়ে *Julius Caeser*-এর সেই দৃশ্যটি যেখানে Portia Brutus-কে বলছে, "I grant I am a woman but withal, A woman that Lord Brutus took to wife." 'পূর্ণচন্দ্র' এবং 'বাসর' নাটকেও দুটি একই ধরনের হাসির ঘটনার উৎস *Merry Wives of Windsor.* প্রথম নাটকে যখন সারি ও সুন্দরা দামোদরকে বাঁদর সাজাচ্ছে বা দ্বিতীয় নাটকটিতে বিম্বাবতীর সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে জগন্নাথ যখন রান্নাঘরে আটকা পড়ছে, তখন আমাদের স্মরণে আসে Mrs. Page-এর হাতে Falstaff-এর বেকুব বনার দৃশ্যটি। 'বিষাদ' নাটকের টুকরো টুকরো ঘটনা শেক্সপীয়রের ছায়া অবলম্বনে রচিত। রাজরাণী সরস্বতীর বালকবেশে বেশ্যাসক্ত স্বামীকে সেবা করা *The Two Gentlemen of Verona*-র Julia-র প্রেমাস্পদ Proteus-এর দাস্যবৃত্তির সঙ্গে তুলনীয়। ঐ একই নাটকে অলর্ককে প্রলুব্ধ করার জন্য ময়ূরপঙ্খী বজরায় রূপবতী উজ্জ্বলার গীতলহরী Enobarbus বর্ণিত Cydnus নদীতে Cleopatra-র কথা স্মরণ করায়। এমনি উদাহরণ আরও বহু পাওয়া যাবে গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের চরিত্রাবলী তাঁর ঘটনা-সমূহের চেয়ে কম, শেক্সপীয়র-প্রভাবপুষ্ট নয়। কয়েকটি শেক্সপীয়রীয় 'type' চরিত্র গিরিশচন্দ্রকে সবিশেষ প্রভাবিত করেছে। শেক্সপীয়রের Fool বা Clown শ্রেণীর চরিত্রের ছাঁচে গড়া এক শ্রেণীর ভাঁড়-জাতীয় চরিত্র গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকেই চোখে পড়ে। 'শ্রীবৎস-চিন্তা'-র বাতুল, 'অশোক'-এর আকাল, 'জনা'-র বিদূষক, 'পাণ্ডব-গৌরব'-এর কঞ্চুকী, 'চণ্ড' নাটকের পূর্ণরাম ভাট, 'সিরাজুদ্দৌলা'-র করিমচাচা প্রভৃতি এই শ্রেণীর চরিত্র। Fool-এর পরেই গিরীশচন্দ্রের সর্বাধিক প্রিয় চরিত্র সম্ভবত Falstaff. 'মুকুলচাঁদ' নাটকের বরুণচাঁদ চরিত্রটি Falstaff-এর মতোই; সে নিজে না হেসে পরকে হাসায়, বাক্‌পটু এবং উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন। এই ভূমিকায় অভিনয় করার পর থেকে অর্ধেন্দুশেখর [illegible] Indian Sir John Falstaff নামে অভিহিত হতেন। 'মোহিনী-প্রতিমা'-র জম্বুভন্ন

এবং 'পূর্ণচন্দ্র'-এর দামোদর চরিত্র দুটিও Falstaff-এর ছায়া অবলম্বনে সৃষ্ট। এ ছাড়াও তাঁর বহু চরিত্র-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের কাছে পুরোপুরি না হলেও আংশিক ঋণী। তাঁর প্রথম নাটক 'আনন্দ রহো'-তে লীলার চরিত্রে Lady Macbeth-এর ছায়া পড়েছে। 'বৈষ্ণবী' নাটকের গুলসানাও শেক্সপীয়র-নির্ভর চরিত্র। জনা চরিত্রের উপর একই সঙ্গে বিভিন্ন শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। *Richard III* নাটকে স্বামীপুত্রের হত্যার প্রতিশোধ মানসে Queen Margaret-এর যে ভীষণ রূপ, তার সঙ্গে জনা চরিত্রের ভীষণতার সবিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার যেখানে জনা পুত্রবধুকে অনুপ্রাণিত করতে প্রয়াসী, সেখানে *Coriolanus*-এর Volumnia-র কথা স্মরণে আসে, 'সিরাজুদ্দৌলা'-র জহরা চরিত্রেও Queen Margaret-এর স্বল্প ছাপ চোখে পড়ে। ঐ একই নাটকে সিরাজ-পত্নী লুৎফ্‌উন্নেসার সঙ্গে *Henry IV*-এর Lady Percy-র মিল অতিসামান্য হলেও দৃষ্টি এড়ায় না।

শেক্সপীয়রের কাছে গিরিশচন্দ্রের ঋণ চরিত্র-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মহাকবির একাধিক নাটকীয় কৌশল গিরিশচন্দ্রের বিভিন্ন নাটকে অবাধে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিষাদ' নাটকে রাজরাণী সরস্বতীর বালকবেশে অলর্ক ও উজ্জ্বলার দাস্যবৃত্তি গ্রহণ, 'রূপ-সনাতন' নাটকে অলকার কনোজিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জ্যোতিষী সাজা, 'মায়াবসান' নাটকে যাদব ও মাধবের স্ত্রীদের পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ ইত্যাদি নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রীয় sex-concealment device দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিভিন্ন নাটকে প্রেতাত্মার অবতারণা শেক্সপীয়রের প্রভাবজাত। 'বিষাদ' নাটকটিতে রাজমাতা ও সরস্বতীর ছায়া-মূর্তির আবির্ভাব *Hamlet*-এর অনুকৃতি। 'চণ্ড', 'কালাপাহাড়' ইত্যাদি নাটকও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

কিন্তু এ পর্যন্ত আলোচিত সাদৃশ্য নিতান্তই বহিরঙ্গ। গৈরিশ নাটকে যে শেক্সপীয়রের মতো ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, প্রতিহিংসা, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতির ছড়াছড়ি তাও নিঃসন্দেহে বহিরাশ্রয়ী মিলের পর্যায়ভুক্ত। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শেক্সপীয়রের প্রকৃত মিল উভয়ের ট্র্যাজেডির সমধর্মিতায়। মহাকবির কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় ঋণ ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। গিরিশচন্দ্র নিজেই বলেছেন, "এই যে ভিতরের দ্বন্দ্ব—internal dramatic actions—যা সামান্য-ভাবে বাইরে প্রকাশ পায়, সেই internal dramatic actions এঁকে দেখানোই best literary art।" এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, যা গিরিশচন্দ্রের মতে শ্রেষ্ঠ

নাটকীয় সম্পদ্—শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির প্রাণবস্তুস্বরূপ এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বই গিরিশচন্দ্রের সার্থক নাটকের—সংখ্যায় যদিও তা নিতান্তই স্বল্প—প্রকৃত শক্তি। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটি অনেকের মতে গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। তার কারণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে গিরিশচন্দ্র এই নাটকটিতে বহুলাংশে সার্থকভাবে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির সাঙ্গীকরণ করতে পেরেছেন। চরিত্রগুলির বিকাশ প্রধানত মনস্তত্ত্বসম্মত; নাট্যশৈলী মূলত সংলাপ-নির্ভর এবং চরিত্র-বিকাশী। 'জনা' বা 'প্রফুল্ল'-ও এই প্রসঙ্গে অল্পাধিক স্মরণযোগ্য। অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই নাটকগুলি শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির সমধর্মী, সমকক্ষ নয়।

গিরিশপ্রসঙ্গে পরিশেষে আরো দুই-একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়রের কাছে সবিশেষ ঋণী। কিন্তু তাঁর ঋণ অনুকরণমাত্র নয়। নিছক অনুকরণ craftsman-এরই শোভা পায়, তা কখনোই শিল্পী-জনোচিত নয়। তার থেকেও বড় কথা, গিরিশচন্দ্রের পক্ষে শুধুমাত্র অনুকারী হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। শেক্সপীয়রের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। জাতীয় ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল গভীরতর। শেক্সপীয়রীয় তথা রেনেসাঁস জীবনদর্শন এবং ধর্মময়তায় আপ্লুত খাঁটি বাঙ্গালী দৃষ্টিভঙ্গির মাঝখানে যে বিপুল ব্যবধান তা অতিক্রম করা গিরিশচন্দ্রের কাম্য ছিল না, সাধ্যও ছিল না। ফলত কখনো বা একই নাটকে দুটি ধারা স্বকীয়তা বজায় রেখে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো আবার দুয়ে মিলিয়ে ঘটিয়েছে রসাভাস। তাহলে কি এই কথাই মেনে নিতে হবে যে, গিরিশচন্দ্রের উপরে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব একেবারে ব্যর্থ হয়েছে? একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকই অভিনীত হতে দেখলে বা পড়তে গেলে সেগুলিতে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব অল্পাধিক বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই প্রভাব নিঃসন্দেহে বাংলা নাটকের পুষ্টিসাধন করেছে। গৈরিশ যুগের প্রারম্ভে বাংলা নাটকের যে অবস্থা ছিল, গিরিশচন্দ্রের পরে বাংলা নাটকে তার থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই উন্নতিটুকুই গিরিশচন্দ্রের শেক্সপীয়রমনস্কতার ফলশ্রুতি। গিরিশচন্দ্র অক্লেশে এবং অকুণ্ঠায় শেক্সপীয়রের ভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ না করলে বাংলা নাটকের ইতিহাস অন্যরকম রচিত হত।

গিরিশচন্দ্রের পরেই সমকালজ নাট্যকারদের মধ্যে অমৃতলাল বসুর

স্থান সর্বাগ্রগণ্য। বিদেশী নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষত শেক্সপীয়রের সঙ্গে, অমৃতলালের যোগ ছিল অত্যন্ত নিবিড়। এ সত্ত্বেও নানাবিধ কারণে (কারণগুলি বর্তমান বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হওয়ার অসুবিধা আছে) তাঁর নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব নিতান্তই স্বল্প। পারতপক্ষে অমৃতলাল শেক্সপীয়রের অনুকরণ বা অনুসরণ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছেন।

অমৃতলালের 'রাজাবাহাদুর' নাটকটিতে সামান্য হলেও শেক্সপীয়রের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই নাটকের একটি জায়গায় চরিত্র পরিকল্পনা ও ঘটনা-পরিকল্পনা *Taming of the Shrew* নাটকটির অনুকৃতি। ঘটনাগত ভাবেও উভয় নাটকের মধ্যে যে বিরাট সাদৃশ্য *Tamiug of the Shrew*-এর Introduction-এর প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যটির পাশাপাশি 'রাজাবাহাদুর'-এর তৃতীয় দৃশ্যটি পড়লেই উপলব্ধি করা যায়। অমৃতলালের 'কৃপণের ধন' প্রহসনটি মূলত মলিয়েরের *The Miser*-এর অনুকৃতি হলেও এতে মন্মথ ও কুন্তলার প্রণয়াখ্যানটি সম্ভবত *The Merchant of Venice*-এর Jessica-Lorenzo প্রণয়বৃত্তান্তটির অনুপ্রেরণাসঞ্জাত।

বাংলা নাটকের মধ্যযুগের সার্থকতম নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর শেক্সপীয়রের প্রতি বাল্যাবধি-গড়ে-ওঠা অনুরাগ ইংলণ্ডবাসের ফলে তীব্রতর হয়েছিল। মহাকবির সমাধির সামনে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন শেক্সপীয়রকে কালিদাসের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই প্রতিজ্ঞা-রক্ষার ছাপ তাঁর নাট্য-সাধনার সর্বস্তরে স্বপ্রকাশ। তাঁর নাটকের ভাষা, ঘটনা-সংস্থাপনা, আংশিক বা সামগ্রিক চরিত্র পরিকল্পনা, মায় ট্র্যাজেডি পরিকল্পনাতেও শেক্সপীয়রের প্রভাব সুস্পষ্ট।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লেখা শুরু করেন শেক্সপীয়রের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে। 'তারাবাঈ' প্রকাশিত হবার পর নবীনচন্দ্র তাঁকে গদ্যে নাটক রচনার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শের ফলে এবং নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী এখন থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যে লেখা শুরু করলেন। কিন্তু পরবর্তী নাটকসমূহের বহু অংশেই তাঁর গদ্য কাব্যাশ্রয়ী (যেমন 'সাজাহান' নাটকের ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্যে সাজাহানের স্বগতোক্তি)। অমিত্রাক্ষরের ব্যর্থতা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যের এই কাব্যময়তার উৎস সম্ভবত শেক্সপীয়রীয় ভাষা নিয়ে তাঁর প্রথম দিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ভাষার ব্যাপার ছাড়া বিভিন্ন ঘটনা-সংস্থাপনার ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়রের কাছে ঋণী। 'ভীষ্ম' নাটকের শান্ব-সত্যবতীর দৃশ্যটি (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) নিঃসন্দেহে *Richard III*-এর ১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্যের প্রভাবে রচিত। 'তারাবাঈ' নাটকের সূর্যমল ও তমসার কাহিনী *Macbeth* নাটকের অনুসরণে পরিকল্পিত। Macbeth-এর Duncan-প্রীতির মতো সূর্যমলের চরিত্রেও রয়েছে ভ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য বাৎসল্য। আবার Macbeth-এর মতোই সূর্যমল রাজ্যলোভকে অস্বীকার করতে পারছে না। এই উচ্চাশাকে Witch-দের মতো চারণীর ভবিষ্যদ্বাণী প্রজ্জলিত করে তুলেছে। আবার সূর্যমল-পত্নী তমসা যখন স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কার্যকর করে তোলার প্ররোচনায় প্রয়াসী, তখন আমাদের Lady Macbeth-এর কথা মনে পড়ে যায়। 'নূরজাহান' নাটকের লায়লা চরিত্রের সঙ্গে 'Hamlet' নাটকের নায়কের অবস্থাগত সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। পিতৃহন্তাকে যে তার মা বিবাহ করেছে Hamlet-এর মতো লায়লার কাছেও তা অসহ্য। Hamlet-এর মতোই সে তার মাকে সমালোচনা করেছে এবং পিতৃহন্তাকে ধ্বংস করার শপথ নিয়েছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে পরবর্তী কালের লায়লা—যার নারীত্ব অন্য সবকিছুর উপরে—Hamlet-এর থেকে অনেক পৃথক এবং দুর্বল।

ভাষা বা ঘটনা-সংস্থাপনার দিক থেকে দ্বিজেন্দ্র-নাটকের চরিত্রাবলী অধিকতর শেক্সপীয়র-প্রভাবপুষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বাধিক প্রিয় Lear চরিত্রের ছায়া তাঁর বহু চরিত্রেই লক্ষণীয়। 'মেবারপতন'-এর গোবিন্দসিংহ, 'সিংহল-বিজয়'-এর সিংহবাহু এবং 'পরপার'-এর বিশ্বেশ্বর প্রমুখ চরিত্রের সঙ্গে Lear-এর অল্পবিস্তর সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। Lear-এর পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল-এর ঋণ Hamlet-এর কাছে। Hamlet-এর প্রভাব লায়লা চরিত্র ছাড়া 'সিংহল-বিজয়' নাটকের কুবেণী চরিত্রের উপরেও পড়েছে। সূর্যমল, তমসা প্রভৃতি চরিত্রের উপর অন্যান্য শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের প্রভাবের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই মহাকবির সাহায্য নিয়েছেন। প্রয়োজনবোধে সমধর্মী চরিত্রের মুখে শেক্সপীয়রের চরিত্রের সংলাপের প্রায় বঙ্গানুবাদ জুড়ে দিতেও ইতস্তত করেন নি। তাই 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে অপমানিতা মুরাকে যখন বলতে শুনি: "শূদ্রাণী! শূদ্র মানুষ নহে? ত'র কি ক্ষত্রিয়ের মত হস্তপদ

নাই? মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই?" তখন Shylock-এর অনুরূপ সংলাপ স্মরণে আসে: "I am a Jew. Hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions?" চরিত্র পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা আংশিক ঋণের কথা ছেড়ে দিলেও দ্বিজেন্দ্রলাল-সৃষ্ট কয়েকটি প্রধান চরিত্র আগাগোড়া কয়েকটি বিখ্যাত শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের ছাঁচে ঢালা। দিলদার, সম্রাট সাজাহান ও নূরজাহান পুরোপুরি শেক্সপীয়র-নির্ভর চরিত্র। দিলদারের সঙ্গে *King Lear*-এর Fool-এর মিল বড় অল্প নয়। এমন কি কখনো কখনো দিলদারের সংলাপ শেক্সপীয়রের ভাষান্তর মাত্র। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল শেষরক্ষা করতে পারেন নি। সাজাহান চরিত্রের পরিকল্পনা—তার অবস্থাগত সাদৃশ্য, নিদারুণ ট্র্যাজেডির সামনে নিষ্ক্রিয়তা, উন্মাদ হয়ে নিজের অভিশাপ উদ্দাম প্রকৃতির মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া—এ সবই Lear-এর চরিত্রানুসরণে পরিকল্পিত। 'সাজাহান' নাটকের ৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য তো *King Lear*-এর Storm scene-এরই ভাবানুবাদ। সাজাহানের নিষ্ফল চিৎকার: "মেঘ! বারবার কি নিষ্ফল গর্জন কর্চ্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে দিতে পার?"—Storm scene-এ লীয়ারের আর্তিরই প্রতিধ্বনি। কিন্তু শেক্সপীয়রের প্রভাব সাজাহান বা দিলদারের থেকে নূরজাহান চরিত্রে বেশি সার্থক হয়েছে। শেক্সপীয়র যে ধাতুতে Lady Macbeth-কে গড়েছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ধাতুতেই নূরজাহানকে গড়েছেন।

এসব ছাড়া শেক্সপীয়রের বহুবিধ নাটকীয় কৌশল দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিভিন্ন নাটকে অসঙ্কোচে লাগিয়েছেন। 'সিংহল-বিজয়' নাটকে লীলার বালকের ছদ্মবেশ গ্রহণ শেক্সপীয়রীয় sex-concealment device-এর অনুস্মৃতি। 'সাজাহান' নাটকের ৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্যে ঔরংজীবের hallucination-এর সঙ্গে *Macbeth* নাটকের Banquet scene-এর সাদৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সর্বোপরি নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার নতুন না হলেও একে এত নাটকীয় ভাবে ব্যবহার করা দ্বিজেন্দ্রলালেই প্রথম। তাঁর নাটকে গান সংলাপের কাজ করে, নিছক গানই থাকে না। এ ব্যাপারেও দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়র-প্রভাবিত বললে তা নিছক কষ্টকল্পনা হবে না।

এতাবৎ দ্বিজেন্দ্র-নাটকে শেক্সপীয়রীয় নাটকের যে প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি তা নিতান্তই বহিরাশ্রয়ী। দু-জনের মধ্যে প্রকৃত মিল উভয়ের

ট্র্যাজেডির সমধর্মিতায়। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে বলেছেন: "অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকেই দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।" এবং তাঁর নাট্যসাধনার শুরু থেকেই এই বিশেষ গুণটি আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি। 'তারাবাঈ' নাটকে সূর্যমল-তমসার কাহিনী শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির তারে বাঁধা। অবশ্য মাঝপথেই সূর্যমল চরিত্রটি অতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তমসা অতি-নাটকীয়তার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তি অনেক বেশি সংহত হয়ে ওঠে। এই সময় রচিত 'সাজাহান' নাটকে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিক রীতির প্রয়োগ সার্থকতর এবং অধিকতর শিল্পসম্মত। 'নূরজাহান' নাটকে ঘটে তাঁর শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। গতিবেগের তীব্রতা ও অনিবার্যতা, সার্থক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি এবং ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনায় 'নূরজাহান' বাংলাদেশে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির প্রথম সার্থক রূপায়ণ।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে সবশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। শেক্সপীয়রীয় প্রভাব অধিকাংশ নাট্যকারের রচনায় ভারমাত্র; দ্বিজেন্দ্রলাল এ ব্যাপারে আর সকলের চেয়ে প্রয়োগসিদ্ধ। তাঁর শেক্সপীয়র-মনস্কতা কোনো মতেই শুধুমাত্র নকলনবিশী নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব সামান্য হলেও একেবারে অনুপস্থিত নয়। তাঁর 'পলিন' নাটকের বিষয়বস্তু পুরুষের ছদ্মবেশ ধরে নায়িকার ভ্রমোৎপাদন। এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রীয় disguise-convention-এর অনুপ্রেরণাজাত। তাঁর 'রক্ষঃরমণী' নাটিকাটিতে *Tempest*-এর প্রভাব লক্ষ্যণীয়, বিশেষত সর্বাণীর চরিত্রের ও সিচ্যুয়েশনের সঙ্গে Miranda-র চরিত্র ও অবস্থার সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। অনেকের মতে অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ রচনা 'নর-নারায়ণ' শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিক রীতির অনুগামী। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হতে পারে, কিন্তু এই নাটকে তিনি কতটা শেক্সপীয়র-অনুগামী তা প্রমাণসাপেক্ষ।

সবশেষে যাঁর নাটকে আমরা শেক্সপীয়রীয় প্রভাব অনুসন্ধান করব তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই তুলনামূলক আলোচনায় কেউ কেউ হয়তো কুঞ্চিতনাসা হয়ে মনে করতে পারেন যে, এতে রবীন্দ্রনাথের অসম্মান করা হয়। তার উত্তরে আমরা এইটুকুই বলব যে Ibsen যদি Scribe-এর

সাহায্য নিয়ে Ibsen থাকতে পারেন, Shaw যদি Robertson-Pinero-র সাহায্য নিয়েও Shaw থাকতে পারেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথ কেন শেক্সপীয়রের সাহায্য নেওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ থাকতে পারবেন না? প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিষয়বস্তু যে কোনো মহৎ শিল্পীর মতোই tradition-নির্ভর। সেই traditional (এখানে traditional শব্দটি খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না) বিষয়বস্তুর মধ্যে ব্যাস-বাল্মিকীর যেমন স্থান, Donne-Shelley-র যেমন স্থান, শেক্সপীয়রেরও ততটুকুই স্থান। রবীন্দ্রনাথের tradition সমগ্র বিশ্বসাহিত্য-নির্ভর।

কবিগুরুর প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন নাটকে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব নানা ভাবে কার্যকর। কখনো বা তিনি শেক্সপীয়রীয় sex-concealment device-এর অনুসরণে শৈলবালাকে পুরুষের ছদ্মবেশ পরিয়েছেন। কখনো বা সাধারণ লোকেদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শেক্সপীয়রের Mob-এর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাঁর কোনো কোনো নাটকের কোনো কোনো সিচ্যুয়েশন শেক্সপীয়রীয় কোনো সিচ্যুয়েশনের প্রভাবপুষ্ট। 'বিসর্জনে' নক্ষত্র রায়ের যে স্বগতোক্তি: "যেথা যাই, সকলেই বলে 'রাজা হবে?' 'রাজা হবে?' এ বড় আশ্চর্য কাণ্ড! একা বসে থাকি তবু শুনি কে যেন বলিছে—'রাজা হবে?' 'রাজা হবে?'—" তা শুনে *Macbeth* এর অনুরূপ সিচ্যুয়েশনের কথা মনে পড়াই স্বাভাবিক। আবার কোনো কোনো নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব অনেক বেশি সামগ্রিক এবং গুণগত। 'চিরকুমার সভা' নাটকটির মূল সুর নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রীয় High Comedy-র তারে বাঁধা হয়েছে। 'শেষ রক্ষা' নাটকটি তো আগাগোড়া একটি *Comedy of Errors*. 'রাজা ও রানী' নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের রূপারোপ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাট্যে শেক্সপীয়রীয় প্রভাব এমন বিচ্ছিন্ন ভাবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা সঙ্গত নয়, এটি সম্যক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু বর্তমান আলোচনার পরিধিতে তা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এইটুকুই বলব যে তাঁর প্রাথমিক যুগের নাটকে নিঃসন্দেহে মহাকবির প্রভাব যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। পরবর্তী যুগে নানা কারণে তাঁর নাট্যশৈলীর গুণগত এবং আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং একান্ত আধুনিক মননশীলতার ফলশ্রুতি স্বরূপ এই নাটকগুলিতে শেক্সপীয়রের স্থান নেই।

তিন

এতক্ষণের দীর্ঘ আলোচনা থেকে একটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলা নাটকের জন্মকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক যুগের নাটকগুলির রচনাকাল পর্যন্ত শেক্সপীয়রের প্রভাব সবিশেষ কার্যকর ছিল। এই প্রভাবের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা অর্থহীন। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী শেক্সপীয়রীয় প্রভাবের চরিত্র কোনো সময়েই গুণগত নয়, তা সবসময়েই বহিরঙ্গগত এবং নিতান্তই ভাসা-ভাসা। এই সিদ্ধান্তটি অনেকের কাছে চমকপ্রদ এবং স্ববিরোধী মনে হতে পারে। সেই কারণেই এটি বিশেষ আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। যুক্তিতর্ক দিয়ে সিদ্ধান্তটিকে প্রমাণ করবার আগে সকলের দৃষ্টি একটি বিশেষ ঘটনার দিকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করি। মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' পর্যন্ত যে-সব নাটকেই শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলার পদ্ধতি আরোপিত হয়েছে তার মধ্যে প্রায় কোনোটিই যথার্থ কালজয়ী হতে পারে নি। আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে যখন কোনো নাট্যকার একই সঙ্গে শেক্সপীয়রীয় পদ্ধতিতে এবং শেক্সপীয়রের প্রভাব-মুক্ত থেকে নাটক লিখেছেন তখন প্রথমোক্ত নাটকের চেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকগুলিই বেশি সার্থক হয়েছে। অমৃতলাল বসুর 'রাজাবাহাদুর' একমাত্র নাটক যেখানে তিনি শেক্সপীয়রকে কাজে লাগিয়েছেন। অথচ এই নাটকটি আজকের দিনে গবেষকের টেবিলেই পড়ে থাকে। অপরদিকে তাঁর 'চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে' বা 'তিলতর্পণ' যাতে শেক্সপীয়রের প্রভাব আদৌ নেই, সেগুলি এখনও পাঠক এবং দর্শক উভয়েরই প্রিয়।

এটি যদি সত্য হয়ে থাকে, এবং আমার ধারণা এটি সত্য, তাহলে তার কারণ কি? একথা ঠিক যে শেক্সপীয়রীয় নাটকে মানবজীবনের সাধারণ এবং শাশ্বত ভাব ও অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছে। তা নাহলে তাঁর নাটক সর্বকালে এবং সর্বদেশে আনন্দের যোগান দিতে পারত না। কিন্তু আবার একথাও ঠিক যে প্রত্যেক দেশেরই এবং প্রত্যেক কালেরই একটি স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গি থাকে। শেক্সপীয়রের নাটকের বিষয়বস্তু যত বিশ্বজনীন এবং সর্বজনীনই হোক না কেন, সেই বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গি এলিজাবেথীয় যুগের একান্ত নিজস্ব। আমাদের প্রত্যেকেরই সেই বিষয়বস্তু ভালো লাগে এবং যদি আমাদের দেশের নাটকে সেই বিষয়বস্তুর স্থান করে দেওয়ার

চেষ্টা হয় তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু যদি আমরা শেক্সপীয়রের একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিটিকে অনুকরণ বা অনুসরণ করতে চেষ্টা করি, তাহলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। রেনেসাঁস-এর পটভূমিকায় ইংল্যাণ্ডের জীবনযাত্রা ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যা ছিল তার সঙ্গে উনিশ শতকী বা বিংশ শতকী বাঙ্গালী জীবনযাত্রা ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যবধানটুকু অনতিক্রম্য। তাজমহল যে সুন্দর এ-কথা শাজাহানের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সকলেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু আজ যদি আমরা সবাই আজকের ঈঙ্গ-মার্কিন আর্কিটেকচারের যুগে আমাদের নিত্য বাসযোগ্য গৃহগুলিকে তাজমহলের মডেলে গড়ে তোলার চেষ্টা করি তাহলে যে বিভ্রাট ঘটতে বাধ্য একথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন। এই সহজ যুক্তিটি যদি আর্কিটেক্‌চার এবং টাউন-প্ল্যানিং-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে তা বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। এবং এই যুক্তিটি যে শুধু অবশ্যম্ভাবী তা নয়, এটি সব দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয়ও বটে।

সবশেষে আর একটি ঘটনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যুগের নাটকে শেক্সপীয়রকে নানাভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নাট্যকাররূপে পরিণতি লাভ করবার পর থেকেই এই চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। কেন? রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে শেক্সপীয়রের নাটকের আবেদন চিরকালীন। কিন্তু তিনি আর একটি সত্যও উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে উনিশ শতকের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে শেক্সপীররকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শেক্সপীয়রকে আজকের দিনে আদর্শরূপে গ্রহণ করার পক্ষে বাধা ত্রিবিধ। প্রথমত, আজকের বিশ্বসাহিত্যে প্রধান সুর হচ্ছে বিশ্বজনীনতা। গ্যয়টে এই বিশেষত্বটিকে বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন: "This is the era of world literature." কিন্তু আজ থেকে চারশ বছর আগে শেক্সপীয়রের যুগে সাহিত্যে এই আন্তর্জাতিকতার সুরটি অনুপস্থিত ছিল। ফলত, শেক্সপীয়রের নাটকগুলি যে সমস্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সেগুলি আমাদের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। *A Doll's House*-এ নোরার সমস্যা যে কোনো বাঙালী মেয়েরও সমস্যা, কিন্তু "হ্যামলেট" নাটকে incest-এর সমস্যা আমাদের পক্ষে এলিজাবেথান যুগের কোনো সাধারণ পাঠক বা দর্শকের তীব্রতা নিয়ে অনুভব করা সম্ভব নয়। স্বভাবতই আজকের দিনের নাটকে শেক্সপীয়রীয় সমস্যাগুলিকে

পুনর্বিন্যাস করার চেষ্টা অযৌক্তিক। শেক্সপীয়রকে আদর্শ করার দ্বিতীয় বাধা ফর্ম। এলিজাবেথান যুগের নাটকের ফর্ম ছিল পোয়েটিক ড্রামা। কিন্তু আজ বাংলাদেশে নাটকের সর্বাধিক প্রচলিত ফর্ম ন্যাচারালিজম্। ফর্ম এবং কনটেন্টের ভিতর সম্পর্কটা যে কত নিগূঢ় সে-কথা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটি কথা বোঝা দরকার। আজকের দিনে নানাবিধ কারণে বাংলাদেশে পোয়েটিক ড্রামাকে ফর্ম হিসাবে স্বাগত জানানো সম্ভব নয়। কাজেই যদি-বা আমরা আমাদের নাটকে শেক্সপীয়রীয় বিষয়বস্তুকে স্থান দেবার চেষ্টা করি, তা ন্যাচারালিস্ট ফর্মের কাঠামোয় সুষ্ঠু প্রকাশ পেতে পারে না। তৃতীয়ত, শেক্সপীয়রীয় নাটক প্রযোজনার যে বিশেষ আঙ্গিক, সেটি প্রচলিত করা বাংলাদেশের বর্তমান পটভূমিকায় নিছক টেকনিক্যাল কারণেই অসম্ভব। এই ত্রিবিধ অসুবিধার ফলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী যুগের নাটকে কখনো কখনো প্রকৃতিবাদী, কখনো সঙ্কেতধর্মী, কখনো বা প্রতীকধর্মী হয়ে উঠেছিলেন। আমার ধারণা তিনি ইতিহাসের নির্দেশকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আজকের দিনে যাঁরা শেক্সপীয়র রিভাইভালে উৎসাহী, তাঁদের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে তাঁরা শেক্সপীয়র নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করুন, শেক্সপীয়র পঠনের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করুন। কিন্তু অতি উৎসাহের ফলে যদি তাঁরা শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলা পুনঃপ্রবর্তনের জিগির তোলেন তাহলে তাঁরা ইতিহাসের গতির বিরোধিতা করবেন মাত্র।

গোপাল হালদার

শেক্সপীয়র-সাক্ষাৎ

(পরিচয়-এর নিজস্ব প্রতিনিধির প্রেরিত)

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন শেষ হতেই বললাম, ভাগ্য ভালো আপনার দেখা পেলাম।

প্রশস্ত ললাট প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ, চাঁপা ঠোঁটে কৌতুক-সরস মৃদু হাস্যরেখা, আর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি চোখে কৌতূহলের ঔজ্জ্বল্য—এ মুখ চিনতে দেরি হত না প্রকাণ্ড টাকের জন্যও।

বল্‌লেন : ভাগ্য আমাদেরও ভালো! না হলে একসঙ্গে এই ফেব্রুয়ারী মাসে এতগুলো রৌদ্রভরা দিন পাই! তোমরাই এনেছ তোমাদের সঙ্গে এমন সূর্য, এমন আলো, এমন আকাশ।

ভারতীয়ের প্রতি এই সৌজন্যোক্তি পূর্বেও শুনেছি। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর স্বচ্ছতার সঙ্গে সহৃদয়তা মাখানো।

বল্‌লাম : ইংলণ্ড এই বঙ্গসন্তানের প্রতি সদাশয়। তাই লণ্ডনেও দেখি নি তার গোমরা মুখ, ধোঁয়াটে আকাশ, আর বৃষ্টি।

সোৎসুক কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন : ইংলণ্ড ভালো লাগছে তাহলে?

আমিও স্বচ্ছন্দ মনে বল্‌লাম : নিশ্চয়, প্রায় নিজের দেশের মতো।

"নিজের দেশের মতো?"—নিম্নস্বরে অবিশ্বাসে কৌতুকে উচ্চারণ করলেন শব্দ কয়টি। প্রচ্ছন্ন একটু পরিহাসের স্নিগ্ধতা আমার প্রাচ্যসুলভ অত্যুক্তিতে।

'প্রায়'—শব্দটিতে জোর দিলাম আমিও সরস চিত্তে।

হাঁ, 'প্রায়'—তিনি পরিচ্ছন্ন হাসি হাসলেন : তবু তোমরা ইংরেজ রাজত্ব খতম করে দিলে তোমাদের দেশ থেকে।

আমি হাসতে হাসতে বলতে চাইলাম : ইংরেজ রাজত্ব ইংলণ্ডে ভালো, ভারতবর্ষে ভারতবাসীর রাজত্ব। কিন্তু 'কবির পূজা বিশ্বময়।' তাই না? আর ইংরেজই কি কম বুদ্ধিমান্—একশো বৎসর আগে থাকতেই গাইতে শুরু করেছে—Indian Empire will go, at any rate, some day, but this

Shakespeare does not go ; he lasts for ever with us ; we cannot give up our Shakespeare. তারপর Here, Isay is an English King.

ললাটে রক্তিম আভা দেখা দিল, কপোলে চোখে লজ্জার বিনম্রতা। সামলে নেবার জন্যই সকৌতুকে বললেন : কথাটা কিন্তু একজন স্কচ্‌ম্যানের।

আমি সাংবাদিক, অপ্রতিভ হবার মতো নই। বললাম : ঠিক, কিন্তু সকল ইংরেজিভাষীর। তবে তাঁরা কেউ বলেন, 'কিং', কেউ বলেন, 'রিপ্রেজেণ্টেটিভ ম্যান্'—

তিনি স্বচ্ছন্দে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে বললেন : বলুক তারা। তোমরা কি বলো ?

আমরা তো বলেছিলাম "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।"

সেও তো এক শ বৎসর আগেকার কথা। এখন ?

এখন যে কী বলব সেই জন্যই তো আপনার কাছে আসা। অনেক নতুন তর্ক উঠেছে। আপনার সঙ্গে তাই নতুন করে বোঝাপড়া করতে হবে।

তাহলে একবার টেভার্ন-এ গেলে হত না ? অর্থাৎ রেস্তোরায়—পানীয় থাকলে জমত—

এখানেই মন্দ কি ? এই মেমোরিয়েল থিয়েটরের পার্শ্বে—অ্যাভনের তীরে।

এসো বসি তবে—

বসতে বসতে বললাম : আমাদের সম্পাদক ভার দিয়েছেন—আপনার সঙ্গে চাই পরিচয়-এর পক্ষ থেকে একটা একান্ত সাক্ষাৎকার মানে, এক্‌স্‌ক্লুসিভ্ ইণ্টারভিয়্যু।

'এক্‌স্‌ক্লুসিভ্ ?'

মুখে হাসি থাকলেও চোখে একটু পরিহাসের বিদ্যুৎ। আমার সাংবাদিক দৃষ্টি তা এড়ায় নি। বুড়ো একটি পাকা ঘুঘু। আমিও কাঁচা রিপোর্টার নই।

বললাম : আপনি নাট্যকার। জানেনই তো আসর বুঝে কীর্তন—আমাদের আসরটা 'গ্রাউণ্ডলিং'দের নয়—ইণ্টেলেক্‌চুয়ালদের, বুদ্ধিজীবীদের।

গম্ভীর হলেন এবার—একটু সসম্ভ্রমে বললেন : তাহলে তো হিজ্ লর্ডশিপ্ ব্যারন্ ভেরুলাম এ্যাণ্ড্ ভাইকাউণ্ট্ সেণ্ট অলবান্-এর সঙ্গেই আপনার সাক্ষাৎ করা দরকার।

একবারের মতো আমিও অপ্রতিভ হলাম—হিজ্ লর্ডশিপটি কে বললেন ?

'ভাইকাউন্ট সেণ্ট অলবান্' জানেন না ? আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ মনস্বী।

যিনি বলতেন 'I have taken all knowlege as my province'—তাঁকে তো তোমাদের না জানবার কথা নয়। ওঃ, হিজ্ লর্ডশিপকে যে তোমরা জানো বেকন বলে—ফ্রান্সিস্ বেকন—

লর্ড বেকন ? আমি চমকিত হয়ে বলে ফেললাম।

হাঁ, হাঁ, 'লর্ড বেকন'—ও নাম আমাদের কালে চলিত হয় নি কিনা, তাই আমরা আমাদের লর্ড চ্যান্সেলর মহাশয়কে জানি ব্যারন্ ভেরুলাম আর ভাইকাউণ্ট সেণ্ট্ অলবান্ নামে।

মুখে বিন্দুমাত্র হাসি নেই, রীতিমতো সীরিয়াস্ কিন্তু চোখের কোণে একটু হাসি ঝিলিক দিচ্ছিল বলে আমার সন্দেহ হল। বুড়ো এক হাত নিলে। আচ্ছা।

ওই তো মুশ্কিল দেখুন—আমিও বিপন্ন ও অপ্রতিভ হবার মতো মুখভাব করে বললাম: আপনাদের কালে কে যে কাকে কী নামে উল্লেখ করতেন, আর কী নামে যে কে লিখতেন, তাও সমস্যা। তারপর খুব ভালো মানুষের মতো বললাম: ফ্রান্সিস্ বেকনের কথাই ধরুন—তাঁর সব লেখার কী হিসেব পাওয়া গিয়েছে ?

মুহূর্তেক তাঁর কপালের উপর দিয়ে একটা সংশয়ের ছায়া ভেসে গেল। তারপরে চোখে খেলল তীক্ষ্ণ ছুরির মতো হাসি, আর মুখে অটুট গাম্ভীর্য।

বল্লেন: নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না। তিনি যে নাটক রচনা করতেন না তার প্রমাণ নেই। অথচ ছাখো, সে সব নাটক কোথায় গেল ?

মুহূর্তেকে আমিও বুঝে ফেল্লাম—হেসে উঠলাম উচ্চকণ্ঠে। বিলিতী অপরাহ্ণের শান্ত কোমল নিস্তব্ধতা সেই বাঙালী হাস্যে চিড় খেয়ে গেল। অ্যাভন-এর দু-একটা ভাসমান মরাল চমকিত হয়ে উঠল। তিনিও সে শব্দে সচকিত হয়ে চারদিকে তাকালেন—

তখন হাসি শেষ করে বল্লাম: কোথায় গেল জানেন—আপনি মেরে দিয়েছেন।

হাসি ফুটে উঠল মুখে। তিনি সকৌতুকে বললেন: এই তো তোমরা জানো! আগেই বুঝেছিলাম—ধরা পড়ে গিয়েছি। ফাঁকি চলবে না তোমাদের কাছে।

মনে মনে বললাম, এখনো কি ! কতটা ধরা পড়েছেন, এখনো তা জানেন না। মুখে বললাম: না জানলে উপায় ছিল ? পরীক্ষায় ফেল হয়ে যেতাম।

কালিদাস কে ছিলেন জানি না। কিন্তু শেক্সপীয়র কে ছিলেন তা না জানলে চলে? তবে দেখুন, আপনি সেই চোরের উপর বাটপাড়ি করেছেন।

সোৎসুক কণ্ঠে বললেন: কেমন?

এই ধরুন নাটকগুলো না হয় আপনি মেরে দিয়েছেন—লিখুক তা বেকন। বেকনই কি বড়ো সাধু? চুরি করেছেন দু'হাতে।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললেন: সে কি কথা! তিনি রাণীর ধর্মাধিকরণের কর্তা, ন্যায়ের অবতার।

তাও শেষ পর্যন্ত সামলে উঠতে পারেন নি! যাক্ বেকন, কিন্তু ঐ নাটকগুলি তো আগাগোড়া চুরি।

তিনি চমকিত হলেন, বললেন: কেমন, বলো দিখিন?

আমি শুরু করলাম: প্রথমত, একটা প্লটও মৌলিক নয়। ঐতিহাসিক নাটকগুলো বলবেন না হয় মৌলিক হবে কি করে? তবু হলিনশেড আর যত ইতিকথা লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া। রোম-ইতিহাসের কাহিনীগুলো তো প্লুটার্কের 'জীবনীমালা' থেকে ছেঁকে তোলা—নর্থ-এর অনুবাদের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে পড়া যায়। এমনকি, লজ, গ্রিন্‌কে পর্যন্ত 'এজ্ ইউ লাইক ইট্', 'দি উইণ্টারস টেল' 'অল্‌স্ ওয়েল ছাট্ এণ্ডস্ ওয়েল্', 'সিম্বোলিন্' প্রভৃতিতে বেমালুম মেরে দিতে ছাড়েন নি। 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট্', 'মাচ্ এ্যাডো এবাউট নাথিং'—এসব তো ইতালীয় রম্যন্যাস থেকে নেওয়া। 'ওথেলো', 'মেজার ফর মেজার' আবার সমকালীন ইতালীয়ান লেখকের কাহিনী-চুরি। হাসছেন? এখনো শেষ হয় নি—

তিনি হেসে বললেন: ও তালিকা শেষ হবে না। কিন্তু কেন বলছ চুরি? অবশ্য বেকন কি বলতেন জানি না, আমরা একে চুরি বলতাম না। মনে কর—একটা গল্প ভালো লাগল; সবাই জানে তা আমার নয়। কিন্তু তা সাজিয়ে-গুছিয়ে লাগসই করে তুলতে হবে, তুললে আমার হবে। চুরি একে কি করে বলো?

আমরা চুরি ছাড়া আর কিছুই বলি না। এরই নাম 'সাহিত্যে চুরি'। এখন এ রকম কাজ কেউ করলে মাসিকে লিখতাম সাপ্তাহিকে লিখতাম দৈনিকে লিখতাম। আদালতেও দৌড়াতাম—অবশ্য যা 'আসল' তাই যদি আবার ইংরেজি বা অন্য ভাষা থেকে 'নকল' বলে প্রমাণ হবার ভয় থাকে তা হলে ওদিকে পা বাড়াতাম না।

ভাগ্যিস তোমাদের কালে জন্মাই নি আমরা। আমাদের কালে মৌলিকতা বলতে এসব বোঝাত না।

একেবারেই কি বোঝাত না?—an upstart Crow beautified with our ferthers, এবং Tygers heart wrapt in Player's hide বলে the onely Shake-scere in the countrieকে গ্রীন্‌ গাল দেন নি? আপনি তখন নট থেকে নাট্যকার হয়ে উঠছেন, থিয়েটরে নাম করছেন—তাই হয়তো রবার্ট গ্রীন-এর খোঁচা গায়ে লাগে নি। তবু দু-একজন তো জানত আপনারা যাঁরা নাম করছিলেন তাঁরা অনেকেই Purlyonde his Plume চোরাই মালের কারবারী।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন: ব্যাচারা রবার্ট গ্রীন্! তখন তার চরম দশা—টাকা নেই, স্বাস্থ্য নেই, নাটক কেউ নেয় না, নতুন নাট্যকারদের উপর রাগ হওয়া তো তার স্বাভাবিক। নাম দেখেই বুঝলে ও বুঝি আমি লিখেছি। তারপরে লোকেরও কাণ্ড ত্যাখো—তারা গ্রীন্-এর ওপর চটে গেল মিছামিছি।

যেন গ্রীন্-এর জন্য তিনি দুঃখিত। আসলে বুঝলাম চালাকি করে মূল কথাটা চাপা দিচ্ছেন। আমি বললাম: কিন্তু কথাটা তো ঠিক। আমরা দেখছি 'লাভ্‌স্ লেবর্ লস্ট' ছাড়া সম্ভবত কোনো নাটকের মূল কাহিনী আপনার নয়।

তিনি বল্‌লেন: নাটকগুলোই কি আমার? তবে কি জানো, তখনকার দিনে কাহিনীর ছাঁচ দিয়ে আমরা লেখার মৌলিকতা স্থির করতাম না। মাল-মশলা যাই হোক, কী গড়া হল, তাই ছিল কথা। সেই গড়াতেই দেখা যেত কারিগরের হাত—কাদামাটি কোথাকার তা দিয়ে কি হবে।

চুরিটা কবুল করলেন, কিন্তু চালাকি ছাড়লেন না। আমিও বললাম: কথাটা কিন্তু তা নয়। কার ছাঁচ তাই কথা। ধরলাম বেশ, কী গড়া হল! আর কেমন-করে গড়া হল তাই কথা, ছাঁচের কথা অবান্তর। ছাঁচের কথা ছেড়ে ছাঁদের কথাও ধরুন—দেখুন জন লাইলির 'ইউফুউজম্' নিয়ে পরিহাস করলে হবে কি, সে ছাঁদ আপনাকেও প্রথম পেয়ে বসেছিল। আর তাঁর 'হাই কমেডির' ছাঁদ না নিলে 'লাভ্‌স্ লেবর্ লস্ট' থেকে 'মাচ্ এডো এবাউট্ নাথিং' কেন, 'এজ ইউ লাইক্ ইট্' পর্যন্ত হালকা হাসির নাটকে অমন করে রাজা-রাণী, আমীর-ওমরাহ্, সাহেব-বিবি পর্যন্ত মহাসম্মানিতদের হাসির আসরে টেনে এনে হাজির করতে পারতেন? পথের মানুষের বেপরোয়া জীবনের নাট্যকার

সেই টমাস গ্রীন্ আর গ্রীষ্টফার মার্লো বিরাট মানুষের বিরাট আকাঙ্ক্ষার নাট্যকার : তাঁদের ছাঁদ, ভাবভঙ্গি ছাড়া হত ওসব নাটক ? আর, মার্লোর 'mighty line' উদাত্ত বাণী, জন কীড্-এর blood-and-thunder রক্ত-বজ্রবর্ষী ট্রাজেডি না পেলে 'হ্যামলেট' 'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো', 'লীয়র', এসবের রূপ কী দাঁড়াত ?

তিনি এবার একটু যেন মোলায়েম হলেন, ভাব দেখালেন কথাটায় সায় দিচ্ছেন : খুব ঠিক কথা। ওঁরাই থিয়েটরের আসর বেঁধেছিলেন। সে কি সহজ কথা ! কথার চাতুরি, হাসির হররা, কবিতার উদাত্ত আহ্বান, ঘটনার বজ্রবিদ্যুৎছটা—না, কী মেহনতটাই না ওঁরা করেছেন ! যার যা সাধ্য দু হাতে জুগিয়েছেন, তবে তো থিয়েটরে মানুষ জুটেছে। আর কত শ্রেণীর মানুষ ! হুল্লোড়বাজ মানুষ, রুচিবান্ মানুষ, সুভ্রান্ত বংশের মানুষ, কর্তারা গিন্নীরা, বড় ঘরের বিলাসীরা বিলাসিনীরা আর স্বয়ং রাণী, তাঁর পারিষদ সহচর অনুচর—কে না ? আবার সকলকেই খুশি করতে হবে। কত রকমের মানুষ, কত রকমের রুচি, কত রকমের তাদের ফরমায়েস। কাউকে 'না' বলার উপায় নেই। পুরনো, নতুন, গল্পগাথা, যার থেকে যা পাওয়া যায় দু হাতে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তবে তো তৈরি হয়েছে আমাদের দিনে এক-একটা নাটক। একটা কিছু দাঁড়িয়ে গেছে। সবসুদ্ধ কী দাঁড়িয়েছে, তাই হল আসল কথা।

বেশ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বললাম : কী দাঁড়িয়েছে—কার হাতে, কী তার মনের কথা, তাই হল আমাদের কালের জিজ্ঞাসা।

মনের কথা ? তোমাদের হেঁয়ালি বোঝা বড় শক্ত।

বুঝলাম—আর ধরা-ছোঁয়া দেবেন না। অন্য দিক দিয়ে নিতে হবে। বললাম : আর আপনাদের ? So thou, being rich in *Will* add to thy *Will* One will of mine to make thy large *Will* more. হেঁয়ালি নয় ?

চোখে খুশি খেলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বললেন : And thou lovest me, for my name is Will. হেঁয়ালি কোথায় ? উত্তর দেওয়াই আছে।

বুঝলাম এবার মুখ ফিরেছে সনেটের দিকে। আরম্ভ করা যাক এদিক থেকেই। বললাম : তাতেই তো হেঁয়ালিটা আরও জমেছে—কে এই 'thou', আর সত্যই কে ওই 'Will' ?

সে তো তোমরা জানো—এই গ্রাম্য শহরে জন্মেছিল 'উইল', উইলিয়ম

শেক্সপীয়র—সেই বাড়িও দেখেছ; দেখেছে সেই গ্রামার স্কুল, তাতে দু-চার বছর পড়েছিল; শিখেছিল দু-চার অক্ষর—

আমি হেসে থামিয়ে দিয়ে বললাম: 'লিটল লাতিন অ্যাণ্ড লেস গ্রীক'—বলবেন তো? সে গল্প জানি। কথা হচ্ছে, নাটক ছাড়া কবিতাও তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে আবার ওই শত দেড়েক সনেট—মোট ১৫৪টি—আর তাতে আপনার সেই উইলিয়াম শেক্সপীয়র 'unlocked his heart'। কিন্তু আমাদের কালের সন্ধানীরা বলেন, তাতে আসলে জিনিসটা চাপা দেওয়ারই চেষ্টা। তার প্রমাণ ওই 'thou'-এর চাবিটি আপনার লুকিয়ে ফেলা। কিন্তু সেইটিই আমাদের কালে উদ্ধার হচ্ছে master-key—তাতে নাটকের তালাও খুলে যাবে। এই সনেটের হেঁয়ালি থেকেও যে আমাদের পণ্ডিতেরা আপনার মনের চেহারা চিনবার সুযোগ না পেয়েছেন তা নয়।

এবার তিনি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না—কেউ পারে না। বিশ্বাস না করলেও যেমন দৈবজ্ঞের কাছে হাত না বাড়িয়ে কেউ পারে না, মন নিয়ে মাথাব্যথা না থাকলেও নিজের মনের কথা শুনবার জন্য তেমনি সকলেরই থাকে আগ্রহ। বললেন: বলো তো শুনি সনেটের থেকে আমার মনের চেহারা কেমন দেখেছেন তোমাদের পণ্ডিতেরা?

আপনাদের লেখকদের অনেকেরই যেমন হয়—একটু বাঁকা-চোরা।

হাঁ, হবে না। বলতে জানেন, অথচ মুখ ফুটে বলতে পারেন না।

তাই বুঝি?—কৌতুক খেলে গেল চোখে,—বেশ, তুমিই না হয় বলো মুখ ফুটে।

তৈরি হলাম: বলছি—আমার কথা নয়, মনোবৈজ্ঞানিকদের কথা। আপনাকে বলতে বাধা নেই—আপনার মুখেও তো কিছু বাধে না—তাই একালের মনোবৈজ্ঞানিকদের কথা শুনতে বাধা দেবে না। 'হোমোসেক-সুয়ালদের' বাধ্য হয়েই বাঁকা-চোরা হতে হতে হয়, আইনের বাধা, সমাজের বাধা—হেঁয়ালির আশ্রয় নিতে হয়।

যা ভেবেছিলাম—তাই। ভদ্রলোক একবারের মতো বিমূঢ় হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই সতর্ক হলেন। তাকে অসতর্ক করে রাখা কিন্তু চাই। তাই বললাম: এসব গুহ্য তত্ত্ব আমরা বেশি জানি না—তবে আপনারই তো কথা Two loves have I একজন সখা, আরজন সখী। সে হেঁয়ালিটা আমাদেরও বুঝতে হবে তো—

A woman's face, with Natures own hand painted,
Hast thou, the master-mistress of my passion.

কাকে সম্বোধন করে বলেছেন, কে সে? 'ডব্লু-এচ' কি? না, তরুণ লর্ড পেমব্রুক? না, আপনার মুরুব্বি লর্ড সাদামটন; না, আর কেউ? ওরা শুধু উপলক্ষ্য, লক্ষ্য অন্য কেউ?—আর, কে সেই কবি 'proud sale of his verse' দিয়ে যে আপনার সখার চিত্তাকর্ষণ করেছে? তারপর, কে সেই dark lady, আপনার শ্যামা সখী, now is black beauty's successive heir যিনি আপনার সখাকেও আপনার থেকে অপহরণ করেছেন? কে, পেমব্রুক ও মেরি ফিটন? না, সাদামটন ও জেন্ ডেভেনাণ্ট?

জেন ডেভেনাণ্ট?—ভদ্রলোক যেন চিনতেই পারছেন না, কে।

ডেভেনাণ্ট—অক্সফোর্ডের সরাইখানার মালিক জন ডেভেনাণ্ট-এর স্ত্রী—উইলিয়ম ডেভেনাণ্ট-এর মা। জেন ছিলেন রূপসী ও রঙ্গিনী। আপনার মতো ভাড়াটে লেখকের অপেক্ষা আপনার মুরুব্বিটি স্বভাবতই তার সঙ্গে জমিয়েছিলেন বেশি। তবে আপনারও ভাগ্যে ছিটেফোঁটা জুটেছে। আপনার নামে ওর ছেলের নামকরণটা একেবারে তো অকারণ নয়। অবশ্য সনেটের সাক্ষ্যের সঙ্গে আবার নাটকের স্বাক্ষ্যও মিলিয়ে দেখবেন মনস্তাত্ত্বিকরা।

এবার ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করে বললেন: এর পরেও আরও সাক্ষ্য?

আমিও ছাড়লাম, না সে সবও গুরুতর। 'হ্যামলেট'-এর সমস্যাটা অকারণে আপনাকে আকর্ষণ করে নি।

কারণ থাকবে না কেন? তবে তোমরাই বল কী তা।

একালের মনের grave-diggers-রা বলেন, হ্যামলেট ঈদিপাস-সিচ্যুয়েশন-এ দ্বন্দ্বগ্রস্ত। মাতৃআকর্ষণ ও পিতৃদ্রোহে মন তার দ্বিখণ্ডিত। এ দ্বিখণ্ডিত মানুষের যা ঘটবার না হয় ঘটেছে। কিন্তু সেই ঈদিপাস কমপ্লেকস-এর চাবিটি হাতে এলেই বুঝা যায়, 'হ্যামলেট'-এর নাট্যকার কেন প্রায় মায়ের বয়সী এ্যান হাতোয়ের হাতে ধরা দেন, আর কেন তার থেকে আবার দূরেও পালান—

হঠাৎ তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন: ধরা দিলাম আবার পালালাম!

হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলে হবে কি? এটা ফ্রয়েডের যুগ, মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে কিছুই গোপন রাখতে পারবেন না।

তিনি কৌতুকের কণ্ঠে বললেন: আমি গোপন করবার চেষ্টা করেছি

কখনো বললামই তো Two loves have I, একজন সেই master-mistress of my passion, আরেকজন সেই dark lady ; এবং

Him have I lost : thou hast both him and me.

ডেপথ সাইকোলজি বলবে—এহ বাহ্য। আসলে আকর্ষণ খুঁজতে হবে অচেতন মনে।

তোমরা তাই আরও জোটালে। মা নিয়ে টানাটানি, তাতেও শেষ হল না, তখন এ্যানকে তুলে দিলে মায়ের পর্যায়ে। অতটাও কিন্তু বয়স হয় নি এ্যান-এর তখনো। তার সঙ্গে সম্পর্কটাও আমার অচেতন মনের নয়। তা গোপনও ছিল না।

পরিহাসের তরল কণ্ঠে তিনি প্রায় সবই উড়িয়ে দেন আর কি। আমিও ছাড়লাম না: গোপন রাখা গেল না বলেই। না হলে কেন সনেটের ওই দুজনার নাম গোপন করলেন? কেন বললেন না কার ছিল কি বয়স?

মুচকি হেসে বললেন: কার নাম করব বল? কতজনকে কত সময়ে মনে পড়েছে। ও-সব কি এক-আধ মাসের, না, এক-আধ বছরের লেখা? কাউকে না মনে করেও তো লিখেছি—আশার কথা তার চেয়েও বেশি নিরাশার কথা বলেছি, প্রকৃতির কথা শিখেছি। আবার লিখতে-লিখতে মনে এসে গেছে কখন কারো মুখ। আসল কথা লিখেছি—যখন ঝোঁক চেপেছে, ভাব মিলেছে, খুশি হয়ে উঠেছি শব্দের সঙ্গে শব্দ গাঁথতে গাঁথতে—

বুঝলাম বুড়ো সেয়ানা। চালাকিতে হার মানাতে চায়। বললাম: দেখুন, ওসবে হয় না। আমাদের যুগে ফ্রয়েডীয় সাইকোলোজিতে লেখকেরাও দিকপাল—বিশেষত গল্প ও কবিতা লেখকেরাও। শুনলে হাসবেন—'খেয়াল মতো লিখেছি, খুশি মতো লিখেছি।'

তা তো বলি নি। সত্যকথা এই—লিখেছি গরজে। সবাই তখন সনেট লিখছে। শুরু করেছিলেন ওয়াট ও স্যারে। তখন ইতালি ও ফ্রান্সের হাওয়া বইছে দেশে। সনেটের হাওয়াও উঠল। আর সেই স্যার ফিলিপ সিডনি লিখলেন 'অ্যাস্ট্রোফেল এ্যাণ্ড স্টেলার' প্রেমের কথা—জোয়ার লাগল আমাদের সনেটের স্রোতে। এডমণ্ড স্পেনসার, গ্রেভিল ফুলকে, বার্নবে বার্নেস, গাইলস ফ্লেচার, লজ, উইলোবি, পার্সি, কনস্টেবল, ডানিয়েল, ড্রেটন—

বাধা দিয়ে বললাম: তালিকা বাড়িয়ে কি হবে? বলুন, আপনি কেন লিখলেন?

সবাই লিখছে বলে।

বুঝলাম—সেই এক বুলি। তাই কণ্ঠ নামিয়ে ধীর ভাবে বললাম: বেশ। কাদের মনে করে লিখলেন।

সত্যকথা বলব?—সিডনি আর স্পেনসার। তারা ছিল মনে। ওঁদের মতো সনেট আমাকে লিখতে হবে। সিডনির মতোই:

"Fool", said my muse, "look into thy heart & write"

তাই তো জিজ্ঞেস করছি—সেই 'হার্টের' মধ্যে কে ছিল?

অতি সহজ তা বোঝা। কবি পালককে প্রেমের পাত্ররূপে সম্ভাষণ করেছি। ছলনাময়ী নারীর রূপ বর্ণনা করেছি; তাকে ছলনার জন্য দোষারোপ করেছি, প্রেমের আশা-নিরাশা, বেদনা-বিষাদের কথা সব বলেছি। এসব যে প্রথাসিদ্ধ বিষয় সনেটের। তেমনি প্রথাসিদ্ধ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বক্রোক্তি, conceit। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে, উপমার সঙ্গে উপমা জুড়ে, সে সবও তৈরি করেছি। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, প্রেমিক ও প্রেমিকার মতো প্রথাসিদ্ধ কাব্যবিষয় আশ্রয় করে সনেট রচনা করলে কেউ পড়ত নাকি আমার সনেট?

বুঝলাম এ বিষয়ে লোকটা এখন সতর্ক, কেবলি কথা বাড়াবে, নতুন নতুন সাফাই আবিষ্কার করবে। শেষবারের মতো তবু বললাম: অর্থাৎ বলছেন পেমব্রুক-মেরি ফিটন, কিম্বা সাদামটন-জন ডেভেনাণ্ট—এদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আপনার সনেটের?

ছিল না কে বলে? পেমব্রুক-সাদামটন ছাড়াও কত মানুষের মুখ মনে পড়েছে—আমাদের থিয়েটরের দলের যে ছোকরাগুলো মেয়ের পার্ঠ করত, A woman's face with Nature's own hand painted কত জনাই তো ওরা ছিল অমনি মেয়েলি চেহারার। আবার, raven black eyesও ছিল কত black beauty-র। কেউ বাজিয়েছে ভার্জিন্যাল, কেউ বাজিয়েছে আমার মন, সাজিয়েছে আমার কবিতা নিজেরও অগোচরে—তারা তো উপলক্ষ্য। শুধু মেরি ফিটন, জেন ডেভেনাণ্ট? আর কাউকে তোমরা দেখ নি?

চোখে তার দুষ্টুমির হাসি খেলল আবার। গলাটা একটু নিচু করে বললেন: এ্যান্ হ্যাতোয়ে নাম্নী মেয়েটিও তো একেবারে বাদ পড়ে নি মনের কোঠা থেকে।

'এ্যান্ হ্যাতোয়ে?—আপনার সেই স্ত্রী?'—প্রতিবাদ না করে পারলাম না: যাকে 'ছ নম্বরের খাটখানা' ছাড়া আর কিছু দিতে শেষ অবধিও আপনি চান না?—একথা কোনোকালে আপনার কেউ মানবে না।

মৃদু হেসে বললেন: না মানুক। আমি জানি, আর আমার মন জানে।

আমি বললাম: তাহলে বাড়ি ছেড়ে পালালেন কেন? বছরের পর বছর থিয়েটরে হৈ-হুল্লোড় নিয়ে, মারমেড ট্যাভার্নে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় গল্পে কি-করে মেতে ছিলেন?

কিন্তু ভুলে থাকি নি।

থিয়েটর অভিনয়, ট্যাভার্নে আড্ডা—এ সব তো ভালোবাসতেন, চাইতেন—

সাইকোলজি নিয়ে না ঘাটিয়ে আমি এবার অন্য দিকে নিয়ে যেতে চাইলাম ওর দৃষ্টি—আমাদের নিজেদের তর্কে।

বললেন: তা আর বলতে!

নাটকও লিখেছেন খান ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ।

যদি বেকন তা না লিখে থাকেন।—আবার দুষ্টুমিতে ভরা চোখ।

ওঁকে আরও সহজ স্বচ্ছন্দ করে তুলবার জন্য আমি বললাম: ওসব বাজে কথা থাক্। লিখেছেন আপনি। গ্রীন্ থেকে বেন্ জনসন পর্যন্ত আপনার কালের আপনার শত্রুমিত্র সকলের কথা উড়িয়ে দোব, অত বড়ো বিদ্যাদিগ্‌গজ আমরা নই।

এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ওর ছিল না। তবু পরিহাস ছাড়লেন না: তোমরা যে বুদ্ধিজীবী। বুঝতে তো পারো অতগুলো নাটক লিখতে বিদ্যাবুদ্ধি দরকার। আমার মতো সাধারণ মানুষের একটা ভাড়াটে নটের পেটে অত বিদ্যে আসবে কোত্থেকে? ঠিক না?

ঠিক উল্টো। আমরা—মানে আমাদের সম্পাদক—মনে করেন বেকন দূরে থাক্ সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কারও পক্ষে ওসব নাটক লেখা অসম্ভব।—বেকন না, মার্লোর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বানও না।

তিনি কুতূহলী হলেন: সে কি হে? এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলে—আমি হোমোসেক্সুয়াল ঈদিপাস-কম্পলেক্সগ্রস্ত পার্ভার্ট।

আমাদের মত নয়—সাইকোলজিস্টদের মত।

তিনি আশ্চর্য হলেন: তোমাদের আবার তাহলে কী মত?

গম্ভীর ভাবে আশ্বস্ত করে জানালাম: আমাদের—মানে, আমাদের সম্পাদক-

মণ্ডলীর মতভেদ হচ্ছে। সম্পাদক বলছেন, আপনি নর্মাল ম্যান্, যা অত্যন্ত অসাধারণ ব্যাপার।

কি রকম বলো তো ?

এই ষ্ট্রাটফোর্ড-আপন-অ্যাভন-এ জন্মেছেন, ওয়ারউইকের চাষীদের সঙ্গে থেকেছেন, স্কুল ছেড়ে দোকান-পশার নিয়ে বসেছেন, এ্যান্ হাতোয়ের খপ্পরে পড়ে ১৮ বছরে হয়ে পড়লেন মেয়ের বাপ। তারপর, সংসারে অন্ন নেই, খাবার লোক আছে, দোকানের আয়ে কুলোয় না, ঘরে খেয়েছেন এ্যান-এর ঝাঁটা, বাইরে হরিণ চুরি করে স্যর টমাস লুসির চাবুক। পালালেন লণ্ডনে। সেখানে তখন জীবনের জোয়ার। তবু কি কম ঘাটের জল খেয়েছেন? থিয়েটারের দুয়ারে প্রথম ঘোড়ার পাহারাদার, শহরের যত রাজ্যের ইতর ভদ্র—বেপরোয়াদের ইয়ার-দোস্ত। তারপরে স্টেজের পিছনে প্রোম্‌টারের হুকুমদার; প্রোমোশন পেয়ে অভিনেতা; ক্রমে পালা-লেখায় হাত পাকিয়ে নাটুকে শেক্সপীয়র আর থিয়েটরের অংশীদার থেকে শেষে থিয়েটারের মালিক, কর্তা,—একবার দেখে নিলাম মুখভাব; খুশিতে তা স্বচ্ছন্দ—তারপর ধীরে ধীরে বললাম: তাই তো আমাদের সম্পাদক বলেন সাধারণ সংসারে না জন্মালে গ্রামের শহরের অমন নানা জাতের মানুষকে চিনতে পারতেন না, কখনো ভালোবাসতে পারতেন না সাধারণ মানুষকে; আর লিখতে পারতেন না ওরকম নাটক। দেখুন না, ফলস্টাফ-এর যত হতচ্ছাড়া শহুরে সঙ্গীরা আপনার চেনা, তাদের ভাষা আপনার মুখস্থ। ডগব্যারির সঙ্গে কতবার দেখা হয়েছে। জষ্টিস শ্যালোকে তো জীবন্তই দেখেছেন। মেরি ওয়াইভসদের চিনতেন—এই ষ্ট্রাটফোর্ডেরই লোক তারা। আর ওই কবর-খুঁড়িয়ে, দারোয়ান্, মালী—বিশেষ করে যত রাজ্যের 'ফুল'—তারাই হল আপনার কথার বাহন।—

একটু থামো—আমার কথায় বাধা দিলেন। বললেন: আমার কথার বাহন কে ?

যত ওসব ছোটলোক।

ছোটলোক হোক, যাই হোক, আমার কথার বাহন হবে কেন তারা ? তারা তাদের কথার বাহন, নিজের নিজের কথা বলেছে।

শুধু তাই কি ? না, তাদের মতো অন্য মানুষের কথাও। 'ফুল' যেমন, সং এর মতো—উৎপীড়িত মানুষের মুখপাত্র। আর, আমাদের সম্পাদক বলেন,

সেই সূত্রে 'ফুল,' সকল মানুষের মুখপাত্র। কি বলেন সম্পাদকের এই মত সম্পর্কে ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : সেই সম্পাদকীয় মতামতের জন্য তোমরা বুঝি দায়ী নও ?

ধূর্ত বুড়ো ধরেছে ঠিক। বললাম : এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দু রকমেরই আপত্তি—লাইন ঠিক করতে হবে। তাই তো আপনার কাছে আমাকে পাঠানো হল।

তিনি হাসতে লাগলেন—আমার কাছে। আমি কি করে জানব তোমাদের বামপন্থীই বা কি, দক্ষিণপন্থীরাই বা কি ?

সম্পাদকের সঙ্গে কেউ একমত নয়। বামপন্থী বন্ধু যাঁরা তাঁরা বলেন, আপনি সাধারণ মানুষের মুখপাত্র হবেন কি করে ? আপনি রাজা-রাজড়াদের নাটক লিখেছেন। তাতে সাধারণ মানুষ তো নিতান্ত নগণ্য, শাসকবর্গ গোষ্ঠীই আপনার নাটকের নায়ক-নায়িকা, প্রধান পাত্র-পাত্রী। তারাই আপনার কথার বাহন ?

কিন্তু সেই রাজা রাজ-রাজরাই আমার কথার বাহন হবে কেন ? তারা কি তাদের কথা বলে নি ?

খুব বলেছে। যা তাদের সাধ্য তার থেকেও ভালো করেই আপনি তাদের তা বলিয়েছেন। কারণ আপনিও বলতে চেয়েছেন তাদের বক্তব্য।

সে তোমাদের যা ইচ্ছা বলো। আমি চেয়েছি যে-যেমন, তেমন-করে সে ফুটে উঠুক। রূপ নিক, দাঁড়াক, দর্শকেরা সামনে দেখতে পাক। আর সবসুদ্ধ নাটকটা গড়ে উঠুক, যাতে অভিনয় জমবে।

সেই হেঁয়ালি 'Others abide our question, thou art free ?' বুড়ো ধরা-ছোঁয়া দেবে না এ-ভাবে। কিন্তু কথা না বের করলে নয়। এতদূর এলাম কেন তবে ? আমি মেনে নেবার ভাব দেখিয়ে বললাম :

আমাদের সম্পাদক বলেন,—সব সত্ত্বেও তাই বক্তব্যও আপনার আছে। যেমন, রোমিওতে তুলেছিলেন প্রেমের বাধাবন্ধহীন প্রকাশের দাবি। জ্যাকুইস্ হয়ে দেখেছেন জীবনের তুচ্ছতা আর অর্থহীনতা। হ্যামলেট দ্বন্দ্বাকুল দার্শনিক মনের আত্মদ্বন্দ্ব ও অপচয়। ম্যাকবেথ, দুর্দমনীয় উচ্চাকাঙ্খার পতনে নিঃশেষতা। আর প্রোসপেরো, মানুষের ভালো-মন্দের সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট

না থেকেও সকলের প্রতি একটি সকরুণ প্রসন্নতা। এমনি করে আপনার দৃষ্টি ক্রমশ পাকা হয়ে উঠেছে, বক্তব্য গভীর হয়েছে।

আমি কিছু হব কেন? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা দিকে চোখ ফোটে, তা বল। বেপরোয়া দুরন্ত যৌবনের চোখে হাসি, হুল্লোড়, আমোদ, উৎসব, প্রেমের অপরাজেয় দাবি—এই মনে হয় সব। আসে তার পর সংশয়, সন্দেহ, দ্বন্দ্ব, বিরোধ, প্রবৃত্তির তাড়না, বিপর্যস্ত কালের বিড়ম্বনা—এসব না দেখে উপায় আছে? আর দেখার সম্পূর্ণতা কোথায় যদি না দেখ তাও শেষ পর্যন্ত—আলো-আঁধারের জালি-কাটা জীবনের ফাঁকে বিশ্বময় এই চিরায়মান চিত্রবহতা।

বলতে বলতে অনেক অনেক দূরে চলে গিয়েছে দৃষ্টি—বললাম:

এইটাই তো আমাদের সন্দেহ। আমাদের সম্পাদক বলেন; বিশ্বরূপ দর্শন আপনার ভাগ্যে ঘটেছে।

তিনি চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে হেসে ফেললেন: ওরে বাবা! এখনি বলবে আমি থিয়েটরের ব্যবসা ছেড়ে ভগবানের স্তব করতে বসে গিয়েছি।

আমাদের সম্পাদক বলেন—তা করেছেন আমাদের মহাভারতকার। জীবনের বিচিত্র রূপ দেখতে দেখতে তাঁর মনে হল—এই তো ভগবানের বিশ্বরূপ। আর আপনার হল ঠিক উল্টো—আপনি এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে দেখতে দেখলেন মানুষের বিশ্বরূপ—মানুষ আর মানুষ আর মানুষ।

তিনি হেসে বললেন: চোখ খুলল না। দিব্য চোখটা খুলল না। ভগবানের বিশ্বরূপ দেখতে পেলাম না।

কিন্তু বললেন তো—এও মায়ার খেলা।

We are such staff
As dreams are made of, and all our little life
Is rounded with a sleep.

তা তো প্রোসপেরোর কথা—

তাঁর কথাই তো আপনার কথা। তার বিদায়বাণী আপনারও থিয়েটরের নিকট বিদায়বাণী। এ বিষয়ে বাম-দক্ষিণ আমরা সকলেই প্রায় একমত। তবে দক্ষিণপন্থীরা কেউ কেউ বলেন প্রোসপেরো আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মুখপাত্র। অন্যরা বলেন—সে আপনার পেটি বুর্জোয়া রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস। কি বলেন আপনি?

এতো আরও হেঁয়ালি মনে হয়। বুঝিয়েই বলো—

যেমন, আমাদের দক্ষিণপন্থীরা বলেন, প্রোস্‌পারোই আপনার চোখে ভাবী দিনের বৈজ্ঞানিক—যাঁরা প্রকৃতির রহস্য জানবেন, তার দান কার্যে প্রয়োগ করতে পারবেন, মানুষকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সঙ্গে সঙ্গে মিরাণ্ডা-ফার্ডিনাণ্ডের ভালোবাসা, রোমিও-জুলিয়েটের উদ্দাম আতিশয্যে ভেসে না গিয়ে, মিলন-সুষমায় সার্থকতা লাভ করবে; বেতন দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রমজীবী মানুষ হবে স্বচ্ছন্দ চিত্ত এরিয়েল; অর্ধসভ্য মানুষ সংযত সকৃতজ্ঞ ক্যালিবান্‌। বিজ্ঞানের সম্বন্ধে এই স্বপ্নই নাকি আপনি টেম্পেস্ট-এ আভাসিত করেছেন—সেই brave new world-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়-এর দিনে—আধুনিক যুগের উষাকালে। আমাদের বামপন্থী বন্ধুরা অনেকেই অবশ্য একথা মানে না।

আমিও মানতাম কিনা জানি না—তোমাদের এই বিজ্ঞানের যুগে বেঁচে থাকলে। সেদিনে প্রোস্‌পেরোই কি মানত মিরাণ্ডার brave new world-এ ষ্টিফানো, ট্রিংকিলো ক্যালিবান্‌রা অমনি 'goodly creatures' হয়ে উঠবে? কি জানি। কিন্তু তাঁরা কি বলেন যারা এ মতের বিরোধী?

তাঁরা বলেন, আপনার প্রোসপেরো তো স্পষ্টই জানিয়ে দিলে this rough magic I hereby abjure.

অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিরোধী। আসলে বিজ্ঞানে বিশ্বাস আপনারও নেই—প্রোসপেরোরও ছিল না। টেম্পেস্ট হচ্ছে আপনার পেটি বুর্জোয়া শেষ স্বপ্ন-বিলাস। পেটি বুর্জোয়া চাইবে বরং গঞ্জেলোর আদর্শে অলস প্রকৃতি-নির্ভরতা—ইউটোপিয়া, নিউ এ্যাটলান্টিস্‌-এর জুরী—

> All things in common Nature should produce,
>
> Without sweat or endeavour.

'পরিশ্রম আর প্রয়াসহীন, আলস্যের স্বর্গস্বপ্ন পেটি বুর্জোয়ারই নিজস্ব জিনিস।

কি জানি, বিশ্বপ্রকৃতির তালের বাইরে কি সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারকা, পৃথিবীর জোয়ার-ভাঁটা, ঋতুচক্রের আবর্তন, বৃক্ষ লতাপাতার ফুটে-ওঠা আর ঝরে-পড়া, প্রাণী জগতের জন্ম-মৃত্যু বিকাশ? কেবল মানুষেরই বেলা তার ব্যতিক্রম? মানুষের উদ্যম উদ্যোগ সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি? না, The art itself is Nature.

কেমন উন্মনা হলেন ভদ্রলোক। আমি বুঝলাম যা বলেন আমাদের বন্ধুরা মিথ্যা নয়, বিভ্রান্ত পেটি বুর্জোয়া, স্ববিরোধী ভাবনায় ভরতি। তা ধরিয়ে

দেবার জন্যই বললাম : মানবীয় চেতনায়-উদ্যোগেই যে মানুষের পরিচয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, এই কথা তো বুঝেছিলেন ?

তাও কি বুঝেছিলাম সম্পূর্ণ ?

না হলে বলতে পারতেন কি what a piece of work is man !

তিনি বলতে লাগলেন : how noble in reason ! how infinite in faculty !···তিনি বলে চললেন, আমি শুনতে লাগলাম। শেষ হলে বললাম ; ধরা পড়ে গেলেন। তাহলে আমাদের সম্পাদক যা বলে তা সত্য—আপনি কমিউনিস্ট নন, কমিউনিস্টদের গুরু।

কমিউনিস্ট—তিনি হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন—বললেন : কেমন ?

আমাদের দিনে মানুষের সম্বন্ধে এসব কথা কমিউনিস্ট ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

সে কি ? মানুষের গৌরব মানে না ?

কি করে মানবে ? মানুষ যে নিঃসঙ্গ ; মানুষ যে পাপসম্ভূত, পাপপূর্ণ···

তিনি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, বললেন : হলেই বা কি ? তবু মানুষ অদ্ভুত !

অর্থাৎ, আপনি কমিউনিস্ট।

এবার তিনি সকৌতুকে হেসে ফেললেন।

সত্য বলেছ, না হলে আমি জ্যাক ক্যাড-এর মতো তোমাদের গণবিপ্লবীর চিত্র আঁকি ? কোরিওলেনাস্ লিখি। নির্বোধ জনতার কাণ্ড দেখাই ?

সে আমাদেরও জানা আছে। আপনার মধ্যে আত্মদ্বন্দ্ব ছিল। তাই তো গোঁড়া বুর্জোয়ারা আপনাকে বলে ক্রিপটো কমিউনিস্ট। আবার বামপন্থী বন্ধুরা বলেন—নিছক পেটি বুর্জোয়া।

বলে তো ? যাক্, জানো যদি ওসবও মনে রেখো।

জান কেন ? বরাবর জানতাম তাই একমাত্র কথা। ছেলেবেলা থেকে আমরা শুনেছি আপনি জনতায় অবিশ্বাসী, অভিজাতদের অনুগৃহীত, রাজশক্তির আশ্রিত, রক্ষণশীল নাট্যকার। গদীয়ান্ সমালোচকেরা তখন বরাবর আমাদের তা বুঝোতেন। তবু দেখুন আমাদের সম্পাদকের মতো মানুষেরা গোল বাধিয়েছেন। তাঁরা বলেন, আপনার ঐতিহাসিক নাটক থেকে তাঁরা শিখতেন দেশভক্তির মন্ত্র, স্বাধীনতার আদর্শ। চাইতেন ব্রুটাস্-এর মতো স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ—অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অবসান।

ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে পড়লেন: সে আমি কি করব? আমি চেয়েছি দেশের সংহতি ; প্রজার স্বস্তি। পঞ্চম হেনরির মতো রাজাই প্রজার গৌরব।

আমরা তাতে বুঝেছি—আমাদের রাজা নেই—স্বরাজে দেশের আশা। তারপর যত বয়স হল আপনার মতোই আমাদের চোখ দেখতে শিখল। দেখলাম দেশের জনসাধারণই দেশ—আপনার লেখাতেও তার চিহ্ন কম নেই। কোরিওলেনাস-এরই নাগরিকরা শোনাল···Our sufferance is gain to them (ঐ বড়লোকদের)···তারা Suffer us to famish, and their store-houses crammed with gain. If wars eat us not up, they will; and there's all the love they bear us. শ্রেণী সংগ্রাম আর কাকে বলে? তারও পরে রোমিও থেকে টাইমন অব এ্যাথেন্সের মুখে পর্যন্ত শুনলাম যা দেখছিলাম টাকায় সব হয় :

> Gold? Yellow glittering precious gold?···
> Thus much of this will make black, white, foul, fair;
> Wrong, right, base, noble; old, young; coward valiant

বুঝিয়ে দিলেন—"cash-nexus" না মানাই অসম্ভব।

কি করব? যদি দেখতে লণ্ডনের তখনকার নতুন বণিক ব্যবসায়ীদের ইতরতা আর উৎকটতা।

তখন আর কী দেখেছেন, এখন দেখলে আরও বুঝতেন। এই সেদিনও যা ঘটল। আপনি আগেই তা আঁচ করতে পেরেছিলেন—তাই তো আমাদের কেউ কেউ আবার বলেন—আপনি তাদের কমিউনিজমের শিক্ষা দিয়েছেন।

আবার ভদ্রলোক বেশ বিড়ম্বিত বোধ করলেন: দ্যাখো, আমি নাটক লিখেছি। লোককে শিক্ষা দিতে বসি নি। নাটকের নিয়মে যা সত্য তা ঘটেছে।

নাটকের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যে সত্য আপনি দেখেছেন, আপনি বুঝেছেন। আর তাই আপনার কথা, আপনার শিক্ষা।

আমার শিক্ষা কেন হবে? নাটকের শিক্ষা। বরং বলতে পার জীবনের শিক্ষা—আমার যদি কিছু থাকে তা আমার জীবন।

ভদ্রলোক একটু জোর দিয়ে বললেন। আমি বললাম: নাটকে কি তা নেই?

থাকতে পারে, নাটকের নিয়মে পরোক্ষে। পরোক্ষ বলেই তো দেখছ তর্ক—তোমাদেরই মধ্যে।—আমি পেটি-বুর্জোয়া রক্ষণশীল, না, আমি জনতার বন্ধু, মানুষে বিশ্বাসী। কিন্তু জীবনটা প্রত্যক্ষ। তার সাক্ষ্য নিলে মতভেদ বেশি হত না। গরীব ঘরের ছেলে—ওই পেটি-বুর্জোয়া। কত কৌশলে দু-পয়সা উপার্জন করতে হয়েছে। থিয়েটর ছিল নেশা। হল পেশা। যেমন করে পারি নাটক জমাতে হবে। কীড স্প্যানিশ ট্র্যাজেডির খুনাখুনি আর হুঙ্কারে তখন আসর মাত করছে। আমাদের থিয়েটর ফেল পড়ে আর কি। লিখে ফেললাম ছ-ছটা খুনের নাটক—'হ্যামলেট'। লোক ভেঙে পড়ল থিয়েটরে। টাকা উপছে পড়তে লাগল—টাকাটা কি ফেলবার জিনিস? এমনি করে দু-পয়সা কামিয়েছি। তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি। জমিজেরাত কিনেছি; ভদ্রলোকের সরকারি তকমা আদায় করেছি; নিজের শহুরে-জীবনটা স্বচ্ছল ভাবে মান-সম্ভ্রম নিয়ে কাটালাম। এই আমার জীবনের জাবন্ত শিক্ষা।

অর্থাৎ আপনি জাত পেটি-বুর্জোয়া—জন্মেও যা, স্বভাবেও তা। আমাদের বামপন্থী বন্ধুরা ঠিকই ধরেছেন। না হলে শহরে যখন থিয়েটরের মালিক হয়ে বসেছেন তখন থিয়েটর ছেড়ে দিয়ে আসতেন না প্রোসপেরোর মতো বলে:

I'll break my staff,
Bury it certain fathoms in the earth.

আপনার প্রোসপেরোরও বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকের মতো উচ্চ সাধনা নেই—তাই বিজ্ঞান ত্যাগ করতে আপত্তি হল না।

তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—আমারও মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে গেছল—স্ট্রাটফোর্ডে জমি কিনেছি, বাড়ি কিনেছি, স্ত্রী-পরিবার নিয়ে এবার শান্তিতে থাকব।

'স্ত্রী-পরিবার'? সেই বুড়ী "railing wife"? এবার ভদ্রলোক আমার দিকে কৌতুকমিশ্রিত কৃপার দৃষ্টিতে তাকালেন।

ওই কথাটাই বুঝি তোমরা চূড়ান্ত বলে ধরে বসে আছ?

কেন, তা কি মিথ্যা? 'টুয়েলফ্‌থ্‌ নাইট' ও 'টেম্পেস্ট'-এ কি তারও আভাস নেই?

থাকুক। জীবনের মূল সাক্ষ্যটা তাতে বাতিল হবে না। তা ভাখো—এ্যান আমার থেকে আট বৎসরের বড়ো। কিন্তু আমার জীবনে সে প্রথম

নারী। তখনো তার বয়স ছিল, আমারও উঠতি বয়স। আমার জীবনে প্রেমের দেবতাকে সে প্রথম জাগায়। তার অর্থ বোঝ? সে-অভিজ্ঞতা অপূর্ব, দেহে-মনে অপুনরাবর্তনীয়। তারপরে, এ্যানও ছেলেমেয়ে নিয়ে বুড়িয়ে উঠেছে, সংসারের জ্বালায় উঠেছে তেতে ক্ষেপে। আমারও জীবনে এসেছে অনেকে—অনেক অভিজ্ঞতা। ফেলে দিই নি। যা নেবার মতো নিয়েছি। তখন my love is fever, তাতে কি? বুড়িয়ে-ওঠা এ্যানকে আমি তো ছাড়াতে চাই নি, উড়ে-বেড়ানো আমাকেও সে ছাড়ে নি। তারপর বয়স থিতিয়ে আসে, feverও ক্রমে নামে। তাপ তখন হয়ে যায় আলো। তখন বোঝা যায় প্রেমের মূল্য, তার অপরিমেয়তা।

হেসে একবার তিনি থামলেন। একটু পরে শান্তভাবে বললেন: একটা মাত্র ছেলে আমাদের—হ্যামনেট। সে গেল। বাড়ি ফিরে তখন দেখলাম এ্যানকে। নিজেও কম আঘাত পাই নি। কিন্তু মায়ের ব্যথার সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? তখন সত্যই এ্যান বয়স্কা। তারপর থেকে কেমন হয়ে গেল পুত্রশোকে। গুম হয়ে বসে থাকে। গৃহ-সংসারও দেখতে পারে না। মেয়ে-জামাইকেই দেখতে শুনতে হয় সব। তবু গৃহই আমার শেষ আশ্রম—আর এ্যান সেই গৃহিণী। অনেক সয়েছে, অনেক ভুগেছে। আমার যৌবনের প্রথম প্রেয়সী, আমার পরিণত প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গিনী। এ-কথার অর্থ বুঝবে যদি প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্ত শ্রী কী, তা বোঝো—যদি জীবনের পরিণতিতে আস্থা রাখো—

Men must endure
Their going hence even as their coming hither.
Ripeness is all.

প্রসন্নতায় ললাট উদ্ভাসিত, পরিতৃপ্তিতে মুখখানা স্নিগ্ধ, চোখে শান্ত সরলতা। একবারের মতো আমি ভুলে গেলাম—তাকিয়ে রইলাম। পরক্ষণেই চমকিত হলাম—এ কি। পরিণত জীবনের সাক্ষ্য? না, ওঁর পরিণত অভিনয়শক্তির প্রমাণ?

হঠাৎ শুনলাম: বিদেশী বন্ধু!—দেখি দাঁড়িয়ে ওঠে তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন—যাবে একবার আমার গৃহে? এ্যানকে দেখবে? কিছু cakes and ale-ও মিলবে? জানালায় দেখবে তাকিয়ে বসে আছে এ্যান! যাবে? দেখা হবে।

আমি হাতে হাত নাড়া দিতে দিতে বললাম: না। তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বাধা হব না। তাঁকে আমার নমস্কার! আর আমাদের সকলের পক্ষ থেকে নমস্কার আপনাকে। কিন্তু শেষ কথাটা কী বলব আপনার? আমাদের একটা লাইন ঠিক করতে হবে তো আপনার সম্বন্ধে। আমাদের কাগজের জন্য আপনার বিশেষ কথা—

বললাম তো—

জিজ্ঞাসা করলাম কি? Ripeness is all?

তিনি হাসলেন। হেঁয়ালিভরা হাসির অর্থ কী তা বুঝবার আগেই দেখি বলছেন, নমস্কার!

পিছন ফিরে আর তাকালেন না। সন্ধ্যার আঁধারে হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা যেন মিলিয়ে গেল।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শেক্সপীয়র অনুবাদের সপক্ষে

শেক্সপীয়র অনুবাদের অসম্ভাব্যতায় দৃঢ়নিশ্চয় এমন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ বাঙালীর দর্শন দুর্লভ নয়, যাঁদের কাছে এই মহাকবিকে অনুবাদ করার মতো পণ্ডশ্রম আর কিছু থাকতে পারে না। পণ্ডশ্রম এই জন্যে যে, যাঁরা ইংরেজী জানেন এবং মূলের রসাস্বাদন করতে পারেন, অনুবাদ তাঁদের কাছে মূলের দুর্গতির স্মারক মাত্র। এবং যারা ইংরেজী জানেন না, সেই অপাংক্তেয়দের জন্যে ভাবনার কারণ নেই, যেহেতু তাদের কাছে শেক্সপীয়রও যা মুচিরাম গুড়ও তাই। কোনো ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুশীয় বা জাপানীর মুখ থেকে অনুবাদ না করার এইরূপ যুক্তি কল্পনাতীত; তার একমাত্র কারণ, তারা তাদের ভাষার সঙ্গে অদ্বৈত। আমাদের কাছে আমাদের ভাষাটা নিতান্তই মাতৃভাষা; তাই তার স্থান অন্দরমহলে, মায়ের আঁচলে বাঁধা। আফিসে, কাছারিতে, বহির্জগতের কর্মকাণ্ডের সব ক্ষেত্রে আজও সেই ভাষাকে ঘোমটা টেনে চলতে হয়, যদিও আইনত এই ঘোমটা খুলে ফেলার অধিকার সে অর্জন করেছে। জন্মগত অধিকারকে যখন আইনের জোরে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, তখন সে-অধিকারে ন্যায়বিচার থাকলেও, ব্যবহারের সহজাত স্ফূর্তি থাকে না। ইংরেজ বা ফরাসী কল্পনাই করতে পারে না, তাদের ভাষার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাদের কোনো অস্তিত্ব আছে। ভাষার প্রতি এই মমত্ব, এ বিধিবদ্ধ কোন অধিকার নয়, এ তাদের সত্তার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই তারা পরকে আপন করে সাজাতে জানে, আপনকে দূরে ঠেলে গৌরববোধ করে না। তাই ফরাসী, জার্মান, রুশীয়রা যখন নিজেদের ভাষায় শেক্সপীয়রকে অনুবাদ করে অভিনয় করে, তার দ্বারা এই প্রমাণিত হয় না, তাদের রসবোধ আমাদের মতো উন্নত নয়, তার দ্বারা প্রমাণ হয় তারা মূলের ততটুকু রসাস্বাদনেই তৃপ্ত যতটুকু তাদের ভাষা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। এ-কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মূলকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করার শক্তি কোনো

ভাষারই নেই। তবু, স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত রেখে ভিন্নভাষী পাঠক অনুবাদককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন রাখে। ভাষার এই বাহিকশক্তিকে আবিষ্কার করা সহজ কাজ নয়। এইজন্যে এইসব দেশে অনুবাদ মৌলিক সাহিত্যের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং দেশের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরা অনুবাদকে মূলানুগ করার কাজে ব্যাপৃত। তাই শেক্সপীয়রের এই চতুর্থ শতবর্ষ উদ্‌যাপনের লগ্নে, পৃথিবীর সবদেশ যখন শেক্সপীয়রের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা স্মরণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে, তখন আমরা তাঁকে মহাকবি বলে শ্রদ্ধা জানালেও, আত্মীয় বলে ভাবতে দ্বিধান্বিত। তা এই চতুর্থ শতবার্ষিক শ্রদ্ধা-অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ড থেকেই বোঝা যায়। আমাদের গবেষকরা বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে শেক্সপীয়রের ছিটেফোঁটা যদি কোথাও পাওয়া যায় তার সন্ধানে ব্যাপৃত, যাতে, বৃষোৎসর্গ না হলেও, অন্তত তিলতর্পণটুকু করা চলে। অন্যদিকে শেক্সপীয়র অভিনয়ের উৎসাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় মূল ইংরেজীতে, নয়তো অপ্রচলিত কোনো প্রাচীন অনুবাদে সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বঙ্গীয় শেক্সপীয়র পরিষদের প্রচেষ্টার কথা। ১৯৫১ খৃঃ মুখ্যত শ্রদ্ধেয় নীরেন্দ্রনাথ রায়ের উৎসাহে এবং শেক্সপীয়র-উৎসাহী বিদ্বজ্জনের সহযোগে এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রায়ের বিদেশ গমনের পূর্ব পর্যন্ত, পরিষদ কলকাতার নাট্যামোদী মহলে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে, তা যদি অদ্যাবধি বজায় থাকত, তাহলে এতদিনে বাঙলায় শেক্সপীয়র অনেক বেশি সুগম হত। প্রতি বৎসর শেক্সপীয়র-দিবস পালন, শেক্সপীয়র নাটকের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ, শেক্সপীয়র সম্পর্কে নিয়মিত প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা ছাড়া, এ কালে বাঙলায় শেক্সপীয়রীয় নাটক অভিনয়ের প্রাথমিক কৃতিত্ব পরিষদের প্রাপ্য। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য লিটল থিয়েটার সম্প্রদায়। তাঁরা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আধুনিক রুচিসম্মত বাঙলা ভাষ্যে শেক্সপীয়রের নিয়মিত অভিনয় করে এবং নাট্যরসিক বাঙালী দর্শকের সঙ্গে সেই নাট্যপ্রতিভার নতুন ভাবে যোগসাধন করছেন।

অথচ ১৮৬৪ খৃঃ শেক্সপীয়রের তৃতীয় শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় তুর্গেনিভ রুশবাসীর জীবনে শেক্সপীয়রের প্রভাব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে যদি বলে থাকেন: "শেক্সপীয়র আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য" তদানীন্তন ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই সেই কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে পারত: "he has become part of our way of life." মুখ্যত

ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের জাদুস্পর্শে শিক্ষিত বাঙালীর মানসদিগন্তে যে বিস্তার ও বর্ণালির উদ্ভাস দেখা গিয়েছিল, তা মরুমায়া হলেও, তার সম্মোহে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের দুর্ধর্ষ জীবনসর্বস্বতা কিছু পরিমাণে তাদের স্পর্শ করেছিল। সেই আবেগের জোয়ারে তারা এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের বাসিন্দা হয়ে গেল। তাদের পরনে ইংরেজী পোশাক, তাদের আচারে আচরণে ইংরেজী কেতা, তাদের মুখে ইংরেজী বুলি। শেক্সপীয়র, মার্লো, বেকন তাদের নিত্যসহচর। তাদের জীবনটাই অভিনয় হয়ে উঠল, অভিনয়ে কখনো তারা এসেক্স, কখনো র‍্যলে, কখনো সাদাম্‌টন বা মার্লো, কখনো বা হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, লিয়র বা শাইলক। শিক্ষিত বাঙালীর সে-স্বপ্নাবেশকে বোধহয় শেক্সপীয়রকে ভালোবাসা বলা চলে না। ভালোবাসার মধ্যে নিজের সত্তার স্বাতন্ত্র্য থাকে, তা ধারণ করে, হারিয়ে যায় না। এই স্বপ্নাবিষ্ট লোকগুলোর আসল প্রকৃতি কিন্তু খাঁটি বাঙালীর। তাই সুস্থ মস্তিষ্কে যখন তারা নিজেদের কথা বলতে চেয়েছে কিংবা শেক্সপীয়রকে ধারণ করতে গিয়েছে, তখন তাদের যে বিশুদ্ধ বাঙালী মূর্তি দেখি, তাতে সন্দেহ থাকে না. তাদের ইংরেজ চেহারা অভিনয়ের সাজ মাত্র। স্বপ্নপ্রয়াণই বলি, অভিনয়ই বলি, এর ফলে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির কম লাভ হয় নি। সেই স্বপ্নের স্মৃতিতে তারা নিজেদের জীবনে শেক্সপীয়রীয় জীবনছন্দের অনুরূপ প্রকাশরূপ খুঁজতে উদ্‌বুদ্ধ হয়। এরই অন্যতম নিদর্শন, এই উগ্র ইংরেজিয়ানার যুগে শেক্সপীয়রের নাটককে বাঙলায় অনূদিত করার প্রয়াস। এবং বোধহয় এক হিসেবে সেকালের বাঙলা ভাষায় এই জীবনবোধের অনুকূল একটি সরল ও খাঁটি বাংলা সুর ছিল। আজকের অত্যধিক পরিশীলিত বাংলা ভাষায় সেই সব জীবন্ত শব্দ অশালীন, গ্রাম্য ও অসভ্যবোধে পরিত্যক্ত হয়েছে। তখনকার অনুবাদ থেকে এইরকম কিছু শব্দ যথেচ্ছভাবে তুলে দিচ্ছি :

> "আঁদার-পাঁদাড় ; ঘাপটি মেরে ; খোদার নাম নিয়ে বদিয়াতি ; আখেরী নরক ; উগ্‌রে ঝেড়ে দিয়েছে।
>
> (ম্যাকবেথ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনূদিত)
>
> রেগেছি কি হেতের চেলেছি ; হেকমৎ তো ভারি ; ওস্তাদি চাল ; হাতের লাঙ্গা তলোয়ার ; তোর গুষ্ঠির মুখে থু ; ঠ্যাঙ্গা ; মার, হাড় পিষে দে।
>
> (রোমিও-জুলিয়েত : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত)

এই শতকের প্রথম ভাগেও এই ধরনের শব্দ নাটকে প্রচলিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বসুকৃত 'ওথেলো' অনুবাদে (১৯১৯) ইয়াগোর মুখের কয়েকটি কথা :

> 'লাট দেমাকে খাতির নাদার', 'গুণের ভেতর সুন্দরীর নাগরীর নাগর', 'ঝিউড়ি ছুঁড়ি', 'এই অজ মুহুরী পাল ভরে উঠলেন বন্দরে,' 'গোলামির ঝকমারি', 'মতলব হাসিল', 'সেলাম বাজালেন', 'নেমকের গোলাম', 'ছাঁদন দড়ি যেন গলার হার,'

তৎসত্ত্বেও শেক্সপীয়রকে বাঙলা অনুবাদে সার্থকভাবে ধরা যায় নি। এর কারণ প্রধানত দৈনন্দিন ব্যবহারে এই ভাষার সীমাবদ্ধতা। যার ফলে মূলের সেই সব চরিত্র সেকালের অনুবাদে সহজেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে যাদের মধ্যে জীবনের জটিল দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত এবং যাদের জীবনচক্রে কাব্য প্রায়শই অস্পৃষ্ট। যেমন, 'ম্যাকবেথ'-এর ডাইনী, দ্বারপাল, 'রোমিও-জুলিয়েত'-এর ধাই বা ভৃত্যরা, 'জুলিয়াস সীজর'-এর পুরবাসীরা, 'ওথেলো'র ইয়াগো, রডারিগো, এমিলিয়া। এরা মাটির কাছাকাছি থাকে, মাটির মালিন্যও যেমন এদের অঙ্গে, তার সঞ্জীবনী শক্তিও এদের সত্তায়। প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া, ভাঁড়ামি, নানা গ্রাম্য রসিকতা ও বাক্‌রীতি-সমৃদ্ধ লৌকিক ভাষা এইসব সংসারী মানুষগুলিকে জীবন্ত করে তোলে। এদের বাচনিক রূপায়ণে মূলে যদিও গদ্যপদ্যের কোনো বাচবিচার করা নেই, সেকালের বাঙলা অনুবাদে এরা একান্তভাবে গদ্য সীমানাভুক্ত, পদ্যের অভিজাত মহলে তাদের গতিবিধি ছিল নিষিদ্ধ। হয়তো শিক্ষিত বাঙালীসমাজের তদানীন্তন পটভূমিতে শেক্সপীয়রীয় ট্রাজিক চরিত্রের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জীবনরহস্য অবধারণ করার মতো মানসিকতার অভাব ছিল, সেই কারণে তাদের জীবন্ত ভাষার সঙ্গে সেই ভাবের আত্মীয়তা তাদের কাছে অসঙ্গত মনে হয়েছে। এবং এই অনাত্মীয় ভাববস্তুর সঙ্গত রূপের সন্ধানে তারা মধুসূদনের সংস্কৃত-বহুল কৃত্রিম ভাষাকে গ্রহণ করল। কিন্তু মধুসূদনের আদর্শ ছিল গুরুগম্ভীর কাব্যিক ভাষায় মিল্টনের কাব্য ও ধ্বনিগাম্ভীর্য, শেক্সপীয়রের বিচিত্র সুরসঙ্গতি নয়। এই খণ্ডিত মানসিকতায় ও দ্বিধাগ্রস্ত ভাষায় শেক্সপীয়রীয় জীবনের সহজ সরল অন্তজ প্রকাশ থেকে নৈর্ব্যক্তিক কাব্য ও দর্শনের তুঙ্গলোক পর্যন্ত আরোহণ অবরোহণের সাবলীলতা অসম্ভব ছিল। মনে হয়, নিত্য ব্যবহারের জীবন্ত ভাষাকে অসাধু জ্ঞানে কাব্যের অচ্ছ্যুত বলে গণ্য না করে, তাই দিয়ে বাঙালী জীবনের উঁচু-নিচু, সরল, জটিল, কাব্যিক ব্যবহারিক সব

স্তরের প্রকাশরূপকে ধারণের প্রয়াস তখন থেকে করলে, আজ শেক্সপীয়রীয় অনুবাদ-চর্চা অনেক সহজ হতে পারত। মধুসূদন চলিত কথ্যভাষাকে অমিত্রছন্দে ধরবার কোনো দৃষ্টান্ত রেখে গেলে, পরবর্তী নাট্যকারেরা, শুধু শেক্সপীয়র অনুবাদেই নয়, মৌলিক নাট্যরচনায়ও জীবনের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ট যোগ রাখতে পারতেন। প্রসঙ্গটা এত বেশি করে বলার কারণ এই, শেক্সপীয়রের নাটকের চরিত্রের, রূপকথা, ইতিহাস পুরাণ, যেখান থেকেই আসুক না কেন, তারা যে-কথার জাদুতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেই-কথা প্রধানত ইংলণ্ডের দেশজ Anglo-Saxon শব্দ ভাণ্ডার থেকে আহরিত। চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে তিনি তদানীন্তন ইংলণ্ডের সব স্তরের ভাষার উপাদানকে অবলীলাক্রমে গ্রহণ করেছেন। কথাশিল্পী যদি কথার সব রঙের ব্যবহার না করতে পারেন তাহলে তাঁর শিল্পসৃষ্টি পঙ্গু হতে বাধ্য। মনে হয়, পদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করে নিছক চলিত গদ্যেও যদি শেক্সপীয়র বাঙলায় অনূদিত হত তাহলেও নাট্যোৎসাহী বাঙালীসমাজে শেক্সপীয়র অনেক বেশি অন্তরঙ্গ হতে পারত।

শেক্সপীয়রীয় অনুবাদ-ব্যর্থতার কারণ আরও মৌলিক হতে পারে। যে দেশ-কাল সমাজের রূপশিল্পী শেক্সপীয়র তার কোনোটাই আমাদের সংস্কারে নেই। ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় সমাজের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য প্রায় সব দেশেরই সংস্কারগত আত্মীয়তা কিছু না কিছু আছে। তাই যে কোনো ইওরোপীয় ভাষায় শেক্সপীয়র সজ্জিত হতে পারেন, তাতে তাঁর নাট্য-ব্যক্তিত্বের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। কিন্তু বহুযুগাগত আচারব্যবহার রীতিনীতির এমন একটা পাকাপোক্ত সংস্কারের প্রাচীর আমাদের এই প্রাচ্য সমাজকে ঘিরে রেখেছে যে তার মধ্যে শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের অবাধ চলাফেরা সম্ভব নয়। যাঁরা শেক্সপীয়রের প্রতিভাকে এমনি শুচিবাইগ্রস্ত বলে মনে করেন, তাঁরা ভুলে যান, শেক্সপীয়রের অধিকাংশ চরিত্রই এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের নয়। তারা রোম, গ্রীস, ফ্রান্স, ইটালি, ইজিপ্ট, আরব, সিসিলি, ডেনমার্ক, নরওয়ে—নানা দেশ নানা কাল থেকে এসে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের অধিবাসী হয় নি, সব দেশ সব কালের অধিবাসী হয়েছে। হ্যামলেট, ওথেলো, ক্লিওপেট্রা, শাইলক, কোরিওলেনাস, সীজর, টাইমন, ট্রয়লাস—ইংলণ্ড যদি এদের আত্মীয় বলে দাবি করতে পারে, বাঙলা দেশ বা কেন পারবে না। সেকালে রামায়ণ মহাভারতের কোনো অনুবাদ যদি শেক্সপীয়রের

হাতে পড়ত, তাহলে, কে জানে, আমাদের রাম-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ-অর্জুন হয়তো, কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, ইংলণ্ডের বাসিন্দা হয়ে যেত। অভিনেয় নাটকে পট ও সাজ বদলের প্রয়োজন থাকলেও মানবিক যোগ কখনো হারিয়ে যায় না। বাংলা নাটকের চরিত্ররাই বা কি কৌলিকভাবে সবাই বাঙালী? বহু অবাঙালীর বাঙালী হওয়া আমাদের নাট্য-ঐতিহ্যে যখন স্বীকৃত, শেক্সপীয়রীয় চরিত্রের পক্ষে তা সম্ভব হবে না কেন?

শিল্পদৃষ্টির সর্বজনীনতায়ও এ যুক্তি অকাট্য নয়। এ কথা অনস্বীকার্য, ভাষা, ছন্দ, রূপকল্প ও ভাবব্যঞ্জনা, সব মিলিয়ে মূল কাব্যে 'ব্রহ্মস্বাদনহোদর' যে অনন্যানুভূতি ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে, তাকে মূলের ভাষারূপ থেকে পৃথক করা সহজসাধ্য নয়। এই কাব্যব্যঞ্জনা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় দৃষ্টান্ত মনে পড়ে, "জল পড়ে, পাতা নড়ে।" সামান্য চারটি শব্দে শ্রাবণের অবিরাম ধারাপাতের যে তন্ময় আবিষ্টতা ফুটে ওঠে, ইংরেজীতে তার কিছুটা আভাস হয়তো মেলে সিগ্‌ফ্রিড সাসুন-এর এই দুই ছত্রে :

a trickling peace
Gently and slowly washing life away.

ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও সাসুন-এর কবিতার রসাস্বাদন করতে পারি; 'জল পড়ে' ও সাসুন-এর কবিতা দু-এরই আবেদন আমাদের কাছে পৌঁছোয়। অনুবাদ যদি এমনি কোনো রূপশৈলীর চর্চা না করতে পারে, যার দ্বারা এক ভাষার আবেদন অন্য ভাষায় অনুরূপ আবেদন সঞ্চার করে, তাহলে আমাদের অক্ষমতাই দায়ী। কাব্যতীর্থে সব মন্দিরেই সবার অবাধ গতি, সেখানে অছ্যুত কেউ নেই। আত্মনিয়োগ করলে, অনুবাদ, এমনকি শেক্সপীয়র অনুবাদ কত সার্থক হয়, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এবং তাঁদের পরে আরো অনেক প্রখ্যাত আধুনিক কবির অনূদিত শেক্সপীয়রের সনেট। কাব্য যখন একান্তভাবে স্বগত ভাবব্যঞ্জনা, যেখানে ঘটমান স্থূল জাগতিক জীবনের হিংসাদ্বেষ লাভক্ষতির হানাহানি থেকে প্রত্যক্ষত তা মুক্ত, সেই আত্মনিমগ্ন ধ্যানের জগতে আধুনিক বাঙালী কবি স্থানকালের ব্যবধান অনায়াসে লঙ্ঘন করে যদি অনুপ্রবেশ করতে পারেন, তাহলে শেক্সপীয়রের নাটকের ক্ষেত্রে, যেখানে কাব্য থাকলেও তা জাগতিক ঘটনা সংঘাতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা, অনুবাদকার্য অপেক্ষাকৃত সহজ হতে বাধ্য। আধুনিক কবিরা নাটকের অনুবাদের কাজে হাত দেন নি বলে

একথা বলা যায় না, তা তাঁদের ক্ষমতাতীত, হয়তো মজুরি না পোষানোর নেহাত একটা আধিভৌতিক কারণে এ-কাজে তাঁরা নিরস্ত থেকেছেন। অধুনা শিক্ষিত বাঙালীসমাজে নানা কারণে নাটক সম্পর্কে সেই প্রাচীন উৎসাহ স্তিমিত বলেই অনুবাদ-প্রয়াসের এই মন্দাভাব। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, উনিশ শতকে, যখন শেক্সপীয়রের নাটক শিক্ষিত বাঙালীসমাজকে মাতিয়ে তুলেছিল, তখন শেক্সপীয়রের নাটক অনুবাদ করার আন্তরিক ও আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও, শেক্সপীয়রের সনেট অনুবাদের কেউ চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা নেই। এমনকি রবীন্দ্রযুগেও কোনো প্রথম শ্রেণীর কবি শেক্সপীয়রের সনেট অনুবাদে যদি হাত দিয়ে থাকেন তাও সুবিদিত নয়। যখন ভাষার আধার তৈরি হয় নি, তখন নাটক-অনুবাদই অপেক্ষাকৃত সহজ বলে, (অবশ্য, নাটকের জনপ্রিয়তাও অন্যতম কারণ) তাতেই তদানীন্তন বাঙালী কবিদের যাবতীয় প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শেক্সপীয়রীয় সনেটের জীবনানুগ গদ্যভঙ্গি বাঙলায় তখনো অনাবিষ্কৃত। এবং, আমার অনুমান, যে কারণে সনেটের অনুবাদ হয় নি, সেই কারণে হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়র, ম্যাকবেথ-এর মতো ট্র্যাজিক চরিত্রের ভাবসংক্ষুব্ধ মুহূর্তগুলি—যা কাব্যিক বিচারে সনেটের সমগোত্রীয়—অনুবাদে ধরা যায় নি। কাব্যে গদ্যভঙ্গির আবির্ভাব কালসাপেক্ষ। সংহত-আবেগ গদ্যিকতা যে মানসিক বয়স্কতায় সম্ভব রবীন্দ্রোত্তর কালের আগে যদি তার সন্ধান ব্যর্থ হয়, তার দ্বারা এই প্রমাণ হয়, আমাদের বয়োপ্রাপ্তির তখনো বিলম্ব ছিল।

শেক্সপীয়রের অনুবাদের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উক্তি স্মরণ করি :

> "বাঙলা জীবন্ত ভাষা : এবং সেইজন্যে গ্রামে জন্মে, শুধু সংস্কৃত কেন, আরবী, ফারসী, হিন্দী, উর্দু, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতির কাছে নিঃসঙ্কোচে হাত পেতে, সে আজ নগরেও অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাকে ভাবনার নূতন প্রণালী শেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ; এবং তার ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ।"
>
> (প্রতিধ্বনি : ভূমিকা)

এই উক্তি শিরোধার্য করে শেক্সপীয়র অনুবাদের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার

পরিপ্রেক্ষিতে অনুবাদের নীতিরীতি ও কার্যকালিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। প্রথমেই বলে রাখি, যেহেতু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতির পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়, আমার প্রথম অনুবাদ 'দি মার্চেণ্ট অফ ভেনিস'-এ অনুসৃত অনেক রীতি আপাতত অবান্তর ও পরিত্যাজ্য মনে হয়েছে। তেমনি 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' অনুবাদে এলিঅট-এর 'a caesura and three stresses' অনুকরণে বাচনভঙ্গির সঙ্গে ছন্দকে মেলাতে গিয়ে যে স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি, তাও এখন মনে হয়, স্বাধীনতার অপব্যবহার। পরবর্তী আলোচনায় আমার সাম্প্রতিক অনুবাদ * 'ওথেলো'র অভিজ্ঞতা এবং সেই অনুবাদে অনুসৃত পদ্ধতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব বেশি আছে।

(ক) গঠনগত সাদৃশ্য

মূলের সঙ্গে পংক্তি মিল ও গঠনগত সৌসাদৃশ্য বজায় রাখার সমর্থনে দি 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' অনুবাদ প্রসঙ্গে দশ বৎসর আগে যা বলেছিলাম, এখন তা শুধু স্বীকার করা নয়, আরও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে বলে বোধ করি। আগে বলেছিলাম :

> "মূলকে বিকৃত করার প্রতিবাদ হিসেবেও এই নীতি অনুসরণযোগ্য। এ সবের চেয়ে বড় কথা ক্লাসিক পর্যায়ের কাব্য বা নাটক এমনি একটি আধার যার মধ্যে সমসাময়িক সংস্কৃতি শুধু প্রকাশমূর্তিই পায় না, ছন্দও পায়। অনুবাদ করতে হলে কাব্যের এই ব্যক্তিত্বকে ধারণ করার দরকার হয়। এই ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভাষার আধারে সমছন্দের প্রকাশরূপ খুঁজে নেয়।…
>
> সমভঙ্গির প্রকাশরূপের প্রয়োজনীয়তা কাব্যে যদি থাকে, নাটক অনুবাদে আরো বেশি করে থাকবে। কারণ নাটকের আদ্যন্ত নাট্যকারের ভঙ্গি তো আছেই, সেই ভঙ্গি আবার প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তিত্বে বিশ্লিষ্ট হয়ে বিশিষ্টভাবে রূপায়িত। এই বৈশিষ্ট্যও স্থির নির্ধারিত নয়, পরিবেশের পরিবর্তনে তারও রং বদল হয়। সবটা মূল নাটকের সামগ্রিক ছন্দে বিধৃত, সেখানে প্রতিটি সংলাপ, প্রতিটি উক্তি, প্রতিটি বিরতি ব্যক্তিত্বের জটিল গ্রন্থির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা।…একটা উদাহরণ সহজেই মনে পড়ছে—হ্যামলেটের তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তি "A little more than

* প্রকাশের অপেক্ষায় এবং 'এক্ষণ' পত্রিকায় অংশত প্রকাশিত।

kin and less than kind." এক পংক্তিতে অনুপ্রাসিত এই তীক্ষ্ণ শ্লেষ হ্যামলেটের ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক।…অনুবাদে…এই ছাঁদ বর্জন করলে, এমনকি অনুপ্রাসের অন্তর্নিহিত শ্লেষটা এড়িয়ে গেলে, হ্যামলেটের ব্যক্তিত্ব সম্যক ফুটে উঠবে না। একক পংক্তির ওই যতিগত পরিমিতিটা চরিত্রোপযোগী বলেই স্বীকার্য।"

[সাহিত্যপত্র—শ্রাবণ, ১৩৬৩]

নাটকে কথা সূত্র, সেই সূত্রে নাটকের ঘটনা চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মূল নাট্যবস্তুর ক্রমিক উন্মেষ বিধৃত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ওথেলো নাটকের তৃতীয় অঙ্কে temptation scene-এর মূল নাট্যসূত্রটি 'When I love thee not, chaos is come again.' ওথেলোর উচ্ছ্বাসে ব্যক্ত হওয়ার পর ইয়াগো পর পর প্রশ্নের আঘাতে সেই মূল সুরটাকে ছিন্নভিন্ন করে যে-রকম দ্রুতগতিতে নাটকের action-কে chaos-এর দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তা এক বা দুই শব্দ পরিমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার তীক্ষ্ণ ও ত্বরিত প্রক্ষেপেই সম্ভব। মাত্রাবদ্ধ এই শব্দবাণগুলি প্রশ্নোত্তরের ঠাসবুনানীতে ছাড়া মাত্র কুড়ি পঁচিশ পংক্তির পরিসরে ওথেলোর মনের আকাশে সন্দেহের কালো মেঘ ছেয়ে দিতে পারত না।

অনুবাদে মূলের গঠনসাদৃশ্য বজায় রাখার প্রয়োজন সম্পর্কে রুশদেশীয় বিশেষজ্ঞ মিখাইল এম. মোরোজোভও কবি পিটার ওয়েইবর্গকৃত 'ওথেলো'র রুশ অনুবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন।

"The first thing that occurs to you about this translation is that it is much too long, much longer than the original, longer in fact by one fifth. This slows down the tempo of action.…This danger was first of all taken into consideration by our translators. Many of our new translations of Shakespeare are equilinear."

[Shakespeare on the Soviet Stage. p. 19]

এই একটি কারণেই অনুবাদের অবাধ স্বাধীনতা অমিতাচারে পর্যবসিত হতে পারে। ছন্দিত কাব্যের সীমাকে মেনে চলার দায় না থাকায়, চরিত্রেরা অত্যধিক প্রগল্ভ হয়ে নাটকের action-এর সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলতে পারে।

(খ) ছন্দ

সমপংক্তিকতা মেনে নেবার পর প্রশ্ন থেকে যায় ছন্দের কোন আধারে শেক্সপীয়র বিবৃত হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই হয়তো মনে পড়ে—গৈরিশ ছন্দের কথা। কিন্তু গৈরিশ মুক্তক ছন্দে ধ্বনির উচ্ছ্বাস, যতির আকস্মিকতা, অনুপ্রাসের বহুলতা শেক্সপীয়রীয় জীবনভাষ্য ধারণের পক্ষে উপযোগী নয়। এ বিষয়ে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> "গিরিশ বুঝলেন, মাইকেলকে অনুসরণ করে তাঁর ছন্দে নাটককে রূপ দেওয়া যাবে না। শেক্সপীয়রের ছন্দকেও বাংলায় রূপ দেওয়া গিরিশ সহজসাধ্য বলে মনে করলেন না।"

[বাংলা নাটক ও নাট্যশালা, পৃঃ ১৩, আধুনিক বাংলা ছন্দে উদ্ধৃত]

শেক্সপীয়রের নাটকে ছন্দ থাকে প্রচ্ছন্ন, বাচনিকভঙ্গির অন্তর্প্রবাহে বয়ে চলে। অর্থাৎ পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিকের নিয়মিত দোলা অতি স্পষ্ট নয়, অথচ নাটকের গদ্যের থেকে একটা পার্থক্য থেকেই যায়। বাঙলাতেও ছন্দকে বাচনভঙ্গির সঙ্গে মেলানো দরকার। এ বিষয়ে আমার মনে হয়েছে :

> "ইংরেজী পঞ্চপর্বিক আয়ম্বিক ছন্দের সঙ্গে বাঙলা মহাপয়ারের ভঙ্গিগত একটা সামঞ্জস্য আছে।...সাধারণ অমিত্রপয়ারের আট-ছয় অক্ষরের চরণের চেয়ে মহাপয়ারের বিস্তার (ও প্রবহমানতাকে) শেক্সপীয়রীয় মূলের গাম্ভীর্য ও নাটকীয় গদ্যানুগত্য বজায় রাখার পক্ষে বেশি উপযোগী মনে হয়েছে।"

[ibid]

(গ) ভাষা : চলিত কথ্য ভাষার সপক্ষে

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত অভিনেয় নাট্যকাব্যের যে সংস্কার চলে আসছিল, ভাষাগতভাবে তার প্রধান দুর্বলতা ছিল : নামধাতু কণ্টকিত সাধু-চলিত ভাষার একত্র ব্যবহার, সর্বনামের তারতম্য লোপ, একান্তভাবে পদ্যে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ। যদিও এককালে এই দুর্বলতাগুলিকেই কাব্যিক ভাষার বিশেষ সুবিধা এবং এই ভাষাকে শেক্সপীয়র অনুবাদের পক্ষে উপযোগী বলে মনে হয়েছিল, আমার এখনকার দৃঢ় অভিমত ওই ভাষা কাব্যনাটকে আপাতত অব্যবহার্য। আমার এই মত পরিবর্তনের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে।

(১) প্রাচীন কাব্যিক রীতিতে একই চরিত্র গদ্য থেকে পদ্যে কথা কইলে মনে হয় না চরিত্রের ভাবলোকের পট পরিবর্তন হচ্ছে। মনে হয় দুই বিভিন্ন চরিত্র কথা কইছে। চারিত্রিক সঙ্গতির দিক থেকে গদ্যে পদ্যে এক কথ্যরীতি গ্রাহ্য। সাধারণ কথা বলার ভাষায় আমাদের জীবনের আবেগসংক্ষুব্ধ মুহূর্তগুলি যখন ধরা পড়ে, তখন নাটকে সেই ভাষার সর্বাঙ্গীন ব্যবহার কেন চলবে না, বিশেষত যখন নাটকের ভাষা কথোপকথনের ভাষা।

(২) সাধারণত হয়তো বলা চলে নাট্যকাব্য সমসাময়িক কবিতার বাচনভঙ্গি অনুকরণ করে চলে। রাবীন্দ্রিক কবিতার নাট্যভাষ্য তাই ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত বেমানান হয় নি। কিন্তু তার পরের যুগের কবিতার বাচনভঙ্গির বদল হয়েছে। কথা বলার ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের ভাষা এক হয়ে আসছে। এ শুধু স্বাভাবিক নয়, ভাষার স্বাস্থ্য ও সজীবতার লক্ষণ।…ইদানীংকার কবিতার সুর সংহত, তার গঠন আঁটসাট, তার গতি অনেক বেশি মন্থর। আটপৌরে বাকভঙ্গিকে কাব্যিক রূপে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। আধুনিক এই কাব্যিক রূপের প্রতিচ্ছায়া যদি নাটকে দেখতে হয়, তবে স্বভাবতই আধুনিক বাকরীতি অনুযায়ী ছন্দোবদ্ধ ভাষার প্রয়োজন।

(৩) আমাদের বাচনিক ভাষার সঙ্গে নাটকের ভাষার সঙ্গতি না থাকলে, সেই কৃত্রিম ভাষা নাটকের বিষয়বস্তুকে অবাস্তব দূরত্বে নিয়ে যায়। মানবিক জীবনসংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এইজাতীয় নাট্যকাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে না। পুরাণ, রূপকথার, কাল্পনিক জগতের চরিত্র সেই জগতেই থেকে যায়, তারা বাস্তব জগতে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে মিশে যায় না যেমন মিশে যায়, হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, লীয়র। নাট্যকাব্যে তাই ইতিহাস, পুরান, রূপকথা—সবকিছু বর্তমানের ভাষ্যে গ্রাহ্য। এ বিষয়ে শেক্সপীয়রই আমাদের গুরু। অতএব আধুনিক কথ্যভঙ্গিতে শেক্সপীয়রকে সাজালে নিশ্চয় সেই প্রতিভার অবমাননা হবে না।

(৪) মূল নাটকে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে যেখানে পদ্য মাত্রই কাব্য নয় এবং সাদামাটা আটপৌরে কথাও পদ্যের ছাঁদে বলা হয়েছে। যেমন 'ওথেলো' নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে ইয়াগো ও রোডারিগোর কথোপকথন :

রোডা : যাক আর কয়ো না কথা ; আমার টাকার থলি নিয়ে
যা খুশি করেছ তুমি ; অথচ, ইয়াগো, তুমি আগেই
এ সব জানতে ; খুবই মর্মাহত আমি।

ইয়াগো : জান কবুল, কিন্তু তুমি শুনবে না তো কোনো কথা ;
এমন ঘটনা যদি কখনো স্বপ্নেও জেনে থাকি এ মুখ দেখো না আর।
আমার ধারণা মূলেও এই কথ্যভঙ্গি আছে। যেমন :

Rod. Tush, never tell me, I take it much unkindly
That thou, Iago, who hast had my purse,
As if the strings were thine, shouldst know of this.

Iago. 'Sblood, but you will not hear me,
If ever I did dream of such a matter,
Abhor me.

এই অংশ কাব্যিক ভাষায় অনুবাদ করলে অনেকটা এরকম দাঁড়ায় :

রোডা : করিও না বৃথা বাক্য ব্যয়, মোর অর্থ লয়ে তুমি
করিয়াছ ইচ্ছামত ব্যয়, অথচ তোমার ইহা
পূর্বেই গোচরে ছিল ; অতি মর্মাহত আমি।

ইয়া : ঈশ্বর দোহাই কিন্তু কর্ণপাত করিবে না জানি,
এরূপ ঘটনা মোর স্বপ্নেরও গোচর যদি হয়
করিও না এ মুখ দর্শন।

মূলের সাধারণ গদ্যিক বাক্যালাপের আমেজ এতে ফোটে না।

(৫) প্রাচীন কাব্যরীতির অপ্রাকৃত পরিবেশে নাট্যচরিত্র যে কাব্যমূর্তি পরিগ্রহ করে তাতে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ম্লান হয়ে যায়। যেমন ডেসডিমোনা ও এমিলিয়া, এই দুই নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কথ্য ভঙ্গিতে যেমন ফুটে ওঠে, অন্য কোনো ভাবে তা সম্ভব নয়। এমিলিয়ার একটা উক্তি নিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। পুরুষজাতি সম্পর্কে তার মন্তব্য।

'Tis not a year or two shows us a man :
They are all but stomachs, and we all but food ;
They eat us hungerly, and when they are full,
They belch us.

এইসব দিক থেকে বিচার করলে, বোধ হয় প্রতি দশ পনেরো বৎসর অন্তর নতুন করে অনুবাদ করা দরকার। অনুবাদ সেইদিন স্বতন্ত্র শিল্পকীর্তি বলে গ্রাহ্য, যেদিন মূলের ঋণ স্বীকার করেও মূল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক স্বাধীন ও আত্মনির্ভর সত্তায় তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। *

অনুবাদ 'ওথেলো' থেকে, কিছু অংশ :

ওথেলো—দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য। ইয়াগোর গান :

[King Stephen was a worthy peer]

ষ্টিফান রাজা কী নামজাদা

পায়জামাতে ছ-আনা দাম লাগে ;

রাজা ভাবেন ছ-আনা দাম জায়দা,

ডাকাত বলে তাড়েন দর্জিটাকে ;

কেউকেটা লোক জানে সবাই তাঁকে,

আর তুমি তো হাড়হাবাতে চাষা।

দেশের পতন হয় দেমাকি ঝাঁকে,

ছেঁড়া কামিজ পর, ছেঁড়াই খাসা।

ওথেলো—পঞ্চম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য

[Othello : Behold I have a weapon থেকে]

ওথেলো। দেখুন, আমার আরো এক অস্ত্র আছে,

এর চেয়ে ভালো কিছু সৈনিকের কটিবন্ধে কভু

পায়নি আশ্রয় ; এ জীবনে এমন গিয়েছে দিন,

যখন এ তুচ্ছ বাহু ওই তরবারিটুকু নিয়ে

আপনার এ বাধার বিশগুণ বাধা ভেদ করে

অক্লেশে করেছে পথ : থাক্‌, সব মিথ্যা গর্ব

নিয়তিকে কে বাঁধতে পারে ? সেদিন নেইক আর।

ভয় নেই, ভয় নেই, যদিও সশস্ত্র আমি :

এ আমার যাত্রা শেষ, এখানেই সমাপ্তি আমার,

* এই প্রবন্ধের সারাংশ গত ২০এ এপ্রিল ব্রিটিশ কাউন্সিলএ অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত।

এ জীবন তরণীর এইখানে দিকপ্রান্তসীমা।
ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন? মিথ্যা ভয়, অমূলক;
শুষ্ক তৃণদণ্ড দিয়ে ওথেলোকে করুন আঘাত
তাতেই সে পড়ে যাবে। কিন্তু ওথেলো কোথায় যাবে?
এখন তোমাকে দেখি দেখাচ্ছে কেমন? হা অভাগী,
সাদা যেন অঙ্গবাস; পরলোকে দেখা হলে পরে
তোমার ও দৃষ্টিশেল স্বর্গ থেকে আমার আত্মাকে
হানবে অতলে, পিশাচে তা ছিঁড়ে নেবে। হিম, হিম,
হিমেল তুষার, ঠিক সতীত্ব তোমার; ওঃ হতভাগা!
পিশাচেরা, আমাকে চাবুক মারো;
কাড়ো, কাড়ো, এই স্বর্গ দর্শনের অধিকার,
ঝঞ্ঝায় তাড়িত কর, দগ্ধ কর গন্ধক খনিতে,
আমাকে ধুইয়ে দাও আগুনের তরল প্রপাতে।
ওঃ ওঃ ডেসডিমোনা! ডেসডিমোনা! নেই, নেই!
ওঃ ওঃ ওঃ।

বিষ্ণু দে

শেক্সপীঅর ও বাংলা

ভাবতে ভালো লাগে যে শেক্সপীঅরের চতুর্থশতবার্ষিকী হুজুগের অনেক আগে থেকে এবং সরকারী প্রচেষ্টার বহু আগেই বাংলায় শেক্সপীঅরের অনুবাদ করেছেন একাধিক গণ্যমান্য লেখক। অন্তত বিশপঁচিশটি নাট্যানুবাদ বাংলায় পড়তে পাওয়া যায় এবং কমবেশি ক্ষমতা হলেও মোটামুটি স্বচ্ছন্দে পড়া যায়। এটা নিঃসন্দেহে একটি দুর্গত প্রদেশের ভাষার পক্ষে গর্বের কথা।

বিদ্যাসাগরের অবলম্বন রচনা 'ভ্রান্তিবিলাস' নিশ্চয়, মাইকেলের হেকটরবধ-এর মতোই বাংলাদেশের সাহিত্যচৈতন্যে স্মরণীয় প্রসার। মর্চেণ্ট অব্ ভেনিসের বাংলায় আদি অনুবাদের বয়সও আমাদের সুনীলবাবুর কাছেই শুনেছি একশো বছরের বেশি। ম্যাকবেথের অনুবাদ শুধু যে মহানাট্যকার ও নট গিরিশচন্দ্রের ভাবালম্বনে বঙ্গীয় প্রাণ পেয়েছিল তাই নয়, সম্ভবত রাজনৈতিক সামাজিক প্রেরণার অগোচর আবেগেই আমাদের কৃতী লেখক অনেকেই ম্যাকবেথ ভাষান্তরিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুবাদ অসতর্ক হলেও পঠনীয়, বিখ্যাত কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পদ্যানুবাদের লঘু পঠনীয়তা উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার স্বদেশী মানুষ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ছন্দোময় গদ্যে অনুবাদটিও পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নীরেন রায় মহাশয়ের আক্ষরিক প্রচেষ্টাও অনেক পাঠকের পরিচিত।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচিত্র রচনায় রোমিও এণ্ড জুলিয়েট্, জ্যোতি ঠাকুরের জুলিয়াস সীজার, এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের, দেবেন্দ্রনাথ বসুর,

---

প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "ওথেলো"—অনুবাদপ্রকাশের উপলক্ষ্যে লেখা।

পশুপতি ভট্টাচার্যের অ্যান্টনি এণ্ড ক্লিওপেট্রা, ওথেলো, অ্যাজ ইউ লাইক ইট, সিম্বেলীন প্রভৃতি হয়তো আজ অনেকের মনে নেই। তবু উৎপল দত্তের নাট্যপ্রচেষ্টা দেখে, সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ তিনটি পড়ে আমি অন্তত আশান্বিত।

শেক্সপীঅরের বাংলা অনুবাদ পড়ে যা সচরাচর মনে হয়, তা উপন্যাসের জগতে যিনি বালজাকের সঙ্গে মিলে শেক্সপীঅরের জুড়ি, সেই তলস্তয়ের শেক্সপীঅর-বিচারকে একটি বিষয়ে সহজেই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে। তলস্তয়ী না হলেও সৎবুদ্ধিকে মানতেই হবে যে তলস্তয় তাঁর বিচারে যে সব মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন সে সাহিত্যিক, নৈতিক, সাহিত্যিক সমালোচনা এক কথায় হেসে ওড়ানো সহজ হলেও কথাগুলি গভীর ও জটিল। তার মধ্যে একটি প্রধান বক্তব্য ছিল তলস্তয়ের মতে শেক্সপীঅরী নাট্যকাব্যের বাক্‌সর্বস্বতার বিষয়ে।

নাট্যের প্রয়োজন বা চরিত্রের প্রয়োজনে নয়, কথা থেকে কথার ঝোঁকে শেক্সপীঅরের প্রতিভা নাকি স্ফুরিত হয়ে চলে। তলস্তয় ছিলেন মহান গদ্যলেখক, গল্পের উপন্যাসের এবং নাটকেরও; আর কে না জানে শেক্সপীঅর ছিলেন মুখ্যত কবি, কবিনাট্যকার রাজ্যের বাদশা। সেইজন্যই কি এলিঅটের মতো কবি নাটক লিখতে বসে উত্তরোত্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন কবিত্বহীনতার নাট্যরচনার? যার জন্য তাঁর শেষ কটি নাটক আধুনিক মঞ্চে নাকি খুব জমে, পাঠে তা যতই কাব্যহীন লাগুক। কিন্তু শেক্সপীঅরের নাটকে প্রতিটি চরিত্রের যে বিশিষ্ট ইমেজপরম্পরায় বা কল্প-প্রতিমার পরম্পরায় সংহত নাট্যচারিত্র্য, সে কি ঐ কথার কবিত্বের নবাবী ছাড়া কখনও প্রাণ পেত?

সে যাই হোক, বাংলা অনুবাদ বিষয়ে সাধারণভাবে বলা যায় যে কথা বা শব্দের এই মাহাত্ম্যে আমাদের বিদ্বজ্জন ভোলেন নি। সে কি শুধু গল্পের জন্য, ঘটনার নাট্যাঘাতের জন্য, লোভভয়ক্রোধ ইত্যাদি মানুষের রিপুগুলির বাহন তৈরির জন্য, যা কাব্যের পথে উপস্থিত হলেও স্বভাববশে কাব্যের তোয়াক্কা রাখে না? তা না হলে এত মহাজন কেন কাব্যনাট্যের নাটকীয়তার দিকে ঝোঁক দিয়ে এই কাব্যের দৈবগুণ তো বটেই এমন কি অনুবাদের যথাযথতাও গৌণ মনে করেন? অন্তপক্ষে নীরেন্দ্রনাথের মতো রসজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাকবেথের এমন অনুবাদ করেন, যা শেক্সপীঅর

পরিষদের কেতাবী চর্চার উপযুক্ত হলেও, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ভাষায়, উচ্চারণ করা যায় না।

সুনীল চট্টোপাধ্যায় এই দিক থেকে বিস্ময়কর অনুবাদ দেখান তাঁর "মর্চেন্ট অব ভেনিস"-এ। "অ্যাজ ইউ লাইক ইট"-এর তৎকৃত অনুবাদও উল্লেখযোগ্য। সুনীলবাবুর অনুবাদতত্ত্ব মূলানুগতায় নির্ভর। এবং তার প্রায় বিপরীত কঠিন দ্বিতীয় দাবিটি সজ্ঞানে মানতে গিয়ে তিনি যে মোটামুটি সাফল্য অর্জন করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে পাঠকের কৃতজ্ঞতা জানাই: তাঁর অনুবাদ পড়া যায়। এবং অভিনয়ও করা যায়।

অনুবাদকার্যের দুরূহতা হয়তো নিজে কাব্যসংবেদ্য মানুষ হয়ে অনুবাদ করতে গেলে সম্যক বোঝা সহজ। কিন্তু সুকুমারমনা পাঠক একটু কল্পনা করলেই বুঝতে পারবেন কতগুলি স্তরে অনুবাদককে এই দুরূহতার মুখোমুখি বসে কাজ করতে হয়। প্রথমত এলিজাবিথীয় সমাজসভ্যতার শিকড় বাংলায় গজায় নি। কোথায় সেই ডাকাতির, সাম্রাজ্যবাদের বীজ-রোপনের, বুর্জোয়া ব্যবসায়ের, লুটতরাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা? কোথায় সেই পরমপাপবিদ্ধ খৃষ্টধর্মের আত্মগ্লানি, আবার নব মানবিকতার মুক্তিজিজ্ঞাসার উদ্দাম উল্লাস? আর দ্বিধাভক্ত দৈহিকতার নেশা? আবার সমবেদনার গভীরতা ও মনের সৌকুমার্য, এবং স্থূলতা আর অস্থির কিন্তু বলিষ্ঠ অশ্লীলতা? মানুষের আবেগ সর্বত্র মূলত এক হলেও তার পুরুষার্থ ও রসাভাসের বিন্যাস তো দেশকালের ও সমাজের ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। ফলে ভাষার সমতা খুঁজে পাওয়া যায় না ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, এমন কি একই ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন যুগে। অধিকন্তু, নাটক যেহেতু শুধু পঠনপাঠনের জন্য লেখা কাব্য নয়, পরন্তু অতিমাত্রায় জীবনময় কর্মনির্ভর, তাই নাটকের ক্ষেত্রে ভাষান্তরের সমস্যা আরো জটিল।

এ কথা মনে রাখলে বোঝা কঠিন নয়, কী সাহস ও দীর্ঘ ধৈর্য আছে সুনীলবাবুর শেক্সপীঅরী নাটকগুলির অনুবাদের কৃতিত্বে। তর্ক অবশ্য উঠতে পারে 'ওথেলো'র এই অনুবাদের তত্ত্ব বিষয়ে। সাহিত্যপত্র-তে প্রকাশিত অনুবাদে সুনীলবাবু যে রীতি অবলম্বন করেছিলেন, অসীম অধ্যবসায়ে তা আবার পরিবর্তন করে তিনি এবারে 'ওথেলো'র অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছেন। প্রথম আনুবাদিক ভাষ্যে তাঁর মন ছিল মহাকবির কাব্যভাষার মাহাত্ম্যে। কিন্তু আজকের বাঙালী রঙ্গমঞ্চে সাধুভাষার কবিত্ব নাকি অচল, শ্রোতারাও

নাকি বিব্রত বোধ করেন। তাই সুনীলবাবু এবারে বর্তমান নাট্যাবৃত্তির রুচিকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সন্দেহ নেই, যে সাহিত্যিক ভাষায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা নাটকীয় কাব্য লিখতেন এবং যে নাটকে বাঙালী শ্রোতার দক্ষ শ্রবণশক্তি ও সবল কবিত্ববোধ তৃপ্তিলাভ করত, তা অধুনাতন রুচির অভ্যাসে ব্যবহার করা কঠিন। অথচ বিশুদ্ধ অর্থাৎ সীমা-নির্দিষ্ট কথ্যভাষায় ভাবের এক মহল থেকে আরেক মহলে চট্ করে যাওয়াআসা সচরাচর সাবলীল হয় না, তাছাড়া আমাদের কথ্যভাষা ক্রিয়ার ব্যাপারে বড়ই দুর্বল। অস্বাভাবিক আড়ষ্ট কবিয়ানা থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করার চেষ্টা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু এখন বোধহয় পরবর্তী দ্বিজ স্বাধীনতার চর্চা করাও দরকার।

বিশেষ করে শেক্সপীঅরের মতো চলাচলের কবির নাটকের অনুবাদে, কারণ মহাকবির নিজের ভাষা সাধুরীতি ও কথ্যরীতির উভয়ত জল-চল্ যুগের অনির্দিষ্ট ইংরেজির চরম কীর্তি। এবং কন্‌ভেনশনাল বা সংকেতিত মার্গেই তাঁর নাটকের জগতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটে, যদিচ সে তীর্থক্ষেত্রে বিচরণের অবাধ স্বাধীনতা তাঁর দৈবী প্রতিভার নিজস্ব বাহাদুরি। কিন্তু এ-বিষয়ে সচেতন ও বিনীতভাবে সচেষ্ট থাকা ছাড়া আর কিছু এখনই আশা করা বোধহয় আতিশয্য। বস্তুত ইংরেজি কাব্য আমরা দেড়শো বছর ধরে পড়ছি, মুখস্থ করছি, নোটবই লিখছি বটে, কিন্তু আমাদের মনের অন্দরে তা এখনও আত্মীয় হয়ে ওঠে নি।

বাংলাদেশে শেক্সপীঅরচর্চার একটা বিহঙ্গচক্ষু হিসাবনিকাশ করলেও বোঝা যায় কী অবান্তর আমাদের ইংরেজিজানা সাহিত্যবিলাসীর অভিমান। হিন্দু কলেজের যুগে কর্তাদের সাহিত্যোৎসাহ ছিল প্রবল এবং বেকারবারী, শুদ্ধ, কিন্তু তাঁরাও শেক্সপীঅরকে দেখতেন বিচ্ছিন্ন এক একক প্রতিভার উদাহরণ হিসাবে। ঐ প্রতিভা, সবাই জানে, অসামান্য, তবু অসামান্য কবিপ্রতিভার জমিতেও থাকে অনেক উত্তরাধিকারের মাটি-জল-রৌদ্র এবং সমসাময়িকদের মানসিক প্রভাব, কাব্যচেষ্টার নির্দেশ। কিন্তু চার্লস ল্যাম্ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পরিচিত হলেও এলিজাবিথীয় বা তাঁর পূর্বজ কাব্য বা নাট্যান্দোলন বিষয়ে শুনেছি তাঁরা খুব আগ্রহান্বিত ছিলেন না। ফলে শেক্সপীঅরের 'নেতিমূলক শক্তিমত্তা'র সঙ্গে সঙ্গে রিচার্ডসন ডিরোজিওর শিষ্যরা ভাবতেন 'অহম-নির্ভর মাহাত্ম্যবাদী' মিলটনের সমধর্মিতার কথা,

ডন বা অন্যান্য মানবিক কবিদের নয়, যাঁদের জীবন্ত শব্দব্যবহারে, ছন্দে, উইট বা ব্যঙ্গবিদগ্ধ দ্ব্যর্থময় গভীরতার দোসর পায় শেক্সপীঅরের জীবনোৎসারিত সেমান্টিক ঐশ্বর্যে। পূর্বপুরুষ হিন্দু কলেজের ইংরেজি ও ইতিহাসের বৃত্তিধারী ছিলেন, সেইসূত্রে সেকালের শেক্সপীঅর-প্রীতির বিশেষত্ব বিষয়ে আলোচনা শুনেছি এবং দেখেছি পরের কয় যুগের সাহিত্যিক রুচির পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্য। শেক্সপীঅর, মিলটন, বাইরন—অবশ্য ওআর্ডসওআর্থ বিষয়ে মাইকেলের আশ্চর্য চিঠি স্মরণীয়—ইত্যাদির বিন্যাসটি পালটে যায়। শেক্সপীঅর, মিলটন—হ্যাঁ, কিন্তু তারপরে বাইরন হয়ে পড়েন অনাদৃত, আসেন লর্ড টেনিসন।

সাম্রাজ্যের দূর দরিদ্র প্রদেশের এংলোনেসান্সে হয়তো এই সব রকমফের স্বাভাবিক, বিশেষ করে মহারাণীর ভাষায় আশৈশব আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন দেখা যায় যে মানসের তলে তলে, রক্তস্রোতে ইংরেজি চলে না, বরং মননকেই করে দেয় এই শিক্ষার চোটে বিকল, নীরক্ত ; তাই নিকটকালীন আধুনিক বা নূতন কবির সাক্ষাতে এ দেশে শিক্ষিতসমাজে এত বিমূঢ়তা। সেইজন্যই বোধহয় শিক্ষণ-ব্যবস্থায় এত বছর ধরে শেক্সপীয়র নির্যাস পান করিয়েও দেশে আজ অবধি শেক্সপীঅরের কোনও মৌলিক অথবা সাহিত্যসংবেদিত সমালোচনা বেরোল না, বহু মূর্খপণ্ডিতী বা গতানুগতিক, পরের মুখে ঝালমিষ্টি খাওয়া চেষ্টা ছাড়া, তা সে ইংরেজিতেই হোক বা বাংলাতে। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। এবং স্বাভাবিক কারণেই। কারণ তিনি কবি, কারণ তিনি সাহিত্যমাত্রকেই ভোগ্য, নন্দনকর, জীবন্ত—এই বিচারণায় গ্রহণ করতেন, তাঁর পঠনপাঠন নিতান্তই শুদ্ধ অর্থাৎ ডক্টর-কম্পাউণ্ডর হবার মতো মনের মৃত্যুতে খাদ্য সংগ্রহ করার তন্ত্রের তিনি ছিলেন আজীবন বিরোধী। এবং ইংরেজিতে তাঁর কর্তৃত্ব জগতবিখ্যাত হলেও তাঁর মন মানুষ হয়েছিল মাতৃভাষার অস্থিমজ্জাগত ঘনিষ্ঠ মাধ্যমে। তাই সম্ভব ছিল তাঁর তর্কসাপেক্ষ কিন্তু মৌলিক শেক্সপীঅর-বিচার, যা 'প্রাচীন সাহিত্য'-তে প্রতিবাদী আতিশয্যে হয়তো ঈষৎ অপরিচ্ছন্ন হলেও 'ক্রিয়েটিভ্ ইউনিটি'-র পরিণত বক্তব্যে পরিষ্কার। কিন্তু সাহিত্যানীহ হলেও পণ্ডিতী পরিশ্রমে কিছু হল না কেন? অথচ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের মতো অসাধারণ প্রাণময় শেক্সপীঅর-শিক্ষক তো এদেশে বহুকাল ধরে পড়িয়েছেন।

তাই উৎপল দত্তদের নাট্য আন্দোলনে শেক্সপীয়রের বিশিষ্ট মর্যাদায়

আশান্বিত লাগে। এবং ইচ্ছা করে বিজন ভট্টাচার্যকে দেখি বাংলার নাট্যরূপে লিয়রের ভূমিকায়। শম্ভু মিত্র কবে মাতবেন হ্যামলেটের উদ্‌ভ্রান্ত স্বগতোচ্ছ্বাসে বা টাইমনের চরম তিক্ততায় অথবা কোরিওলেনসের আত্মহা গর্বের নাটকীয়তে? রূপকার-সম্প্রদায় এবারে ব্যাপিকাবিদায়ের ভ্রান্তিবিলাসী হাস্য থেকে চলে আসুন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার মধ্যে বেনেডিক্ট ও বিয়েট্রিসের বাকযুদ্ধে।

এবং এই আশায় ইন্ধন জোগায় সুনীলবাবুর নিরন্তর শেক্সপীয়র—শ্রবণ না হোক—মনন ও ধ্যান এবং তাঁর নিরলস পরিশ্রম। তাঁর এই তৃতীয় প্রয়াস তাই আমার কাছে এত মূল্যবান—যদিচ স্বর্গত বন্ধুবর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তর্কে কখনও একমত হতে পারি নি, যে 'ওথেলো'ই মহাকবির শ্রেষ্ঠ নাটক ; যেহেতু প্রেম নয়, ঈর্ষাই হচ্ছে মানুষের প্রেমের আদি প্রেরণাশক্তি। আশা করি, অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার ঈর্ষাজয়ী মরণোত্তীর্ণ প্রেমের রাজকীয় আকাশ-বিহার সুনীলবাবুকে অনুপ্রাণিত করবে তাঁর চতুর্থ অনুবাদে॥

শেক্সপীয়রের রচনা থেকে

ম্যাকবেথ

প্রথম অঙ্ক। সপ্তম দৃশ্য

[ম্যাকবেথের প্রসাদের একটি ছোট কক্ষ। ম্যাকবেথের প্রবেশ]

ম্যাকবেথ : যদি এ কাজের সঙ্গে শেষ হয় কাজ,—তবে ভাল।
যত শীঘ্র পাট চোকে, তত ভাল। একটি সংহার
যদি জালে তুলে নিতে পারে সব সংহারের ফল
যথার্থ গুটিয়ে নেয় সব জের, সব ফলশ্রুতি
একটি হত্যায় যদি হয়ে যায় এই পৃথিবীতে
সমস্ত হত্যার সুরু আর শেষ—তা হলে এখানে,—
এখানে, কালের এই জলমগ্ন শীর্ণ বেলা থেকে
ঝাঁপ দিতে পারি পরকালে। অথচ এ সব ক্ষেত্রে
এখানেই হয়ে যায় সমস্ত বিচার। আমরা ত
শোণিত-সাধন শিক্ষা দিয়ে থাকি। শেখানোর পর
গুরুকেই হতে হয় শিক্ষার শিকার। বিষপাত্র—
আমরা যা ভরে তুলি—সমদর্শী ন্যায়ের নির্দেশে
সেই পাত্রে মুখ দিতে হয়। এখানে আছেন তিনি
দ্বিবিধ বিশ্বাসে। প্রথমত; আমি জ্ঞাতি, তাঁর প্রজা
ও কাজ না করার পক্ষে এ দুটি-ই যথেষ্ট কারণ;
আবার অতিথি তিনি। ঘাতকের মুখের উপরে
দোর বন্ধ করে তাঁকে রক্ষা করা আমার উচিত
অসঙ্গত নিজে ছুরি ধরা। ফের, এই ডানকান
রাজশক্তি প্রয়োগে এমন নম্র ও বিনয়ী আর
রাজধর্মে এত নিষ্কলুষ;—যে তাঁর সদ্‌গুণরাজি
তুরী-মুখী দেবদূতের মতন উচ্চকিত হবে
তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্যতম পাপের নিন্দায়।

এবং করুণা মাড়িয়ে ঝঞ্ঝার চূড়া দেখা দেবে
নগ্ন নবজাতকের মত ; অদৃশ্য হাওয়ার ঘোড়া
ছুটিয়ে আসবে ত্রিদিবের পক্ষবাণ দেবশিশু
প্রত্যেক লোকের চোখে ফুঁড়ে দেবে সে জঘন্য কাজ
ডুবে যাবে অশ্রুতে বাতাস। মাতাতে দুরন্ত ইচ্ছা
কাঁটা মারা জুতো পায়ে নেই, আছে সেই শুধু এক
উত্তাল উচ্চাশা, অন্ধ ; লাফিয়ে সে শূন্যে বহুদূরে
অন্য দিকে টলে পড়ে যায়।
[লেডী ম্যাকবেথ এসে।]
কি ব্যাপার ? কি খবর ?

লেডী ম্যাকবেথ　ওঁর খাওয়া প্রায় শেষ। ঘর ছেড়ে চলে এলে কেন ?

ম্যাকবেথ　কেন, তলব হয়েছে নাকি ?

লেডী ম্যাকবেথ　তুমি কি জানো না ?

ম্যাকবেথ　এ কাজে আমরা আর এক পাও এগিয়ে যাবো না
সম্প্রতি আমাকে তিনি দিয়েছেন নূতন সম্মান
রাজ্যের সমস্ত লোক আমার সুখ্যাতি করে কত
সেই নূতন দীপ্তিতে মজে থাকা এখন উচিত
এত তাড়াতাড়ি তাকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিয়ো না।

লেডী ম্যাকবেথ　যে আশায় সেজে গুজে ছিলে এতদিন সে কি ছিল
কোন পাঁড়-মাতালের ঘোর ? সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?
ঘুম থেকে জেগে উঠে করুণ বিবর্ণ মুখে দেখো
বিগত কামনা—যা সহজে স্বীকার করেছ তুমি।
তোমার প্রেমের রীতি কী রকম এখন বুঝেছি !
কাজে ও সাহসে ঠিক আকাঙ্ক্ষার মত দৃঢ় হতে
এত ভয় পাও ? এই ভাবে তাকে পাবে যাকে তুমি
মনে কর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ, অথচ
নিজের মনের কাছে হয়ে রবে ভীরু কাপুরুষ ?
বলবে কি 'সাহস হয় না কিন্তু বড় ইচ্ছা করে'
প্রবাদ কথার সেই দ্বিধান্বিত বেড়ালের মত ?

ম্যাকবেথ : দোহাই তোমার চুপ করো।
মানুষের সাধ্যে যতটুকু, ততটুকু করতে পারি
তার বেশি যে করে সে মানুষ নয় ক', অন্য কিছু।

লেডী ম্যাকবেথ : কথাটাকে পেড়েছিলে যখন আমার কাছে এসে
তখন কি পশু হয়েছিলে ? যখন বলেছ তুমি
সেই কথা,—তখন, তখনই ছিলে প্রকৃত পুরুষ।
এবং স্বপ্নকে যদি বাস্তবের রূপ দিতে পার
তবে হবে মানুষের চেয়ে আরও ঢের ঢের বড়।
সে কাজের উপযুক্ত স্থান কাল তখন ছিল না
তবু তুমি গড়ে তুলতে চেয়েছিলে সুযোগ সুবিধা
নিজ হতে সে সুযোগ আজকে এসেছে ; সেই ক্ষণ
এল,—আর তুমি হারালে সাহস। আমি ত শিশুকে
দিয়েছি বুকের দুধ, আমি জানি কী কোমল
দুধের শিশুকে ভালবাসা। তবু যদি পণ করি
আমি পারি,—যখন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে
পারি, তার তুলতুলে মাড়ি থেকে সরিয়ে মাই-এর বোঁটা
সজোরে আছাড় মেড়ে সব ঘিলু বার করে দিতে।
—অথচ এমন পণ তুমি করেছিলে।

ম্যাকবেথ : যদি ব্যর্থ হই ?

লেডী ম্যাকবেথ : ব্যর্থ হব ?
সুরে সুরে টান করে বেঁধে রাখ সাহসের তার
বিফল হব না তবে। ডানকান ঘুমাবে যখন,
সমস্ত দিনের তীব্র পথশ্রমে নিশ্চয়ই আজ
অঘোরে ঘুমাবে, তার দুই প্রতিহারীদের আমি
খাইয়ে অঢেল মদ এমন বেহুঁস করে দেবো
যাতে স্মৃতি, মেধার প্রহরী, হবে আচ্ছন্ন, আতুর
বাষ্পময় হয়ে যাবে জ্ঞান বুদ্ধি বিচার ক্ষমতা।
শুয়োরের মত তারা ঘুমিয়ে পড়লে, মদে মত্ত
তাদের চেতনা হলে অচেতন মড়ার মতন
তুমি আমি দুই জনে কি না করতে পারি অরক্ষিত

ডানকানের ওপর? মত্তপ ওদের ঘাড়ে ভবে
চাপাতে পারবোই সব অপরাধ। তারা বয়ে যাবে
মহৎ হত্যার সব দায়ভার—

ম্যাকবেথ : গর্ভে ধর ছেলে, শুধু ছেলে
তোমার নির্ভীক সত্তা থেকে শুধু সৃজন সম্ভব
কুমার কলাপ। প্রতিহারীদের যদি রক্তে রক্তে
মাথামাখি করে দেই, যারা তার ঘরেই ঘুমন্ত,
ব্যবহার করি যদি ওদের হাতের ছুটো ছোরা
তা হলে ওদের লোকে ভাববে না কি হত্যাকারী বলে
বলবে না কি এ ওদেরই কাজ?

লেডী ম্যাকবেথ : কার সাধ্য অন্য কিছু ভাবে? তার মৃত্যুতে এমন
তুলবো শোকের বান, কেঁদে কেটে চিৎকারে চিৎকারে
এমন মাতাবো পাড়া, কার সাধ্য অন্য কিছু ভাবে?

ম্যাকবেথ : তাই হবে। কেটে গেল দ্বিধা, দেহ জ্যা-বদ্ধ ধনুক
তৈরি হও প্রতি অঙ্গ ভয়ঙ্কর কাজের শপথে
শোভন ছলায় চল ব্যঙ্গ করে কাটাই সময়
কপট মুখের নিচে ঢেকে রাখ যা জানে হৃদয়।

[ম্যাকবেথ ও লেডী ম্যাকবেথ চলে গেল।]

রাম বসু

হ্যামলেট, ডেনমার্কের রাজপুত্র

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রথম অঙ্ক

[অংশ]

রাজা : এ কেমন, এখন-যে মেঘরাশি ঘিরে আছে মুখ?

হ্যামলেট : না, তেমন নয় প্রভু, বড় বেশি রৌদ্রে আছি কিনা!

রানী : বৎস হ্যামলেট, করো উন্মোচন তোমার ও-রাত্রিবর্ণ বাস
এবং তোমার চক্ষু দেখুক বন্ধুর দৃষ্টে ডেনমার্কের মাটি

খুঁজো না মৃত্তিকাশায়ী ভট্টারক পিতাকে তোমার
নতনেত্রে, নয়নের আনত পাতায় চিরকাল।
স্বাভাবিক বলে মানো : জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু
প্রকৃতির বর্ত্ম বেয়ে অসীম প্রস্থানে।

হ্যামলেট : তাই, দেবী, এ-ই স্বাভাবিক।

রানী : যদি বা ভাবিস তাই এতটা গুরুত্ব কেন দিতে চাস তুই—

হ্যামলেট : দিতে চাই দেবী! না তো এই যথাযথ, দিতে চাওয়া
অজ্ঞাত আমার।
এ কেবল মসীবর্ণ কৃষ্ণ আবরণ নয়, জননী আমার,
এ নয় চলিত প্রথাসিদ্ধ কৃষ্ণ পরিধান স্বভাব গম্ভীর,
চেষ্টাকৃত শ্বাসে নয় দেখাবার জন্য দীর্ঘশ্বাস,
না চক্ষের ফলপ্রসূ বহতা নদীও নয়
না, মুখের সবিষাদ অভিনয় নয়
সব রূপে, মেজাজে, শোকের আচরণে
আমাকে যথার্থ সত্যে প্রতিভাত করে : অবশ্যই মনে হতে পারে
যে কোন ব্যক্তিরই পক্ষে অনুরূপ অভিনেয়, তাই :
তবু যা নিহিত রয়, সে রয়েছে অলক্ষ্যে দৃশ্যের,
এগুলি কেবলমাত্র প্রদর্শনী বস্ত্র, মাত্র শোকের পোশাক।

রাজা : চমৎকার, হ্যামলেট, তোমারই চরিত্রসাধ্য প্রশংসার কাজ,
গতায়ু পিতার জন্য শোককৃত্য কর্তব্য এ সব,
তবু মনে রেখো স্থির, তোমার পিতাও পিতৃহীন হয়েছেন,
সে পিতা হারিয়েছেন তাঁরও পিতা; এবং যে বেঁচে থাকে
অপত্যের পালনীয় কর্তব্যও বাঁচে তার আরও কিছু দিন
সলাভ দুঃখের কর্ম : কিন্তু ধৈর্য ধরে
একরোখা শোককৃত্য অপবিত্র একগুঁয়ে ব্যাপার,
পুরুষের অযোগ্য সে শোক :
এ শুধু দেখায় বোধ ভ্রান্তি যা স্বর্গে পরলোকে
দুর্বল হৃদয় এক, অসংবৃত মন, আর অসংস্কৃত সরল ধারণা :
কেননা, যা আমাদের জ্ঞাত, ঠিক তাই হবে, স্বাভাবিক তাই
বুদ্ধির বিচারে তুচ্ছ বিষয়ের মত স্পষ্ট, ঠিক,

তবু কেন মনে রাখা আমাদের স্বতঃমত বিরোধী তফাৎ
কী লজ্জার কথা ! এ যে স্বর্গের বিধানে অপরাধ,
মৃতের নিকটে পাপ, অপরাধ প্রকৃতির কাছে,
অদ্ভুত যুক্তির দায়ে, যে যুক্তির চলিত বিষয়
পিতৃ-পুরুষের মৃত্যু, যা এখনও উচ্চৈস্বরে হাঁকে
আদি শব থেকে আজ যে মরেছে সে পর্যন্ত কাল
'এ তো ঠিক এই হয়।' তাই বলি, অপ্রচল শোকসজ্জাগুলি
দাও, ছুঁড়ে ফেলে দাও ধূলার উপরে, আর মনে করো আমাকে
তোমার
পিতার মতই অন্য : কেননা এ পৃথিবীর সকলে জানুক,
তুমি রাজসিংহাসনে সন্নিকট উত্তরাধিকারী—
প্রিয়তম পিতা তাঁর পুত্রকে যে স্নেহ দেন তার চেয়ে সামান্যও কম
স্নেহ আমি দিই না তোমাকে। এবং তোমার
উইটেনবার্গের বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা আমাদের
কামনার বিপরীত : আর তাই উপরোধ করি
বৎস তুমি হয়ে থাকো নয়নানন্দ, হয়ে আমাদের নয়নপুত্তলী
আমাদের যুবরাজ, রাজপুত্র, পুত্র আমাদের।

রানী : মায়ের প্রার্থনা, হ্যামলেট, পূর্ণ যেন হয়
আমিও বলছি, থাক আমাদের সঙ্গে, না যাস নে উইটেনবার্গ।

হ্যামলেট : মেনে নিই যথাসাধ্য আজ্ঞা আপনার দেবী।

রাজা : বেশ, এই প্রীতি-ধৃত যথার্থ উত্তর :
আমাদের একজন হয়ে রও ডেনমার্কে। এসো, মহারানী,
সুভদ্র ও অনির্বন্ধ হ্যামলেটের সাধ
এখনও আমার মনে মৃদুহাস্যে উপবিষ্ট : তার যথাযোগ্য মর্যাদায়
শুধুমাত্র আনন্দিত পানসভা না-করে ডেনমার্ক
মেঘে মেঘে গর্জমান সুবৃহৎ কামানে জানাবে সে সম্মান
নৃপতির পানোৎসব মেঘলোকে সংবাদ রটাবে
পৃথিবীর বজ্রধ্বনি প্রতিধ্বনি করে। চলো যাই।

[ঝনৎকার। হ্যামলেট ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

হ্যামলেট : ও, এ পেশল সংবদ্ধ মাংস একদিন গলে যাবে
দ্রবীভূত হয়ে যাবে, এক বিন্দু শিশিরে গড়াবে।
না কী, চিরাম্লত যিনি তাঁর নীতি স্থিরীকৃত
হয় নাই আত্মবলীদানে! হে ঈশ্বর, ভগবান,
কী ক্লান্ত, বিস্বাদ, স্থূল আর নিষ্ফলতা
মনে হয় পৃথিবীর সর্ববিধ কর্ম, আচরণ।
লজ্জা, ছি ছি, কী যে লজ্জা! এ যে এক বুনোঝোপে আবৃত উদ্যান
যে জঙ্গল বীজ দিতে বেড়ে ওঠে; স্বভাবে যে নীচবৃত্তি স্থূল
সেই শুধু ধরে রাখে সেই বীজ। সে তো ঠিক এই হবে শেষে!
তবুও দুমাস আগে মৃত, না অতও নয়, দু মাসও নয়:
এত মহাশয় রাজা: যিনি এর কাছে
সূর্যদেব অর্ধছাগ কামুক দেবের তুলনায়:
আমার মাতার প্রতি এত প্রেমময়,
সুযোগ দেননি তিনি আকাশের বায়ু রাখে মুখে তার অকরুণ হাত
স্বর্গ ও মৃত্তিকা
স্মরণে নিশ্চয় করে রাখি না কী? কেন বা জননী তাঁকে
স্মৃতিপটে রাখবেন ধরে
যেন ক্ষুধা লেলিহান ক্রমাগত খাদ্যের উপরে:
: এবং তথাপি এক মাসের ভিতরে—
আমি যেন না ভাবি এ সব,—চঞ্চলা রে, তোরই নাম নারী
ক্ষুদ্র এক মাস মাত্র, যে পাদুকা পায়ে মাতা হতভাগ্য পিতার
আমার
শবানুগমন করেছেন সে পাদুকা পুরাতন হবার পূর্বেই,
চিরাশ্রুমতীর মতো অশ্রুময়ী; কেন তিনি, এমন কী তিনিই—
হা ঈশ্বর। পশু এক, সেও চায় যুক্তি আলোচন,
আরও কিছুকাল যার শোক সাজে,—তিনি কিনা বিবাহিত
আমার নিজের
পিতৃব্যের সঙ্গে, যিনি আমার পিতার ভ্রাতা; তবু যা উভয়ে মিল
তুলনায় বজরঙ্গ ও আমি: এ কটি মাসের মধ্যে;
অতীব অসতী অশ্রুজলরাশি বিধৃত লবণ

বিষাক্ত দু চোখে তার উজ্জ্বলতা শুকাবার আগে
বিবাহিত তিনি : হায় অতি ঘৃণ্য দ্রুততায় রতি
এমন কৌশলে স্থির অগম্যগমনে শয্যাতলে !
এতো ঠিক নয়, ঠিক কখনো হবে না ;
কথা কও আত্মগত, হে হৃদয়, কেননা যে রুদ্ধ রাখা

শ্রেয় এ রসনা ॥

[হোরেসিও, মারসেলাস ও বার্ণার্ডোর প্রবেশ]

অনুবাদ : তরুণ সান্যাল

শেক্সপীয়রের দ্বিতীয় সনেট

(When forty winters shall besiege thy brow)

চল্লিশ আবর্তে শীত বেষ্টিবে তোমার ভুরু যবে,
গভীর খনিত্রক্ষত তোমার সৌন্দর্যক্ষেত্রে আজি,
অধুনা নয়নরম্য সম্ভ্রান্ত প্রচ্ছদখানি হবে
নিছক আগাছা, যার দাম খুব বেশি নয় জানি,
কোথা তব রূপরাশি রয়ে গেছে, একথা শুধালে,
এবং কোথায় তব রসোচ্ছল সেই সব দিন,
তোমারি নিমগ্ন চোখে, উত্তরে একথা বলা হলে,
জলজ্যান্ত মিথ্যা সে যে স্তাবকতা পরিমিতিহীন।
কৃতার্থ সৌন্দর্য তোর পেত আরো অধিক সন্তোষ
বলতে পারতিস যদি জেনো এ সুন্দর সুত মোর
মেলাবে আমার অঙ্ক, খণ্ডাবে আমার যতো দোষ,
জাতকে বর্তেছে যতো রূপ সে তোমারি সদুত্তর।
সে তো নব পুনর্নব বৃদ্ধা হয়ে গেছ তুমি যবে,
উষ্ণতা তোমারি রক্তে নিস্তাপ যখন অনুভবে ॥

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সুধাংশু ঘোষ

শেক্সপীয়রের রূপকল্প প্রসঙ্গে

কবিতা অথবা নাটকে সম্পৃক্ত রূপকল্পের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে। সেই রূপকল্পের স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে মগ্ন হওয়ার ঝুঁকি অনেক। এই মগ্নতা অবশেষে স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে উজ্জ্বল রূপকল্পটিকে কবিতা অথবা নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে পারে। এই বিচ্ছেদ মারাত্মক, প্রায় একটি জীবন্ত শরীরের কোন অংশ ছুরি দিয়ে কেটে নেবার মতো। তথাপি এই ঝুঁকির বিষয়ে পাঠক এবং সমালোচকদের অনীহার দৃষ্টান্ত অজস্র।

দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্পের আদল অপেক্ষাকৃত সহজে ধরা পড়ে বলে এই ধরনের স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে মগ্ন হওয়ার প্রবণতা তীব্রতর। একটি কবিতায় কটি ফুলের উল্লেখ আছে তা আঙুল গুণে বলে দিতে অথবা কটি ছবি আছে তা মনের চোখে দেখে নিতে আমাদের কৈশোরেই শেখানো হয়। অমন করে গুণলে অথবা দেখলে কবিতাটির হৃৎপিণ্ড যে থেমে যেতে পারে, একথা অন্তত ওই বয়েসে সাধারণত কেউ বলে না। তাছাড়া দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্পের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অন্য ধরনের রূপকল্পগুলির আঘাত মৃদু এবং এমনকি অননুভবনীয় করে তুলতে পারে। একটি কবিতায় জুন মাসের পাতায় ঢাকা এক শীর্ণ নদীর ধ্বনি সারারাত বনভূমি শুনেছে। নদীটি জুন মাসের পাতায় ঢাকা, তবু চোখ বুজে মনের চোখ দিয়ে সেই শীর্ণ নদী দেখে নিতে শেখানো হবে। তার ফলে শ্রবণের প্রতি নদীটির ধ্বনিরূপের আঘাত মৃদু এবং এমনকি অননুভবনীয় হবে। অথচ কবি অবশ্যই চেয়েছিলেন, সেই ধ্বনি সঞ্চারিত হবে পাঠকের মনে।

ভালো কবিতায় দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্প অন্যান্য শ্রেণীর রূপকল্পের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হয়ে সুন্দরের শরীর গড়ে তোলে। বিভিন্ন শ্রেণীর রূপকল্পের বিচিত্র সংশ্লেষ ঐশ্বর্যময়তার লক্ষণ। নানা জটিল ইন্দ্রিয়াঘাত যেমন কল্পনায় অনুভব করা যেতে পারে, তেমনই সেই আঘাতের প্রত্যেকটি, তা সে যতই তীব্র অথবা

মৃদু হোক, রূপকল্পের মাধ্যমে এক মন থেকে অন্য মনে সঞ্চারিত হতে পারে। শীতলতা, তাপ, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, চাপ, প্রসার্যমাণতা, গতি, ভার, শব্দ ইত্যাদির ইন্দ্রিয়াঘাত কবিতায় কথার অনুষঙ্গ, প্রতীকতা ও ধ্বনিতরঙ্গবাহিত, কিন্তু প্রধানত রূপকল্পাশ্রয়ী।

এসবই, বলা বাহুল্য, কথামালার কথা। তথাপি রূপকল্পের যে-কোনো প্রাথমিক আলোচনায়, শেক্সপীয়রের রূপকল্পের আলোচনায়ও, আরও একবার স্মরণ করা বরং ভালো।

কথার কোনো নির্দিষ্ট মানে নেই; প্রতিবেশী কথা এবং আগে যেসব প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের প্রভাবে কথার মানে বদলায় এবং নতুন করে ঐশ্বর্যময় হয়। আই. এ. রিচার্ডস-এর এই বক্তব্য থেকে উইলিয়ম এমসন শুরু করেছিলেন। কিন্তু শুরুরও শুরু থাকে। রিচার্ডস নিজেই হয়তো ক্রোচের কাছে তাঁর ঋণ লুকোবার তাগিদে ক্রোচের তত্ত্ব বিষয়ে তেতো কথা বলেছেন। কথার দ্ব্যর্থে কাব্যের সৌন্দর্যঅন্বেষী এমসন অনেক কবিতাংশ বিশ্লেষণ করে যে প্রচ্ছন্ন জটিল তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন, প্রথম পাঠে তা চোখে পড়ে না। কিন্তু শুধু দ্ব্যর্থের জন্যেই দ্ব্যর্থের অন্বেষা অকারণ অস্বচ্ছতা ও বিভ্রান্তি আনতে পারে। তাঁর 'সেভেন টাইপস্ অব এ্যাম্বিগুইটি' গ্রন্থে এমসন স্বীকার করেছেন যে তাঁর তত্ত্ব অনুসারে শেক্সপীয়রের একটি সনেটের বিশ্লেষণ অস্বচ্ছতা এনেছে। তাহলে এই বিশ্লেষণ অন্তত মাঝে মাঝেই সৌন্দর্য উপলব্ধির বাধা হবে এমন আশঙ্কা করা সঙ্গত।

এমসন অবশ্য স্পষ্ট করে বলেছেন, শুধু দ্ব্যর্থই সৌন্দর্য নয়; এক বিশেষ ধরণের দ্ব্যর্থে কাব্যের সৌন্দর্য নিহিত। এই বিশেষ ধরণের দ্ব্যর্থের সংজ্ঞা লক্ষ্য করলে মনে হবে, কবির ভাবনার প্রকৃতিই আসল কথা এবং তখন আর দ্ব্যর্থের তত্ত্বের বিশেষ কোনো তাৎপর্য থাকবে না।

এমসনের বক্তব্য অনুসারে একটিমাত্র কথার অজস্র সম্ভাবনা শেক্সপীয়রের এক-একটি নাটকে উপস্থাপিত। যেমন 'ওথেলো' নাটকটিতে 'সততা' কথাটির অজস্র সম্ভাবনা রূপায়িত হয়েছে। এলিজাবেথের কালে নিচু শ্রেণীর মধ্যে কথাটির যে সব অর্থ ছিল সেই সব অর্থে ইয়াগোর চরিত্রে সততা রয়েছে। ভিন্ন অর্থে 'সততা' ওথেলোরও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নাটকটির দুই প্রধান চরিত্রের বিরোধ শুধু 'সততা' কথাটির বিভিন্ন অর্থবিধৃত।

এমসনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 'ওথেলো'-র মতো একটি গভীর জটিল

নাটক বড় বেশি সরল মনে হবে। এই সরলীকরণে ইয়াগো ছাড়া অন্যান্য চরিত্রসৃষ্টি, কাহিনীবয়ন ইত্যাদির আশ্চর্য নিপুণতা উপেক্ষিত। এমসনের তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা যায়, কথার সম্ভাবনা বিশ্লেষণ সমালোচনার অন্যতম লক্ষ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু তা-ই সাহিত্য সমালোচনা নয়।

এমসন এবং ক্যারলিন স্পার্জনের পদ্ধতি স্বতন্ত্র, তবু এই দুজনের মধ্যে দূরত্ব অসেতুবন্ধন নয়। এমসন এক-একটি মৌল কথায় শেক্সপীয়রের এক-একটি নাটকের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছেন এবং স্পার্জন এক-একটি রূপকল্পে প্রায় তা-ই পেয়েছেন। অবশ্য এমসনের তুলনায় স্পার্জনের দাবি অনেক বিনীত।

শ্রীমতী স্পার্জন বিশ্বাস করেন, নাট্যকার অথবা ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্ব, মেজাজ ও মানসের আদল তাঁর সাহিত্যকর্মেই মেলে, তাঁর জীবনীতে মেলে না। একজন কবি প্রধানত তাঁর রূপকল্পের মাধ্যমে কিছুটা নির্জ্ঞানে নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই কবি শেক্সপীয়রের মতো নাট্যকার হলে তিনি তাঁর সৃষ্ট পাত্রপাত্রীদের থেকে এবং তাদের দৃষ্টিকোণ ও মতামত থেকে নিজেকে যতই দূরে রাখুন, তীব্র আবেগে কম্পিত মুহূর্তে তাঁর হৃদয় থেকে কিছুটা নির্জ্ঞানে উৎসারিত রূপকল্প প্রবাহে নিজেকে প্রকাশ করেন। বিশেষ করে যা-কিছু তাঁর অভিজ্ঞতাবিধৃত হয়েও বিস্মৃত, আবেগের আঘাতে উত্তরঙ্গ মুহূর্তে উৎসারিত রূপকল্পে তারই প্রতিভাস।

এই বিশ্বাস নিয়ে স্পার্জন শেক্সপীয়রের নাটকের রূপকল্পগুলিকে বেছে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন। রূপকল্পের সংজ্ঞা দিতে তিনি চান নি। একটি মিলের ভিত্তিতে দুটি ভিন্ন জিনিস অথবা ভাবনার মধ্যে স্পষ্ট অথবা প্রচ্ছন্ন তুলনাকে তিনি রূপকল্পের মর্যাদা দিয়েছেন। অবশ্য রূপকল্পের আঘাত যে শুধু দৃষ্টিতে নয় এ বিষয়ে তিনি খুব সচেতন। তাঁর বিশ্বাস, কোনো কবি অথবা গদ্যলেখক তাঁর ভাবনাকে রূপায়িত, উদ্ভাসিত ও অলঙ্কৃত করতে যে বাক-প্রতিমা ব্যবহার করেন তাকেই রূপকল্প হিসেবে মেনে নিলে ক্ষতি নেই।

শেক্সপীয়রের নাটকের রূপকল্পগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করে স্পার্জন প্রথমত নাট্যকারকে জানতে চেয়েছেন এবং দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটি নাটকে নতুন আলোকপাত করতে চেয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এক-একটি নাটকে একটি রূপকল্প বারবার এসেছে। একটি রূপকল্পের বারবার ব্যবহারে সামান্য ভাষান্তর অনুল্লেখ্য। একটি রূপকল্পের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ নাটকটির মৌল আবেগ বারংবার তরঙ্গায়িত ও তীক্ষ্ণমুখ করেছে। যেমন 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট'

নাটকটির সারাৎসার আলোর রূপকল্পাশ্রয়ী। অন্ধকার পৃথিবীতে এই আলো নানারূপে প্রসারিত।

স্পার্জনের পদ্ধতির দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ম্যাকবেথ' নাটকটিকে বেছে নিলে দেখা যাবে তিনি নাটকটির চারটি প্রধান রূপকল্প চিহ্নিত করেছেন। এই চারটি রূপকল্প নাটকটিতে বারংবার ব্যবহৃত। প্রথমত নায়ক ম্যাকবেথ বেমানান পোশাকের ভারে মৃদুগতি এক ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত। বেমানান পোশাকের রূপকল্প নাটকটিতে অজস্রবার এসেছে। স্পার্জন দেখিয়েছেন, এই বেমানান পোশাকের ভারে, মৃদুগতি ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিটি ম্যাকবেথের চরিত্র সম্বন্ধে কোলরিজ ও ব্র্যাডলির মতো সমালোচকের ধারণার সঙ্গে মেলে না। কোলরিজ ও ব্র্যাডলি ম্যাকবেথকে বিরাটত্বে মিলটনের স্যেটানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্পার্জন মেনে নিয়েছেন, সাহসে, আবেগে, অনিরুদ্ধ উচ্চাশায়, কল্পনাশক্তিতে ও অনুভবের তীক্ষ্ণতায় ম্যাকবেথ নিঃসন্দেহে খুবই বড়, না হলে তো ট্র্যাজেডিই হত না। কিন্তু তিনি মনে করেন, হ্যামলেট অথবা ওথেলোর পাশে দাঁড়াবার মতো মহত্ত্ব ম্যাকবেথের নেই। বেমানান পোশাকের ভারে মৃদুগতি এক ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তির রূপকল্পের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে যেভাবে ম্যাকবেথ বারবার নাটকটিতে উপস্থাপিত, শেক্সপীয়র নিজে তাকে সেইরূপেই 'দেখেছেন'।

বিপুল বিস্তারে এবং পৃথিবীর প্রত্যন্ত পার হয়ে অধীর শূন্যে ধ্বনির কম্পিত তরঙ্গায়িত প্রতিধ্বনি 'ম্যাকবেথ' নাটকটির দ্বিতীয় প্রধান রূপকল্প। প্রতিধ্বনি ও বিচ্ছুরিত আলো সব সময় শেক্সপীয়রের প্রিয়। তাঁর নাটকগুলিতে এই পক্ষপাতিত্বের অনেক নজির ছড়িয়ে আছে। ম্যাকবেথ দুঃসহ যন্ত্রণায় উপলব্ধি করেছে, ডানকানের হত্যার কাহিনীর তরঙ্গায়িত প্রতিধ্বনি পৃথিবীর প্রত্যন্ত পার হয়ে অসীম শূন্যে কম্পিত হবে। ম্যাকবেথের নৃশংসতা বর্ণনায় ম্যাকডাফের কথা একই প্রতিধ্বনির রূপকল্পাশ্রয়ী।

অন্ধকার 'ম্যাকবেথ'-এর তৃতীয় প্রধান রূপকল্প। আলোয় জীবন ও কল্যাণ প্রতিভাত এবং অন্ধকারে মৃত্যু ও শয়তানি—এই সরল প্রতীকতা থেকে অন্ধকারের রূপকল্প এই নাটকে বারবার এসেছে। এই সরল প্রতীকতা থেকে এই ভাবনা রূপকল্পবিধৃত হয়ে বারবার প্রযুক্ত হয়েছে যে, ম্যাকবেথের নৃশংসতা চোখের পক্ষে অসহ্য, তাই অন্ধকার অথবা আংশিক অন্ধত্ব প্রয়োজন। এই কারণে ম্যাকবেথ তারার আলো নেভাতে ব্যাকুল, এই কারণে ম্যাকবেথ

ও তার স্ত্রী নিজের নিজের চরিত্র অনুসারে গভীর অন্ধকারকে আহ্বান করেছে। প্রতিক্রিয়া শুরু হবার পর যে-আলো লেডি ম্যাকবেথ সব সময় কাছে রেখেছে, তা বরং এই অন্ধকারকে গভীরতর করেছে।

পাপ একটা ব্যাধি, স্কটল্যাণ্ড ব্যাধিগ্রস্ত—শেক্সপীয়রের এই প্রিয় ভাবনা 'ম্যাকবেথ' নাটকের চতুর্থ প্রধান রূপকল্প। ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের রূপকল্পের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্তক্ষরণের ভাবনা এসেছে। 'ম্যাকবেথ' নাটকের অন্ধকার প্রেক্ষিতে রক্তের রূপকল্পও বারবার সম্পৃক্ত।

শেক্সপীয়রের নাটকে রূপকল্পগুলি বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্নভাবে প্রযুক্ত নয়। এক-একটি নাটকে এক-একটি প্রধান রূপকল্পের পুনরাবৃত্তি পটভূমি ও পরিবেশ তৈরি করে এবং নাটকের মৌল আবেগ তরঙ্গায়িত ও তীক্ষ্মমুখ করে। শ্রীমতী স্পার্জনের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। তাঁর রূপকল্পের শ্রেণীবিন্যাস শেক্সপীয়রের নাট্যশিল্পের শৈলী উপলব্ধিতে অবশ্যই সাহায্য করে। কিন্তু যদি দাবি করা হয়, রূপকল্পই শেক্সপীয়রের নাটকের তাৎপর্য বিষয়ে শেষ কথা এবং একটি বিশেষ রূপকল্পের পৌনঃপুনিকতায় একটি নাটকের মৌল ভাবনা অথবা আবেগ প্রতিফলিত, তাহলে নাট্যসমালোচনার এবং সাধারণভাবে সাহিত্যসমালোচনার পরিধি সঙ্কুচিত করা হবে। তাছাড়া জটিল নাটকের উপলব্ধিতে শ্রীমতী স্পার্জনের পদ্ধতি ভুল পথের দিকেও তর্জনীসংকেত করতে পারে। যেমন বেমানান পোশাকের ভারে মৃদুগতি কোনো ব্যক্তি হাসির উৎস, বিষাদান্ত নাটকের নায়ক নয়। পোশাক বাইরের জিনিস, কিন্তু ম্যাকবেথের শয়তানি তার অন্তর্নিহিত।

উইলসন নাইট ঠিক ক্যারলিন স্পার্জনের মতো রূপকল্পের 'বৈজ্ঞানিক' বিশ্লেষণে আগ্রহী নন, তিনি গভীর অর্থে শেক্সপীয়রের জীবনদৃষ্টির ভাষ্যকার। নাটকের কাব্যিক তাৎপর্য তাঁর প্রধান আলোচ্য। ঘটনা অথবা কাহিনীর ক্রমবিকাশ অথবা চরিত্রায়ণ তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেনি, তিনি এই সবের উৎসে যে শিল্পীমানস তার ব্যাখ্যায় মগ্ন। নাটকে উপস্থাপিত কোন উত্তরঙ্গ ক্ষণকাল চিরকালীনতায় সম্পৃক্ত হয়ে জীবন ও মৃত্যুর কোন্ সত্যের আবরণ তুলে নেয়, প্রতীকতা ও রূপকল্পের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাকে চিহ্নিত করা উইলসন নাইটের লক্ষ্য।

নাইট তাঁর 'দি শেক্সপীরিয়ান টেম্পেস্ট' বইটিতে তীক্ষ্মভাবিতায় বিশিষ্ট। এখানে তাঁর বক্তব্যে কোনো কুয়াশার আস্তরণ নেই। এখানে তিনি দেখিয়েছেন,

শেক্সপীয়রের প্রত্যেকটি নাটকের ক্ষণকালের বৃত্তে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত এসেছে এবং এই সংঘাত অবসিত হয়ে সুশৃঙ্খলা ফিরে এলে সেই ক্ষণকালের বৃত্ত চিরকালীনতায় সম্পৃক্ত হয়েছে। শেক্সপীয়রের নাটকে বিশৃঙ্খলা ও সুশৃঙ্খলার, মৃত্যু ও জীবনের, অন্ধকার ও আলোর, অশান্তি ও শান্তির, অসুন্দর ও সুন্দরের বিরোধ 'ঝড়ের' ও 'সঙ্গীতের' রূপকল্পে উপস্থাপিত। শেক্সপীয়রের জীবনদৃষ্টিতে সঙ্গতি ও অসঙ্গতির, প্রেম ও অপ্রেমের এক পরম প্রত্যয় রয়েছে। বিভিন্ন নাটকের বিচিত্র বর্ণালী সেই এক চরম প্রত্যয়ের প্রতিভাস। এই কারণে লীয়র-এর 'চরিত্রে' 'কিং লীয়র' নাটকটির হৃদয়ের স্বাদ মিলবে না; সেই স্বাদ মিলবে ঝড়ের ও সঙ্গীতের সংঘাতে। 'এ্যান্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা' ছাড়া শেক্সপীয়রের অন্য সব নাটক সম্বন্ধে উইলসন নাইটের এই একই বক্তব্য। নাইটের সঙ্গীতের ও ঝড়ের রূপকল্পকে রম্য রূপকল্প ও রুদ্র রূপকল্প বললে হয়তো আরও সঙ্গত, অর্থবহ ও সহজবোধ্য হয়। কিন্তু 'রুদ্র' কথাটির আর বিশেষ ধার নেই, কথাটি অপব্যবহারে জীর্ণ।

উইলসন নাইটের সমালোচনার রীতি 'ম্যাকবেথ' নাটকটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে বেছে নিলে স্পষ্ট হবে। বিশৃঙ্খলা ও মৃত্যু 'ম্যাকবেথ' নাটকে পরম্পরা ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। এই নাটকে ঝড় অত্যন্ত হিংস্র। শুরুতেই সার্জেন্ট-বর্ণিত বিদ্রোহ ঝড়ের রূপকল্পবিধৃত। যে তিন অতিপ্রাকৃত চরিত্র ম্যাকবেথের ভাগ্য বলে দিতে বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টিতে অপেক্ষা করছে তারা ঝড়ের প্রতিমূর্তি। তাদের একজন এক নাবিককে নির্যাতন করবে। নাবিকটির জাহাজের নাম 'দি টাইগার'। একটি জাহাজের এই নাম 'টুয়েল্‌ফ্‌থ নাইট' নাটকটিতেও রয়েছে। জাহাজের নামের ওই ব্যাঘ্রে ঝটিকার হিংস্রতা রূপায়িত।

ডানকান-হত্যার রাত্রিতে ঝড়ের আঘাতে জীবনের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরেছে। এমন ঝড় লেনক্সের অভিজ্ঞতায় নেই। হিংস্র জন্তু ঝড়ের অথবা রুদ্রের প্রতীক। ডানকান-হত্যার রাত্রির ভয়ঙ্কর ঝড় অনেক হিংস্র জন্তুতেও রূপায়িত। ওই রাত্রিতেই হত্যার আগে বিশিষ্ট অতিথিকে আপ্যায়নের আয়োজনে সঙ্গীতের সুষমা রয়েছে।

ভাগ্যের আয়নায় ভবিষ্যতের ছায়া দেখে নিতে ম্যাকবেথ পাহাড়ের নির্জন গুহায় আবার সেই অতিপ্রাকৃত ত্রয়ীর কাছে এলে পরপর তিনটি ছায়ারূপ তার দৃষ্টিকে আঘাত করবে। এই দৃশ্যে একটি সশস্ত্র মুণ্ড, এক রক্তাক্ত শিশু ও এক মুকুট-পরা শিশুর ছায়ারূপে ধ্বংস ও সৃষ্টি, মৃত্যু ও জীবনের সংঘাত

প্রতিফলিত। সশস্ত্র মুণ্ডটি ম্যাকবেথের নিজের ছায়ারূপ। ডানকানকে হত্যা করে স্কটল্যাণ্ড থেকে, মানবতা থেকে, জীবন থেকে খণ্ডিত হয়ে ম্যাকবেথ নিজেকে শুধুই অস্ত্র দিয়ে সাজিয়েছে। রক্তাক্ত শিশুর ছায়ারূপ মৃত্যু থেকে উৎসারিত জীবনের প্রতীক। মুকুট-পরা শিশুর ছায়া জীবনের জয়ের প্রতীক। এই দৃশ্যেরই শেষের দিকে আট রাজার ছায়ামিছিল ম্যাকবেথের আহত চোখের সামনে সঙ্গীতের কম্পিত তরঙ্গে অপস্রিয়মান। এই সঙ্গীতসৃষ্টিও জীবনের। ঝড় ও সঙ্গীতের রূপকল্পাশ্রয়ী মৃত্যু ও জীবনের এই সংঘাত অনন্তকালের সমুদ্রে একটিমাত্র ঢেউ।

উইলসন নাইটের রীতি শেক্সপীয়রের নাটকের তাৎপর্য উপলব্ধিতে প্রচুর সাহায্য করে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটিমাত্র রূপকল্পে অথবা প্রতীকে একটি নাটকের সারমর্ম খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা সব সময় সার্থক হতে পারে না। নাইটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দুটি নাটকের স্বাতন্ত্র্য দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে পড়ে। বিষাদান্ত এবং মিলনান্ত নাটকের মধ্যে পার্থক্যও অস্পষ্ট হয়ে যায়। নিজের তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে নাইট শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকের অনেক অংশের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর 'এ্যাণ্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা'-র ভাষ্য সানন্দে গ্রহণ করা সহজ নয়। শেক্সপীয়রের নাটকের সমালোচনায় রূপকল্পের ব্যাখ্যা যে লক্ষ্যে পৌঁছবার অন্যতম পথ, রূপকল্প অথবা প্রতীকের ব্যাখ্যাই যে লক্ষ্য নয়, এই অনস্বীকার্য কথাটি নাইটের পদ্ধতিতে উপেক্ষিত।

স্টোল এবং অপর কয়েকজন সমালোচক অভিযোগ করেছেন যে, এলিজাবেথীয় মানসের সঙ্গে উইলসন নাইটের ব্যাখ্যার কোনো সাযুজ্য নেই। এই অভিযোগ ধোপে টেকে না। এলিজাবেথীয় কবিতার তুলনায় সমালোচনা অনেক পিছিয়ে ছিল। শেক্সপীয়রের নাট্যকলার ব্যাখ্যা তাঁর যুগের উপলব্ধির বৃত্তে সীমিত করা চলে না।

এডওয়ার্ড এ. আর্মস্ট্রং চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত তাঁর 'শেক্সপীয়র্স ইম্যাজিনেশন' বইটিতে কয়েকটি পরস্পরসংযুক্ত রূপকল্প বেছে নিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বিভিন্ন নাটকে এই রূপকল্পপুঞ্জের পুনরাবৃত্তি শেক্সপীয়রের শিল্পীমানসে আলোকপাত করে। আর্মস্ট্রংয়ের বইটির প্রকাশ-কালের দু'বছর পরে প্রকাশিত 'দিস গ্রেট স্টেজ' গ্রন্থে আর. বি. হেলম্যান 'কিং লীয়র' নাটকটির রূপকল্প সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন। নাটকটির গঠনের

সঙ্গে রূপকল্পের সম্পর্কসন্ধান তাঁর লক্ষ্য। একই সময়ে 'হ্যামলেট' ও 'ম্যাকবেথ' এবং অন্যান্য নাটকের রূপকল্প বিষয়ে রয় ওয়াকার দু-খানি গ্রন্থে* ও বহু প্রবন্ধে সার্থক আলোচনা করেছেন।

ক্যারলিন স্পার্জনের 'শেক্সপীয়র্স ইমেজারি' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল তিরিশের দশকের মধ্যভাগে। তার ঠিক এক বছর পরে উল্ফ্‌গ্যাং ক্লেমেন শেক্সপীয়রের নাট্যকাহিনীর বিকাশে রূপকল্পের ভূমিকা বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন। স্পার্জনের তুলনায় তাঁর পদ্ধতি কম 'বিজ্ঞানসম্মত', কিন্তু স্পার্জনের বইটিতে যে একটা অভাববোধ ছিল, বলা যায়, ক্লেমেনের আলোচনায় তা অবসিত।

শ্রীঅমলেন্দু বসুর প্রবন্ধটি দেরীতে পাওয়ায় এই সংখ্যায় দেওয়া গেল না। এই প্রবন্ধটি এবং শেক্সপীয়র সম্পর্কে আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক পরিচয়

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চে শেক্সপীয়র

মঞ্চে শেক্সপীয়রের নাটকাভিনয়ের কথা উঠলেই চার্লস ল্যামের সেই বিখ্যাত উক্তি স্বতই মনে পড়ে :

"The plays of Shakespeare are less calculated for performance on a stage than those of any other dramatist whatever."

এই উক্তির সমর্থনে এখন বোধকরি বহুজনই সাড়া দেবেন। শেক্সপীয়রের নাটকের রসাস্বাদের জন্য চোখে দেখার চেয়ে মনে ভাবাই শ্রেয়, এমন একটি ধারণাই অধুনা প্রচলিত। কিন্তু এমন ধারণা শেক্সপীয়রের নিজের মনে প্রশ্রয় পায় নি। পেলে বোধকরি নাটক লেখা তাঁর কোনোদিনই ঘটে উঠত না। কারণ তিনি নাটক লিখেছেন নেহাতই জীবিকার প্রয়োজনে এবং তাঁর নাটকের মঞ্চসাফল্যের ওপর এই প্রয়োজন বহুলাংশেই নির্ভরশীল ছিল। অবশ্য তাঁর যুগের মঞ্চ আমাদের যুগের থেকে অনেক পৃথক ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

সে যুগের মঞ্চ ছিল অনেকটাই খোলামেলা; দর্শকের অনেক কাছাকাছি। সামনে ও দুই পাশে কোনো পর্দার আয়োজন ছিল না; আঁকা দৃশ্যপটও অনুপস্থিত। স্ত্রীভূমিকায় স্বল্পবয়সী ছেলেরাই অভিনয় করত। দর্শকের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি। খোলা মঞ্চের তিনদিক ঘিরে তারা অভিনেতাদের অতি নিকটেই থাকত। মঞ্চের এই প্রকৃতি যে নাটকের চরিত্র ও অভিনয়ের রীতির ওপর সুগভীর ছাপ রেখেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পট পরিবর্তনের প্রচলন না থাকায় নাটকে আসত দ্রুতগতি; নায়িকার পুরুষবেশ ধারণও অতিপ্রচলিত ছিল এবং দৃশ্যপটের অনুপস্থিতির জন্য নাটকে কাব্য ও কল্পনার আশ্চর্য স্ফূর্তি সম্ভবপর হয়েছিল। সেদিনের প্রচলিত অনেকগুলি নাট্যদলের মধ্যে একটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন শেক্সপীয়র, প্রধানত নট ও নাট্যকার হিসাবে। দলের

সবচেয়ে খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন রিচার্ড বারবেজ। তাঁর দক্ষতা ছিল মুখ্যত ট্রাজিক চরিত্রাভিনয়ে। সেকালে অভিনয়দক্ষতা নি র্ভর করত বাচনভঙ্গি ও প্রত্যঙ্গ চালনার ওপর। নিরাবরণ মঞ্চের তিনদিকে বেষ্টিত দর্শককুলকে অভিভূত করতে আর কীই বা উপায় ছিল? এই ধরনের অভিনয়ে দর্শকমন কতদূর তৃপ্ত হত তার কিছুটা পরিচয় পাই Francis Meres-এর Palladis Tamia থেকে; নাট্যকার Ben Jonson প্রদত্ত শ্রদ্ধাগুলি থেকে এবং সহ-অভিনেতা Heminge ও Condell-এর সপ্রশংস উক্তি থেকে। ভাগ্যের আনুকূল্যও অবশ্য শেক্সপীয়র পেয়েছিলেন। অন্যান্য প্রতিভাধর নাট্যকারগণ একে একে গত হলেন। ফলে অতি অল্প দিনেই শেক্সপীয়র খ্যাতির বিজয়মাল্য অর্জন করেছিলেন। আর এক সময়ে তাঁর খ্যাতি যে সকলকে ছাড়িয়ে শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছিল সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

১৬২৩ খৃঃ পুস্তকাকারে শেক্সপীয়রের কয়েকখানি নাটকের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তেই থাকে এবং খ্যাতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পিউরিটান আমলে মঞ্চগুলির বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহতই থাকে। পিউরিটান আমলের কিছু আগে মঞ্চে তাঁর জনপ্রিয়তা Fletcher ও Massinger-এর কাছে অবশ্য কিছু ন্যূন হয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি বন্ধ হয় নি, বরং বেড়েই চলেছিল। প্রমাণ পাই D' Avenant, Suckling ও মিলটনের রচনায়। সুতরাং Restoration যুগে মঞ্চগুলি যখন আবার দরজা খুলল ও পূর্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত হল তখন শেক্সপীয়রের নাটকগুলির পুনরভিনয়ে মোটেই আশ্চর্য হই না। এই যুগে শেক্সপীয়রের প্রতি মনোভাবের সাক্ষাৎ পরিচয় পাই ড্রাইডেনের রচনায়। এই রচনাটিকে সমকালীন মনোভাবের নিখুঁত ছবি হিসাবে ধরাই সঙ্গত। একদিকে আছে Jonson ও Massinger ইত্যাদির তুলনায় শেক্সপীয়রের তথাকথিত ত্রুটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ অন্যদিকে Greek নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর তুলনা এবং নানা ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর প্রতিভা যে নাটকরচনার সব আইনকে অগ্রাহ্য করেই আপন মহিমায় ভাস্বর তার নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি।

আসল কথা Restoration যুগ শেক্সপীয়র সম্বন্ধে তার দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারে নি। একদিকে পাই Aristotle-এর রচনার বিকৃত

ব্যাখ্যানুযায়ী নাটকরচনার আইনগুলি শেক্সপীয়র মানেন নি বলে তাঁর রচনা সর্বাঙ্গসুন্দর নয় এমন একটি মনোভাব। অন্যদিকে রসের বিচারে তাঁর নাটক যে অপূর্ব সে কথাটিও কেউ অস্বীকার করতে পারেন নি। এই দ্বিধা ও সংশয়ের পেছনে যে সমকালীন রুচির পরিবর্তন সক্রিয় ছিল সেটি অবশ্যই স্মর্তব্য। নাটকের দর্শকের সংখ্যা রাজসভাকে কেন্দ্র করে যারা ঘুরে বেড়াত প্রায় তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নট ও অন্যান্য নাট্যকাররাও এদেরই অন্তর্গত ছিলেন। রাজার আনুকূল্যে এঁদের মধ্যে সমকালীন ফরাসী নাটকের আইন-মানা আদর্শই প্রচলিত ছিল এবং অন্যদিকে জীবনের গভীর সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে এক ধরনের তরল রসিকতাই তাঁদের বেশি রুচিকর ছিল। ফলে মঞ্চে শেক্সপীয়রের নাটকগুলিকে পরিবর্তিত আকারে উপস্থাপিত করা হল। এমনকি কিছু রসালো প্রেমকাহিনীও সংযোজন করা হল দর্শকমনকে তৃপ্ত করতে। কমেডির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল *The Merry Wives of Windsor.* ট্রাজেডির মধ্যে *Hamlet* ও *Othelo* ছাড়া অন্যগুলিকে পরিবর্তন করা হয়। Nahum Tate পরিবর্তন করলেন *King Lear*-কে, এবং ciffer করলেন *Richard III*-কে। মোটকথা শেক্সপীয়রের নাটক এই যুগের মঞ্চে রীতিমতো অভিনীত হয়েছে; দর্শকমনকে তৃপ্ত করেছে যদিচ নাট্যকাররা যুগের রুচির তাগিদে এই সব নাটকের অঙ্গচ্ছেদও করেছেন।

এই যুগের বিখ্যাত নট বেটারটন যিনি শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিগুলিতে অভিনয় করেই খ্যাতি সঞ্চয় করেছিলেন। এই যুগের মঞ্চেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। আলোর বন্দোবস্তের সঙ্গে এসেছিল মঞ্চের মাথায় ছাদ এবং আঁকা দৃশ্যপট। স্ত্রীভূমিকায় ছেলেদের বদলে মেয়েরাই অভিনয় করতে শুরু করলেন। বিখ্যাত মঞ্চগুলির মধ্যে নাম করা যায় Drury Lane ও Covent Garden-এর। এরা উভয়েই শেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ করে যথেষ্ট সুনাম কিনেছিল। এলিজাবেথীয় যুগের মঞ্চের সঙ্গে এদের পার্থক্য থাকলেও এলিজাবেথীয় যুগের Blackfriar-জাতীয় মঞ্চের সঙ্গেই এদের নিকট আত্মীয়তা। অর্থাৎ এই মঞ্চগুলিও কিছুটা খোলামেলা ও দর্শকের অনেক কাছাকাছি ছিল। ফলে নট ও দর্শকের মধ্যে সম্পর্ক আমাদের যুগের মতো সম্পূর্ণ সুদূর হয়ে যায় নি।

নট হিসাবে বেটারটন ছিলেন শক্তিমান ও জনপ্রিয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত

অভিনয়ধারা তাই প্রভাবিত করল উইলবাস, বার্টন বুথ, কলি সিবার ইত্যাদি অন্যান্য নটেদের। কিন্তু এই অভিনয়ধারায় কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম ও অন্যান্য আতিশয্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে কেমন প্রাণহীন ও আড়ষ্ট বলে বোধ হতে লাগল। এই আড়ষ্টতা ও প্রাণহীনতাকে দূরে সরিয়ে চরিত্রাভিনয়ে প্রাণের সাড়া আনলেন অভিনেতা গ্যারিক। তাঁর মৌলিকতা স্বাভাবিকতায়, আতিশয্যের বর্জনে। একাধারে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গ্যারিক ট্রাজিক চরিত্রাভিনয়ে নব্যরীতির প্রবর্তন করলেন; সাধারণের মধ্যে শেক্সপীয়র প্রতিভাকে বোধগম্য ও মর্মস্পর্শী করলেন আর বহু বিভিন্ন ও অনন্ত চরিত্রকে রূপায়িত করে আপন অভিনয়প্রতিভার বিরাট স্বাক্ষর রাখলেন। তাঁর কীর্তির মধ্যে শেক্সপীয়র লিখিত বহু নাটকের অভিনয়ের জন্য পুনরুজ্জীবনই শুধু পড়ে না, Restoration যুগের বহু অপকৃষ্ট পরিবর্তনের বর্জন ও তাদের মৌলিক ও যথাযথরূপে পুনরাবির্ভাবও তার মধ্যে গণ্য। অবশ্য একথা সত্য কিছু কিছু নাটককে খুশিমতো পরিবর্তন করতে তিনিও দ্বিধা করেন নি, কিন্তু তবু মঞ্চের মাধ্যমে শেক্সপীয়রকে অসাধারণ জনপ্রিয় করতে তাঁর দান যে অপরিসীম সে কথা স্বীকার করতেই হবে। অভিনয়ে মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখলেন অন্যান্য নটনটিদের প্রভাবিত করে। মেয়েদের মধ্যে শ্রীমতী ক্লাইভ, শ্রীমতী সিবার ও শ্রীমতী প্রিটচার্ড তাঁর কাছে ঋণী; যেমন ঋণী ম্যাকলীন যিনি শাইলককে ট্রাজিক চরিত্র হিসাবে উপস্থিত করলেন। হিণ্ডারসন বিখ্যাত হলেন ফলস্টাফের ভূমিকায় আর জন পামার নানা ছোট ভূমিকাকে অমর রূপ দিয়ে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করলেন।

গ্যারিক মঞ্চ হতে অবসর নিলেন ১৭৭৬ খৃঃ। তাঁর পরে তাঁর স্থান দখল করলেন জন ফিলিপ কেম্বল। প্রথমে Drury Lane ও পরে Covent Garden-এর ম্যানেজার হিসাবে তিনি হাত পাকিয়েছিলেন; এখন অভিনেতারূপে দক্ষ শিল্পীর আবির্ভাব ঘটল তাঁর মধ্যে। ইতিমধ্যে ১৮০৮-৯ সালে উপরোক্ত দুটি থিয়েটার গৃহই পুড়ে যাওয়ায় তাদের আবার নতুন করে বৃহৎ আকারে নির্মাণ করা হল। দর্শক সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধিই অবশ্য এর জন্য দায়ী। মঞ্চের এই আধুনিকীকরণ ও অতিবৃহৎ আকৃতি অভিনয়-রীতিতে অনিবার্য পরিবর্তন আনল।

কেম্বল ও তাঁর ভগ্নী শ্রীমতী সিডনস এই নব্য অভিনয়রীতির স্রষ্টা।

এই রীতির মুখ্য কথাটা ছিল অভিনয়ে কিছুটা সাদাসিধা ভঙ্গির প্রয়োজনের স্বীকৃতি ও কাব্যাংশগুলিকে উচ্চগ্রামে হলেও মন্থরগতিতে উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা। নতুন মঞ্চের আধুনিক চরিত্র এর জন্য দায়ী। এলিজাবেথীয় যুগ থেকে প্রচলিত মঞ্চের সামনেকার খোলা অংশটির পরিপূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছিল; দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে এসেছিল দীর্ঘ দূরত্ব। দূরস্থিত দর্শকদের তৃপ্ত করতে উচ্চভাষণের আতিশয্য তাই অনিবার্য ছিল। নব্য অভিনয়ধারায় কেম্বলকে ছাড়িয়ে গেলেন এডমাণ্ড কীন। তাঁর হাতে শেক্সপীয়র অভিনয়-পদ্ধতি রোমাণ্টিক চরিত্র অর্জন করল। অঙ্গভঙ্গি ও উচ্চভাষণের আতিশয্য, চোখধাঁধানো আলো, দৃশ্যপট ও সঙ্গীতের ব্যবহার, এবং নাটকে বর্ণিত কালের উপযোগী আবহাওয়াকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার দিকে ঝোঁক দেখা গেল। এই নতুন ঝোঁকের স্রষ্টা হিসাবে নাম করতে হয় চার্লস কীন ও ম্যাকরীডির। ১৮৫১ খৃঃ ম্যাকরীডির অবসর গ্রহণের পরে একচ্ছত্র আধিপত্য পেলেন চার্লস কীন। Princess Theatre মঞ্চে চলল নতুন রোমাণ্টিক অভিনয়কলার বিজয়াভিযান।

কীন তাঁর নতুন ধারার পরাকাষ্ঠা দেখালেন *The Winter's Tale*-এর অভিনয়ে। মঞ্চে উপস্থিত করলেন গান, নাচ, বিরাট বিরাট চোখ-ঝলসানো দৃশ্যপট। ডিয়োনিশাসের উৎসবকে জীবন্তরূপে উপস্থাপিত করার জন্য তিনশত নর্তকের দলকে মঞ্চে স্থাপন করে মঞ্চৈশ্বর্যের চূড়ান্ত দেখালেন। বাদ পড়ল যেটুকু সেটুকু নিঃসন্দেহেই মূল্যবান; সেটুকু শেক্সপীয়র লিখিত নাট্যবস্তু। চোখ ও কানকে তৃপ্ত করতে গিয়ে নাটককে কেটে ছিঁড়ে ও দৃশ্যগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করে শেক্সপীয়রকে এক অদ্ভুত আকারে উপস্থিত করা হল।

এই দুর্দিনে আলোর রেখা একেবারেই অনুপস্থিত ছিল না। ১৮৪৩ খৃঃ Drury Lane ও Covent Garden-এর মঞ্চাভিনয়ে একাধিপত্য শেষ হল। ফলে লণ্ডন শহরের কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার নাট্যশালাও মঞ্চাভিনয়ে অধিকার পেল। তাদের পক্ষে বৃহদায়তন মঞ্চদুটির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তারা দর্শকদের চমৎকৃত করার দিকে মন না দিয়ে শেক্সপীয়র-সৃষ্ট নাট্যবস্তুর যথাযথ উপস্থাপন ও আবেদনে আস্থা রাখলেন। ১৮৪৪ খৃঃ হে মার্কেট মঞ্চে বেঞ্জামিন ওয়েবস্টার যখন *The Taming of the Shrew*-কে উপস্থাপিত করলেন, তখন তাঁর নজর ছিল শেক্সপীয়র লিখিত আসল নাটকটিকেই উপস্থাপিত করা; তাই শুধু পর্দা ও স্থাননির্দেশক বোর্ড ব্যবহার

করে দৃশ্যপটকে সম্পূর্ণ বর্জন করলেন। ঠিক একই সময়ে Saddler's Wells-নামক মঞ্চের মালিক হলেন স্যামুয়েল ফেল্‌প্‌স। তিনি বিশ বছরের মধ্যে সাতখানি বাদে শেক্সপীয়রের সমস্ত নাটকেরই মঞ্চরূপ দিলেন। তাঁর প্রযোজনায় নাটকের আসল রূপ অবিকৃত রইল। মঞ্চৈশ্বর্যের আতিশয্য বর্জিত হল; দৃশ্যপটের ব্যবহার অনেক সরল ও সীমাবদ্ধ হল। অবশ্য এই ক্ষুদ্রাকার মঞ্চগুলি বৃহদায়তন প্রতিদ্বন্দ্বীদের পাশে নেহাৎ নিষ্প্রভ ছিল; ফ্যাশনদুরস্ত বৃহদায়তন মঞ্চে নব্য রোমান্টিকধারা কিন্তু অপ্রতিহত গতিতেই এগিয়ে চলল।

ভিক্টোরীয় যুগের শেষার্ধেও এই ধারারই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। চার্লস কীন মারা গেলেন ১৮৬৮ খৃঃ এবং তার দশ বছর পরে ফেল্‌পসেরও প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে শেক্সপীয়র অভিনয়ের একাধিপত্য পেলেন হেনরি আর্ভিঙ। তাঁর প্রযোজনায় শেক্সপীয়রের নাটক যে-রূপে আবির্ভূত হল তা বোধকরি কেম্বল ও কীনেরও স্বপ্নের অগোচর ছিল। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দর্শককে অভিভূত করা কাব্যের আবেদনে নয়, দৃশ্যের মনোহারিত্বে। যদিচ যা তিনি উপস্থিত করলেন তা অতীব মনোহারী তবু তা শেক্সসপীয়র রচিত নাটক নয়। শেক্সপীয়রের আবেদন তাঁর নাট্যকাব্যে, আর্ভিঙ প্রযোজিত নাটকের আবেদন চোখের তৃপ্তিতে। এই একই ঝোঁকের বশে হ্যামলেট নাটকের বিকৃতিসাধনেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর হাতে হ্যামলেট ভাবপ্রবণ প্রেমের ট্রাজেডিতে পরিণত হয়। কিছু লোক অবশ্যই এই বিকৃতিসাধনে সচকিত হয়ে উঠলেন। বেনসন ও উইলিয়ম পোয়েল শেক্সপীয়রের প্রতি তাঁদের কর্তব্যবোধের তাড়নায় স্বতই তৎপর হয়ে উঠলেন। বেনসন ১৮৮৩ খৃঃ ভ্রাম্যমান নাটুকে দলের সাহায্যে নতুন ধারার উজ্জীবনে হলেন একাগ্র; সযত্নে পরিহার করলেন মূল নাটকের অঙ্গচ্ছেদ। দৃশ্যপটের ব্যবহারেরও দেখালেন অসাধারণ পরিমিতিবোধ। পোয়েল ১৮৯৫ খৃঃ স্থাপন করলেন এলিজাবেথীয় স্টেজ সোসাইটি। তাঁর উদ্দেশ্য শেক্সপীয়র ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের নাটকগুলিকে দৃশ্যপট ও বিরতি ব্যতিরেকেই মঞ্চে উপস্থিত করা। তবে আর্ভিঙ-প্রযোজিত ধারা ১৯০৫ খৃঃ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অবসিত হয় নি। এবং বিরবোম ট্রি দেখা দিলেন আর্ভিঙের উত্তরসাধক হিসাবে। মঞ্চ প্রযোজনায় আর্ভিঙকেও পরাস্ত করলেন। *Antony and Cleopetra*-এর অভিনয়ে মঞ্চে আনলেন সত্য ঝরণা। বাস্তবতার দিক থেকে তা

উপভোগ্য হলেও এর প্রয়োজনে মূল নাটককে কেটে ছেঁটে নাট্যবস্তুকে ব্যাহত করে যে পদার্থ রূপায়িত করলেন সম্পাদকারের নাট্যরসিকের কাছে তা হাস্যকর বোধ হতে দেরী হল না। এই ধরনের নাট্যরূপে চোখের ওপর অতিআবেদনের ফলে নাটকের ভাষার ঐশ্বর্যের প্রতি মনোযোগ বিন্যস্ত করা খুবই সুদূর ও দুরূহ। আর্ভিঙ বা ট্রি-র মনোভাব বোধকরি এই ছিল যে শেক্সপীয়রের নাটক তো অল্পবিস্তর সকলেরই জানা; তার মৌল আবেদনের সঙ্গেও সকলেই পরিচিত। সুতরাং যা বাকী আছে তা হল বিরাট বিরাট দৃশ্যপটের সাহায্যে চক্ষুকর্ণের তৃপ্তিসাধন। অবশ্য এই ধরনের অতিবাস্তবতার বিরুদ্ধে রসিকরুচির বিদ্রোহ প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই দানা বেঁধে ওঠে। এই প্রসঙ্গে হারলি গ্র্যানভিল বার্কারের ভূমিকা অবশ্যই অগ্রগণ্য। তাঁর প্রযোজনা শেক্সপীয়র অভিনয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। বিগত একশত বছরের পর এই প্রথম তিনি শেক্সপীয়রের নাটককে বিনা পরিবর্তনে যথাযথভাবে উপস্থিত করলেন। বাদ দিলেন বিরাট মঞ্চৈশ্বর্যের অবতারণা ও অতিবাস্তবতার যথেচ্ছাচার। সামান্য কয়েকটি পটের সাহায্যে ও নাটকের ঘটনার দ্রুত স্রোতকে অব্যাহত রেখে দেখিয়ে দিলেন যে শেক্সপীয়র মঞ্চে অভিনয়ের জন্যই নাটক লিখেছিলেন। ল্যাম-কথিত উক্তি যে নেহাত ভ্রান্ত তা বুঝতে আর কারু বাকি রইল না।

বার্কার মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও শেক্সপীরীয় যুগের মধ্যে একটি আপোষ করেই সাফল্য লাভ করেন। তাঁর সম্বল ছিল কয়েকটি পরিচিত পট ও একবার মাত্র বিরতি। এই সামান্য সম্বলেই ওয়েস্ট এণ্ডে স্থাভয় মঞ্চে দর্শকমনকে জয় করে নিলেন। ফল হল অসামান্য। এই ধারা প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেই প্রসারলাভ করল ও পরে ওল্ড ভিক-এ এসে স্বপ্রতিষ্ঠ হল। লণ্ডন শহরে শেক্সপীয়র অভিনয়ের তীর্থক্ষেত্র তো এখন এই থিয়েটর। এই প্রসঙ্গে বেন গ্রিট ও লিলিয়ান ব্যেলিসের নেতৃত্ব স্বতই মনে আসে। অভিনয়ে বার্কার-প্রদর্শিত ঐতিহ্যই সুপ্রতিষ্ঠ। পরে আরও কত দল ও অভিনেতার আবির্ভাব ঘটেছে; কিন্তু পুরনো ঐতিহ্য নতুন পরীক্ষা-নীরিক্ষার পথ ধরেই প্রাগ্রসর। আধুনিক যুগের অভিনয়ে দুটি উপাদান বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথমত শেক্সপীয়রের নাটকের মূল রূপকে অবিকৃত রাখার দিকে সতর্ক দৃষ্টি। দ্বিতীয়ত তাঁর নাটকের মৌল আবেদনকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এলিজাবেথীয় যুগের মঞ্চের গঠন ও আবহাওয়ার প্রতি বিন্যস্ত মনোযোগ।

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ১১
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

সূচীপত্র

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

বিশ্বপরিস্থিতি তথা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র মাসিকপত্র

আন্তর্জাতিক

প্রধান সম্পাদক : বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ

প্রতি সংখ্যা—পঞ্চাশ নয়া পয়সা ; বার্ষিক চাঁদা—ছয় টাকা

ষান্মাসক চাঁদা—তিন টাকা

১৪৪, ধর্মতলা স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১৩

২৪-৩৯৩০

সম্পাদকীয়

জওহরলাল নেহরু

জওহরলাল নেহরু অকস্মাৎ অস্তমিত হলেন। ৭৪ বৎসর পূর্বে ইং ১৮৮৯-এর ১৪ই নবেম্বর এলাহাবাদে যে-জীবনের যাত্রারম্ভ আজ ইং ১৯৬৪-এর ২৭শে মে নয়াদিল্লীতে তার প্রিয় জন্মভূমি ও প্রিয় পৃথিবীর কাছ থেকে সে চিরবিদায় গ্রহণ করল।

ভারতবর্ষের মহাসৌভাগ্য যে, একই যুগে একই দেশে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও জওহরলালের আবির্ভাব ঘটেছে। আমাদের ইতিহাসে এমন যুগ আর কখনো আসে নাই, পৃথিবীর কয়টি দেশের ইতিহাসেই বা এমন যুগ বেশি আসে? তাই তো জওহরলালের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে শোকমুহ্যমান্ জাতির মনে আজ এতটা বেদনা ও বিহ্বলতা, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা। এ তো শুধু কোনো মহান্ জাতীয় নেতার বিদায় নয়, এ যে প্রতি ভারতবাসীর প্রিয়জনবিয়োগ, পৃথিবীর প্রতি মানুষের বন্ধুবিয়োগ, ভারতেতিহাসের সেই মহাযুগের অবসান যে-যুগ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সঙ্গে উদিত আর জওহরলালের সঙ্গে আজ অস্তমিত।

জওহরলালের জীবন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে যুগ-সত্যের উদ্‌যাপনের ইতিহাস, রাজনৈতিক গণনায় যা যুগ থেকে যুগান্তর যাত্রার ইতিহাস। এক জীবনের মধ্যেই একাধিক যুগের প্রয়াণ-প্রকাশ তাতে বিধৃত, আভাসিত ও বিকশিত।

জওহরলাল যখন রাজনীতিক ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের চক্ষের মোহাঞ্জন তখন পর্যন্ত মুছে যেতে-যেতেও মুছে যায় নি। এই সুদূর পূর্বকোণে দুঃসাহসী স্বদেশীদের বুকে যতই জেগে থাকুক আবেদন আর নিবেদনের বিরুদ্ধে বিরূপতা ও বিক্ষোভ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোহপাশে গান্ধীজীও তখন পর্যন্ত আবদ্ধ। এ ভালোই হয়েছিল যে, জওহরলাল এসেছিলেন হ্যারো-কেম্‌ব্রিজের প্রাণ-প্রাচুর্যপূর্ণ যৌবনের দৃষ্টি নিয়ে, অন্য দিকে

সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন স্বদেশীয় বিদ্রোহ-ঐতিহ্যের দৃপ্তি নিয়ে। ঔপনিবেশিক রাজনীতির হিসাব-করা কথা ও কর্মে তাঁদের কারোরই মুক্তিপ্রয়াসী মন তৃপ্তি পেতে পারে না। জওহরলালের ব্রিটিশ স্বাধীনতায় পরিপুষ্ট মন সে প্রসাদজীবী রাজনীতি সহজেই অগ্রাহ্য করে।

ভাগ্যের কথা, সেই 'আবেদন আর নিবেদনের' রাজনীতি ছাড়িয়ে ভারতীয় আন্দোলন যখন মুক্তি-সাধনার সক্রিয় আন্দোলনে রূপায়িত হয় সেই ঐতিহাসিক ক্ষণে জওহরলাল পেয়েছিলেন গান্ধীজীর সস্নেহ আশ্রয়। তাই গণ-আন্দোলনের পথে তিনি লাভ করলেন জাতির সাধারণ মানুষের প্রাণস্পর্শ। অনুভব করলেন তাঁদের বহু পুঞ্জিত দারিদ্র্যের দুর্বহতা, অধিকার-বঞ্চিত জীবনের শূন্যতা, অজ্ঞান-আবৃত চিত্তের অসহায়তা। বিলাসী পরিবারের বিলাতে-শিক্ষিত একমাত্র পুত্রের ভাগ্যে এই অভিজ্ঞতা না জুটলে তিনি ভারতবর্ষকে আপনার করতে পারতেন না। দেশ অর্থ যে দেশের মানুষ,—দেশকে ভালোবাসার অর্থ যে দেশের মানুষকে চেনা, জানা, সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে তাদের আপনার হয়ে ওঠা, সেবার মধ্য দিয়ে তাদেরকে আপনার করে পাওয়া,—রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশীব্রতের শিক্ষা পণ্ডিত জওহরলালের নিকট তখনো পৌছবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি তা আহরণ করেছিলেন গান্ধীজীর শিষ্যত্বে, গণ-আন্দোলনের কার্যগত সূত্রে, গ্রামে শহরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রাণের সংযোগে। এই ভারত-পরিচয়ই জওহরলালের 'ভারতাবিষ্কারের' বাস্তব ভিত্তি।

কিন্তু আরও ভাগ্যের কথা, ভারতৈতিহ্যের গান্ধীবাদী ভাবনার দ্বারা সীমিত না হয়ে জওহরলাল জাগ্রত হলেন যুগসত্যের ঐতিহাসিক চেতনায় ত্রিশের কোঠায়। আর তারই ফলে সেই যুগসত্যের আলোকে উপলব্ধি করলেন ভারতেতিহাসের মহদভিপ্রায়—মানব মহা-ইতিহাসে আধুনিক কালের জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, কর্মে ও প্রেমে, আদর্শে ও সাধনায় ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতেই তার মুক্তি-সাধনার সম্পূর্ণতা। এই চেতনা হ্যারো-কেম্‌ব্রিজের আধুনিক শিক্ষায় হয়তো দুর্লভ হত না। কিন্তু সেই শিক্ষায় দুর্লভ হত নিপীড়িত সকল মানুষের সকল সংগ্রামের মধ্যে এই ঐক্যবোধ, মানবেতিহাসের সেই সামগ্রিক চেতনা, মহামানবের সমাগত মুক্তিতে সেই গভীর আস্থা। পরাধীন জাতির মর্মবেদনা দিয়ে জওহরলাল পেয়েছিলেন সকল জাতির মুক্তিসংগ্রামের

সেই অখণ্ডতাবোধ। ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরতর উপলব্ধি থেকে পেয়েছিলেন 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' সেই মন্ত্র। আর, তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও সোভিয়েত রুশের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন সমাজতন্ত্রী জীবন-রূপায়ণের প্রত্যক্ষ শিক্ষা।

ত্রিশের কোঠা থেকে তাই ভারতীয় গণ-আন্দোলন ঐতিহাসিক নিয়মে গান্ধীপর্ব থেকে জওহরলালের পর্বে উত্তীর্ণ হতে থাকে। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে—পৃথিবী-জোড়া ফ্যাশিজম-এর তাণ্ডবকালে—রবীন্দ্রনাথের ভাব-সাধনা যেন রাজনীতিক কর্মযোগে অনুসৃত হবার আয়োজন হল। জওহরলালের সঙ্কল্পে রবীন্দ্র-গান্ধী-সমৃদ্ধ ভারতেতিহাসের সেই যুগের যেন এল সমন্বয়ের ক্ষণ। সে যুগের ইতিহাসে জওহরলালের এইটিই বিশেষ ভূমিকা—জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টির সঞ্চার, ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে সর্বদেশীয় মুক্তি-আন্দোলনের অঙ্গীভূত করে জানা, আর জাতীয় গণতন্ত্রী আন্দোলনকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের লক্ষ্যাভিমুখী করে গণ-আন্দোলন রচনা।

তারপর স্বাধীনতার প্রভাতে দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই জওহরলাল গ্রহণ করলেন স্বাধীন ভারত রূপায়ণের দায়িত্ব। তার অসম্পূর্ণতা অজ্ঞাত নয়। যে মহাজাতির দায় তিনি গ্রহণ করেন তাকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের নাতিবন্ধুর পথে বিপ্লবের ফলভাগী করা যেমন দুষ্কর, তেমনি সেই বিভেদবিচ্ছিন্ন দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে তাকে গণবিপ্লবের দুঃসাহসিক অভিযানে প্রণোদিত করাও দুঃসাধ্য। যুগের বাস্তব সাক্ষ্য মনে রেখেই ইতিহাস করবে জওহরলালের বিচার। ইতিহাস কি ভুলতে পারবে—পঞ্চাশ কোটি লোক নিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের এই বৃহত্তম আয়োজন মানবেতিহাসে কত অভিনব? পৃথিবীব্যাপী বিপর্যয়ের মুখে শত বিভাগ-বিদীর্ণ দেশে এই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পোষণ কী কঠিন সাধনা? বহু যুগের অচলায়তন পেরিয়ে এই সুপ্রাচীন দেশের দিকে দিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আরব্ধ নতুন উদ্যোগ, নতুন প্রকল্প, নতুন যোজনা কত বড় দুঃসাহসিক সূচনা? আণবিক শক্তিমত্ততার যুগে অস্ত্রহীন, দর্পহীন, জোট-নিরপেক্ষ এক নতুন শক্তির আন্তরাষ্ট্রিক আসরে বিশ্বমুক্তির ও বিশ্বশান্তির উদ্গাতারূপে সকলের স্বীকৃতিলাভ, প্রীতিলাভ, শ্রদ্ধালাভ—পৃথিবীর ইতিহাসে কত বড় সুসংবাদ?

আর সর্বশেষে, ইতিহাস কি একেবারে বিস্মৃত হবে রাজনৈতিক সমস্ত ধূলিধূসরতার, জয়-পরাজয়ের মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধেই মানুষের পরম পরিচয়? যে অম্লান জীবনবোধ সংগ্রামের শত উগ্রতার মধ্যেও মানুষে মানুষে সম্পর্ককে করেছে শোভন ও সুন্দর, শিল্পে-সাহিত্যে চিত্রে নৃত্যে নাট্যে—ক্রীড়াক্ষেত্রে, নর্ম-নিবেদনে—দেশের অন্তর্লক্ষ্মীকে সকল শ্রীতে, সকল শক্তিতে বিকশিত করা ছিল যাঁর স্বপ্ন, আকাশের তারায় আর শিশুর মুখে যিনি ধ্যানসুন্দর নেত্রে দেখতেন জীবন-লক্ষ্মীর রহস্যময় প্রকাশ—তাঁর পরিমাপ তো শুধু কর্মে নয়,—জ্ঞানে আর প্রেমেও। তিনি তো শুধু একটি পর্বের স্রষ্টা নন—সমস্ত ভুল আর সত্যসুদ্ধ তিনি একটি যুগের পরিচয়—যে-যুগ রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-জওহরলালের যুগ—ইতিহাসে মানবতার সাধনার একটি মহৎ অধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-জওহরলালের যুগ শেষ হল, ইতিহাসের শেষ নাই। যুগ-প্রয়াণের মধ্যেই থাকে তা উত্তরণের বাণী। জওহরলালের পরে আছে সেই নতুন যুগের উত্তরাধিকারী। কোনো একজন ভারতীয় নেতা নয়, ভারতের জনতা। নামহীন, যশোহীন, অভিমানহীন সেই জনসমাজই আজ জওহরলালের উত্তরাধিকারী—নতুন জওহরলাল, মহত্তর জওহরলাল, এ বাণীর সার্থক স্বাক্ষর: 'জওহরলাল অমর রহে'।

রইল সকল জওহরলালের উদ্দেশে 'পরিচয়'-এর সশ্রদ্ধ প্রণাম!

মনোজ রায়

গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২)

খ্রীষ্টীয় ইয়োরোপের বিজ্ঞানচিন্তার পটভূমিকাতেই গ্যালিলিও সম্পর্কিত আলোচনা স্বাভাবিক কারণে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই নবম ও দশম শতকে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম বিদ্যোৎসাহিতা থেকে বিজ্ঞান-প্রয়াসের বিচিত্র ধারাকে অনুসরণ করা যাক। তখন স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে আরব্যবিজ্ঞান ও সভ্যতা শিখরস্পর্শী। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার সমকালীন ইয়োরোপের সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের যা কিছু পরিচয় তা আরবী ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে। দ্বাদশ শতকে মুসলিম সভ্যতা যখন নিম্নগামী তখন খ্রীষ্টীয় ইয়োরোপে ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা প্রকাশ পায়। ইতিহাসের এই যুগসন্ধিতে প্রথম রেনেসাঁসের সূত্রপাত, ইয়োরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্ম। ইহুদী অনুবাদকদের কল্যাণে মুসলিম দুনিয়ার বিজ্ঞানচিন্তা প্রবাহিত হয় ইয়োরোপের দিকে। প্রাচ্য ও আরব্যবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ে অনুপ্রাণিত হবার পর এবার ইয়োরোপের দৃষ্টি পড়ে প্লেটো-অ্যারিস্টটল্ প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকগণের বিস্মৃত চিন্তাসম্পদে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের ধারণা হয়, এই চিন্তাসম্পদের মধ্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সত্যগুলি নিহিত রয়েছে ; নতুন কোনো সত্যের সন্ধানে মননশীলতার অবকাশ নেই। তবে খ্রীষ্টীয় ধর্মালোকে বিধর্মী পৌত্তলিক গ্রীকদের দর্শনচিন্তার সংস্কার-শুদ্ধির প্রয়োজন আছে। এই উপলব্ধি থেকেই ত্রয়োদশ শতকের পণ্ডিতীয় যুগে খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সমন্বয়। এর ফলে বিজ্ঞানচিন্তার স্বাধীনতা বিশেষভাবে সংকুচিত হয়। স্বাধিকারপ্রমত্ত ধর্মসংস্থা মানুষের আত্মিক পবিত্রতা সংরক্ষার দায়িত্ব ছাড়িয়ে তার মননশীলতার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। ফলস্বরূপ দেখি, পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতা এমন একটা স্থবির

যুগে এসে পৌঁছেছে, যেখানে প্রচলিত বিশ্বপরিকল্পনা দ্বিতীয় শতকের টলেমীর চিন্তাপ্রসূত, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যা চরম সত্য বলে গৃহীত তার মূর্তিমান বিগ্রহ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের অ্যারিস্টটল। পণ্ডিতদের কাছে আর্ষবাক্য শিরোধার্য, আর শিক্ষার্থীরা কিছুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ না করে প্রাচীন পুঁথিপত্রের বিষয়বস্তুকে নিঃশেষে কণ্ঠস্থ করতে যত্নবান। মননশীলতার এই সংকট থেকে মুক্তি, খ্রীষ্টীয় ধর্মদর্শন থেকে বিজ্ঞানচিন্তার বিচ্ছেদ, মধ্যযুগের সভ্যতার মন্দ-প্রগতিকে স্রোতস্বিনী করে তোলার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন হয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে। সাধারণভাবে রেনেসাঁস-অভিহিত এ যুগের স্বরূপ মুখ্যত বৈজ্ঞানিক ছিল না, সর্ববিষয়ে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা তার বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগীয় মানসক্রিয়ার মধ্যে একটা পণ্ডিতীয় আবরণ ছিল, সে আবরণ ধীরে ধীরে খুলে পড়তে থাকে। আপাত-অক্ষয় সনাতন ধারণাকে আশ্রয় করে নানা জল্পনাকল্পনা জড়ো না করে তার পরিবর্তে নতুন কোনো সত্যের সন্ধানে মানুষ মননশীল হয়ে উঠে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রণশিল্পের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবধারার দ্রুততর প্রসার সম্ভব হয়। একই সময়ে মধ্যযুগের ধর্মীয় ঐক্যে ভাঙন ধরে এবং সমকালীন মানসিকতা ভাবসংঘাত ও প্রগতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারা সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ দেখা যায়, অ্যারিস্টটলের চেয়ে প্লেটোর সমাদৃতি বাড়ে। লিওনার্দো দা ভিন্‌চির মতো অভিযাত্রী শিল্পীর বহুমুখী প্রতিভার ছোঁয়াচ লেগে নন্দনশিল্প থেকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সজীব হয়ে উঠে। লিওনার্দো ও বত্তিচেলি কর্তৃক অনুসৃত শিল্পরীতির উপজীব্য ছিল শারীর সংস্থান ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা। তার অনুষঙ্গ হিসেবে জ্যামিতির যে পরিশীলন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তা পরোক্ষভাবে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে। ইতালীয় রেনেসাঁসের মূল ধারা থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন এ যুগের অন্যতম চিন্তাবিদ কোপার্নিকাস। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সূর্যকেন্দ্রীয় বিশ্ব-পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।

রেনেসাঁস এবং তার পূর্ববর্তী যুগের বিজ্ঞান-প্রয়াস নানাদিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কারণ হিসেবে দুটি অভাবের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমত জ্ঞানের বিশেষ বিভাগে ব্যুৎপত্তি, দ্বিতীয়ত কোনো নতুন মত বা আবিষ্কারের সত্যতা ও প্রয়োগ-সম্ভাবনাকে বিচার করে দেখবার মতো সচেতন বিজ্ঞানীগোষ্ঠী। লিওনার্দো কাজ করেছেন সম্পূর্ণ একা, তাঁর উদ্‌ভাবিত তথ্য প্রকাশের জন্য তাঁকে কেউ প্ররোচনা বা উৎসাহ দেয় নি, যা নিউটন পেয়েছিলেন হ্যালীর

কাছ থেকে। ফলে অনেক নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার অবলুপ্তি ঘটেছে প্রকাশের আগেই। তদুপরি ছিল গোপনীয়তা রক্ষা এবং যে সকল সমস্যার সমাধান আপাত-দুঃসাধ্য তাকে ঘিরে একটা মরমিয়া রহস্য সৃষ্টি করার প্রয়াস। এর ফলে বিজ্ঞান জগতে ভাবধারার বিনিময় এবং বিভিন্ন ধারণার পারস্পরিক ব্যাহত হয়েছিল। পদার্থের ধর্ম ব্যাখ্যার জন্য গুরুত্ব (gravity) লঘুত্ব (levity) এই রকম কতকগুলি বিরুদ্ধ গুণ-প্রকাশক শব্দযুগল প্রচলিত ছিল। তাপ তখন পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত আলোচ্য বিষয় নয়, রাসায়নিক মৌল-বিশেষ। কিমিয়াবিদ্‌দের চিন্তাজগতে বস্তু আর বিমূর্ত একাকার হয়ে বিধৃত। সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে অ্যারিস্টটল যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সেগুলো ধর্মশাস্ত্রে ও খ্রীষ্টীয় ইয়োরোপের চিন্তাদর্শনে স্বতঃপ্রমাণ ও অখণ্ডনীয় সত্য বলে গৃহীত হয়েছিল। এই দৃঢ়মূল মতবাদের পরিপন্থী চিন্তা ও উদ্‌ভাবন ছিল অবাঞ্ছনীয়। মধ্যযুগের প্রান্তিক ভাগে ইয়োরোপীয় সভ্যতার দৈন্য ও শূন্যতার মধ্যে মুষ্টিমেয় একক কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল। এই সময় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে মরমীবাদের আচ্ছাদন থেকে মুক্তি দেবার নিরর্থক প্রয়াস দেখা যায়। এমনকি রেনেসাঁস যুগেও প্যারাসেল্‌সাস্‌, করডাস্‌ ও এগ্রিকোলার প্রথাবিরুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চা তেমন সার্থক হয় নি। বস্তুত আধুনিক কাল পর্যন্ত অ্যারিস্টটলপন্থীদের প্রবল বিরোধিতার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে প্রতিটি পদক্ষেপ করতে হয়েছে।

ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান-প্রগতির পরিপন্থী অ্যারিস্টটলীয় দর্শনে চতুর্দশ শতকের গোড়াতেই জঁ৷ বুরিদাঁ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তারপর রেনেসাঁস যুগে লিওনার্দো দা ভিন্‌চি অ্যারিস্টটলীয় বলবিদ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। কিন্তু তখন গণিত বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় রয়ে গিয়েছিল বলে, বলবিদ্যা ও উপস্থিতিবিজ্ঞানে নিহিত তত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী হয়েও লিওনার্দো কোনো গাণিতিক সূত্র রচনা করে যেতে পারেন নি।

ষোড়শ শতাব্দী চিন্তাধারায় মধ্যযুগীয়, তার দৃষ্টি প্রকৃতিবিমুখ, সনাতন চিন্তা ও ধর্মশাস্ত্রের প্রভাবকে অতিক্রম করে রেনেসাঁসের অঙ্কুরিত বিপ্লবকে সে খুব বেশি সার্থক করতে পারে নি ধর্মসংস্থার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ও নিপীড়নের জন্য। একটা আমূল পরিবর্তন ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব যে আসন্ন তার পূর্বাভাস দিয়ে ষোড়শ শতাব্দী শেষ হয়। রেনেসাঁস পেরিয়ে সপ্তদশ শতকে আধুনিক বিজ্ঞান যুগের শুরু। এই দুই শতাব্দীকে যুক্ত করেছে জিওর্দানো ব্রুনোকে জীবন্ত দগ্ধ করার কলঙ্ককাহিনী।

সপ্তদশ শতাব্দীকে চিন্তা ও কর্মে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁরা হলেন নেদারল্যাণ্ডের স্পিনোজা, ফ্রান্সের দেকার্ত ও প্যাস্কাল, জার্মানীর লাইবনিৎস্, হল্যাণ্ডের হাইজেন্স্, ইংল্যাণ্ডের হার্ভে, নিউটন ও হুক এবং ইতালীর গ্যালিলিও। এঁদের মধ্যে অনেকেই জন্মেছিলেন এবং লালিত হয়েছিলেন রেনেসাঁসের চিন্তাবিপ্লবের পরিবেশে। গ্যালিলিও গ্যালিলি, প্রাচীন তাস্কান্ প্রথা অনুসারে কুলনামের এই দ্বিত্ব। আজ থেকে চারশো বছর আগে, ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মিকেলাঞ্জেলোর মৃত্যু এবং শেক্সপীয়র ও গ্যালিলিওর জন্মের বছর। শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য জন্ম-মৃত্যুর আশ্চর্য যোগাযোগে অবিস্মরণীয়।

একটা সাঙ্গীতিক পরিবেশে প্রতিপালিত হওয়ার জন্যই বোধ হয় গ্যালিলিওর মধ্যে স্বাভাবিক সঙ্গীতপ্রবণতা জন্মেছিল; সেই সঙ্গে গণিতে অনুরাগ। যৌবনে তিনি দান্তের *Divina Commedia*-তে বর্ণিত Inferno সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে তার বৃত্তের পরিমাপের চেষ্টা করেন কবির বর্ণনা অনুসারে। এই প্রবল গণিত-অনুরাগের জন্য গ্যালিলিওর চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ অসমাপ্ত থেকে যায়। এই সময়ই দোলকের ধর্ম নিয়ে পরীক্ষার মধ্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ। পিসা ক্যাথিড্রালে একদিন নীরস ধর্মোপদেশ শুনতে শুনতে ক্লান্ত গ্যালিলিও ঝোলানো দীপাধারের দোলন লক্ষ্য করেছিলেন। এ কাহিনীতে অতিরঞ্জন আছে কি নেই তা অবান্তর। হয়তো অনেকেই ধর্মোপদেশে ঐকান্তিক না হয়ে সেদিন অলস দৃষ্টি ফেলেছিলেন দোদুল্যমান দীপাধারের দিকে। কিন্তু গ্যালিলিও ঘড়ির বিকল্প হিসেবে নাড়ী স্পন্দনের সাহায্যে দোলনের বিস্তার ও দোলনকালের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের যে চেষ্টা করেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লক্ষ্য করেন, দোলন সংকুচিত বা প্রসারিত যাই হোক না কেন, দোলনকাল সমান। এই আবিষ্কারকে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন নাড়ীর স্পন্দন মাপবার জন্য সময়-নিরূপক যন্ত্রের পরিকল্পনায়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এই যে দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতন মানসতার পরিচয় গ্যালিলিও দিয়েছিলেন তা ষোড়শ শতকে সম্পূর্ণ নতুন।

গাণিতিক প্রতিভা এবং পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণে স্বাভাবিক প্রবণতা ও নৈপুণ্যের স্বীকৃতিতে তরুণ গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ লাভ করেন। এখানেই বস্তুর পতন ও গতি-সম্পর্কিত গবেষণার সূত্রপাত হয়। প্রতিপদে তিনি পূর্বাচার্যদের মতে সন্দেহ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, নিজের প্রত্যেকটি

সিদ্ধান্তের অনুকূলে পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের সন্ধান করেছেন। তাঁর কার্য-কলাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রমশ বিরূপ হয়ে উঠেন। যে অ্যারিস্টটলীয় মতবাদ স্বতঃপ্রকাশ ও ধ্রুবসত্য হিসেবে স্বীকৃত তার সমালোচনায় গ্যালিলিওর অসংযত মুখরতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব, সর্বোপরি, জিওভ্যানি দ্য মেদিচি কর্তৃক উদ্‌ভাবিত এক অকেজো পাম্পযন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিন্দাসূচক মন্তব্যের ফলে পিসার পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে উঠে। তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পর যখন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্নিয়োগের সময় আসে তখন গ্যালিলিও সেখানে অবাঞ্ছিত। সঙ্গে সঙ্গে স্বাগত আহ্বান আসে পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

সমকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলারকে লিখিত পত্র থেকে আভাস পাওয়া যায়, ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোনো এক সময়ে গ্যালিলিও টলেমীর ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ বর্জন করে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদে বিশ্বাসী হন। প্রকৃতপক্ষে গ্যালিলিওর জ্যোতিষীয় গবেষণা শুরু হয় ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে, সার্পেণ্টারিয়াস তারামণ্ডলে একটি নতুন নক্ষত্রের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে। কেপলার ও গ্যালিলিও নিঃসংশয়ে বলেন, নতুন নক্ষত্রটি সেই জ্যোতিষ্কলোকের অধিবাসী, যেখানে অ্যারিস্টটল-টলেমীর জ্যোতিষ অনুযায়ী নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু নেই। এর বছর তিরিশেক আগে ক্যাসিওপিয়া তারামণ্ডলে দেখা নতুন নক্ষত্র সম্পর্কে টাইকো ব্রাহে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। প্রাচীন জ্যোতিষীয় মতবাদের অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করে গ্যালিলিও প্রকাশ্যভাবে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ সমর্থন করেন।

দূরবীক্ষণের উদ্‌ভাবক হান্‌স্ লিপেরশে কখনো আকাশ-সন্ধানের কথা ভাবেন নি। লিপেরশের দূরবীক্ষণ সম্পর্কে জনশ্রুতি শুনেই গ্যালিলিও ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুরূপ একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। দূরবীক্ষণের সামরিক উপযোগিতার সম্ভাবনায় যখন ভেনিস দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা উত্তেজিত, লিপেরশে যখন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য মোটা পারিতোষিকের প্রত্যাশী, তখন গ্যালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ স্থাপন করেন আকাশের দিকে। আকাশ জরিপের কোনো আগ্রহ সে যুগের বিদ্বৎসমাজে দেখা যায় নি। গ্যালিলিওর সহকর্মিগণ তাঁর দেবতাহীন ঐন্দ্রজালিক নলের ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে

দৃষ্টি দিতে রাজী হন নি। এই সনাতনপন্থীরা বিশ্বাস করতেন, সূর্য, চন্দ্র, আর পাঁচটি গ্রহ মিলিয়ে জ্যোতিষ্কের সংখ্যা সাত, এই পবিত্র সংখ্যার বাইরে আর কোনো জ্যোতিষ্কের কল্পনাই করা যায় না।

দূরবীক্ষণের সাহায্যে গ্যালিলিও যে-সব আবিষ্কার করেন তা সনাতন-পন্থীদের বিশ্বাসকে প্রচণ্ড আঘাত করে। দেখা যায়, তাঁদের কল্পনার পবিত্র সংখ্যা ছাড়িয়ে আকাশমণ্ডপে বহুতর জ্যোতিষ্কের সভা—অনেক নতুন নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথে আকীর্ণ সংখ্যাতীত তারকাপুঞ্জ, বৃহস্পতির উপগ্রহ। প্রাচীন জ্যোতির্ষীয় ধারণায় যে চাঁদ ছিল একটি নিষ্কলঙ্ক স্বর্গীয় গোলক, দেখা যায় তা পৃথিবীর মতোই অসমতল। গ্যালিলিও শনিবলয়ের অংশবিশেষ, সৌরকলঙ্ক, সৌরাবর্তন ও শুক্রকলা আবিষ্কার করে কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। দূরবীক্ষণের সাহায্যে জ্যোতিষ্কলোকের সন্ধানের ফলাফল আংশিক প্রকাশিত হয় ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে *Sidereus Nuntius* (তারকা বার্তা) শীর্ষক পুস্তিকায়। গ্র্যাণ্ড ডিউক কসিমো দি মেদিচিকে উৎসর্গীকৃত মাত্র চব্বিশটি পাতা, তার মধ্যে অসীম জ্যোতিষ্কলোকের কত রহস্য বাঙ্ময়। প্রাচীন বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করে গ্যালিলিও এই যে আকাশের সীমাকে লক্ষগুণ প্রসারিত করেন, সূর্যকে ঘিরে গ্রহের, গ্রহকে ঘিরে উপগ্রহের পরিক্রমণ, তাঁর জ্যোতির্ষীয় পর্যবেক্ষণের এই যে সংশয়াতীত সিদ্ধান্ত তা কোপার্নিকাস নামীয় এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বিশ্বচিত্রের সমর্থন জুগিয়েছিল শুধু তাই নয়, এই সিদ্ধান্ত আঘাত করেছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের মূলে। অথবা বলা যায় ধূলিসাৎ করেছিল মানুষের স্বর্গলোকের কল্পনাকে, স্বর্গীয় আলোকে ভাস্বর চাঁদগ্রহের পবিত্র স্বপ্নকে; সংক্ষেপে The heavens are the heavens of the Lord; But the earth hath he given to the children of men এই ভ্রান্তিবিলাসকে। *Sidereus Nuntius*-এ আলোচিত তথ্যসমূহের সঙ্গে কোপার্নিকাসের চিন্তাধারার কোনো যোগাযোগের কথা স্পষ্ট করে উল্লিখিত হয় নি। অ্যারিস্টটল-টলেমীয় বিশ্বপরিকল্পনার অলীকতা সম্পর্কে ইঙ্গিত যে বিতর্কের সূত্রপাত করে তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল চাঁদ, অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ, এমনকি নক্ষত্রলোকে প্রাণের সম্ভাবনার প্রশ্ন। আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বকে ঈশ্বরের মহত্তম লীলা বলে মনে করা হয়; অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও অনুরূপ প্রাণের অভিপ্রকাশ আরো অনেক প্রাণময় জগতের থাকতে পারে, এই সম্ভাবনা তো স্রষ্টা ঈশ্বরের মহিমাই ব্যক্ত করে।

সেদিন কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস ভেঙ্গে পড়বে এই আশঙ্কায় গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ হয়েছিল। অবিশ্বাস, পরিহাস, অখ্যাতিকর বিবৃতি, শেষ পর্যন্ত কোপার্নিকাসের গ্রন্থ থেকে উদধৃতি। প্রতিপক্ষ বলে : "কোপার্নিকাসের যুক্তি সমগ্রভাবে সৌরজগতের গতিবিধির আঙ্কিক প্রকাশের সহায়ক মাত্র ; পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ করে এ কথা স্বীকার করা যায় না।" তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোপার্নিকাসের *De Revolutionibus Orbium Coelestium* গ্রন্থের একটি উক্তির প্রতি "এই গ্রন্থের প্রকল্পগুলি সত্য, এমন নাও হতে পারে। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলে, এমন কোনো গণনা যদি সম্ভব হয় তবেই যথেষ্ট। আমরা নিঃসন্দেহে এগুলোকে পুরনো অন্যান্য অবাস্তব প্রকল্পের পর্যায়ে ফেলতে পারি।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থটির মুদ্রনকালে কোপার্নিকাসের অজ্ঞাতসারে তাঁর বন্ধু ওসিয়ান্ডার লুথারপন্থীরা বিক্ষুব্ধ হবে আশঙ্কা করে ভূমিকায় এই জাতীয় উক্তি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাছাড়া কোপার্নিকাসের প্রস্তাবিত নামের সঙ্গে Orbium Coelestium শব্দ দুইটির সংযোজনও ওসিয়ান্ডারের কীর্তি। তাঁর এই চাতুরীর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র গ্রন্থটি টলেমীর অনুকরণে লেখা নির্দোষ রচনা, এমনি ধারণার সৃষ্টি করা। গ্রন্থের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে প্রচ্ছন্ন রাখার এই প্রয়াস সার্থক হয়েছিল।

কেপ্‌লার প্রাগে প্রকাশিত *Siderius Nuntius*-এর পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায় গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে উচ্চারিত সব আপত্তি খণ্ডন করেন। গ্যালিলিও নিজে বিরুদ্ধবাদীদের উত্তরে এবং কোপার্নিকাস মতবাদের সমর্থনে ছটি পত্র প্রকাশ করেন (Istoris e Dimostrazioni intorno alle Macchie Solari).

সে সময় ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্ররূপে ফ্লোরেন্স পরিচিত। সেখানকার অ্যাকাডেমীর সদস্য হয়ে গ্যালিলিও ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে আসেন কসিমো দি মেদিচির চেষ্টায়। অ্যাকাডেমীতে প্রদত্ত বক্তৃতায় গ্যালিলিও কোপার্নিকাস-মতবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। তিনি অ্যারিস্টটলবাদীদের বলেন, "যেখানে অ্যারিস্টটল ছিলেন চক্ষুকর্ণের অধিকারী এক মানুষ, সেখানে গ্যালিলিওর রয়েছে অতিরিক্ত এক দূরবীক্ষণ।" তিনি আরো বলেন যে তাঁর মতবাদ অশাস্ত্রীয় নয় ; কারণ প্রকৃতির যে নিয়ম অনিবার্য, তা ঈশ্বরের সৃষ্টি।

যুক্তিতর্কে পরাস্ত ও ক্ষুব্ধ টলেমীপন্থী জ্যোতির্বিদগণ সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদে গ্যালিলিওর অধার্মিক আনুগত্যের প্রতি পোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পোপ পঞ্চম পলের আহ্বানে রোমে গিয়ে গ্যালিলিও তাঁর জ্যোতির্বীয় ধারণা ও

আবিষ্কারের কুশলী ব্যাখ্যায় প্রতিপক্ষের চক্রান্ত ব্যর্থ করেন। পোপের খাস দরবারে অর্জিত এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যে, উপরন্তু কার্ডিনাল বার্বেরিনোর সৌহৃদ্যে গ্যালিলিওর মনে একটা স্বস্তিবোধ জাগে। তিনি গ্র্যাণ্ড ডাচেস্ ক্রিষ্টিন্ ও বন্ধু ক্যাস্তেল্লিকে লেখেন যে শাস্ত্রীয় উক্তির সঙ্গে সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের সঙ্গতিসাধন করা সম্ভব। এই চিঠি দুইটিকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সমাজ ও স্বার্থান্বেষীরা গ্যালিলিও-নিগ্রহের যে ষড়যন্ত্র করে তার অন্যতম নায়ক পিসার আর্চবিশপ। পোপের নির্দেশে গ্যালিলিও ইনকুইজিশনের সামনে উপস্থিত হন ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদ্ বেলারমিন্ শপথ করান শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে দিয়ে তিনি যেন কথায় বা লেখায় সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ মনন, সমর্থন বা প্রচার না করেন। এর পক্ষকাল পরে পোপ সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের সমর্থক সর্ববিধ প্রয়াস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশের পর এই মতবাদে ধর্মসংস্থার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নি; অসহিষ্ণু হয়ে এ রকম বিধিনিষেধ প্রয়োগ করে নি (কোপার্নিকাসের মতবাদে বিশ্বাসী হওয়াই ব্রুনোর একমাত্র অপরাধ ছিল না)। ধর্মসংস্থা উদার ছিল, অন্তত কোপার্নিকাসের মতবাদ সম্পর্কে, এ রকম ধারণা করা ঠিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ যে ভাবে উপস্থাপিত করা হয় তাতে টলেমীপন্থী জ্যোতির্বিদ ও ধর্মসংস্থা বিপন্ন বোধ করে নি। এ-প্রসঙ্গে *De Revolutionibus* গ্রন্থের প্রকাশে ওসিয়ান্ডারের ভূমিকা কতটা দায়ী তা উল্লেখ করা হয়েছে। শাণিত যুক্তিতর্ক ও সংশয়াতীত প্রমাণের অভাবে কোপার্নিকাসের মতবাদ বরং বিমূর্ত, দুর্বোধ্য ও অগ্রাহ্য মনে হয়েছিল।

ধর্মসংস্থার সতর্কবাণীতে গ্যালিলিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তা হলে ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে *Il Saggiatore* প্রকাশ করবার মতো দুঃসাহস তাঁর হত না। অবশ্য প্রায় একই সময় কার্ডিনাল বার্বেরিনো পোপের পদে অভিষিক্ত হন। তাঁর সৌহৃদ্যের কথা স্মরণ করেই গ্যালিলিও নির্ভয়ে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন *Dialogue on the Two Chief Systems of the World.* কোপার্নিকাসের মতবাদকে উপজীব্য করে একটা মনোজ্ঞ বিজ্ঞান-দার্শনিক আলোচনা, সম্ভবতঃ ইয়োরোপে প্রকাশিত প্রথম লোকরঞ্জক বিজ্ঞান-সাহিত্য। স্যালভিয়াতি (কোপার্নিকান জ্যোতিষে বিশ্বাসী), সাগ্রেদো (নিরপেক্ষ) এবং সিম্প্লিসিয়াস (অ্যারিস্টটল-টলেমীর সমর্থক), এই তিন

চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে গ্যালিলিও কী প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন তা সহজেই অনুমেয়। ল্যাটিনের পরিবর্তে ইতালীয় ভাষায় লেখা এই রচনায় তিনি কেপলারের গাণিতিক যুক্তির অবতারণা না করে সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের দার্শনিকসুলভ বর্ণনা দেন। এই গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সূর্যকেন্দ্রীয় ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং গণিত-অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের কাছে, পৃথিবীই মহাবিশ্বের মধ্যমণি—অ্যারিস্টটল-টলেমীর এই ভূকেন্দ্রীয় ধারণার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করা। উপবৃত্তের পরিবর্তে নিখুঁত বৃত্তপথে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যপ্রদক্ষিণ করে, এরকম ত্রুটি সত্ত্বেও যুক্তিবিন্যাসের নৈপুণ্যে গ্যালিলিওর উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

বিশ্ব পরিকল্পনায় পৃথিবী ও সূর্যের আপেক্ষিক মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা ছাড়াও *Dialogue* গ্রন্থের একটা গভীরতর দার্শনিক বক্তব্য ছিল। বস্তুজগতের আপাত-সম্পর্কহীন ঘটনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঐক্যের কথা গ্যালিলিও উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেন। অ্যারিস্টটলীয় দর্শন অনুসারে, পৃথিবীর বুকে আর অপার্থিব জ্যোতিষ্কলোকের স্বর্গীয় পরিবেশে যা ঘটছে তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই; একই নিয়মে তারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। 'পার্থিব' আর 'স্বর্গীয়' পদার্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক মধ্যযুগীয় দর্শনের একটা বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ। এই বিতর্ক কয়েক শতাব্দী ধরে চলেছিল। 'পার্থিব' আর 'স্বর্গীয়' এই বিভেদ-কল্পনায় সম্ভবতঃ ব্রুনোর আগে আর কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেনি। 'স্বর্গীয়' পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে কোনো আলোচনা না করলেও যে বল ও গতিবিজ্ঞানের নিয়ম পার্থিব ঘটনার ব্যাখ্যায় খাটে তা জ্যোতিষ্কলোকেও সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, গ্যালিলিও এ সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন।

কথোপকথনের ছদ্মাবরণ ভেদ করে গ্যালিলিও-বিদ্বেষীরা *Dialogue* গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি পোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেরী করেনি। রোমের ইনকুইজিশন পূর্বেকার সতর্কবাণী উপেক্ষা করার অভিযোগে গ্যালিলিওর বিচার করে। গ্যালিলিও অপরাধ স্বীকার করেন। ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে নিশ্চয়ই মার্জনা মিলত না, হয়তো বা ব্রুনোর মতোই চরম শাস্তি পেতেন। সত্তর বছর বয়সের ক্ষীণদৃষ্টি বার্ধক্যে ঔদ্ধত্য থাকে না, থাকে ধর্মের প্রতি আনুগত্য। গ্যালিলিওর ধর্মবিশ্বাস ছিল গভীর। তিনি ধর্মসংস্থাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করতে চান নি, যদিও বিজ্ঞানের উপর আরোপিত ধর্মশাস্ত্রের

বিধিনিষেধ সম্পর্কে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল।* স্বীয় মতবাদ প্রত্যাহার করায় এবং সদাচরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে তদুপরি কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যস্থতায় আজীবন কারাবাসের লঘুদণ্ড হল গ্যালিলিওর। অনেকে মনে করেন, পৃথিবীর আহ্নিক গতির সমর্থনে অকাট্য চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারলে ইনকুইজিশনের দণ্ড লঘুতর হত। এমন প্রমাণ ছিল চোখের সামনে, পিসা ক্যাথিড্রালের দোদুল্যমান দীপাধার। উনবিংশ শতাব্দীতে পারী প্যান্থিয়নের দোলকে ফুকো আহ্নিক গতির প্রমাণ পেয়েছিলেন। ইনকুইজিশনের সতর্ক প্রহরায় আর ক্ষীয়মান দৃষ্টি নিয়ে গ্যালিলিও জীবনের প্রান্তিক নয় বছর অতিবাহিত করেন। এই সময় দেকার্ত আর মিলটনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। অনেক শিল্পী সাহিত্যিককে অনুপ্রাণিত করেছিল এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকার। গ্যালিলিওর মৃত্যুর ষোল বছর পরে মিল্‌টন্‌ *Paradise Lost* লিখতে শুরু করেন, ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রচনা সম্পূর্ণ হয়। এই গ্রন্থের বিশ্বতত্ত্ব টলেমীয়, কিন্তু মিল্‌টনের মনে অনেক বছর আগের দেখা কোপার্নিকাসবাদী গ্যালিলিওর স্মৃতি সজীব ছিল। অনুবাদের ব্যর্থতার আশংকায় মূল থেকে উদ্‌ধৃত করা হল :

the moon, whose orb
Through optic glass the Tuscan artist views
At evening, from the top of Fesole,
Or in Valdarno, to descry new Lands,
Rivers, or mountains, in her spotty globe.

বলবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণা

কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় বিশ্বপরিকল্পনা সমর্থন করার জন্য ধর্মসংস্থার সঙ্গে যে বিরোধের সৃষ্টি হয় তার নাটকীয়তা এবং শেষ জীবনের ট্রাজেডি গ্যালিলিওর জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণাকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠা অহেতুক অপাত্রে বর্ষিত এমন কথা বলছি না। কিন্তু এ গবেষণার

* Reasons are doubtless at hand for the rejection of any established religious formula, but it would be perverting the historical record to ascribe the disire to do so to Galileo or to men of science in general.—Singer.

সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ইতিহাস মনকে এত বেশি আলোড়িত করে যে বলবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণায় গ্যালিলিওর যে মহত্তর প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে, তা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় না। এ-প্রসঙ্গে লাগ্রাঁজ লিখেছেন, "বৃহস্পতির উপগ্রহ শুক্রকলা, সৌরকলঙ্ক ইত্যাদি আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন ছিল দূরবীক্ষণের আর প্রগাঢ় অভিনিবেশের। কিন্তু চোখের সামনে প্রতিনিয়ত যা ঘটছে এবং যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দার্শনিকগণ বারবার ব্যর্থ হয়েছেন তার মধ্যে নিহিত প্রকৃতির নিয়ম উদ্‌ঘাটন করতে অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন।"

লিওনার্দো ও গ্যালিলিওর আরো অনেক পূর্বসূরী পড়ন্ত বস্তুর ক্রমবর্ধমান গতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। কী মাত্রায় এবং কী নিয়মে বস্তু ত্বরিত হয় গ্যালিলিও তা নির্ণয় করেন। সেই সঙ্গে তিনি গতিবেগ সময়ের আনুপাতিক এই অনুমানের ভিত্তিতে সময় ও অতিক্রান্ত দূরত্বের মধ্যে আঙ্কিক সম্পর্ক স্থির করেন। নির্ভুলভাবে বস্তুর দ্রুত পতনের সময় নির্ণয় করা কঠিন ছিল বলে নত সমতলের উপর অনুরূপ পরীক্ষা করা হয়। সেখানে বস্তুর বেগ মন্দীভূত হওয়ায় জলঘড়ির সাহায্যে সময় নিরূপণ সম্ভব হয়েছিল। এই পরীক্ষায় উল্লিখিত আঙ্কিক সম্পর্কের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্ক থেকেই ত্বরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার উদ্‌ভব। গ্যালিলিও বল সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন করেন। তিনি বলেন, বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল ত্বরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বেগের সঙ্গে নয়। যে বস্তুর উপর কোনো বল কাজ করছে না তার কোনো অবস্থান্তর ঘটবে না। বস্তুর এই জড়বাদ বা principle of inertia সম্পর্কে গ্যালিলিও বিশদভাবে আলোচনা করেন নি। কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও মন্তব্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বস্তুর গতি সম্পর্কে গ্যালিলিওর এই ধারণাগুলি দেকার্ত ও হাইজেন্‌সের মানসজগতে লালিত হয়। তারপর ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নিউটনের *Principia* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ তিনটি সূত্রের মধ্যে সেগুলি পূর্ণতা লাভ করে।

তরুণ বয়সে দোলকের গতি ও বস্তুর পতন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের মধ্যে গ্যালিলিওর বিজ্ঞান-প্রয়াসের সূচনা। এই সূচনাপর্বেই অ্যারিস্টটলীয় বলবিদ্যায় তাঁর সন্দেহ জাগে। এমনি সন্দেহ জেগেছিল লিওনার্দো দ্য ভিন্‌চির। কিন্তু গ্যালিলিওর স্বকীয়তার প্রকাশ যথাসম্ভব সুষ্ঠু পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের সাহায্যে স্বীয় মতের সমর্থনে প্রমাণ সংগ্রহের মধ্যে। তিনি পরীক্ষার সঙ্গে একটা

সহজ অথচ কার্যকরী আঙ্কিক পদ্ধতির সমন্বয় করেছিলেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিতর্কে এ ছিল বড়ো হাতিয়ার। তিনি অ্যারিস্টটলীয় পদার্থবিজ্ঞানকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তার মূল সূত্রগুলিতে পৌঁছে তাদের গাণিতিক আলোচনার চেষ্টা করতেন। এমনিভাবে তিনি বহুবার স্বীকৃত ধারণার অলীকতা এবং স্বীয় মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসঙ্গত বস্তুর পতন-সম্পর্কিত পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। এর ফলে ভারী বস্তুর পতন হাল্কা বস্তুর তুলনায় দ্রুততর, এই অ্যারিস্টটলীয় ধারণা ধূলিসাৎ হয়। গ্যালিলিও লক্ষ্য করেন, কোনো নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে ছেড়ে দেওয়া বিভিন্ন ওজনের দুটি বস্তুখণ্ডের পতনকাল প্রায় সমান। সামান্য যা তফাৎ তার উৎস বাতাসের বাধা। পিসার হেলানো মিনার থেকে গ্যালিলিও আলোচ্য পরীক্ষা সম্পাদন করেছিলেন বলে যে কাহিনী প্রচলিত তা হয়তো অমূলক। অনেকের মতে, সাইমন স্টেভিন্ গ্যালিলিওর আগে অনুরূপ পরীক্ষা করেছিলেন। এ মতানৈক্যে গ্যালিলিওর কৃতিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। বিভিন্ন বস্তুখণ্ডের পতনকালের মধ্যে যে সামান্য বৈষম্য তার জন্য পতনমাধ্যমের বাধাই যে দায়ী গ্যালিলিওর এই ধারণা সমর্থিত হয় জলের মধ্যে অনুরূপ পরীক্ষায়। এ থেকে যে অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় তা হল, এমন কোনো মাধ্যম যদি থাকে যা বস্তুর পতন রোধ করবে না, তবে নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে নিক্ষিপ্ত পাখীর পালক ও সীসকখণ্ড একই সঙ্গে ভূমি স্পর্শ করবে। গ্যালিলিওর এই কাল্পনিক মাধ্যম হল সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য পরিবেশ। দুর্ভাগ্যবশত 'বায়ুশূন্যতার বিভীষিকা' (horror vacui) সম্পর্কে তৎকালীন কুসংস্কারের প্রতিকূলে এ সম্পর্কে বহুদিন কোনো পরীক্ষা হয় নি। টরিচেলি কর্তৃক শূন্যতাসৃষ্টির পর গ্যালিলিওর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়।

জীবনের প্রান্তিক দিনগুলিতেও গ্যালিলিও গতিবিজ্ঞানের চর্চায় মনোনিবেশ করেন। প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ প্রকাশে বাধা থাকায় গোপনে পাণ্ডুলিপি ইতালীর বাইরে নিয়ে আসেন প্রিন্স মাতিয়া দি মেদিচি। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লাইডেন থেকে যখন গ্যালিলিওর সারা জীবনের পরিণত বিজ্ঞানচিন্তা প্রকাশিত হয় তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত। *Mathematical Discourses and Demonstrations Concerning Two New Sciences* (Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno a due nuove Scienze) গ্রন্থের রচনাশৈলী *Dialogue*-এর মতো। স্যালভিয়াতি, সাগ্রেদো এবং

সিমপ্লিসিয়াসের কথোপকথনের মাধ্যমে বস্তুর গতি ও বলবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

নিউটনীয় সূত্রের উপকরণ

Discourses-এর পাণ্ডুলিপি শেষ হলে বল ও গতির পারস্পরিক নির্ভরতা সম্পর্কে গ্যালিলিও যে গবেষণা শুরু করেছিলেন তা অসমাপ্ত রয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর পরিপূরক হিসেবেই যেন নিউটনের জন্ম ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে। সপ্তদশ শতকের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিপ্লব দিক পরিবর্তনের মুখে। গ্যালিলিও কেপলারের পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-প্রকল্প তখনো স্বীকৃতিসাপেক্ষ; দেকার্ত, বয়েল হাইজেন্স্ সনাতন চিন্তাধারাকে তেমন প্রভাবিত করতে পারেন নি। গ্যালিলিওর অনেক অসম্পূর্ণ চিন্তার উপকরণ নিউটনের *Principia*-কে সমৃদ্ধ করেছে; তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছি আগে। যদি সবকিছু বাহ্যিক বাধা দূর করা যায় তবে অনুভূমিক তলে নিক্ষিপ্ত বস্তু অনন্তকাল ধরে গতিশীল থাকবে—গ্যালিলিওর এই ধারণা নিউটনের প্রথম সূত্রের সমার্থক। কোন বস্তুর উপর একই সঙ্গে একাধিক বল প্রযুক্ত হতে পারে কিনা এবং হলে সেই বস্তুর গতিপথ কীরকম হবে সে সম্পর্কে গ্যালিলিও *Discourses* গ্রন্থে আলোচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন অভিকর্ষ আর অনুভূমিক নিক্ষেপ এই দ্বিমুখী বলের মিলিত প্রভাবে বস্তুর গতিপথ হবে অধিবৃত্তের মতো। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের সঙ্গে ইহা জড়িত। গ্যালিলিওর বিজ্ঞানকর্মের মধ্যে নিউটনীয় সূত্রের এমনি অনেক উপকরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। গ্যালিলিও সনাতন রক্ষণশীল বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে বিচ্ছেদের সূচনা করেন, আর সে বিচ্ছেদকে সম্পূর্ণ করেন নিউটন, গ্যালিলিও আর কেপলারের বিজ্ঞানকর্মের সংশ্লেষণে। প্রাক্-রেনেসাঁস যুগ আর সপ্তদশ শতাব্দীর চিন্তাজগৎ এত দূরবর্তী যে, অ্যারিস্টটল ও প্লেটো যদিও বা রেনেসাঁস আমলের ইতালীয় চিন্তাধারার মর্মগ্রহণ করতে পারতেন গ্যালিলিও ও নিউটনের ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করা এই দুই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের পক্ষে বোধহয় সহজ হত না।

ভৌতবিষয়ক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কী প্রাসঙ্গিক ও গ্রাহ্য আর কী বর্জনীয় এ নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছিল। ভর, দৈর্ঘ্য ও গতির এইসব প্রাথমিক ভৌতগুণের সঙ্গে রূপ রস গন্ধ স্পর্শের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কল্পনার ফলে যে

বিশৃঙ্খল ধারণার উদ্ভব হয়েছিল গ্যালিলিও সেগুলি সংহত করেন। তিনি *Il Saggiatore* গ্রন্থে বলেছেন :

"যখনি কোনো ভৌত বা দেহগত বস্তুর কথা ভাবি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও ধারণা করার প্রয়োজন উপলব্ধি করি যে তার একটা সীমারেখা এবং অবয়ব আছে; কোন বিশেষ মুহূর্তে তা কোনো বিশেষ স্থানে অবস্থিত তা চলমান বা স্থির তা অন্য কোনো বস্তুকে স্পর্শ করে রয়েছে বা নেই এবং তা সংখ্যায় এক বা একাধিক। এ অবস্থা থেকে বিযুক্ত কোনো বস্তু আমার কল্পনায় আসে না। কিন্তু তা সাদা কি লাল, তেতো না মিষ্টি, মুখর না মূক, এসব বিষয়কে পদার্থের অবশ্য অনুষঙ্গ হিসেবে মনে করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।" বস্তুর গুণকে পরিমেয় এবং অপরিমেয় বলে তিনি বিশেষিত করেন। গ্যালিলিওর এই ধারণা সে যুগে নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান-প্রগতির মূল্যবান সহায়ক হয়েছিল। তদুপরি এই ধারণা উত্তরকালের দার্শনিক চিন্তাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উল্লেখযোগ্য, গ্যালিলিও যে-সব গুণ অপরিমেয়, গৌন বলে মনে করতেন, হয়তো আজ আর তা বিজ্ঞানীর কাছে উপেক্ষণীয় নয়, অন্তত বস্তুর রং। সীমারেখা একদিন সম্পূর্ণ লুপ্ত হতে পারে।

Siderius Nuntius গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণের মধ্যে তার আধুনিক যুগসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রেক্ষিত বস্তু সম্পর্কে নীতিবাগীশ ও ভাববিলাসী নন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চাঁদ সম্বন্ধে কোনো প্রশস্তি বা জ্যোতিষ্ক হিসেবে তার স্বর্গীয়তা ও আলোর পবিত্রতাকে সমান্তরাল কল্পনা করবার উচ্ছ্বাস নেই। তার বদলে আছে পর্যবেক্ষণকে নির্ভরযোগ্যভাবে লিপিবদ্ধ করার সযত্ন প্রয়াস, যা তিনি দেখেছেন তার বাস্তব বর্ণনা। লেখার স্টাইল ও বক্তব্য-বিষয়ের অবতারণা ও উপস্থাপনার ভঙ্গি আধুনিক, তার রচনাকাল যে সাড়ে তিনশ বছর পিছনে কখনো তা মনে হয় না। বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌছনোর জন্য আরোহী যুক্তিধারার প্রয়োগ *Sidereus Nuntius* গ্রন্থে সুস্পষ্ট। বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসেন গ্রহের সঙ্গে তার উপগ্রহের অচ্ছেদ্য আকর্ষণ সম্পর্কে অর্থাৎ গ্রহ তার অনুগত উপগ্রহকে নিয়েই সূর্য প্রদক্ষিণ করে। আরোহী যুক্তিধারা গ্যালিলিওর উদ্ভাবন নয়। কিন্তু যুক্তিধারার স্বচ্ছতা এবং সেই পথে তিনি যে সব তথ্য সংগ্রহ করেন তা বিজ্ঞানচিন্তার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক।

গ্যালিলিও নব্যবিজ্ঞান যুগের উদ্‌বোধন করেন। তার সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল রেনেসাঁস আমলে। একমাত্র সনাতন চিন্তাধারার সঙ্গে বিচ্ছেদের মধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞান যুগের উদ্‌বোধন হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে। দুর্ভাগ্যবশত এই বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত না করে অ্যারিস্টটলীয় মতবাদে দীক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ রেনেসাঁস যুগের মানবিকতা ও বিজ্ঞানচিন্তার বিরোধিতা করে। যে ধর্মীয় মঠ এককালে শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, ছিল জ্ঞান প্রগতির সংরক্ষক, সপ্তদশ শতাব্দীতে তার লালন থেকে বিজ্ঞান বঞ্চিত হয়। ধীরে ধীরে মুষ্টিমেয় রাজদরবার আর পণ্ডিতসভা বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠে। সপ্তদশ শতকের বৈজ্ঞানিক তৎপরতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমী—১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে নেপল্‌স্‌এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (Academia Secretorum Nature). কিন্তু কালো ম্যাজিকের আস্তানা এই সন্দেহে পোপ তা অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ করে দেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে একাধিক বিজ্ঞান-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় তার মূলে গ্যালিলিওর পরোক্ষ প্রভাব ছিল। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে Accademia dei Lincei প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগে ছিলেন প্রিন্স ফেদেরিকো চেসি, গ্যালিলিওর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ফ্লোরেন্সে গ্যালিলিওর শিষ্যবর্গ স্থাপন করেন Accademia del Cemento (১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)। কয়েক বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইংল্যাণ্ডে রয়াল সোসাইটি (১৬৬০) এবং ফ্রান্সে Académie des Sciences (১৬৬৬), ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয় *Philosophical Transaction, Journal des Scavants, Acta Eruditorum*, ইত্যাদি বিজ্ঞান-পত্রিকা।

ষোড়শ শতকের শেষ অবধি যে প্রাচীন-বিজ্ঞান পণ্ডিত মহলের আদর্শ ও আশ্রয় ছিল তার স্থান অধিকার করে পরীক্ষা। সূক্ষ্ম যন্ত্রের উদ্‌ভাবন, নিপুণ পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ ও গণিত-নির্ভর আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমশ মানুষ সচেতন হয়। চিন্ত ধারার যে রূপান্তরের ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম, তাতে কোপার্নিকাস, ভেসালিয়াস, হার্ভে, টাইকো ব্রাহে, কেপলার এবং আরো অনেকের অবদান রয়েছে। কিন্তু গ্যালিলিওর প্রাধান্য এতো বেশি যে এ বিপ্লবকে গ্যালিলিও নামে বিশেষিত করা অযৌক্তিক নয়। পরিবর্তনটা কী? সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে নতুন তথ্যের সংযোজন? না। তবে কি সৃষ্টি স্থাপত্যের প্রচলিত ধারণাকে বদলানো? তাও নয়। কী ভাবে এবং কী ধরনের জ্ঞান অর্জনীয়, পরিবর্তনটা সে-সম্পর্কে আমাদের

মনোভঙ্গীর। বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হবার পথে পরীক্ষণ অপরিহার্য বেকনের এই উপলব্ধির প্রথম সার্থক প্রয়োগ গ্যালিলিওর বিজ্ঞানপ্রয়াসের মধ্যে। একান্তভাবে পরীক্ষা-নির্ভর অনুসন্ধানের যে মনোবৃত্তি বিজ্ঞানপ্রগতির মূলে তার জন্য আমরা ঋণী এই ইতালীয় বিজ্ঞানীর কাছে। গ্যালিলিও যদি শুধু দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রসূর্য গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি নির্ণয় করতেন বা কোপার্নিকাসের বিশ্বচিত্রকে ধর্মীয় নিপীড়ন ও সংস্কার বিদ্রূপের প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত করে যেতেন তাতেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। কিন্তু, যে-সম্পদ তিনি দিয়ে গিয়েছেন তা নিছক উদ্‌ভাবন ও আবিষ্কারের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। গাণিতিক পদ্ধতি ও ভৌতপরীক্ষার যে উর্বর সমন্বয়ে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ঋদ্ধি গ্যালিলিও গ্যালিলি তাতে পৌরহিত্য করেন।

H. T. Pledge, *Science Since 1500*, New York, 1947

Bertrand Russell, *The Scientific Outlook*, London, 1949.

S. F. Mason, *Main Currents of Scientific Thought*, New York, 1953

A. D. White, *A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom*, New York, 1960

সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৫৮

Charles Singer, *A Short History of Scientific Ideas to 1900* Oxford, 1959.

তারাস্ শেভচেনকো

(১৮১৪-১৮৬১)

[য়ুক্রেনীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা তারাস্ শেভচেন্‌কো'র প্রতিভা বিকশিত হয় চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতা—শিল্পকলার তিনটি প্রধান ক্ষেত্রেই। অথচ তিনি ছিলেন এক ভূমিদাসের সন্তান সেই নির্দয় যুগে, যখন রুশ সম্রাট প্রথম নিকলাই-এর কঠিন শাসনে রুশ দেশের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির কণ্ঠ রুদ্ধ। পরাধীন দেশ য়ুক্রেনের জনগণের তো দুর্দশার সীমা ছিল না। শেভচেন্‌কো'র জন্ম হয় ১৮১৪ সালের ৯ই মার্চ। তাঁহার জীবনের প্রথম চব্বিশ বছর কাটে জমিদার এঙ্গেলহার্ট পরিবারের ভূমিদাস হিসবে, যখন শারীরিক প্রহার ও মানসিক অপমান ছিল তাঁহার নিত্যসাথী। তা সত্ত্বেও শেভচেন্‌কো'র চিত্রাঙ্কণ-প্রতিভা কর্তার চোখে পড়ে ও তিনি এই যুবককে রাজধানী পিটার্সবুর্গে আনেন, যাতে এর শিল্পশক্তি তাঁহার "দরবারের" গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে। এখানে শেভচেন্‌কো বিখ্যাত রুশ শিল্পী কার্ল ব্রুইলভ্-এর সংস্পর্শে আসেন, যিনি নিজে একখানি চিত্র আঁকিয়া লটারীতে বিক্রয় করেন ও এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া শেভচেন্‌কো'র ভূমিদাসত্বের অবসান ঘটান। এই সময়ে শেভচেন্‌কো কবিতা রচনায় মন দেন, যে কবিতা ছিল নির্যাতিত য়ুক্রেনীয়দের মর্মের কাহিনী। ফলে, ভূমিদাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াও শেভচেন্‌কোকে যাইতে হয় নির্বাসনে, জার নিকলাই-এর আদেশে। নির্বাসনে তিনি ছবি আঁকিতে বা কবিতা লিখিতে পাইবেন না—ইহাই ছিল রুশ সম্রাটের স্বহস্ত লিখিত আদেশ। দীর্ঘ নির্যাতনের পর তিনি পূর্ণ মুক্তি পান ১৮৫৭ সালে। আর তাঁহার মৃত্যু হয় ভীষণ ড্রপ্‌সি রোগে ১৮৬১ সালের ১০ই মার্চ তারিখে।

শেভচেন্‌কো জন্মভূমিকে ভালোবাসিতেন জননীর মতো, আর দেশের অত্যাচারী শাসনকর্তাদের তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিতেন দুশমন বলিয়া। তাঁহার সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা—"অন্তিম নির্দেশ"। বিশ্বশান্তি সংসদের নির্দেশে এ বৎসর পৃথিবীর নানা দেশে শেভচেন্‌কো'র স্মৃতিতে সম্মান জ্ঞাপন করা হইতেছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে এই বিখ্যাত কবিতাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি।]

শেভচেনকো: অন্তিম নির্দেশ

(ৎভারদভস্কি-র রুশ অনুবাদ হইতে)

আমার মরণ হ'লে রেখে দিয়ো এই দেহ
প্রাণপ্রিয় য়ুক্রেনের কোলে,
কবরের তরে মোর বেছে নিয়ো হেন ঠাঁই
চারিপাশে মুক্ত সমতলে,
কফিনেতে শুয়ে শুয়ে আমি যেন পাই কাছে
স্তেপ্‌-এর অসীম বিস্তার,
দ্‌নীপারের খাড়া তীর, কানে যেন এসে লাগে
তরঙ্গের স্বনন তাহার।
য়ুক্রেনের ভূমি থেকে অরাতির রক্তলিখা
মুছে দিয়ে দ্‌নীপারের জল
মিশিবে সাগর-নীলে···য়ুক্রেনের এ কবর
ছেড়ে উঠো তখনই কেবল,
কেবল তখনই আমি প্রার্থনার তরে যাব
বিধির সদনে মোর···তবে
সেদিন না আসে যতদিন···তাঁর সাথে মোর—
কোনরূপ সংযোগ না রবে।
আমাকে প্রোথিত করো, তারপরে ওঠো সব,
ভেঙে ফেলে শৃঙ্খলের ভার,
দুশমনের রক্তধারে করো ত্বরা অভিষিক্ত
নবলব্ধ মুক্তির প্রসার।
তারপরে দেশ-জোড়া নব মহা-পরিবারে,
ভয়মুক্ত মহা-পরিবার ;—
সদয় কথার সাথে কোমল ব্যঞ্জনা দিয়া
মনে কোরো নামটি আমার।

অনুবাদক : নীরেন্দ্রনাথ রায়

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

বৃক্ষের ভাগ্যকে ঈর্ষা করি

বৃক্ষের ভাগ্যকে ঈর্ষা করি।

আপনার ব্যথা থেকে আপনি ফোটায় পুষ্পদল।
আপন কস্তুরীগন্ধে আপনি বিহ্বল।
বিদীর্ণ বল্কলে বাজে বসন্তের বাঁশী বারংবার।
আত্মজ কুসুমগুলি সহস্র চুম্বনচিহ্নে অলঙ্কৃত করে ওষ্ঠতল।

আমি একা ফুটিতে পারি না
আমি একা ফোটাতে পারি না
রক্তের বিষাদ থেকে আরক্তিম একটি কুসুমও।

আমাকে বৃক্ষের ভাগ্য তুমি দিতে পারো।
বহু জন্ম বসন্তের অম্লান মঞ্জরী ফুটে আছো,
নয়নের পথে দীর্ঘ ছায়াময় বনবিথীতল।
ওষ্ঠপুটে প্রস্ফুটিত কুসুমেরা কাকলী মুখর।
আমাকে বৃক্ষের ভাগ্য তুমি দিতে পারো।

তুমি পারো করতলে তুলে নিতে আমার বিষাদ
ভিক্ষাপাত্র ভরে দিতে পারো তুমি কুসুম সম্ভারে।
সর্বাঙ্গ সাজিয়ে আছো উচ্ছ্বসিত সৌরভে শ্যামলে
উদ্গত অশ্রুকে তুমি অভ্যর্থনা করে নিতে পার না কি তোমার উদ্যানে?

মোহিনীরা স্বভাবে নির্মম।
আর যারা ভালবাসে
তারা শুধু নিজেদের আত্মার ক্রন্দনে ক্লিষ্ট হয়।

বৃক্ষের ভাগ্যকে তাই এত ঈর্ষা করি।
অপরের ভিক্ষালব্ধ ভালবাসা ব্যতীতই তার
প্রণয়ের পুষ্পগন্ধে স্তবকে স্পন্দিত পূর্ণ প্রাণ।

চিত্ত রায়

প্রতীক্ষার দিনগুলি

ঘনীভূত হতে হতে একদিন
কালো কালো মেঘগুলো আমাদের উপর
ঝরতে শুরু করবে।
বড় জোর একোণ থেকে ওকোণে
স্থানচ্যুত হতে পারে, যতটুকু বাতাসের ক্ষমতা।

মানুষ কল্যাণকামী, ভাগ করে' নেবে
প্রতিটি ভগ্ন অংশ।
তৃষ্ণার্ত চাতক হয়তো পাবে জল।

অথচ আকাশে এখনও
আসন্ন ঝড়ের জনয়িত্রী
কালো মেঘ।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ঘাতক

দারুণ ঘাতক কেউ অবিরল চতুর রীতিতে
আমার পেছনে ঘোরে। মিশে যাই ফুটপাথে : ভিড়ে ;
ছুটে গিয়ে ট্রামে উঠি ; ফাঁস দিয়ে অলিতে গলিতে,
চারপাশ দেখে-টেখে, সন্তর্পণে ঘরে আসি ফিরে।

দরজায় খিল তুলে দেখি সে আমারই অপেক্ষায়
চেয়ারে রয়েছে বসে—মুখ ঢাকা দৈনিক কাগজে।
"কে, কে, তুমি, হে ঘাতক ? বিপন্ন জন্মের ব্যর্থতায়
মঞ্চের বাইরে থাকি। সন্তাপের প্রদাহ মগজে।

কী লাভ আমাকে মেরে ?   ঝঞ্ঝাহত আমার বাগান,
সেখানে ফোটে না কোনও অনবদ্য স্বপ্নের কোরক।
করে না আমাকে লুব্ধ সমুদ্রের মাতাল আহ্বান—
আমার বুকের মধ্যে মৃত সব পাখির পালক।"

কাগজ ফেলে সে উঠে দাঁড়াল, এবারে মুখ তার
দেখা গেল।   আরে, এ যে প্রতিমূর্তি হুবহু আমার॥

অশোক পালিত

প্রদক্ষিণ

অভ্যাসের কক্ষপথে যথাবিধি প্রদক্ষিণ দেখেছি, জেনেছি—
মানুষেরা সত্য থেকে মন তুলে নেয়, প্রাচীন মাটির গন্ধ
মূল্যহীন, উপযোগ হারায় ক্রমশ, দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
শেষ হলে নিরঞ্জন অস্থি হাতে ফিরে আসে গৃহগতপ্রাণ।
কেহ কি বলিতে পারে কোন্ জলে ডুবে গেলে মানব আত্মার
শান্তি হয় পুণ্য হয় সার্থক মানবজন্ম ?   ত্রিশূলে গাঁথিয়া
নিশান উড়ায় কেন, ভিখারী পয়সা পায়, ব্রজবাসীগণ
স্বার্থে কি পরার্থে ছোটে কুণ্ডে কুণ্ডে স্নান করে কীর্তন বিলায় ?

কেহই পারে না তবু বিন্যাস কামনা করে, গোলাপের কাঁটা
বাব্‌লার কাঁটা কিম্বা যাই হোক্ ফুটে ওঠে অবিনাশ হয়
ততক্ষণ যতক্ষণ দীপক জ্বালায় কেহ সেবা দান করে
মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে ভালোবাসে, বহুদূর পায়ে হেঁটে আসে।

তবে কি একথা সত্য সকলের অভিলাষ যদি জড়ো হয়
আলো করে দেয়া যায় নির্বিকার প্রদক্ষিণ ঘর ও বাহির ?

আবদুল আজীজ আল্-আমান

কবি বিদ্রোহী প্রসঙ্গে

'মোসলেম ভারত' যুগের কবি নজরুলের অনেক কথা, অনেক ঘটনার সাক্ষী আফ্‌জালুল হক সাহেব। এই সময় নজরুল দীর্ঘদিন আফজালুল হকের সঙ্গে থেকেছেন, একই অন্ন খেয়েছেন দু-জনে।

নজরুলের পানপ্রিয়তার কথা বর্তমানে একটা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে, অবিশ্বাস্য বলেও অনেকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু বিষয়টা সম্পূর্ণ সত্য। আফজালুল হক সাহেব জানাচ্ছেন পানের 'বাটায়' কোনো কাজ হত না—নজরুলের জন্য ছিল পানের 'ডাবর'। বড় বড় পান একসঙ্গে তিনি পাঁচটা-ছটা পর্যন্ত অবলীলাক্রমে মুখে দিয়ে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করতেন। মেডিক্যাল কলেজের বিপরীত ফুটপাতে এক পানের দোকান ছিল—একজন বৃদ্ধা পানোয়ালী ছিলেন সে পানের দোকানের মালিক। তাঁর পান সে সময় ও-এলাকায় বিখ্যাত ছিল। পয়সায় দুটি করে পান—বিরাট আয়তনের খিলি। প্রধানত কবির জন্যই প্রতিদিন দশ থেকে বার আনার পান খরচ হত। বুড়ীর পান, পুঁটিরামের দোকানের মিষ্টি এবং মালাইয়ের চা—এ তিনটি ৩২ নম্বরের দ্বিতলের কোণার ঘরটির নিত্য অতিথি ছিল। কেবল নজরুল কেন—অন্য যে কোনো দর্শক বা অতিথি ওখানে গেলে এ তিনটির দর্শন পেতেন। বলাবাহুল্য আফজাল সাহেব হাসিমুখেই সকল খরচ বহন করতেন।

'মোসলেম ভারত'-এর যুগেই কবি এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের 'নবযুগ'-এর সঙ্গে যুক্ত হন—কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পর তিনি 'নবযুগ'-এর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই সময় কবির শরীরও ভালো যাচ্ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কিছুদিন বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি দেওঘরে যাবেন। যে কথা সেই কাজ। কবি যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এদিকে 'মোসলেম ভারত'-এর উপায় যে কী হবে সেটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নজরুল ছাড়া 'মোসলেম ভারত' অচল। এ-প্রসঙ্গে জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ মন্তব্য করেছেন যে,

সে সময় ঠিক হয়েছিল দেওঘরে থাকাকালীন আফজালুল হক প্রতিমাসে একশো করে টাকা পাঠাবেন—আর ওখান থেকেই কবি পত্রিকার জন্য লেখা পাঠাবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ মন্তব্য ঠিক নয়। কেননা, জনাব আফজালুল হক জানিয়েছেন যে, সে সময় এ ধরনের কোনো কথা হয়েছিল বলে তাঁর মনে নেই। তাছাড়াও পবিত্রবাবুর নিকট লেখা কবির চিঠি (যা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম) থেকে জানা যায় যে, দেওঘর থেকে কবি সাহায্য হিসেবেই টাকাটা চেয়েছেন—পাওনা বা দাবী হিসেবে নয়। যাহোক দেওঘরে যাবার দিন সাড়ম্বরে একটি বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হল কবিকে। এই অনুষ্ঠানের মূলে আফজালুল হক সাহেব। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে 'সন্দেশ' সম্পাদক সুবিনয় রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মুজফ্ফর আহমদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে স্মরণীয়। এই অনুষ্ঠানে কবি তাঁর কয়েকদিন পূর্বে রচিত :

"বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজন পুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে?
আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,
ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে।"

গানটি গেয়ে শোনান। আফজালুল হক সাহেব তাঁর স্মৃতি থেকে জানান যে এই অনুষ্ঠানে মোট আটত্রিশ টাকা ছ-আনা খরচ হয়েছিল।

দেওঘরে পৌছেই কবি তাঁর অন্যতম বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দেন। সেই অপ্রকাশিত চিঠিটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম :

Dr. Bose's Sanatorium
Quarter No. 49
Deoghar.
শুক্রবার, বিকাল
[কোনো তারিখ লেখা ছিল্ না—ডাকঘরের স্ট্যাম্পের তারিখ 19 Dec, 20.]

ভো ভো "নির্ভ'র" মুশ'য়ের !

গতকাল শুভ দিবা দ্বিপ্রহরে অহম্ দানবের এই দেওঘরেই আসা হয়েছে। আপাততঃ আসন পেতেছি ঐ উপরের ঠিকানাতে। শিমুলতলা যাওয়া হয়নি।

পথের মাঝে মত বদলে গেল। পরে সমস্ত কথা জানাব। জায়গাটা মন্দ নয়। তবে এক মাসের বেশী থাকতে পারব না এখানে, কেননা এখনো (?) খুব বেশি আনন্দ পাচ্ছি না।…নারায়ণের টাকাটা দিয়েছিস অবিনাশদা'কে। যদি হাতে টাকা থাকে, তবে বিজলির দু টাকা তাদের অফিসে দিয়ে আমার ঠিকানায় কাগজ পাঠাতে বলিস।…তোর বৌ-এর খবর কি? তাঁর সঙ্গে আমার চিঠির মারফৎ আলাপ করিয়ে দিস। কালই চিঠি না পেলে কিন্তু তোদের মাঝে জোর কলহ বাধিয়ে দেব।…কান্তিবাবুকে আমার প্রীতি ভালবাসা আর প্রণাম জানাস। তোর গল্প লিখবো, একটু গুছিয়ে নি আগে। বড্ডো শীত রে এ·· জায়গায়। টাকা ফুরিয়ে গেছে, আফজল কিম্বা খাঁ যেন শীগ্‌গীর টাকা পাঠায়, খোঁজ নিবি আর বলবি আমার মাঝে মানুষের রক্ত আছে। আজ যদি তারা সাহায্য করে, তা ব্যর্থ হবে না—আমি তা সুদে আসলে পুরে দেবো।

ইতি—

তোর পিরীত-দধি-লুব্ধ মার্জ্জার

নজর্।

সানাটোরিয়ামের পাশে কবি একটি বাসা ভাড়া নেন। এখানে আবদুল নামে একজন ভৃত্য কবির সকল কাজ করে দিত। কিন্তু দেওঘরে এসে কবির সৃষ্টির কিছুমাত্র উন্নতি হল না। উন্নতি তো হলই না—বরং বেশ কিছু অবনতি দেখা গেল। বেশ কয়েক মাসের মধ্যে তিনি মাত্র গুটিকয় গান ছাড়া আর কিছুই লেখেন নি। নজরুলের জীবনধারা ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁর দুঃখের, দারিদ্র্যের দিনগুলিতে তিনি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দেওঘরের নিশ্চিন্ত অলস জীবনযাত্রার মধ্যে সে জ্বালা-যন্ত্রণা-দাহন কোথায়?

এই সময়ের একটি ছোট্ট ঘটনা স্মরণীয়। দেওঘরে থাকাকালীন এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। একদিন দুপুরে মধ্যাহ্নের ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলি যাপনের জন্য কবি ভদ্রমহিলার বাসায় এসে হাজির হলেন। কিন্তু নিরাশ হতে হল তাঁকে। দেখা গেল দরজায় তালা দেওয়া—বিশেষ প্রয়োজনে ভদ্রমহিলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্য কোথাও গেছেন। কবি একখণ্ড কাঠকয়লা দিয়ে বড় করে দেওয়ালে লিখে দিলেন :

"আজ দুপুরে দেওঘরে,
কেউ ঘরে নেই কেউ ঘরে।"

জনাব মুজফ্ফর আহমদ গিয়ে কবিকে দেওঘর থেকে কলকাতায় আনেন।

আফজালুল হক সাহেবের নিকট হতে আর একটি মূল্যবান তথ্য জানা গেছে। এ তথ্যটি দিয়ে আমাদের অনেকের ভুল সংশোধিত হবে।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত বই কোনটি? যুগবাণী? অগ্নিবীণা? না ব্যথার দান?

আজ পর্যন্ত সকল নজরুল-জীবনীকার—এমন কী নজরুল-জীবনী সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি জনাব মুজফ্ফর আহমদ পর্যন্তও—লিখেছেন যে নজরুলের প্রথম প্রকাশিত বই 'যুগবাণী' এবং দ্বিতীয় বই 'অগ্নিবীণা'। কিন্তু তথ্যটি আদৌ সত্য নয়। সন্দেহাতীতরূপে নজরুলের প্রথম প্রকাশিত বই 'ব্যথার দান'। প্রমাণস্বরূপ একটি মাত্র ঘটনাই যথেষ্ট।

'মোসলেম ভারত'-এর যে সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩২৮) "বিদ্রোহী" কবিতাটি প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যায় 'ব্যথার দান'-এর বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছে। 'ব্যথার দান' এই বিজ্ঞাপনের পূর্বেই বাজারে প্রকাশিত হয়েছে। 'অগ্নিবীণা'র প্রধান কবিতাই "বিদ্রোহী"—সুতরাং 'অগ্নিবীণা' 'ব্যথার দান'-এর পূর্বে প্রকাশিত হতে পারে না। তাছাড়া 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' রক্ষিত 'ধূমকেতু'র পুরাতন ফাইল দেখলেও বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হবে। 'ধূমকেতু'-র প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় (শনিবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৯ সাল মোতাবেক মোহর্‌রম, ১৩৪১ হিজরী) হতে কয়েকটি সংখ্যা পরিষদে আছে। এই সপ্তম সংখ্যায় 'অগ্নিবীণা' ও 'যুগবাণী' মুদ্রিত হচ্ছে বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে—কিন্তু ঐ সংখ্যার কভারে 'ব্যথার দান' পুস্তক সম্পর্কে অন্যান্য পত্রপত্রিকার সুদীর্ঘ মতামত মুদ্রিত করা হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় 'ব্যথার দান' কবির প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। এরপর মুদ্রিত হয় 'অগ্নিবীণা'—সুতরাং 'অগ্নিবীণা' কবির দ্বিতীয় বই, তৃতীয় বই হল 'যুগবাণী'।

'ব্যথার দান' প্রকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। "হেনা", "ব্যথার দান", "অতৃপ্ত কামনা" প্রভৃতি গল্পগুলি ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হতেই কবি ঐ লেখাগুলির পাণ্ডুলিপি নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশকের নিকট কয়েকদিন ধরে যাতায়াত করেন। টাকার বিশেষ প্রয়োজন অথচ 'ব্যথার দান' প্রকাশে কেউ সম্মত নন।

যে কালে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো বইয়ের প্রথম সংস্করণ দপ্তরীর বাড়িতে নষ্ট হয়—সে সময় একজন নূতন লেখকের বই ছাপতে যাওয়া অনেকখানি বিপদের কথা বৈকি! এবং এ বিপদের সম্ভাবনা সকল প্রকাশক সজ্ঞানে এড়িয়ে গেলেন। একদিন দুপুরে ঘোরাঘুরির পর যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে কবি বাসায় ফিরেছেন, আফজালুল হক বসে আছেন সেখানে। কবি 'ব্রিচেস' (সৈনিক পোশাক) খুলছেন এমন সময় হক সাহেব "কোথায় গিয়েছিলেন" জিজ্ঞেস করতেই কবি 'ব্যথার দান' সম্পর্কে সকল কথা বলে গেলেন। তাঁকে যথেষ্ট ম্লান এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। সেই মুহূর্তেই কোনো কিছু বিবেচনা না করে আফজালুল হক 'ব্যথার দান' ছাপতে রাজী হলেন। কবির পক্ষে তো সেই মুহূর্তে কোনো কিছু বিবেচনা করা সম্ভব ছিল না (আর তিনি কোন দিনই বা তা করেছেন), তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'কপি রাইট' লিখে দিলেন। আফজালুল হকের সঙ্গে তখন তাঁর যা সম্পর্ক সে অবস্থায় মূল্যের কথা উঠতেই পারে না। 'কপি রাইট' লিখে দেওয়ার জন্যে হকসাহেব কোনোরূপ জোর বা চাপ দেন নি। কবি স্ব-ইচ্ছায় এবং আনন্দের সঙ্গে দুশো টাকার বিনিময়ে 'কপি রাইট' লিখে দেন।

যথাসময়ে 'ব্যথার দানে'-এর পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠানো হল। কিন্তু পাইকা টাইপে গল্পগুলি মুদ্রণের পর দেখা গেল মাত্র ষাট পৃষ্ঠার বই হয়েছে। ঐ অবস্থায় একটি চটি বই বাজারে বার করা যায় না—কবিও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন শ্রাবণ মাস, মধ্যাহ্ন কাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির অবিশ্রাম বর্ষণ, বাদলের সকল চিহ্ন সুস্পষ্ট। সেই মেঘাচ্ছন্ন বাদল-মধ্যাহ্নেই কবি লিখতে বসে গেলেন—প্রায় দু ঘণ্টার কাছাকাছি সময়ে লিখে ফেললেন সুদীর্ঘ গল্প "বাদল-বরিষণে"। গল্পটি শ্রাবণ মাসের (১৩২৭ সাল) 'মোসলেম ভারত'-এ মুদ্রিত হয়েছিল। 'রাজবন্দীর চিঠি' তিনি এর পরে রচনা করেছিলেন। এবং ঐ দীর্ঘ গল্পদুটি নিয়ে মোটামুটি একটা ভদ্র আকারে 'ব্যথার দান' বাইরে আত্মপ্রকাশ করে।

'মোসলেম ভারত'-এর প্রকাশ তখন খুব অনিয়মিত। কবি আফজালুল হক সাহেবকে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কথা জানালেন—এর থেকে অর্থাগম হলে 'মোসলেম ভারত'কে আবার প্রকাশ করা যাবে। বলাবাহুল্য হক সাহেব রাজি হয়ে গেলেন। হক সাহেবের নামেই চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হতে মুদ্রাকর ও প্রকাশক ডিক্লারেশন নেওয়া

হল। কাগজের সারথি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, ম্যানেজার হিসেবে ছাপা হল শ্রীশান্তিপ্রসাদ সিংহের নাম। প্রথম সংখ্যা যেদিন আত্মপ্রকাশ করে সেদিনের রাতটি এক অবিস্মরণীয় রাত। হক সাহেবের মুখে জানা গেল, কবির সে কী আনন্দ, সে কী উন্মাদনা। কবির সঙ্গে হক সাহেবও সারা রাত মেটকাফ প্রেসে জেগে কাটিয়ে দিলেন। আর জাগলেন প্রেসের কর্মীবৃন্দ। কবি ও হক সাহেব মাঝে মাঝে প্রুফ দেখেন, প্রুফ না থাকলে গান গেয়ে প্রেসের কর্মীবৃন্দের আনন্দ দেন, হৈ-হুল্লোড় করে কম্পোজিটারদের নিদ্রা থেকে দূরে রাখেন, মাঝে মাঝে চা আর পান তো আছেই। সে রাতে মেটকাফ প্রেসের মধ্যে একটা আনন্দ ও উন্মাদনার ঝড় বয়ে গেল।

সকালে বাইরে আত্মপ্রকাশ করল 'ধূমকেতু'!

'ধূমকেতু'র প্রথম হকার হল আবদুল। এই আবদুল দেওঘরে থাকার সময় কবির সকল কাজ করে দিত। দেওঘর থেকে কলকাতায় আসার সময় কবি একে সঙ্গে করে আনেন এবং আফজালুল হক একে কবির সেবার জন্য নিযুক্ত করেন। সে সকালবেলাই এক বাণ্ডিল 'ধূমকেতু' নিয়ে হাওড়ার দিকে চলে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব কাগজ বিক্রি করে দেহমনে উন্মত্ত নেশা নিয়ে ছুটে এল আবদুল, আরো কাগজ চাই। কিন্তু তখন সব শেষ, বিক্রির জন্যে আর একটি কপিও অবশিষ্ট নেই।

প্রথম বর্ষের অষ্টম সংখ্যা (মঙ্গলবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৩২৯ সাল মোতাবেক ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত 'ধূমকেতু' আফজালুল হকের বাসা ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীট হতে প্রকাশিত হয়—তারপর পত্রিকা-অফিস ৭নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেন-এ উঠে যায়। অষ্টম সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে এই অফিস পরিবর্তনের ঘোষণা এই ভাবে মুদ্রিত হয়েছে :

"'ধূমকেতু'-র কেন্দ্রচ্যুতি—
'ধূমকেতু' কেন্দ্রচ্যুতি—

"'ধূমকেতু' কেন্দ্র ৭নং প্রতাপ চাটুয্যের লেন-এ উঠে এসেছে। অতঃপর চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের কাগজ সবই এই ঠিকানায় 'ধূমকেতু'র একমাত্র স্বত্বাধিকারী কাজী নজরুল ইসলামের নামে পাঠাতে হবে।"

এই কেন্দ্রচ্যুতির পর আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে 'ধূমকেতু'-র আর বিশেষ কোনো যোগ ছিল না। তবুও প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় (মঙ্গলবার,

৯ আশ্বিন, ১৩২৯ সাল মোতাবেক ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ) কবির "আনন্দময়ীর আগমনে" মুদ্রিত হতেই তাঁর নামে যে গ্রেপ্তারীর পরোয়ানা বার হয় তাতে হক সাহেবকেও বন্দী হতে হয়। কেননা পত্রিকার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ না থাকলেও প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হচ্ছিল। কিন্তু চার দিন আটক রাখার পর আফজালুল হক যে নির্দোষ এমন প্রমাণ পেয়ে সরকার পক্ষ তাঁকে মুক্ত করে দেবেন এমন সময় কুমিল্লা থেকে নজরুলকে ধরে আনা হল কলকাতায়। ফলে হক সাহেবের মুক্তি-দিবস আরো কিছুদিন পেছিয়ে গেল। শেষে সরকার পক্ষ স্থির করলেন হক যদি তাঁদের প্রয়োজন মতো কোর্টে এসে সাক্ষী দিতে রাজি থাকেন তাহলে তাঁরা তাঁকে ছেড়ে দেবেন।

বলাবাহুল্য হক সাহেব তাতেই রাজি হলেন।

হক সাহেবের প্রদত্ত সাক্ষ্য বিচারাধীন বন্দী নজরুলের অনেক উপকারে এসেছিল।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

খোকন গেছে কার নায়

না, নেই—কলকাতার কোনো হাসপাতালে বছর আঠারো বয়েস সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা বাঁ গালে তিল কোঁকড়ানো চুল ফর্সা রঙ পরনে শাদা ট্রাউজার গায়ে বাদামি শার্ট নীল জাম্পার ডিগ্রি কোর্স সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র অধ্যাপক পরমেশ মুখুজ্জের ছেলে প্রেমতোষ ওরফে খোকা বলে কেউ নেই।

স্বস্তির কথা সন্দেহ নেই।

মহী বলে, 'আমি আগেই বলেছিলাম! অনর্থক—আমার চা?'

মমতা বলে, 'রাধাদি আনছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছল।'

চায়ের অভাবে সিগারেট। সিগারেটের প্যাকেট বের করেই খেয়াল হয় সামনে বাবা। 'তুমি আর কেন মিছিমিছি—'

পরমেশ নড়েচড়ে বসে। ঘুম থেকে উঠে গীতা পাঠ। সারা দিনের মতো মনটা ধাতস্থ হয়ে থাকে। আত্মবিশ্বাস দানা বাঁধে। অভ্যেসটা আজ চিড় খেল। উপায় কি! দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'আরেক কাপ চা দেবে, বাবা?'

'হাওড়ায় ফোন করেছিলি? হাওড়ার হাসপাতালে?'

'হাওড়ায়?' পাল্টা প্রশ্নে মহী হকচকিয়ে যায়। 'হাওড়ায় তো কিছু হয় নি, বাবা।'

হয় নি! কোথায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে জোর করে বলা যায়? কলকাতায় হলে হাওড়ায় হবে না—এমনিতেই রোজ একটা-না-একটা হাঙ্গামা যেখানে লেগেই আছে? 'করলে পারতে—করলেই যখন।'

তুই থেকে তুমি! তার মানে বাপের মন মানছে না।

বাবা এমন অবুঝ আগে যদি বুঝত!

আগে বুঝলে করত আরেকটা ফোন। খানিক আগে বুঝলেও বলত করেছি ফোন।

দরাজ গলায় মহী বলে, 'তুমি মিথ্যে ভাবছ। আমি বলছি ওর কোনো বিপদ হয় নি। নাকি বলো, অশোক?'

অশোক বলে, 'না না, বিপদের কী আছে।'

মায়া বলে, 'বালাই ষাট! খোকার কেন বিপদ হতে যাবে।'

মমতা বলে, 'বিপদের ধারেকাছে ছোড়দা—'

ইন্দু বলে, 'বিপদের ভয় দেখলে ঠাকুরপো—'

খোকা হাসপাতালে নেই শুনে সুনীতি হাঁফ ছেড়েছিল, খোকার কোনো বিপদ হয় নি বলে জোর গলায় সকলের জানান্ দেওয়া শুনে বুকটা তার এখন ছ্যাঁৎ করে ওঠে: বিপদের আশঙ্কা তাহলে আছে? হাসপাতালে না থাকলেও আছে?

'তবে গেল কোথায়?' গলা সুনীতির থরথর করে, 'কাল সেই কখন বেরিয়েছে—'

'হয়তো কোনো বন্ধুর বাড়ি—'

'যে-ছেলে কখনও সন্ধ্যের পর বাইরে থাকে না—'

'যেমন হুটহাট কার্ফু বসছে—'

অশোক বলে, 'তাই। হঠাৎ কার্ফু হয়ে যাওয়ায়—'

পরমেশ বলে, 'তাহলে একটা ফোন করে দিত না?'

সুনীতি বলে, 'হ্যাঁ, ফোন করে দিত না? এভাবে না বলে-কয়ে—'

তৈরি চা ফেলে ফোন করতে ছুটল, তা সত্ত্বেও বাপ-মায়ের এই জেরা-জিজ্ঞাসা? মহী বলে, 'তাই যদি বলো মা, কাল ওর বাড়ি থেকে বেরনোই উচিত হয় নি। বাবার কলেজ বন্ধ, মমর ইশকুল বন্ধ, বেলা তিনটেয় আমি আপিশ থেকে চলে আসি, অশোক অব্দি বাড়িবন্দী হয়ে আছে—' গলা ধাপে ধাপে চড়ছিল, কিন্তু রাগারাগিটা এখন নেহাতই বেমানান বুঝে আচমকা মহী থেমে যায়।

গুম হয়ে যায়।

সত্যিই বেরনো উচিত হয় নি। পরমেশও স্বীকার করে। কিন্তু এখন সেকথা তুলে লাভ? 'তোদের কিছু বলে গিয়েছিল?'

মায়া বলে, 'নাঃ।'

মমতা বলে, 'না তো।'

'বৌমা?'

ইন্দু শুধু মাথা নাড়ে　এমনভাবে নাড়ে যার মানে হ্যাঁ হতে পারে, না-ও হতে পারে।

গুরুজনের মুখোমুখি মিথ্যে বলা যায়? তার ওপর খোকা ফিরে যদি ধমকধামকের চোটে বলে বসে—বৌদিকে তো আমি বলেই গিয়েছিলুম?

মায়া বলে, 'দাদা ঠিকই বলেছে, বাবা। কারো বাড়ি গিয়ে আটকা পড়েছে, ফোন করার অসুবিধে থাকায়—'

'এতক্ষণে আসা উচিত ছিল। সাতটা বাজে।'

'ট্রামবাসের গোলমালে—'

'ট্যাক্সি করে আসতে পারত।'

দু-দুটো জোরালো সম্ভাবনা পলকে বাপ খারিজ করে দিতে মেয়ে যায় ঘাবড়ে।

অশোকও যায়। বউয়ের চোখমুখ দেখে ঘাবড়ে যায়: বাপের বাড়িতে প্রথম মা হতে আসার সাধ বেচারীর মাথায় উঠেছে। ফিরে যাওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে।

বাইরের খবরাখবর শুনেই ক্ষেপে উঠেছে, এরপর ভাইয়ের জন্যে দুশ্চিন্তাটা যদি জেঁকে ধরে, ভালোমন্দ কিছু হয়ে যায় ভাইয়ের—নির্ঘাত হার্টফেল করবে।

ছেলে পেটে আসায় হার্টটা যেমন শত্রুতা শুরু করেছে!

অশোক বলে, 'যদি অ্যারেস্টেড হয়ে থাকে? মানে—কার্ফুতে?'

সুনীতি কঁকিয়ে ওঠে!

'হাসপাতালে থাকার চেয়ে পুলিশের হেফাজতে থাকা ভালো।' তাড়াতাড়ি অশোক বুঝিয়ে দেয়। 'হাজার হলেও—'

'তা বাপু ভালো। কার্ফুতে অ্যারেস্ট হওয়া ঢের ভালো।' অকূলে মায়া কূল পায়।

মহীরও মনে হয়, কথাটা অশোক ভালোই বলেছে। পুলিশ অবশ্য মারধোর করে, তবে খোকার গায়ে নিশ্চয় হাত তুলবে না। পুলিশ লোক চেনে।

ইন্দু প্রার্থনা করে: খোকাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখ, ঠাকুর! প্রতিজ্ঞা করে: আসুক-না ফিরে, বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র ফাঁস করে দেবে লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখার কথা। হিন্দী সিনেমা দেখার কথা!

তার কথা সকলের মনে ধরেছে, বিশেষ করে বউয়ের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখে সোৎসাহে অশোক বলে, 'কোনো সন্দেহ নেই। গুণ্ডা-বদমাসদের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না, ওদের যত দাপট ইনোসেণ্টদের ওপর। কে না জানে, নিরীহ-নির্দোষরাই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।'

সকলেই জানে। সায় দেয়।

'কিন্তু', সায় দিয়েও সুনীতির সন্দেহ যায় না, 'থানায় ওঁর নাম বললে ছেড়ে দিত না?'

'রাত্তির বেলা—'

'ছেড়ে না দিক, ফোন করত।' পরমেশ বলে, 'খোকাও করতে পারত।'

'অত রাত্তিরে—'

'যত রাত্তিরেই ফোন আসুক নন্দী ফার্মেসী জানিয়ে দিত। দেয় না?'

অস্বীকার করার যো নেই।

ওষুধে যত গলাই কাটুক, ফোনের খবর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে নন্দী ফার্মেসী যোল আনা সাচ্চা।

সাধেই প্রতি ফোন বাবদ আট আনা দিয়েও পাড়ার লোকে ওখানে যায় ফোন করতে। দাম বেশি জেনেই ওষুধ কিনতে।

তাহলে? খোকা তাহলে কোথায়?

হাসপাতালে নেই, বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যায় নি, পুলিশেও ধরে নি—তাহলে?

সকলেই জানতে চায়। কিন্তু চাই চাই করেও কেউ কারো মুখের দিকে চাইতে পারে না।

কদিন-ধরে-শোনা খবরের-কাগজে-পড়া বীভৎস-ভয়ঙ্কর নানান কাহিনী মনে পড়ে গিয়ে বুক উথলে দম আটকে চোখে আঁধার ঘনিয়ে হাত-পা সুনীতির অবশ হয়ে আসে, দরজা ধরে সামলাতে সামলাতে 'ওরে খোকা!' বলে চাপা আর্তনাদ তুলে চৌকাঠের ওপর ধপ করে বসে পড়ে।

'মা!'

'মা!'

'মা!'

মমতা তাড়াতাড়ি উঠে যায়। 'তুমি কী মা! ওঠো, ঘরে চল। ছোড়দার কিছু হয় নি। কিচ্ছু—'

মেয়েকে টেনে বসিয়ে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সুনীতি।

'ছাখ কাণ্ড!'

'মিথ্যে আপনার আশঙ্কা, মা। কলকাতা পাকিস্তান নয়। এখানে কোনো হিন্দুর—'

'অশোক ঠিক বলেছে, মা। কলকাতায় হিন্দুদের ভয় কিসের!'

'নেই? পরশু বিধান রায়ের বাড়ির সামনে—তুই দেখিস নি? বলিস নি? —ওরে খোকা!' সুনীতি হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

নিজের চোখে মহী দেখে নি, দত্ত দেখেছে। কিন্তু ওই সময় দত্তর বদলে বা দত্তর সঙ্গে বাসে থাকলে সে-ও দেখত নাকি? ঘটনাটা যখন সত্যি?

ঘটনাটা জীবন্ত করার জন্যে নিজের চোখে দেখে এলাম বলে জানিয়েছে, ঘটনাটা রোমাঞ্চকর করার জন্যে মুসলমানকে হিন্দু বানিয়েছে।

হায়, এভাবে তার জের টানতে হবে কে ভেবেছিল!

অশোকের দিকে ব্যাকুলভাবে তাকায়: কাল বিশ্বাস কর নি, তর্ক জুড়েছিলে—এখন কেন চুপচাপ?

বউয়ের দিকে তাকিয়ে বুক অশোকের গুরগুর করে: দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, তুই চোখ ঠেলে বেরিয়েছে—ফিট হওয়ার ভূমিকা নয় তো?

বিয়ের পর বন্ধ হয়ে গেলেও ইদানীং মাঝে মাঝে ফিট-ফিট ভাব হচ্ছে না? রাতভর বুকে রেখে বারবার ডাক্তারের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে সামলাতে হয় না?

তবু যদি ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ফিট হয় মন্দের ভালো, কিন্তু এখানেই ফিট হয়ে চেয়ার উল্টে পড়লে—

মাথা অশোকের ঝিমঝিম করে।

'আমি বলছি মা,' অশোকের সাহায্য না পাওয়ায় টেবিলে ঘুঁষি মেরে বক্তব্যটা মহী জোরদার করতে চায়, 'কলকাতায় হিন্দুদের—'

'প্রবোধ দিচ্ছিস? আমায় মিথ্যে বোঝাচ্ছিস মহী! মিথ্যে! মিথ্যে! ওর কুষ্ঠি দেখে ঠাকুরমশায় বলেছিলেন—।' সুনীতি গুমরে গুমরে ওঠে। ফাঁড়ার বয়েসটা অবশ্য কেটে গেছে। কিন্তু বয়েস কেটে গেলেই ফাঁড়া কেটে যাবে তার নিশ্চয়তা কী? শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেছিল বলে হয়তো তুটো বছর পেছিয়ে গেছে, গোঁয়ার্তুমি না করে খোকা যদি মাদুলীটা ধারণ করত!

সে-ও যদি ব্যাপারটার ওপর গুরুত্ব দিত!—অকথ্য অপরাধবোধে প্রাণটা স্থনীতির ফেটে যেতে চায়।

অশোক বলে, 'আচ্ছা, স্টুডেণ্টদের যে-প্রসেশন বেরোয়—

'ছোড়দা ওসবে নেই।'

পলিটিকস নয়, ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। পরমেশের কড়া শাসন। কিন্তু প্রসেশনে না গেলেই কি রেহাই মেলে? যদি কলেজ লাইব্রেরীতে গিয়ে থাকে? কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে থাকলেও—। আর্তকণ্ঠে পরমেশ শুধায়, 'ওকথা কেন বললে বাবা, ওকথা কেন বললে!'

অশোক কিছু ভেবে বলে নি। টেবিলে হেঁট হয়ে থাকায় মায়াকে চোখে চোখে চাওয়াতে না পেরে গলার আওয়াজটা শোনাতে চেয়েছিল: তার কথা শুনে মায়া নিশ্চয় তাকাবে। সঙ্গে সঙ্গে ইশারায় তাকে ঘরে যেতে বলবে।

নিজেও যাবে।

'চলো, ঘরে চলো' বলে সকলের সামনে বউকে তো আর ঘরে নিয়ে যেতে পারে না। ঘরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনটা এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠলেও।

'বাবা অশোক—!'

'না, এমনি—হঠাৎ মনে হল—'

'ভূদেব সেনের কথা?'

'অঁ্যা!' মায়া চমকে ওঠে।

মায়ার চমকানো দেখে অশোক নার্ভাস হয়ে যায়।

'খোকারই মতো ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে—'

'বাবা!'

'কলেজের মধ্যেই ছিল—'

'দেখুন, ওই একটাই যা—মানে দৈবাৎ—'

'একটা!' জামাইকে ধমক দিয়েই স্থনীতি ফুঁপিয়ে ওঠে। 'দিনদুপুরে মিছিল থেকে চার-চারটে ছেলেকে—'

মহী বলে, 'যত্ত সব বোগাস!'

'খবরের কাগজে বেরোয় নি?'

'তুই-ই—'

বেরিয়েছে। মহীই সে-খবর পড়ে শুনিয়েছে। কিন্তু অশোকই না তখন 'যত্ত সব বোগাস!' বলে চেঁচিয়ে ওঠে?

আর এখন?

যেন শুনতেও পায় নি। কেমন ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে আছে মায়ার দিকে। বেহায়ার বেহদ্দ কাঁহাকা!

গা কিসকিস করে মহীর। 'কী ব্যাপার বলো দেখি তোমাদের? চা পাব, না পাব না?' বউয়ের ওপর ফেটে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দু উঠে পড়ে।

মমতা বলে, 'তুমি বসো বৌদি, আমি দেখছি।'

'না, আমি যাই।'

'বাচ্চু উঠলে—'

ইন্দু ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে।

আন্দাজী কথা সকলে বলছে, অথচ জানা সত্ত্বেও খোকার সিনেমায় যাওয়ার কথাটা সে জানাতে পারছে না। এখানে বসে থেকে সে-কথা চেপে রাখায় যে কী অস্বস্তি!

এখন আর বলাও চলে না। খোকা না ফেরা পর্যন্ত সব ধাক্কা তাকেই তাহলে পোয়াতে হবে।

কিন্তু—। রেলিং ধরে ইন্দু থমকে দাঁড়ায়। সিনেমা থেকে ফিরতে নটা বড় জোর দশটা হতে পারে। সারা রাত—বুক ইন্দুর ধড়াস ধড়াস করে।

এদিকে দু-হাতে বুক থাবড়ায় সুনীতি: শুধু ঠাকুরমশায় নয়, গণক ঠাকুরও হাত দেখে ফাঁড়ার কথা বলেছিল। কেউ তখন গ্রাহ্য করে নি। কেউ না! কেউ না! কেউ না!

'মা!'

'মাকে নিয়ে তো মহা মুশকিল হল!'

'মিছিমিছি আপনি—মা!'

'ওকে কাঁদতে দাও, অশোক।'

'আপনিও—।'

'তুমিও বাবা—!'

'আমি ঠিক আছি! আমি ঠিক আছি!'

পরমেশের মতো রাশভারী মানুষও যদি ভেঙে পড়ে, বাড়িতে মড়াকান্না পড়ে যাবে। নিরর্থক।

মহীর মন বলছে নিরর্থক। খোকা নিশ্চয় কুশলে আছে। বিপদে পড়ে থাকলেও চরম অমঙ্গল খোকার হতেই পারে না।

খোকা যে মহীর বড় গর্বের ভাই। পাঁচজনের কাছে বুক ফুলিয়ে খোকার কথা যে মহী বলে বেড়ায়। চেহারায় লেখাপড়ায় হীরের টুকরো খোকার কথা।

সেই খোকা কিনা এমন বেকায়দায় তাকে ফেলল!

খোকার প্রতি ভালোবাসাটা খোকার অভাবে তীব্র আক্রোশে পরিণত হয়ে যায়। 'জানে বাড়িশুদ্ধ সবাই ভাববে—দিনকাল খারাপ—তবু একটা খবর পর্যন্ত না দিয়ে—' মহী দাঁতে দাঁত ঘষে, 'এমন ইরেসপনসিবল্ ছেলেকে ধরে চাবকানো উচিত।'

'ফিরে আসুক—'

'আসুক না একবার—'

'যদি আসে—'

'যদি আসে! কী বলছ বাবা?'

'হ্যাঁ, যদি আসে!' সশব্দে শ্বাস ছেড়ে পরমেশ উঠে দাঁড়ায়।

ভাম হয়ে থাকে সবাই। সুনীতি ফোঁপায় দমকে দমকে।

'ঘরে চলো।' দরজা থেকে সুনীতিকে প্রায় জোর করেই ঘরে নিয়ে গিয়ে পরমেশ দরজা ভেজিয়ে দেয়।

ঘর থেকে সুনীতির আথালি-পাথালি কান্না শোনা যায়। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে পরমেশের ফোঁপানি।

মায়া বলে, 'কী হবে!'

মমতা বলে, 'কী হবে দাদা!'

মহী সিগারেট্ ধরায়।

অশোক বলে, 'বুড়ো মানুষ তো—সামান্যতেই—'

'পাড়ায় একবার খোঁজ নিলে হত না?'

'পাড়ায় মেশে ছোড়দা? তুই জানিস না দিদি?'

জানে আবার না! বছরখানেক পরবাসী হলেও পাঁচ-পাঁচটা বছর এই পাড়ায় কাটিয়ে গেছে না? চোখ-কান বুজে কলেজে যাওয়া-আসা করতে হত না?

তার ওপর, পাড়ায় খোঁজ নিতে যাওয়া মানে পাড়াকে বাড়িতে ডেকে আনা। শিক্ষিত পরিবার বলে দূরে সরিয়ে রাখলেও, মডার্ন পরিবার বলে আড়ালে ঠাট্টা করলেও, চাঁদার গরজে ছাড়া এ-বাড়ির ছায়া কেউ না মাড়ালেও —শোক-সহানুভূতি জানাতে দল বেঁধে সবাই হামলে আসবে। সবার আগে হাবুল।

তখনই হাঁ করে চেয়ে থাকত, এই অবস্থায় দেখলে—

সস্নেহে মায়া পেটে হাত বুলোয়: না, মরে গেলেও কাঁদবে না। চিৎকার করে কাঁদবে না। কাউকে কাঁদতে দেবে না। চিৎকার করে কাঁদতে দেবে না। কেন কাঁদবে? খোকার কিছু হয়নি। ঠিকই বলেছে ও। মনকে সব সময় হাসিখুশি রাখা দরকার। ডাক্তার বলেছে। তাহলে আর কাঁদার কথা ওঠে কেন? খোকার যখন কিছু হয় নি, খোকার কিছু হয়নি, খোকার কিছু হয়নি, খোকার কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, হয়নি, হয়নি, হয়নি—

'কিছু বলছ?' অশোক শুধায়।

'অ্যা!' বিড়বিড় করছিল টের পেয়ে মায়া থরথর করে কেঁপে ওঠে।

ইন্দু এসে জানায়, 'চা হবে না।'

'কেন? চা হবে না কেন?' মহী দপ করে জ্বলে ওঠে।

'রাধাদি করতে পারবে না। কাঁদছে।'

'কাঁদছে!' মহী দপ করে নিভে যায়। মাইনে-করা মানুষটা তার ভাইয়ের জন্যে কাঁদছে! 'তা তুমিও তো করে আনতে পারতে?'

'দরজা আগলে বসে কাঁদছে। ঠাকুরপো না ফেরা পর্যন্ত নিজে কিছু করবে না, কাউকে করতে দেবেও না!'

'বেচারা!'

'আহা!'

'খুব ভালোবাসত ছোড়দাকে।'

'বাসত না, বাসে বল।'

'বাসে, বাসে।'

'নিজের ছেলের মতো।'

ছেলের মতো নয়, ছেলেই। প্রথম দিনেই কী ভাবে খোকাকে বুকে চেপে ধরেছিল—চোদ্দ বছরের পুরনো দৃশ্য আজও মহীর চোখে ভাসে।

পাট ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে দশজনে খুবলে খুবলে খায়, স্বামী সমেত সারা গুষ্টিকে হুপিয়ে হুপিয়ে শেষ করে, তাতেও সাধ মেটেনি—হাত-পা বেঁধে তিন বছরের খোকাকে তার জলন্ত ভিটায় ছুঁড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে, আধমরা রাধাকেও ধরে রেখে দেখায়।

এই খোকাকে বুকে নিয়ে সেই খোকার অভাব ভুলেছে। সামনে বলে খোকাবাবু, আড়ালে খোকাবাবা। সবাই জানে।

ঠেলে-আসা দীর্ঘশ্বাসটা গিলে ফেলে মহী শুধায়, 'কী করা যায় বলো তো অশোক?'

'তোমার টনিকটা'—

'কী বললে?'

'হুঁ, বড় ভাবনার কথাই হল।' অশোক সামাল দেয়।

টনিকটা খাওয়া হয়নি। হর্লিকস খাওয়া হয়নি। খাওয়ার কথা মায়া অবশ্য ভাবতেও পারছে না, তবু খেতে হবে। মায়া উঠে দাঁড়ায়।

শুধু নিজের কথা ভাবলে মায়ার চলে! মা হওয়া মুখের কথা! মায়া চলে যায়।

'আমার মন অবিশ্যি বলছে—'

মনে মনে দাদাকে মুখ ভেঙায় মমতা। তার দৃঢ় বিশ্বাস শিখার দাদা স্বব্রতদা নিশ্চয়ই যেখান থেকে হোক খোকাকে খুঁজে-পেতে নিয়ে আসতে পারে। স্বব্রতদা তার দাদার মতো ভীরু নয়, দাঙ্গার ভয়ে আপিস থেকে পালিয়ে এসে ঘরে বসে লম্বাচওড়া কথা বলে না।

কিন্তু হায়, স্বব্রতদার কথা বাড়ির কাউকে বলা যাবে না! অত কাজের হওয়া সত্ত্বেও খোকাকে খুঁজে আনার কাজে স্বব্রতদাকে লাগানো যাবে না!

'তবু দুশ্চিন্তা—নাকি বলো অশোক! তুমি ঠিকই বলেছিলে—গুণ্ডা আর অ্যান্টিসোশ্যাল—' গলা চিরে কাল অশোকের প্রতিবাদ করলেও আজ মহীর মনে হয় অশোকের কথাই ঠিক। পাকিস্তানে যাই হোক এখানকার মুসলমানরা তার ফল ভোগ করবে কেন? গুণ্ডাবদমাসদের লাই দেওয়া উচিত নয়। ওরা মাথায় চড়ে বসলে পরিণাম ভয়াবহ। মুসলমান ফুরিয়ে গেলে হিন্দুর ওপর হামলা শুরু করবে। করে নি গত দাঙ্গার পর? 'গবর্নমেন্টও তেমনি। ওদের নাড়িনক্ষত্র জানে, ইচ্ছে করলে এক ঘণ্টায় হাঙ্গামা থামাতে পারে—কিন্তু সর্বের মধ্যেই ভূত—নাকি বলো?'

কাল বললেও আজ আর অশোক বলে না। আজ মনে হয় মহীর কথাই ঠিক—পাকিস্তানে হিন্দুরা এক তরফা মার খায়, এখানকার মুসলমানরা পাল্টা মারও দেয়। পাকিস্তানের দাঙ্গায় কখনো মুসলমান মরে না, এখানকার দাঙ্গায় হিন্দুও মরে।

দিদির বড় নেওটা ছিল। দিদিও বড্ড ভালোবাসত ভাইকে। অশোকের দৌলতে মা হতে চলেছে, তবু সাধ, ছেলে যেন তার দেখতে-শুনতে মামার মতো হয়। ছোট মামার মতো। খোকার যদি কিছু হয়—মায়াকে বাঁচানো যাবে!

'বাচ্চু বোধ হয় উঠল, বৌদি।'

'উঠল?' ইন্দু উঠে পড়ে।

মমতাও। বৌদিকে যদি বলা যায় সুব্রতদার কথা। বুকে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করিয়ে বলা যায় যদি।

'থানায় একটা খবর দিয়ে রাখলে হয় না?'

'ঠিক বলেছ।' বাড়ির বড় ছেলে, অথচ হাত পা গুটিয়ে বসে আছে! অশোকের প্রস্তাব শুনে মহী বর্তে যায়। 'চলো, বেরনো যাক।'

থানায় খবর দিয়ে হবে কচু। খোকা কি ছোট্ট খোকা, না বাড়িতে রাগারাগি করে নিরুদ্দেশ?

কিন্তু বেরনো দরকার। বাড়ি থেকে থানা। থানা থেকে কাজের অজুহাতে এসপ্লানেড কি ড্যালহৌসি।

নিজের নামে জরুরী তার: ছুটি নাকচ, এক্ষুণি জয়েন কর।

মাথায় থাকুক কলকাতার নামী নার্সিং হোম!

খোকার ভালোমন্দর ওপর অশোকের হাত নেই, কিন্তু মায়ার ভালোমন্দ তার দেখা কর্তব্য।

হাসপাতালে খোকা নেই। কিন্তু সব আহত কি হাসপাতালে পৌছোয়? লাশ অনেক সময় গুম হয়ে যায় না? দশ-বারো দিন পরে হদিশ মেলে না?

খোকাও নির্ঘাত কোনো মুসলমান গুণ্ডার হাতে—

'চলুন মহীদা।'

অশোক তাড়া দেয়। গুণ্ডার হাতে খুন-হয়ে-যাওয়া খোকার খবর এসে পৌছনোর আগেই জরুরী তারের পৌছনো দরকার।

বেরনোর দরকার শেষ অবধি হয় না।

সদরের মুখেই দেখা।

পরনে ধুতিপাঞ্জাবী। গায়ে গরম চাদর।

দাদা-জামাইবাবুকে দেখে খোকা থমকে দাঁড়ায়।

খোকা ফিরেছে! খোকা ফিরেছে! খোকা ফিরেছে!

হুই হুই করতে করতে সবাই নেমে আসে। পরমেশ স্থনীতি মায়া মমতা ইন্দু মহী অশোক রাধা সবাই ঘিরে দাঁড়ায়।

মুখখানা হাসি হাসি করে, সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে খোকা পা বাড়ায়।

'সারা রাত কোথায় ছিলি রাস্কেল।' খপ করে মহী তার কাঁধ খামচে ধরে।

অশোক সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে দেয়।

স্থনীতি হাঁ হাঁ করে এসে ছেলেকে আগলে ধরে।

'কোথায় ছিলি বাবা, অ্যাঁ? তোর জন্মে ভেবে ভেবে—'

'আচ্ছা লোক তুমি ছোড়দা!'

'ছি খোকা ছি, তোর জন্মে আমরা সবাই—'

'আমি সব বলে দেব ঠাকুরপো—হাঁ।'

কারো কথার জবাব না দিয়ে খোকা গিয়ে তার ঘরে ঢোকে। পিছে পিছে মিছিল করে আসে সবাই। মিছিলের নেতা মহী।

শুধু দু ঘা দিতে পারল না বলে নয়, এত বড় অন্যায় করেও খোকাকে নির্বিকার দেখে মহীর সারা শরীরে জ্বালা ধরে যায়।

'কেন কাল বাড়ি থেকে—'

'দরকার থাকলে বেরোব না।'

দাদার ধমকে কোথায় কেঁদে ফেলবে, তা নয় মুখে মুখে জবাব! প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই জবাব! রাগে মহী এমনই দিশেহারা হয়ে যায় যে মুখে তার কথা সরে না।

মায়া শুধায়, 'কোথায় ছিলি সারা রাত?'

'নন্দদের বাড়ি।'

'নন্দ?'

'আমার বন্ধু।'

'বন্ধু! বন্ধুর বাড়ি রাত কাটাতে যাওয়া হয়েছিল কেন শুনতে পারি?'

'খুলনায় ওর মা-বাবা খুন হয়েছে। শুনে গিয়েছিলাম। অন্যায় করেছি ?' খোকা টান টান হয়ে দাঁড়ায়। 'কী, অন্যায় করেছি ?'

ভয়ানক দমে যায় মহী।

পরমেশ বলে, 'জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

'আমিই কি আগে জানতাম বাবা।'

ইন্দু বলে, 'যখন দেখলে ফিরতে পারছ না—একটা ফোন—'

'হাবড়া থেকে—'

মায়া বলে, 'হাওড়া তো গঙ্গা পেরোলেই—'

'হাওড়া নয়, দিদি—হাবড়া। বনগাঁ লাইনে।'

মমতা বলে, 'ভোরেই চলে আসতে কী হয়েছিল ?'

'ট্রেন আমি চালিয়ে আসব ?'

চটপট জবাব। খোকা অবিশ্যি খুবই স্মার্ট, কিন্তু এ সময় এতখানি স্মার্টনেস অশোকের কেমন কেমন ঠেকে। এমন বেপরোয়া স্মার্টনেস। চোখ-মুখ শুকনো। মনে হয় সারা রাত শরীরের ওপর দিয়ে জোর ধকল গেছে। মা-বাবার শোকে বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর মনও ভেঙে পড়া স্বাভাবিক। চটপট জবাব দিয়ে তাই রেহাই পেতে চাইছে ?

অশোক বলে, 'চলুন সবাই। ও কাপড়চোপড় ছেড়ে আসুক। বৌদি এবার—'

ইন্দু হাসি হাসি মুখে রাধার দিকে তাকায়।

চোখের জলে ধোয়া ভাঙাচোরা মুখখানা রাধার হাসিতে চিকচিক করে, 'দিমু জামাইবাবু। অখনি দিতাছি। কারো কিছু করন লাগব না—আপনেরা বয়েন গিয়া।' বলতে বলতে রাধা হেঁসেলে চলে যায়।

মমতা বলে, 'তুই না প্যাণ্ট পরে গিয়েছিলি ছোড়দা ?'

'গিয়েছিলাম তো। আছাড় খেয়ে—'

'আহা হা ! লাগে নি তো বাবা ! লাগে নি তো !'

'কাদা লেগেছে।' খোকা গায়ের চাদর খোলে। কাগজে মোড়া প্যাকেটটা বিছানায় রাখে।

'বিছানায় ওই নোংরা কাপড়চোপড়'—

'নোংরা না, মা, কাদা লেগেছে বললাম না।'

'তা হোক, তুই নিচে রাখ। রাধা কাচতে দিয়ে আসবে খন।'

'না। চাটা খেয়ে আমিই দিয়ে আসব' বলে খোকা বাথরুমে চলে যায়।

ফের বসে চায়ের আসর।

গরমাগরম লুচি হালুয়া।

আসরের ষোলকলা পূর্ণ হয় খোকার ঘর থেকে হঠাৎ ভেসে-আসা রবীন্দ্রসঙ্গীতে: আমরা, নূতন যৌবনেরি দূত।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে খোকা লাফিয়ে ওঠে, পড়িমরি করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে।

'কী ব্যাপার। কী ব্যাপার।' করতে করতে পিছু পিছু আসে আর সবাই।

ইন্দুর হাতে ট্রানজিস্টার। এক গাল হাসে ইন্দু।

খোকা গর্জে ওঠে, 'কেন তুমি ওটা বের করলে? কেন তুমি—।'

'ড্রাইং ক্লিনিংয়ে পাঠাব বলে প্যাকেটটা খুলতে—'

'কে তোমায় প্যাকেটে হাত দিতে বলেছিল?'

খপ্ করে অশোক হাতটা না ধরে ফেললে খোকা বুঝি ইন্দুর ওপরে ঝাঁপিয়েই পড়ত। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত ইন্দুকে: কেমন ধকধক করে জ্বলছে দুই চোখ, দাঁতে দাঁতে শান্ দিচ্ছে--কী অমানুষিক হিংস্র হয়ে উঠেছে মুখখানা!

'তাসের দেশের গান, নারে দিদি?'

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাসের দেশের গান! তাসের দেশের গান! প্যাণ্টের ওই দাগ কিসের? কাদার? জলে ধুলে কাদার রঙ কি লালচে হয়ে যায়? অশোক অপলক।

'কেন তুমি ওটা খুললে!' খোকা গলা চিরে ফেলে। ঝিমিয়ে পড়ে। পিছু হটে।

খোকাকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি প্যাণ্টটা যাতে মায়ার নজরে না পড়ে অশোক সরে দাঁড়ায়।

'বেশ গাইছে, নারে দিদি।'

তোফা গাইছে। মেয়েপুরুষের খাসা কোরাস।

'আরও জোর করে দিন বৌদি, আরও জোর করে দিন—কোরাস তা না হলে জমে না।' গলা ফাটিয়ে বলে অশোক।

এবং অধ্যাপক পরমেশ মুখুজ্জে সপরিবারে গান শোনে। নির্ভেজাল রবীন্দ্রসঙ্গীত।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

অগ্নিস্পর্শ

'দুধও খাব, তামাকও খাব'—এই 'গভাচর চন্দ্রী' সাধ আমারও কিন্তু জন্মগত। শুধু স্বাধীনতা চাই বা তদভাবে সাহিত্যরসের আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকো, এমন কথা অগ্রাহ্য। পাকামিটাও বোধ হয় মজ্জাগত, অন্তত কতকাংশে আমাদের বৈঠকখানাগত। না হলে ওবয়সে বঙ্কিম, মাইকেল প্রভৃতির ডাকে বাবার বই-এর আলমিরার চাবি সংগ্রহের বুদ্ধি এল কোথা থেকে? স্বাদেশিকতার ঝোঁকও ভেতরবাড়ি ও বৈঠকখানার টানা-পোড়েনে সেই সঙ্গে, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের মতো, এক-আধ গজ করে বেড়ে যাচ্ছিল। মেজ জেঠাইমার সকল জিনিসেই ঔৎসুক্য—মামা তাঁরই সহোদর; স্বদেশীতেও জেঠাইমা তাই উদাসীন নন। কিন্তু মামা কেন, আত্মীয়স্বজন সকলকেই তিনি আবার মমতার বশে সেই আগুনের আঁচ থেকে আড়াল করে দূরে রাখতেও উদ্‌গ্রীব। অথচ যুগটাই যে অগ্নিযুগ। হাওয়া বইলেই ছাইচাপা আগুনের দু-এক ঝলক দেখা দেয়। মোহনবাগান শীল্‌ড্ পেল। সে উৎসাহ পূর্ব-বাঙলার ওই ছোট শহরেও ছড়িয়ে পড়ল। শিব ভাদুড়ী, বিজয় ভাদুড়ী প্রভৃতি হিরোদের নামগোত্র আমাদেরও মুখস্ত, ছবিও কখনো কখনো বেড়া-স্থ। যিনি জীবনে ফুটবল কেন, কোনো খেলাই খেলেন নি, আমার সেই দাদা সে জয়-বর্ণনা দশগুণ প্রাণবন্ত করে তুললেন মুখে মুখে। বাবার ক্রিকেট-ফুটবলে উৎসাহ ছিল না। এই বিজয়ের উচ্ছ্বাসকে তিনি মৃদু পরিহাসে সংযত করতে ছাড়তেন না। তবু প্রিন্স রণজিৎ সিং থেকে ঢাকার সেদিনের অধ্যাপক এস. রায়., এ নামগুলো আমরা জপ করতাম। আর ভাবতাম, না, এদিকেও জাতির অখ্যাতি দূর না করলেই নয়। ঈটনের মাঠে ওয়াটার্লুর জয়, ইংরেজি প্রবাদ। কিন্তু কলকাতার ময়দানে ফুটবল নিয়ে ভারত-উদ্ধারের মহড়া—আমারও প্রত্যক্ষ সত্য। সে অবশ্য কলেজ জীবনের

কথা। আপাতত ১৯১১-এর মোহনবাগানের জয়ে ফুটবল থেকেও যে স্বদেশীয় ফুলকি ফুটে বেরুল বাড়ির কে তা বুঝবে? আরও কতখান থেকে যে তা বেরুচ্ছে, তাই বা কে জানে? রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ই কি জানতেন—কিম্বা বাবা বা দাদা বুঝতেন—'প্রবাসী'র পাতা থেকে এক অবোধ কিশোর একটুও না বুঝলেও কী বুঝত, আর কী আগ্রহে পড়ত রামলাল সরকারের ১৯১১-এর চীনা বিপ্লবের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত? কিম্বা কেমন করে রবীন্দ্রনাথের নোবল প্রাইজের গৌরবও তার মনে জোগাল ভারতের গৌরবের ধ্যান? দায়ী কেউ নয়—তখন অগ্নিযুগ, আগুনের আঁচ তার বাতাসে।

বারোর পথে এগোতে এগোতে সেই আগুনের একেবারে মুখোমুখি এসে পড়লাম। লাঠি খেলা তার অনেক আগেই বন্ধ; ন্যাশনাল স্কুল তখন কার্যত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত। ছাত্ররা অপেক্ষা করছে কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলে সাধারণ স্কুলে আবার ভর্তি হবে। শহরের পূর্বপ্রান্তে একটা মস্ত বড় বাগানে সে সময়ে শীতের শেষে মহোৎসব হত। বাগানটা যোগীদিয়ার হেমবাবুর। মহোৎসবের কাঠামোটা খাঁটি দিশি—মেলার মতোই তা অকৃত্রিম। এ কালের 'সর্বজনীন' এ কালের মতো করে ডিমোক্র্যাটিক হয়েছে। কিন্তু মেলা-মহোৎসব প্রভৃতি হচ্ছে দেশের মতো করেই ডিমোক্র্যাটিক। যাক গে। দু-একজন স্বদেশী ভাবনার মানুষ ওই মহোৎসবের উদ্যোক্তা। তাঁরা ওই দিশির গায়ে কালের ছোপও লাগালেন। উৎসবটা 'শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব'। ব্যাপারটা সমস্ত শহরের। সাধারণে চাঁদা দেয়; নানা কথকতা, পুঁথিপাঠ বক্তৃতা হয়; আর একদিন খিচুড়ী-লাব্‌ড়ার প্রসাদ নেয় হাজারে হাজারে ছোটবড়ো ছত্রিশ জাতের মানুষ। অন্তত সাত দিন ধরে চলত ভাগবত পাঠ, গীতার ব্যাখ্যা, ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা, আর মাঝে মাঝে কোনো শৌখীন দলের যাত্রাগান, নিমাই সন্ন্যাসের মতো পালা-কীর্তন। সেখানেই প্রথম কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের ভাগবতের কথকতা শুনে আমি মুগ্ধ ও চমৎকৃত হই। সে আসরে মল্লিক মহাশয়ের সমাদরও ছিল—উদ্যোক্তাদের অর্থের জোগান ছিল কিন্তু কম। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘদেহ, দীর্ঘকেশ, মধুরকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় শ্রীধর স্বামীর টীকা উদ্ধৃত করে যখন গীতার ব্যাখ্যা করতেন, কিম্বা গান ধরতেন, তখন মুগ্ধ হতাম। অনেক দিন পর্যন্ত সে রেশ কানে ছিল—মনেও। এই শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবেই আসত বিক্রীর জন্য বাঙলায় প্রকাশিত বিবেকানন্দের নানা বক্তৃতা ও লেখা। নটেশন-এর প্রকাশিত ইংরেজিতে বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও লেখা স্থায়ী হয়েছিল বাবার

আলমিরাতে। বোধহয় দাদাই তারও উদ্যোক্তা,—এখনো তা আমার উত্তরাধিকারে। কিন্তু বক্তৃতার কথা উঠলে বাবা বলতেন, "কেশববাবুই ইংরেজি বাগ্মিতায় অদ্বিতীয়।"—তাঁর বক্তৃতার বইও আলমিরাতেই ছিল। মন কিন্তু ওই কথাটা মানতে চাইত না। হিন্দুপুনরুজ্জীবনের 'হেরো' যে বিবেকানন্দ। আর সে যুগটা বাঙলা দেশে Hero as the Orator-এর যুগ। বিবেকানন্দকে তাই অদ্বিতীয় বাগ্মীও প্রমাণ করা দরকার—বিশেষত ইংরেজিতে। অথচ ইংরেজির রস-বিচার তখনো আমাদের অসাধ্য। নটেশন্-এর প্রকাশিত গ্রন্থটার পাতা উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে রেখে দিতাম। এমন সময় এসে গেল বিক্রীর জন্য উদ্বোধনের প্রকাশিত বিবেকানন্দের বই, বক্তৃতা, লেখা, চিঠিপত্র, ডায়ারি। বইগুলি বাঙলায়। কিছু যে অনুবাদ তাও জানতাম; কিন্তু ভাবটা মাতৃভাষাতেই সহজে ধরতে পারি। চলতি বাঙলার লেখাগুলো পড়ে চমকিত হই। স্টাইলের সম্পূর্ণ মূল্য বুঝবার মতো বিচারশক্তি তখনো জন্মে নি; কিন্তু বোধশক্তির উন্মেষ হয়েছে। তাই অনুভব করছিলাম কোনো কোনো লেখার ও বক্তৃতার ভাষা আড়ষ্ট, কৃত্রিম; আবার কোনো কোনো লেখা—'সাধু বাঙলা' না হলেও--পৌরুষময়। একটা কথা এখন ভাবছি—বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে তো অনেক ভাষায় গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হবে। কিন্তু বাঙলা সংস্করণে কি উল্লেখ থাকবে কোন্‌টি স্বামীজীর মৌলিক রচনা, কোন্‌টি অপরের অনুবাদ? পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও মনে হয়েছে কোনো কোনো অনুবাদ বড়োই আড়ষ্ট; সে সবের পুনরনুবাদ করানোই কি উচিত নয়? অনুবাদও একটা বিজ্ঞান। যুগে যুগে নতুন করে তা করতে হয়; চেষ্টার পর চেষ্টায় তা মূলের তুল্য হয়, নিকট থেকে নিকটতর হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য মূল লেখারও, ইংরেজি বাঙলা যাই হোক—টীকাসুদ্ধ সম্পাদন করা প্রয়োজন। যাই হোক্, সেই বারো বৎসর বয়সে বাঙলা লেখার মধ্য দিয়েই প্রথম পেলাম বিবেকানন্দের স্পর্শ—আগুনের পরশমণি।

'আগুন' ছাড়া ও-মানুষের অন্য কোনো তুলনা নেই। তাঁর লেখার বা কথার সম্বন্ধেও না। সব লেখা আমি পড়ি নি। 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি বইগুলো তখন ভয়ে ভক্তিতে পড়তে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। যা তখন পড়েছি আর বুঝেছি, আজ তা-ই সকলের মুখে, দেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। অর্থাৎ তখনো মিথ্যা বুঝিনি তাঁকে। আমরা দেখেছিলাম—যা মিসেস বেসান্ট বলেছেন—বিবেকানন্দের দুর্জয় যোদ্ধরূপ। বীর্যবান্ স্বাদেশিকতার ও

নব্যহিন্দুত্বের উন্মাদনার উৎস। আমাদের জীবনে পরেকার দশ বছর এই বীর সেনাপতিরই রাজত্বকাল। এ রাজত্ব আমার ওপরে একছত্র রাজত্ব হতে গিয়েও হয়ে ওঠে নি, আবার একেবারে বিলুপ্ত হয় নি,—এখনো না। বাঙলা দেশে যাকে অগ্নিযুগ বলে তার অগ্নিমন্ত্র কেউ যদি জুগিয়ে থাকেন তবে সে বিবেকানন্দ। সে যুগের অসম্পূর্ণতা অনেক—আমাদের জীবনের ও আয়োজনের মধ্যেই তার প্রমাণ পুঞ্জিত। তথাপি সে যুগের যা দান তা অতুলনীয়। আর সে দান বহুলাংশে বিবেকানন্দের দান: ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা, আক্ষুদ্র ভারতের জনসাধারণের জন্য মমতা, নির্ভীকতা সংযম ও ত্যাগের মূল্যবোধ। তখনকার দিনে আমরা যে-বিবেকানন্দকে পেয়েছি তিনি নিবেদিতার বিবেকানন্দ, পরে রলাঁ তাঁকে কালের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করে দেখান। আমরা সেদিনে ভাবতাম সেই বিবেকানন্দই বেলুড় মঠে ও রামকৃষ্ণ মিশনেও রূপায়িত হচ্ছেন। তাই ওদুই প্রতিষ্ঠানও আমাদের চোখে ছিল দুই আদর্শ প্রতিষ্ঠান। চাইতাম মিশনের লোকদের কাছে সেবাধর্মের শিক্ষানবিশী, কর্মযোগের দীক্ষা—তারপর কেউ না হয় নেবে জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে সাধনার পথ; কিন্তু অধিকাংশেই নেবে স্বদেশীর বীর্যবান ধর্ম—এই ছিল আমাদের তখনকার ধারণা। এ ধারণার জন্য অবশ্য সেই মঠ-মিশনের লোকেরা দায়ী নন। দায়ী বিবেকানন্দ স্বয়ং, দায়ী তাঁর লেখা কথা, দায়ী তাঁর তৈরি-করা মানুষ নিবেদিতা।

কথাটা এ প্রসঙ্গেই শেষ করে ফেলা যাক :—প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে একাধিক ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে স্বদেশী ভাবের যুবকেরা সেবায়োজনে শিক্ষানবিশী করে—বর্ধমানের প্লাবনে, বাঁকুড়ার নোয়াখালির দুর্ভিক্ষে। তাদের লক্ষ্য কিন্তু স্বদেশসেবা। লর্ড রোনাল্‌ডশে তাই বললেন, 'স্বদেশীরা' রামকৃষ্ণ মিশনের আবরণে গা-ঢাকা দিয়ে চলে। মিশনের তখনকার প্রেসিডেণ্ট্‌ তৎক্ষণাৎ এ কথার প্রতিবাদ করে জানালেন—মিশন ধর্মসাধনার প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি তার অস্পৃশ্য। তাঁর কথা সম্পূর্ণ সত্য। তবে আমরা তা বুঝতাম না। জানতাম না যে, ওজন্যই বিবেকানন্দের বিদায়ের পনের দিনের মধ্যেই নিবেদিতাকেও মিশনের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়। স্বদেশীদের মনে তখনো মিশন-মঠই body of Vivekananda. তারপর, ১৯২১ থেকে আর্তসেবার কাজ কংগ্রেস সংগঠন ও কংগ্রেস কর্মীরা হাতে তুলে নিলেন। সেবাধর্মে মিশনের স্থান গৌণ হয়ে পড়ে; মিশনের তাগিদও কমে আসে। তখন থেকে

বিবেকানন্দের রাজত্বও স্বদেশীদের সমাজে স্তিমিত হতে থাকে। ১৯৩০-এর পর থেকে সেই মঠ-মিশন আর বাংলা দেশের প্রাণচঞ্চল যুবকদের আকর্ষণ করল না। দোষটা সবই যুবকদের নয়, ফলটাও কারো পক্ষেই সম্পূর্ণ শুভদায়ক হয় নি। অবশ্য দ্বিতীয় বিবেকানন্দের রাজত্বও দেখা দিয়েছে—১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরে। তবে তা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের রাজত্ব বা মঠ-রাজত্ব। এ চার্চে আত্মত্যাগী পরিচালক আছেন, স্বার্থত্যাগী ভক্ত আছেন, সুশিক্ষিত সাধক সন্ন্যাসীও আছেন। আর বিত্তবান্ কীর্তিমান, এমনকি, বিদ্বান্, গৃহিণীদের ভীড়ে আজ রামকৃষ্ণ মিশনের জয়জয়কার। ঠাঁই নেই 'দরিদ্র নারায়ণের'। অচলায়তনে শোণিতপাংশু অদৃশ্য। মঠ-মনেস্টারি মাত্রেরই পরিণতি কি অচলায়তন?

কর্মযোগের রূপ

শিবের গাজন গেয়ে ফেললাম। ধানভানা বাদ দিতে চাই না। বিবেকানন্দের বাঙলা বই বাবাকে বা দাদাকে আকর্ষণ করে নি। তা বাড়িতে পাই নি। পেয়েছি বন্ধুবান্ধব সহপাঠীদের থেকে। আসলে পেয়েছিলাম একজনার কাছে। সে যজ্ঞেশ্বর দত্ত। বাদামতলারই বাসিন্দা, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে নয়। ওঁর দাদারা দু পা সরে এসে ঠিক বাদামতলায় তাঁদের দোকান খুলেছেন—সোনারূপার অলঙ্কারের কারখানা ও দোকান। কাছাকাছি তিনটি স্বর্ণকারের দোকান-কারখানার মধ্যে এটি মাঝারি। এরা নতুন মাথা জাগিয়েছেন, মাথা উপরে তুলতেও দৃঢ় সংকল্প। আমাদের বৈঠকখানার দিকে নিকটতম প্রতিবেশী এরা—এদের বাসাবাড়ি, দোকান, কারখানা। আগে পুকুরের এই পশ্চিমপাড়টা জুড়ে থাকতেন পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা কেউ কেউ। সে প্রায় অতীত ইতিহাস। আমার বাল্যে কৈশোরে যজ্ঞেশ্বররাই হ'ল তার বাসিন্দা। এরা জাতিতে কর্মকার, ব্যবসায়ে স্বর্ণকার, পরে মনোহারী দোকানদারও হন। এরাও সকলে সেই ঢাকা-বিক্রমপুরের ঔপনিবেশিক! এখন শুনলে কি নতুন শোনাবে, তখন পর্যন্ত এসব জাতের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যদের তফাৎটা আরও বেশি ছিল? একালের শিক্ষাও ব্যাপ্ত হয় নি, কিন্তু হতে শুরু করেছে। আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীতেই তাই সব জাতের মানুষ ছিলেন—যাদের 'জলচল নেই' তেমনও ছিলেন কেউ কেউ সাহা, যুগী, ধোপা ইত্যাদি। আমাদের বাড়িতে মা-জেঠাইমাদের কাছে তাদের বরাবরই 'জলচল'—কিন্তু সে অন্য কথা।

এ প্রসঙ্গে শুধু আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি—প্রতিবেশীরূপে আমি নিকট থেকে দেখতে পেয়েছিলাম—বাল্যে কৈশোরে বাদামতলায় ওই 'কামার-বাড়ির' মেয়ে-পুরুষদের; যৌবনে কলকাতায় কিছুদিন একটি অবস্থাপন্ন মুসলমান পরিবারকে; আর পরিণত বয়সে মানিকতলা শুঁড়িপাড়ার বাসিন্দাদের। অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি—এদের জীবনযাত্রায়, আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে আচরণে দেখেছি অসামান্য আন্তরিকতা ও সদাচার। বিশেষত এই কথা সত্য আবার ওই তিন জাতের তিন পরিবারের মেয়েদের সম্বন্ধে! যজ্ঞেশ্বরদের কাজেকর্মে, কথাবার্তায়, ব্যবহারে দেখেছি কর্মব্যস্ত সুসংযত ভাব, শিষ্ট স্বভাব ভদ্র আচরণ। যখন-তখন তাঁদের অন্দর মহলেও গিয়েছি, উচ্চকণ্ঠ কারও শুনিনি। ঘর দুয়ার পরিচ্ছন্ন নিকানো-পুছানো। বাড়িতে লোক অনেক। নিজেরা আছে, জ্ঞাতিকুটুম্ব, কারিগর—দোকানে কাজ করে, বাড়িতে খায়। সে যেন ভারতীয় 'গিল্ড্' বিশেষ। মেয়েদেরও পরিশ্রমেই সংসারটাকে চালাতে হয়। নিশ্চয়ই সংসারের চাকায় সর্বদা প্রচুর তেল জোটে নি; কিন্তু কখনো কর্কশ আর্তনাদ শোনা যায় না। ভেতরে-ভেতর এঁদেরও ঠোকাঠুকি হয়তো হত, সব সংসারে যেমন হয়—কিন্তু বাইরে তার কাংস্যধ্বনি পৌঁছয় না। এই তো যথার্থ ভদ্র সংসার।

যজ্ঞেশ্বর অবশ্য বেশি সময়েই থাকৃত বাইরের একটা ছোট ঘরে। একপাশে চাউলের গোলা—চাউল 'রাখী' করে দাদারা বাজারে বিক্রী করেন,—আর পাশে ছোট তক্তপোষ, আর চৌকি ও প্যাকিং বাক্সের কাঠের টেবল তাক্,—এই যজ্ঞেশ্বরের আস্তানা। অদূরেই কারখানা কাম্ দোকান, সকাল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত চলছে ঠুক-ঠাক্। তার একদিকে লম্বা গুটি কয় তক্তাপোষ, পাটি পাতা, স্তূপীকৃত কাঁথা-কাপড়ের গুটানো বিছানা। কারিগররা রাত্রিতে ঘুমোয়, দিনে বিশ্রাম করে, তাস পাশা খেলে। ভেতর বাড়িতে একপাশে ওদের ছোট ঠাকুর-ঘর আছে—সন্ধ্যার পরে তাতে কীর্তন চলে। বাইরে থেকেও দু-চারজন উৎসাহী আত্মীয় বন্ধু তাতে জোটে। নাম কীর্তনে, হরির লুটের নাচে গানে, খোলে করতালে বাদামতলা গরম করে রাখে তারা। বৈঠকখানার মজলিসে পর্যন্ত বড়োদের মধ্যে মাঝে-মাঝে কথা হয়—"এবার একটু থাম্‌লে বাঁচি।" গান-বাজনা সম্বন্ধে আমার কান সামান্য। ওই 'নিতাই-গৌর, নিতাইগৌর' আমাকে আকর্ষণ করে নি—গীতরসেও না, ভক্তিরসেও না। অনেক বেশি আগ্রহ ছিল যজ্ঞেশ্বরদের কামারশালায় বসে কারিগরদের কাজ দেখায়। হাতের কারুকর্ম, নকসার সূক্ষ্মতা, চারুতা, এসবে ছিল দৃষ্টি মুগ্ধ। নানা গল্পও

সেখানে তাদের মুখে শুনতাম। ওখানেই কৈশোর না পেরুতেই ছু যাই ঝাবা খেলা শিখে ফেলি। সে নেশা তখন এমন পেয়েছিল যে পরীক্ষার উত্তোলিত খড়্গেও তা বাধা পেত না। এই কারিগরদের সঙ্গে কথাবার্তায়, খেলতে খেলতে আমরা তাদের কাজে-ভরা জীবনের, সহজ সুখদুঃখ ধ্যান-ধারণারও মধ্যে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ লাভ করেছিলাম—অবশ্য সে তত্ত্ব তখনো অজ্ঞাত। ব্যাপারটা কিন্তু অনেকে সুনজরে দেখতেন না—পদস্থ ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে 'কামার দোকানে' কি করি কামারদের সঙ্গে ? এখন বলতে পারি—আমার বাদামতলার ওটাও একটা বিশেষ অধ্যায়। স্থূলতা রূঢ়তা এই কারিগর শ্রেণীর মধ্যে থাকবার কথা, কিন্তু ওখানে তা প্রশ্রয় পেত না—একটি অশিষ্ট শব্দও আমি তাদের মুখে শুনেছি মনে পড়ে না। সহজ সহৃদয় মানুষ, লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, কিন্তু পৃথিবীর নানা কথা জানতে উৎসুক। ১৯১৪ থেকে যুদ্ধকালীন বাঙলা দৈনিক তাঁরা রাখতেন, পড়তেন, কাজ করতে করতে পড়া শুনতেন। সাধারণ কেরানি ভদ্রলোকদের থেকে এসব খবরাখবরে এই 'অশিক্ষিত' কারিগর কর্মীদের ঔৎসুক্য কম ছিল না। যজ্ঞেশ্বর ছিল তাদের গৌরব স্থল—সে লেখাপড়া করছে। তার বন্ধুরাও স্নেহ, আদর ও সম্মানেরও পাত্র। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 'দুয়ার থেকে অদূরে' দেখা এই কারিগর মিস্ত্রিদের স্মৃতিতে স্থূলতা কুশ্রীতার দাগ খুঁজে পাই না—একটা সহজ 'আটপৌরে' সদাচারের ছাপই তাতে দেখছি। আমার কাছে সত্যকার মেহনতি মানুষের এই প্রথম পরিচয়, এই প্রধান স্মৃতি—কর্মযোগের সহজ রূপ। ধান ভানতে গিয়েও তাই আবার এতটা কথা পাড়তে হল। আমার স্বদেশী-যোগের এও যে পটভূমি।

স্বদেশী-যোগ

যজ্ঞেশ্বর বাদামতলায় দাদাদের কাছে এসেছিল একটু বিলম্বে—তাঁরা যখন এখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। সে কনিষ্ঠ ভাই, তাকে তাঁরা পড়াশুনা করাবেন—তাঁদের উচ্চাশার এও একটা অংশ। সত্যই তাঁদের আশা সফল হয়েছিল—যজ্ঞেশ্বরের পড়াশুনায় মন ছিল। বি. এ. পাশ সে করে কৃতিত্বের সঙ্গেই, কিন্তু সে কথা এখানে নয়। বাল্যে সে পড়ত অন্যত্র এক আত্মীয় কারিগরের দোকানে থেকে—যতদূর বুঝেছি—সম্ভবতঃ স্বদেশী-যোগেই যুগীদিয়ার সে স্কুলেরও জন্ম। প্রকাশ্যে ন্যাশনাল স্কুল নয়, কিন্তু মনে মনে তাই। স্কুলের এই মন

বোধহয় যুগীদিয়ার জমিদার-গোষ্ঠীর মানুষ তার হেডমাষ্টার মশায়ের তৈরি। তাঁকে আমি দেখি নি, সে স্কুলও না। দেখেছি তার ছাত্র যজ্ঞেশ্বরকে ও মাঝে-মাঝে তার পূর্বতন সতীর্থদের—সে মন তারা কিছুটা বহন করে আনত, শহরে আমাদের গায়েও তার আঁচ দিয়ে যেত—সেখানকার পাঠ্যবিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যপদ্ধতির কথায় গল্পে। তাতে মনে হয়—স্কুলটার একটা আদর্শ ছিল। কতজন ছাত্র কি ভাবে জীবনে জেনে-না-জেনে তার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে, কে তা বলবে?

যজ্ঞেশ্বরের ছিল নানা সৎবিষয়ে উৎসাহ। আমার থেকে সে বছর তিন-চার বড়ো। এক ক্লাশ উপরে পড়ে, লেখাপড়ায় মনোযোগী, পূর্বপুরুষের কারুবিদ্যায়ও সে সুদক্ষ শিল্পী হতে পারত। ড্রয়িংএ হাত ছিল, লেখাও ছিল চমৎকার। দীপান্বিতায় বাজি তৈরি করা ছিল তাদের বাড়ির কারিগরদের একটা ঝোঁক। যজ্ঞেশ্বরেরও। একবার সেই বাজি তৈরি করতে গিয়েই তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল। অন্য চোখ সম্বন্ধেও তারপর সাবধান হতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে বিবেকানন্দের ও ওরকমের অন্য বই যজ্ঞেশ্বরের কাছে আসত। সে সংগ্রহ করত, সম্ভব হলে কিনত। আমরাও হতাম তার পাঠক। আমাদের বাড়ির বাবার আলমারির দুই একটা বইও চুরি করে তাকে পড়তে না দিতাম, এমন নয়। তাঁর নিভৃত চালাঘরে পড়বারও সুযোগ অব্যাহত। পড়ার মতোই আমাদের বাদামতলার খেলার ফাঁকে তা ছিল গল্পের জায়গা। সেই সূত্রেই পাই জিলা স্কুলের একটা ভালো ছাত্রগোষ্ঠীর পরিচয় ও বন্ধুত্ব—উপেন রায়, ইঞ্জিনীয়ার রাইমোহন ভৌমিক, ডাক্তার প্রাণকুমার কর প্রভৃতি ছিলেন যজ্ঞেশ্বরের সহপাঠী। 'গুণ্ডা ছেলের স্কুল' ও 'ভালো ছেলের স্কুলের' মধ্যেকার দূরত্বটা বাদামতলার ওই যজ্ঞেশ্বরের চালাঘরে এসে মিলিয়ে যেতে থাকে। সত্যই মিলিয়ে যায় অবশ্য ওই বিবেকানন্দের কর্মযোগের ও তার পরেকার স্বদেশী-যোগের যোগাযোগে।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও বিপ্লবায়োজন

কালের মন্দিরা তখন বামে বাজতে শুরু করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল (১৯১৪-১৯১৮)। বৈঠকখানার কান দিয়েই তার প্রথম খোঁজ পাই। রুশ-জাপান যুদ্ধের ছোপ তখনো বৈঠকখানার ছবিতে। ত্রিপলির যুদ্ধের সময়ে বাজারের মুসলমান দোকানিদের দোকানে তুর্কী যোদ্ধাদের বড় বড়ো

বড়ো রঙীন ছবি দেখতাম। মুসলমান ছাত্ররা দেখলাম একদিন লাল ফেজ-টুপি ছিঁড়ে ফেলল—তা নাকি ইতালির তৈরি। আর রুমের সোল্‌তান জেহাদ ঘোষণা করেছেন ইতালির বিরুদ্ধে। তারপর বল্‌কান্ যুদ্ধে শুনলাম বুলগেরিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি কোনো কোনো দেশ তুর্কীর অধীনতা-পাশ ছেদন করে স্বাধীন হচ্ছে। নিশ্চয়ই তা উৎসাহের কথা। তবে তার ছাপও বৈঠকখানার গায়ে বেশি লাগল না। বাবার মুখে শুনতাম, "বড়ো রকমের যুদ্ধ একটা হবে জার্মানির সঙ্গে সম্ভবত ইংরেজের। অনেক দিন ধরে জার্মানি তৈরি হচ্ছে। সেই ১৮৭১-এ ফ্রান্সের গৌরব ধূলিসাৎ করে সে-ই হয়েছে ইউরোপ-ভূমির প্রধান শক্তি। বড়ো রকমের সাম্রাজ্য না পেলেই তার নয়।"

সেদিনটাও স্পষ্ট মনে আছে—৪ঠা আগস্ট, ১৯১৪। জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করল বেলজিয়মের স্বপক্ষে। আরম্ভ হল প্রথম মহাযুদ্ধ—আর তা শেষ হল ১৯১৮-র ১১ই নবেম্বর। চার বৎসর তো নয়, চারটা আজগুবি কাণ্ডের যুগ। কামানে-কামানে যুদ্ধ থেকে বিমানে-বিমানে যুদ্ধ। তারপর ট্যাঙ্কের পাল্লা। ক্রুজার-ব্যাটলশিপ্-এর সমুদ্রশাসন আর সাবমেরিন-টর্পেডোর গুপ্তাঘাত। গুজবেরও জোয়ার—এমডেন-এর কথা বলেছি। রাত্রে পথে দাঁড়িয়ে বয়স্করা গবেষণা করতেন আকাশে যা জ্বলছে তা কী? জেপলিন যে তা না বললেও চলে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কী? শুধু গুজব নয়। নিটশে ট্রিটস্কে প্রভৃতি নাম শুনলাম। বাবা প্রুশীয় জঙ্গীবাদ ও 'জার্মান কুল্‌টুর'-এর বিশ্বগ্রাসী হা আবিষ্কার করছেন নতুন বই থেকে। দাদা একবার নিয়ে এলেন নিটশে সম্বন্ধে চটি বই। ষোল আনা বোঝা অসম্ভব, কিন্তু সেই আবহাওয়ায় চার আনা কিম্বা ছ আনা বোঝা এই বারো-ছাপানো 'পাকা' ছেলের পক্ষে অসম্ভব হত না। ইংরেজি দৈনিক পড়ছি বাড়িতে; বাঙলা দৈনিক যজ্ঞেশ্বরদের ওখানে। নতুন কথা, নতুন শব্দ, নতুন আবিষ্কার, নতুন ধারণারও সঙ্গে পরিচয় প্রতি প্রভাতে। সুরেন্দ্রনাথ-তিলকের জোড়ালাগা কংগ্রেসও কি কম আশার উৎসাহের জিনিস? যুদ্ধের চমককে ছাপিয়ে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে কাছেকার ঘটনাও।—এখানে স্বদেশী ডাকাতি, ওখানে বোমার আবির্ভাব, আর একখানে গোয়েন্দার স্বদেশীগুলিতে মৃত্যু। নির্মলকান্ত গুপ্তের মামলা নিয়ে আলোচনা সর্বত্র। বারবার জুরী বদলিয়েও হাইকোর্টের বিশেষ বিচারক এই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করাতে ব্যর্থ। সকলের মুখে ক্ষোভ, এ কি বিচারের প্রহসন। তার ওপরে

মুসলমানপাড়া বোমার মামলায় আসামী হয়ে পড়ল একেবারে আমাদের ঘরের পাশের ছেলে।—আমার বন্ধু উপেন সেনের দাদা সেনপাড়ার নগেন সেন। নগেন প্রেসিডেন্সির ছাত্র। রূপেগুণে সেনপাড়ার মধ্যমণি—সকলেই অবশ্য বরাবর জানত নগেন অসামান্য। বোমার কথা শুনে বুঝল—নগেনের তা অসাধ্য নয় কিন্তু তার দণ্ড হলে তা হবে সকলের দুর্ভাগ্য। মামলায় বেকসুর মুক্তি পেয়ে নগেন বিলাত চলে গেল। তারপরে যখন ফিরে এল (১৯২৩ ?) তখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। সহৃদয়, কিন্তু বড় চাকুরে মাত্র। কিন্তু তার মামলা উপলক্ষ্য করে আবর্তিত হল শহর ; প্রবর্তিত হয়ে গেল দেশে প্রথম ভারতরক্ষা আইন। কারণ তার আগে—মুসলমান পাড়া বোমার মামলার পূর্বে পরে এখানে ওখানে স্বদেশীদের দুঃসাহসী কাজের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। দেশের সংবাদপত্রগুলি খবর ছাপছে ফলাও করে। মুখে অবশ্য তারাও করছে এইসব 'দুষ্কর্মের' নিন্দা। চারদিকে কিন্তু গোপনে গুঞ্জন 'সাধু! সাধু!' আর আরও চাপা একটা কর্ম-ব্যস্ততা। ছাই-চাপা আগুনের থেকে এক-এক ফুঁতে যেন আগুনের ফুলকি জ্বলে ওঠে রিভলবারের মুখে, বোমার দীপ্তিতে। আবার তখুনি ছাইচাপা দিয়ে তা ঢাকা হয়। শহরে দেখা যায় ছেলেদের শরীরচর্চার উৎসাহ দ্বিগুণ। দৌড়-ঝাঁপের প্রতিযোগিতায় পরম আগ্রহ। সেবা-শুশ্রূষার সংগঠন, আয়োজন অভিনব—বিবেকানন্দ যেন পাড়ায় পাড়ায় যুবকপ্রাণে জীবন্ত। আমাদের প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বরের ঘরে আবার তার একটা পীঠস্থান। কোথায় কলেরা, কোথায় টাইফয়েড তা যেন সেখানে যেসব ছাত্র আসে তার খোঁজ রাখা, শুশ্রূষা করা তাদেরই দায়। আসেও আবার অচেনা মুখ, তরুণ যুবক গ্রাম থেকে। সকলেই চাপা-চেতনায় উদ্দীপ্ত ; কী কাজ তাদের বোঝা যায় না—আর তাই বোঝা আরও সহজ। আমাকে কিন্তু একটু দূরে রাখবার চেষ্টা তাদের—অথচ আমার ভাই সাধু তাদের অন্তরঙ্গ। চাপা কথা, চাপা উত্তেজনা, গোপন সক্রিয়তার মাঝ থেকে তাদের কাজ ও দেশের নানা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কার আমার পক্ষে দুঃসাধ্য নয়। কোনো কোনো বিষয়ে আমার দৃষ্টি তো বরাবরই তীক্ষ্ণ। শুধু বাঙলা নয়, বারাণসীর ষড়যন্ত্র মামলার শচীন সান্যাল, পিঙ্গলেদের কাজ আমার সুপরিচিত। পাঞ্জাবের গুরুমুখ সিংহ, ভাই পরমানন্দদের ছাড়িয়ে, আমেরিকার গদর দল, সানফ্রান্সিস্কোর বিপ্লবী চক্র, জার্মানির সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত বিপ্লবী চক্রের কোনো কথা আমার চোখ এড়াত না। কলকাতার মোটের ডাকাতিগুলোর তথ্যও

সংবাদপত্র থেকে আমার মুখস্থ। হেদোর মোড়ে সুরেশ ভট্টাচার্যকে সকালবেলা গুলি করে যারা পালিয়ে গেল তাদের নাম না বেরুলেও বিবরণটা আমার সম্পূর্ণ জানা। আমড়াতলার এক বাড়িতে কে প্রশ্ন করলে "কি হে, যতীন, তুমি এখানে?" অমনি গুলিতে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর সাইকেল করে বাড়ির সেই যুবকেরা পালিয়ে গেল। যাকে 'শিকারের' চেষ্টা সেই 'যতীন' আর হেদোর সেই পলাতকরা একসঙ্গে অবশ্য আবিষ্কৃত হলেন পরে বালেশ্বরে একেবারে বুড়ী-বালামের তীরে 'বাঘা যতীন', চিত্তপ্রিয় প্রভৃতি রূপে। কিন্তু তার পূর্বেই সাইকেল ভাড়া করে এনে সাইকেল শিখল যজ্ঞেশ্বর, সাধু প্রভৃতি। ছোট বলে আমাকেও আর দূরে রাখা কি সম্ভব? ম্যাৎসিনি-গ্যারিবলডীর জীবনী ও সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা', অক্ষয় মৈত্রেয়ের 'সিরাজদ্দৌলা', এসব আমাকে একেবারে ফাঁকি দিয়ে পড়াও যায় না, চালাচাল করাও অসম্ভব। আমারও উত্তেজনাটা চাপা থাকে না—শরীরে আমি সামান্য বলে সকলেরই বিশ্বাস। কথাটা মিথ্যা নয়। তা অপ্রমাণিত করবার জেদ আমাকেও করেছে শহরের দুরন্ত ছেলে, দেহের কষ্টে বা মনের সাহসে বাড়াবাড়ি করতে অকুণ্ঠিত। শিশু বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এই বর্ণচোরা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে মুক্ত হতে পারি নি। যে কাজেই আমি অপটু বলে লোকের সন্দেহ, তাতেই আমি এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। 'কী মনে করে ওরা?—দেশকে আমি ভালোবাসি না? না স্বদেশীতে আমার সাহস নেই?'—এই সংশয় সেদিনের তেরো বছরের পক্ষে বড়ো অসহনীয় চ্যালেঞ্জ। আজ হলে অবশ্য মনোবিজ্ঞানীদের দয়ায় সহজেই বলতে পারি—এই অভিমানটাই তো প্রমাণ যে, অনেকটা জোর করেই কায়িক অতি-প্রয়াস ও মানসিক অতি-সাহসে নিজের অভাবই আমি ঢাকা দিচ্ছিলাম। সেদিন তো মনোবিজ্ঞান জানতাম না। মানতামও না। স্থির হলাম, যখন অভিমানটা সম্পূর্ণ শান্ত হল—যজ্ঞেশ্বর আমাকে অচিরেই সমিতির স্থানীয় নেতার নিকটে নিয়ে গেল। না বললেও তাঁকে জানতাম। তিনি নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়—তখন তিনি আমাদের ইস্কুলের মাস্টারও। আর তাঁদের কথার শেষে বুঝলাম—দ্বিধা ছিল কোথায়—"বয়সটা চৌদ্দও নয়"। কিন্তু চৌদ্দ কি সকলেই ছিল—ছিল রাজপুত বালক বীর বাদল? দুদিন পরেই তো আমি হব চৌদ্দ। বাঙালী বাদলকে তেরোর পরেই তাই দলভুক্ত করা হয়।

(ক্রমশঃ)

অমলেন্দু বসু

শেক্‌স্‌পিয়রের কাল

দেশ ও কাল দুই-ই যেন সযত্নে বেছে নিয়ে শেক্‌স্‌পিয়র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেশ—ইংল্যাণ্ড। ইওরোপ মহাদেশের অন্তর্গত একটি দেশ অথচ কুড়ি মাইল চওড়া সমুদ্রের বেড়া দিয়ে মহাদেশটির অন্য সব দেশ থেকে স্বতন্ত্র-করা। কাল—ষোল শতকের শেষার্ধ। তখন বিখ্যাত রেনেসাঁস-উন্মাদনা ইটালীতে ও ফ্রান্সে স্থবির হয়ে গেছে, সে সব দেশে ইতিহাসের নতুন পর্যায় শুরু হবে, ইংল্যাণ্ডে রেনেসাঁস এল বিলম্বে কিন্তু বিলম্বের দরুন তার প্রাবল্য কম হল না, এবং ইটালী, ফ্রান্স ও স্পেনে রেনেসাঁসের ফলে যে সব বাড়াবাড়ি দেখা গিয়েছিল ইংল্যাণ্ডে তার স্থান ছিল না, ইংল্যাণ্ডে বরং সংযম ছিল এবং পূর্বসূরীর অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ আচরণ ছিল।

আজকের গ্রেট ব্রিটেন তখন ছিল না। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ তিন দেশ মিলে আজ এক দেশ, যদিও মাঝে মাঝে স্কটল্যাণ্ডের ও ওয়েল্‌সের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় কিছু কিছু লোকের ঘোর আপত্তি শোনা যায়। কিন্তু ষোল শতকে ইংরেজ, ওয়েল্‌স্‌ম্যান ও স্কটস্‌ম্যান—তিনে খুবই সচেতন প্রভেদ বিদ্যমান ছিল, আচারে, ব্যবহারে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে। এই স্বতন্ত্র ইংল্যাণ্ডের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত শেক্‌স্‌পিয়রের জেলা, ওয়র্‌উইক্‌শায়ার, চারিদিকে প্রায় সমানসংখ্যক অন্যান্য জেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ওয়র্‌উইক্‌শায়ারের লোক যেন হাত বাড়িয়ে সমগ্র দেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে সহজেই সংযুক্ত। যে হিসাবে ডিভনশায়ারের অথবা কর্নোয়ালের অধিবাসী, কাম্বারল্যাণ্ডের অথবা নরফোকের অধিবাসী, এমন কি লণ্ডনের প্রতিবেশী কেন্টের অধিবাসীও অল্পবিস্তর আঞ্চলিক মনোবৃত্তির প্রতীক, অর্থাৎ তাঁদের কথার টানে পরিচ্ছদে খাদ্যরীতিতে এবং প্রাকৃত জীবনের অন্যান্য সূচীতে এমন একান্ত সঙ্কীর্ণ অঞ্চল-সীমিত রূপ যে সেকালে মনে হতে পারত যে দেশের সমগ্র সাংস্কৃতিক রূপ হয়তো এদের মর্মে প্রবেশ করে নি। ওয়রউইকের লোক

এই অর্থে কথনই অঞ্চল-সীমিত ছিল না। শেক্স্‌পিয়রের কালে এই ওয়রউইকের লোক অতি সহজেই মিশে যেতে পারত অন্য অঞ্চলের লোকের সঙ্গে। পশ্চিমে উরস্টার ও শ্রপ্‌শায়ার, দক্ষিণে গ্লস্টার অক্স্‌ফোর্ড বার্কশায়ার, দক্ষিণ-পূর্বে লণ্ডন-অঞ্চল, পূর্বে কেম্‌ব্রিজ-অঞ্চলের সেকালে কুখ্যাত জলাভূমিগুলি, উত্তরে নটিংহাম ডার্বি ইয়র্ক—সব অঞ্চলের সঙ্গেই একটা সহজ সমতা বোধ করত ওয়রউইকের লোক। এই ওয়রউইকের অধিবাসী এবং শেক্স্‌পিয়রের সমকালীন ছিলেন কবি মাইকেল ড্রেটন যাঁর কাব্যে ইংরেজ স্বাজাতিকতা রূপ পরিগ্রহণ করেছে। ইংল্যাণ্ডের এই হৃৎপিণ্ড থেকে, ওয়রউইক্‌শায়ার থেকে, উৎসারিত হয়েছে অঞ্চলোত্তর সমগ্র ভূখণ্ডস্পর্শী একটা প্রশস্তহৃদয় স্বদেশপ্রেম, আর এই নবজাগ্রত ন্যাশনালিজমের অবিস্মরণীয় উদ্‌গাতা শেক্স্‌পিয়র যাঁর রচনায় ইংরেজরা বিশেষ মহকুমার অধিবাসী বলে চিহ্নিত হয় না, তাদের পরিচয় তাদের ইংরেজত্বে।

Now all the youth of England are on fire,
And silken dalliance in the wardrobe lies.

(Henry V)

And you, good yeomen,
Whose limbs were made in England, show us here
The mettle of your pasture ; let us swear
That you are worth your breeding : which I doubt not ;
For there is none of you so mean and base,
That hath not noble lustre in your eyes.

(Henry V)

This England never did ; nor never shall,
Lie at the proud foot of a conqueror.

(King John)

This royal throne of kings, this scepter'd isle,
This earth of majesty, this seat of Mars,
This other Eden, demi-Paradise ;
This fortress built by Nature for herself
Against infection and the hand of war ;

This happy breed of men, this little world ;
This precious stone set in the silver sea,
Which serves it in the office of a wall,
Or as a moat defensive to a house,
Against the envy of less happier lands ;
This blessed plot, this earth, this realm, this England,
This nurse, this teeming womb of royal kings,

*   *   *

This land of such dear souls, this dear dear land,
Dear for her reputation through the world.

(*Richard II*)

সর্বশেষ-উদ্ধৃত স্তবকে শেক্স্‌পিয়র যেন তাঁর নাটকীয় প্রথার নৈর্ব্যক্তিকতা বর্জন করেছেন, কুশীলবের মুখে যেন নিজেরই কথা বসিয়ে দিয়েছেন। যেন ভুলে গেছেন নাটকের প্রয়োজন, যেন নিজেই দাঁড়িয়েছেন মহাকালের রঙ্গমঞ্চে, দাঁড়িয়ে তাকিয়েছেন মহাকালের চিরন্তন দর্শক-শ্রোতাদের পানে, তাঁদের বলেছেন কী মধুর মহান তাঁর স্বদেশ ইংল্যাণ্ড! তাঁর স্বাজাতিকতায় বিধৃত হয়েছে ভৌগোলিক ইংল্যাণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, মিড্‌ল্‌সেক্স বা রাটল্যাণ্ডের মতো ক্ষুদ্র জেলা, আবার নরফোক্‌ ও ইয়র্কের মতো বিস্তীর্ণ জেলা।

শেক্স্‌পিয়রের এই সর্বধাত্রী সর্বসমস্পর্শী দেশাত্মবোধ, একজাতিচেতনা, ইংরেজ ইতিহাসে নতুন। ইতিপূর্বে একজাতিচেতনা ছিল না, ছিল ফিউড্যাল-যুগের সামন্ততান্ত্রিক কৌমনিষ্ঠা, যার ব্যঙ্গাত্মক সুষ্ঠু বর্ণনা পাওয়া যায় বার্নার্ড শ'র 'সেইন্ট্‌ জোন্‌' নাটকের এক উক্তিতে :

A Frenchman ! Where did you pick up that expression ? Are these Burgundians and Bretons and Picards and Gascons beginning to call themselves Frenchmen, just as our fellows are beginning to call themselves Englishmen ?···If this cant of serving their country once takes hold of them, goodbye to the authority of their feudal lords, and goodbye to the authority of the Church.

খ'র কল্পিত উক্তির ঐতিহাসিক কাল ১৪২৯ খৃষ্টাব্দ, শেক্‌স্‌পিয়র-উদ্ধৃতিগুলির রচনাকাল থেকে ১৫০ বৎসর পূর্বে। এই দেড় শতক কালের মধ্যে টেম্‌স্‌ নদীতে অবশ্যই কয়েক লক্ষ কুসেক্‌ জল প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু তারও বড়ো এমন এক বন্যা প্রবাহিত হয়েছে যার ফলে সংকীর্ণ গোষ্ঠী-মনোভাব পরিবর্তিত ও পরিশীলিত হয়েছে স্বাজাতিকতায়।

সেজন্যই বলেছি শেক্‌স্‌পিয়র যেন জন্মগ্রহণ করার পূর্বে দেশ ও কাল বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর কর্মের ও সিদ্ধির সঙ্গে কালের ও দেশের অনেক রকম সঙ্গতি বিদ্যমান, এত সঙ্গতি যে শুধু তাঁর জীবনী-আলোচনার প্রসঙ্গে ইতিহাস ও ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু অন্ধ আধিদৈবিক প্রত্যয় উদ্ভূত হতে পারে, মনে হতে পারে যে সবার উপরে ইতিহাস সত্য, তাহার উপরে নাই, ভাবা যেতে পারে যে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের বাহিরে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্ত্বা বলে' কিছু নেই। আমার নিজ প্রত্যয় তেমন নয় কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়র-আলোচনায় পরিবেশ ও ব্যক্তির অঙ্গাঙ্গী সালোক্য অবশ্য-লক্ষ্যণীয় বিষয়। টিউডর যুগের একজাতি প্রেমের মূলে কোন্‌ কোন্‌ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিদ্যমান ছিল, প্লান্টাজেনেটদের রাজত্ব আর তারপরে ইয়র্ককুল ও লাঙ্কাস্টারকুলে রক্তাক্ত সংঘর্ষ কী ভাবে সর্বমান্য এক রাজতখ্‌তে (টিউডর রাজতখ্‌তে) শান্ত সমাহিত হল, কী ভাবে মধ্যযুগের শক্তিমান ব্যারনগণ ও বিশপগণ ক্ষমতাবঞ্চিত হলেন, কী ভাবে অনেক স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিরোধ ও অস্থিরতা পেরিয়ে, কতিপয় আন্তর্জাতিক বিপদের মহদাশঙ্কা অতিক্রম করে' রানী এলিজাবেথের শেষ পনেরো বৎসরে ইংল্যাণ্ড অভূতপূর্ব শান্তি সমৃদ্ধি সংহতি ভোগ করল, কী উপায়ে এই যুগেই আবার ভবিষ্যৎ সমাজ-বিবর্তনের মহান বীজ সুপ্ত ছিল, সে সব ঘটনাবলীর উল্লেখ বা আলোচনা এই সাময়িকী-প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে আসে না। আমি বরং ধরে নেব আমার পাঠক ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে অন্ততঃ যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান রাখেন। আমার বিবেচ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাবে উদ্ভূত কোন্‌ কোন্‌ মূল চিন্তা ও প্রত্যয় শেক্‌স্‌পিয়রের রচনায় নিয়ত উপস্থিত। ইতিহাসের, বিশেষত রাজনৈতিক ইতিহাসের, পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাচ্ছি শেক্‌স্‌পিয়র এমন দেশে এমন কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন ও যেখানে স্বাজাতিকতার উদ্দীপনায় সর্বজনের চিত্ত ভরপুর ছিল, যখন ও যেখানে এই উদ্দীপনার সঙ্গে ইওরোপীয় রেনেসাঁসের শতবর্ষপুষ্ট নবচিন্তাধারা

This happy breed of men, this little world ;
This precious stone set in the silver sea,
Which serves it in the office of a wall,
Or as a moat defensive to a house,
Against the envy of less happier lands ;
This blessed plot, this earth, this realm, this England,
This nurse, this teeming womb of royal kings,

*   *   *

This land of such dear souls, this dear dear land,
Dear for her reputation through the world.

(Richard II)

সর্বশেষ-উধৃত স্তবকে শেক্স্পিয়র যেন তাঁর নাটকীয় প্রথার নৈর্ব্যক্তিকতা বর্জন করেছেন, কুশীলবের মুখে যেন নিজেরই কথা বসিয়ে দিয়েছেন। যেন ভুলে গেছেন নাটকের প্রয়োজন, যেন নিজেই দাঁড়িয়েছেন মহাকালের রঙ্গমঞ্চে, দাঁড়িয়ে তাকিয়েছেন মহাকালের চিরন্তন দর্শক-শ্রোতাদের পানে, তাঁদের বলেছেন কী মধুর মহান তাঁর স্বদেশ ইংল্যাণ্ড! তাঁর স্বাজাতিকতায় বিধৃত হয়েছে ভৌগোলিক ইংল্যাণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, মিড্‌ল্‌সেক্স বা রাটল্যাণ্ডের মতো ক্ষুদ্র জেলা, আবার নরফোক্ ও ইয়র্কের মতো বিস্তীর্ণ জেলা।

শেক্স্পিয়রের এই সর্বধাত্রী সর্বসমস্পর্শী দেশাত্মবোধ, একজাতিচেতনা, ইংরেজ ইতিহাসে নতুন। ইতিপূর্বে একজাতিচেতনা ছিল না, ছিল ফিউড্যাল-যুগের সামন্ততান্ত্রিক কৌমনিষ্ঠা, যার ব্যঙ্গাত্মক সুষ্ঠু বর্ণনা পাওয়া যায় ব্যর্নার্ড শ'র 'সেইণ্ট্ জোন্' নাটকের এক উক্তিতে :

A Frenchman ! Where did you pick up that expression ? Are these Burgundians and Bretons and Picards and Gascons beginning to call themselves Frenchmen, just as our fellows are beginning to call themselves Englishmen ?···If this cant of serving their country once takes hold of them, goodbye to the authority of their feudal lords, and goodbye to the authority of the Church.

শ'র কল্পিত উক্তির ঐতিহাসিক কাল ১৪২৯ খৃষ্টাব্দ, শেক্স্‌পিয়র-উধৃতিগুলির রচনাকাল থেকে ১৫০ বৎসর পূর্বে। এই দেড় শতক কালের মধ্যে টেম্‌স্‌ নদীতে অবশ্যই কয়েক লক্ষ কুসেক্‌ জল প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু তারও বড়ো এমন এক বন্যা প্রবাহিত হয়েছে যার ফলে সংকীর্ণ গোষ্ঠী-মনোভাব পরিবর্তিত ও পরিশীলিত হয়েছে স্বাজাতিকতায়।

সেজন্যই বলেছি শেক্স্‌পিয়র যেন জন্মগ্রহণ করার পূর্বে দেশ ও কাল বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর কর্মের ও সিদ্ধির সঙ্গে কালের ও দেশের অনেক রকম সঙ্গতি বিদ্যমান, এত সঙ্গতি যে শুধু তাঁর জীবনী-আলোচনার প্রসঙ্গে ইতিহাস ও ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু অন্ধ আধিদৈবিক প্রত্যয় উদ্ভূত হতে পারে, মনে হতে পারে যে সবার উপরে ইতিহাস সত্য, তাহার উপরে নাই, ভাবা যেতে পারে যে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের বাহিরে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা বলে' কিছু নেই। আমার নিজ প্রত্যয় তেমন নয় কিন্তু শেক্স্‌পিয়র-আলোচনায় পরিবেশ ও ব্যক্তির অঙ্গাঙ্গী সালোক্য অবশ্য-লক্ষ্যণীয় বিষয়। টিউডর যুগের একজাতি প্রেমের মূলে কোন্‌ কোন্‌ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিদ্যমান ছিল, প্লাণ্টাজেনেটদের রাজত্ব আর তারপরে ইয়র্ককুল ও লাঙ্কাস্টারকুলে রক্তাক্ত সংঘর্ষ কী ভাবে সর্বমান্য এক রাজতখ্‌তে (টিউডর রাজতখ্‌তে) শান্ত সমাহিত হল, কী ভাবে মধ্যযুগের শক্তিমান ব্যারনগণ ও বিশপগণ ক্ষমতাবঞ্চিত হলেন, কী ভাবে অনেক স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিরোধ ও অস্থিরতা পেরিয়ে, কতিপয় আন্তর্জাতিক বিপদের মহদাশঙ্কা অতিক্রম করে' রানী এলিজাবেথের শেষ পনেরো বৎসরে ইংল্যাণ্ড অভূতপূর্ব শান্তি সমৃদ্ধি সংহতি ভোগ করল, কী উপায়ে এই যুগেই আবার ভবিষ্যৎ সমাজ-বিবর্তনের মহান বীজ সুপ্ত ছিল, সে সব ঘটনাবলীর উল্লেখ বা আলোচনা এই সাময়িকী-প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে আসে না। আমি বরং ধরে নেব আমার পাঠক ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে অন্ততঃ যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান রাখেন। আমার বিবেচ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাবে উদ্ভূত কোন্‌ কোন্‌ মূল চিন্তা ও প্রত্যয় শেক্স্‌পিয়রের রচনায় নিয়ত উপস্থিত। ইতিহাসের, বিশেষত রাজনৈতিক ইতিহাসের, পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাচ্ছি শেক্স্‌পিয়র এমন দেশে এমন কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন ও যেখানে স্বাজাতিকতার উদ্দীপনায় সর্বজনের চিত্ত ভরপুর ছিল, যখন ও যেখানে এই উদ্দীপনার সঙ্গে ইওরোপীয় রেনেসাঁসের শতবর্ষপুষ্ট নবচিন্তাধারা

সংমিশ্রিত হয়ে এক আশ্চর্য বাণীসৃষ্টির যুগ প্রস্তুত করল। শেক্স্‌পিয়র এই কালের এই দেশের মানুষ, তার উপরে সেই ওয়রউইকের মানুষ যেখানে স্বাজাতিকতা যেন হাত বাড়িয়ে দ্বীপময় ছোট দেশটির চূর্ণতরঙ্গধৌত বেলাভূমি পর্যন্ত আপন করে নিত।

দুই

শেক্স্‌পিয়রের স্বাজাতিকতা কিন্তু ঠিক পেট্রিয়টিজম্ নয়। পেট্রিয়টিজম্ এই স্বাজাতিকতার অবশ্যই অন্তর্গত কিন্তু আরও অনেক চিত্তবৃত্তি ও চিন্তা-প্রণালী সেই সঙ্গে বিধৃত। কবি-নাট্যকার হিসাবে এই টিউডর স্বাজাতিকতা থেকে যে শ্রেষ্ঠ প্রেরণা তিনি গ্রহণ করেছিলেন সে-প্রেরণা (আমার দৃঢ় বিশ্বাসে) তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে, তাঁর মনোলোকবাসী অনুভূতিগুলিকে তাঁর পরিচিত প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে সংযুক্ত রেখেছে। শেক্স্‌পিয়রের কল্পজগৎ তাঁর সমকালীন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গম্য জগতের ভিত্তিতে নির্মিত। অর্থাৎ যে-জগৎ শেক্স্‌পিয়রের শিল্পে প্রতিভাত; যে পরাক্রমশালী তুঙ্গ কল্পনা অগণিত নরনারীর কথায় আচরণে চিন্তায় আবেগে কর্মে সমূর্ত হয়েছে; যে-জগতের অধিবাসী একই স্বাধিকার দাবীতে শাইলক্ ও বুলিবটম্, হ্যামলেট ও ফলস্টাফ, ওফিলিয়া কর্ডিলিয়া ও ভলুমনিয়া, ক্লিওপাট্রা ও মিষ্ট্রেস্ কুইক্‌লি, লিয়র ও টোবি বেল্‌চ্; যে-জগতে মানবিক অভিজ্ঞতার প্রায় সব কয়টি ভাবনা ও ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছে, সেই জগতের শিকড় শেক্স্‌পিয়রের পরিচিত প্রত্যক্ষ জগতেই নিহিত। বোধহয় শিল্পের ধর্মই এমন যে মহৎ শিল্প কখনই প্রত্যক্ষবিমুখ হতে পারে না, প্রত্যক্ষ থেকেই তার উদ্ভব যদিচ শিল্প ও প্রত্যক্ষ সমার্থ নয়। এমন যে দান্তের অপ্রাকৃত মরণোত্তর জগৎ, সেখানেও পাওলো ও ফ্রান্‌চেস্‌কা বাস করে, বাস করে বিয়াত্রিচে, উগোলিন, ব্রুনেত্তো, এবং আরও অনেক নরনারী যাদের দেখা দান্তে পেয়েছিলেন হয় ইতিহাসের পাতায় নয়তো ফ্লরেন্স নগরে নিজ গৃহের আশেপাশেই। মাইকেল এঞ্জেলোর মহান আদম মূর্তি মনগড়া নয়, সে-মূর্তির দেহাবয়ব কোনও সমকালীন মনুষ্যেরই দেহাবয়বের অনুরূপ যদিচ সে-মূর্তির গম্ভীর মহত্ত্ব শিল্পীর সৃজনী কল্পনা থেকে উৎসারিত।

শেক্স্‌পিয়রের সৃজনীপ্রতিভা সম্বন্ধে আমরা কখনোই সুষ্ঠু সমুচিত ধারণা করতে পারি না যদি না অহরহ এ-কথা স্মরণ রাখি যে

শেক্‌স্‌পিয়রীয় কল্পজগৎ বায়ুভূত নিরালম্ব নিরাশ্রয় জগৎ নয়, সে-জগতের মূলে concrete reality বর্তমান, একটা বস্তুদৃঢ় প্রত্যক্ষ বর্তমান। শেক্‌স্‌পিয়র ভালোবেসেছেন স্বকালকে, স্বদেশকে, সেই ভালোবাসা ধোঁয়াটে নয়, সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে সমকালীন ইংল্যাণ্ডের দৃশ্যসাধ্য, শ্রবণসাধ্য, স্পর্শ-ঘ্রাণসাধ্য রূপগুলিকে আত্মচেতনার নিরন্তর রসে সঞ্জীবিত করেছেন, করে' সেই প্রাকৃত অভিজ্ঞতাকে বাণীর বিদেহী চিরন্তন দ্যোতনায় রূপায়িত করেছেন। এই সদা-অমলিন প্রত্যক্ষতার জন্যই প্রধানতঃ শেক্‌স্‌পিয়র সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত, ইংল্যাণ্ডে, ইওরোপে, এমন কি সাগর পারে আমাদের দেশেও, যেখানকার নৈসর্গিক জগৎ ইংল্যাণ্ডের নৈসর্গিক জগতের তুল্য নয়। তুল্য না হোক, শেক্‌স্‌পিয়র-জগতের মূলে যে বস্তুময়তা তাতে সকল রকমের পাঠকের ও দর্শকের কল্পনা নির্ভরযোগ্য আশ্রয় পায়। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান যাবতীয় মানুষে মানুষে অচ্ছেদ্য সংযোগসূত্র। বাংলাদেশের যে চাষী চাল ডাল উৎপাদন করে, তাকে আমেরিকার আরিজোনায় নিয়ে গেলে সেখানকার কৃষিপদ্ধতিতে সে আকৃষ্ট হবে যতই না সে-পদ্ধতি তার পরিচিত বঙ্গীয় পদ্ধতি থেকে পৃথক হোক। নিকোবর দ্বীপের তীরধনুকে সজ্জিত যোদ্ধা আফ্রিদির রাইফেল দেখে কৌতূহল বোধ করবে। আমার জগতে (আমার প্রত্যক্ষ জগতে আবার মনোজগতেও) এবং শেক্‌স্‌পিয়রের জগতে অনেক বৈষম্য, অনেক প্রভেদ, কিন্তু আমার প্রত্যক্ষনির্ভর অনুভূতি তাঁর প্রত্যক্ষনির্ভর কল্পজগতে স্বস্তি পায়, প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে অগ্রসর হয়ে ক্রমে মনোজগতেও শেক্‌স্‌পিয়রকে পায় (মোহিতলালের ভাষায়) 'আত্মার আত্মীয়'। এইভাবেই শেক্‌স্‌পিয়র-সাহিত্যের ইউনিভার্সল্, সার্বজনিক আকিঞ্চন।

তিন

যে বস্তুময় প্রত্যক্ষজগতের অগণিত প্রকাশ শেক্‌স্‌পিয়রের শিল্পরূপে তার কিছু ধারণা হওয়া দরকার।

এভন্ নদীর পাড়ে অবস্থিত ছোট স্ট্র্যাটফোর্ড শহরটির নাম আজ সমস্ত পৃথিবীতে সুপরিচিত, বেথলেহেম শহরের মতোই। পুরানো গ্রাম। নর্ম্যান বিজয়েরও পূর্বে থেকে এই গ্রামের ইতিবৃত্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্ন এবং এই গ্রাম্য-শহরের আশেপাশে গ্রামগুলিতে ১৫-১৬ শতকে বেশ কয়েকটি শেক্‌স্‌পিয়র

পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের শেক্‌স্‌পিয়র যদি আজ ভূতলে ফিরে আসতেন তাহলে হয়তো স্ট্র্যাটফোর্ড এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে ঘুরে-ফিরে খুব কিছু বিস্মিত হতেন না কেননা মোটরগাড়ি, রেলরাস্তা ও ইতস্তত কয়েকটি কারখানার চিমনি ছাড়া খুব বিপর্যয়কারী দৃশ্য চারিদিকে বেশি মিলবে না। অবশ্য এই জেলারই এক অংশে, স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরেই অবস্থিত বার্মিংহাম শহর, অন্যদিকে লীমিংটন শহরটিতেও কারখানার সংখ্যা বাড়ছে, আরও কিছুদূরে কভেন্ট্রি শহরের বুকে এখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমা-লাঞ্ছন লক্ষ্য করা যায়। এ-ও সত্য যে শেক্‌স্‌পিয়রের কালে ছোট শহরটিতে যত ফাঁকা জায়গা ছিল, যত মাঠ-ময়দান, গাছপালা ছিল এখন তত নেই কিন্তু সেকালের বড়ো রাস্তাগুলি—ব্রিজ স্ট্রীট, হেন্‌লি স্ট্রীট, হাই স্ট্রীট—এখনো তেমনি আছে, এখনো এভন্‌ নদীর উপরে ছোট পুলগুলি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, আর পুলের তলায় রাজহাঁসগুলি ভাসে, স্ট্র্যাটফোর্ডের গির্জা ও কবরখানা (যেখানে শেক্‌স্‌পিয়রের কবর) এখনো তেমনি গম্ভীর। শেক্‌স্‌পিয়রের যৌবনকালে শহরে এক হাজার এল্‌ম্‌ গাছ ছিল, বাড়িঘর ছিল মাত্র শ' ছয়েক, কিন্তু পাখি ছিল গাছে গাছে, সে সব পাখি গান গাইত বিচিত্র সঙ্গীতের ঐক্যতানে, কত রকমের ফুলই না শহরে এবং শহরের আশেপাশে দেখা যেত, আজও দেখা যায়। আমি একদা hitch-hiking করেছিলাম, অর্থাৎ ভ্রমণ করেছিলাম কিছুটা পদব্রজে কিছুটা দয়ালু অপরিচিত মোটরযাত্রীর কৃপায়, অক্সফোর্ড থেকে বিখ্যাত কট্‌সোল্ড পাহাড় পেরিয়ে, ফেল্‌ডনের মধ্য দিয়ে স্ট্র্যাটফোর্ড অবধি গিয়েছিলাম (যে রাস্তা দিয়ে শেক্‌স্‌পিয়র নিজে অক্সফোর্ড হয়ে লণ্ডনে যেতেন), পরে শেক্‌স্‌পিয়রের মামাবাড়ি উইল্‌ম্‌কোট ও শ্বশুরবাড়ি শটেরিতে ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েছিলাম, তখন (মাসটা ছিল আগস্ট, "ফুলেরই দিন!") আমার অসংবেদী কুনো শহুরে চোখেও ধরা পড়েছিল ওয়রউইকে ফল-ফুলের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য! এই সব ফুল-ফলের দেদীপ্যমান স্মৃতিই কি কিছু অমর ছত্রের জনক নয়? 'দি উইণ্টার্স টেল'-এ পার্ডিটা বলছেন :

Reverend sirs,
For you there's rosemary and rue ; these keep
Seeming and savour all the winter long :

Sir, the year growing ancient,—
Not yet on summer's death, nor on the birth
Of trembling winter,—the fairest flowers o' the season
Are our carnations, and streakt gillyvors,
Which some call nature's bastards : of that kind
Our rustic garden's barren.

এই একটি দৃশ্যেই পার্ডিটা কত না ফুলের নাম করেছেন !

Here's flowers for you ;
Hot lavender, mints, savory, marjoram ;
The marigold···these are flowers
Of middle summer, and, I think, they are given
To men of middle age.

এর পরে পার্ডিটা সাজাচ্ছেন flowers o' the spring, বসন্তের ফুল—ড্যাফোডিল, ভায়োলেট, প্রিমরোজ (pale primroses), অক্‌স্‌লিপ্‌, ক্রাউন-ইম্পেরিয়ল, ফ্লাওয়ার-দ্য-ল্যুস্‌। পার্ডিটার এই প্রমোদোচ্ছল উক্তির বিপরীত উক্তি মনে পড়ে, ওফিলিয়ার বেদনাবিদ্ধ স্বগতোক্তি :

There's rosemary, that's for remembrance ; pray, love, remember : and there is pansies, that's for thoughts,···there's fennel for you, and columbines ; there's rue for you ; and here's some for me ; we may call it herb of grace o' Sundays. O ! you must wear your rue with a difference. There's a daisy ; I would give you some violets, but they withered all when my father died.

এসব উল্লেখে ও বর্ণনায় প্রত্যক্ষের উজ্জ্বল মোহর আঁকা। যিনি না দেখেছেন তাঁর পক্ষে এ বর্ণনা সম্ভব নয়, দেখেছেন আর ইন্দ্রিয়ের উদগ্র সংহত শক্তি দিয়ে দেখেছেন। এই ফুলের বর্ণনারই প্রসঙ্গে 'উইণ্টার্স' টেল্‌' নাটকে শেক্‌স্‌পিয়র অন্য এক প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন যা ষোল শতকী ইংল্যাণ্ডের গ্রাম্য অঞ্চলে সুপরিচিত ছিল—গান-পাগল ফিরিওয়ালার প্রসঙ্গ :

O master, if you did but hear the pedlar at the door, you

would never dance again after a tabor and pipe ; no, the bag-pipe could not move you. He sings several tunes faster than you'll tell money ; he utters them as he had eaten ballads, and all men's ears grew to his tunes··· He hath songs for man or woman of all sizes··· He has the prettiest love-songs for maids···with such delicate burdens of dildos and fadings, 'jump her and thump her'··· He hath ribbons of all the colours i' th' rainbow···inkles, caddisses, cambrics, lawns. Why he sings 'em over as they were gods or goddesses.

(*The Winter's Tale*)

এই গ্রাম্য আমোদের অন্য প্রাসঙ্গিক উল্লেখ পাই অন্যত্র :

At Pentecost
When all our pageants of delight were played.

(*Two Gentlemen of Verona*)

মধ্য-ইংল্যাণ্ডে সে যুগে ফিরিওয়ালারা গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াত রকমারি গান গেয়ে, যেমন যেমন ক্রেতা তেমন তেমন গান গেয়ে। অতি তুচ্ছ বিষয় এটি, ইতিহাসের মহিমময় দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, কবির দৃষ্টিতেও তেমনটি পড়ে না—শেক্‌স্‌পিয়রের সমকালীন কিড্, মার্লো, স্পেন্‌সর্, ডান্, চ্যাপম্যান লক্ষ্য করেন নি এই তুচ্ছ ব্যক্তিটিকে—কিন্তু উইল্ শেক্‌স্‌পিয়রের সদা-সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়েছে কম জিনিসই, আর যা কিছুই তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান-সাধ্য হয়েছে তা-ই তিনি শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সত্যিকারের দেশাত্মবোধ এখানেই।

ফিরিওয়ালার গান অনেক সময় পাখির গানের অনুকরণ। শেক্‌স্‌পিয়র অজস্র পাখি দেখেছিলেন ও অসংখ্য পাখির গান শুনেছিলেন ওয়রউইক্‌শায়ারের নাতিশীতোষ্ণ বাতাবরণে বিশেষতঃ জেলার উত্তর অঞ্চলে, যে-অঞ্চলের নাম আর্ডেন সেই উপবনে। এভন্ নদীটি এই জেলাকে প্রায় দুটি সমান ভাগে ভাগ করেছে, উত্তর অঞ্চল হচ্ছে আর্ডেন বন, সেখানে লোক বসতি কম (শেক্‌স্‌পিয়রের কালে ছিল, আজও কম), গাছপালা বেশি, এই আর্ডেন বনই শেক্‌স্‌পিয়রের কল্পনায় রূপান্বিত হয়েছে 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট্' নাটকের বিখ্যাত ফরেস্ট অব আর্ডেন-এ :

Are not these woods
More free from peril than the envious court?
Here feel we not the penalty of Adam,
The season's difference ; as the icy fang
And churlish chiding of the winter's wind.

এই সেই দেশ যেখানে
সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিত যদি এই স্বপনের হাতে !
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,—
থাকিত না হৃদয়ের জরা— .

এই সেই land of heart's desire, হৃদয়ের আকাঙ্খার দেশ, যেখানে
দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্খার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি—

শেক্‌স্‌পিয়র-যুগের সাহিত্যে বারংবার একটি সুর শুনতে পাই, কর্মময় প্রাণচঞ্চল ধাবমান জীবনের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশের পাশে এক নিভৃতে একটি অনুচ্চ মৃদু সুর অনুরণিত হয়, সে সুরে প্রকাশ পায় কর্মে ক্লান্তি, নাগর জীবনে ঔদাস্য; জীবনের আম-দরবার ছেড়ে সঙ্গোপনে খাস-কামরায় চলা-ফেরা অথবা কিছু-না-করার নির্দায়িক সুখ ; public duty এবং private repose-এর তারতম্য-জ্ঞান। সমকালীন প্রায় সব নাট্যকারেই এই সুর শুনতে পাই, শেক্‌স্‌পিয়রের প্রায় প্রতিটি ট্র্যাজেডি ও ইতিহাস-নাটকে এই সুর ধ্বনিত, এই সুরই 'টেম্পেস্ট' নাটকে গন্‌জালোর ইউটোপিয়া-বর্ণনে, আর এই সুরের জালেই সে যুগের পাস্‌টরাল সাহিত্য আবদ্ধ। শেক্‌স্‌পিয়রের সেই স্বপ্নের দেশ কিন্তু নিতান্তই বায়ুভূত দেশ নয়, সে-দেশ প্রত্যক্ষে অনুষক্ত, সে-দেশ ওয়রউইক্‌শায়ারের আর্ডেন নামক নির্জন নিকোলাহল নৈসর্গিক পরিবেশে অবস্থিত। শেক্‌স্‌পিয়রের যে সব নাটকে বন বা উপবনের বা গ্রামের পরিবেশ—অ্যাজ ইউ লাইক ইট, উইন্টার্স টেল, টেমিং অব্ দি শ্রু—সে সবের নৈসর্গিক বর্ণনা সযত্নে অধ্যয়ন করলে প্রত্যক্ষের দৃঢ় বস্তুময়তা

আমাদের অভিভূত করে। এই আর্ডেন-উপবনে এবং তৎনিকটবর্তী অঞ্চলে কোন্ সব পাখি ষোল শতকে দেখা যেত তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায় ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম টার্ণার দ্বারা লিখিত একটি পক্ষী বিবরণীতে, উইলিয়ম হ্যারিসনের পর্যটন-বৃত্তান্তে, লিল্যাণ্ডের ও পরে ক্যাম্‌ডেনের পুরাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থগুলিতে। আশ্চর্যের বিষয় এ সব গ্রন্থে উল্লিখিত যাবতীয় পাখির নাম পাওয়া যায় শেকসপিয়র-রচনায়, এমন কি তারও বেশি। অধ্যাপক আনিয়নস্ বলছেন: If Shakespeare's predilection for any particular class of creatures can be inferred from the number of his allusions to them, the first place must be given to birds।

কত পাখি শেকসপিয়রে!—চড়াই, সোয়লো, কোকিল, পেঁচা (একাধিক শ্রেণীর পেঁচা), রেন্, ম্যালার্ড, স্নাইপ্, প্লভার, কোয়েইল, উড্‌কক্, তিতির, বন মুর্গী; হাঁস (অনেক শ্রেণীর), টার্কি, ময়ূর, শেল্‌ড্রেক, স্কপডাক, ড্যাবচিক, করমোরাণ্ট, ব্ল্যাক বার্ড, নাইটিঙ্গেল, থ্রাশ, লার্ক, রবিন রেডব্রেস্ট, কাক, দাঁড় কাক, ম্যাগপাই, চিল, জে, স্টার্লিং, ঈগল, শকুন, বাজপাখি, তোতাপাখি, উটপাখি। এখানে আমি চিড়িয়া শুমারি করতে বসিনি, মোট কত পাখি শেকসপিয়রে পাওয়া যায় তার তালিকা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, শুধু শেকসপিয়র-সাহিত্যের ভিত্তি কত প্রত্যক্ষ কত দৃঢ় বস্তুময় সে বিষয়ে ধারণা সৃষ্টির জন্যই কিছু নামের উল্লেখ করলাম, কোন্ পাখির নাম কোন্ নাটকে কোন্ প্রসঙ্গে পাওয়া যায় এত সব বিশদ আলোচনায় গেলাম না। আখেরি বিচারে যিনি যত যত্ন ও প্রেম সহকারে শেকসপিয়রের গ্রন্থাবলী পাঠ করেছেন তাঁর সংবেদনা ততই তথ্যপুষ্ট ও চিন্তা সমৃদ্ধ হবে। পাখি ছাড়া আরও প্রাণী আছে শেকসপিয়রে—মাছ ও জলজ প্রাণী (রুই, কড্, ডেস্, হেরিং, পাইক, ম্যাকেরেল্, মিনো, স্যামন্, স্প্রাট, টেন্‌চ্, ট্রাউট; মাসেল্, অয়স্টার, বড় চিংড়ি, কাঁকড়া, কুচো চিংড়ি; অ্যাঞ্চোভি, গার্নেট) তিমি, শুশুক,—সাপ, কেঁচো, কেন্নো, পোকামাকড়। জানোয়ার শেকসপিয়রে কত রকমের তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 'ম্যাকবেথ' থেকে যেখানে শুধু কুকুরেরই অনেক জাতির তালিকা দেওয়া হয়েছে:

Ay, in the catalogue ye go for men;
As hounds, and grey-hounds, mongrels, spaniels, curs,
Shoughs, water-rugs, and demi-wolves, are clept

All by the name of dogs: the valu'd file
Distinguishes the swift, the slow, the subtle,
The housekeeper, the hunter.

শেকসপিয়র ঠিক কোন বৎসরে ষ্ট্র্যাটফোর্ড ছেড়ে গিয়েছিলেন সে কথা আমরা জানিনে, তবে এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না যে বিয়ের পরেও চার পাঁচ বৎসর অর্থাৎ তাঁর বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স অবধি তিনি ষ্ট্র্যাটফোর্ডেই ছিলেন। যতদিনই ছিলেন তিনি যেন সর্বেন্দ্রিয়ের উন্মুখ আত্মসাৎকরণী শক্তি দিয়ে চারিপাশের জগৎ লক্ষ্য করেছিলেন। সে-জগৎ যেমন নরনারীর জগৎ তেমনই পশু-পাখি গাছপালা পোকামাকড়ের জগৎ, যেমন চিন্তার ও ভাবের, মণীষার ও আবেগের জগৎ, ঋতুর জগৎ, তেমনই বিচিত্র ধ্বনি ও বর্ণের জগৎ। অতএব এই জগৎ ব্যাপক বিচিত্র সর্বাত্মকৃত জগৎ। কিন্তু যেহেতু শেকসপিয়রের চিত্ত কেবল ইন্দ্রিয় নির্ভর ছিল না, মননশীলও ছিল, সেজন্য এই প্রত্যক্ষ জগতের বস্তুগুলির মধ্যে তিনি অনেক সময় প্রতীকী অর্থ খুঁজে পেতেন। সুতরাং এই জগৎ থেকে তাঁর অজস্র বাকপ্রতিমা, অসংখ্য রূপক উদ্ভুত হয়েছে। আমি মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

I can suck melancholy out of a song as a weasel sucks eggs.

(As You Like It)

You play the spaniel,
And think with wagging of your tongue to win me.

(Henry VIII)

The strain of man's bred out
Into baboon and monkey.

(Timon of Athens)

So work the honey-bees,
Creatures that by a rule in nature teach
The act of order to a peopled kingdom.
They have a king and officers of sorts ;
Where some, like magistrates, correct at home,
Others, like merchants, venture trade abroad,

Others, like soldiers, armed in their stings,
Make boot upon the summer's velvet birds ;
Which pillage they with merry march bring home
To the tent-royal of their emperor :
Who, busied in his majesty, surveys
The singing masons building roofs of gold,
The civil citizens kneading up the honey,
The poor mechanic porters crowding in
Their heavy burdens at his narrow gate,
The sad-eyed justice, with his surly hum,
Delivering o'er to executors pale
The lazy yawning drone.

(Henry V)

চার

আমার অনুমান যে নিসর্গের প্রত্যক্ষ জ্ঞান শেক্‌স্‌পিয়রে সঞ্জাত হয়েছিল প্রধানতঃ স্ট্র্যাটফোর্ড-অন্‌-এভনের পরিবেশ থেকে। তাহলে রাজারাজড়া মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চকোটিসম্ভূত নরনারীর চরিত্র ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এবং নাগরিক রাজধানী-সংস্কৃতির ধারণা তিনি অর্জন করেছিলেন তৎকালীন লণ্ডন থেকে। এসব বিষয়ে অনুমান কখনোই তথ্য-প্রমাণিত সত্য নয়, এসব উক্তিতে গোঁড়ামি চলে না, অতএব আমি 'প্রধানতঃ' শব্দটির প্রয়োগ করেছি।

স্ট্র্যাটফোর্ড—লণ্ডন যাতায়াতের রাস্তা মাত্র দুইটি, তখনও ছিল, এখনও আছে : অক্সফোর্ড ও হাই ওয়াইকুম্‌ হয়ে অথবা এইল্‌স্‌বেরি ও ব্যান্‌বেরি হয়ে। শেক্‌স্‌পিয়র প্রথম রাস্তাটি ব্যবহার করতেন। ১২০ মাইল রাস্তা, ঘোড়ায় চড়ে যেতে হত, তিনদিন লাগত, দ্বিতীয় রাত্রি যাপন করতেন অক্সফোর্ডে। অক্সফোর্ডের কর্ন মার্কেটে, হাই স্ট্রীট ও কর্ন মার্কেট স্ট্রীটের জংসন থেকে ৫০।৬০ গজ উত্তরে এগিয়ে গেলে, রাস্তার পূব পারে একটু ভিতরে একটি হোটেল আছে, The Golden Cross Hotel, একেবারে সেকেলে Ye Olde Inne ধরনের হোটেল। এই হোটেলে শেক্‌স্‌পিয়র বাস করতেন তাঁর যাতায়াতের পথে। ১৯৫৭ সালে এই হোটেলে দিন

দশেক বাস করার সুযোগ আমার হয়েছিল, তখন লক্ষ্য করেছিলাম যে গৃহ-নির্মাণ প্রণালী বিচার করলে এই হোটেলের কাঠ, সিঁড়ি, জানালা, কক্ষগুলির মেজের উচ্চতা প্রভৃতি শটেরিতে অবস্থিত শেক্‌স্‌পিয়রের শ্বশুরবাড়ির মতোই অথবা হেনলি স্ট্রীটে অবস্থিত শেক্‌স্‌পিয়রের জন্মগৃহের মতোই। যাতায়াত কালে যে শেক্‌স্‌পিয়র একা চলতেন এমন মনে হয় না, সে কালে পথে ঘাটে রাহাজানি হ'ত সর্বদা আর প্রায়ই সরাই মালিকের সঙ্গে দস্যুদের যোগসাজস থাকত। এ হেন এক রাহাজানিতেই লিপ্ত হয়েছিল স্যার জন ফল্‌স্টাফ ও তার সঙ্গীরা। সে কালে গাড়ির প্রচলন মাত্র শুরু হয়েছিল, গাড়ির মিস্ত্রীর উল্লেখ করছেন মার্কুশিয়ো 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকে। জন্ স্টো-লিখিত লণ্ডনের যে-বিবরণ ১৫৯৮ সনে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তিনি আফশোষ করছেন যে শহরে নানারকমের গাড়ির সংখ্যা বড্ড বেড়েছে। ভ্রমণের অধিক-প্রচলিত উপায় ছিল অশ্বারোহণে অথবা পদব্রজে। এই কারণে ও যেহেতু যুদ্ধকালে অশ্বের প্রয়োজন ও মূল্য অতীব গুরুতর ছিল সেজন্য শেক্‌স্‌পিয়রে অশ্বের উল্লেখ অগণিত। আচম্বিতে মনে পড়ে যায় তৃতীয় রিচার্ডের আকুল কামনা :

A horse ! a horse ! my kingdom for a horse !

শেক্‌স্‌পিয়র লণ্ডনে গিয়েছিলেন জীবিকার সন্ধানে। সেই একই সন্ধানে সেকালে সঙ্গতিপন্ন বংশের ছেলেরা বিদেশে যেত, ইওরোপের দেশগুলিতে।

Other men, of slender reputation,
Put forth their sons to seek preferment out :
Some to the wars, to try their fortunes there ;
Some to discover islands far away ;
Some to the studious universities.

(The Two Gentlemen of Verona)

তৎকালীন সমাজের একাংশী নিখুঁত চিত্র এই ছত্র কয়টিতে অঙ্কিত হয়েছে। যে Law of Primogeniture ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত ছিল, যে আইন অনুসারে সমস্ত সম্পত্তি অটুট অবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্রেই বর্তায়, সেই আইন অনুসারে অন্য ছেলেদের যার যার রাস্তা দেখতে হত, যেমন অবস্থা হয়েছিল "অ্যাজ ইউ লাইক ইট্" নাটকের অর্ল্যাণ্ডোর। পিতা জীবিত থাকতে কনিষ্ঠ ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতেন যার ফলে তারা পরবর্তীকালে বড়ো

আইনজীবী হতে পারত অথবা রাজনীতিবিদ অথবা উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক অথবা সৈন্যবিভাগে বা নৌবিভাগে জেনারেল বা অ্যাড্‌মিরাল। শেক্‌স্‌পিয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে এহেন জ্যেষ্ঠানুজ পুত্রের সংখ্যা কম নয়। কালে এরা কেউ কেউ নিজগুণেই হয়তো আর্ল বা ব্যারন হতেন। শেক্‌স্‌পিয়রের যুগে নতুন আরেকটি জীবিকা সাহসী যুবকদের সামনে খোলা ছিল—নবাবিষ্কৃত বিদেশে উপনিবেশ রচনা অথবা নবপ্রতিষ্ঠিত একচেটিয়া কারবারী সম্প্রদায়ে যোগদান করা। উপরের ছত্র কয়টিতে এই নব সামন্তবাদের আভাস পাই। শেক্‌স্‌পিয়র নিজে বিদেশে গিয়েছিলেন কিনা এমন প্রমাণ পাই না যদিচ অনেকের বিশ্বাস তিনি গিয়েছিলেন। বিদেশ-প্রত্যাগত ব্যক্তি সম্বন্ধে শেক্‌স্‌পিয়রের শ্লেষ আছে আবার ঘরকুনো লোক সম্বন্ধেও যেন তাঁর ধারণা উঁচু নয়।

> Hath Britain all the sun that shines ?…
>
> There's livers out of Britain.
>
> *(Cymbeline)*

অপর পক্ষে স্মরণ করি জ্যাকেসের প্রতি রজালিণ্ডের কৌতুকাবিষ্ট ব্যঙ্গ বাণী :—

> Farewell, Monsieur Traveller: look you lisp, and wear strange suits, disable all the benefits of your own country, be out of love with your nativity, and almost chide God for making you that countenance you are ; or I will scarce think you have swam in a gondola.
>
> *(As You Like It)*

বিদেশী পরিচ্ছদ ও রীতি সম্বন্ধে অনুকরণ শেক্‌স্‌পিয়রের কয়েক জায়গাতেই মৃদু শ্লেষের কারণ হয়েছে, যেমন "মার্চেণ্ট অব্‌ ভেনিস্", "টেমিং অব্‌ দি শ্রু", "কিং জন্", "রোমিও অ্যাণ্ড্‌ জুলিয়েট" প্রভৃতি নাটকে।

বিদেশের মধ্যে ইটালীর মোহই ছিল প্রবলতম। শুধু যে রেনেসাঁসের যুগে মহৎ ইটালীয় শিল্প জগতে আপন শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছে এমন নয়, ষোল শতক অবধি ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য প্রধানতঃ ইটালীয় বণিকদেরই হাতে ছিল। এই কালেই অবশ্য পোর্তুগাল, হল্যাণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এমন কি ডেনমার্কও এমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হলেন যার ফলে বাণিজ্যিক ভারকেন্দ্র ভূমধ্যসাগর থেকে সরে গেল ভারত সাগরে ও আমেরিকার পূর্ব উপকূলে। কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়রের কালেও টিন্‌টোরেট্টো জীবিত ছিলেন, তখন

ভেনিসের বিখ্যাত রিয়ালটো-সেতু নূতন স্থাপত্যে পুনর্নির্মিত হচ্ছে, তখনও বেশভূষায় আদব কায়দায় ইটালীয় ফ্যাশান অন্য দেশীয়দের ঈর্ষা ও অনুকরণের বিষয়, ইটালী থেকেই ইংরেজ যুবকেরা শিখে এলো গলায় Ruff পরা, নিম্নাঙ্গে গায়ে-সাঁটা গেঞ্জির পোষাক পরা, নানারকম শাদা ও লাল দ্রাক্ষারস পান করা, হাত দিয়ে না খেয়ে ছুরি ও কাঁটার ব্যবহার করা। হলোফার্নেস বলছে :

I may speak of thee as the traveller doth of Venice :

—Venetia, Venetia,

Chi non te vede, non te pretia.

(Love's Labour's Lost)

প্রায় দু'শো বছরের কূপমণ্ডুকতার পরে শেকসপিয়রের কালে সাহসী ইংরেজ যুবকগণ আবার অনুভব করলেন যে বিশাল বিশ্বের সব দিক থেকেই ডাক পৌছচ্ছে তাঁদের কাছে। ভৌগোলিক অর্থে ও মানসিক অর্থে শেকসপিয়রের যুগ যেন সহসা বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, সেই বিস্তারের সুর শেকসপিয়রের নাটকে।

যখন শেক্‌স্‌পিয়র তার নাট্যকাহিনীগুলির উৎস খুঁজেছেন স্বদেশের বাইরে তখন যে প্রায়শঃ তিনি ইটালীয় কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন এ তথ্যের তাৎপর্য গভীর। ইটালীয় নামের মোহ সেকালে প্রবল, ইটালী সে যুগে ইওরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরম আদর্শ। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে কাহিনী ও কুশীলব ইটালী থেকে নেওয়া হলেও কাহিনীর আবেদন ও চরিত্রের অন্তর্নিহিত মূল্য সম্পূর্ণ রকমে ইংরেজ। উনিশ শতকী অর্থে শেক্‌স্‌পিয়র রিয়লিস্ট নন। ইতিহাসের যথাযথতা আয়ত্ত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সার হেন্‌রি আর্ভিং নাটক মঞ্চস্থ করার পূর্বে মোটা মোটা বই পড়ে ফেলতেন যাতে কিনা প্রচ্ছদপটে ও পোষাকে ঐতিহাসিক যথাযথতার ত্রুটি না থাকে। চার্লস্‌ কিংসলি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার জন্য দিনের পরে দিন ব্রিটিশ মিউজিয়মে কাটিয়েছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের এ হেন খণ্ডিত সত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নি শেক্‌স্‌পিয়র। তাঁর লক্ষ্য ছিল আরও মহৎ সত্য, আরও স্থায়ী সত্য, যাকে বলি মানবিক সত্য। সাহিত্যে সেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় গ্রন্থকীটের পাদটীকা-মুখর ক্লিষ্ট বিদ্যায় নয়, প্রতিষ্ঠা হয় সহানুভূতি-সম্পন্ন সর্বধাত্রী কল্পনার দুর্বার দাক্ষিণ্যে, প্রতিষ্ঠা হয় শেক্‌স্‌পিয়রের কল্পনায়। শেক্‌স্‌পিয়র মৃত ইতিহাসকে সত্য বলে মানেন নি, মেনেছেন জীবিত সমকালকে। ফলে এথেন্স-নগরীর থিসিয়ুস্‌-চরিত্র এথিনিয়ন ইতিহাসের তথ্য-সঙ্গত হয় না, হয়ে

দাঁড়ায় ষোল শতকী ইংরেজ চরিত্র। যে সব কোলাহলকারী জনতা 'জুলিয়স্ সীজার' ও 'কোরিওলেনাস্' নাটকে জনচাঞ্চল্যের প্রতীক তারা আসলে জ্যাক্ কেইডের ইংরেজ 'মব্' থেকে কিছুমাত্র পৃথক নয়। রোজালিণ্ড, অর্ল্যাণ্ডো, সীলিয়া প্রভৃতি বিদেশী নামের সঙ্গে ঘরোয়া নাম অড্রি ও কেইট শোভা পায়। হার্মিয়া লিসাণ্ডার হেলেনা ডিমিট্রিয়াস আপাতদৃষ্টিতে ইংরেজ নয় কিন্তু Quince, Snug, Bottom, Flute, Snout, Starveling এরা তো লণ্ডনের থিয়েটর-দর্শকদের সুপরিচিত ইংরেজ মনুষ্য!—দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায় কিন্তু দেওয়ার দরকার নেই কেননা পাঠক অতি সহজেই স্মরণ করবেন যে শেক্স্পিয়রে historical veracity-র প্রয়াস নেই, তিনি থীসিস্ লিখতে বসেন নি, শেক্স্পিয়রে আছে আরও মহৎ বস্তু, imaginative verisimilitude, তথ্যের হুবহুতা নয়, কল্পনার সত্য। মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের চাঁইবুড়োর কথা :—

—'তুমি যে আজকালকার ছেলে—হিষ্টিরি পড়ে কেউ কল্পনা করতে পারে ?'

—'তবে ?'

—'তবে আবার ? ছাখো অবুবাবু, এই আমি সেকালের বুড়ো—হিষ্টিরি-পড়া মানুষ নয়, তাই কল্পনা করতে আমার ঠেকে না একেবারেই।'

শেক্স্পিয়রও হিষ্টিরি-পড়া মানুষ ছিলেন না, তাঁরও কল্পনা করতে ঠেকত না একেবারেই। অতএব নাট্যকাহিনীর দেশ ও কাল যেখানেই এবং যেকালেই থাক না কেন, থেকেছে অনেক দেশে অনেক কালে—তমসাচ্ছন্ন অনৈতিহাসিক প্রাক-খৃষ্টীয় যুগে, বোহিমিয়ায়, রোমে ও কায়রোতে, ভেনিসে, নাম-না-জানা দ্বীপে, বনে বা গ্রামে অথবা লণ্ডনে অথবা কোনও বিদেশী শহরের রাজপথে—শেক্স্পিয়র সব কিছুকেই ইংরেজায়িত করেছেন। সব কিছু ঘটনার তাৎপর্য সংশ্লিষ্ট হচ্ছে সমকালীন ইংল্যাণ্ডের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে, সব কয়টি চরিত্র, নামের ও পোষাকের বিদেশীয়ানা সত্ত্বেও, আসলে ইংরেজ। Scratch a Russian and you'll find him a Tartar—বলা হত একশো বছর আগে। Scratch a Shakespearean character and you'll find him an Englishman of the Elizabethan Age।

জানিনা এই প্রবন্ধের পাঠক আমার এই উক্তিটি শেক্স্পিয়রের পক্ষে

প্রশংসা বা নিন্দা বলে জ্ঞান করবেন কি না, আমার ধারণায় আমার উপরোক্ত চিন্তা বাণীশিল্পের পরম প্রশংসা। আমি বলছি শেকসপিয়রের শিল্পে চিরন্তন মানবিক সত্য বিদ্যমান, যে-সত্য (অবনীন্দ্রনাথের উক্তি অনুসারে) কল্পনার সত্য, ইতিহাসের নয়।

এই মানবিক সত্য যে শেকসপিয়রে সাধিত হয়েছে তার চরম কারণ তো অবশ্য তাঁর সৃজনী কল্পনার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া, যে-শক্তি আজ অবধি বিশ্লেষণসাধ্য হয়নি। এই চরম কারণের পরেই স্থান দেব শেকসপিয়রের অক্লান্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের। এই মাটির পৃথিবীতে শেকসপিয়র নিয়ত সুবদ্ধচরণ, তিনি যতই উর্ধ্বে তাকান, তাঁর দৃষ্টি হয়তো দূর থেকে দূরতর রহস্যের সন্ধান করছে কিন্তু তাঁর দৃষ্টির পরিধি থেকে সামান্য পৃথিবী কখনও বিলুপ্ত হয় না। তিনি কখনও ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য প্রত্যক্ষ বস্তুময় সত্যকে দুর্বল করেন নি, সেজন্যই তাঁর কল্পনা সত্য ও চির মহৎ।

পাঁচ

ষ্ট্র্যাটফোর্ড ছেড়ে, কট্‌সোল্ডের নিচু পাহাড় পেরিয়ে, অক্‌স্‌ফোর্ডের মধ্য দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে, হাই ওয়াইকুমে অল্পক্ষণ থেমে শেকসপিয়র প্রবেশ করলেন ষোলশতকী লণ্ডনে। প্রথমে কোথায় উঠেছিলেন সঠিক জানা যায় না তবে গোড়ার দিকেই টাওয়ারের উত্তর-পশ্চিমে বিশপ্‌স্‌ গেটে বাস করতেন। শহরে ঢুকে হয় কভেণ্ট গার্ডেন—ফ্লিট ষ্ট্রিট—সেণ্টপল্‌স্‌—চিপ্‌সাইড্‌ হয়ে অথবা সেণ্ট জাইল্‌স্‌—হবর্ণ—নিউগেট—চিপ্‌সাইড্‌ হয়ে ঢুকলেন নিজ মহল্লায়। সেকালের ও একালের ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে যদি প্রচণ্ড পার্থক্য দেখা না দিয়ে থাকে, সেকালের লণ্ডনে ও একালের লণ্ডনে প্রায় আকাশপাতাল প্রভেদ। শহরে তখন এক লক্ষের বেশি অধিবাসী ছিল না। আজকের জনবহুল শহরতলিগুলি সেকালে ছিল গ্রাম। উলিচ্‌—গ্রীনিচ্‌—ডালিচ্‌—ক্রয়ডন্‌—ক্ল্যাপাম্‌—চেল্‌সি—পাট্‌নি প্রভৃতি পূব-দক্ষিণ-পশ্চিমের পাড়াগুলি, হ্যাম্‌স্টেড্‌—হাইগেট—ইল্‌ফোর্ড প্রভৃতি উত্তর লণ্ডনের প্রান্তগুলি তখনও সর্বগ্রাসী রাজধানীর কুক্ষিগত হয় নি। বস্তুতঃ লণ্ডন্‌ শহরের এলাকা ছিল পশ্চিমে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে থেকে রেখা টেনে হোয়াইটহল পেরিয়ে, টেম্‌পল্‌ পেরিয়ে, সেণ্টপলের ক্যাথিড্রাল অতিক্রম করে টেম্‌স্‌ নদীর পাড়ে পাড়ে, ষ্ট্র্যাণ্ড রাজপথ বেয়ে, পূর্বসীমায় টাওয়ার অব্‌ লণ্ডন্‌ হোয়াইট চ্যাপেল অবধি।

শহরটি চওড়ায় কোথায়ও নদীতীর থেকে দু মাইলের বেশি ছিল না। নদীর এপারে ওপারে যাতায়াতের জন্ম একটি মাত্রই সেতু ছিল, সুপ্রাচীন লণ্ডন্ ব্রিজ, তার দক্ষিণে নদীর ওপারে ছিল সাউথওয়র্ক পল্লী যেখানকার টাবার্ড নামক সরাইখানায় দুশো বছর আগে জেফ্রি চসর্ রাত কাটিয়েছিলেন, আর এই পল্লীতেই অবস্থিত ছিল শেকসপিয়রের গ্লোব থিয়েটর। খড়-ছাওয়া এই থিয়েটর-গৃহ পুড়ে' ছাই হয়ে যায় ১৬১৩ সালে যখন শেকসপিয়র-রচিত 'অষ্টম হেনরি' অভিনীত হচ্ছিল। দ্বিতীয়বার নির্মিত হয়েছিল থিয়েটর-গৃহ কিন্তু ১৬৪৪ সনে সেই বাড়ি ভেঙে ফেলে ভাড়াবাড়ির ফ্ল্যাট তৈরি হয়। আজ আর শেকসপিয়রের গ্লোব থিয়েটরের কোনই চিহ্ন নেই।

শেকসপিয়রের পাড়া বিশপস্‌গেট থেকে অনতিদূরে প্রাচীন লণ্ডন প্রাচীরের বাহিরে ছিল কতকগুলি মাঠ, মূর ফিলড, স্পিটাল ফিলড, মাইল এণ্ড। এসব মাঠে কুচ কাওয়াজ হত। বিশেষতঃ শেকসপিয়র আনুমানিক যে সময় লণ্ডনে প্রথম যান, সে-কালেই স্প্যানিশ আক্রমণের আশঙ্কায় প্রচণ্ড সমরোদ্যম চলছিল শহরে ও আশেপাশে। যে উদ্দীপনায় তখন দেশে রংরুট যোগাড় হচ্ছিল তার কিছু চিত্র পাওয়া যায় 'চতুর্থ হেনরি' নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং অতি-সাধারণ লোকের চিত্তাবস্থার সুন্দর প্রকাশ পাওয়া যায় ফীব্‌ল্ নামক রংরুটের শাদামাটা কিন্তু বাস্তবিক নির্ভীক উক্তিতে ;

By my troth, I care not ; a man can die but once ; we owe God a death. I'll ne'er bear a base mind. An't be my desting, so ; an't be not, so. No man's too good to serve's Prince ; and let it go which way it will, he that dies this year is quit for the next.

এ এক আশ্চর্য heroic unheroism, বীরপুরুষ হওয়ার কোনও চেষ্টা নেই চেতনা নেই বলেই ফীব্‌ল্-এর কথাগুলিতে একটা অসামান্য সরল শৌর্য প্রস্ফুট হয়েছে। আমাদের দেশে এককালে অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত নায়ক নিয়ে এত উচ্ছ্বাস হয়েছে যে আজ আমি পেন্‌ডুলাম-গতির বিপরীত প্রান্তে পৌঁছে, জনগণের মানস নিয়ে নতুন কোনও Mystique বা রহস্যবাদ প্রস্তুত করব না কিন্তু এই ফীব্‌ল্-চরিত্রের সূত্র ধরে এই কথাটি বলব যে শেকসপিয়রের সাধারণ মানুষের চরিত্রে ও কর্মে যে অচেতন নিষ্প্রয়াস শৌর্য ও মহত্ত্ব প্রকাশিত সে বিষয়ে পাঠকেরা বা দর্শকেরা সচরাচর ওয়াকিবহাল নন।

জনগণ সম্বন্ধে শেকসপিয়রের মনোভাব কি প্রকার ছিল এই নিয়ে কিছু পল্লবগ্রাহী আলোচনা হয়েছে বটে, কেউ বলেছেন শেকসপিয়র জনবিরোধী সামন্তপূজক, কেউ হয়তো অতি ক্লিষ্ট ব্যাখ্যায় দেখেছেন শেকসপিয়র প্রগতিশীল গণবাদী। সাময়িকী প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে এই গুরুতর বিষয়ে আমি আলোচনা করতে পারছি না, কেবল আমার প্রত্যয় প্রকাশ করব যে প্রথমত শেকসপিয়রের চিন্তা মতবিলাসী নয়, প্রত্যক্ষপন্থী, অর্থাৎ তিনি জীবনে রং চড়াননি, যেমনটি দেখেছেন জীবন তেমনটি এঁকেছেন, যার ফলে কোনো অনাবিল শুভ্রতা বা দীপ্তিহীন তমিস্রা তাঁর চিত্রপটের একচ্ছত্র অধিপতি নয়, অগ্রগতি অথবা পশ্চাৎগতি 'ছোটলোক' বা 'বড়োলোক' কারুরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। দ্বিতীয় কথা যে শেকসপিয়র-সাহিত্যে সমাজের উচ্চকোটি নরনারী (ধরুন বেরৌন অথবা বিয়াট্রিস অথবা পোর্শিয়া অথবা হ্যামলেট) যে-পরিমাণে ইংরেজ (অর্থাৎ কুশীলব হিসাবে যদিও তারা অন্য দেশবাসী হতে পারে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারেই ইংরেজ-সুলভ), নিম্নকোটির নরনারী সে পরিমাণে আরো খাটি ইংরেজ। নাটকের ঐতিহাসিক প্রয়োজন বিচারে এই সব সাধারণ নরনারী হয়তো কেউ মিশরের, কেউ রোমের, কেউ বোহিমিয়ার, কেউ ভেনিসের, কেউ এথেন্সের অধিবাসী, কিন্তু তাদের মনোভঙ্গী সম্পূর্ণতঃ ইংরেজ। এক্ষেত্রেও শেকসপিয়রের রচনায় প্রত্যক্ষজ্ঞান কার্যকরী। লণ্ডনের বিচিত্র জনপ্রবাহ নিশ্চয় তাঁর মনে সাড়া জাগিয়েছিল, জনতার সম্মিলিত রূপ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আবার জনতার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাগুলিকেও অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, আর তারই ফলে এই সাধারণ লোকগুলি তাঁর রচনায় আশ্চর্য জীবন-সাদৃশ্য লাভ করেছে। আমার বিশ্বাস কেউ যদি শেকসপিয়র-সাহিত্যের lesser charactersগুলি অধ্যয়ন করেন, যে সব নাম-না-জানা চরিত্র অথবা যে সব চরিত্র মাত্র দুই একবার আবির্ভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, যারা নাটকের প্লট-বিন্যাসে আদৌ সুসংশ্লিষ্ট নয়, তাহলে মানবচরিত্র সম্বন্ধে শেকসপিয়রের মূল প্রত্যয় প্রণিধান করতে পারবেন।

সচরাচর শেকসপিয়রের নাটকে প্রধান চরিত্রগুলি সমাজের উচ্চ কোটি-সম্ভূত হয়ে থাকে, তারা রাজবংশীয় অথবা প্রতিষ্ঠাবান জননেতা বা সৈনিক। সাধারণ মামুলী লোক, খেটে-খাওয়া মানুষ, অথবা পেশাদার মধ্যবিত্ত লোক (যেমন শিক্ষক, চিকিৎসক, ধর্মযাজক ইত্যাদি) শেকসপিয়রের নাটকে সর্বত্রই উপস্থিত বটে কিন্তু গোড়ার দিকের কয়েকটি নাটকে (যথা 'টু জেণ্ট্‌লমেন্‌

অব্ ভেরোনা' 'মেরি ওয়াইভ্‌স্ অব্ উইণ্ডসর্', 'কমেডি অব্ এরর্স', 'টেমিং অব্ দি শ্রু') যেটুকু প্রাধান্য পেয়েছে এই শ্রেণীর লোকেরা, পরিণত নাটকে তেমনটি হয় নি। শেকসপিয়রের সমসাময়িক ডেকার যেমন মেহনতী লোকের কাহিনী রচনা করেছেন, বেন জন্‌সন্ অথবা ম্যাসিঙ্গার যেমন মধ্যবিত্ত মানুষকে কেন্দ্রস্থলে রেখেছেন, শেকসপিয়র তেমনটি করেন নি বলে যদি পিচ্ছিল-সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই যে শেকসপিয়র নিম্নকোটি লোক সম্বন্ধে দরদী ছিলেন না, অথবা তাঁর সমাজবোধ ছিল একপেশে, তাহলে আমাদের সাহিত্যপাঠে কিছু খেলোমি আছে বুঝতে হবে। শিল্পের প্রকৃতি এমন হালকা নয় যে কাহিনীর নায়ক রাজপুত্র না ঝাড়ুদার সেই বিচারে কাহিনীকারের সমাজবোধ সাব্যস্ত করব। আমাদের আসল মানদণ্ড শিল্পীর মনোভঙ্গী। শেকসপিয়রের অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে প্রত্যেক চরিত্রের মূল মানবতা উদ্‌ঘাটিত ও উজ্জ্বল হয়েছে। চরিত্রের বৃত্তি যেন পোষাকের মতো, তার সাহায্যে চরিত্রটির প্রত্যক্ষ বস্তুময়তা (concrete reality) প্রমাণ হয়েছে, চরিত্রটি ইতিহাসের এলাকায় এসেছে, কিন্তু কোনো মানুষই কেবল বৃত্তি নয়, জাতি নয়, দেশবাসী নয়, প্রত্যয়াবলম্বী নয়, মানুষ আবার শাশ্বত মানুষও বটে। শেকসপিয়রের নায়ক মেহনতী লোক নয়। বস্তুতঃ ইংরেজি সাহিত্যে সর্বপ্রথম আঠারো শতকের ঔপন্যাসিকদের হাতে, বিশেষত উনিশ শতকে ডিকেন্সের হাতে, মেহনতী লোক প্রতিষ্ঠালাভ করে সাহিত্য জগতে। শেকসপিয়রের কালে জনরুচি ছিল দীপ্তিময় গ্ল্যামরাস্ উচ্চবিত্ত নায়কের সপক্ষে, শেকসপিয়র সমকালীন সাহিত্যরুচি মেনেছেন, আর এই রুচি যে শিল্পকৃতির মানদণ্ডে অগ্রাহ্য এমন বলতে পারি না। শেকসপিয়রের লিয়র ও টুর্গেনিভের লিয়র অব দি স্টেপ্‌স্, শেকসপিয়রের হ্যামলেট ও টুর্গেনিভের রুডিন যে বিভিন্ন আবেগ পাঠক চিত্তে সংক্রামণ করে তার কারণ যে চরিত্রগুলির সামাজিক আসন একেবারেই নয় এমন বলতে পারি না। কিন্তু যদিও মেহনতী লোকেরা, নিম্নবিত্ত লোকেরা, নায়কের মর্যাদা পায় নি, তবুও কী আশ্চর্য সমানুভূতি, সমদর্শিতা, সংবেদনা দিয়ে শেকসপিয়র তাদের সৃষ্টি করেছেন! সমকালের প্রায় যাবতীয় শ্রেণীর পেশা ও ব্যবসায় বিধৃত হয়েছে তাঁর নাটকে। কয়েকটি পেশার উল্লেখ করছি: Schoolmaster, friar, parson, doctor, nurse, physician, nun, vicar, sexton, lawyer, alderman, sheriff, country Justice; sailor, soldier; gardener, constable, page, inn-keeper, pedlar; courtezan, bawd,

Executioner ; vintner, drawer, carrier, goldsmith, carpenter, joiner, bellows-mender, tinker, tailor, haberdasher, masker, torch-bearer, guard, watchman, jeweller, mercer। ষোল শতকী ইংল্যাণ্ডে কত রকম পেশা অনুসৃত হত তার কিছু ধারণা হয় আমার এই অসম্পূর্ণ তালিকা থেকে। নাটকের প্রয়োজনে হয়তো বলা হয়েছে যে এরা রোমের লোক, ভিয়েনার লোক, কিন্তু নামে কাজে চরিত্রে এরা খাঁটি ইংরেজ। হয়তো ষ্ট্র্যাটফোর্ডে অথবা লণ্ডনে অথবা অন্যত্র শেকসপিয়র দেখে থাকবেন এদের স্থূলমূর্তি, তারপরে সুযোগমতো এদের রূপায়িত করেছেন নিজ নাটকে।

সমকালীন জীবনের অধিক অংশই শেকসপিয়র-নাটকে বিধৃত হয়েছে। রাজা রাজড়ার জীবন তো হয়েইছে, সে বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ এ-প্রবন্ধে অনাবশ্যক। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে শেকসপিয়র সেকালের ক্রমবর্ধমান ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করেন নি, কেবল জ্যাক কেইডের মুখে দুই একটি কথা ছাড়া এবং বণিকদের প্রতি তেমন মনোযোগী হননি। 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস' নাটকে অবশ্য বণিক বর্তমান আরও দুই একটি নাটকে বণিকের আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু যে হিসাবে বেন্ জনসনের নাটকে দেখানো হয়েছে যে (অধ্যাপক এল্ সি নাইট্স্ যেমন বিশ্লেষণ করেছেন) সেকালের ইংরেজ সমাজের বিবর্তনের ফলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে টাকা-খাটানো লোকের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল, পুঁজিপতিদের সৃষ্টি হল আর তার ফলে নৈতিক আদর্শ ও আচরণ বদলালো, সে হিসাবে শেকসপিয়রের নাটকে সমাজের কোনও নব সূচনা সম্বন্ধে চেতনা দেখতে পাই না। পিউরিটানদের তিনি অপছন্দ করতেন। মালভলিও তাঁর নাটকে অপদস্থ হয়েছে এবং সার টোবি বেল্চের উক্তি এ-প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয় বটে কিন্তু শেকসপিয়রে এমন কোনোও আভাস নেই যে এই পিউরিটান মনোবৃত্তি অচিরে পরাশ্রয়ী ঐশ্বর্যলালিত সামন্তের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে। প্রত্যক্ষের যে জ্ঞান শেকসপিয়রকে অনবরত নিয়ে গেছে সমসাময়িক মানুষের দিকে সে জ্ঞান তাঁকে আগামী কালের সম্ভবপর সমাজের দিকে নেয় নি। সেই হিসাবে শেকসপিয়র পুরোপুরি স্বকালবদ্ধ। শেকসপিয়র খাঁটি Londoner। চসরের মতো, ডিকেন্সের মতো, শেকসপিয়র সমকালের লণ্ডনে পেয়েছেন মানব-চরিত্রের ও মানুষের গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত অসংখ্য আচরণের রূপ, তাইতেই

সন্তুষ্ট থেকেছেন, প্রত্যক্ষের নিশ্চিত ক্ষেত্র ছাড়িয়ে অনাগত কালের সম্ভাব্যরূপ কল্পনা করেন নি।

ছয়

প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে যে মানব সমাজ গড়ে উঠল শেকসপিয়র-সাহিত্যে সেই সমাজের মানস মূর্তিটি কেমন? কোন্ কোন্ প্রধান ধ্যান ধারণা শেকসপিয়র পেয়েছিলেন সমকাল থেকে!

এককালে বলা হত যে শেকসপিয়র অল্পশিক্ষিত ছিলেন, তাঁর লিখনপটুতা এক আশ্চর্য অশিক্ষিত-পটুত্ব মাত্র। শেকসপিয়রের জীবনী ও তাঁর কাল সম্বন্ধে আমাদের তথ্যজ্ঞান ও বোধ বাড়ার ফলে আজকাল আমরা জেনেছি যে শেকসপিয়র অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান পান নি কিন্তু তেমন জ্ঞানের মাত্র দুই এক ধাপ নিচেকার জ্ঞান ও শিক্ষা তিনি অর্জন করেছিলেন। স্ট্র্যাটফোর্ডের গ্রামার স্কুলে তিনি পড়েছিলেন এবং তাঁর হেডমাস্টার টমাস জেন্‌কিন্‌স্ লেখাপড়া বিষয়ে খুব সহজে সন্তুষ্ট হওয়ার লোক ছিলেন না। বস্তুতঃ আমেরিকান অধ্যাপক টমাস বল্‌ডুইন তাঁর মন্থর বিশাল গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে বেন্ জন্‌সন্ যা-ই বলুন না কেন, সেকালকার গ্রামার স্কুলের প্রথা অনুসারে শেকসপিয়র যে বিদ্যালাভ করেছিলেন তা' কী গুণে কী পরিমাণে আদৌ অবজ্ঞেয় নয়। শেকসপিয়র একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, অপর দিকে তেমনি গ্রন্থপাঠ দ্বারাও জ্ঞান বাড়িয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থগত জ্ঞান সম্বন্ধে আমি ডকটর জন্‌সনের কয়েকটি বাক্য উধৃত করব যা জন্‌সন্ প্রয়োগ করেছিলেন ড্রাইডেন সম্বন্ধে।

I rather believe that the knowledge of Dryden was gleaned from accidental intelligence and various conversation, by a quick apprehension, a judicious selection, and a happy memory, a keen appetite of knowledge, and a powerful digestion; by vigilance that permitted nothing to pass without notice, and a habit of reflection that suffered nothing useful to be lost.···I do not suppose that he despised books, or intentionally neglected them; but that he was carried out, by the impetuosity of his genius, to more vivid and

speedy instructors, and that hls studies were rather desultory and fortuitous than constant and systematical.

অর্থাৎ মণীষার যে বিশেষ ধর্ম জন্‌সন্‌ লক্ষ্য করেছিলেন ড্রাইডেনে সেই ধর্মের পরাকাষ্ঠা বলে' যদি আমরা শেকসপিয়রকে বিচার করি তাহলে মানতে হবে যে শেকসপিয়র জ্ঞান আহরণ করেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, অন্যের সঙ্গে আলোচনা দ্বারা, এবং প্রয়োজন মতো গ্রন্থ পাঠ থেকে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল আমাদের শিখিয়েছেন যে জ্ঞানার্জনের সুষ্ঠু প্রণালী এই তিনটিই। শেকসপিয়র বই পড়তেন—যথা, প্লুটার্ক (অনুবাদে), অভিডের 'মেটামরফসিস' মূল লাটিনে, হলিনশেড, আর্কেডিয়া, ইউফুয়েস, সর্বোপরি বাইবেল, এ হেন কয়েকটি গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে এগুলি তিনি পড়েছিলেন। অন্য বই আছে যেগুলি পড়লেও পড়ে থাকতে পারেন, আবার হয়তো সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা শুনে থাকতে পারেন—যথা, মেকিয়াভেলির 'ইল্‌ প্রিন্স্‌' নামক গ্রন্থ। আর ধরুন স্যার ওয়ল্টার রলে'র School of Night নামক দুঃসাহসী সংশয়বাদী প্রায়-নাস্তিক গোষ্ঠীর আলোচনায় অথবা মার্মেড ট্যাভার্নের উচ্চকণ্ঠ তার্কিকদের আড্ডায় কী ধরনের মনের খোরাক শেকসপিয়র পেতেন সে বিষয়ে কিছু ধারণা করতে পারি ফ্রান্সিস্‌ বোমণ্ট যে পদ্য-পত্র লিখেছিলেন বেন্‌ জন্‌সনের কাছে সেটি থেকে :

What things have we seen
Done at the Mermaid ! heard words that have been
So nimble and so full of subtle flame,
As if that every one from whence they came
Had meant to put his whole wit in a jest,
And had resolved to live a fool the rest
Of his dull life.

মননশীলতার এই শাণিত তীব্র আবহাওয়ায় স্বভাবতই শেকসপিয়র সমকালীন চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

সেকালে লণ্ডনে রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। পনেরো শতকের অনেক অনিশ্চয়তা ও ক্লেশের পরে যখন টিউডর রাজবংশ সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হল আর নানা বিপর্যয়ের পরে এলিজাবেথের আমলে

শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রবর্তিত হল তখন একদিকে যেমন সরকারী ভাবে (যথা আর্চ বিশপ হুকারের Laws of Ecclesiastical Polity নামক গদ্যগ্রন্থে) এই শান্তির সমর্থন হল, অন্যদিকে অনেক সাহিত্যিক (শেকসপিয়র স্বয়ং) এই শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রচার করলেন। শেকসপিয়র থেকে একটিমাত্র উধৃতি দেব, যদিচ দীর্ঘ উধৃতি :

Degree being vizarded,
Th' unworthiest shows as fairly in the mask.
The heavens themselves, the planets, and this centre,
Observe degree, priority, and place,
Insisture, course, proportion, season, form,
Office, and custom, in all line of order :
And therefore in the glorious planet Sol
In noble eminence enthron'd and spher'd
Amidst the other, whose med'cinable eye
Corrects the ill aspects of planets evil.···
··· ··· But when the planets
In evil mixture to disorder wander,
What plagmes and what portents, what mutiny,
What raging of the sea, shaking of earth,
Commotion in the winds ! Frights, changes, horror,
Divert and crack, rend and deracinate,
The unity and married calm of states
Quite from their fixture ! O, when degrre is shak'd,
Which is the ladder of all high designs,
The enterprise is sick ! How could communities,
Degrees in schools, and brotherhood in cities,
Peaceful commerce from dividable shores,
The primogeneity and due of birth,
Prerogative of age, crowns, sceptres, laurels,
But by degree stand in authentic place ?

Take but degree away, untune that string,

And hark what discord follows!

(Troilus and Cressida)

এই ডিগ্রী দ্বারা, উচ্চনীচের ব্যবধান দ্বারা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালিত হচ্ছে, হচ্ছে মানবসমাজও। সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চনীচ ব্যবধান। স্কুলের ছাত্ররা কেউ উঁচু শ্রেণীতে কেউ নিচু শ্রেণীতে পড়ে। নগরে নগরে নানাপ্রকার সমিতি সম্প্রদায় থাকে, সেখানেও সদস্যদের মধ্যে কেউ উচ্চ পদাধিকারী কেউ বা নিচুতে। যে সব বণিকেরা দেশ ছেড়ে দুস্তর বিদেশে ভ্রমণ করেন তাদের মধ্যেও গুণকর্মের বিভাগ, অর্থাৎ ডিগ্রীর ব্যবধান, বর্তমান। সংসারে যে ভাই আগে জন্মায় সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান ও দায়িত্ব অন্য ভাইদের চেয়ে বেশি। যিনি বৃদ্ধ তাঁরও সম্মান বেশি। এই ডিগ্রীর মাহাত্ম্যেই মুকুট ও রাজদণ্ডধারী ব্যক্তির সামাজিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অন্য যাবতীয় ব্যক্তির চেয়ে অধিক। অতএব জীবনের মূল নীতি হচ্ছে ডিগ্রী।—এ-বিশ্বাস ইউলিসিসের একার নয়, স্বয়ং শেকসপিয়রের বলে, মানা গেছে, মানা গেছে অনেক সঙ্গত কারণে যেগুলির প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলা যায় যে এই ডিগ্রী-প্রত্যয় শেকসপিয়রে অন্য অনুরূপ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়, এই প্রত্যয় সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তার গোড়ার কথা, এবং সমকালীন ইংরেজি সাহিত্যের সর্বত্র পাওয়া যায়। উপরন্তু, শেকসপিয়র সম্বন্ধে যতদূর আমরা জানি, তাতে জানি যে মানুষ হিসাবে তিনি ডিগ্রীতে বিশ্বাস করতেন যদিচ মানুষকে তুচ্ছ করতেন না আর জানতেন যে ডিগ্রী নামক সমাজধর্মের চেয়েও মানবধর্ম মহত্তর।

ডিগ্রী শুধু সমাজধর্মই নয়। খ্রীষ্টীয় প্রত্যয়, প্লেটোর ধারা-অনুযায়ী প্রত্যয়, দুইয়েই ডিগ্রী সমর্থিত। স্বর্গে যেখানে মহান ঈশ্বর রাজসভা সাজিয়ে বসে আছেন, তাঁর চারিদিককার সভাসদগণ (অর্থাৎ আর্কেঞ্জেল, এঞ্জেল, সেরাফ, চেরাব প্রভৃতি দেবাংশী সন্তাগণ) এই ডিগ্রীর তারতম্য মেনেই কেউ বসেছেন প্রথম সারিতে, কেউ বসেছেন পিছনের সারিতে। (এই মধ্যযুগীয় প্রত্যয়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপ দান্তের ডিভিনা কম্‌মেডিয়াতে এবং যদিচ শেকসপিয়র যে চার্চ অব ইংল্যাণ্ড মানতেন সেই চার্চ দান্তের মানা ক্যাথলিক মত অনেকটা পালটে দিয়েছিল, তাহলেও অন্যান্য অনেক চিন্তার মতোই ঐশ্বরিক রাজসভার কল্পনাটি ত্যাগ করে নি।

এই ডিগ্রী যখন এমনই মূল্যবান প্রভাবশালী সর্ববিষয়চালক শক্তি, ডিগ্রীর ব্যত্যয় হলে কী হতে পারে? শেকসপিয়র বলছেন যে ব্রহ্মাণ্ডে যে Order, যে-শৃঙ্খলা, বিদ্যমান তা ধ্বংস হবে আর পরিবর্তে আসবে প্রলয়, জাগতিক বিপর্যয় ও ধ্বংস। শেকসপিয়র বর্ণনা করছেন, ঝড় আসবে, মেদিনী কম্পিত হবে, সমুদ্র উথলে উঠবে, আধি ব্যাধিতে পৃথিবী ভরে যাবে। (শেকসপিয়র সম্ভবত সেণ্ট জনের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ভাবছেন যেখানে সেই সাংঘাতিক আখেরি দিবসে, 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর!', pestilence ছড়াবে সর্বত্র!)

কিন্তু ডিগ্রীর ব্যত্যয়ে শুধু পৃথিবীই ধ্বংস হবে না, হবে সৌরজগৎও। প্লেটো বলেছিলেন, গ্রীক প্রাচীনেরা মানতেন, যে সৌরমণ্ডলের যাবতীয় গ্রহনক্ষত্র যার যার কক্ষে আবর্তিত হওয়ার সময় যে-ধ্বনি সৃষ্টি করে সে-ধ্বনির সমবেত তানে একটি মহাব্যোমময় মহান সাঙ্গীতিকী একতান উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডীয় সুরে সমস্ত বিশ্বের গতিবিধি বাঁধা। এই গতিবিধিতেও ডিগ্রী, শৃঙ্খলা। যদি ডিগ্রী যায়, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডীয় সুরও বিশৃঙ্খল হবে অর্থাৎ ধ্বংস হবে।

অতএব শেকসপিয়রের ও ষোল শতকের ডিগ্রী-প্রত্যয়, শৃঙ্খলা-দর্শন সে-যুগের জীবন-দর্শনের গোড়ার কথা। এই দার্শনিক প্রত্যয়ে বিধৃত তাদের সমাজবিধি, আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ঈশ্বরোপাসনা, বিশ্বপ্রত্যয়। আজ যেমন আমাদের প্রত্যয়গুলি খণ্ডিত, পরস্পরে অসঙ্গত, অর্থাৎ আমার ঈশ্বরপ্রত্যয়ে ও আমার রাজনীতিতে অথবা অর্থনীতিতে হয়তো বিরোধ থাকতেও পারে, শেকসপিয়রের কালে এমনটি ছিল না। সেকালে সচরাচর সমস্ত প্রত্যয় একসূত্রে গাঁথা থাকত।

এই ডিগ্রীপ্রত্যয় থেকে থেকে আরেকটি প্রত্যয়ে পৌছেছিলেন সে যুগের মনীষী—নেতৃত্ব-প্রত্যয়ে। এই প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদটি সমাপ্ত হয়েছে 'পঞ্চম হেনরি' থেকে উধৃত একটি দীর্ঘ স্তবকে। এই স্তবকে মধুমক্ষী-সমাজের বিশদ বর্ণনার সাহায্যে বলা হচ্ছে যে গুণকর্মের বিভাগ অনুসারে বৃত্তি নির্ধারিত হয়, অনেক কর্মী থাকে সমাজে কিন্তু সে-সব কর্মীকে চালনা করার লোক দরকার, সেই সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তি হচ্ছেন এম্পারার, সম্রাট, মহারাজ। অধ্যাপনা-কক্ষে ইদানীং যে-প্রত্যয়কে আমরা Divine Right Theory of Monarchy বলে থাকি, সেই দৈব অধিকারের

ধারণা এই ডিগ্রী-প্রত্যয়ের ও নেতৃত্ব-প্রত্যয়ের অবধারিত পরিণতি। কিন্তু রাজ্য চালনার জন্য সম্রাটের বাহু দরকার, অনেক বাহু দরকার, অর্থাৎ এমন সব কর্মচারী দরকার যারা নিজ নিজ সীমিত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত পালন করতে পারবে। সিংহাসনে আসীনা যদি রানী এলিজাবেথ, তাহলে তাঁর কর্মচারী হবেন বার্লে, ওয়ল্‌সিংহাম, তাঁর আদেশে রলে ড্রেক ফ্রবিশর যাবেন দেশে বিদেশে। অর্থাৎ দেশে এক কর্মচারীকুল তৈয়ারি হওয়া দরকার। দরকার শিক্ষার। এইজন্য সেকালে রজার আসকামের বই, ক্যাসটিলিওনির বই, সর্বোপরি মেকিয়াভেলির বই। এইজন্যই অচিরে বেকন লিখবেন জ্ঞানের প্রসার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ, লিখবেন নিউ আটলান্টিস, নতুন সভ্যতার কল্পনা। আর সেই সমকালীন কল্পনা শেকসপিয়রকে নাড়া দিয়েছিল তার প্রমাণ 'টেম্‌পেসট্‌' নাটকে গন্‌জালোর বিখ্যাত উক্তি যদিও শেকসপিয়র আবার অপরের মারফত গন্‌জালোর কল্পনাবিলাস বিদ্রূপও করেছেন যেন বলতে চাচ্ছেন, 'ঠাট্টা করে ওড়াই সখি নিজের কথাটাই!' আর এই নেতৃত্ব-প্রত্যয়ের জন্যই ইতিহাসও বিকৃত করেছেন শেকসপিয়র, পঞ্চম হেন্‌রিকে আদর্শ রাজা বানিয়েছেন। তাছাড়া নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পসন্তান ফল্‌স্টাফকে করেছেন ব্যাহত অপদস্থ মর্মাহত। তাঁর সমকালীন অনেক মনীষীর মতো শেকসপিয়র ইতিহাসে খুঁজেছেন আদর্শ নেতা। রানী এলিজাবেথ তো অবশ্যই, সে যুগের দৃষ্টিতে, সর্ব আদর্শের ললামভূতা, তাঁর যশোগাথা শেকসপিয়র গেয়েছেন, যেমন গেয়েছেন লিলি সিডনি স্পেনসর ড্রেটন এবং আরো অনেকে, গেয়েছেন মামুলি রাজপ্রশংসার উদ্দেশ্যে নয়, অন্তরের বিশ্বাস ও তাত্ত্বিক নিশ্চয়তা থেকে। শেকসপিয়রের আদর্শ ইংরেজ রাজা প্রাক্তন ইতিহাসে পঞ্চম হেন্‌রি, রোমের ইতিহাসে অকটেভিয়স সীজার।

এই সঙ্গে আরেকটি ধারণা বিধৃত, যে-ধারণা সম্বন্ধে উপরে তৃতীয় অনুচ্ছেদে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছি। সেখানে আর্ডেন-উপবনের উল্লেখে বলেছি ষোল শতকের একটি কামনার কথা, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত দেশের কথা। এ হেন আকাঙ্ক্ষা জাতির বা ব্যষ্টির কর্মহীন অলস মুহূর্তে আসে না। আসে কর্ম-নীরন্ধ্র দায়িত্ব-ব্যাকুল নিরলস মুহূর্তে, যখন মানুষ কাজের নেশায় মাতাল, কাজ করছে তো করছেই, কাজ সে ছাড়বে না, তবুও মাঝে মাঝে যেন কোন্‌ সুদূরে উদাস দৃষ্টি পাঠিয়ে দেয়, আবার তারই পরে কাজে লেগে যায়। Public duty

ও private repose এর দুই সুতো এলিজাবেথীয় কর্মী মানুষের মধ্যেও ছিল, তার আভাস শেকসপিয়র নাটকে। কিন্তু আসল সুতো বড়ো শক্ত সুতো, কর্মের সুতো। ফিলিপ সিড্‌নি আর্কেডিয়ার স্বপ্ন দেখছেন, দেহত্যাগ করছেন রণক্ষেত্রে। মার্লো 'হীরো অ্যাণ্ড লীয়ণ্ডার' কাব্যে প্রেমের বিস্রস্ত আলস্য বর্ণনা করছেন কিন্তু তাঁর জীবন কর্মে ভরা। শেকসপিয়র প্রায় কুড়ি বৎসর গড়ে বছরে দুখানা করে নাটক রচনা করলেন আর সুযোগ পেলেই চলে গেলেন ষ্ট্র্যাটফোর্ডের ছায়াচ্ছন্ন কূজনমুখর শিথিল জীবনে। ষ্ট্র্যাটফোর্ড ও লণ্ডন্ যেন দুই পরিপূরক প্রতীক।

কিন্তু তবুও এলিজাবেথী যুগে কর্মই প্রধান। যে প্রস্‌পেরো গ্রন্থনিবিষ্ট সংসার-উদাসী, বিচিত্র অভিজ্ঞতার অন্তে তিনিও জাদুদণ্ড ভেঙে ফেলে চললেন আবার কর্মের জীবনে।

বস্তুতঃ এই কর্মের উন্মাদনা ছিল বলেই শেকসপিয়রের কালে নাটক হয়েছিল শ্রেষ্ঠ বাণীশিল্প। যত 'কবিত্বই' নিজ প্রকৃতিতে লেখকেরা অনুভব করে থাকুন না কেন, তাঁদের শিল্পশক্তি নাটকের কর্মস্রোত-লীলায়িত জীবনের বঙ্কিম পথে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমার বিশ্বাস মার্লো এবং ওয়েবস্টার মূলতঃ কবিপ্রকৃতির লোক, বেন্ জন্‌সনের মতো নাট্যপ্রকৃতির নয় কিন্তু যুগধর্মের অবশ্যমান্য নিয়মে এঁরা হয়েছিলেন নাট্যকার। শেক্‌সপিয়র-চরিত্রে নিভৃত-লোকবাসী কবি ও বহিরাশ্রয়ী নাট্যকার উভয়ে মিলিত হয়ে জনোল্লাসমুখর প্রেক্ষাগৃহের অদম্য উন্মাদনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। শেকসপিয়রের কাল নাট্যসাহিত্যের কাল কেন না সমসাময়িক ইতিহাস নিরলস কর্মের ইতিহাস।

কিন্তু কর্মের জগতে উত্থান পতনের নিত্যলীলা চলে। কোন্ অজ্ঞাত ভাগ্য বিপর্যয়ে নেতৃত্ব বদলায় (শেকসপিয়র ও তাঁর সমকালীনেরা জানতেন স্বদেশের ইতিহাসে নেতৃত্ব কতবার বদলেছে, সেদিনও স্কট রাণী মেরীর ভাগ্য-বিপর্যয় হয়েছে, লেস্টারের আর্ল ও এসেক্সের আর্ল উত্থানের শিখরে পৌঁছে পতনের গহ্বরে নেমেছেন), কোন্ অনির্ণেয় শক্তির অরোধ্য আঘাতে ব্যষ্টির জীবন প্রসন্ন হয় আবার ধূলিসাৎ হয়, কে বলবে? অতএব শেকপিয়রের কালে Mutability অর্থাৎ পরিবর্তনশীলতা, ভাগ্য, একটি পুনরাবৃত্ত ধারণা। স্পেন্‌সর তো এই নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন, শেকসপিয়রে এই ভাগ্যের ধারণা প্রতিটি ঐতিহাসিক ও রোমান নাটকে, আবার এই ধারণা দ্বারা শেকসপিয়র যে ক্লিষ্ট ছিলেন না তার প্রমাণ :

Rosalind. What shall be our sport, then ?

Celia. Let us sit and mock the good housewife fortune from her wheel, that her gifts may henceforth be bestowed equally.

Ros. I would we could do so ; for her benefits are mightily misplaced ; and the bountiful blind woman doth most mistake in her gifts to women.

(As You Like It)

এখানেও সেই 'ঠাট্টা করে ওড়াই সখি নিজের কথাটাই।'

শেকসপিয়রের যুগে একদিকে যদি অনতিক্রম্য ভাগ্যের ধারণা, তাহলে তুলাযন্ত্রের অন্য পাল্লায় অপরাজেয় মানবাত্মায় বিশ্বাস, এবং দুই ভিন্নমুখী শক্তির সংশ্লেষ ও সংঘর্ষের ফলেই ব্যক্তির জীবনে কমেডি ও ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়। কমেডি ও ট্র্যাজেডির ধারণা এলিজাবেথী যুগে কী ছিল, তারও পূর্বে মধ্যযুগে এবং তারও পূর্বে গ্রীকো-রোমান যুগে কী ছিল, শেকসপিয়রে তার বিশিষ্ট রূপ কী, এসব জটিল বিষয়ে আলোচনা এই সাময়িকী প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়, আর এসব বিষয়ে জ্ঞানী আলোচনা এ-যাবত অনেক হয়েছে। আমার মূল বক্তব্য যে শেকসপিয়র-কালে কমেডির অথবা ট্র্যাজেডির যে-ধারণা সক্রিয় ছিল সে-ধারণার পশ্চাতে সমকালীন জীবনদর্শন অনেকাংশেই দায়ী। আজকাল আমরা জেনেছি যে হব্‌স্‌ লক্‌-এর আগেই শেকসপিয়রের কালে সাইকলজির আলোচনা হয়েছিল। মধ্যযুগীয় Four Humours এর ধারণা ক্রমে জটিল মনস্তত্ত্ব ও শারীর বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সংস্কার থেকে উন্নীত হল সূক্ষ্ম চরিত্র-বিশ্লেষণে। কেন লোকের চরিত্র বিশেষ ধরনের হয় ? মধ্যযুগে বিশ্বাস করা হত যে প্রত্যেকেরই চরিত্রে vertu (আধুনিক virtue নয়) বিদ্যমান, তারই প্রভাবে মার্লোর চরিত্রেরা নেশাগ্রস্তের মতো একেকটা প্রচণ্ড দুর্দমনীয় বাসনার পিছনে ছুটছে। শেকসপিয়রের কালে এই প্রচণ্ড বাসনার, এই violent passion-এর, সূক্ষ্মতর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হল। বার্টনের 'অ্যানাটমি অব্‌ মেলাংকলি', শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট', ডানের আত্মবিশ্লেষী কবিতাগুলি, এই নব মনস্তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই মনস্তত্ত্বের মহৎ দান মানুষের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস। মধ্যযুগে ব্যষ্টির মূল্য ছিল অতীব ক্ষীণ। এখন মানা হল যে ভাগ্যে সুখ থাক বিষাদ থাক বিনাশই থাক, ভাগ্যের আলোড়নে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। এই কথা যখন মানা গেল তখন বিস্ময় জাগল ব্যক্তিত্বের ভাবনায়।

যেন নতুন এক পৃথিবী আবিষ্কৃত হল। যে-রেনেসাঁসের গোড়ার কথা নবত্ববোধ, বিস্ময়, যে-রেনেসাঁস প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার করে', নূতন ভূখণ্ডের আবিষ্কার করে' বিস্ময়মগ্ন হয়েছিল, সেই রেনেসাঁস এখন অন্য এক মহাদেশ আবিষ্কার করল—মানবচিত্ত। আর এই মহাদেশ যেন নিত্য নতুন বিস্ময় আমাদের সামনে সাজাল! বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াচ্ছেন না শেক্স্‌পিয়র অথবা সমকালীন অন্য কোনো লেখক, দাঁড়াবার সময় নেই কেননা জীবন তো দ্রুত ধাবমান, কিন্তু সেই তড়িদ্‌গমনের সঙ্গেই শেক্স্‌পিয়র লক্ষ্য করছেন মানবচিত্তের অগণিত প্রকাশ। এই তো রেনেসাঁসের বিস্ময়, রেনেসাঁস মানলো ব্যক্তির চেয়ে অধিক অভিনব কিছু নেই। এই বিস্ময়েরই অবিস্মরণীয় প্রকাশ হ্যামলেটের ও মিরাণ্ডার উক্তিতে, তাছাড়া কত যে ছোটখাট আরও উক্তিতে ছড়িয়ে আছে—কী শেকসপিয়রের লেখায়, কী অপরের—তার হিসাব নেই। কীট্‌স্ তাঁর সনেটে মেক্সিকো-জয়ী কর্টেসের কথা বলেছেন, পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে কর্টেস্ দেখলেন ওপারে অনন্ত সাগর, অনাবিষ্কৃত পৃথিবী, আর তাঁর চিত্ত ভরে গেল অপার বিস্ময়ে। শেকসপিয়রের যুগে প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন একেকটি কর্টেস—অপার বিস্ময়ের মালিক, অনলস কর্মী, পুরুষকার-প্রত্যয়ী আবার ভাগ্যেরও বিরোধী নন, ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী।

ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস থাকলেই একটি মূল্যবান অনুসিদ্ধান্তে পৌছতে হয়। শেকসপিয়র-কালে এই অনুসিদ্ধান্ত অতিশয় সক্রিয়, তাঁর সাহিত্যচিন্তায়ও সক্রিয়। এই সিদ্ধান্তে নেচার ও আর্টের তারতম্য করা হয়েছে। জীবনের কতটুকু স্বতস্ফূর্ত, কতটুকু শিল্পায়িত, স্বতস্ফূর্তিই কি মানুষের কাম্য না সব কিছুই শিল্প দ্বারা রূপায়িত সংযত হওয়া দরকার? যদি ব্যক্তিকে মানি, আর মানি যে ব্যক্তি কর্মশীল, তাহলে কর্মও মানতে হবে। বস্তুতঃ সমগ্র রেনেসাঁস-সাহিত্যে নেচার ও আর্টের দ্বৈততা, শেষ বিচারে আর্টের শ্রেষ্ঠতা, পুনঃপুনঃ বর্ণিত হয়েছে। এই দুইয়ের দ্বৈততার শ্রেষ্ঠ বাণীপ্রকাশ, আমার যতটুকু জানা আছে, শেকসপিয়রের 'টেম্‌পেস্‌ট্' নাটকে এবং মিল্‌টনের 'কোমাস্' নাটকে। মিলটনে পশুশক্তির রূপক কোমাস বলছে সংযমবিহীন ভোগের কথা, সংস্কৃতিবান নারী বলছেন সংযত সমাজ-সচেতন স্থমিত ভোগের কথা। মিল্‌টনের সহানুভূতি অবশ্যই নারীর দিকেই। শিক্ষা ও স্বভাব, সংযম ও অবাধ প্রবৃত্তি এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব শেকসপিয়রের নাটকে ('উইন্টার্স টেল', 'সিম্বেলিন', 'কিং লীয়র' ও অন্যত্র) ও সে-যুগের অন্য সাহিত্যে কী ভাবে

প্রকাশিত হয়েছে, এই দ্বন্দ্বের মানসিক পশ্চাৎপট কী সে বিষয়ে ইদানীং বহু আলোচনা হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক 'টেম্‌পেস্‌ট্‌' নাটকের নব-আর্ডেন সংস্করণ পাঠে এই চিন্তার পরিচ্ছন্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাবেন।

শেকসপিয়র শিক্ষায় শিল্পে বিশ্বাস করতেন, নিরেট প্রবৃত্তিতে বিশ্বাস করতেন না। এ বিষয়ে তিনি পুরোপুরি স্বকালবদ্ধ। শিল্প মানে অস্‌কার ওয়াইল্‌ড্‌-এর স্বয়ম্ভূ শিল্প নয়, এই শিল্প জীবনেরই সংস্কৃত রূপ। শিল্প মানতেন বলেই তাঁর শিল্প নিয়ত প্রত্যক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেছে, প্রত্যক্ষকে বর্ণায়িত করেছে। শেকসপিয়রের জগৎ নিষ্ঠার সঙ্গে, প্রেম দিয়ে, সমকালীন জগতের ভিত্তিতে আপনাকে দাঁড় করিয়েছে বলেই সে-জগৎ মহৎ শিল্প এবং তার আকৃতি সার্বজনিক।

সাত

যে কয়েকটি প্রত্যয়ের বর্ণনা করেছি সেই কয়টিতেই শেকসপিয়রের সমগ্র চিন্তাচক্র সমাপ্ত হয়েছে এমন হাস্যকর অবিবেকী দাবী করব না। আমার প্রয়াস খুবই সীমিত ও বিনীত। সমকালীন যে নৈসর্গিক, সামাজিক ও মানসিক পরিমণ্ডলে শেকসপিয়র জীবন কাটিয়েছেন, সেই পরিমণ্ডল থেকে কয়েকটি প্রত্যয় ও কিছু ধারণা পেশ করেছি যেগুলি তাঁর শিল্পী চিত্তে সঞ্চারিত হয়েছিল। এসব প্রত্যয় তাঁর যুগের, আবার তাঁর নিজেরও। সর্বক্ষেত্রেই যে শেকসপিয়রের নিজ প্রত্যয় ও তখনকার যুগপ্রত্যয় সমতুল্য ছিল এমন নয়। সেকালে অনেকের ধর্মচিন্তা ছিল গোঁড়ামিতে ভরা। শেকসপিয়র অবশ্যই খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস করতেন কিন্তু গোঁড়ামিতে ভোগেন নি, বরঞ্চ পিউরিটান সম্প্রদায়ের গোঁড়া খৃষ্টানদের অপছন্দই করতেন। অপরপক্ষে, তাঁর শেষ নাটকগুলিতে যে ক্ষমা-প্রেম-মৈত্রী-মিলনের অনুপ্রেরণা নিহিত, সে-অনুপ্রেরণা মুখ্যতঃ যীশুর মহান উপদেশ থেকে উৎসারিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু সে-প্রেরণা সর্বমানবিকও বটে। শেকসপিয়রের উপলব্ধি বিশেষ ধর্ম, বিশেষ উক্তি, বিশেষ কাল ছাড়িয়ে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের জন্য ক্ষমা-প্রেম-মৈত্রী-মিলনে প্রত্যয়ী হয়েছিল। অন্য কোনো সমকালীন নাট্যকারে এই প্রেরণা ও প্রত্যয় পাই না যদিও তাঁরা সকলেই শেকসপিয়রের মতোই খৃষ্টান ছিলেন, হয়তো সমাজের চোখে তাঁদের কেউ কেউ বেশি খাঁটি খৃষ্টানই ছিলেন। কিছু প্রত্যয় শেকসপিয়র পেয়েছিলেন তৎকালীন বহু-আলোচিত চিন্তা থেকে,

এহেন কয়েকটি প্রত্যয়ের আভাস উপরে দিয়েছি। ধরা যাক আরেকটি প্রত্যয়: ভূমা ও অণুর সম্পর্ক, macrocosm ও microcosm সংক্রান্ত চিন্তা। সে যুগের একটি সুপরিচিত চিন্তা এখানে। Cosmos বা ব্রহ্মাণ্ড দুই ভাবে স্বরূপ উদঘাটিত করতে পারে: আব্রহ্ম স্তম্ব বিশাল বিশ্বে যে প্রকৃতি, যে নিয়ম, যে ছন্দ, তার সবই বিধৃত হতে পারে একটি ক্ষুদ্র সত্তায়, ধরুন একটি মানব সত্তায়। মানুষের দেহে সেই প্রকৃতি ও নিয়ম লক্ষ্য করতে পারি যা করেছি বিশাল সৌরজগতে। তাহলে macroccsm ও microcosm-এ বিশ্বলীলার ছন্দ অভিন্ন যদিও তাদের অবয়বে ও আয়তনে প্রচণ্ড প্রভেদ। ভূমা ও অণুর এই বিচিত্র সম্পর্ক নিয়ে দু-চার কথাও বলেন নি এমন লেখক ষোল শতকে পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে শেকসপিয়রের প্রত্যয় বিশেষভাবেই ষোল শতকী প্রত্যয়। এসব প্রত্যয়ের সম্ভারে শেকসপিয়র স্বকালমগ্ন পুরুষ, তাঁর নিজ যুগে তিনি সমাস্ত, সীমিত। আরো দশজন সমকালীন লেখকের চিন্তা ও তাঁর চিন্তা অভিন্ন। পক্ষান্তরে এমন প্রত্যয় শেকসপিয়রে প্রতিভাত যা' কিনা নেহাৎ যুগধর্মপ্রসূত নয়, যেখানে তিনি ইতিহাসে বিলুপ্ত নন, সে সব প্রত্যয় সর্বকালীন, সেখানে তিনি চিরন্তনের সংকেত-সন্ধানী। সমকাল ও সর্বকাল, মহাকালের এই দুই রূপ শেকসপিয়র-চিন্তায় স্বাক্ষর রেখেছে। এই দুই রূপের বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ, সংযোগ ও ব্যবধান, প্রণিধান করা শেকসপিয়র-প্রেমীর কর্তব্য, যদিও দুরূহ কর্তব্য। বর্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল সমকাল-চিন্তারই কিছু আভাস দিয়েছি।

যদিও 'প্রত্যয়' শব্দটি বারংবার ব্যবহার করছি তবুও সংশয় হয় শেকসপিয়রের কল্প জগতের গভীরতম কন্দরে এই শব্দটি সুপ্রযুক্ত কিনা। সমকালের হোক, সর্বকালের হোক, কোনো চিন্তাই কি শেকসপিয়রে ধ্রুব, অপরিবর্তনীয়, অনমনীয় ছিল? জীবনের মূল্য সম্বন্ধে শেকসপিয়র কি কখনোই প্রস্তরস্থির সিদ্ধান্ত করে বসেছিলেন? শেকসপিয়র কী ভাবতেন সে-বিষয়ে কোনো তথ্য প্রমাণই আমাদের আয়ত্তে নেই, তাঁর রচনাবলী ছাড়া, অতএব সে-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হয়ে কোনো রায় দেওয়া যায় না, আমরা কেবল সপ্রেম অধ্যয়ন-সঞ্জাত নিজ অনুভূতির কথাই বলতে পারি। বলতে পারি যে শেকসপিয়রের জীবনে প্রত্যক্ষ ও মানসিক অভিজ্ঞতা অবশ্যই ছিল প্রচুর ও বিচিত্র, তবুও (তাঁর রচনাবলী বারংবার অধ্যয়ন ও তাঁর নাটক বহুবার মঞ্চস্থ দেখার ফলে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে) তাঁর নিবিড়তম অচ্ছেদ্যতম অভিজ্ঞতা

ছিল রঙ্গমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ। থিয়েটার যেন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ জগৎ, বহির্জগতের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র জগৎ কিন্তু সেখানে বহির্জগতেরই প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছায়া। এই জগতের বাসিন্দা থিয়েটারের লোক—লেখক, অভিনেতা, ম্যানেজার, মঞ্চাধিকারী, প্রযোজক, সজ্জাকার, আরো কত কর্মচারী। শেকসপিয়র লেখক ছিলেন, ছিলেন অভিনেতা, আবার অংশের মালিক। এই থিয়েটারে তিনি জীবিকা অর্জন করতেন, এই থিয়েটারেই তিনি সাজতেন (হয়তো 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর অ্যাডাম অথবা হ্যামলেটের পিতার প্রেত), এই থিয়েটারেই তাঁর কল্প জগৎ রূপায়িত হত অপরাহ্নের পরে অপরাহ্ন। ইয়েট্‌স্ যাকে বলেছিলেন this theatre business, the management of men, সেই সংগঠনী দায়িত্ব যেমন তাঁর ছিল, তেমন আবার এই থিয়েটারেই তাঁর সৃজনী প্রতিভা পেয়েছিল প্রকাশপথ। একেকটি নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পরে, অপরাহ্ন-শেষে রঙ্গমঞ্চ থেকে মানস-সন্তানগুলি কোন্ অন্ধকারে মিলিয়ে যায় যতদিন না আবার নাটকটি মঞ্চস্থ হয়! কোথায় অদৃশ্য হয় জুলিয়েট, পোর্শিয়া, জাস্টিস শ্যালো, হ্যামলেট, লিয়র, অ্যান্টনি! কোথায় উড়ে গেল প্রায়-স্বতোৎসার অথচ তীব্র কল্পনামথিত মৃত্যুহীন কাব্যছত্রগুলি! আর কোথায় মিলিয়ে গেল সেই সব মেধাবী প্রত্যয়গুলি যেগুলি আহরণ করা হয়েছিল সমাজচিন্তা ও দার্শনিক আলোচনা থেকে, নিজ জীবন বীক্ষা থেকে! শেকসপিয়রের কি মনে হয়নি যে রঙ্গমঞ্চ একটা নিত্য কুহেলি-আচ্ছন্ন রূপক? শেকসপিয়রের পদনখযোগ্য নয় এমন এক লেখক, প্রীসট্‌লি, তাঁর 'জেনি ভিলিয়াস' নামক উপন্যাসে অভিনেত্রী পলিন ফ্রেজারের কাছে অভিনেতা মার্টিন চেভেরিলকে বলাচ্ছেন:

> I believe now that in our life, as in the theatre, the scenery and costumes and character make-ups and props are only a shadow show, to be packed up and put away when the performance is over. And what is real, indestructible and enduring is all that so many fools imagine to be flimsy and fleeting—the way an honest artist sees his work—the root and heart of a real personal relationship—the flame. Yes, the flame burning clear.

আর শেকসপিয়র নিজে তাঁর রচনায় বারংবার এই রূপকের আশ্রয় নেন নি

কি, বারংবার কি বলেন নি, মানুষের জীবন যেন একটা অভিনয়, একটা খেলা-খেলা আত্ম-অবলোপ, একটা মুখোশ, একদিন অন্য সত্তায় নিজ সত্তা বিলিয়ে দেওয়া আবার অন্যদিন অন্য এক নূতন সত্তায় নিজকে সাজানো? তাহলে নিজের আসল সত্তা কোথায়? কত ভাবে এই রূপক দেখা দিয়েছে শেকসপিয়রের কাব্যে! "টেম্‌পেস্ট"-এর বিখ্যাত ছত্র সর্বজনবিদিত:

the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve,
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind.

একটা pageant, মিছিল, এই জীবন, কিন্তু সেই মিছিলও এক মায়াময় রহস্য, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, তাকে ধরতে গেলে মিলিয়ে যায়। একই বাক্-প্রতিমা প্রযুক্ত হয়েছে অ্যাণ্টনির উক্তিতে:

Sometime we see a cloud that's dragonish ;
A vapour sometime like a bear or lion,
A tower'd citadel, a pendant rock,
... ...
They are black vesper's pageants.
... ...
The rack dislimns, and makes it indistinct
As water is in water.

শেকসপিয়র জানতেন যে কিছুই আয়ত্তে আনা যায় না, কিছুই জানা যায় না, প্রত্যয় ও অপ্রত্যয়ের সীমানা অনির্ণেয়। তিনিও জানতেন যেমন বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ সৃজনী প্রতিভা জেনেছিলেন যে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বহু-উচ্চারিত প্রশ্ন আবার তোলা যায়, কে তুমি, কিন্তু মেলে না উত্তর। শুধু জানা যায় যে অনেক প্রত্যক্ষের ও প্রত্যয়ের, অনেক মনীষার ও আবেগের, অনেক দর্শনের ও শ্রবণের ও মননের ও পারে ঝিলিক দেয় এক অপরূপ মায়াময় রহস্য।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

উইল শেক্সপীয়র : একটি কল্পনা

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য

[শেক্সপীয়রের বাড়ি। অনাড়ম্বর সাজানো ঘর কিন্তু সর্বত্র রুচির ছাপ আছে। পেছনের দেওয়ালে ঠিক মাঝখানে পৃথিবীর মানচিত্র ঝুলছে। দেওয়ালে আর দু-একটি তৈলচিত্র। ঘরের কোণে ছোট খাট। ঝালর-দেওয়া বেডকভারে বিছানা ঢাকা, খাটের মাথার দিকে ছোট টিপয়—তাতে ফুলদানিতে কিছু ফুল। সেণ্টার স্টেজে টেবিল—তার ওপরে কাগজপত্র স্তূপাকার। টেবিলের ধারে দু-তিনটি ওক কাঠের চেয়ার। শেক্সপীয়র বসে আছে, হাতে পাণ্ডুলিপি। মার্লো ওর চেয়ারের হাতলে বসে, এক হাতে শেক্সপীয়রের গলা জড়িয়ে ওর হাতের পাণ্ডুলিপি পড়ছে।]

শেক্স : আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। তুমি কেমন করে সৃষ্টি করো আমি অবাক হয়ে দেখি! সারাদিন জুয়া খেলে কাটাও…রাত্রে সুরা আর নাচ—কখন তুমি লেখো এসব—কেমন করেই বা লেখো ?

মার্লো : পছন্দ হয়েছে তোমার ?

শেক্স : পছন্দ হয়েছে। কী বলছো তুমি? সাগর-পারে সামগানের গাম্ভীর্য নিয়ে যখন সূর্য ওঠে—বৃষ্টি-ভেজা আকাশে যখন রামধনুর দীপ্তি ঝলমল করে—সূর্যের আলো যখন তুষারধবল গিরিশৃঙ্গকে সোনালী আবির মাখিয়ে দেয়—তখন কি নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হয় ভালো লেগেছে কিনা!

মার্লো : তুমি আমাকে লজ্জা দিলে উইল! যাক ওসব কথা, তোমার সীনটা কতদূর হল ?

শেক্স আমার সিন! আমার দেওয়ার পালা শেষ হয়েছে। সব রস আমার কে যেন নিঙড়ে নিয়েছে। এ নাটক তোমায় একাই শেষ করতে হবে কিট্।

মার্লো ও কথা আমি আগেই শুনেছি।

শেক্স মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যদি লণ্ডনে কোনোদিন না আসতাম!

মার্লো হেন্‌স্‌লো ফিরে এসেছে। দেখা হয়েছে?

শেক্স আমার কারো সঙ্গে দেখা হয় নি। ওদের ট্যুর ভালো হয়েছে?

মার্লো বললে তো ভালোই হয়েছে। ও অবশ্য স্ট্র্যাটফোর্ডে ওদের ছেড়ে এসেছে।—আমায় কিন্তু এবার যেতে হবে।

শেক্স কোথায়? মেরীর কাছে?

মার্লো তোমার মেরীর কাছে আমি কেন যাব?

শেক্স কেন আবার? আমি তোমায় অনেকবার বলেছি বলে। তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে—তুমি ইচ্ছে করলে আমায় সাহায্য করতে পারতে।

মার্লো কোনো পুরুষ ও নারীর মাঝখানে থাকা বিপজ্জনক!

শেক্স কিন্তু তুমি আমাদের বন্ধু! আর লোকে বলে তুমি নারীচরিত্র ভালো বোঝো!

মার্লো : লোকে অনেক কথা বলে। তারা বলে আমরা নাকি প্রতিদ্বন্দ্বী—আমি নাকি ঠিক একদিন তোমাদের সর্বনাশ করব।

শেক্স : যে যা বলে বলুক; আমি চিন্তা করি না। তুমি মেরীকে শিগ্‌গির দেখেছ? শেষ কবে দেখা হয়েছে?

মার্লো : মনে নেই। বোধ হয়…গত শনিবার।

শেক্স : তুমি আমার কথা বলেছ মেরীকে? ও কিছু বলল আমার কথা?

মার্লো : একান্তই যদি জানতে চাও—প্রায় কিছুই নয়।

শেক্স : আমি তিনদিন দেখিনি ওকে।

মার্লো : বেশ তো যাও, দেখা করো গিয়ে।

শেক্স : যখনই যাই শুনি ব্যস্ত। ওর নানান কাজের ভিড়ে একটি ছুটি মুহূর্তের বেশি আমার জন্য থাকে না। তখনো মাপা হাসি, দুটি আঙুল এগিয়ে দেয়…তারপরেই "বিদায় মিঃ শেক্সপীয়র।" কিন্তু

মাত্র একমাস আগে…হ্যাঁ একমাস আগেও—! আমার চিঠি দিয়েছিলে ওকে ? কী বলল ও ?

মার্লো : পড়ে হাসল আর বলল তুমি স্বপ্ন দেখছ।

শেক্স : তার মানে ?

মার্লো : মেরী বলতে চায় তুমিই ওকে অবহেলা করো, ও নয়।

শেক্স : এই কথা বলল ? কী জানি কথাটা সত্যি হলে ভালো স্বাগত। যাক—মার্লো আমার কাছে তোমার ধন্যবাদ পাওনা রইল।

মার্লো : ও সব থাক।

শেক্স : কিট্, তুমি কি আমাকে খুব ঘৃণা করো ?

মার্লো : ঘৃণা ? ঘৃণা করতে যাব কেন তোমায় ?

শেক্স : আমি লণ্ডনে—ষ্ট্রাটফোর্ডে নয় বলে।

মার্লো : আমি বিচার করি না। কোনো খবর পেয়েছ ?

শেক্স : না। আর খোঁজ নিতেও ভয় হয়। আমার ছেলে নিশ্চয়ই মারা গেছে। আমি জানি। কিন্তু ও খবর আমি শুনতে পারব না। মার্লো, মার্লো; তুমি নিশ্চয় আমাকে বিচার করছ ?

মার্লো : আমি কেন তোমার বিচার করতে যাব! আমি নিজে যা ইচ্ছে হয় তাই করি—তার জন্য নরকে যেতে হলেও আমি রাজী। তোমায় কেন দোষ দিতে যাব ? মেরীর মতো আশ্চর্য মেয়ে—বিশেষত তোমার মতো দেখার চোখ থাকলে—কটা মেলে পৃথিবীতে ? আমার যা কাম্য বস্তু তার জন্য মূল্য দিতে হবে আমাকে।

শেক্স : সত্যি বলছ কিট্ ?

মার্লো : সত্যি বলছি, উইল।

শেক্স : বিশ্বাস, নীতিবোধ ; একমাত্র সন্তান—এতো বড়ো মূল্য ? অবিশ্যি আমি আমার পাওনা চুকিয়ে দিয়েছি!

মার্লো : কিন্তু তুমি তার জন্য অনুতপ্ত! নিজের অবস্থা কি হয়েছে দেখেছ ? এই চেহারা নিয়ে মেরীর কাছে গেলে খুবই স্বাভাবিক সে ক্লান্তিবোধ করবে।

শেক্স : ক্লান্তি ? কি বললে ? ও ক্লান্তিবোধ করে ? কে বললে ?

মার্লো : না না, সে-কথা আমি বলি নি, উইল ! আমি কেন বলতে যাব সে-কথা ? উইল, উইল ।

শেক্স : (উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে) আমি সারারাত ঘুমোতে পারি না, কিট্‌ ? এক লাইন লেখা বেরোয় না আমার। এ আমার কী হল ? মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব ! (চমকে উঠে) সিঁড়িতে ঐ ছেলেটা ? মেরীর কাছে পাঠিয়েছিলাম চিঠি দিয়ে। আমি জানি মেরী আমার সঙ্গে খেলা করছে। কিন্তু আমি আর পারছি না। আজ রাতে ওর দেখা পেতেই হবে। তুমি চলে যাচ্ছ, কিট্‌ ?

মার্লো : আর দেরী করলে ডেপ্টফোর্ডে পৌছতে রাত হয়ে যাবে।

শেক্স : ডেপ্টফোর্ডে তুমি কতদিন থাকবে ?

মার্লো : পুরো গ্রীষ্মটা।

হেন্‌স্‌ : (দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে) বাড়িতে কে আছ ? বাড়িতে কে আছ ?

মার্লো : হেন্‌স্‌লো এসেছে।

শেক্স : ছেলেটা এত দেরী করছে কেন ?

হেন্‌স্‌ : ভদ্রমহোদয়গণ, পথিক গৃহে প্রত্যাগত ! আমি এলাম, আর তুমি চললে, কিট্‌ ? যাক তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে হল না বলে ধন্যবাদ !

মার্লো : আমায় খাতির করো হেন্‌স্‌লো ! আমার আসছে নাটক তোমায় বড়লোক করে দিতে পারে !

হেন্‌স্‌ : আরে যাও ! এই লোককে দিয়েই আমার কাজ চলবে।

মার্লো : আমি তোমাকে বলেছিলাম, উইল, এরা আমাদের দুজনের ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে ছাড়বে। শিগ্‌গিরই আবার দেখা হবে।

[বেরিয়ে যায়]

হেন্‌স্‌ : তারপর, খবর কী বলো।

শেক্স : আমি ঘরে বসে আছি, তুমি গোটা ইংল্যাণ্ড ঘুরে এলে ; খবর তো তুমিই বলবে। ট্যুর কেমন হল, বলো।

হেন্‌স্‌ : তুমি ভীষণ রোগা হয়ে গেছ। কী ব্যাপার ?

শেক্স : ট্যুর কেমন হল ?

হেন্‌স্‌ : অক্সফোর্ডে একরাত থেকে ওয়ারউইক ; কেনিলওয়ার্থ—

শেক্স : কেমন হল জিজ্ঞেস করছি, কোথায় নয়।—

হেন্‌স্ : —লিমিংটন, সবশেষে স্ট্র্যাটফোর্ড। প্রত্যেক জায়গায় রোমিও-জুলিয়েট করেছি, হল ফেটে পড়েছে। সবার তোমাকে পছন্দ। আর তোমার শহরের লোকেরা তো পাগল হয়ে উঠেছে।

শেক্স : স্ট্র্যাটফোর্ডে কি তুমি অনেকদিন ছিলে?

হেন্‌স্ দু-দিন

শেক্স কাউকে···দেখেছ?

হেন্‌স্ সোজাসুজি জিজ্ঞেস করো না—

শেক্স আমার বাড়ির কাছে গিয়েছিলে?

হেন্‌স্ তোমার বাড়ির পথ ভুলে গিয়েছিলাম।

শেক্স যেমন আমি ভুলে গিয়েছি।

হেন্‌স্ গেলে ভালো হত?

শেক্স না

হেন্‌স্ তবু আমি গিয়েছিলাম। লণ্ডনে আসার জন্য ঘোড়ায় চেপে মনে হল এ যেন কত চেনা পথ। আনমনে এক গলির মধ্যে ঢুকে হঠাৎ দেখি তোমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছি; দশটা বছর তোমার বাড়ির গেটের সামনে এক মুহূর্তে যেন মিলিয়ে গেল।

শেক্স : দশ বছর!

হেন্‌স্ : কিচ্ছু বদলায় নি···সেই ছোট্ট বাগানটি রোদ মেখে চুপ করে ঝিমোচ্ছে···গোটা বাগান ভরে অজস্র গোলাপ···মৌমাছিরা গুনগুন করে দূর থেকে ভেসে আসা স্কাইলার্কের গান ডুবিয়ে দিয়েছে···

শেক্স : তুমি ভেতরে গিয়েছিলে?

হেন্‌স্ : চুপিচুপি পা টিপে টিপে গেলাম জানলার ধারে···ভেতরে তাকালাম—

শেক্স : কি দেখলে?

হেন্‌স্ : দেখলাম ওকে—একটা বাচ্চাদের চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে, ঠোঁট দুটি শুধু কাঁপছে—মনে হল তোমার নাটকের একটা গান গুনগুন করে গাইছে···

শেক্স : অনেক বদলে গেছে?

হেন্‌স্‌ : আমার চিনতে অসুবিধে হয় নি। আমি জানলায় টোকা মারতে 'উইল' বলে দৌড়ে ছুটে গেল দরজার দিকে···চুল উড়ছে···উদ্‌ভ্রান্ত চোখ দুটি···দরজা খুলে আমাকে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল···যেন শীতের পাতাঝরা গাছ—

শেক্স : তারপর ?

হেন্‌স্‌ : আমি জিজ্ঞেস করলাম আমাকে চিনতে পেরেছ কিনা। বললে 'হ্যাঁ' আর জানতে চাইল আমি কিছু খাব বা বিশ্রাম করব কিনা। আমি তোমার কথা বললাম ; ও চুপ করে শুনে গেল।

শেক্স : কোনো প্রশ্ন করল না ?

হেন্‌স্‌ : একটিও না ?

শেক্স : কোনো কথা বলল না ?

হেন্‌স্‌ : না। আমি চলে আসার আগে জানতে চাইলাম কোনো খবর পাঠানোর আছে কিনা। একটু ইতস্তত করে চুপি চুপি বললে : "বলবেন Shottery-র বনে এখনও বসন্তের মেলা বসে।" "আর কিছু" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "ওকে বলবেন এখনও সেই বুনো গোলাপের ঝোপে ফুল ফোটে।" "কোনো চিঠি বা আর কিছু" বলাতে ও বলে উঠল, "আর ওকে বলবেন এখনকার দিনগুলো বড়ো দীর্ঘ, আর—।" তারপর কথা না শেষ করে হঠাৎ দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

শেক্স : ওঃ হেন্‌স্‌লো। দশ বছর আগে অ্যান্‌ যদি এরকমটি হত আর আমি যদি এখন যা তাই হতাম—। যাক ওসব কথা, মার্লোর খবর শুনেছ ? তার 'লীথান্তার'-এর তিনভাগ শেষ হয়ে গেছে ! ওঃ এই মার্লো ; কি আশ্চর্য প্রতিভা !

হেন্‌স্‌ : তোমার নাটক শেষ হয়ে গেছে ?

শেক্স : না।

হেন্‌স্‌ : কতটা হয়েছে ?

শেক্স : এক লাইনও না।

হেন্‌স্‌ : তুমি কি পাগল ? আমরা প্রতিশ্রুত। রানীকে কি বলব আমি ?

শেক্স : যা খুশি তোমার। তুমি নিজে নাটক লেখ। মার্লোকে বা আর কাউকে দিয়ে লেখাও। আমি পারব না। আমি ফুরিয়ে গেছি। রোমিও জুলিয়েটের প্রেতাত্মারা এখনও ঘুরে বেড়ায় আমার চারপাশে, কিন্তু আমি আর ওদের জীবন দিতে পারব না। আমি একেবারে নিঃশেষ হেন্‌স্‌লো।

হেন্‌স্‌ : এই দেখ! রোমিও-জুলিয়েট আর কে চায়? নতুন নাটক কোর্টে হবে। ওখানে সবাই চায় হাল্কা সহজ কমেডি। তুমি বুঝতে পারছ না! ফরাসী রাজদূতাবাস থেকে লোক আসবে, ইটালিরও দুজন আসবে, এছাড়া এসেক্স আর তার দলবল তো আছেই। তুমি তো জান ওদের কি পছন্দ। লক্ষীটি, তাড়াতাড়ি লিখে ফেল! কি আর এমন শক্ত কাজ? কয়েক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা; একটু ঝগড়া, একটু বিরহ; দু-চারটে চুমু; দুটো নাচ; চারটে গান, ড্যাফোডিল, ভ্যালেণ্টাইন আর গোলাপের মেলা—ব্যস, এইসব একটা বোতলে পুরে বারকতক ঝেঁকে নিয়ে সবার পাতে দিয়ে দাও। হয়ে গেল তোমার নাটক—যেমনটি রানীর পছন্দ!

শেক্স : হ্যাঁ, "যা তোমাদের পছন্দ!" কিন্তু আমি পারব না। আমি বাঁচতে চাই, লিখতে না। রানীকে বোলো সে কথা।

[একটি কিশোর গুনগুন করে গান করতে করতে ঢোকে]

শেক্স : এই যে, কি খবর হিউ?

কিশোর : আজ্ঞে কোনো খবর নেই।

শেক্স : কি? কোনো উত্তর?

হেন্‌স্‌ : দেখ উইল, তুমি যদি নাটক না লেখ তো আমি সোজা রানীর কাছে যাব। বলে দিলুম তোমাকে!

শেক্স : (কিশোরকে) তুমি কি দেখেছ—?

কিশোর : ঐ ভদ্রমহিলাকে?

হেন্‌স্‌ : তোমার পাগলামিতে 'রোজ' থিয়েটার চোখের সামনে ডুবে যাবে এ আমি কিছুতেই—

শেক্স : (কিশোরটিকে) আমি তোমায় কি বলেছিলাম?

কিশোর : আজ্ঞে, আপনি বলেছিলেন দরকার হলে সারারাত মিসট্রেস ফিটনের দরজা-গোড়ায় অপেক্ষা করতে। কিন্তু উনি যে চলে গেলেন—আমি নিজের চোখে দেখলুম ওঁকে। উনি অবশ্য আমাকে দেখেন নি।

হেন্‌স : ও, মেরী ফিটন ! এবার বুঝলুম ব্যাপারটা কি !

শেক্স : কি বললে তুমি ?

হেন্‌স্ : বলছি যে রানীকে বলতে হবে এই গণ্ডগোলের মূলে কে ?

শেক্স : তোমার স্পর্ধা তো কম নয় ? একজন ভদ্রমহিলার সম্পর্কে এরকম বলছ !

হেন্‌স্ : উইল, উইল !

শেক্স : বল নি তুমি ?

হেন্‌স : উইল, তোমার বন্ধুদের ধৈর্য নিয়ে তুমি বড়ো বেশি টানাহেঁচড়া করো।

শেক্স : তুমি আমাকে ছিবড়ের মতো পথের ধারে ফেলে দিতে পার ! কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুও আমার আছে—মার্লো আর—

হেন্‌স্ : হুঁ, মার্লো ! [শেক্সপীয়র আক্রমণোদ্যত] না উইল, না। আমার বয়স হয়েছে—আমি ঝগড়া করতে চাই না।

শেক্স : তুমি বসে বসে আমার বন্ধুদের কুৎসা করবে আর আমায় তাই শুনতে হবে ?

হেন্‌স্ : কুৎসা ? শহরের যে-কোনো লোককে জিজ্ঞাসা কর। মোটে একদিন হল ফিরেছি—এর মধ্যেই সব আমার কানে এসেছে। উইল, রাস্তার লোকেরা এই ব্যাপার নিয়ে গান গাইছে !

শেক্স : এই ব্যাপার ? কি ব্যাপার ?

হেন্‌স্ : এই ছোকরা।

কিশোর : আজ্ঞে ?

হেন্‌স্ : সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কি গান গাইছিলি ?

কিশোর : আজ্ঞে…মানে…ইয়ে—

হেন্‌স্ : হ্যাঁ, গানটা করত !

কিশোর : আজ্ঞে আমি সবটা জানি না।

হেন্‌স্ : যতটুকু জানিস কর।

কিশোর　আজ্ঞে তাহলে করি—

লাল টুকটুক পদ্মফুল মুখ তুলে ওই চায় রে—
দুই দিকে দুই ভোমরা এসে গুনগুনিয়ে গায় রে ॥
দুইজনে তার পরানবঁধু, দুইজনে চায় ফুলের মধু ;
[ফুলের] সোহাগ নিয়ে রেষারেষি চলছে দুজনায় রে ॥
[মাঠের] ভোমরা দুটো নাকাল হয়ে মরছে শুধু ঘুরে হে !
[সতী] পদ্মবালা দুইজনাকেই দিচ্ছে হাসি ছুঁড়ে হে !
একটি ভ্রমর বসলে পাশে, অন্য ভ্রমর মারতে আসে
[ওরে,] কার কপালে ঝুলছে মধু কেউ জানে কি তায় রে ?

হেন্‌স্　কি উইল ? বেশ ভালো সুর না ? খাসা সুর !

শেক্স　আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করব—তার জন্য নরকে যেতে হলেও আমি রাজী।

কিশোর　আমি কি চলে যাব ?

শেক্স　যাও ! যাও !

কিশোর　আজ্ঞে আমার বকশিস ? বিশ্বাস করুন আমি পারলে ওনাকে থামাতাম। এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন ! একেবারে অন্যরকম লাগছিল দেখতে—ঘোড়ায় চড়ার পোশাক···আমি কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছিলাম।

হেন্‌স্　এসব কি ব্যাপার ?

শেক্স　(কিশোরকে) তুমি স্বপ্ন দেখছ—

কিশোর　আজ্ঞে না, তাঁর আঙ্গুলে আপনার আংটি দেখলাম—

শেক্স　চুপ কর। এই নাও আর স্বপ্নের কথা ভুলে যাও ! (ওকে টাকা দেয়) বিদায় হেন্‌স্ ! তুমি যা বললে তা যদি মিথ্যে হয় তার দাম দিতে হবে তোমাকে। আর যদি সত্যি হয়—।

হেন্‌স্　দাম-টাম আর আমি বুঝি না। আমার শুধু চাই রানীর ফরমায়েসী নাটক ! শেষ পর্যন্ত আমি তা পাবও। রানীকে তুমি এখনও চেন নি !

শেক্স　হিউ !

কিশোর : আজ্ঞে ?

শেক্স　কোনদিকে গেল সে ?

কিশোর : আজ্ঞে আমি কি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি ?

শেক্স : কোনদিকে গেল ?

কিশোর : আজ্ঞে আমি স্বপ্ন দেখলুম, উনি ব্রীজ ছাড়িয়ে ডেপ্টফোর্ড রোড-এর দিকে গেলেন।

শেক্স : ডেপ্টফোর্ড ! মার্লো ! ডেপ্টফোর্ড ! (দৌড়ে বেরিয়ে যায়)

কিশোর : (হাতের টাকার দিকে তাকিয়ে) স্বপ্নেরও তাহলে দাম আছে ? এ যে অনেক টাকা !

হেন্‌স্ : এই ছোকরা, আমার কথা শোন ! কখনও কোনও লোককে বিশ্বাস করবি নে, আর কোনও মেয়েলোক যদি ঠোঁট এগিয়ে দেয় তাও চুমু খাবি না। সারাদিন কাজ করবি আর রাতভোর ঘুমোবি। তাহলে দেখবি জীবনে কোনো ঝামেলা নেই। এদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। যাই রানীর কাছে, দেখি উনি কি বলেন ?

[মাথা নাড়তে নাড়তে হেন্‌সলো বেরিয়ে যেতে থাকে। কিশোর ওকে অতিক্রম করে আগেই বেরিয়ে যায়]

পর্দা

(ক্রমশ)

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সম্পর্কে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখাটি ডাকের গোলযোগে বিলম্বে পাওয়ায় আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

আগামী সংখ্যায় জওহরলাল নেহরু সম্পর্কে আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।

অনিবার্য কারণ বশত 'গোলাপ হয়ে উঠবে'-র কিস্তি এই সংখ্যায় দেওয়া গেল না।

পুস্তক-পরিচয়

ভারতে শেক্সপীয়র-চর্চা

মহাকবি শেক্সপীয়রের জন্মচতুঃশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলিপুরের বেলভেডিয়ারস্থ জাতীয় গ্রন্থশালায় পুস্তক ও চিত্রের যে প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছিল তা অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই প্রদর্শনীটির মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল ভারতবর্ষে শেক্সপীয়র-চর্চা-বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শেক্সপীয়রের রচনাবলীর তরজমা-গ্রন্থ স্বভাবতই এতে প্রাধান্য লাভ করেছিল, ভারতবর্ষের শেক্সপীয়র-গবেষকদের কাছে যার মূল্য অপরিসীম।

প্রদর্শনীটি অবশ্য যতই সুপরিকল্পিত, সুষ্ঠু ও মূল্যবান হোক-তা অস্থায়ী কিন্তু এতদুপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থশালা কর্তৃপক্ষ 'শেক্সপীয়র ইন ইণ্ডিয়া' নামে যে স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন তা স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে।

স্মারক-গ্রন্থটিতে কয়েকটি তথ্যবহুল সুলিখিত রচনা আছে, বিশেষ করে 'শেক্সপীয়র ইন ইণ্ডিয়া' রচনাটি ভারতে শেক্সপীয়র-চর্চার একটি মূল্যবান রূপরেখা। 'ইণ্ডিয়া ইন শেক্সপীয়র' রচনাটিও বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। এই শ্রম-সাপেক্ষ রচনাটিতে শেক্সপীয়রের নাটকে যেখানে যেখানে ভারতবর্ষের উল্লেখ আছে তা বিশেষ যত্ন সহকারে উৎকলিত হয়েছে। রসিকজনের কাছে যাই হোক, গবেষকদের কাছে এই ধরনের রচনার মূল্য তর্কাতীত। কিন্তু স্মারক গ্রন্থটির অমূল্য সম্পদ পরিশিষ্টে সংযোজিত ভারতে শেক্সপীয়র-চর্চার

সংবিধানে তালিকাভুক্ত তেরটি ভারতীয় ভাষায় শেক্সপীয়রের রচনাবলীর যে সব তরজমা, কাহিনী-সার বা আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এই পুস্তকপঞ্জীতে তা সমগ্রভাবে তালিকাভুক্ত করার প্রয়াস করা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থশালার মত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ব্যতিরেকে এই কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না বলাই বাহুল্য।

তালিকাটি অবশ্য সম্পূর্ণ নয়, সংকলকরাই লিখেছেন: It will be seen from the bibliography that many incomplete entries have been included. We have not seen the books relating to these entries. We have, however, thought it fit to offer to our readers whatever particulars we could collect about them. At least

this will help these who feel interested to make further search for details.

অন্যান্য ভাষার কথা জানা নেই, বাংলা ভাষার তালিকার দু-একটি অসম্পূর্ণতার দৃষ্টান্ত এমন কি বর্তমান লেখকের মতো অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও চোখে পড়েছে।

তবে এ-সব অসম্পূর্ণতা তুচ্ছ এবং বাংলা দেশের শেক্সপীয়র অনুরাগীদের সহযোগিতায় সহজেই তা পূরণ করা সম্ভব।

এই পুস্তকপঞ্জী দৃষ্টে দেখা যায় ভারতবর্ষে শেক্সপীয়র-চর্চা প্রধানত মহাকবির নাটকের তরজমাতেই সীমাবদ্ধ। আর এদিক দিয়ে বাংলাদেশই সবার চেয়ে এগিয়ে আছে।

এই পুস্তকপঞ্জীতে মোট ৬৭০টি গ্রন্থ তালিকাভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫, বাংলা ভাষায় ১২৮, গুজরাতি ৩৪, হিন্দী ৭০, কানাড়ি ৬৬, মলয়ালী ৪০, মারাঠী ৯৭, ওড়িয়া ৭, পাঞ্জাবী ১৩, সংস্কৃত ৭, তামিল ৮৩, তেলেগু ৬২ ও উর্দু ৪৮।

কিন্তু তরজমার কাজ কিছুটা অগ্রসর হলেও, ভারতীয় ভাষায় শেক্সপীয়র আলোচনা এখনও খুবই পিছিয়ে আছে। বাংলা ভাষাতেই শেক্সপীয়র সংক্রান্ত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র তিনটি। তিনটিই জীবনীগ্রন্থ। তার মধ্যে দুটি একই ব্যক্তির লেখা এবং দুটি কিশোর-পুস্তক। অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থ-তালিকার দিকে তাকালেও একই ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য ভারতীয়দের রচিত ইংরেজী ভাষায় শেক্সপীয়র সংক্রান্ত ৫০টি গ্রন্থ পুস্তকপঞ্জীতে তালিকাভুক্ত হয়েছে কিন্তু তার অধিকাংশই কলেজ-পাঠ্য পুস্তক।

অবশ্য অন্তত বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে অনেকেই শেক্সপীয়রের সাহিত্য সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বহু প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন—কিন্তু আলোচ্য পুস্তকপঞ্জীতে তা তালিকাভুক্ত করা সম্ভব ছিল না। তবে এর প্রয়োজন আছে, কেউ এ-ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি বঙ্গবাসীর ধন্যবাদভাজন হবেন।

শেক্সপীয়রের এই জন্মচতুঃশতবার্ষিকী বৎসরে কোনো প্রকাশক উদ্যোগী হয়ে এই সব রচনার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করুন না কেন—তাই হবে মহাকবির উদ্দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য

—শচীন বসু

আনন্দভৈরবী। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্‌স্‌ প্রাইভেট লিঃ। ছ' টাকা।

কবি প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার আমি আগ্রহী পাঠক। এক সরল কবিত্বের সম্পদ এই কবির কবিতার জগতে ইতঃস্তত প্রকীর্ণ হয়ে আছে—তার প্রতি লোভ বরাবরই অনুভব করেছি এবং এখনো করি। সকল আধুনিক কবির মতো প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যেও একজন 'আমি' কথা বলেন কবি যাঁকে নির্মাণ করেছেন, রচনা করেছেন, জন্ম দিয়েছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে আনন্দভৈরবীর কবিরও কবিতা রচনা প্রকৃতপক্ষে এই আমিকে মূর্ত করে তোলা। প্রথম কবিতা 'স্বগত ভাষণে'ই বোঝা যায়, অনুভব করা যায় আলোচ্য কবির অপ্রতিরোধ্য কবিত্বকে। তিনি জানেন যে কবিকর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা আর কবিত্ব একার্থক নয়। আমরা আনন্দ-ভৈরবীর অনেকগুলি কবিতা সম্বন্ধেই একথা বলতেও পারি যে কাব্যিক প্রসঙ্গের জন্য ভাবনাতুরতার জন্যই সেগুলিকে আমরা বাহবা দিচ্ছি না—কবির আত্ম-ঘোষণা না হয়ে কবির আত্মার অভিজ্ঞানের বাহক হতে পেরেছে বলেই তারা কাব্য হয়েছে। প্রসঙ্গত 'স্বগত ভাষণ'-এর দ্বিতীয় স্তবকের সবটাই উদ্ধৃত করা যেত, যদি না স্থানাভাব প্রতিবন্ধক হত।

কোনো কবি সভ্যতা এবং চলিষ্ণু সময়ের জটিল গতি সম্বন্ধে সচেতন একথার চেয়ে, বস্তুতঃ এই কথাটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ যে সময়ের প্রতিঘাতে অনেক ভেঙেগড়ে কবি এক বৃহত্তর 'আমি'কে গড়ে তোলেন। সেই 'আমি' তখন তাঁর সময়ের রূপককে ধারণ করে। আনন্দভৈরবীর 'আমি'ও নিঃসন্দেহে সেই প্রয়াসে বিশিষ্ট হতে চেয়েছে। এর জগতে সমকালীনতা ছায়া ফেলেছে—সেই কালের এক প্রান্ত রয়েছে অতীতে, অন্য প্রান্ত ইঙ্গিত দিচ্ছে ভবিষ্য নির্মাণের। কোণার্কের মিথুন মূর্তি, লোককাব্যের অবিনশ্বর ভাবরূপক যেমন কবিতাগুলির প্রসঙ্গ, তেমনি সেই প্রসঙ্গগুলির সাহায্যেই কবি রচনা করেছেন স্ব-ভাষা। সেটা তাঁর অভিজ্ঞতার ভাষা হয়েছে। 'অন্ধকার ঢেউ ভাঙে', 'কোণার্ক মিথুন', 'কেন্দুবিল্বের মেলায়' প্রমুখ কবিতাগুলিতে আনন্দভৈরবীর আনন্দলোকের বিমলবিভা। 'ল্যাণ্ডস্কেপ', 'সাঁওতাল প্রেমিক ওরা', কবিতাগুলিতে নিসর্গমুক্তির মাঝে তিনি এক সুস্থ মানবিক স্বর এনেছেন। 'জাতিস্মর'-এর মতো কবিতায় কবির হৃদয়প্রতিমায় হৃদয়েরই রঙ লেগেছে, অথচ

সময়ের রঙ একেবারে মুছে যায় নি। আর যা নেই এই কবিতাগুলিতে তা হল বিবর্ণ বিষণ্ণতা। আনন্দভৈরবীর নামকরণ থেকে শুরু করে কোথাও সুখের কথাই হোক বা দুঃখের কথাই হোক—গ্লানির গরিমা প্রবল হতে চেষ্টা করেনি। নিচের স্বীকারোক্তি তাই নিঃসন্দেহেই কাব্যোক্তি—এর মধ্যে তাঁর শক্তি এবং দুর্বলতা দুয়েরই ইঙ্গিত উপস্থিত।

এই ভালবাসা যেন অঙ্গে অঙ্গে প্রতি রোমকূপে
ফোটার রোমাঞ্চ আনে, আমি যেন মঞ্জরিত তরু
কিম্বা তার একতারা, যে আমার কেড়ে নেয় সবই
নিষ্ঠুর দরদে শুধু আমার বুকের তারে তারে
সে জন বাজিয়ে যায় মনমাতানো আনন্দভৈরবী।

একতারা এবং আনন্দ ভৈরবী কতখানি মেলে জানি না কিন্তু বাউলের মতোই এই কবি আপনাতে আপনি বিভোর। এইটাই সৎ কবিতা রচনার একমাত্র পন্থা, এবং বাকি সব পথই ভুল এমন কথা বলার স্পর্ধা যেন না থাকে, তবে প্রমোদবাবুর এই চারিত্র তাঁর স্বধর্ম। একে রক্ষা করা, লালন করা এবং অধিকতর সংগঠিত করা তাঁর সারাজীবনের কবিকর্তব্য।

তাই আনন্দভৈরবীর পরেও তিনি আরো কবিতার বই লিখবেন বলে কতকগুলি কথা নিবেদন করা সমীচীন মনে করি। দুদিকে তাঁকে সতর্ক হতে হবে। তাঁকে প্রথম সতর্কতা গড়ে তুলতে হবে চিত্রকল্প-প্রয়োগের ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে তাঁর ত্রুটি যা পরে বৃহৎ হতে পারে তার দুটি মুখ। প্রথমত চিত্রকল্প নির্মাণে আলস্য। 'স্বগত ভাষণ'-এর প্রথম স্তবকে কয়েক চরণের মধ্যে "যেন তার ঘামার মতন" "স্রোতের দিয়ার মত" এবং "আরোগ্যের মত এক গভীর আরামে"—এই চিত্রকল্প এবং ভাবচিত্র দুটি বারবার 'মত' শব্দের প্রয়োগে নষ্ট হয়েছে। সহজেই একটু পরিমার্জিত করা যেতে পারত। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে তাঁর গভীরতর ত্রুটি চিত্রকল্পের বা সঙ্গীতকল্পের অসংলগ্ন প্রয়োগ। 'সাঁওতাল প্রেমিক ওরা' কবিতায় শেষ স্তবকে কিছুতেই আর সাঁওতাল প্রেমিক-প্রেমিকাকে পাওয়া যায় না। আধারটুকু কবি নিজেই ভেঙে ফেলেছেন সেতারের উপমা-প্রসঙ্গ এনে। এমনি করেই ভূমিকা-কবিতায় একতারা ও ভৈরবীর সংযোগে প্রত্যয় হয়েছে বিঘ্নিত। এই সূত্রেই আরেকটি কথা বলার থাকে। অগ্রজ কবির বাণীসন্নিবেশ-সৌন্দর্যের উত্তরাধিকার সরল ভাবেই কখনো কখনো তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছে। উত্তরাধিকারে আপত্তি নেই।

উত্তরাধিকার কবিত্বের সংজ্ঞা নিরূপণে কর্তব্য-নির্দেশনায় সহায় হোক। কিন্তু কাব্যের আকৃতিপ্রকৃতি নির্মাণে কবির স্বাধীন তপস্যাই কাম্য। প্রমোদবাবু সে সাধনার ক্ষেত্রেই অধিষ্ঠিত আছেন—শুধু কখনো কোথাও আলস্যকে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলেই এ-কথাটা বললাম।

আর এক বিষয়ে তাঁকে অবহিত হতে হবে। সংস্কৃতির আনন্দলোকে তাঁর যেমন সহজ আনাগোনা, প্রত্যহের জলকাদায় যেন তাঁর ইচ্ছা ততটা জাগ্রত নয়। গৌরব বহনে তিনি অতন্দ্র। কিন্তু গ্লানি-স্নান না হলে তিনি পূর্ণ হবেন কী করে। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আমাদের সকলেরই শিক্ষা। দুঃখের তিমিরকে তিমির বলে জেনেই তো মঙ্গলালোকের কল্পনা, বিশুষ্ক জীবনের পটেই তো করুণাধারার প্রত্যাশা। আনন্দভৈরবীর কবিকে সেই জলকাদা, গ্লানি, গঞ্জনার পথ কিছু মাড়াতে হবে। তাহলে তাঁর কাব্যিক ভাষার লালিত্যটুকু কিছু হারাবে, কিছু স্নিগ্ধতা ঝরে যাবে। কিন্তু তার বদলে যা আসবে তা চলিষ্ণু স্বাস্থ্য।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকটি কণ্ঠস্বর। মণিভূষণ ভট্টাচার্য। কবিপত্র প্রকাশভবন। আড়াই টাকা।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য-এর 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' তরুণ কবিদের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তারুণ্যের ঝোঁকে কবিতায় উচ্ছৃঙ্খলতাকে মৌলিকত্ব ভাবার দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক কবিদের কাব্যে প্রকট এবং এ-ব্যাপারটা নানা কৌতুকের দৃশ্যের অবতারণা ইতিমধ্যেই করেছে। অবশ্য এর অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, তরুণ কবিদের হাতে বাংলা কবিতা রসাতলে যাচ্ছে। এর তাৎপর্য এইখানে, সাম্প্রতিক কবিবৃন্দ বর্তমান সমাজেরই প্রত্যক্ষ শীকার, সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার দৃষ্টান্ত হয়ে পড়েছেন, সময়ের মুঠি ছাড়িয়ে সমন্বয়ে আসতে পারছেন না।

আমার বক্তব্য, অবশ্যই এই নয়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য এটা পেরেছেন। হয়তো প্রথম কাব্যগ্রন্থে এটা সম্ভব নয়, তবু কয়েকটি আশাপ্রদ লক্ষণ আলোচ্য কবির কবিতাসংকলনে দ্রষ্টব্য।

কবি মণিভূষণ, ভাষার দিক থেকে কাব্যিক কৃত্রিমতায় বিশ্বাসী নন। অর্থাৎ যতটা সম্ভব তাঁর পক্ষে, ততটা তিনি মৌখিক ভাষা, আরও ঠিকভাবে

ক্রিয়াকে কবিতায় বলবৎ রেখেছেন। ইদানীং বাংলা কবিতার মূল ঝোঁকের বিপক্ষেই সাধু ক্রিয়া, তথাকথিত কাব্যিক শব্দাবলী (মোর, তরে ইত্যাদি) প্রভৃতি ব্যবহারের প্রবণতা কবিদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল—অনেক ক্ষেত্রে ছন্দ বাঁচাবার জন্য এর ব্যবহার ঘটেছে, যার অন্য অর্থ কবিদের পরিশ্রমবিমুখতা। সুখের বিষয়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য-এর কবিতায় এই কৃত্রিমতা তথা পরিশ্রমবিমুখতা অনুপস্থিত দেখলাম।

শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষভাবে কথ্যচাল আনার প্রয়াসও তাঁর কবিতায় লক্ষণীয়। যেমন 'পোশাক' নামক কবিতার চতুর্থ স্তবক। এই কবিতা মণিভূষণের কবিস্বভাবের নাটকীয়ত্বও দেখায়। বস্তুতঃ 'উদ্ভাসিত জন্ম ও আনন্দিত মৃত্যু' কবিতাটির বিষয়বস্তু যথেষ্ট নাটকীয়। যদিও স্বয়ং কবি, হয়তো সাহসের অভাবেই এর সুযোগ গ্রহণ করেন নি। তবুও পোশাক, গল্পবিষয়ক কবিতা, অসামাজিক ইত্যাদি কবিতা মণিভূষণের ভবিষ্যৎ কাব্যনাট্য লেখার হয়তো প্রস্তুতি।

এর সঙ্গে রয়েছে, যেটা আমার কাছে খুবই প্রতিশ্রুতিময় মনে হয়েছে, ছবিতে কথা বলার চেষ্টা। উদাহরণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

১. মেঘের মন্দিরে শুধু সারারাত মন্ত্র-কথকতা।
২. নিঃশব্দে পোড়ালো তারা মৃত্যুহীন সময়ের শব।
৩. বাবার মুখের রক্ত ঘন হয় পশ্চিম আকাশে।
৪. তবু খোশগল্পে মত্ত ঢেউগুলি অপ্রস্তুত, চুপ।
৫. সূর্যের কোলে বিকেল বিপুল নদী।

কিংবা 'অন্ধকারের গল্প' নামক কবিতার শেষের দিকের একটি সুন্দর স্তবক।

ঢেউগুলি নেচে নেচে সারাদিন গল্প ব'লে যাবে
জীবন মৃত্যুতে মগ্ন কাহিনীরা পরমায়ু পাবে নিরবধি,
শতাব্দীর পুরাতন গাঢ়তম রক্তধারা স্মৃতিকে ভেজাবে,
অবিরাম ব'য়ে যাবে রূপালি কান্নায় ভরা আকাশের মতো এক নদী।

অবশ্যই মণিভূষণ ভট্টাচার্য-এর কবিতা এখনও উপযুক্ত, তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের অপেক্ষায় আছে। উক্তি ও উপলব্ধির হর-গৌরীমিলনও তাঁর ভবিষ্যৎ কবিতার ব্যাপার। আশ্চর্য গোছানো কবিতা লেখা সত্ত্বেও, আড়ষ্টতা এখনও তাঁর কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে—কোনো কোনো কবিতা তো যুক্তাক্ষরের প্রদর্শনী মনে হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণ দুরূহ—অনেক অভিনিবেশ ও

চর্চাসাপেক্ষ। বিশেষতঃ যে-সব কবিতা ধ্বনিপ্রধানে লেখা, সে-সব কবিতায় মনে হয়েছে, ছন্দ সামলাতে গিয়ে কবিতা ডুবেছে। তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে। কদাচিৎ, হলেও, অকারণে স্মার্ট হওয়ার দিকে প্রবণতা কবি মণিভূষণের আছে—কিছুটা বা শহুরে চাতুর্যে মজা। মাঝে মাঝে, অস্পষ্ট মিল কানে লাগে। একই শব্দের বারবার ব্যবহার, ছবি আঁকায় একই তুলনার পুনঃ পুনঃ উক্তি ক্লান্তিকর ঠেকে—সেই শব্দের ব্যবহারের বিশিষ্টতাও হারিয়েছে।

তবু মণিভূষণের কাব্যগ্রন্থ আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ লেগেছে। কারণ আগেই বলেছি।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিবচন। রেবন্ত বসু। গ্রন্থজগৎ। তিন টাকা।

ভারতীয় গল্পসঙ্কলন। অনুবাদ: বোম্মানা বিশ্বনাথন। জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চার টাকা।

যিনি 'এক প্রেমিক' কী 'মাছ'-এর মতো চমৎকার গল্প লিখতে পেরেছেন, সেই লেখককে, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রেবন্ত বসুকে—যেহেতু সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত; অতএব সমালোচকের বকেয়া অভিনন্দনবাণীর লৌকিকতা উপহার দিতে চাই না; বরং তাঁর সম্বন্ধে স্বীকার করা ভালো যে, তিনি বেশ প্রস্তুত হয়েই আসরে নেমেছেন। এ-প্রস্তুতির পরিচয় তাঁর প্রথমতম গ্রন্থ 'দ্বিবচন'-এ বিলক্ষণ বর্তমান। সমাজ, সময়, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত উপাদান একজন মরমী কথাকারের আবশ্যিক অবলম্বন শ্রীযুক্ত বসুর মধ্যে সেগুলি যথাযথ সম্মিলিত। এবং তাঁর বাগ্‌ভঙ্গিও রীতিমতো শানানো। কোথাও তির্যক, কোথাও শ্লেষাক্ত, কোথাও বা ঋজু পরিণত কবিত্বে বিধুর। প্রাসঙ্গিক কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার পরিবর্তে আমি পাঠকবৃন্দকে বইখানি পড়ে নেবার জন্যে অনুরোধ করি। অবশ্যই সাধুবাদ একেবারে নিরঙ্কুশ নয়; 'সান্ত্বনা' গল্পটির শেষ অনুচ্ছেদটির ইঙ্গিতবহতা কাহিনীগত শৈথিল্যের জন্যে মাঠে মারা গেছে। এই গল্পের ভূমিকাজাতীয় কায়দা আমার কাছে শেষ পর্যন্ত মূষিকপ্রসূ পর্বতের মতো মনে হয়েছে। 'মানুষ'-এর মতো গল্প সম্বন্ধে আমার বক্তব্য: শ্রীযুক্ত বসু তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন

এখানে। এর কারণ নর-নারীর যৌনসম্বন্ধ নিয়ে কোনো রক্ষণশীল ছুৎমার্গতা নয়; ব্যাপারটা, তা মাসতুতো বোনকে জড়িয়ে হলেও, অত্যন্ত পুরনো এবং গল্প লেখার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক। পাঁচটি গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প দুটির নাম সর্বাগ্রেই করেছি। 'নাম' গল্পটি দ্বিধাবিভক্ত সত্তার চেহারা বর্ণনা করেছে। বেশ বড়ো গল্প, কিন্তু আদৌ ক্লান্তিকর নয়। ফ্যানটাসি ধরনের লেখাতেও রেবন্তবাবু সিদ্ধহস্ত, এই গল্পে বোঝা গেল তা।

ভারতের জাতীয় সংহতিবিধানে অন্যতম প্রয়োজন মনে হয় প্রাদেশিক ঐতিহ্যের কূপমণ্ডুকমনোবৃত্তি দূর করা। ভাষাগত অহম্‌বোধও এই ঐতিহ্য-বিলাসের অন্তর্গত। সুতরাং প্রাদেশিক ভাষাগুলির সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত বোম্মানা বিশ্বনাথন বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এই কাজ অনেকদিন থেকেই করে আসছেন এবং এ-ব্যাপারে সাধুবাদও পেয়েছেন বিস্তর। তাঁর সম্পাদিত 'ভারতীয় গল্পসঙ্কলন'-এর অন্তর্ভুক্ত চৌদ্দটি গল্পের অনুবাদক, বলা বাহুল্য, তিনি নিজেই। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল; যদিচ, এবং এখানেই বিস্ময়, অনুবাদক অবাঙালী। প্রত্যেক ভাষার জন্যে মাত্র একটি করে গল্প শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথন অনুবাদ করেছেন। সুতরাং তা থেকে সেই ভাষার চরিত্র ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা অবশ্য করা সম্ভব নয়; এবং গল্পগুলিও অত্যন্ত ছোট। তবু সেগুলি থেকে একটা উদ্দেশ্য অন্তত সার্থক হয়েছে। প্রতিটি প্রদেশের সাহিত্যকৃতি মানুষের একটা ভাষানির্বিশেষ সাধারণ স্বরূপকে বিম্বিত করেছে। ভালোবাসার ও ভালোবাসবার আকাঙ্ক্ষা, দারিদ্র্য, ঘরোয়া জীবনের খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত এই গল্পগুলিকে আমাদের অত্যন্ত নিকটের করে তুলেছে। প্রতি ভাষার গল্পের সঙ্গে সেই ভাষা সম্বন্ধে ঈষৎ পরিচিতি আছে। এই পরিচিতি আমাদের, বঙ্গভাষাভাষীদের কাছে, দরকারী সন্দেহ নেই।

শিবশম্ভু পাল

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'

কোনো একজন চলচ্চিত্ররসিকের এক প্রশ্নের জবাবে কিছুকাল আগে সত্যজিৎ রায় জানিয়েছিলেন 'নষ্টনীড়'-এর মধ্যে তিনি ঘরে-বাইরেকে একত্র করবেন—এ-ছবি শুধুমাত্র তিনটি বা চারটি ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ট্র্যাজেডি হবে না—এ ছবির মধ্যে একটি বিশেষ কালকে ধরবার চেষ্টা করা হবে। এখন স্বীকার করতে বাধা নেই যে এই উক্তি তখন মনের মধ্যে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করেছিল—মনে হয়েছিল 'মহানগর'-এ যে দেশকাল ও ব্যক্তির সামগ্রিক রূপ প্রত্যাশিত ছিল—'নষ্টনীড়'-এর নিছক অন্দরমহল-অবলম্বী ব্যক্তিক-সম্পর্ক-আশ্রয়ী কাহিনীতে তা আনবার দরকার কি—আনা যাবেই বা কি করে (এ-ভাবনা অবশ্য শুধু শিল্পীরই হবার কথা—তবুও অনধিকার চর্চা থেকে সব সময়ে উদ্ধার পাওয়া যায় না)—আর আনলে 'নষ্টনীড়'-এর যে ঘনসংবদ্ধ শিল্পরূপটি আছে সেটি খণ্ডিত হবে কিনা।

তারপর ছবিটি দেখা হল। প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে আবার একটা পরিচিত সত্যই প্রতিষ্ঠিত হল যে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে "ফলেন পরিচীয়তে"—এই শেষকথা। কোনো পূর্বকল্পিত ধারণা নিয়ে যে কোনো শিল্পকর্মের সম্মুখীন হতে নেই—একথা বেশ স্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হল।

একথা সত্যি যে নিছক ব্যক্তিগত সম্পর্কের সংঘাতকে যে কোনো দেশকালেই বিধৃত করে দেশকালকে শুধুমাত্র পটভূমিকা রেখে শিল্পসৃষ্টি করা যায়—যদি সেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে চিরন্তনতার আভাস থাকে। কিন্তু 'চারুলতা'-তে সত্যজিৎ রায়-এর অন্বিষ্টই অন্যরকমের। বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালকে শুধুমাত্র একটা সম্ভাব্য বিশ্বাসযোগ্য পটভূমিকা করেই রাখা নয়—তাকে social এবং ideological force হিসাবে ছবিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে দৃশ্যমান করাই ছিল তাঁর অভিপ্রেত এবং ব্যক্তিগত সমস্যাকে সেই দেশকালীন সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করে রূপায়িত করা তাঁর শিল্পগত উদ্দেশ্য ছিল।

সে উদ্দেশ্য যে কি অসাধারণভাবে সাধিত হয়েছে তা আক্ষরিক অর্থে কল্পনার অতীত ছিল। দেশকালকে এ ছবিতে শরীর ও আত্মাসহ দৃশ্যমান

করা হয়েছে এক অনুকম্পায়ী মন নিয়ে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। শরীরের দিকটাতে অবশ্য নতুন করে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই—কেননা 'milieu' তৈরি করবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত সত্যজিৎ রায়-এর অসামান্য শিল্পজ্ঞানের পরিচয় আমরা প্রথম থেকেই পেয়ে আসছি (এ-ব্যাপারে তার সহকর্মী শিল্পনির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্তের কথা উল্লেখ করতে হয়)। 'পথের পাঁচালি'র ইন্দির ঠাকুরণের ছেঁড়া কাঁথা থেকে শুরু করে—'অপরাজিত'তে ঘটিতে হাতার হাতল সহযোগে চা তৈরি, 'অপুর সংসার'-এ অপুর ঘর, 'দেবী' বা 'জলসাঘর'-এর অপসৃত ও অপম্রিয়মান জগৎ, 'অভিযান'-এ সুখনরামের ঘরের দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের ছবি, 'মহানগরে' তোবড়ানো থালাতে মাছের মুড়ো সবকিছুই নিখুঁত বস্তুচেতনার পরিচায়ক এবং সেখানে আবার বস্তু এক নিবিড় মমত্ববোধে সঞ্জীবিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 'চারুলতা'র details-এর কাজগুলি অসামান্য হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়কর নয়—কেননা এ শিল্পগুণের অস্তিত্ব সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এখন স্বতঃসিদ্ধপ্রায়। তাই 'চারুলতা'তে আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, নক্সাকাটা মাদুর, পানের বাটা, খাতার ওপরে চিত্র, দেওয়ালের ছবি, দোয়াতকলম ইত্যাদির মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকে যেভাবে শরীরী রূপ দেওয়া হয়েছে তাকে গ্রহণ করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। শব্দযোজনা প্রসঙ্গেও এই কথা খাটে। 'পথের পাঁচালি'তে সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকুরণের কলহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেশীর বাড়িতে ভিক্ষুকের কণ্ঠের দেহতত্ত্ব সঙ্গীতের অর্ধস্পষ্ট সুর থেকে কিংবা গভীর রাত্রের ঝিঁঝির ডাক আর দূরাগত ট্রেনের আওয়াজে পাঠরত শিশু অপুর অন্যমনস্ক হওয়া, ঐ ট্রেনের আওয়াজ শুনেই সর্বজয়ার মুখে সংসারযন্ত্রণার তিক্ততা ফুটে ওঠার দৃশ্য থেকেই আমরা সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে শব্দযোজনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় পেয়ে আসছি। 'পরশপাথর'-এ প্রতিবেশীর গৃহের 'সরগম' অভ্যাসের আওয়াজ, 'জলসাঘরে' সুরবাহারের সুরকে ছাপিয়ে Electric generator-এর থটথট একটানা শব্দ, 'মনিহারা'তে গভীর রাত্রে দূরের যাত্রার আসরের ভেসে-আসা সুর, মহানগর-এ রেডিওর আওয়াজ, ফেরিওয়ালার ডাক—তালিকাবৃদ্ধি করা কঠিন নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'চারুলতা'তে ফেরিওয়ালার ডাক, বাগানে ঘুঘুর ডাক, ঝড়ের সময় কাঁচ-ভাঙ্গার শব্দ, ট্রামের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ঐ পরিচিত বস্তুচেতনারই দান। অন্যান্য ছবির মতো 'চারুলতা'তেও ঐ সব শব্দের একটা স্বতন্ত্র

subjective value অবশ্য আছে—নিঃশব্দ গৃহপিঞ্জরবদ্ধ চারুর কাছে ঐ সব শব্দ বাইরের জগতের দুর্লভ স্বাদ এনে দেয়—কিন্তু সে প্রসঙ্গকে বাদ দিলেও—দৃশ্যেশ্রাব্যে ছবির জগতকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলবার যে ক্ষমতার পরিচয় আমরা 'পথের পাঁচালি' থেকেই পেয়ে আসছি—'চারুলতা' সে ক্ষমতারই একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এবং এক্ষেত্রে এই ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পুষ্ট করেন নি—করেছে সযত্ন অধ্যয়ন আর কল্পনাশক্তি—তাই বোধহয় এক্ষেত্রে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ অতিরিক্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে।

কিন্তু যে দিকটা সত্যিই আমার কাছে অকল্পনীয় ছিল, সেটা উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চবিত্তের গৃহের যথাযথ রূপায়ণ নয়—সেটা হল উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা-আন্দোলনকে এমন অদ্ভুত ভাবে এ ছবির সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে অন্বিত করে তোলা। এই অন্বয় সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব সৃষ্টি এবং এর মধ্যে তার পূর্বপ্রতিশ্রুতি চরম সার্থকতার সঙ্গে পালন করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা-আন্দোলনকে কেউ বা renaissance বলেন, কেউ বা ওর অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত না হবার দায়ভাগে এবং জনজীবনের গভীরে প্রবেশে অসমর্থ হবার দায়ভাগে ওকে renaissance বলে মানেন না—কেউ বা তাকে বলেন অসম্পূর্ণ renaissance. সে ঐতিহাসিক তর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু এটা না মেনে উপায় নেই যে পাশ্চাত্ত্য-চিন্তার ঢেউ আমাদের তৎকালীন চিন্তাশীলদের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সে আলোড়নের ফলশ্রুতিতে অন্তত একটা মূল্যবান জিনিস নিশ্চয় আমরা লাভ করেছিলাম—জাতীয় চেতনা—যার একদিকের প্রকাশ হিসাবে আমরা আমাদের সমৃদ্ধ বাংলা-সাহিত্যকে পেয়েছি। যত সীমিতভাবেই হোক সেই আন্দোলনের ঢেউ অন্দরমহলেও পৌছেছে এবং রান্নাঘরের গণ্ডী থেকে মেয়েদেরও বাইরে বার হবার বাসনাকে অন্তত জাগিয়ে তুলেছে। সামন্ততন্ত্রকে অর্থনৈতিক ভাবে ইউরোপের রেনাঁসাসের মতো আমাদের রেনাঁসাস কি পরিমাণে আঘাত করতে পেরেছে—তা অন্যত্র বিবেচ্য—কিন্তু সামন্তশ্রেণীর অনেক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিকে যে কর্মে প্রবৃত্ত করে "idle rich" অপবাদ খণ্ডন করতে প্রণোদিত করেছে—তার খবর শুধুমাত্র ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস থেকেই স্পষ্ট। এখন একে আমরা ধার-করা renaissance বলি আর imperfect renaissance বলি না কেন—এর impact-গুলিকে অন্ধের মতো অস্বীকার করা সম্ভব

নয়। সত্যজিৎ রায় সেই impact-কে 'চারুলতা'তে স্বচ্ছবুদ্ধি এবং অপরিসীম দরদের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন ছবির পটভূমিকা হিসাবে নয়—ছবির অন্তর্নিহিত চরিত্র হিসাবে। তিনটি প্রধান চরিত্রই ঐ ভাবগত আন্দোলনের মধ্য থেকে প্রাণ সংগ্রহ করেছে। ভূপতিকে সত্যজিৎ রায় লিবারাল পেট্রিয়টদের প্রতিভূ করেছেন—রাজনীতি তার নেশা বা পেশা নয়—তার প্রাণের অঙ্গ। দেশপ্রেম, সাধুতা, মানুষে ও নিজের ওপরে অগাধ বিশ্বাস তার জীবনের ভিত্তি—সেই ভিত্তি ঘরে-বাইরে যখন সরে গেল তখন তার সামনে সবকিছু স্তব্ধ—সবশূন্য। অমল প্রারম্ভে চপল, উচ্ছল, অসংযত রোমান্টিক, কিছুটা ভীতু (চারুকে দোল দেবার আগে চারপাশ দেখে নেয়)—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার maturity আসতে থাকে—দায়িত্ববোধ জন্মায়। চারুলতা প্রকাণ্ড এক বাড়িতে নিঃসঙ্গ একা, বাইরের জগতের আভাস পেয়েছে—পরিপূর্ণ স্বাদ পায় নি, স্বাদ গ্রহণের জন্য প্রাণপণে সাহিত্যকে আঁকড়ে ধরেছে—'বঙ্কিম' তার কাছে তার চার-দেওয়ালের বাইরের আকাশ। অপেরা গ্লাস দিয়ে সে বাইরের বস্তুজগতকে সন্নিকট করতে চায়। আর তার সম্বল আত্মগত চিন্তা (আঃ মানুষ ভাবেও তো বাপু)।

প্রত্যেকটি চরিত্রকে কালধর্মে পরিপুষ্ট করার ফলে ছবিটির যে একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতি তৈরি হয়েছে তা সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব সৃষ্টি। এই স্বাতন্ত্র্য ভূপতির চরিত্রেই সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মূল গল্পের ভূপতি সাদামাটা মানুষ—গল্পলেখক তার "সম্পাদকী নেশা আর রাজনৈতিক নেশা"কে সস্নেহে ঠাট্টা করেন—সত্যজিৎ রায়ের ভূপতির রাজনৈতিক চেতনা আর সাংবাদিকতা ("There is nothing like the sound of a printing press") তার আদর্শনিষ্ঠারই একটা দিক—সেখানে হাসিঠাট্টার কিছু নেই (Sentinal-কে চারুলতার 'সতীন' বললেও নেই)—তাই "মৃত সৈনিকের" দৃশ্য অমন গভীর ট্র্যাজিক গুণ অর্জন করেছে। "Unflinching regard for truth" আর "integrity" নিয়ে ভূপতি ঊনবিংশ শতাব্দীর বলিষ্ঠ পুরুষচরিত্র হিসাবে বরঞ্চ গোরার ও নিখিলেশের সমগোত্রীয়। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সযত্ন অভিনয় বিশ্বাসভঙ্গজনিত ট্র্যাজেডির রূপায়ণে সত্যজিৎ রায়কে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

অমলের চরিত্রের মূল দিকগুলি সত্যজিৎ রায় অক্ষুণ্ণ রেখেছেন—তবে

একজন বাস্তবভাবাদী দৃঢ়তাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিতুলনায় একজন অসংযত রোমান্টিক কল্পনাবিলাসী কোমলস্বভাব যুবকের উপস্থাপনায়—দ্বিবিধ ভাবধারার পারস্পরিক সংঘাতকে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারটা সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়নৈপুণ্যে অমল প্রাণবন্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প থেকে বিচ্যুতির ব্যাপারে যে সব সাধারণ অভিযোগ শোনা যায় তার আলোচনা এখানে অবান্তর কিন্তু একটি বিষয়ে ঐ অভিযোগ একটি বিশিষ্ট চেহারা নিয়েছে—এবং সে অভিযোগের মধ্যে আমাদের নিজেদের উনিশশতকী রক্ষণশীল মনোবৃত্তি উঁকি দিচ্ছে। চারুলতার প্রেমের অসংযত আত্মপ্রকাশে অনেকে ভীষণ রকমের মর্মাহত হয়েছেন এবং "পবিত্র" রবীন্দ্র-সাহিত্যের অবমাননা করার জন্য অনেক "রবীন্দ্রভক্ত" সত্যজিৎ রায়কে ধিক্কার দিচ্ছেন। প্রথম কথা হল এই যে চারুর অবদমিত আকাঙ্ক্ষার আত্মপ্রকাশ দেখাতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'নষ্টনীড়' গল্পে কোথাও কার্পণ্য করেন নি—সত্যজিৎ রায় চারুলতার চরিত্রের "প্যাশন" রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প থেকেই নিয়েছেন। হয়তো ছবিতে প্রকাশটা কিছুটা বেশি প্রকট হয়েছে—ছবির আবেদন অনেক প্রত্যক্ষ—কিন্তু তাতে দুটো উপকার হয়েছে। এক হল এই যে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা নন—তিনি যে 'ল্যাবরেটরি'র মতো গল্প 'চতুরঙ্গ'-এর মতো উপন্যাস রচনা করেছেন—"ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া নাই ভয় নাই লজ্জা" এ কথা যে তাঁরই রচনা—সেই রবীন্দ্রনাথকে এ ছবিতে পাওয়া গেছে (যদিও এ কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণের সামনে উপস্থিত করাই সত্যজিৎ রায়ের উদ্দেশ্য নয়—তবুও সে উদ্দেশ্য এতে সাধিত হয়েছে), আর দ্বিতীয়ত চারুর "ক্ষুধার্ত প্রেম"কে অনমনীয়ভাবে রূপায়িত করায় এ ছবির সর্বাঙ্গে এমন একটি চাপা violence ফুটে উঠেছে যার তুলনা খুব কম ছবিতেই মেলে—এই violence শরীরী নয়—চাপা হবার ফলেই এর ভেতরকার হাহাকার আর যন্ত্রণা এত ভয়ঙ্করভাবে ফুটেছে। চারুলতাকে বিশেষকালে আবদ্ধ রেখেও সত্যজিৎ তার মধ্যে মানুষের চিরন্তন elemental দিকগুলিকে রূপ দিয়েছেন—প্রখর আত্মাভিমান আর পিপাসার্ত দেহমন নিয়ে এক নারী সর্বব্যাপী নিঃসঙ্গতার মধ্যে শূন্যচারী গ্রহের মতো ঘুরছে—এ ছবিতে সেদিক থেকে "a study in lonliness of a woman" বলা যায়। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে সত্যজিৎ রায় সেই নিঃসঙ্গতার, অতৃপ্ত কামনার, আহত

অভিমানের ভয়ঙ্কর ছবি এঁকেছেন--তার মধ্যে মোলায়েম করবার কোনো চেষ্টা নেই বরঞ্চ 'পাকাচুল তোলা'র দৃশ্যে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছে। চারুর মুখ যেন বেলা বালাজ কথিত "Der Sichtdare Mann"-এর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেই মুখে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা দেখানো হয়েছে—দোলনায় দুলতে দুলতে "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে" গান গাইবার সময় আনন্দোজ্জ্বলে মুখ—হঠাৎ ভাবনায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে, বিশ্ববন্ধুর লেখা নিয়ে অমলকে আঘাত করবার সময় সে মুখে বেদনার তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে, অমলের অতর্কিত অন্তর্ধানের পর গাছে জল দিতে দিতে সে মুখে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা ফুটেছে, শেষ দৃশ্যের স্থির চিত্রের 'Close up'এ সে মুখে ভয় ও যন্ত্রণার এক শ্বাসরোধকারী অভিব্যক্তি ফুটেছে। চারুর নিঃসঙ্গতার ট্র্যাজেডী আর ভূপতির বিশ্বাসভঙ্গজনিত ট্রাজেডী একত্রে গ্রথিত করে শেষ পর্যন্ত সত্যজিৎ রায় এই দুটি চরিত্রকে চিরস্থায়ী নিঃসঙ্গতার অন্তহীন আকাশে দুই দূরবর্তী গ্রহের মতো বদ্ধ রেখে ছবি শেষ করেছেন—যেখানে কালের গতি স্তব্ধ—অতীত বর্তমানের বোঝা, আর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে অবলুপ্ত।

এ ছবিকে এককথায় "সুন্দর" বলা অর্থহীন কেননা এ ছবি বিশেষ অর্থে "নির্মম"। নির্মাণপদ্ধতির অসামান্য aesthetic beautyর দিকে তাকিয়ে ঐ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়তো যায়—কিন্তু এ ছবির নির্মাণপদ্ধতি এ ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। zoom পদ্ধতিতে নৈকট্য-দূরত্বের রূপায়ণ এবং গতির সাঙ্গীতিক উত্থানপতন রচনা, subjective cameraর ব্যবহার (দোলনায় চারুর দৃষ্টিকোণ থেকে অমল, গীতরত অমলের দৃষ্টিকোণ থেকে বসে-থাকা চারু) focus-এর হেরফের করে নিঃশব্দে চারু-অমলের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপায়ণ; অন্ধকারের ব্যবহার আর শেষে স্থিরচিত্রে ট্রাজেডীর ভয়াবহতার রূপায়ণ চরম শিল্পোৎকর্ষের পরিচয়। "চারুর জীবনে অমল ঝড়ের মতো আসিয়া পড়িল" এ ব্যাপারটা পড়লে বা শুনলে মনে হতে পারে literary image-এর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু ছবির মধ্যে সেটি পরিপূর্ণ দৃশ্যধর্মে ভাষায় আক্ষরিক অর্থে অবর্ণনীয়ভাবে রূপায়িত করা হয়েছে—তা ছাড়া মূলত এই ঝড়ের image-টি সাহিত্যে পূর্বে ব্যবহৃত হলেও—এটা দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই সংগ্রহ করা—যেখানে চলচ্চিত্র-শিল্পের অবাধ অধিকার।

কিন্তু এ-ছবির নির্মম ট্রাজেডীর সঙ্গে সত্যজিৎ রায় সাধারণ অনুকম্পায়ী

মনোবৃত্তির কোনো অসামঞ্জস্য নেই। সামগ্রিকভাবে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মে অতীতের প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ (nostalgia—ভালো অর্থে) আর ভবিষ্যতে অগ্রসর মন একত্রে কাজ করে—সম্ভবত সব মহৎ শিল্পকর্মেই এই দুই আপাত-বিরোধী মনোবৃত্তির দ্বৈতরূপ কাজ করে। অপম্রিয়মান জগতের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ; সত্যজিৎ রায়—রবীন্দ্রনাথ বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। 'অপরাজিত' উপন্যাসের উপসংহারে নিশ্চিন্দিপুরে ভাঙা রান্নাঘরে সর্বজয়ার ভাঙা কড়াই অপুর মনে যে অবর্ণনীয় অনুভূতির সঞ্চার করে—সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মে সে অনুভূতির স্পর্শ আছে। ঐ গভীর মমত্ববোধে 'পথের পাচালী' সিঞ্চিত। অপম্রিয়মান জগতের প্রতি মমত্ববোধ আর ভবিষ্যতের প্রতি অগ্রসর মনের নির্মম উদাসীনতার দ্বৈতরূপ 'অপরাজিত' ছবিতে পাওয়া যায়। 'জলসাঘর' ও 'দেবী'ও ঐ মমত্ববোধের পরিচয় বহন করছে। অপুর মমত্ববোধ অমলের উক্তিতে সমর্থন পায় : "হায়রে মানুষের মনই শুধু পশ্চাতের দিকে ধায়, জগৎসংসার সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না।" উনবিংশ শতাব্দীর প্রতি সত্যজিতের এই মমত্ববোধের স্পর্শ আমরা 'চারুলতা'তেও পাই। কিন্তু একে বলা যায় creative nostalgia—কেননা এতে মানুষকে "রক্ষণশীল" করে না বরঞ্চ তার জীবনাদর্শকে মানবিক করে তোলে। এই মমত্ববোধ আধুনিকতার পরিপন্থীও নয়—কেননা অতীত কালের পটভূমিকায় মানুষের চিরন্তন সমস্যাগুলির রূপদানে আধুনিক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব—যেমন সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নাটকে কিংবা কমল মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে। 'A study in loneliness' হিসাবে 'চারুলতা' অত্যন্ত আধুনিক ছবি।

কালানুগ ও কালোত্তীর্ণের, মমতা ও নিষ্ঠুরতার, সমগ্রের ও ব্যক্তির, হাসিকান্না হীরাপান্নার, গতি ও নিশ্চলতার দ্বৈতরূপকে সন্নিবদ্ধ করে সত্যজিৎ রায় 'চারুলতা'তে একালের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের সৃষ্টি করেছেন।

ধ্রুব গুপ্ত

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

Adam Schaff-এর 'A Philosophy of Man' সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅশোক রুদ্র পৌষ-সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'humanism' সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়ে কয়েকটি বক্তব্য নিবেদন করতে চাই।

শাফ কর্তৃক 'প্রাচীন খ্রীষ্টীয় মানবিকতা'র উল্লেখে শ্রীরুদ্র রুষ্ট হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের মানবিকতা সম্পর্কে হীরেন মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তিকে রুদ্র বিদ্রূপ করেছেন ভাবপ্রবণ অত্যুক্তির দায়ে। শাফ ও মুখোপাধ্যায় দুজনেই 'humanism' বা 'মানবিকতা'র সংজ্ঞাকে ঘুলিয়ে ফেলেছেন এবং 'humanitarianism' বা 'জীবে দয়া'র সঙ্গে 'humanism'-কে এক করে দেখেছেন, এমন ইঙ্গিত শ্রীরুদ্র তাঁর সমালোচনায় করেছেন।

শ্রীরুদ্র নিজে 'humanism'-এর কোনো 'খাঁটি' সংজ্ঞা উপস্থিত করেন নি। কাজেই অনুমানের ভিত্তিতেই তাঁর বক্তব্যের যাচাই করতে হচ্ছে। মধ্যযুগের অন্তে ইউরোপে (প্রথমে ইতালিতে) সংস্কৃতি ও চিত্তবৃত্তির ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী পরিবর্তনের জোয়ার আসে তাই 'humanism' আন্দোলন নামে ইতিহাসে খ্যাত। 'Humanism'-এর ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে শাফ বা শ্রীমুখোপাধ্যায় অবহিত নন বা বিস্মৃত একথা বলার ধৃষ্টতা নিশ্চয় কারও হবে না। শ্রীরুদ্রও তা বলতে চান নি, আমরা ধরে নিতে পারি। তবে প্রাচীন খ্রীষ্ট-ধর্মে ও ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে 'মানবিকতার'র সন্ধান বা উল্লেখ তাঁকে এত পীড়া দেয় কেন? সম্ভবত 'মানবিকতা' আন্দোলনের যে 'ঈশ্বরতত্ত্ব' বা 'ব্রহ্মবিদ্যা' (theology) বিরোধী একটি বৈশিষ্ট্য আছে, শ্রীরুদ্র শুধুমাত্র তার ওপর জোর দিয়েই তাঁর বক্তব্য হাজির করেছেন। তাঁর জানা আছে কিনা জানি না, 'humanism'-এর এই সংজ্ঞা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। 'Humanism' আন্দোলনকে ঈশ্বরতত্ত্ব-বিরোধী আন্দোলনের নামান্তর বললে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস সম্পর্কেও অনেক ইতিহাসসিদ্ধ তথ্য বাতিল করতে হয়। একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের উক্তি স্মরণ করে বলতে ইচ্ছা করে: "The Dark Age was not as dark as it is made to look." এ কথা তো আজ অস্বীকৃত নয় যে মধ্যযুগের জ্ঞান ও চিন্তা ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা পুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়েও সংস্কৃতির অপঘাতকে জয় করে পুনর্জাগরণের সূচনা

করতে সমর্থ হয়েছিল, সমর্থ হয়েছিল জীবনের একটা মহৎ মূল্য আবিষ্কার করতে। তুলনামূলকভাবে চৈতন্যযুগে বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা সংস্কৃতিতে যে অভিনবত্ব সূচিত হয়েছিল তার উল্লেখ করা যায়। মধ্যযুগীয় সংস্কার চৈতন্য-প্রভাবিত সাহিত্যেরও আশ্রয়, তবু চৈতন্য-প্রভাব বাঙালীর মানস-ঐতিহ্য, বাঙালীর জীবনসাধনাকে যে বলিষ্ঠ বৈচিত্র্যের মধ্যে নবরূপায়িত করেছিল তাকে অস্বীকার করায় চপলতার মনোহারিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসনিষ্ঠার অভাব আছে নিঃসন্দেহে।

'Humanism'-এর বৈশিষ্ট্য এক নয়, বহু। এর যে কোনো একটিকে মাত্র আশ্রয় করলে তাই পদস্খলন অনিবার্য। *Encyclopaedia of the Social Sciences*-এর প্রামাণ্য আলোচনায় Edward Cheyney ও F. S. Schiller বলেছেন, "Humanism thus means many things." চিত্তবৃত্তির স্বাধীনতা 'humanism'-এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। Encyclopaedia অনুযায়ী: "···inseparably bound up as the latter (humanism) was with emancipation of spirit and freedom of thought." প্রশ্ন করা যেতে পারে চিত্তবৃত্তির স্বনির্ভরতার মাপকাঠিতে সমগ্র প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র কি তাসের ঘরের মতো অলীক প্রতিপন্ন হবে? এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দের একটি উক্তির উল্লেখ করছি: "He (Buddha) was the first who dared to say, 'Believe not because some old manuscripts are produced, believe not because it is your national belief, because you have been made to believe it from your childhood; but reason it all out, and after you have analysed it, then if you find that it will do good to one and all, believe it, live up to it, and help others to live up to it."

এর পরও কি, বুদ্ধের বাণীতে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের মধ্যে মানবপ্রাধান্যের, চিত্তবৃত্তির পরিমুক্তির যে উপলব্ধি ছিল তাকে অস্বীকার করতে হবে, যেহেতু রেনেসাঁস যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান বা বস্তুপ্রত্যয়গত চেতনার প্রসার বৌদ্ধযুগে ঘটেনি, সেই কারণে?

দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবেও 'মানবিকতা'-বাদকে একটিমাত্র নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় স্থির রাখা যায় নি। 'Absolutism'-এর বিপরীত তত্ত্বরূপে উদ্ভূত হলেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা-পরম্পরায় কিন্তু 'Absolutism' বিরোধিতাই 'মানবিকতা'-

বাদের বিশিষ্ট লক্ষণরূপে পরিগণিত হয় নি। "This philosophic usage of humanism clearly does not involve my antagonism to absolutism." (*Encyclopaedia of Social Sciences*)। আরও, ধর্মবিরোধিতাও যে 'মানবিকতাবাদ'-তত্ত্বের কোনো মৌলিক ভূমি নয় তার প্রমাণ, Santayana'র 'Realm of Matter'। বস্তুত, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক উভয়দিক থেকেই 'মানবিকতাবাদ' এক বহুধারা স্রোতঃস্বিনী। Adam Schaff তাঁর বই-এর 'Socialist humanism and its fore-runners' নামক অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করে, মার্কসীয় চিন্তাধারায় অধুনাবিস্মৃত এক গুরুত্বপূর্ণ দিককে সংযোজিত করেছেন। এর জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ, বিশুদ্ধবাদী'দের রোষ সত্ত্বেও।

'Humanism' ও 'Humanitarianism'-এর তুলনাতেও শ্রীরুদ্রের সমালোচনার মধ্যে আত্মতুষ্ট ন্যায়পরায়ণতার (Self-righteousness) সুর প্রচ্ছন্ন। তাঁর জানা আছে কিনা জানি না যে ইরাসমাস প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র 'humanist' রেনেসাঁস-উত্তর সমাজে নতুন গরীবদের জন্য কাতর হয়ে তাদের দুঃখ লাঘব করতে এগিয়ে এসেছিলেন ; 'খাঁটি' 'humanist'-রা কিন্তু এ থেকে অনেক দূরে, অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। অথচ, সমাজতান্ত্রিক মানবিকতার ঐতিহ্যে ঐ 'জীবে দয়া' শ্রেণীভুক্ত 'humanist'দের স্থানই স্বীকৃত। *Encyclopaedia of Social Sciences* থেকে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। "The persistent struggles that brought about better conditions of life for the mass of people were not carried on by persons imbued with a humanistic view of life ; their interests were too aristocratic and individualistic, their eyes were turned too much towards the past and upon themselves."

সমাজতান্ত্রিক মানবিকতার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করার জন্য, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংগঠনকে 'মানবিকতা'-হীন ছাঁচে-ঢালাই যান্ত্রিকতার অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন মানবিকতার বিচিত্র ঐতিহ্যের মধ্যে এর নিজস্ব বিশিষ্টতার অনুসন্ধান। Adam Schaff সমাজতান্ত্রিক মানবিকতার নতুনকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েই পাঠককে স্মরণ করিয়েছেন যে এই মানবিকতা কোনো স্বয়ম্ভূ-অর্থে নতুন নয়, একে এর নতুনত্বের পরীক্ষা দিতে হবে সনাতন ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠকে অতিক্রম করে।

সিতাংশু ভট্টাচার্য

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ১২
আষাঢ়, ১৩৭১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

২৪-৩৯৩০

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জওয়াহরলালজী নেহরু

বুদ্ধ পূর্ণিমার রাত ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জওয়াহরলালজী নেহরুর হৃদ্‌যন্ত্র জানিয়ে দিয়েছিল যে তার মেয়াদ বোধ হয় ফুরিয়ে আসছে। অনেক দিনের অনেক ধাক্কা সাম্‌লে-আসা এই যন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না। এই তো অতি সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে হাসিমুখে বলেছিলেন যে তাঁর জীবন চট্‌ করে শেষ হতে যাচ্ছে না! যখন চার মাস আগে ভুবনেশ্বরে জওয়াহরলাল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন থেকে সারা দেশ আশা আর আশঙ্কা নিয়ে উৎকণ্ঠিত ছিল। অবাধ্য নিয়তি সে-অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছে।

আগের রাতে কাকে যেন বলেছিলেন যে সরকারী 'ফাইল্‌' দেখার কাজ তিনি শেষ করে রাখলেন। ভোরে উঠে বুকের যন্ত্রণা আর সর্বদেহে অস্বস্তিকে অগ্রাহ্য করে তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরেছিলেন, দৈনন্দিন দাড়ি কামানো থেকে বিরত হন নি। বয়সের বোঝা আর অপরিসীম কাজের চাপ কোনও দিন তাঁর আচারে ব্যবহারে আকৃতিতে অযত্ন আর শৈথিল্যের ছাপ রাখতে পারে নি। জীবনের শেষদিনেও স্বভাবের এই রীতি থেকে তাই তিনি বিচ্যুত হন নি। চিরদিনই তিনি চেয়েছিলেন যে মৃত্যু যেন আচমকা আসে। রোগ-শয্যায় অসহায় হয়ে শুয়ে থাকার কথা ভাবলে তিনি শিউরে উঠতেন—কিন্তু যমরাজের তলব তাঁকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাকড়াও করবে, এ-জিনিস তিনি চান নি। মরণকে নিজের দুয়ারে দেখেও তাই দিনের কাজের জন্য তৈরি হতে তিনি ভোলেন নি। জওয়াহরলালের শিল্পীমন নিজের সম্বন্ধে গালভরা বিশেষণ শুনলে যে কুণ্ঠিত হত তা জানি। 'কর্মবীর' তাঁকে বলা নিশ্চয়ই যায় কিন্তু আজ না হয় ঐ ধরনের বাক্য ব্যবহার না-ই করা গেল। শুধু বলা

যাক যে কাজ ছিল যার প্রাণ, কাজ ছিল যার একমাত্র উপাসনা, কাজ ছিল যার মর্মের অনুভূতির নিরন্তর তুষ্টিহীন প্রকাশ, কাজে বাধা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চৈতন্য লুপ্ত হল, রোদে ধোওয়া আলোয় ফুলের হাসিও তার ঘুম ভাঙাতে পারল না।

সত্যই ইন্দ্রপাত হয়ে গেল আমাদের মধ্যে—কিন্তু যার তিরোধানে সারা দেশ আজ এত ব্যথিত, তিনি দেবরাজ ছিলেন না। দেবোচিত বহু গুণের অধিকারী হয়েও তিনি ছিলেন নিছক মানুষ, অশান্ত, অস্থির, সদাজিজ্ঞাসু, প্রখর, প্রকৃত মানুষ। সর্বরিপুদমনের অতিমানুষিকতা কোনও দিন তাঁকে প্রলুব্ধ করে নি—জীবনের শেষ অধ্যায়ে দেখা গেছে সৌম্য, সংযত আত্ম-সংহৃতির প্রয়াসে তিনি বহুলাংশে সফল হয়েছেন, কিন্তু ইচ্ছা করেছে দেখতে সেই পূর্বাভ্যস্ত রূপ, যখন তাঁর মনের বিচিত্র ইন্দ্রধনু থেকে ক্ষিপ্র, তীব্র শর নিক্ষিপ্ত হয়েছে, লক্ষ্যভেদ না ঘটলেও বায়ুমণ্ডল বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে, "শুধু দিনযাপনের গ্লানি" থেকে নিস্তারের পথ যেন দেখা গেছে, ক্লেদ আর ক্ষুদ্রতা যে রাজনীতিপথে অকাট্য নয় তা বোঝা গেছে।

অনধিকারী হয়েও বলতে ইচ্ছা করে যে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও যেন এক অজ্ঞাতপূর্ব প্রশান্তির আস্বাদ পাওয়া যেত, কোন্ জাদুবলে অশান্তির অন্তর্নিহিত সুমহান্ শান্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মনে হত। জওয়াহরলালজীর সান্নিধ্যে অনুভূতি আসত ভিন্ন প্রকৃতির। গান্ধীজীর হাস্য-মণ্ডিত মুখ আর অতি স্বচ্ছ আলাপ তাঁর মানবিকতার প্রোজ্জ্বল সাক্ষ্য হলেও মনে হত যে তিনি যেন অন্য গ্রহবাসী, যে জগতে আমাদের বিচরণ তা থেকে অন্যত্র তাঁর অধিষ্ঠান। এই দূরত্ববোধ জওয়াহরলালের কাছে বসলে মনে জায়গা পেত না। সন্দেহ নেই যে তাঁর অনন্য মহত্ত্ব সান্নিধ্যে এসে অনুভব করতেই হত। কিন্তু একান্ত একাকী এই ব্যক্তিকে একেবারে আত্মীয় মনে করতে বিলম্ব ঘটত না, প্রায় সমান স্তরে কথা বলার ধৃষ্টতা সংগ্রহ করতে কোনো ক্লেশ বা অস্বস্তি বোধ হত না। জন্মে, শিক্ষাদীক্ষায়, জীবনপদ্ধতিতে অভিজাত হয়েও জওয়াহরলাল এদেশে সর্বজনের প্রিয়বান্ধব যে হতে পেরেছিলেন, তার রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর চরিত্রে, তাঁর অনায়াস অমায়িকতায়, নির্বিশেষে অপরের ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা পোষণের অনুকূল মানসিক প্রবৃত্তিতে।

ভারতবর্ষের অধুনাতন ইতিহাসে চারিত্র্যের এই আবির্ভাবকে সমুজ্জ্বল

ঘটনা বললে অত্যুক্তি হবে না। একে একটু বিস্ময়করও বলা যায়, কারণ প্রথম জীবনে জওয়াহরলাল প্রতিভা কিম্বা অসামান্যতার তেমন কোনো আভাস দেন নি। ধনী বংশে জন্ম, বিলাসে লালন, বিদেশে শিক্ষা,—উপসংহারে অর্থোপার্জন ও সাংসারিক সাফল্যে পর্যবসন অসঙ্গত ছিল না। পরাধীন দেশে জন্মেও রাজনীতি ব্যাপারে তরুণ বয়সে তাঁর অনীহার অন্ত ছিল না। মদনলাল খিংড়া লণ্ডন শহরে প্রকাশ্য সভায় ভারত শাসনে কুখ্যাত ইংরেজ রাজপুরুষকে হত্যা করে স্বাধীনতার জয়গান করতে চেয়েছিলেন, তখন জওয়াহরলাল তাঁর সাহসে মুগ্ধ হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর আবেগ গভীরভাবে উদ্রিক্ত হয় নি। বিপিনচন্দ্র পালের মতো ব্যক্তিকে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে অতি উচ্চ স্বরে দেশের দুর্দশার কথা বলতে শুনে তাঁর মার্জিত রুচিতেই আঘাত লাগে, বিখ্যাত দেশনেতার বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে দুরূহ হয়েছিল। দেশে ফিরে আদালতে 'প্র্যাক্‌টিস্' করতে যাওয়া, মাঝে মাঝে ক্লাবে গিয়ে গল্পগুজব করা। মোটের উপর সৎভাবে সমাজের উপরতলার জীবন নির্বাহ করা—এবং বাইরে খুব বেশি চিন্তা তখন তিনি করতে চান নি। কিন্তু আগ্নেয়গিরির মতো তাঁর মনের গভীরে একটা মস্ত বড় আলোড়ন নিশ্চয়ই তৈরি হচ্ছিল। আর যখন দেশের জীবনে গান্ধীজীর আবির্ভাব হল, মোতিলাল নেহরুর মতো ব্যক্তি যখন বিলাসব্যসন ও উগ্র রাজনীতির প্রতি বীতরাগ ভাব ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে নামলেন, তখন যেন জওয়াহরলাল প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ করলেন। নতুন পশ্চাৎপট নিয়ে ভারতবর্ষের যে নতুন পরিবেশ আর নূতন জীবন সৃষ্টি তখন হতে চলেছিল, সেই জীবনে যেন তাঁর দ্বিতীয় জন্ম ঘট্‌ল।

জওয়াহরলাল নিজে বলে গেছেন তাঁর জীবনে তিনজন ব্যক্তির প্রভাব কত বেশি ছিল। পিতা মোতিলাল ছিলেন তেজস্বী, অপরিসীম পুত্রস্নেহ সত্ত্বেও পুত্রের সঙ্গে মতবিরোধ তাঁর বারবার ঘটেছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উভয়ে ছিলেন যেন উভয়ের সচিব এবং সখা। গান্ধীজীর ইন্দ্রজালে জওয়াহরলাল জড়িয়ে পড়েছিলেন। স্বভাবের প্রচণ্ড পার্থক্য এবং বহু বিষয়ে বিচারভেদ তাঁদের মধ্যে সহজে ধরা পড়ে, কিন্তু গান্ধীজীর তুলনাহীনতার মায়া কাটিয়ে ওঠা জওয়াহরলালের সাধ্য কিম্বা সাধ কখনও হয় নি। জওয়াহরলালের মানসিকতার একটা বৃহৎ অংশ ছিল শিল্পী—তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অন্ত ছিল না, মনের গঠনে ও সংবেদনশীলতায় তাঁদের মধ্যে

মিল ছিল প্রভূত। কিন্তু জওয়াহরলাল ছিলেন গান্ধীজীর ছকে না হলেও গান্ধীজীর হাতে গড়া। বোধ হয় বলা যায় যে স্বদেশের চেয়ে বিদেশের সঙ্গে যোগ যার কিশোরকাল থেকে ছিল সমধিক, সে যেন চিরন্তন ভারতবর্ষের মূর্ত প্রতীকরূপে আবিষ্কার করল গান্ধীজীকে, আর তার পর থেকে মতভেদ আর আশাভঙ্গ-জনিত বিস্ময় ও বিরক্তি সত্ত্বেও তাঁকেই অবিচল আলোকবর্তিকা বলে গ্রহণ করল। এই আবিষ্কার ও দীক্ষাকেই বুঝি জওয়াহরলালের জীবনের কেন্দ্রবস্তু বলা চলে।

আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন নিজ বাসভূমে পরবাসী অনুভূতির কথা—"কোথাও যেন আমার ঘর নেই, সর্বত্রই আমি খাপছাড়া।" ১৯২০-২১ সালে বাস্তবিকই দেখা গেছল গান্ধীজীর জাদুকরী। জওয়াহরলালের মধ্যে যে মহিমা সুপ্ত হয়েছিল, কোথা থেকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে তিনি জাগিয়ে তুললেন। সমসাময়িক ভারত ইতিহাসে এ হল একটা বড় দরের ঘটনা।

তখন থেকে জওয়াহরলালের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তারই শেষ দেখলাম সেদিন। আমাদের ইতিহাসের একটা গর্ব করার মতো অধ্যায় যেন তাঁর নশ্বর দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে গেল।

গান্ধীর সবচেয়ে একনিষ্ঠ ভক্ত হয়েও জওয়াহরলাল কখনও বহু গান্ধী-শিষ্যের মতো কেবল গান্ধীবাক্যের প্রতিবিধান করতে চান্ নি, পারেন নি। তাঁর এমন ক্ষমতা বা ইচ্ছাও কখনও হয় নি যে গান্ধীর পথ পরিহার করে নিজের বুদ্ধি ও বিচার যা বলে তদনুযায়ী চলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধী যে সিদ্ধান্ত করেছেন তারই সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য না ঘটিয়ে তিনি পারেন নি—গান্ধীও ঐ সামঞ্জস্য সাধনে সহায়তা করে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও কর্মপন্থার জালে জওয়াহরলালকে বহুবার বেঁধেছেন। কিন্তু দেশের মানুষের অবস্থা আর দুনিয়া জুড়ে সমাজ বিবর্তনের প্রয়োজন ও সম্ভাবনা বুঝে ভারতবর্ষের বাস্তব ক্ষেত্রে নতুন পথের প্রবর্তন সম্বন্ধে জওয়াহরলালের অবদান কখনও ভুলতে পারা যাবে না। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধী লিখেছিলেন তাঁকে: "তুমি যেমন ভাবো, তেমনই ধনী আর শিক্ষিত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে আন্দোলন আমাদের করতে হবে—কিন্তু তার সময় এখনও আসে নি।" গান্ধীজীর হিসাবে তার সময় কখনও এল না, আর জওয়াহরলালের হিসাবে সময় এল আর চলে গেল, তার সদ্ব্যবহার সম্ভব হল না। ফল অবশ্য এক,

কিন্তু জওয়াহরলালের চিন্তা আর কর্মের সঙ্গে আমাদের এই মাত্মত্যাগশ্রী দেশের এগিয়ে চলার যে সম্পর্ক রয়েছে, তাকে ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই।

অনলস আবেগ ও আন্তরিকতা নিয়ে জওয়াহরলাল গতিশীল জীবনের কথা সর্বদা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মনে পড়ে যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা—যে-ঐতরেয় শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত ঋষিপুত্র মহীদাসের রচনা বলে খ্যাত, যে-ঐতরেয় গ্রন্থ পাঠ বিনা বেদজ্ঞান নাকি সম্ভব নয়, যার শিক্ষা এসেছিল স্বয়ং মাতা বসুন্ধরার কাছ থেকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে, রাজপুত্র রোহিত পথশ্রান্ত হয়ে ঘরে চলেছেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তাঁকে বার বার পাঁচবার নানা ভাবে বললেন, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—চরৈবেতি, চরৈবেতি। "চলাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, চেয়ে দেখো ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়ে নি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।"

এগিয়ে চলবার এর চেয়ে প্রদীপ্ত বাণী আর কোথাও আছে কি? একেই মূলমন্ত্র করেছিলেন জওয়াহরলাল—জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করে এগিয়ে চলো, কুসংস্কার বর্জন করে এগিয়ে চলো, স্বার্থসন্ধতাকে পরিহার করে এগিয়ে চলো, যাতে সর্বজন সুখী হয় সেই প্রচেষ্টার পথে এগিয়ে চলো। এ-কথাই তাঁর জীবন দিয়ে জওয়াহরলাল বলে গেছেন। তাঁর অশান্ত, অশ্রান্ত জীবন-কথার এই তো মর্মবাণী।

জওয়াহরলালের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটি কথা না বললে চলবে না। বিপ্লবী বলতে প্রকৃত প্রস্তাবে যা বোঝায়, তা তিনি ছিলেন না—এজন্য কোনো কোনো পরিস্থিতিতে তিনি বিপ্লবীদের চক্ষুশূল হয়েছেন আর তা অহেতুকও ছিল না। কিন্তু কেমন করে ভোলা যায় যে তাঁর ধারণায় অসঙ্গতি ও দুর্বলতা থাকলেও ১৯২৭ সাল থেকে এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন সর্বোপরি তিনি এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ভুলভ্রান্তি তাঁর বহু ঘটেছে, কিন্তু মনের প্রকৃত প্রসার আর হৃদয়ের দরদ নিয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের দিকে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। করাচী কংগ্রেসে (১৯৩২) মৌলিক অধিকারের যে সনদ তিনি পেশ করেন, তাতে ফাঁক এবং ফাঁকি ছিল যথেষ্ট, কিন্তু বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তার তদানীন্তন মূল্য একেবারেই

অল্প ছিল না। "Whither India ?" আখ্যা দিয়ে যে প্রবন্ধগুলি তিনি প্রকাশ করেন, এদেশে সোশালিজমের প্রসারে তাঁর অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ না করলে অপরাধ হবে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) সভাপতিরূপে তাঁর অভিভাষণে সোশালিজম্ এবং সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য যে আজও মহামূল্য তা স্বীকার না করে উপায় নেই। মনে আছে ১৯৩৬ সালে এলাহাবাদে আনন্দভবনে ছোট এক সভায় স্বাধীনতা এবং সোশালিজম্ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে দুটো লাড্ডু রয়েছে একটা খেয়ে তার পর অন্যটা খেতে যাব, এমন ব্যাপার নয়—দুটো লাড্ডুই যাতে খেতে পাবার সম্ভাবনা ঘটে, তাই হল কাজ। এর চেয়ে সহজে ও স্পষ্টভাবে স্বাধীনতা আর সোশালিজমের লড়াই সম্বন্ধে কথা বলা যায় বলে জানি না। তাঁর নায়কতায় সম্প্রতি কংগ্রেস সোশালিজমকে লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে—এই ঘোষণাকে শঠতা বলা সহজ, কিন্তু তা বললেই কাজ শেষ হয় না, এবং এমন ঘোষণা ঘটারও একটা বৃহৎ মূল্য রয়েছে, যাকে অগ্রাহ্য বা বিদ্রূপ করা হল ভ্রান্তি। বাস্তবিকই মনে হয় যে স্তালিনের মৃত্যুর পর সবচেয়ে দামী কথা যে জওয়াহরলাল বলেছিলেন, তার একটা বিশিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে।

জওয়াহরলালকে কোথায় যেন ভারতপথিক বলে বর্ণিত হতে দেখেছি। মহাত্মা কবীরের শিক্ষাকেও 'ভারতপন্থ' বলা হয়েছে—হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার তিনি ছিলেন প্রতীক, আর সে-সাধনা ছিল সচল, জীবননির্ভর, অচলায়তনের প্রতিপন্থী। "বহতা পানী নিরমলা বন্ধা গন্দা হোয়"—যে জল বয়ে চলেছে তা হল নির্মল, বদ্ধ জলই হয়ে ওঠে দূষিত, দুর্গন্ধ। তখনকার জীবনে দুঃখ-দুর্গতি লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না—সেখানে সাধক বলেছিলেন "আঠ পহর কা ঝুঝ্না বিন্ খাণ্ডে সংগ্রাম।" অষ্টপ্রহর এই যুদ্ধ চলেছে, বিনা খড়্গের এই সংগ্রাম। ভারতবর্ষের চিরন্তন এ-সব কথা বর্তমান যুগে যাঁরা নতুন করে ভেবেছেন, জওয়াহরলালের স্থান সেই সৎসঙ্গে। কবীর বলেছিলেন: ধরণী আকাশে চলেছে থরহরি, সকল শূন্য ভরে চলেছে গর্জন, তারই মধ্যে মৈত্রী ও সমন্বয়ের বাণী নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ভিন্ন পরিস্থিতিতে, সামাজিক সম্ভাবনা যখন ভিন্ন প্রকৃতির তখন আজকের মহাত্মাদের যুগসম্মত চিন্তাকে প্রকাশ করতে হবে। জওয়াহরলাল সেই চেষ্টা করেছেন, আর ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও এমন ভাবে করেছেন যে মানুষ মনে রাখবে শতাব্দী ধরে তাঁর মমতা, তাঁর মনের করুণা, তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি

আর পরদুঃখকাতর মহত্ত্ব—যে-গুণাবলীর মূল্য বিপ্লবের নামে যেন হ্রাস করে দেখার প্রবৃত্তি আমাদের না হয়।

প্রায় অর্ধজগৎ আজ মার্কস্-কথিত সুসমাচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজবাদকে গ্রহণ করেছে, সাম্যবাদের পথে পদক্ষেপের প্রচেষ্টায় নেমেছে। দুটো বিরাট বিশ্বযুদ্ধ গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঘটেছে, রুশ সাম্রাজ্যে আর মহাচীনে সাম্যবাদী নেতৃত্বে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, মধ্য ইয়োরোপ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরতট পর্যন্ত সমাজবাদী শাসন স্থাপিত হয়েছে, সাম্রাজ্যের শৃংখল ভেঙে এশিয়া আফ্রিকা লাতিন-আমেরিকার বহু দেশ স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে, সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা বিনা সার্থক স্বাধীনতা যে অসম্ভব তা হৃদয়ঙ্গম করে যথাসাধ্য সোশালিজমের দিকে এগিয়ে চলার কঠিন প্রয়াসে নেমেছে। এমনই যুগান্তরকারী পরিবর্তন আজকের দুনিয়াতে এসেছে বলেই সাম্যবাদী অভিযানের পূর্বতন স্তরে চিন্তা ও কর্মে যে একাগ্র, এমন কি প্রয়োজন হলে নির্মম, কঠোরতা সঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল, তাকে অনড়, অটল, অপরিবর্তনীয় মনে করারও বুঝি প্রকৃত কারণ নেই। এ-প্রসঙ্গ আলোচনার স্থান অন্যত্র, কিন্তু জওয়াহরলাল নেহরুর মতো মানুষ সম্বন্ধে মনে হয় যে এঁরা বিপ্লবের যে মূল্য ইতিহাস বার বার নিয়েছে তা দেখে বিপ্লবপথ সম্বন্ধেই কুণ্ঠা বোধ করেছেন—সমাজের সনাতনী শোষণব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে যে সমাজকে অপরিসীম গ্লানি ও বেদনা সহ্য করতে হয়, তা মেনে এবং বুঝেও বিপ্লবের মূল্য দিতে সংকুচিত হয়েছেন, বিপ্লবের চরিত্রকে পরিবর্তিত করতেও তাই চেয়েছেন। একশো বছর কিম্বা আরও আগে আকাশচারী সাম্যবাদী যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও কল্পনা করতেন যুক্তি এবং হৃদয়বত্তার কষ্টিপাথরে যাচাই করে মানুষ সাম্যবাদকে বিনা সংঘর্ষে গ্রহণ করবে। তাঁদের সে-কল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল; কার্ল্ মার্কস্ এই গগনবিহারী কল্পনাকে তাই ধিক্কৃত করেছিলেন। কিন্তু ধিক্কার দিলেও 'ইউটোপিয়ান্' মনীষীদের অবদানকে সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাতে তিনি সংকোচ বোধ করেন নি। আজকের পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিবেশে জওয়াহরলাল নেহরুর মতো ব্যক্তি কিছু পরিমাণে ইউটোপিয়ান্দের উত্তরাধিকারী—তবে যে জগতে সোশালিস্ট শক্তিপুঞ্জের বর্তমান প্রভাব এবং জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের ক্ষমতা ও গভীরতা বিপুল, সেখানে বিপ্লবের পূর্বকল্পিত মূর্তির সর্বত্র পুনরাবৃত্তিকে অকাট্য মনে করা

চলে না। নানা পথে সমাজবাদে পৌঁছাবার সম্ভাবনার কথা আজ আমরা জানি। জওয়াহরলাল প্রকৃত সমাজবাদ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ চেতনা রাখতেন না, তাঁকে সমাজবাদী বলে ধরে নেওয়া যে ভুল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজবাদকে ভারতীয় পরিস্থিতিতে সহজ, স্বাভাবিক ও সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার অনুকূল মানসিকতা ও প্রস্তুতিকে বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠ করতে তাঁর চিন্তা এবং দীপশিখার মতো সমুজ্জল তাঁর বহু বাক্য অবশ্যই সাহায্য করবে।

জওয়াহরলাল ছিলেন যুগন্ধর মানুষ—তাই তাঁর সম্বন্ধ কথার উপর কথা সাজিয়ে যাওয়া সহজ। কথা বড় বেশি বলা হয়ে গেছে দেখে তাই অস্বস্তি আসছে। কী প্রয়োজন এত কথার? তবে বুঝি কথা বলে যেতে থাকলে মনের ভার কিছু কমে, আর হয়তো বা কথার মধ্য দিয়ে কিছু কাজেরও নিশানা মেলে।

১০ই এপ্রিল তারিখে লেখা তাঁর শেষ চিঠি হাতের কাছে রয়েছে। "তোমার বাংলা প্রবন্ধের বইটা পেয়ে সুখী হলাম, কিন্তু আমি তো বাংলা পড়তে পারি না, আমার লাইব্রেরিতে এটা থাকবে। তোমার চিঠি পড়লে আমার খুব ভালো লাগে। আমার শরীর খারাপ মনে করে যখন খুশি লিখতে সংকোচ কর না, তবে আগের মতো অবিলম্বে জবাব দিতে হয়তো পারব না।" কোনো কাজে বিলম্ব তাঁর ধাতে সইত না। তাই বুঝি অস্বাস্থ্যের বোঝাও বেশিদিন বইতে তিনি পারলেন না।

ডক্টর জাকির হোসেন সেদিন এক সভায় বললেন: জওয়াহরলাল ছিলেন "হিন্দোস্তান-কে মেহ্‌বূব্‌", সারা দেশের দুলাল। শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি নয়, এত ভালোবাসা কোথাও কোনো রাজনৈতিক নেতা লক্ষ লক্ষ অচেনা মানুষের কাছ থেকে কখনও পায় নি। নিজের সঙ্গে অপরের ব্যবধান দূর করবার প্রায়-অসম্ভব ক্ষমতা বিনা এমন মহত্ব সম্ভব নয়। চারিত্র্যের এই ঐশ্বর্য জওয়াহরলালের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামে জওয়াহরলালের ভূমিকা ইতিহাসে কীর্তিত হতে থাকবে। স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররূপে দেশগঠন ও বিশ্বশান্তি স্থাপনে তাঁর প্রয়াসের বিবরণও ইতিহাস সহজে বিস্মৃত হবে না। কিন্তু নিছক রাজনীতির বিচারে শুধু স্তুতিই তাঁর প্রাপ্য নয়। বহু কঠিন ও কঠোর সমস্যা অপূর্ণ রেখে তিনি চলে গেছেন। অতি-মানবিক শক্তির

অধিকারী হয়েও অতি-মানবিক পদ্ধতিতে সেই শক্তি ব্যবহারে তিনি অপারগ ছিলেন। হয়তো এজন্যই তিনি কখনও বিপ্লবী ভূমিকায় নামতে পারেন নি; দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বনেও স্বীকৃত হতে পারেন নি। সংসারে রুচি ও প্রগতির মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্য যতদিন না ঘটে, ততদিনই হয়তো তাঁর মতো ব্যক্তির জীবনে ও কীর্তিতে কিছু পরিমাণে ব্যর্থতা না থেকে পারে না।

এ-সব চিন্তা ছাপিয়ে আজ জওয়াহরলালের তিরোধানে স্বজনবিয়োগব্যথায় ভারতবর্ষ বিধুর। শিশুর হাসি আর ফুলের ছটা ছিল যার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, আসক্তির সঙ্গে নিরাসক্তিকে একসূত্রে বাঁধার শক্তি ছিল যাঁর চরিত্রমহিমা, সেই মহদাশয় ও একান্ত অনন্য মানুষটি আর নেই। শুধু অমর হয়ে থাকবে তাঁর স্মৃতি এবং তাঁর অজর অভীপ্সা :

সর্বস্তরতু দুর্গানি সর্বো ভদ্রানি পশ্যতু।
সর্বস্তদ্বুদ্ধিমাপ্নোতি সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু॥

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বদেশীর দলে ঢুকলাম না হল দীক্ষা, না বিশেষ কোনো

এ প্রসঙ্গেই তাই দু-একটা কথা বলা দরকার। বাঙলা দেশে একটা কথা বিশেষ প্রচলিত। মনে পড়ে, রাউলাট কমিশনের রিপোর্টেও সে মর্মের কথা আছে। সাম্যবাদী পত্র-পত্রিকাতেই একালে কথাটা অকাট্য বলে অধিক প্রচারিত। 'টেররিস্ট' দলগুলো তাদের সদস্য সংগ্রহ করত কালীপূজা করে। নানারূপ ক্রিয়া-প্রক্রিয়াও ছিল তার অঙ্গ—রক্তের ফোঁটা কপালে এঁকে মন্ত্র পড়ে সদস্যদের হত দীক্ষা। হয়তো তা হত কোনো কোনো দলে কোনো এককালে। আমি কিন্তু দলে যে গৃহীত হলাম তা ফোঁটা-চন্দন, পূজা-হোম কিছু করে নয়। কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনই ছিল না; প্রতিজ্ঞাপত্রেও সই করতে হয় নি, শপথও না। বরং এ কথাই একবার শুনেছিলাম বড়োদের মুখে, "অনুষ্ঠান দিয়ে মানুষকে বাঁধা যায় না। বন্ধন—স্বদেশপ্রীতির, নীতিবোধের, ধর্মবোধের।" হয়তো যে-বিশেষ দলে আমি অন্তর্ভুক্ত তাঁদেরই এটা বিশেষ মত ও বিশেষ নিয়ম। দলটা ছিল বরিশালের শঙ্কর মঠের সঙ্গে সংযুক্ত। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী তাঁর প্রতিষ্ঠাতা—'সরস্বতী প্রেস', 'সরস্বতী লাইব্রেরী' তাঁরই নামাঙ্কিত। ধর্মের ঝোঁক এ দলেও ছিল প্রবল, দেবদেবীতে অনাস্থা নেই, পূজা-হোমেও না। কিন্তু তাঁরা অদ্বৈতবাদী, তাই অনেক আনুষ্ঠানিক উৎকটতায় আস্থাহীন। কথাটা তাই এই—ওরূপ একান্ত সাম্প্রদায়িক দীক্ষা স্বদেশী দলে সর্বগ্রাহ্য বা সর্বত্র প্রচলিত ছিল না। বিপ্লববাদের ইতিহাস-লেখকদের সে কথাটা বলা উচিত। আলোচকদেরও জানা প্রয়োজন। অবশ্য, গীতার ওপর শ্রদ্ধা প্রচারিত হত; তা পাঠ ছিল বাধ্যতামূলক না হলেও প্রায় সর্বজনীন। বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও সেবাধর্মের সঙ্গে নব্যহিন্দুত্বের হাওয়াও প্রবল বইত।

স্বাস্থ্য, সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি চর্চার জন্ম আবার জোর দেওয়া হত ব্রহ্মচর্য, সদাচার, ভগবদভক্তির ওপর। 'সেক্যুলর' নয়, বরং একটু বেশি রকমেই হিন্দু-ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় কথাটাও সত্য: 'ডাকাতি' ও 'হত্যা' এই বিশেষ 'টেররিস্ট' পদ্ধতি বিপ্লবীদের পেয়ে বসেছিল। শুনেছি স্বয়ং অরবিন্দ প্রথম থেকে 'টেররিস্ট'-এর পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পি. মিত্র প্রভৃতি গোড়ার অনুশীলনবাদীরা তা চাইতেন না। পরে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। তবু কোনো কোনো দলের আদর্শ ছিল, গুপ্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হলে বিদ্রোহ ও গেরিলা যুদ্ধ। যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মত এ সম্বন্ধে ছিল সুদৃঢ়। নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তবু ডাকাতি গুপ্তহত্যা প্রভৃতির গ্রাসে গিয়ে পড়েছে কার্যপরম্পরায় স্বদেশী দলগুলো। বারবার তা থেকে নিবৃত্ত হতে চেয়েছে। কিছু দিনের মতো হয়েছে, আবার পথ না পেয়ে সেই পদ্ধতির শরণ নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু স্বদেশী গুপ্ত আন্দোলন সমগ্রভাবে কোনো কেন্দ্রীয় সমিতির দ্বারা চালিত হয় নি। এমনকি, শুধুমাত্র দুটি সমিতি—'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর'—তা চালিয়েছে, এমনও নয়। কাজেই কার্যধারায়ও ছিল বিভিন্নতা! দীর্ঘ ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বছরে পর্বে পর্বে তাদের পরিবর্তনও হয়েছে। সদস্য বদল হয়েছে। চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। আদর্শ বিবর্তিত হয়েছে। কার্যপদ্ধতিও একরূপ থাকে নি। 'রিভোল্যুশনারি ন্যাশনালিজম' থেকে সোশালিজম্-এর দিকেই এই বিবর্তন—মোটামুটি। কাজেই 'টেররিজম্' বললেও তার নীতির প্রতি সুবিচার হবে না। এ আন্দোলনের কথা বলতে হলে—বলা উচিত: 'জাতীয় বিপ্লববাদ', 'বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলন',—এরূপ কিছু বলা সমীচীন—'টেররিজম্' নয়।

কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের মতাদর্শ বা তার বিচার আপাতত নিষ্প্রয়োজন। সে আন্দোলনের কর্মধারারও সামগ্রিক বিশ্লেষণ এখানে অনভিপ্রেত। আর তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ দান তো আমার পক্ষে অসাধ্য। গুপ্ত সমিতির বীজ তার নিজের নিয়মেই সমিতির মধ্যেও থাকে চক্রে চক্রে সীমাবদ্ধ—একজনার কাজ অন্যজনা জানে না, আলাপ-আলোচনা নিকটতমদের মধ্যেও নিষিদ্ধ। এক সমিতিতে অন্য সমিতির কাজ জানবার কথা নয়। আমি ওসব দিক থেকে চুনোপুঁটি অথবা শুধু 'রোলিং স্টোন'। সেই গড়িয়ে-চলার পথে যেটুকু অভিজ্ঞতা তা সামান্য। আর তারও সেই অংশটুকুই উল্লেখযোগ্য যা এই রূপনারানের কূল ঘেঁষে গিয়েছে।

(৬) পুঁটিমাছের কথা

'বীর বাদলের' দেশোদ্ধার কিরূপ ছিল? যুদ্ধক্ষেত্রে যবন সেনানীর উদ্দেশ্য পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব আমার কাজ বিপ্লবী সাহিত্যে, বইপত্র রাখা। পড়ার ঘরে প্যাকিং বাক্সের আলমিরাতে দু-ভাই-এর পড়ার বই থাকত। সেখানে পাঠ্য বই-এর পিছনে ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতিও লুকিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলাম। এখন 'দেশের কথা', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি রাখতেই বা পারব না কেন? সেই ঘরেরই আরেক পাশে বাঁশের মাচায় আমাদের পরিচারকরা ঘুমোয়। এদিকের তক্তপোষে বসে আমরা পড়ি। ঘরের মাস্টার মশায় এলে পড়ান, বন্ধুবান্ধব এলে গল্পও করি—আলমিরারও তালা নেই এবং না থাকাই লোকের কৌতূহল উদ্রেকের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। 'দেশের কথা', ম্যাৎসিনি গ্যারিবল্ডীর জীবনী, সিরাজদ্দৌলা, স্কুল লাইব্রেরি থেকে আমারই চুরি-করা গেরিলা যুদ্ধের নানা বই, অরবিন্দের পত্র, পরে 'প্রবর্তক',—এমনি সব নানা বই সেখানে থাকত স্বচ্ছন্দে। সে-সব বইপত্র যাতায়াত করত নানা লোকের কাছে। তাদের আমার চেনা উচিত নয়, অনুমান করতে পারতাম। আরও পরে, বইপত্র রাখা এবং চালান দেওয়ায় যখন আমি অভিজ্ঞ, তখন বই-এর স্থানটা আরও একটু ভিন্ন রকমের জিনিস গ্রহণ করল। তাও চালাচালিতে আমাদের দু'ভাই-এর সাফল্য মন্দ দেখা যায় নি। সেই তালাহীন আলমিরার বই-এর পিছনে নির্বিবাদে যে-সব জিনিস স্থান পেয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি মশা'র পিস্তল—কাঠের বাঁট সুদ্ধ ও জিনিসটিকে সামলানো সহজ নয়। রডা কোম্পানিরই চোরাই মাল। কত পথ ডিঙিয়ে এসে আমার আলমিরায় পৌঁছে, এবং কতখানে বারে বারে দু-এক মাসের মতো ঘুরে এসে আবার সেখানেই বিশ্রাম করে—যতদিন পর্যন্ত কলেজের শিক্ষার ডাকে আমি নোয়াখালি ত্যাগ না করি ততদিন তা ছিল আমারই জিম্মায়।

প্রথম দিকেরই আরেকটা কথা বলা দরকার। যবন-সেনানীর আবির্ভাব অসম্ভব ছিল—তারা তখন ইউরোপে, মেসোপোতামিয়ায়। তারা যখন, মনে হয় সময়টা তখন ১৯১৫-এর শেষ—আমরা যখন স্বদেশীর তালিম দিচ্ছি আমার সে শহরের স্বদেশী দলের দোসররা যে-সব জিনিসের তখন তালিম দিচ্ছেন তা কম অর্থব্যঞ্জক নয়। ব্যায়াম, জিমনাষ্টিক, হাঁটার প্রতিযোগিতা, দৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সাইকেলের নানা রেস্—এসব তখন স্কুলে স্কুলে বেড়ে

যাচ্ছে। সৈনিকের গুণ চাই, সক্রিয় উদ্যোগ চাই, কষ্ট সহিষ্ণুতা চাই। বিভিন্ন স্কুলের দুরন্ত খেলোয়াড় ছেলের বন্ধুগোষ্ঠী নানারূপ দূর পাল্লার হাঁটায়, দৌড়ে, সাইকেল-চালনায় কী সূত্রে যে মেতে উঠছে তা কর্তারা না বুঝলেও আমাদের বুঝতে দেরি হয় নি—সম্ভবত পুলিশেরও না। সন্ধ্যার পরে যজ্ঞেশ্বর উপেন সাধু প্রভৃতির আমার প্রায় কাছাকাছি দু রকমের ছোট ছোট ঝাণ্ডা নিয়ে যে-সব ভঙ্গি করে তারই নাম স্কাউটিং—তাতে দূর সিগন্যালও হয়। আমিও দু-একটু শিখতে পেলাম। কিন্তু আমি তো আর সন্দীপে বা সমুদ্রের চরে গিয়ে ওসব নিয়ে অপেক্ষা করব না। বয়স নিতান্ত কম, শহর ছেড়ে আমরা দু'ভাই কখনো বাইরে যাই নি। কিন্তু সিগন্যাল যে না শিখলেই নয়—জাহাজ এসে যেতে আর দেরি নেই। কথাটা খুবই আভাসে বুঝতে হয়। কিন্তু উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা এত প্রচুর যে না বুঝে পারা যায় না। আসছে, আসছে, আসছে। তারপর অধীরতা দেখা দেয়—কবে আসছে, কই আসছে? তারপরে সংশয়—আসছে না যে! তবে কি আসছে না? শেষে আসবে না? বুড়ি বালামের তীরে সংঘর্ষটা শেষ হলে দিনে দিনে বোঝা গেল—না এলো না। ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রের জাহাজ-বোঝাই অস্ত্র দেশে পৌঁছল না—গোলমাল হয়ে গেল।

গোলমাল হয়েছে। 'স্বাধীন ভারত' জানাল—"না হতে তোমার বোধন জননী রাক্ষসে ভাঙিল মঙ্গল ঘট"—আবার বোধন চাই—তৈরি হও, তৈরি হও। আমাকেও বলা হল নতুন ছেলেদের দলে টেনে আনো—অন্য স্বদেশী দলেও অনেক ছেলে দেখছ তো। 'অন্য দল' কথাটা সেই প্রথম শুনলাম। তাই একটু বিস্মিত হলাম—একদল নয় স্বদেশীরাও?—যা নয় তা মেনে নিতেই হয়। আর মেনে নিয়ে দেখলাম—শহরে এমন যোগ্য ছেলে শতকরা আর ক'জন আছে যারা কোনো না কোনো স্বদেশী দলে ভুক্ত হয় নি—এমন ভালো ছাত্র, এমন চরিত্রবান্ যুবক, স্বাস্থ্যবান, এমন অবস্থাপন্ন—হাঁ, 'অবস্থাটাও' একটা বিশেষ গুণ—চোদ্দ থেকে চব্বিশের মধ্যে যাদের বয়স এমন যুবক আর ক'জন আছে? এ কথা বলার অর্থ নোয়াখালির মতো ঝিমন্ত কোণের এই পরিস্থিতি থেকে পূর্ব বাঙলার যুব-জগতের সেদিনকার (১৯১৫-১৯১৭) চিত্র সহজেই অনুমান-সাধ্য। 'চোখে পড়ে' এমন যুবক সেদিন সে-সব শহরে স্বদেশী দলের বাইরে থাকতে পারে নি। থেকেছে—পরিহার্য বিবেচিত হলে। অর্থাৎ মুসলমান হলে। হলে সরকারী বন্ধু

চাকরের ছেলে। কিম্বা সন্দেহভাজন বা চরিত্রহীন বলে নির্ভরের অযোগ্য। তা ছাড়া থেকেছে যদি আমার মতো অযোগ্য কেউ নেয় তাকে দলে টানার ভার। কারণ, একটি বন্ধুকে ছাড়া আমি সত্যই আর কাউকে স্বদেশীতে টেনেছি বলে নিজে মনে করি না। যারা এসেছে, এসেছে নিজের গরজে। গরজটা বন্ধুটিরই ছিল সমধিক।

একটা মজার গল্প এ প্রসঙ্গে বলতে পারি। বৈঠকখানার সান্ধ্য বৈঠকে অনেকের মতোই মাঝে-মাঝে আসতেন আমাদের প্রতিবেশী গোয়েন্দা ইনস্পেকট্‌র শরৎ দাস মশায়। এ-শহরে তিনি বদলি হয়ে এসেছিলেন কিছুকাল আগে। স্বদেশীর গল্পও বৈঠকখানায় উঠত তাঁর সামনে। সত্য ও সহজ উত্তরই তিনি দিতেন। জিজ্ঞাসা করেন সেদিন কেউ কেউ—"কেন ওরা (স্বদেশীরা) ডাকাতি করে?" শরৎবাবু বললেন, "না হলে টাকা পাবে কোথায়?" "টাকার কি দরকার?" "অর্গ্যানিজেশন-এ টাকা লাগে।" "অর্গ্যানিজেশনে এত কি লাগে?" "লাগে বইকি। ডাকাতি বা গুলি তো শুধু নয় সবখানেই গড়তে হয় অর্গ্যানিজেশন। সব খবর রাখতে হয়। সব খবর রাখেও। এই যে আমরা কথা বলছি তাও ওরা হয়তো জানতে পারবে।" আমি ঘরের একপ্রান্তে তখন লেখার নাম করে একটা খাতা নিয়ে বসেছিলাম। স্বদেশী কোথায় নেই সেদিন পূর্ব বাঙলায়?

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা কথার ও ঘটনার তালিকা না বাড়িয়ে মোদ্দা কথাটায় আসা যাক। সেটা প্রথম মহাযুদ্ধকালীন স্বদেশীর পর্ব—আমি তার চুনোপুঁটিও নই। কিছুকালের মধ্যেই বোঝা গেল—কলকাতার মোটর-ডাকাতি আর বালেশ্বরে যতীন মুখুজ্জের আত্মাহুতি থেকে শেষ কৃষ্ণনগরের ডাকাতি, আসাম-উত্তর ভারতের নানা বিদ্রোহ চেষ্টা থেকে ভবানীপুরে বসন্ত চ্যাটুজ্জের হত্যা পর্যন্ত, যে-সব অসমসাহসিকতার ও আয়োজনের ফলে দেশের লোক চমৎকৃত, তাতে জার্মান অস্ত্র নিয়ে জাহাজ এল না, সিপাহীরা এক-আধজনা প্রাণ দিল, কিন্তু দ্বিতীয় সিপাহী যুদ্ধও সম্ভব হল না। সে-সব ঘটনাসূত্রে কিন্তু যাঁরা সারা দেশের বিপ্লব আয়োজনের কর্মী, ছোটো-বড়ো-মাঝারি, তাঁরা আর কেউ বাইরে থাকছেন না। বিপ্লবের চেষ্টাটাও শেষ পর্যন্ত ঠেকছে গিয়ে সংগঠনরক্ষায়, ডাকাতিতে ও গুপ্তহত্যায়। তাতে কিছুই ঠেকানো যায় না—চাপা-পড়া উত্তেজনা তাই দিশা হারিয়ে দুঃসাহসেই খোঁজে আত্মতৃপ্তি। পুলিশের জালটা দেশের

উপর ছড়াতে ছড়াতে সে শহরের ওপর ছড়াতে তবু দেরি করছিল—ওখানকার যুবকেরা কলকাতায় ও অন্যত্র গেলে ধরা পড়ছে—কেউ কেউ তারা সেরা ছেলে, কেউ সম্মানিত সজ্জন—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বসু, ত্রিবেণী শূর ইত্যাদি। তারপর পুলিশের এক গুপ্তচর নিহত হল শহরের পথে একদিন শীতের সকালে। কেউ অবশ্য ধরা পড়ল না। কিন্তু ভারতরক্ষা আইনের জালটা এবার শহরেও ছড়িয়ে পড়ল। বড়োরা গেল—নগেন্দ্রবাবু, ক্ষিতীশ রায় চৌধুরী, প্রভৃতি। মেজরাও যে কতদিন ফাঁকি দিতে পারবে তা সন্দেহ। কয়মাস পরে একবার জানা গেল—যজ্ঞেশ্বর, উপেন, প্রভৃতিও পরদিন সকালেই জালবদ্ধ হবে, আমার ভাই-এরও নাম আছে সে তালিকায়। আমাকে নিয়ে প্রশ্ন ছিল না। আমি তখনো এত ছোট যে গুপ্তচরেরও চোখ পড়ে না। আর, বন্ধুদেরও এত স্নেহের যে, আমাকে সকল সন্দেহের বাইরে রাখতেই তাঁরা সযত্ন। যাক, উত্তেজনায় রাত কাটল। কিছু হল না। পরে শুনেছি—স্থানীয় গোয়েন্দার কর্তা সেই শরৎ দাস মশাই নাকি এজন্য দায়ী। তিনি উপরওয়ালা সাহেবকে বোঝালেন, "ওরা আমার চোখের ওপরে থাকে; সকাল-সন্ধ্যা চোখে-চোখে রাখতে পারি ওদের। কেন তাহলে ওদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা—ছেলেগুলো পড়াশুনায়ও ভালো।" এমন কাণ্ডজ্ঞান ও শুভবুদ্ধি যদি অন্য গোয়েন্দাগুরুদের থাকত তাহলে অনেক ভ্রান্তির হাত থেকে ইংরেজ সরকারও বাঁচত, দেশের মানুষও নিস্তার পেত। কারণ, ক'মাস পরেই মহাযুদ্ধের পর্ব শেষ হবার আগেই—আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের ছটফটানিতে কোনো ফায়দা নেই।

সেই মেজ-সেজরা পাশ করে একে একে চলে গেল কলেজে। আমিও একবৎসর পরেই এগিয়ে গেলাম। বই-অস্ত্র, জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বুঝলাম—ব্যস্ত হয়েই বা কি হবে? অনেক কাজ বাকী। গোড়ার কাজও হয় নি।

রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা ইঙ্গিত আবার মনে জাগতে লাগল। বিবেকানন্দের প্রেরণার আগুনে শুধু না জ্বলে তাতে প্রদীপ জ্বালানোর মতো সুযোগ রচিত করে দিতে চাইল কবির বাণী। 'প্রবাসী'র পাতা থেকে 'ছোট ও বড়' আর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এসে সেই পুরনো অনবলুপ্ত বোধকেই আরও জীইয়ে তুলল—"যারে তুমি নিচে

ফেলল সে তোমার বাঁধিবে যে নিচে" আর "রাক্ষসে মঙ্গল ঘট ভাঙবে" কি ?

'মঙ্গল ঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে'—

তারটা উঁচুতে হোক নিচুতে হোক, আরেক গ্রামে বাধা হচ্ছিল। যখন বাজবার দিন আবার এল, নন্ কো-অপরেশনের শেষ বেলায়, তখন তাতে সন্দেহ রইল না।

(চ) যজ্ঞেশ্বর দত্ত

'স্বদেশীর' প্রথম পর্বটা ওই স্কুলের সঙ্গেই শেষ। এই পাঠটা যাঁদের কাছে পেয়েছিলাম, যাঁদের সঙ্গে নিয়েছিলাম, ওই শহরের ও ওই বয়সের পরিধিতেই তাঁদের সঙ্গে পরিচয়। তবে অনেকের সঙ্গে পরিচয় বয়ে চলেছে পর্ব-পর্বান্তরে। যজ্ঞেশ্বরের কথা বলেছি ; অথবা বলা হয় নি। বেশি কথা তার সম্বন্ধে বলা দুর্ঘট। বললেও তাতে তাকে প্রকাশ করা হবে না। কারণ, সে স্বভাবেই অপ্রকাশিত। প্রকাশেই যে বিব্রত হয়, এমন মানুষ। নন্ কো-অপারেশন-এর ঝড়-ঝাপটার পরে বি-টি পাশ করে শিক্ষাব্রত নিয়ে সে আপনাকে সঁপে দিতে গিয়েছিল মনের মতো কাজে। গ্রামের স্কুল, ছাত্রদের সমাজসেবার আদর্শে সচেতন করতে, কৃষক-খাতকদের মধ্যে সমবায়-নীতির প্রবর্তনে, পল্লীমঙ্গলে। তারপর এল (১৯৩০) আইন-অমান্যের দোলা। আবার, তুলতে হল তার নোঙর, নিতে হল ছেঁড়া-পাল আন্দোলনের হাল সেই শহরে সে সময়ে। তারপর ? আমি তার খেই আর খুঁজে নিই নি। সে ফিরে গেছল তার শিক্ষকতার অজ্ঞাতবাসে, লোকহিতের অবিজ্ঞাপিত কাজে। সম্ভবত শিক্ষক কোথাও। অনেক তাঁর গুণ ছিল ; প্রধান গুণ প্রকাশে কুণ্ঠা। সব গুণের মতো তাঁর বিনয় নম্রতা—তাঁর দোষও হয়ে যায়। কর্তব্যবোধ যাঁর বেশি জাগ্রত, সে কেবলই দেখে কর্তব্য সম্পূর্ণ পালিত হচ্ছে না, আর এই বোধে নিজের কাছেই নিজে থাকে সে সঙ্কুচিত, অপরাধী। মনোবিবালকর শাস্ত্রে বোধহয় একেই বলে 'ম্যাসেসিজম্'। বলুক, ও নামে কাজ নেই। এ দেশের কর্মযোগীর নামহীন তালিকায় যদি এরূপ মানুষের সংখ্যা সামান্য হত তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্রোতটা—শুধু কাগজের পাতায় ফাঁপানো প্রচারিত নাম আর ঘটনার ফুঁ-দেওয়া ধোঁওয়া

সত্ত্বেও অজস্র বাধার মধ্যে প্রবাহিত হতে পারত না। যজ্ঞেশ্বর দত্ত সেই সংবাদপত্রের উপেক্ষিতদের দলে।

(ছ) নগেন্দ্র গুহরায়

যজ্ঞেশ্বর আমাকে দলের যে লোকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল তিনি অপরিচিত তখনো ছিলেন না, এখনো নন। তিনি সে শহরে সে দলের নেতা—আমারও প্রথম নেতা। মনে হয়, তাঁর যে-গুণ তা গুপ্ত সমিতির প্রয়োজনীয় গুণ নয়—প্রকাশ্য আন্দোলনের গুণ। ১৯৩৯ সনে পুরুলিয়ার একটি ছাত্র সম্মেলনে আমি গিয়েছিলাম। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন যিনি (তৎপূর্বে আমার অদেখা কিন্তু বহুশ্রুত) নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। বাঘা যতীন-এর পরে তিনিই ছিলেন দলের নেতৃত্বভার নিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে বললেন, "আমাদের কালে স্বদেশীতে মন্ত্রগোপনের চর্চা করতে হয়েছে, এখনকার দিনে চর্চা করতে হয় মন্ত্রপ্রচারের। দু-কালের দু-পদ্ধতি।" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রকাশ-ধর্মী মানুষ। সেই অপ্রকাশ্য দিনের কথা প্রকাশেও তিনি এদিনে কম যত্ন করেন নি। প্রকাশই তাঁর স্বধর্ম—লেখায়, বলায়। তাঁর মুখেই শুনেছি—স্বদেশীর দিনে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি যখন পূর্ববাঙলায় নিষিদ্ধ হয় তখন বোধহয় কর্তৃপক্ষের আয়োজনে শহরের গণ্যমান্তরা সে নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করতে সভা ডাকেন। সকলের সম্মানিত ছিলেন এক পণ্ডিত মহাশয়। তিনি ছাত্রদের বলেন, "কেউ মারা গেলে আমাদের দেশে ওরকম হরিধ্বনি দেয়। মা কি মারা গিয়েছেন যে তোমরা ওরকম 'বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং' ধ্বনি তুলবে!" নগেন্দ্রনাথ তখন তের-চৌদ্দ বৎসরের কিশোর। দলসুদ্ধ সভায় ছিলেন। দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে বললেন, পণ্ডিত মহাশয়ের উপদেশের পরেও—"সত্য কথা। আমাদের দেশ আমাদের মাতা। সে-মাতা আজ সত্যই মৃতা, বা মৃতকল্পা। তাই আমরা এই ধ্বনি দিচ্ছি—বন্দেমাতরং।" সাহস শুধু নয়। তুমুল কাণ্ড। সভার ভেতরে-বাইরে দুর্দান্ত ছেলেদের ধ্বনি উঠল 'বন্দেমাতরং'। প্রকাশ্যে সেই ঘোষণা থেকে নগেন্দ্রনাথের স্বদেশী-জীবনের সূচনা। কিশোর নগেন্দ্র অবশ্য তখন সরকারী বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন। কলকাতায় 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের গৃহে তিনি আশ্রয় পান। সেখানে তিনি ন্যাশনাল কলেজ থেকে লেখাপড়া করেন, পাশও করেন। আবার, সে গৃহেই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে,

তার পরে চন্দননগরের ('প্রবর্তকের') মতিলাল রায় মহাশয়দের সম্পর্কেও আসেন—সে-সব বিবরণ তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি তা লিখেছেনও। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধবার কিছু আগে নগেন্দ্রনাথ নিজের শহরে আবার ফিরে আসেন—সম্ভবত এ শহরের এই স্বদেশী দলের ভার তিনি পেয়েছিলেন। এখানে নতুন করে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি জুবিলী স্কুলের মাস্টার হলেন। কিছুদিন বাড়িতে আমাদের শিক্ষকও ছিলেন। কিন্তু তার আগেই আমরা সেই স্বদেশী দলে ঢুকেছি, তিনিও আমাদের নেতা। নগেন্দ্রবাবু প্রবীণ ভদ্রলোকদের ছিলেন স্নেহের পাত্র। সুদর্শন যুবক, পৌরুষব্যঞ্জক রূপ, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান, সকলের সঙ্গেই কথাবার্তায় সুপটু। সব থেকে বড়ো কথা—তিনি সুবক্তা, এবং সে-কথাটা তিনি জানেন, আর, তাই সেই সুযোগ বড় নষ্ট হতে দেন না। কিন্তু আর একটা কথা বুঝি আরও বড়ো—তিনি বাঙলায় সুলেখক, তাঁর দেশপ্রীতির মতো এইটাও তাঁর কম গর্বের বিষয় ছিল না। নগেন্দ্রবাবু সে বয়সেই গ্রন্থকার। দু-একখানা বই ('বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ') আমাদের সুপরিচিত। এমন মানুষের গুণমুগ্ধ হতে অসুবিধা হয় নি। অবশ্য বাঙলা রচনায় তিনি তখন রবীন্দ্র-বিরোধী, চলতি ভাষার বিরোধী। সাধু ভাষায়ও ঋজু অপেক্ষা আলঙ্কারিক রীতির ভক্ত। সেরূপ শব্দযোজনায়, সেরূপ পল্লবিত রচনায়, বক্তৃতাতে, বাগ্-বৈদগ্ধ্যে তিনি আমাদের মনোহরণ করেছিলেন। সে ভাষা প্রলুব্ধও করত। তবু সংশয় জুটত। বাড়ির ধারায় আমরা 'পাকা', অর্থাৎ রবীন্দ্রানুরাগী। আর দাদার শিক্ষায় আমরাও শুনতাম—ভাষার বাহাদুরীই লেখার শেষ কথা নয়, 'ধটু' বলেও একটা জিনিস দরকার। তাই মাঝে-মাঝে দোটানায় পড়তাম। আসলে এটা একই বিশিষ্ট প্রকৃতির দু'মুখী টান—স্বদেশীর টান ও সাহিত্যের টান। আমরা তার মাঝখানের জায়গাটায় দাঁড়াতে চাইতাম, কিন্তু তেরো-চোদ্দ বছরে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারব কেন? আর একটা দু'মুখী টানও তার সঙ্গে ছিল—তা সূক্ষ্মতর। একদিকে ভাবালুতার টান অন্য দিকে শিল্পরুচির টান। এ দু-টানের মধ্যে তাল রাখা চুয়ান্ন বছরেও কঠিন—চোদ্দতে তো দূরের কথা। যাই হোক, স্বদেশীয় ভাবালুতাতে নগেন্দ্রবাবুই নেতা—আর তাঁর অলঙ্কার-বিজড়িত লেখায় আমরা মুগ্ধ। আমরা দু-ভাই সাহিত্যানুরাগের জন্য নগেন্দ্রদা'র বিশেষ স্নেহ লাভ করেছিলাম। পরেও—আমার স্বদেশী-ভাবনা

আর নগেন্দ্রবাবুর স্বদেশী-কর্ম তখন বিভিন্নমুখী—আমি তাঁর স্নেহ পেয়েছি, আদর পেয়েছি, তাঁর গৃহে আতিথ্য উপভোগ করেছি। তাঁর সব কথা গ্রাহ্য করতে না পারলেও আমার বয়ঃকনিষ্ঠ কর্মীদের মতো তাঁর প্রতি আস্থা হারাই নি। নানা গুণের মানুষ হিসাবে তাঁর বিরোধিতা জেনেও তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতাম, আর বয়ঃকনিষ্ঠদের থেকে সেজন্য লাভ করতাম একটু সহাস্য ব্যঙ্গ। দোষ তাঁদেরও নয়। কিন্তু সত্যই অনেক গুণ ছিল নগেন্দ্র গুহের—আমার বিশ্বাস অবস্থার বৈগুণ্যেও যতটা সম্ভব তিনি তাঁর সার্থকতা সম্পাদন করেছেন। কিন্তু ঐ 'অবস্থার বৈগুণ্য'টাও বুঝবার মতো। যেমন, বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির যা প্রয়োজনীয় গুণ তা নগেন্দ্রদা'র বিশেষ ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি প্রকাশজীবী মানুষ। স্বাদেশিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তিনি ঠিক জায়গায় নিজের স্থান করতে পারতেন। যে-প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রাপ্য—তা স্বাভাবিক ভাবে আপন যোগ্যতায় অধিকৃত হত। কিন্তু গুপ্ত সমিতির কাজে তিনি কতটা সত্যই সফল তা আমার জানা নেই, বড়োরা জানতেন। দেখতাম, তাঁরা তত বড়ো বলতেন না। অবস্থার দ্বিতীয় বৈগুণ্য এই—স্বদেশীতে পোড় খেতে-খেতে জীবিকার দায়ে তাঁকে হতে হয় মোক্তার—যখন মোক্তারদের গৌরবের কাল অস্তমিত। অসহযোগে তবু তিনি এগিয়ে না গিয়ে স্থির হতে পারেন না; আইন-অমান্যেও এগিয়ে যান। সে-সব সূত্রে তাঁর প্রকাশধর্মী স্বভাব সত্যই মুক্তি পায় বেশি। নেতাদের মতোই তাঁর নাম তখন সুপ্রচারিত। তিনি তাই প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মোক্তারি ত্যাগ করে নামকর্মে ঘুরপাক খেতে লাগলেন। কিন্তু সেই ঘূর্ণীচক্রে একটা-না-একটা জীবিকা আশ্রয় না করেও যে দাঁড়াবেন এমন তাঁর আর্থিক সামর্থ্য নেই, সামাজিক সুবিধাও নেই। তাতে করেই অনেক চেষ্টায় এক-একটা সুযোগ তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়। অথচ সেইসব সুযোগ সীমাবদ্ধ, সুচিরস্থায়ীও নয়। তবু তারি মধ্যে তিনি নিজের স্বাভাবিক শক্তি ও উদ্যমের বলে কাজে ও লেখায় নিজেকে প্রকাশিত করতে পেরেছেন—চাপা পড়েন নি। ব্যক্তিগত প্রীতি-শ্রদ্ধার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নগেন্দ্রবাবু স্বদেশীতে আমার প্রথম নেতা—নগেন্দ্রবাবুর পুরুষকারও স্বীকার্য।

(ক্রমশ)

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের সমস্যা

"The greatest service that you can render to the communist cause is not to make an apology for it, but to criticize it frankly and truly."

Romain Rolland : I Shall Not Rest

ছোটবেলায় ছড়াতে পড়েছিলাম 'কাজের ছেলে' বাজার করতে বেরিয়েছিল "দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল, চিনিপাতা দৈ" কিনতে। পথের ঘটনাবৈচিত্র্যের আকর্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে সে যখন বাজারে এসে পৌছুল, তখন তার মুখে নিত্য-আওড়ানো তালিকাটি "দাদখানি বেল, মুসুরির তেল, সরিষার কৈ"—এই রূপ নিয়েছিল। বর্তমান চীন ও সোভিয়েতের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের হাতে পড়ে মার্কসবাদ তার তত্ত্বের কৌলীন্য হারিয়ে অনুরূপ বিকলাঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। নিজেদের দেশের অর্থনীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ও বিশ্বে শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের সংগ্রামের দীর্ঘ আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রম করতে করতে তাঁরা উভয়ই বিস্মৃত হয়েছেন মার্কসবাদের মূল উদ্দেশ্যের কথা।

তাই চীন-সোভিয়েতের পরস্পরের বিরুদ্ধে যে কুৎসা রটনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, তার সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক দিক তাদের নিজেদের সমর্থনে মার্কসের নামের ব্যবহার। পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের তাগিদে মার্কসের তত্ত্বকে যথেচ্ছভাবে দুমড়ে-মুচড়ে ব্যবহার করা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শের প্রতি সবচেয়ে বড় অপরাধ।

মার্কসীয় তত্ত্বের অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের এই জাতীয় সুযোগ দানে মার্কস ও এঙ্গেলস্ স্বয়ং বোধহয় কিছু অংশে দায়িত্বভাগী। তাঁদের জীবিতকালে মার্কস ও এঙ্গেলসকে নানা ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লেখনী-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। ভাববাদী দর্শন, যান্ত্রিক বস্তুবাদ, সুবিধাবাদ,

নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি তদানীন্তন ইউরোপীয় চিন্তাগজতের ভিন্নধর্মী ও অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী, প্রবণতার বিরুদ্ধে লিখতে হয়েছিল। ফলে তাঁদের কোনো কোনো রাজনৈতিক রচনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশেষ কোনো মত খণ্ডন করার প্রয়োজনে মার্কসীয় তত্ত্বের কোনো বিশেষ দিকের উপরই সম্পূর্ণ জোর গিয়ে পড়েছে, অন্যান্য দিকগুলি অবহেলিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে ব্লখ্ (Bloch)-কে লিখিত এঙ্গেল্সের পত্রের সেই বিখ্যাত অংশটি উল্লেখযোগ্য : "তরুণ লেখকেরা কখনও কখনও (ঐতিহাসিক বস্তুবাদের) অর্থনৈতিক দিকের উপর যতখানি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তার থেকে অনেক বেশি মাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ; এর জন্য মার্কস এবং আমি অংশত দোষী। আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয়রা, যাঁরা এদিকটি অস্বীকার করতেন, তাঁদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা এই মূল তত্ত্বটির উপর জোর দিতে বাধ্য হই। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, গতি-প্রকৃতির মধ্যে আরও যে-সব তাত্ত্বিক উপাদান জড়িত রয়েছে, সেগুলিকে যথোপযুক্ত সম্মান দেবার স্থান, কাল বা অবকাশ সব সময় আমরা পাই নি।" (১৮৯০)

তাই সাময়িক প্রয়োজনে যে-সব লেখা রচিত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে নিজেদের সুবিধা অনুসারে কিছু বাক্য উদ্ধৃত করে সেগুলিকে বিশুদ্ধ মার্কসবাদের 'ট্রেড-মার্ক' হিসেবে ব্যবহারে আত্মপ্রসাদ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো, মার্কসীয় তত্ত্বের অসম্পূর্ণ ও বিকৃত উপলব্ধিরই তুল্য হবে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রতি যুগে পুনরাবৃত্ত ভ্রান্তির বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে যদি মনে রাখা যায় যে মার্কসবাদ মূলত একটি প্রয়োগ-প্রণালী যার ভিত্তি বস্তুবাদ-বিশ্বাস ও দ্বান্দ্বিক-রীতি। বস্তুর ক্রমবিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি মানব ও সেই মানব ইতিহাসে এ পদ্ধতি নিয়োগ করেই মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করে দেখতে পান যে, সে সমাজে মানুষের মানবীয় সত্তা সম্পূর্ণ অবলুপ্তির পথে, বা মার্কস-ব্যবহৃত পরিভাষায় বলা চলে, সে সমাজে মানুষ তার প্রকৃতির অন্তর্নিহিত চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন (estranged)। এই সত্তার অবলুপ্তি বা বিচ্ছিন্নতার সর্বচেয়ে চরম ও পরিপূর্ণ রূপ শ্রমজীবীশ্রেণীতে। তাই তারাই

ধনতান্ত্রিক সমাজের সকল স্তরের অত্যাচারিত মনুষ্যজাতির প্রতিমূর্তি এবং তাদের বন্ধন-মোচনেই বিশ্বমানবের মুক্তি। এই কারণেই মার্কসের তত্ত্বে শ্রমজীবী আন্দোলনের পথনির্দেশ এবং তাঁর কর্মে তার সংগঠন, এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে রয়েছে।

এর সূত্র ধরে মার্কস সমসাময়িক সমাজ, অর্থনীতি, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য—এক কথায় মানুষের সৃষ্টির সমগ্র জগৎ প্রসঙ্গে ক্রমবিকাশের কয়েকটি নিয়মের ইঙ্গিত মাত্র করে গিয়েছিলেন, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তাঁর মতে, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তি-মানবের মুক্তি ও সৃজনক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মূল চরিত্র তাই মানবতাবাদী।

মার্কসবাদের প্রয়োগক্ষেত্র বিস্তীর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান ও ক্রমপরিবর্তনীয়। তাই মার্কস তাঁর যুগে যে সকল ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগ করেছিলেন তার অনেকগুলিই আজ আরও ব্যাপকতর হয়ে উঠছে, অনেকগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আরও নিত্য-নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। ফলে মার্কসের কিছু সিদ্ধান্তকে প্রসারিত করার সুযোগ এসেছে, নতুন পরিস্থিতি উদ্ভাবনার ফলে কিছুর পরিহার বাঞ্ছনীয় এবং অন্যান্য অবহেলিত ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। মার্কসবাদের ক্রমবিকাশ এই ভাবেই সম্ভব।

দুর্ভাগ্যবশত মার্কসবাদের এই বিকাশশীল চরিত্রটি সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে যথোপযুক্ত সম্মান পায় নি। সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে এ তত্ত্বের বিশেষ কয়েকটি অংশের উপর এতকাল ধরে জোর দিয়ে আসা হয়েছে। ফলে মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের গতিটা হয়েছে সমতাবিহীন।

মনে রাখা দরকার যে মার্কসবাদ একটি সামগ্রিক জীবন-দর্শন। সুনিপুণ হাতে বোনা বস্ত্রের মতো তার প্রতিটি গ্রন্থি পরস্পরের সঙ্গে বয়ন করা। এ সত্যটি বিস্মৃত হয়ে ক্রমাগত একটি গ্রন্থির উপর যদি অত্যধিক চাপ দেওয়া হয়, তাহলে বাকিগুলির সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হবে এবং মার্কসবাদ বিদীর্ণ বস্ত্ররূপে দরিদ্রবুদ্ধির বসন হয়ে দাঁড়াবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদের প্রয়োগ

এ অসম ক্রমবিকাশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদের প্রয়োগের অভিজ্ঞতা। সে দেশে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষায় প্রতিটি

সাফল্য বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদীদের যেমন উৎসাহিত করেছে ঠিক তেমনই তার যাত্রাপথের পদস্খলন তাদের মর্মাহত ও বিভ্রান্ত করেছে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির গত বিংশতিতম কংগ্রেসে এই বিচ্যুতি প্রসঙ্গে আত্মসমালোচনার ও ত্রুটি-সংশোধনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সমালোচনার কায়দা ও সংশোধনের পদ্ধতি লক্ষ্য করে তখনই সন্দেহ হয়েছিল সমস্যাটার প্রবেশদ্বারের অর্গলে এখনও আঘাত পড়ে নি। সেই কংগ্রেসের পর আরও কয়েক বৎসর কেটে গেছে এবং পরবর্তী কয়েকটি ঘটনা প্রারম্ভিক সন্দেহকে ক্রমশই বলবতী করছে।

প্রতিটি সমাজেই মানুষের অগ্রগতি বা অধোগতির সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় মার্কসবাদীরা সর্বপ্রথমেই তার রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিগত যুগের অনাচারের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে দেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দ মাত্র একজন নেতার স্বৈরতান্ত্রিক আচরণকেই লক্ষ্যবস্তু করে আত্মসন্তুষ্ট হয়েছেন। সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার কতখানি দায়িত্ব ছিল, সে জটিল অথচ প্রয়োজনীয় সমস্যার আলোচনায় আজ পর্যন্ত সাহসী হতে পারেন নি।

হলে হয়তো অতীতের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নের অসম্পূর্ণতা বহুলাংশে পূরণ হত এবং বর্তমানের বিভ্রান্তিকর অসঙ্গতির কিছুটা অবসান হত। কারণ সোভিয়েতের দুঃখজনক বিচ্যুতির নেপথ্যে ধনতন্ত্রের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের দায়িত্বকে এবং অন্যান্য বহিঃস্থ কারণগুলিকে লাঘব না করেও, আজ স্বীকার করতে হবে যে, অতীতের অগণতান্ত্রিক আচরণবিধির এবং বর্তমানের বৈকল্যের একটা প্রধান সূত্র রয়ে গেছে সে'দেশের সমাজব্যবস্থার কাঠামোর কোনো এক কীটদষ্ট ছিদ্রে। বিচার করলে দেখা যাবে যে, এ-সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে মার্কসবাদের প্রয়োগকালে তার তত্ত্বের কিছু অংশের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ এবং কিছুর প্রতি প্রায় সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য—এই অসমতল ভিত্তির উপর। এরই ফলে অতীতে সোভিয়েত সমাজের অসামান্য অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অসহনশীলতার রক্তাক্ত প্রকাশ আমাদের সংশয়গ্রস্ত করেছিল। আজও ক্রুশ্চেভের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি যেমন বিশ্বের মানবতাবাদীদের সমাদর লাভ করেছে, ঠিক তেমনই স্বদেশে নিঃস্তালিনিকরণের উগ্র তাণ্ডব ও শিল্পী সাহিত্যিকদের স্বাধীন মত প্রকাশে অশালীন ও উদ্ধত হস্তক্ষেপ মার্কসবাদীদের বিমূঢ় করেছে।

রাশিয়ায় মার্কসবাদের অসঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োগের শুরু সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গোড়া থেকেই। মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট লীগ ও পরবর্তী যুগে ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে যে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, রাশিয়াতে মার্কসবাদী সংগঠন স্থাপনের সংগ্রামে ও তার গণতন্ত্র রচনায় সে দৃষ্টিভঙ্গি নানা কারণে সম্ভব হয় নি। নিঃসন্দেহে প্রাগ্-বিপ্লবকালীন রাশিয়ায় জারতন্ত্রের একনায়কত্বের জন্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে একটা গুপ্ত-ষাড়যান্ত্রিক চরিত্র নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু এই চরিত্রকেই আদর্শরূপে বজায় রাখবার প্রচেষ্টায় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব কম নয়। লেনিনের নেতৃত্বে যে সম্পূর্ণ 'নতুন ধরনের দল' তৈরি হয়েছিল, সেই বলশেভিক পার্টির ভিতর অনমনীয় অনুশাসনের ফলে মার্কসবাদের মূল মানবতাবাদী দিকটি এবং ব্যক্তিমানবের অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ক্রমশই অবহেলিত হতে হতে পরবর্তী যুগে প্রায় অবলুপ্তির শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার উৎসাহে ও ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার রূপে পার্টিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাকে কেন্দ্রীকরণের শৃঙ্খলায় শক্ত করতে গিয়ে রুশ মার্কসবাদীরা বিস্মৃত হয়েছিলেন 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র সেই কথাগুলি: "বর্তমানের আন্দোলনেও কমিউনিস্টরা সে আন্দোলনের ভবিষ্যৎকে প্রতিফলিত এবং তার তত্ত্বাবধান করে।"

লেনিনের উগ্র অতি-কেন্দ্রীকরণের বিপদ সম্বন্ধে রুশ বিপ্লবেরও বহু পূর্বে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী রোজা লুক্সেমবুর্গ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বলশেভিক পার্টির সদ্যপ্রস্তুত গঠনপ্রণালীর তিনি বিরোধিতা করেছিলেন ১৯০৪ সালে 'ইস্ক্রা'তে প্রকাশিত 'রুশ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সাংগঠনিক প্রশ্নাবলী' প্রবন্ধে: "Nothing will more surely enslave a young labour movement to an intellectual elite hungry for power than this bureaucratic strait-jacket, which will immobilize the movement and turn it into an automaton manipulated by a Central Committee," গত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত করেছে।

রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পর রোজা লুক্সেমবুর্গ তাকে উচ্ছ্বসিত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের পূর্বে থেকেই মার্কসীয় তত্ত্বের যে বিকৃত ও

অসমঞ্জস প্রয়োগপ্রণালী রাশিয়ায় শুরু হয়েছিল, সেই প্রবণতারই জের বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধিত হতে দেখে তিনি পুনরায় তার বিরোধিতা করতে বাধ্য হন। কোনো অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের সমৃদ্ধিশীল ও সুখী সাম্যবাদ রচনার কল্পনায় বিভোর হয়ে আপাতত সমস্ত মানবিক স্বাধিকারের প্রশ্ন মুলতুবী রেখে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগের প্রয়োজনের জন্য তদানীন্তন রুশ নেতৃবৃন্দ যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, তা তিনি মানতে পারেন নি। ১৯১৭/১৮ সালে জার্মান কারাগারে বসে রোজা লুক্সেমবুর্গ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক অধিকার বিলোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন: "But socialist democracy is not something which begins only in the promised land after the foundations of socialist economy are created; it does not come as some sort of Christmas present for the worthy people who, in the interim, have loyally supported a handful of socialist dictators. Socialist democracy begins simultaneously with the beginnings of the destruction of the class rule and of the construction of socialism." (*The Russian Revolution*)

মৃত্যুর পূর্বে লেনিন উপলব্ধি করেছিলেন রাশিয়ায় মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগের অসম্পূর্ণতা ও অসুবিধার কথা। তাঁর শেষ লেখায় এইজন্য বার বার উল্লিখিত হয়েছে পার্টি আমলাতন্ত্রের ঘনায়মান বিপদের কথা, অনগ্রসর রাশিয়ায় বিপ্লবের ফলশ্রুতি রক্ষার সমস্যা ও শ্রমজীবী সাধারণকে নিজস্ব চিন্তাশক্তির উন্মেষের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত করার কর্তব্য।

বিপ্লবের পূর্বে মার্কসবাদকে যেমন কেবলমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দর্শনরূপেই ব্যবহার করা হয়েছিল, বিপ্লবের পরে তাকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রচনার হাতিয়ার হিসেবে দেখা হতে লাগল। রাশিয়ার পশ্চাদ্বর্তী অর্থনীতিকে দ্রুতবেগে উন্নত করে ধনতান্ত্রিক শিবিরের অর্থনৈতিক শক্তিকে অতিক্রম করার প্রয়োজনের দিকে সমস্ত দৃষ্টি গিয়ে কেন্দ্রীভূত হল। আজও এ দৌড়-প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে নি। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদ মূলত একটি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানরূপেই বেশি স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। মার্কসবাদের সর্বব্যাপী দর্শনের অন্যান্য দিকগুলি অপেক্ষাকৃত অবহেলিত।

মানবীয় কর্মশক্তি : উপায় না অভিপ্রায় ?

জীবনের প্রারম্ভে রচিত 'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপিতে' মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগে বলেছিলেন, মানুষের কর্মক্ষমতাকে কেবল তার জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার উপায়রূপে ব্যবহার করা হয়। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর শেষ জীবনের লেখা 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডে মার্কস যে সাম্যবাদী সমাজের কথা বলেছিলেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে এই— কর্মদক্ষতাকে নিছক উপায়ের স্তর থেকে উন্নীত করে তাকে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের লক্ষ্যে পৌছে দেওয়া। ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে শ্রমশক্তি যে দীর্ঘ সময়ব্যাপী ব্যয়িত হয়, সেই সময়কাল সংক্ষেপিত করতে পারলেই এই কর্মশক্তির স্বাধীন প্রসার সম্ভব।

দুর্ভাগ্যবশত সোভিয়েত ইউনিয়নে আজও জনসাধারণের কর্মশক্তিকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রাচুর্যলাভের পন্থা হিসেবেই ব্যবহৃত করা হচ্ছে। এই প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে সোভিয়েতের মানুষ তার চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলি বিকশিত করার সুযোগ কবে পাবে, সে বিষয়েও আজ সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ দ্বিধাগ্রস্ত। সম্প্রতি 'প্রাভদা' দাবি করেছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেই ঐতিহাসিক মন্ত্র "each according to his needs" আজ অতীতাশ্রয়ী অপ্রচলিত। সুতরাং জনসাধারণকে শেখাতে হবে শক্তিশালী যন্ত্র-সমৃদ্ধ ভিত্তি স্থাপনের জন্য তাদের সম্পূর্ণ কর্মশক্তি নিয়োগ করতে। (স্টেট্‌স্‌ম্যান, আগস্ট ২৫, ১৯৬৩)

অথচ মার্কস যে সমাজতন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তা শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনের পরাকাষ্ঠার চিত্র নয়। সে-সমাজতন্ত্রের মানুষ তার সমস্ত মানবীয় দিকের পূর্ণ প্রসারের সুযোগ পাবে, যে-সুযোগ থেকে সে ধনতন্ত্রে বঞ্চিত। পাশ্চাত্ত্য সমাজের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যে পরিপুষ্ট মানুষের থেকে সমাজতন্ত্রের মানুষের পার্থক্য এইখানেই। নিজস্ব মোটরগাড়ি বা ঘরে টেলিভিশন আনার ক্ষমতা অর্জনই যদি সমাজতান্ত্রিক মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বিশ বৎসর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের সঙ্গে কি তার কোনো মানসিক মৌলিক তফাৎ থাকবে ?

মার্কসবাদের মূল উদ্দেশ্য শ্রমজীবীদের আর্থিক উন্নতি সাধন—এই জাতীয় একটা অতিসরলীকরণের চিন্তা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ক্রমশই স্থান পাচ্ছে। এর ফলে, ইংলণ্ডে 'ওয়েলফেয়ার স্টেট্' বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'জনগণের ধনতন্ত্র'

ইত্যাদির নামে শ্রমজীবীদের একটা অংশকে কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছল্যের পরিবেশে যখন এনে দেওয়া হয়, আমরা তখন সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে এর তুলনা করে কেবল একটা কথারই পুনরাবৃত্তি করি। বলি যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এ স্বচ্ছলতা চিরস্থায়ী হবে না, তার অর্থনৈতিক সংকট আসন্ন। ভুলে যাই যে ধনতন্ত্রের স্বল্প-সংখ্যার অস্থায়ী স্বাচ্ছল্যের সঙ্গে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের পার্থক্য আরও মৌলিক। ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের উদ্দেশ্য শ্রমজীবী সমাজের কিছুকে আর্থিক প্রাচুর্যের উৎকোচ দিয়ে আত্মসন্তুষ্ট ও চিন্তাশূন্য করে রাখা। অপর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীদের চিন্তাশক্তির উন্মেষ সাধন ও তাদের মানবীয় অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

বোধহয় এই কর্তব্যে গত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরাঙ্মুখ হবার ফলেই আজ প্রকট হয়ে উঠেছে সোবিয়েত ইউনিয়নে এক জাতীয় নির্মননশীল অর্থ-উপার্জনসর্বস্ব মানসিকতা। অর্থনৈতিক উন্নয়নে একাগ্রতার ফলে নিঃসন্দেহে সে দেশে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ঘুচেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্যাতিত জাতির বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের নতুন মানুষ, যে মানুষ মার্কসের ভাষায়, "সম্পত্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব মানবীয় সত্তাকে ফিরে পাবে" (*Economic and Philosophic Manuscripts*, 1844), সে মানুষের আবির্ভাবের সাড়া কোথায়?

বিস্মিত ও ব্যথিত হই যখন দেখি আধুনিক চিন্তাজগতের বিতর্কমূলক সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে, এ দেশের নিকৃষ্ট হিন্দী চলচ্চিত্র দেখে সোভিয়েত জনসাধারণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। স্পুটনিকের উর্ধ্বাকাশ যাত্রার গুরুত্বকে লাঘব না করেও ভেবে দেখা দরকার ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গের প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থটি: "Is it really more important to reach the moon than to understand the heart of the man living in the next street?" ব্যক্তিমানবের বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষণ এবং তাকে নিজস্ব চিন্তার ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাই স্তালিন-পূজা, নিঃস্তালিনিকরণ এবং বর্তমানের ক্রুশ্চভ-প্রশস্তি—এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের জটিল আবর্তে সোভিয়েতের মানুষের প্রতিক্রিয়া এক চিন্তাশূন্য নীরবতার আড়ালে আত্মগোপন করে

রইল, সরকারী অনুমোদিত পথে, যখন যেদিকে স্রোত বইছে, তাতে গা ভাসিয়ে দেওয়া তাই এত সহজ।

আসলে মার্কস্‌বাদের দুর্ভাগ্য যে অনগ্রসর মানসিকতাসম্পন্ন জনসাধারণের কাছে তাকে সহজবোধ্য করার অভিপ্রায়ে এই বিদগ্ধ চিন্তা-প্রসূত তত্ত্বটিকে অতিসরলীকরণ করতে হয়েছে। ফলে মার্কসবাদের এই শিশুপাঠ্য তরলীকৃত সংস্করণ, তার সমালোচদের কাছে কুসংস্কার এবং সমর্থকদের কাছে জপমালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোভাব, দিয়ে বাস্তবের বিচার তাই আজও অনুপস্থিত।

জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিকতাবোধ

মার্কসবাদের অসম ক্রমবিকাশে সর্বাধিক পীড়িত হয়েছে, গত অর্ধশতাব্দীকাল-ব্যাপী, মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকটি।

ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর মধ্যে মরুদ্যানের মতো একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকাশ নানা ধরনের জটিল ও নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল যার সঙ্গে জড়িত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রয়োজনের সংঘাত। যতই বলা হোক না কেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থরক্ষাই বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবে, এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, অনেক সময়ই আমরা যাকে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে বিরাট অবদান বা পদক্ষেপ বলে অভিনন্দন জানিয়েছি, তা অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় সাময়িক নীতি-কৌশল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

গত যুদ্ধের পূর্বে নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তি এই জাতীয় একটি কূটনৈতিক কৌশল মাত্র। অথচ সোভিয়েত-জার্মান সম্পর্কের আঁকা-বাঁকা গতির সঙ্গে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিরা তাল রেখে নিজেদের নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে নিজেদের দেশের জন-আন্দোলনের গতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়েও, সোভিয়েত রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রয়োজন থেকে বিশ্বের এবং নিজেদের দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার দরকার ছিল। মনে রাখা আবশ্যক, সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন্ পদক্ষেপ বাস্তবিকই বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে সাহায্যকারী এবং কোন্‌টি তার নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে সাময়িক নীতি-কৌশল মাত্র।

কারণ, সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদী বহিঃশত্রু এবং আত্মঘাতী প্রতিবিপ্লবীদের হাত থেকে বাঁচাবার কর্তব্যে রুশ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র বিশ্বের শ্রমজীবী সমাজের বিপ্লবের ভরসায় স্বভাবতঃই অপেক্ষা করতে পারেন নি; ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আপস-নিষ্পত্তি করতে বাধ্য হয়েছেন।

জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে সোভিয়েতের এই জাতীয় কৌশল অবলম্বন সম্বন্ধে কারুর কোনো আপত্তি থাকত না। কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন, কমিণ্টার্ণ এবং কমিন্‌ফর্মে, নিজেদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে রুশ নেতৃবৃন্দ এই সব কৌশল বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর চাপিয়ে দিয়ে অন্যদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিকে নিজেদের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনানুসারে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মার্কস্‌বাদী সংগঠনকে নানা সময় কি ভাবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রে পরিণত করা হয়েছিল, তার আংশিক স্বীকৃতি ক্রুশ্চভের বিংশতিতম কংগ্রেসের বক্তৃতায় আছে।

এর থেকে বার বার এইটেই প্রমাণিত হয় যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেতৃত্বের নির্দেশের প্রতি সরল বিশ্বাসের উপরই সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে এসেছে। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে যুক্তি-নির্ভরশীল সূক্ষ্মদর্শী বিচারক্ষমতাকে কোনোদিনই উৎসাহিত করা হয় নি।

এ অবস্থার অবসান আজও হয়েছে কিনা সন্দেহ। হলে চীন-সোভিয়েতের নিছক জাতীয় স্বার্থ ও ক্ষমতার লড়াইকে উপলক্ষ করে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এত দ্রুত ও উগ্রভাবে যে যার প্রয়োজন মতো দুই দেশের যে কোনো একটি নেতৃত্বকে অমোঘ সত্যরূপে বেছে নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে পারত না।

চীন-সোভিয়েত বিরোধ

আবেগমুক্ত হয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, আন্তর্জাতিকাবাদ-বিরোধী যে জের সোভিয়েত নীতিতে গত চল্লিশ বৎসরে নানা সময় প্রতিফলিত হয়েছিল, তারই চরম পরিণতি আজ পাওয়া যাচ্ছে চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টির আচার-ব্যবহারে।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যে-রকম রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ ও

আন্তর্জাতিকতাবোধের পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, চীনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থানের ফলে, দুই দেশের অসম রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ ও তাদের দুই ধরনের প্রয়োজন, চীন ও সোভিয়েতের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন ও জটিলতর সমস্যার জন্ম দিয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিকতাবাদের মার্কসীয় ভিত্তিতে কমিণ্টার্নের যুগ থেকে যে চিড় ধরতে শুরু করেছিল, আজ তা ক্রমবিস্তীর্ণ ফাটলের রূপ নিচ্ছে।

ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে যে, সোবিয়েতের বিরুদ্ধে চীনের অভিযোগ মূলত জাতীয় স্বার্থসম্বন্ধীয়। চীনের অর্থনীতি ও শিল্প-উন্নয়নের কাজে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যদানের গতিতে ভাঁটা পড়ার বিরুদ্ধে চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিবাদমুখর। বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিচালনা-পদ্ধতি নিয়ে চৈনিক পার্টির যে জঙ্গীবাদী তত্ত্ব, তারও পটভূমিকায় রয়েছে স্বদেশ সম্বন্ধে চীনের জাত্যাভিমান, এবং বহির্বিশ্বের ঘটনার গতির সঙ্গে নিজের বিচ্ছিন্নতা। আর পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে চৈনিক মনোভাবও বোধগম্য। যে-পৃথিবীতে ক্ষমতা বিচারের মাপকাঠি পারমাণবিক শক্তির অধিকার ভোগ, যে-যুগে নিজের স্বার্থানুযায়ী কার্য হাসিল করা যায় পারমাণবিক শক্তির ভয় দেখিয়ে, সে পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ শক্তির হাতে পারমাণবিক অস্ত্রের একচেটিয়া কেন্দ্রীকরণকে কোনো ক্ষুদ্র শক্তিই সন্তুষ্টির চোখে দেখতে পারে না।

এই বিরোধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিষ্পাপ বলিরূপে চুনকাম করার যে চেষ্টা চলছে, তা কোন মতেই সমর্থনীয় নয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থে বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে যে-ভাবে দুমড়ে-মুচড়ে ব্যবহার করেছে, সে কলঙ্কময় ইতিহাসের ঘা আজও শুকোয় নি। এ-ইতিহাসের নায়কেরা হয় মৃত নয় পদচ্যুত। কিন্তু ভোলা কঠিন, বর্তমানে যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন, এঁরা সেই বিগত যুগের স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্বের হয় সক্রিয় অনুচর ছিলেন কিংবা নীরব দর্শক ছিলেন। সুতরাং আজ যদি এ নেতৃবৃন্দকে কেউ অবিশ্বাসের চোখে দেখে তাহলে সে সন্দেহশীলতা বোধহয় কিছুটা মার্জনীয়।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে এই দুর্ভাগ্যজনক সন্দেহ দূর করার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে বলে মনে হয় না। বর্তমান নেতৃত্ব স্তালিন যুগের রক্তাক্ত পদ্ধতির অবসান ঘটানোয় ইঙ্গিত দিলেও, অসহনশীলতার প্রবণতা আজও রয়ে গেছে। তাই নিজেদের নীতির সঙ্গে

কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গুরুতর মতপার্থক্য ঘটলেই, দেখা যায় সে দেশের প্রতি সোভিয়েত সাহায্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পুরনো প্রতিশ্রুতি বিস্মৃতির গহ্বরে চলে যাচ্ছে।

গত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু নীতি সম্বন্ধে সন্দেহকে, বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্টরা গোপন করে রেখেছিল, পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে চোখের মণির মতো রক্ষা ও সমর্থনের পবিত্র কর্তব্য পালনের প্রয়োজনে। এই নীরবতা রচনার পরিকল্পনার ফলে বহু অনাচার ঘটার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। সুতরাং আজ সেই পুরাতন ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করে যাতে ভবিষ্যত অনাচার না ডেকে আনি, তারই জন্য সতর্ক হয়ে সমালোচনা করার সৎসাহস প্রত্যেক কমিউনিস্টের প্রয়োজন।

বিংশতিতম কংগ্রেসের পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে, প্রাথমিক মোহভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার পর, একটা সতেজ আবহাওয়া ও পরিণত চিন্তাশক্তির প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। সোভিয়েত পার্টির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র নীতি গ্রহণ, মার্কসবাদের পুনর্মূল্যায়ন এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগের দিকে প্রবণতা এবং অনেকক্ষেত্রে সোভিয়েত পার্টির ভ্রান্তির বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর এই যে সুযোগ পেয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশত চৈনিক নীতি সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। চীনের মতান্ধতা, বিবাদপ্রিয়তা এবং সর্বোপরি স্তালিন-যুগীয় অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যাগমনের প্রবণতা, বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে আবার সোভিয়েত পার্টির অন্ধ সমর্থনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। রুশ বিপ্লবের সম্যক মূল্যায়ন এবং সোভিয়েত নীতির আবেগমুক্ত বিচারের যে কাজ শুরু হয়েছিল, তা অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেল।

সুতরাং বর্তমানের প্রাথমিক কর্তব্য, কোনো পক্ষের কাছেই বিবেকটা দস্তখত করে না দিয়ে, মার্কসীয় আদর্শের পূর্ণ উপলব্ধি। এবং এ কাজে সবচেয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আশা করা যেতে পারে মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের কাছ থেকেই। বাম বা ডানের প্রতি হেলা বক্ররেখার ভিড়ের মধ্যে সোজা শিরদাঁড়া নিয়ে হাঁটতে সাহসের প্রয়োজন। এ দুঃসাহসিক অভিযানের মন্ত্র হোক দান্তের সেই কথাগুলি, যার উদ্ধৃতি দিয়ে কার্ল মার্কস শেষ করেছিলেন তাঁর 'ক্যাপিটাল'-এর ভূমিকা :

"Segui il tuo corso, e lascia dir le genti." (লোকে যা-ই বলুক, নিজের পথ অনুসরণ কর)।

সুজয় মিত্র

মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের সমস্যা : অন্য মত

সুমন্তবাবু তাঁর প্রবন্ধে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীতের এবং বর্তমানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় যে কোনো রকম গুরুবাদ চলতে পারে না, কোনো বিশেষ পার্টি বা নেতার নির্দেশ যে মার্কসবাদের শেষ কথা নয়, এ-বিষয় আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু তবু সুমন্তবাবুর অনেক সিদ্ধান্ত এবং উক্তি আমার গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না, এমনকি রীতিমতো বিস্ময়কর লেগেছে। তাঁর প্রবন্ধ পড়ে আমার যা মনে হয়েছে তা সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করছি।

মার্কসীয় তত্ত্বের কৌলীন্য হরণ

সুমন্তবাবুর মতে, "অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের" (যাঁদের মধ্যে তিনি সোভিয়েত, চীন, এবং বোধহয় অতীতের ও বর্তমানের বেশির ভাগ কমিউনিস্ট নেতাদের ফেলছেন) হাতে পড়ে মার্কসীয় তত্ত্ব এক "বিকলাঙ্গাবস্থা" প্রাপ্ত হয়েছে। সাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বা জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে এই তত্ত্বভাণ্ডার বিক্ষিপ্তভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে, প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে পার্টি বা রাষ্ট্রনেতৃত্বের নিতান্ত স্বার্থপর কৌশলকে বলা হয়েছে মার্কসবাদ প্রয়োগের উজ্জ্বল নিদর্শন। মার্কসবাদকে জনপ্রিয় করতে গিয়ে তার অতি-সরল ব্যাখ্যা প্রচার করা হয়েছে। এ-সবের ফলে মার্কসবাদ আজ তার "কৌলীন্য" হারিয়ে ফেলেছে।

এই অভিযোগের মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর চোখে যাকে অতি-সরলীকরণ মনে হতে পারে, ঐতিহাসিক বিচারে তা কি কিছুটা পরিমাণে স্বাভাবিক বা এমনকি অবশ্যম্ভাবী ছিল না? মার্কসবাদ যত্ন করে সাজিয়ে-রাখা তত্ত্ব-ভাণ্ডার নয়, এই ধূলিমাখা পৃথিবীর আমূল রূপান্তরই ছিল মার্কসের ব্রত, তাই তত্ত্ব এবং শ্রমিক আন্দোলনের

মিলন গোড়ার থেকে হয় মার্কসবাদের মূলমন্ত্র। কিন্তু তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়ের অর্থই হল যা ছিল এতদিন মোটামুটি বুদ্ধিজীবীদের সম্পত্তি, দরিদ্র অশিক্ষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে সেই সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের ব্যাপকতম প্রসার। পরিমাণগত প্রসারের ফলে তত্ত্বের পবিত্রতা যে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, মার্কসের মতো মহাপুরুষের কাছে তা নিশ্চয়ই অজানা ছিল না। "অন্ধ জনতা"র সংস্পর্শে পাছে দর্শনের শুভ্রতা মসীলিপ্ত হয়ে যায়, সেই ভয়ে ব্রুনো বাউয়ের (তরুণ হেগেলিয়ানদের মধ্যে একজন) রাজনীতি সযত্নে পরিহার করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। গজদন্তমিনারবাসী এই 'Pure Critic'-এর নির্দয় সমালোচনা রয়েছে মার্কসের *Holy Family*-র পাতায় পাতায়।

গণ-আন্দোলনে অতি-সরলীকরণ কিছুটা হয়তো অবশ্যম্ভাবী, তবে বেশি মাত্রায় হলে সেটা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক। আন্তনিও গ্রামচী তাঁর *Modern Prince* নামক গ্রন্থে এই সমস্যার কিছু আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু বেশির ভাগ মার্কসীয় নেতা যে এ-বিপদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারেন নি, এ বিষয় আমি সুমন্তবাবুর সঙ্গে একমত। প্রসঙ্গত বলা চলে যে মার্কসবাদের অতি-সরলীকরণ বুদ্ধিজীবীর পক্ষেও সম্ভব। মার্কসের ১৮৪৪-এর লেখা (পরবর্তী জীবনে তিনি কিন্তু এ-লেখা ছাপান নি) তাঁর মতামতের উপর উজ্জ্বল আলো ফেলে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর পরের চল্লিশ বছরের রচনায় নানা অবস্থায় নানা সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা অগ্রাহ্য করলে চলে না। কোনও দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক পরিচয় মনে না রাখাটাই অতি-সরলীকরণ।

সোভিয়েত দেশে মার্কসবাদের প্রয়োগ

সাময়িক প্রয়োজনে মার্কসীয় তত্ত্বের অপব্যবহারের প্রধান উদাহণগুলি সুমন্তবাবু দিয়েছেন সোভিয়েত পার্টির ইতিহাস থেকে। তাঁর মতে রাশিয়ায় মার্কসবাদকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রথমদিকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের দর্শনরূপে, পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে—ফলে যে উচ্চতম মানবিক মূল্যবোধ মার্কসবাদের প্রাণ, তা সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকেও সোভিয়েত নেতারা মোটামুটি রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। বিংশ কংগ্রেসে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি শোধরানোর একটা চেষ্টা হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-চেষ্টার মধ্যে বহু

ত্রুটি থেকে যায় (বিশেষ করে স্তালিন এবং স্তালিন-যুগের পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের অভাব), ফলে সোভিয়েত সমাজ ও তার নেতৃত্বের দুর্বলতাগুলি বহুল পরিমাণে আজও দূর করা যায় নি।

বিংশ কংগ্রেসের কথাই প্রথমে আলোচনা করা যাক। স্তালিন এবং স্তালিন-যুগের পূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন বা এ-বিষয়ে শেষ কথা যে বিংশ বা দ্বাবিংশ কংগ্রেস দিতে পেরেছে, তা আমি মনে করি না। কিন্তু স্তালিনকে বিচার করতে হলে যেমন তাঁর যুগটার সম্যক পর্যালোচনা দরকার, তেমনি বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্বের স্তালিন-পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের রীতি কোনো কোনো সময় কিছুটা অমার্জিত ঠেকলেও তাঁদের পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থার কথাও আমাদের মনে রাখা কর্তব্য। মূর্তিপূজার পরে মূর্তি-ভাঙ্গার তাণ্ডব অস্বাভাবিক বা ইতিহাসে অভূতপূর্ব নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইতিহাসের পুনর্লিখনের রীতি (যা স্তালিন আরম্ভ করেছিলেন ট্রট্স্কীকে নিয়ে) একদিনে বদলানো কঠিন—তাই স্তালিনের সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন দেওয়া বিংশ কংগ্রেসের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। দ্বিতীয়ত, সুমন্তবাবুর প্রবন্ধ পড়ে মনে হল তিনি বিংশ কংগ্রেসের পরবর্তী সোভিয়েত সমাজের নেতিবাচক, অতিতাশ্রয়ী দিকগুলিই বড়ো বেশি করে দেখছেন, নানা জটিল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পূর্ণতর গণতন্ত্র ও সামগ্রিক সজীবতার যে-সমস্ত লক্ষণ চীন বাদে প্রায় সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে কম-বেশি দেখা যাচ্ছে, তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। শিল্প-সাহিত্যে তথাকথিত 'বুর্জোয়া' ভাবধারার বিরুদ্ধে গত বছরের অভিযান সুমন্তবাবুর মতো আমাকেও বিস্মিত ও পীড়িত করেছিল, কিন্তু তাই বলে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক জীবনে যে আবার স্তালিন-যুগীয় বন্ধ্যাতা ফিরে আসছে, তা তো মনে হয় না। বরং সম্প্রতি দেখলাম মার্কিন পত্রিকা 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স' ক্রুশ্চেভ-অভিযানের পরেও নতুন ধরনের সোভিয়েত ফিল্ম দেখে কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করেছে। অসহিষ্ণু ব্যবহার, আমলাতান্ত্রিক মূঢ়তা ইত্যাদি সোভিয়েত সমাজের নেতিবাচক দিকগুলির বন্ধুত্বপূর্ণ অথচ দৃঢ় সমালোচনার নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে। সে-সমালোচনা আজকাল কিছুটা ফলপ্রসূ হয় বলে মনে হচ্ছে—গত বছর শোনা গিয়েছিল ইতালি ও ফ্রান্সের কমিউনিস্ট মহলের প্রতিবাদ নাকি এরেনবুর্গ-এভতুশেন্‌কোর বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করার অন্যতম কারণ। গোটা ছবিটা মনে রেখে তবেই কিন্তু সমালোচনা করা উচিত।

সুমন্তবাবুর মতে, সোভিয়েত সমাজের গলদের মূলে রয়েছে লেনিনের "নতুন ধরনের পার্টি" গঠনের নীতি, যার মধ্যে নিহিত আমলাতান্ত্রিক অতি-কেন্দ্রীকরণের বিপদ সম্পর্কে রোজা লুক্সেমবুর্গ বহু পূর্বে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। লুক্সেমবুর্গের মত নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য, কিন্তু তাঁর ১৯০৪-এর লেখাটি "অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত" হয়েছে বলে মানতে পারি না, যখন মনে করি বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর গৌরবময় সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক সৃজনশীলতার অসংখ্য নিদর্শনের কথা। লেনিনের পার্টি ছাড়া রুশ বিপ্লব সাফল্যলাভ করতে পারত না, বেশির ভাগ ঐতিহাসিক এমন কথাই বলেন—তার জন্য ই. এইচ. কার-এর মতো পশ্চিমী ঐতিহাসিকও লেনিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দ্বিতীয়ত, পরের যুগের অতি-কেন্দ্রীকরণ ও পার্টি-গণতন্ত্র বিনাশ বোধহয় লেনিন-নীতির ফল নয়, বিশেষ অবস্থার চাপে এবং ব্যক্তিগত কারণে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে লেনিনের সুস্পষ্ট নির্দেশ অগ্রাহ্য করার পরিণতি। লক্ষণীয়, লুক্সেমবুর্গের দ্বিতীয় যে রচনা থেকে অংশবিশেষ সুমন্তবাবু উদ্ধৃত করেছেন, সে-লেখাটি সবটা পড়লে দেখা যায় নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অভাবের জন্য লেখিকা পার্টি-সংগঠন-নীতি অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেই অধিক দায়ী করেছেন : "It would be demanding something superhuman from Lenin and his comrades if we should expect of than that under such circumstances they should conjure forth the finest democracy, the most exemplary dictatorship of the proletariat, and a flourishing socialist economy.···The Bolsheviks have shown that they are capable of everything that a genuine revolutionary party can contribute within the limits of the historical possibilities. They are not supposed to perform miracles. For a model and faultless proletarian revolution in an isolated land, exhausted by world war, strangled by imperialism, betrayed by the international proletariat, would be a miracle."

অবশ্য একথা ঠিক, রাশিয়ার বিশেষ অবস্থায় অপরিহার্য লেনিনের ধাঁচের পার্টি যে সকল দেশে সকল কালে প্রয়োজনীয়, কমিন্টার্ন-যুগের

এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ রয়েছে—লুক্সেমবুর্গের সতর্কবাণী এ-দিক দিয়ে বিশেষ করে মূল্যবান। বিংশ কংগ্রেসের পরের যুগে এ নিয়ে সাম্যবাদী মহলে যে আলোচনা হচ্ছে না, তা নয়—উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সমাজতন্ত্র শ্রেণী-সংগ্রামবিহীন বলে যে সেখানে একক-পার্টি ব্যবস্থাটাই স্বাভাবিক ফ্রান্স বা ইতালির কমিউনিস্টরা (এমন-কি বহু-নিন্দিত ভারতের পার্টিও তাঁদের অমৃতসর কংগ্রেসে) এই তত্ত্বটি সম্প্রতি অস্বীকার করেছেন।

সোভিয়েত সমাজের বিরুদ্ধে সুমন্তবাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ, সেখানকার সমগ্র চিন্তা ও কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্থনৈতিক প্রাচুর্যলাভ, চরিত্রের অন্যান্য দিক বিকশিত করার সুযোগ থেকে নাকি সোভিয়েত মানুষ বঞ্চিত। কিন্তু আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে কিছুটা উন্নাসিক ভাব কী মার্কসবাদ-সম্মত, যে-মার্কসবাদের আদর্শ সমগ্র মানবজাতির এবং বিশেষ করে সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত দরিদ্রতম শ্রেণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং মুক্তি? বিপ্লবের পর রাশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ দেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া কি অনুচিত ছিল? দ্বিতীয় এবং আরও বড় কথা হল, চল্লিশ বছরে সোভিয়েত দেশে "শুধুই" অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে, এমন কথা ইতিহাস-সম্মত বলে আমার মনে হয় না। সোভিয়েত এশিয়ার পিছিয়ে-পড়া জাতিদের দ্রুত উন্নয়ন, মেয়েদের স্বাধীনতা ও সমান অধিকার প্রদান, সর্বোপরি সেই বিশাল সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যার ফলে অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে শিক্ষার আলো পৌঁছে গিয়েছিল সুদূর গ্রামে-গ্রামে—রবীন্দ্রনাথ যা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন (অর্থনৈতিক প্রাচুর্য তখনো রাশিয়ায় আসেনি)—সুমন্তবাবু কি এসব ভুলে গেলেন? হিন্দী ছবির জনপ্রিয়তা ও বিমূর্ত শিল্প বা আধুনিক কাব্যরীতির অনাদর দেখে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই ব্যথিত হন—কিন্তু সোভিয়েত সাংস্কৃতিক জীবনের এটাই কি পূর্ণাঙ্গ চিত্র? সোভিয়েত দেশেই তো শেক্সপীয়ার রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের গ্রন্থাবলী অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে, সুদূর সাইবেরিয়ার ক্ষুদ্র শহরে রবার্ট বার্ণসের জন্মবার্ষিকী স্মরণ করা হয় (দ্বিতীয় খবরটি পড়েছিলাম স্টেটসম্যানে তারিখটা মনে নেই)। রাশিয়া দেখে এসে আন্দ্রে জীদ্ বলেছিলেন, বিশ্বের সাংস্কৃতিক সম্পদ এতদিন ছিল যেন এক দেয়াল-দেওয়া অভিজাত বাগান, বলশেভিকরা এই দেয়াল ভেঙে ফেলে সর্বস্তরের মানুষের সামনে নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। সাংস্কৃতিক জীবনের এই প্রসারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না,

যদিও এর ফলে রুচির মান হয়তো কিছুদিনের জন্য কোথাও কোথাও নিচের দিকেই ঝুঁকেছে।

সোভিয়েত সম্বন্ধে সুমন্তবাবুর তৃতীয় এবং শেষ অভিযোগ, সে-দেশের কমিউনিস্ট পার্টি "নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থে বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে··· দুমড়ে-মুচড়ে ব্যবহার করেছে, সে কলঙ্কময় ইতিহাসের ঘা আজও শুকোয় নি।" এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি? এ-ধরনের অভিযোগ প্রথম করেছিলেন ট্রট্স্কী, তবে তাঁর একটা যুক্তি ছিল, তিনি ভেবেছিলেন এককভাবে সমাজতন্ত্র গড়া যাবে না, দেশে দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়াই তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। সুমন্তবাবু এ যুক্তি মানেন নি, আজকের দিনে এটা মানাও কঠিন। কিন্তু ট্রটস্কীর যুক্তি অস্বীকার করলে একথাও মানতে হয়, সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের আর্থিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করা সোভিয়েত পার্টির আন্তর্জাতিক কর্তব্যেরও অংশ ছিল কারণ একমাত্র এই ভাবেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ তার উদাহরণ ও ক্রমবর্ধমান পরাক্রম দ্বারা বিশ্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারত। অর্থাৎ সোভিয়েতের জাতীয় প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলনের স্বার্থ, উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ না হলেও অনেকদূর পর্যন্ত একটা সমীকরণ হয়ে গিয়েছিল। দুয়ের মধ্যে বিরোধ যে একেবারে হয়নি তা নয়—এবং সে বিরোধগুলির সময় বিদেশের কমিউনিস্ট পার্টিরা আর-একটু স্বাবলম্বী হতে পারলে শেষ পর্যন্ত হয়তো রাশিয়া এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলন, উভয়েরই মঙ্গল হত। অবশ্য বিশ্বের সমস্ত পার্টি যে সর্বদা মস্কোর ল্যাজ ধরে নেচেছে, এমন কথা ভাবার কোনো কারণ নেই—সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি বলবৎ থাকলেও ফ্রান্স বা যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই নাৎসীদের সাদর অভ্যর্থনা জানায় নি, আর চীনের পার্টি তো অনেক সময়ই নিজের মতো চলেছে। তবু সুমন্তবাবুর সঙ্গে একমত হওয়া যেত, যদি-না তিনি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অধিকতর স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ এই ঢালাও অভিযোগটা না করে বসতেন, যে সোভিয়েত পার্টি শুধু নিজের সংকীর্ণ স্বার্থে চল্লিশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক আন্দোলনকে ব্যবহার করে এসেছে। বিশেষ প্রমাণ তিনি এখানে দেননি, শুধু বলেছেন সোভিয়েত-জার্মান চুক্তির কথা। এই চুক্তি ইউরোপের প্রগতিশীল আন্দোলনকে বিমূঢ় করেছিল সন্দেহ নেই—তবু মনে রাখা দরকার যে সেদিন রাশিয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক এক অবস্থায়

সম্মুখীন হয়েছিল, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের হিটলার তোষণনীতির ফলে ফ্যাসি-বিরোধী কূটনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের ছ-বছরের সোভিয়েত চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর, হিটলারের আক্রমণের সামনে সম্পূর্ণ একলা পড়বার একটা সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। আর সেদিন নাৎসীদের আক্রমণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হয়ে গেলে ইউরোপ বা পৃথিবীর অন্য কোথাও সমাজবাদ গণতন্ত্র বা জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কতটুকু আশা বাকি থাকত ?

চীন-সোভিয়েত বিতর্ক

সাম্প্রতিক চীন-সোভিয়েত বিতর্ক সম্বন্ধে সুমন্তবাবু প্রথমত বলেছেন, চীনের বর্তমান নীতি অনেকাংশে ভ্রান্ত এবং উগ্র জাত্যাভিমান-দোষে দুষ্ট, কিন্তু আকস্মিক বা অভূতপূর্ব নয়, চল্লিশ বছরের আন্তর্জাতিকতাবিরোধী সোভিয়েত নীতিরই ঐতিহ্য চীন আজ তার চরম পরিণতিতে নিয়ে গেছে। তাঁর এই বক্তব্য ইতিহাস-সম্মত বলে স্বীকার করতে পারলাম না। বিপ্লবের পরমুহূর্তে সমস্ত অসম-চুক্তিলব্ধ অধিকার বিসর্জন, ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-স্বীকার, ইত্যাদি লেনিন-যুগের উদারতা ও আদর্শবাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু স্তালিনের সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক দুইটি সিদ্ধান্ত—সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি ও ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ—এগুলির সঙ্গেও কি চীনের পাক-প্রীতি ও ভারত-আক্রমণের তুলনা চলতে পারে? পারমাণবিক পরীক্ষা-বন্ধ চুক্তিতে চীনের আপত্তি "বোধগম্য" বলে সুমন্তবাবু আধা-সমর্থন করেছেন দেখে অবাক হলাম। "ক্ষুদ্র শক্তি" চীন অপেক্ষা দুর্বল দেশ পৃথিবীতে অনেক আছে—কই এক ফ্রান্স ছাড়া তারা তো কেউ বৃহৎ শক্তির পারমাণবিক আধিপত্যের ভয়ে ভীত হচ্ছে না? সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের পথে একটি ধাপ বলেই তারা চুক্তিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছে—সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে সম্পূর্ণ অন্ধ না হয়ে থাকলে এটাই তো স্বাভাবিক।

বর্তমান বিরোধে সোভিয়েত পার্টিকে সুমন্তবাবু নির্দোষ বলে মানতে রাজি নন—ক্রুশ্চেভ-নেতৃত্ব তাঁর মতে চীন সম্বন্ধে সহনশীলতার অভাব দেখিয়েছে। আমার তো মনে হয় সোভিয়েত নেতারা বরং বেশি মাত্রায় সহিষ্ণু, কমিউনিস্ট ঐক্যের খাতিরে বার বার কিছুটা আপস-প্রবণতাই তাঁরা দেখিয়েছেন। সুমন্তবাবু মনে হয় ১৯৬০-এর দ্বিতীয় ভাগে চীন থেকে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ সরিয়ে আনার ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন—"নিজেদের নীতির সঙ্গে কোনো

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গুরুতর মতপার্থক্য ঘটলেই দেখা যায় সে দেশের প্রতি সোভিয়েত সাহায্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।" ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ ছিল না। প্রকাশ্য বাক-বিতণ্ডা এবং অন্যের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চীনারাই প্রথম শুরু করেছিলেন ১৯৬০-এর এপ্রিলে 'লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক' পুস্তিকা সারা পৃথিবীতে প্রচার করে। চীনে কর্মরত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের এই পুস্তিকাটি পড়ানোর চেষ্টা হয়, তাছাড়া তাঁদের প্রতি অনেক সময় অপমানকর ব্যবহার করা হয়—এ বিষয় 'মেনষ্ট্রিম' কাগজে সম্প্রতি ভারতীয় এক প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। তাছাড়া সুসলভ রিপোর্ট থেকে জানা গেল, এত কাণ্ডের পরেও ১৯৬৩-র শেষের দিকে সোভিয়েত চীনকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্যদানের প্রস্তাব করে, শুধু একটি মাত্র শর্তে—নিজস্ব মত পরিত্যাগ করার দরকার নেই, খালি প্রকাশ্য বিতর্ক বন্ধ করো। এর উত্তরে চীনা নেতারা তাঁদের আক্রমণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন—ক্রুশ্চেভ "ইতিহাসের নিকৃষ্টতম বিভেদপন্থী" এবং তিনি রাশিয়ায় ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন এই ধরনের কুৎসা প্রচার করতেও আজকাল তাঁদের লজ্জা হচ্ছে না।

সুমন্তবাবু সমগ্র বিরোধটাকে দেখছেন "নিছক জাতীয় স্বার্থ ও ক্ষমতার লড়াই" বলে—তাই প্রকৃত মার্কসবাদীদের এ-সমস্ত নোংরা জিনিস থেকে একটু দূরে থাকাই বুঝি কর্তব্য। বিতর্কের মধ্যে একরকম প্রবেশ না করেই এত সহজে তাঁকে সমস্ত জিনিসটা উড়িয়ে দিতে দেখে আমি বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছি। এভাবে তো স্তালিন-ট্রট্স্কী, লেনিন-কাউটস্কি বা মার্কস-বাকুনিন বিরোধকেও স্বার্থের দ্বন্দ্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। চীনা নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক অনেক কার্যকলাপ দেখে অবশ্য এমন সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়, যে তাঁদের কাছে আদর্শগত বিরোধ একটা অজুহাত মাত্র, সোভিয়েতকে হটিয়ে বিশ্ব আন্দোলনের নেতৃত্ব অধিকার করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু পৃথিবীর নানা দেশের অনেক মার্কসবাদী চীনা-নীতি সমর্থন করছেন—তাঁরা সকলেই কি হঠাৎ চীনের জাতীয় স্বার্থের দালাল হয়ে গিয়েছেন? চীনা নেতাদের মনে যাই থাকুক, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না, যে কমিউনিস্ট মানসে যা কিছু অতীতাশ্রয়ী, চীনা বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই তাকে আকৃষ্ট করেছে। নতুন যুগে পুরনো ফর্মুলা ব্যবহারের অভ্যাস যাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না, স্তালিনের জায়গায় আর এক পিতৃতুল্য পরম গুরু যাঁদের

প্রয়োজন—তাঁরাই ঝুঁকেছেন চীনের দিকে। তথাকথিত সোভিয়েত দৃষ্টি-ভঙ্গিও আবার ক্রুশ্চেভের নিজস্ব সম্পত্তি নয়—বিংশ কংগ্রেসের সৃজনশীল মার্কসবাদের ধারা যাঁরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, চীনা মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁদেরই দাঁড়াতে হচ্ছে। কাজেই বিরোধটা শুধু সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে নয়, বর্তমান বিতর্কের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে সমগ্র মার্কসবাদী আন্দোলনেরই ভবিষ্যৎ।

সুমন্তবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, চীন-সোভিয়েত বিরোধ বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আবার অন্ধ সোভিয়েত-আনুগত্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, বিংশ কংগ্রেসের স্বাধীন চিন্তার ধারা হারিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরের ঘটনা কিন্তু এর সাক্ষ্য দেয় না। বরং গোঁড়ামির বিষময় ফল চীনের নীতি আরও সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে, মাও ৎসে তুং যাকে "নেতিবাচক উদাহরণ" বলতে ভালোবাসেন, ভাগ্যের পরিহাসে সেই রকম উদাহরণ তাঁর পার্টি আমাদের দিচ্ছে। তা ছাড়া যুগোশ্লাভ, পোল্যাণ্ড, ইতালির মতো পার্টি—যাদের সৃজনশীল তত্ত্ব-আলোচনা ও কার্যক্রম বেশ কিছুদিন থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—তারা কেউই নিশ্চয়ই "বিবেক দস্তখত" দিয়ে ক্রুশ্চেভকে সমর্থন করছে না, প্রয়োজন হলে সোভিয়েতের সঙ্গে তাদের মত-পার্থক্যের কথা জানিয়ে দিতে তারা যথেষ্ট প্রস্তুত। দ্বাবিংশ কংগ্রেসের কয়েকটি দিক তোগলিয়াত্তি (এবং ভারতের অজয় ঘোষও) সমালোচনা করেছিলেন, রোম ও প্যারিসের মার্কসবাদী মহলে গত বছরের আধুনিক শিল্পীদের বিরুদ্ধে অভিযান নিন্দিত হয়, অতি সাম্প্রতিককালে আর এক বিশ্ব কমিউনিস্ট অধিবেশনে ডাকার সোভিয়েত প্রস্তাব ইতালিয়ানরা সমর্থন করেন নি, রুমানিয়া আজকাল অনেকটা নিজের মতো চলেছে। অন্ধ আনুগত্যের অবশ্য আজও অভাব দেখছি না পিকিংএর সমর্থকদের মধ্যে—কিন্তু অন্য দিকে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সৃজনশীল মার্কসবাদের অভিযান স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন দেশের অবস্থা অনুযায়ী নানা পথে চলেছে, বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হচ্ছে মার্কসবাদের নতুন দিগন্ত।

পাঠকদের আমরা এ-আলোচনায় যোগ দিতে আহ্বান করছি। তবে পরিচয়-এর কলেবরের কথা স্মরণ করে তাঁরা যেন তাঁদের রচনা দু-তিন পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন।

—সম্পাদক পরিচয়

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুব্রত শান্তনুর কাছে আবার গিয়েছিল।

শান্তনু ভেবেছিল বুঝি সুব্রত রুচির বিষয় বলতেই এসেছে। মুখে হাসি টেনে সুব্রতকে সে অভ্যর্থনা করেছিল। কিন্তু সুব্রত যখন বললে—শান্তনু তোমার কথাই কদিন থেকে বেশি করে মনে পড়ছে। তখনই শান্তনু কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

না—শান্তনু আর তার বিষয়ে কাউকে ভাবতে দেবে না। এর মধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটেছে। শান্তনুর বাসায় মমতা এসেছিল। মমতা জিজ্ঞাসা করেছিল—অনেকদিন যান নি, কেন? শান্তনু বলেছিল কারণটা। মমতা চুপ করে বসেছিল। ফর্সা রং রৌদ্রে লাল। ঘাম জমেছে ঠোঁটে। খানিকক্ষণ বাদে মমতা জিজ্ঞাসা করেছিল—সেরে যাবে, কী বলেন? শান্তনু ভারি খুশি হয়েছিল শুনে। সেদিন সারাদিন তার মনে হয়েছিল—হ্যাঁ সেরে যাওয়াই ভালো। সারুক তার অসুখটা।

মমতা বলেছিল—জানেন বেণুটা বড় বাজে হয়ে যাচ্ছে।

—কেন?

—মদ খেতে শিখেছে। সেদিন মাতাল হয়ে দুপুরবেলায় এসে হাজির। চলে যেতে বললাম, হাত ধরে কী কান্না।

—মুশকিল তো।

—ভয়ানক মুশকিল, দু-দিন দোকানে মাল বিলি করল না। আমার খাটুনি সার হল। এমন করলে খদ্দের থাকে?

—আমি কিছু বলব ওকে?

—উঁহু আপনি কিছু বলবেন না, আপনার কথা ও আরো শুনবে না।

শান্তনুর মন অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিল।

সুব্রত বলল—তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ?

—সাঁওতাল পরগণায় কোনো একটা জায়গায়।

—ফিরবে কবে?

—এখন কী করে বলব?

—রুচি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

—আসার অসুবিধা হলে আমি গিয়েও দেখা করতে পারি।

সুব্রত যেন অনেক দূর থেকে কথা বলল—না সে জন্য নয়, ও বলছিল ওর খুব কষ্ট হচ্ছে।

—কার জন্যে?

—তোমার জন্যে।

—বাঁচলাম।

সুব্রত শান্তনুর বিদ্রূপে বিশেষ মাথা ঘামালো না। বলল—কেন জানি না তোমার চলে যাওয়াটা আমার ভালো লাগছে না।

—মনে হচ্ছে যেন শান্তনু পালাচ্ছে।

—কতকটা তাই বটে।

—কার কাছ থেকে?

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

নিজেরই কাছ থেকে।

—কেন?

—কিছুর মীমাংসা হল না জীবনে। এ রকম উদ্‌ভ্রান্ততার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে আর পারি না। আমরা কত সহজে সব ভুলে যাই। কত সহজে আপস করে ফেলি।

—পালিয়ে গেলে তার মীমাংসা হবে?

—না, তা হবে না, কিন্তু আমাকে দেখতে হবে না এলোমেলো উল্টোপাল্টা কথা কাজ চিন্তা। সুখদেবপুর এলাকা থেকে লেফট পার্টিগুলো কাকে নমিনেশন দেবার কথা ভাবছে জানো?

—ডাক্তার মৃগাঙ্কমৌলি সান্যালকে।

—এই সেদিন তিনি প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অভ্যর্থনা সভার সভাপতির ভাষণ পড়ছিলেন, না?

—হ্যাঁ ভাই।

—কাল তাঁকে কংগ্রেস টিকিট দিলে তিনি কংগ্রেসেই যাবেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হওয়াও বিচিত্র হবে না। অথচ তিনি সংযুক্ত বামপন্থীদের প্রার্থী হচ্ছেন। হচ্ছেন না?

—হচ্ছেন।

—বিনয়কে জানতে? বিনয় বিয়ে করেছে। পণ পেয়েছে প্রচুর। ফার্নিচারের তালিকা শুনলে তোমার হাই উঠবে। সে পি. এম. পণ নেওয়া আটকালো না কিন্তু। তুমি সুবোধকে বলেছ পার্টির মেম্বারশিপ ড্রপ করতে কেন না সে শেয়ার বাজারে যাতায়াত করছে, বিনয়কে কী বলবে? কিছু বলবেই কি না কে জানে তা।

সুব্রত জবাব দেবার চেষ্টা করল না। শান্তনু বলল:

—এই রকম সংখ্যাতীত প্রশ্ন রাত্রিবেলা ছারপোকার মতো কামড়ায়। এদেরই হাত থেকে পালাতে চাই। আমি জানি তুমি আমায় কী বলবে—বলবে ভীরু, পলায়নপ্রবণ। কিন্তু আমি যে আর মেলাতে পারছি না। শুধু ছাড়পত্র খুঁজে খুঁজে জীবন চলে না।

সুব্রত বৃথাই মাথার চুলগুলোর ভিতরে আঙুল চালিয়ে রুক্ষ জটগুলো ছাড়াতে চাইল। ও কি জানে না এ সব কথা—জানে বৈকি। কিন্তু এই জানাকে অজুহাত করে আত্মলোপের সিদ্ধান্ত নেবে কি করে সে? এই সব দুর্বোধ্য জটিলতার সামনে দাঁড়ালেই সুব্রত আজকাল বেশি করে রুচির কথা ভাবে। রুচি—রুচিকেই তার বেশি প্রয়োজন। সে সময়মতো কেমন স্তব্ধ হতে জানে। জানে যথাকালে মুখর হতে। সে শান্তনুর মতো নয়। কবে কোন শুভক্ষণে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হবে তবে বিপ্লবের রঙিন পথে পা বাড়াব—রুচি এমন পণ্ডিতম্মন্যের মতো কথা কখনো ভাবে না। রুচির স্নিগ্ধ হাতের আঙুলে অনেক বরাভয়।

হয়তো শান্তনুও একা একা হলে এমন কথাই ভাবে।

অনেক বেশি অর্থপূর্ণ নয় কি মমতার বেঁচে থাকার চেষ্টা। একদিন ওদের সেই চায়ের দোকানে মমতার বাবার সঙ্গে শান্তনুর দেখা হয়েছিল। তাঁর সেদিন মত্ততা ছিল না। আর শান্তনু দেখেছিল মদ না খেলে ভদ্রলোক ভারি মিতভাষী, নম্র এবং শান্ত।

—মমতার জন্যে একটা ছেলে খুঁজে দিন না। মেয়েটা বড় ভালো বুঝলেন

কিনা। ও ঠিক ওর মায়ের মতন। এমনিতে ওর মায়ের স্বভাব ছিল ভারি মিঠে। অন্তদিকে যাই হোক।

শান্তনু বলল, আচ্ছা দোব।

মমতার বাবা বললেন—হাতিঘোড়া কিছু না, সাধারণ একটা ছেলে হলেই হবে, ওকে যত্নআত্তি করবে, মোটামুটি যা হয় করে এমন একটি ছেলে।

শান্তনু বললে—নিশ্চয় খোঁজ করবে সে।

শান্তনু কিন্তু খোঁজ করেনি। সে নিজের খাবার আয়োজন করতেই ব্যস্ত রয়েছে। ভেবেছিল একদিন মমতার কাছে যাবে। প্রাণভরে গল্প করে আসবে। কী ভেবে যায় নি আর। বেণু দিনের পর দিন কেমন বুনো হয়ে যাচ্ছে। শান্তনুকে আগে স্যার বলত—এখন মাস্টারবাবু বলে। মমতার কথা বললে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়। কাটা কাটা কথা বলে। শান্তনুর এ সব কথা ভাবতে আর ভালো লাগে না। বেণুকে সেও এড়িয়ে চলে।

সেদিন কী হল হঠাৎ ঐ চায়ের দোকানটার সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। দুই ভদ্রলোক নামলেন দুটো হাণ্টার আর হুইপ নিয়ে। একজন সায়েবী পোশাক পরা, অন্য জনের অবাঙালী পোশাক। অত্যন্ত চড়া তাদের মেজাজ। বেণুকে দেখতে পেয়েই কলার ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তারা তাকে গাড়িতে তুলল। এবং আশ্চর্য বেণু কোনো প্রতিবাদ করলে না। ন্যায্য শাস্তি মাথা পেতে নিচ্ছে এমন ভাবে গাড়িতে গিয়ে উঠল। অনেক রাত্রে বেণুকে পাওয়া গেল বি. টি. রোডের ধারে একটা কালভার্টের পাশে—সারা শরীর চাবুকের রক্তাক্ত দাগে ডোরাকাটা। বেণুর মালিকের কাছে শান্তনু শুনেছিল যে ছোঁড়াটার ডানা গজিয়েছে। মেয়ে যোগাড় করে দেবে বলে আগাম টাকা নেয়। পরে তাদের বলে, হল না দাদু পাখি ভেগেছে। কে আর এ নিয়ে হল্লা করে বলুন। কিন্তু সব পার্টি তো সমান নয়। ত্যাঁদোড় পার্টির পাল্লায় পড়েছে—কাঠবিড়ালি বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। মমতা শান্তনুকে বললে—ওর মাথায় ঢুকেছে টাকা করতে হবে। ব্যবসায় নামবে।

—কেন এত তাড়াতাড়ি কিসের ?

—টাকা জমাবে। তারপর বিয়ে করবে।

—বলে তোমাকে এ সব কথা ?

—বলে না আবার, কেবলই বলে।

—আর কিছু বলে ?—আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল শান্তনু। এক লহমায় বিব্রত হয়ে উঠল মমতা—আবার কি বলবে, কি যে বলেন।

মমতার হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মুখখানা দেখে শান্তনু সব বুঝল। আর দেখল মমতা কত বড় হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যটা ফিরেছে। মুখের মধ্যে একটা দৃঢ়-লক্ষ্য প্রত্যয় জেগেছে। সারা শরীরে এসেছে একটা সুঠাম শরীরী লাবণ্য। যাইহোক না কেন, সব কিছু উপেক্ষা করে এবং তুচ্ছ করে মমতা শেষ পর্যন্ত সুন্দর হবে। শান্তনুর মনের এক কোণে একটা ছায়া ঘনিয়ে উঠল।

—তুমি যে বলছিলে বেণু মদ খেতে শিখেছে।—শান্তনুর নিজের কাছেই নিজের স্বর কেমন যেন শুকনো বলে মনে হল।

—তাতে কী, মদ তো আমার বাবাও খায়।

মমতার গলা প্রয়োজনের বেশি গম্ভীর।

শান্তনু এ বিষয়ে আর কোনো কথা বলেনি। বেণুর মতো একটা বাজে ছেলে এবং মমতার মতো একটা ভালো মেয়েকে সে এক করে ভাবতে পারছে না। অথচ সে মন খুলে সব কথা বলতেও পারছে না। মমতা হয়তো ভাববে—না, থাক বলে দরকার নেই কিছু। মমতা কী বুঝল কে জানে। সে বলল—ওর যত দুর্ভোগ সব আমারই জন্যে। কাজেই আমি ওর ভালোমন্দ কিছু বলতে পারি না। বলবও না। আমার জ্বর হলে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কেউ বাড়িতে থাকে না। আসেও না খোঁজ নিতে কেউ। ও ছুটে যায়, ডাক্তার নিয়ে আসে, ওষুধ কিনতে ছোটে। টাকা না থাকলে ধার করে। এই করে কাবলিওয়ালার কাছে ওর দেনা জমে গেছে। কিন্তু সেসব তো আমারই জন্যে।

শান্তনু বলল—তা বলে অন্যায় করলে বলবে না।

মমতা হেসে লুটিয়ে পড়ল। বলল—ও তো আমার ওপর অন্যায় করছে না। আমার জন্যে করছে। ধীরে সুস্থে বলব বৈকি সে সব কথা। কিন্তু তাই বলে ওকে কি বাদ দিতে পারি ? ও বাবা, তা হলে ও ঠিক লাইনে গলা দেবে।

শান্তনু ভাবল আমি তো লাইনে গলা দিতে পারব না—কাজেই চুপ করে যাই। বেণু যা পারে নিশ্চয়ই আমি তা পারি না। কাবুলিওয়ালার কাছে টাকা ধার করতে পারি না, মমতার তৈরি জিনিস দোকানে দোকানে ফেরি করতে পারি না, মমতার বাবা মদ খেয়ে বমি করলে মাথায় জল

চালাতে পারি না। বস্তুত আমি কিছুই পারি না। কাজেই চুপ করে যাওয়াই ভালো।

—মমতা,

—বলুন।

—তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে "আপনি খুব ভালো লোক।"

—বলেছিলাম তো।

—আজও তাই বল কি?

—হ্যাঁ তাই বলি। আপনি খুব ভালো লোক।

আজই শান্তনু কথাটার মানে বুঝতে পারল। সেদিন কথাটা নিয়ে মিছেই নাড়াচাড়া করেছে সে। কথাটার মানে বোঝেনি। ও কথার মানে হচ্ছে আপনি খুব ভালো লোক—এর বেশি কিছু নয়।

শান্তনু বুঝল যে সে যেমন অনেক কিছুই পারে না, তেমনি ভালোবাসতেও পারে না। বুঝল পৃথিবীতে অতি তুচ্ছ কাজও সোজা কাজ নয়। আর, সব কাজেই নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। নিজেকেও যাচাই করতে হয়—কতটা খাঁটি, কতটা মেকি। কাজেই ওদিকে আর কথা বাড়াল না শান্তনু।

মমতা জিজ্ঞাসা করল—কবে যাচ্ছেন?

শান্তনু বলল—এই সপ্তাহেই।

—আসছেন কবে?

—কী করে বলব। আসার ইচ্ছে খুব নেই।

—কেন?

—ইচ্ছে করার মতো কিছু নেই বলে।

—মনে করলেই থাকে, মনে না করলেই থাকে না।

সারাটা সন্ধ্যা সেদিন মমতার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখের ঐ একটি বাক্য শান্তনুকে আচ্ছন্ন করে রইল—"মনে করলেই থাকে, মনে না করলেই থাকে না।"

জীবনের দিকে যদি এতই সহজে তাকানো যেত, এতই যদি সোজা করে নেওয়া যেত সব জট তাহলে কোথাও যেতে হত না। শান্তনু কি তা জানে না? জানে বৈকি। কিন্তু ও-ভাবে তাকানোর আর্ট সে কোনোদিন শেখেনি যে। তার চেয়ে এই ভালো এই মেয়েটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে যাওয়া। এ সুখী হোক। বেণু হয়তো আস্তে আস্তে শুধরে যাবে—হয়তো মমতার ছায়ায় ছায়ায় ও একদিন স্নিগ্ধ হয়ে উঠবেও। এখনি বেণুকে দেখে

আতঙ্কিত হয়ে কী লাভ? বর্তমানের কোন্ স্তর কোন্ পর্যায়কে দেখে আশান্বিত হওয়া যায়? কী হচ্ছে এটা বড় কথা নয়, কী হবে, কী হতে পারে—সেটাই আসল কথা। আর সেটা তো একটা এ্যাটিচ্যুডের প্রশ্ন। শান্তনু ভাবল সে এ্যাটিচ্যুড আমার না থাক, এদের থাকল।

শান্তনু আর দেরি করল না। পরের দিন বিকেলে ট্রেনে উঠল। না সুব্রত, না রুচি, না মমতা—অনাত্মীয় জনতায় বোঝাই স্টেশনের দিকে পিছু ফিরে বসে থাকল সে, শেষ ঘণ্টা, শেষ হুইসিল না বাজা পর্যন্ত।

আজ ময়দানে পার্টির আহ্বানে প্রকাশ্য সমাবেশ।

সুপ্রীম কোর্টের রায় বেরিয়েছে অনেকদিন। ভারতীয় কোনো রাজনৈতিক সংস্থাকে ভারতের কোনো অঙ্গরাজ্যে অবৈধ ঘোষণা করা চলবে না। তারপর এই প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশের আহ্বান। ময়দানের পূব দিকে সুব্রত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদিক থেকে একটা বৃহত্তম মিছিল এসে ময়দানে ঢুকছে। অবরুদ্ধ ট্র্যাফিক। দক্ষিণ দিক থেকে আর একটা আসছে। ব্যারাকপুর, বজবজ, এলেনবেরি, বার্মাশেল, জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং, আন্দুলমৌরি, জুট ওয়ার্কাস—মিছিল মিছিল মিছিল—মনুমেণ্টের নিচে থেকে মাইক্রোফোনে হেঁকে জানাচ্ছে কারা এল, কোথা থেকে এল। ক্রাচ বগলে পা-কাটা যুবক, হাসি-হাসি মুখ। বই হাতে ছাত্র। রুক্ষ-চুল ইনটেলেকচুয়াল। কবি-শ্রমিক-প্রেমিক। ঘর্মাক্ত এবং কর্মার্ত। সুব্রত দাঁড়িয়ে আছে। নানা রঙের ফেস্টুন। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, বাঁচবার মতো মজুরি চাই, সুব্রতর মনে পড়ে গেল—ফর এ হ্যাপি ইউথ ইন এ ফ্রি ইণ্ডিয়া।

—উঃ কত যে খুঁজেছি, দেরি হয়ে গেল। রুচি খুশিতে উপছে পড়ছে ভিড় দেখে।

—এখন এলে?

—হ্যাঁ আমরা আশীজন এলাম যে।

সুব্রত দেখল রুচি ঘামছে—লাল হচ্ছে।

—জানো, শান্তনু চলে গেছে?

—কবে? কিছু বলে গেল না তো।

রুচি দেখল এ শুধু সুব্রতর মন্তব্য, জিজ্ঞাসা নয়। সুব্রত তাকিয়ে আছে পশ্চিমদিকে। জনসমাবেশ সেদিকে জনসমুদ্রের রূপ নিয়েছে। সমাবেশের

কাজ শুরু হবে। স্বল্প কথায় পতাকা উত্তোলনের ভাষণ শেষ করলেন পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। নোয়াখালির বৃদ্ধ মানুষটির উচ্চারণে আর কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল কে কথা বলছেন।—গান শুরু হল—উঠ হোসমে···আ বেদার হো যা···

—আমি গিয়েছিলাম শান্তনুর খোঁজে। যদি পাই ধরে নিয়ে আসব বলে। ও এমন লুকিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তুমি আমার কথা শুনছ না।

না, শুনছিল না সুব্রত। ওরা রাস্তার দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সুব্রত দেখছিল একটি সুবেশ প্রৌঢ়ের সঙ্গে একটি সুঠাম তরুণী গাড়িতে ওঠার উদ্যোগ করছে। তরুণীর স্মিত মুখে রকমারি প্রসাধন। প্রৌঢ়ের মুখে আত্ম-প্রত্যয়ের ছাপ।

রুচি জিজ্ঞাসা করল—কী দেখছ ?

সুব্রত বলল—ওদের চিনতে পারছ না তুমি ?

রুচি একটু তাকিয়ে বলল—নন্দিনী না। সঙ্গে ও কে, প্রিয়ব্রতবাবু নন তো ? প্রগলভ হাসি ছড়িয়ে গাড়ি চলে গেল। সুব্রত ওদিকে তাকিয়ে থেকে বলল—না ওঁকে আমরা জানি না। রুচি চুপ করে গেল।

সুব্রত বলল—চলো রুচি, আমরা সবায়ের মধ্যে গিয়ে বসি।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লাল গোলাপের জন্য

আমারও প্রিয় রং লাল ;
আমারও প্রিয় ফুল
গোলাপ।

আমি লড়ছি
লাল গোলাপের জন্যে।

চেয়ে দেখ,
আসমুদ্রহিমাচল
শোকস্তব্ধ আমাদের ভালবাসা
নতমুখে
উদ্ভিন্ন মাটির দিকে তাকিয়ে।

শৃঙ্খলের ক্ষতগুলো
ভাল ক'রে আজও শুকোয় নি ;
প্রাণের সব তার
এক সুরে এখনও বাঁধা হয় নি ;
সর্বনাশের কিনার থেকে
পৃথিবী
বরাবরের মত এখনও সরে আসে নি।

চষা মাটির মত এবড়ো খেবড়ো সময় ;
চলতে কষ্ট হলেও
জানি, তার গর্ভে ছড়ানো আছে বীজ।
আশাহত অবুঝ অশান্ত
আমাদের আজকের অভিমানগুলো
চোখের জল ফেলে
নবান্নের উৎসব করবে।

চোখে নয়,
এখন আমাদের বুকের মধ্যে লাল গোলাপ-
বুক দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

আমার প্রিয় রং লাল ;
আমার প্রিয় ফুল
গোলাপ।

লাল গোলাপের জন্য
সাহসে বুক বেঁধে
এখন আমাদের লড়াই ॥

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

কবি, তুমি একবার তোমার ধ্যানের ভারতবর্ষে ছাখো এসে :
ব্রাহ্মণমহিমা ক্ষত্রগরিমা না, মনুষ্যত্ব মনীষা মমতা
কিছু না—ব্যাপারী রাজা মন্ত্রী ভাঁড়ু দত্ত শুধু বৈশ্যের সভ্যতা
যোজনায় যন্ত্রথর নিয়নে নাইলনে নগ্ন উর্ধ্বশ্বাস দেশে।
কে জানত নিগূঢ় স্কাইস্ক্রেপারে স্ক্রেপারে আদি অরণ্যের গুহা ?
মানুষ দ্বিপদ জন্তু আত্মপর একাকিত্বে নিজেরই পোষা কি
নিজেকে লেহন ক'রে ! সংস্কৃতি যদিও সভাউজ্জল, পোশাকী
ছদ্মবেশ ছিঁড়লে নখীদন্তীশৃঙ্গী লোভ দ্বেষ দর্প বা অসূয়া।

কবি, তুমি নিজ মুখ দেখো না বার্ষিক স্মৃতিতর্পণ-দর্পণে
রবীন্দ্রসঙ্গীত কানে নিয়ো নাক' ইঙ্গবঙ্গ গদ্গদ ভাষণ—
আপন প্রতিমা ভেঙে দীপ উল্টে মালা ছিঁড়ে আত্মসমর্পণে
পূর্ণ কর অভ্যুদয়, পূর্ণ কর এতকাল শূন্য যে-আসন।
সভ্যতা-সংকটে ক্ষয়ে এস কবি সংক্রান্তির চণ্ড বিস্ফোরণে
হে বীর, সম্ভব কর ভারতবর্ষে সুন্দরের পুনর্বাসন।

সিদ্ধেশ্বর সেন

মা যেখানে থাকেন

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য........ ...."

॥ সূক্ত : ৫ ॥ ঈশোপনিষৎ ॥

মা যেখানে থাকেন, সেইখানেই
তো মন্দির

পূজার্চনা শেষ হয়েছে, এখন
গঙ্গাজল

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

এখন তিনি ঘুমোন, আমি
জেগে আছি
শিয়রদেশের পাশে, আমি
রইব জেগে, মা

যেখানে আছেন, সেখানেই
তো মন্দির

হাসপাতাল আর মন্দিরে, কী এতই
মাখামাখি
এই তো থাকেন, মা

এইখানে—তিনি ছিলেন, এই-ই
যেমন পরিপাটি, এই তো, তেম্নি
আছেন শুয়ে,—আমার

মা-জননী মন্দিরে তাঁর, অ-রোগ
বিছানায়

আমি রয়েছি জেগে, উনি
ঘুমিয়ে আছেন

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

২

স্বস্তি
ফিরুক তাঁর নিশ্বাস
ফিরুক, যা, মাতরিশ্বা
হাওয়া

নমো মধু
আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত—মধু, মধু

ফিরুক, অন্নময় তাঁরই
প্রাণ—
মনোময় কোষ বিজ্ঞানময়ও
ক্ষিতিতে, অপ ও তেজে
মরুৎ ও ব্যোমে
স্বস্তি
জাতবেদ অগ্নিমুখে—স্বস্তি

স্বপ্নে, স্বপ্নভঙ্গে, প্রয়াণে হে
অলক্ষ্য, অলক্ষ্যযানে
দ্যাব্যাপৃথিবীর থেকে উত্থান, উত্থিত
চরাচর
পঞ্চভূতে-অন্তরীক্ষে-ভূপৃষ্ঠে ও স্রোতবহতায়, ভেসে
অনন্তযাত্রায়……

নির্মলা মা, ফের একাকিনী ; ওম
শান্তিঃ শান্তিঃ
—মা আমার ॥

জগদীশ ভট্টাচার্য

কাল রাতে

রন্ধ্রহীন অন্ধকারে
মাঝদরিয়ার বুকে হাল ভাঙা নাবিক দেখো নি ?
তাহলে আমার দিকে চাও।
কাল রাতে আমি সেই মৃত্যুভীত নাবিক ছিলাম ॥

আকাশে ছিল না তারা,
সমুদ্রের বুকে ছিল ঝড়।
উত্তাল ঢেউয়ের মুখে তরীখানি ছিল অসহায়।
বিনাশের বিভীষিকা হিংস্র শ্বাপদ হয়ে
আমাকে কবলে পুরেছিল।
বুকে ছিল দিশাহারা দুরুদুরু মৃত্যুর ইশারা।
প্রেতায়িত চেতনায় একটি মুমূর্ষু শিখা
আলেয়ার মতো ছিল জেগে—
কখন তলিয়ে যাব নিঃসীম অতলে।
কখন আসবে নেমে শেষ সর্বনাশ ॥

রন্ধ্রহীন অন্ধকারে
মাঝদরিয়ার বুকে হাল ভাঙা নাবিক দেখো নি ?
তাহলে আমার দিকে চাও।
কাল রাতে আমি সেই মৃত্যুভীত নাবিক ছিলাম ॥

রণজিৎ সিংহ

কবি সমাধিস্থল

এ সমাধিস্থলে শুয়ে আছে আশ্চর্য হৃদয়,
শুয়ে আছ কবি।
নির্জনে আসে না কেউ
কেবল সৌহার্দ্য মেলে ধরে
মাটি ঘাস তারা সকাল সন্ধ্যা।

শহরের একান্তে নির্জনতা পাব ব'লে
চ'লে আসি দুজন ;
এখানে এ সমাধিস্থলে ফোটাব ভালোবাসা।

ও কবি ও সন্ধ্যামৌন হৃদয়!
দিব্য উচ্চারণে
ডাকো ওই তারাদের,
বহাও অমিত জ্যোৎস্না, সৌরভ,
বহাও আশ্চর্য নদীর ধ্বনি······
আমাদের সন্তাপ ধুয়ে যাক
আমাদের হৃদয় গলে যাক রাজকীয় মৌনতায়।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

উইল শেক্সপীয়র : একটি কল্পনা

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গভীর রাত। সরাইখানার একটি ছোট্ট ঘর, ডানদিকের দেয়ালে দরজা; সেই দরজার ফাঁক দিয়ে বড় ঘর দেখা যাচ্ছে—সেখানে কয়েকজন লোক বসে মদ্য পান করছে। ঘরের পেছনে দেওয়ালের নিচু দিকে জানলা—জানলা দিয়ে ফুলের লতানো গাছ দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকের দেয়ালে ফায়ার প্লেস। ফায়ার প্লেস আর জানলার মাঝখানে নিচু খাট—বিছানা পাতা। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল, তার ওপর মোমবাতি, গ্লাস, মদ ইত্যাদি। তিনজন লোক টেবিলের চারপাশে বসে মদ্য পান করছে। মার্লো জানলার দিকে পেছন ফিরে, একটি পা চেয়ারে রেখে চিৎকার করে গান করছে এমন সময় পর্দা উঠছে।]

মার্লো : এক যে আছে নিয়তি সে ভাগ্য নিয়ে খেলা করে ;
হঠাৎ যদি দেয় সে দেখা, বলব যে তার হাতটি ধরে—
'তোমার সঙ্গে কাটাব দিন—এ সাধ ছিল অন্তবিহীন,
কিন্তু তুমিই ফেরালে মুখ, বাঁধব তোমায় কিসের ডোরে ?'

তুমি আমার পরানসখী
তুমি আমার মাতাল হাওয়া—
তোমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে
হোক না আমার গানটি গাওয়া—

সবাই একসাথে : তুমি আমার প্রাণের খুশি
তুমি আমার সুখের চাওয়া—

তোমার সুরে সুর মিলিয়ে
হোক না আমার গানটি গাওয়া—।

প্রথম ব্যক্তি : (টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে) আবার ! আবার !

সরাইওয়ালা : (দরজার কাছ থেকে) এই যে মশায় ! বাইরে একজন অল্পবয়স্ক লোক—ঘোড়ায় চড়ে এসেছে—আপনাকে চায়।—

মার্লো : কি নাম তার ?

সরাইওয়ালা : আর্চার, ফ্রান্সিস আর্চার ! বলছে আপনি ওকে চেনেন।

মার্লো : একজন আর্চারকে আমি চিনতাম, কিন্তু সে ফ্লাণ্ডার্সে মারা গেছে।

সরাইওয়ালা : লোকটির সারা গায়ে এত কাদা যে ও ফ্লাণ্ডার্স থেকে আসতেও পারে।

মার্লো : ফ্লাণ্ডার্সের কবর এত কম গভীর ! ওকে বলো বেঁচে থাকলে আমি ওকে চিনি না···আর মরে গেলে ওকে আমি চিনতে চাই না। কাজেই যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে যাক্ ও।

[সরাইওয়ালা বেরিয়ে যায়]

প্রথম ব্যক্তি : কিন্তু ও যদি সত্যিকারের ভূত হয় ? তোমার একটু ভাবা উচিত, তুমিও তো একদিন ভূত হবে। হবে কি না ? তারপরে ভূত হয়ে বন্ধুদের কাছে গেলে তারা তোমায় চিনতে পারল না ! কেমন কষ্টটা পাবে, ভাব দিকিনি।

সরাইওয়ালা : (দরজার কাছ থেকে) লোকটি বলছে, আপনি সত্যিই ওকে চেনেন···আর আপনার সঙ্গে ওর বিশেষ দরকার।

মার্লো : বেশ, আসুক ! তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?
যদি মৃত্যুও আসে এখানে তো গাইব :
আসবে যখন মৃত্যুরাজা নিয়ে কঠিন পরোয়ানা।
অট্টহাসি হেসে তখন দেখব যে তার কাণ্ডখানা ॥
বলব, দাদা যমরাজ হে, আছো তো বেশ খোশ মেজাজে ?
তোমার খেলা চলছে কেমন, করছ কি তায় টালবাহানা ?
যমরাজ গো লক্ষ্মী দাদা,
ঘুচুক তোমার আপদ বালাই,

এখন এসো তোমার সাথে
বোতল নিয়ে ফুর্তি চালাই !

মেরীর কণ্ঠস্বর :

হায় শুনি কী ভীষণ কথা !
যমের সঙ্গে রসিকতা !
ধরবে যখন গলা টিপে
ঘুচবে তোমার ধানাই পানাই ॥

সবাই একসাথে :

যমরাজ গো, লক্ষ্মী দাদা,
জানি তোমার মনটি সাদা,
দোহাই, ছেড়ে দাও আমাদের,
প্রাণটা নিয়ে ঘরে পালাই ॥

মার্লো : এ কার গলা ?

[মেরী দরজা খুলে ভেতরে এসে দাঁড়ায়, পরণে ছেলেদের পোশাক, গায়ে ক্লোক, পায়ে রাইডিং বুট, মাথায় স্লাউচ ক্যাপ]

প্রথম ব্যক্তি : নাইটিংগেলের গলা ! চেন নাকি একে ?

মার্লো : মনে হচ্ছে চিনি। (মেরীকে আড়ালে) একি কাণ্ড ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তুমি নাকি মরে গেছ ?···কবরের মাটির তলায় ছিলে ?

মেরী : তাই তো ছিলাম। কিন্তু লণ্ডনের এক ডাইনী দিনরাত মার্লোর জন্য হাহুতাশ করে ! সে-ই কবর থেকে তুলে আমায় পাঠালে ওকে খুঁজে আনার জন্যে।

প্রথম ব্যক্তি : সেই ডাইনীর নাম ?

মেরী : এত জোরে আমি ছুটেছি ওর খোঁজে যে আমার স্মরণশক্তি পেছনে পড়ে আছে···ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে আর আসবে না।

মার্লো : সরাইওয়ালা ! দশজনের মতো মদ পাশের ঘরে দাও। আর তোমরা ওঘরে গিয়ে ফুর্তি কর।

প্রথম ব্যক্তি : কিট্ ! তুমি চা-লাক ! আমি চা-লাক ! আমরা সব্বাই চা-লাক !

তুমি আমার প্রাণের খুশি
তুমি আমার সুখের চাওয়া—
তোমার সুরে সুর মিলিয়ে
হোক না আমার গানটি গাওয়া—

[ওরা বেরিয়ে যায়। দরজা বন্ধ হয়ে যায়]

মেরী : এত ভালো মেক্-আপ দেখেছো কখনো? চুল নিয়েই যা একটু ঝামেলা হয়েছিল!

মার্লো : পাগল! এ সব কি কাণ্ড!

মেরী : পতঙ্গ! তুমি আমার শিখায় পুড়তে চাও না? আমি একা জ্বলছি!—কিট্, তুমি চারদিন আমার কাছে আসনি!

মার্লো : অসুবিধে ছিল—যেতে পারি নি।

মেরী : পতঙ্গ তোমার পাখা কী পুড়েছে?

মার্লো : আমি না। পতঙ্গরাজ জ্বলেপুড়ে মরছে তোমার শিখায়।

মেরী : ও, শেক্সপীয়র! আমি পালিয়ে এসেছি—পোড়ার গন্ধ আমি সইতে পারি না! আজ রাতে ওর আমার কাছে আসার কথা ছিল··· ট্র্যাজেডি, কমেডি পড়ে শোনাতে—ওঃ এত ক্লান্তি লাগে!—তুমি আমায় ভালোবাসো? (চুমো খায়)

মার্লো : ইচ্ছের থেকে বেশি।

মেরী : রোগমুক্ত হতে চাও?

মার্লো : সম্ভব নয়।

মেরী : কেন? চার্চে গিয়ে বিয়ে করে ফেল। বিয়ের ফুল ফুটলেই প্রেমের ফুল ঝরে যাবে। উইলও বলে এই কথা।

মার্লো : উইলের জানা উচিত।

মেরী : কি বললে?

মার্লো : কিছু না।

মেরী : ও বিবাহিত?

মার্লো : আমি তো বলিনি সে কথা।

মেরী : বিবাহিত! এর ফল পেতে হবে ওকে। বিবাহিত! আমি একটু সন্দেহ করেছিলাম। আচ্ছা! দেশে আছে ওর স্ত্রী?

মার্লো : দশ বছর ওদের দেখা হয় নি। রোমিও-জুলিয়েটের রাতে উইলকে খবর পাঠিয়েছিল—যাবার জন্য।

মেরী : এখন সব বুঝতে পারছি, আমি! এই জন্যই সে রাতে ও রকম অদ্ভুত ব্যবহার করছিল উইল! আমরা সবাই ঠক্ কিন্তু এখন ওকে ঠকাতে আর বিবেকে লাগবে না। বিবাহিত!

মার্লো : এ আমি কি করলাম! মেরী, তুমি জান না উইল আমাকে কতটা বিশ্বাস করে! শিশুর মতো সরল বিশ্বাস নিয়ে ওই আমাকে পাঠিয়েছিল তোমার কাছে—যাতে তোমার কাছে ওর কথা বলি। বন্ধু বলে ও আমায় বিশ্বাস করল···আর কি সুন্দর প্রতিদান আমি দিচ্ছি সেই বিশ্বাসের!

মেরী : ওর কথা বলে কেন সময় নষ্ট করছ? ভুলে যাও এখন ওকে।

মার্লো : তুমি পার?

মেরী : ভুলতে পারি না, তাই তো এত খারাপ লাগে—

মার্লো : ভুলে যাব? ওকে ভোলার চেয়ে আমার নিজেকে ভোলা সহজ! মেরী, আমি ওর ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে ফেলে আসা উদ্দাম যৌবন। মাঝে-মাঝে মনে হয়—আমি যদি হঠাৎ মরে যাই উইলের ভেতর আমি বেঁচে থাকব! ওর লেখার কালিতে আমার রক্ত মিশে থাকবে।

মেরী : অসহ্য, কিট্! আমি এত কষ্ট করে এলাম সে কি শুধু মৃত্যুর কথা শুনতে?

মার্লো : তুমিই তো আর্চারের কথা মনে করিয়ে দিলে।

মেরী : তুমি ওর কথা বলেছিলে একদিন—আমি তোমায় চমকে দিতে চেয়েছিলাম।

মার্লো : সেই থেকে আমার মাথায় মৃত্যুর ছায়া ঘুরপাক খাচ্ছে। মৃত্যু··· মৃত্যু কি অসুন্দর!···আমার খুব ভালো লাগছে তুমি এসেছ! আমার সঙ্গে থাক···জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাক···ভুলে যাও সব—শুধু আমার পাশে থাক!

মেরী : (মার্লোর গলা জড়িয়ে ধরে) এমনি করে···সারা রাত···চুপ করে··· তুমি আর আমি···ওকি? কে ডাকে? শুনতে পাচ্ছ কিছু?

মার্লো : পাখি ডাকছে দূরে কোথাও।

মেরী : ঐ আবার! জানলাটা খোল! (মার্লো উঠে গিয়ে জানলা খুলে দেয়) কিছু দেখতে পেলে ?

মার্লো : চারপাশ কি আশ্চর্য নিশ্চুপ! চাঁদ ডুবে গেছে···কি গভীর অন্ধকার!

মেরী : আর বাতাস! যেন ঈর্ষায় জ্বলে আছড়ে পড়ছে জানলার ওপরে—আমাদের আলাদা করে দিতে চাইছে ঘরে এসে! কিট্ তোমার ঈর্ষা হয় না ?

মার্লো : অত বোকা আমি নই যে হলেও বলব।

মেরী : হ্যাঁ, তুমি সত্যিই বোকা নও। উইল বলে, ওর ঈর্ষা নেই—কিন্তু যখন ও চুপ করে তাকিয়ে থাকে···ওর দৃষ্টি আমার পেছন পেছন ঘুরতে থাকে···যখন চুমো খেতে খেতে হঠাৎ থমকে গিয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে···তখন···তখন···সমস্ত গা-টা যেন শিরশির করে ওঠে···। ভাগ্যিস্ ও তোমায় বন্ধু বলে মনে করে—

মার্লো : আমি ওর বন্ধুই ছিলাম।

[শেক্সপীয়র নিঃশব্দে জানলার কার্নিশে এসে দাঁড়ায়]

মেরী : এখনও তো তুমি ওর বন্ধু—তাই না ? তাই তো বন্ধুর মতো সব জিনিস ভাগ করে নাও। একই প্রেমিকা—দুই বন্ধু মিলে—আঃ ছটফট করো না—ওকি ?—ঠোঁটের কোণে বিরক্তি কেন ? বন্ধুর কথা ভাবছ বুঝি ?

মার্লো : ও কথা যাক। তুমি জান আমি ওকে ভালোবাসতাম—ভালোবাসি।

মেরী : আমিও তো ভালোবাসি।

মার্লো : আচ্ছা, আচ্ছা, আজ রাতে নয়।

শেক্স : (জানলায় দাঁড়িয়ে) আজ রাতে নয় কেন, আমার বন্ধু, আমার প্রেমিকা ?

[ওরা চমকে ওঠে। উইল লাফিয়ে ঘরের ভেতরে আসে]

আমাকে মদ দিয়ে অভ্যর্থনা করবে না তোমরা ? বস, বস—অনেক কথা আছে আমাদের তিনজনের। কিন্তু তার আগে বল তোমার হাত ওর গলায় অমন করে জড়ানো কেন ?—যেন বহু দিনের অভ্যাস ? সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও, বলছি! নাহলে চিরকালের মতো আলাদা করে দেব তোমাদের!

মেরী : ওর কাছে অস্ত্র রয়েছে!

মার্লো : ও তোমার কিছু করবে না, মেরী।

শেক্স : মার্লো! তুমি! মার্লো!

মার্লো : ওর কাছ থেকে সরে যাও।

শেক্স : তুমি! তুমি, মার্লো!

মার্লো : সরে যেতে বলছি তবু—

[মার্লো শেক্সপীয়রের দিকে ছুটে যায়। ধাক্কা খেয়ে টেবিলের ওপর পড়ে। মোমবাতি উল্টে যায়। দ্বিতীয়বার ছুটে যায়। শেক্সপীয়রের ধাক্কায় নিজের হাতের ছোরা কাঁধে বসে যায়। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সব থমকে যায়। তারপর শেক্সপীয়র দৌড়ে গিয়ে মার্লোর মাথা এক হাত দিয়ে তুলে ধরে।]

মেরী : মারা গেছে? ও কি মারা গেছে? ওঃ, এর আগে আমি কাউকে কথনো মরতে দেখি নি!

মার্লো : ওঃ!

শেক্স : ও কি?

মার্লো : আঃ···আমি যে আরও বাঁচতে চেয়েছিলাম···! মৃত্যু! তুমি এত তাড়াতাড়ি কেন এলে? আঃ···আমায় বাঁচতে দাও···জীবনটা বড় সুন্দর··· (মৃত্যু)

মেরী : এখন কি করব আমি? দেরি করা বিপজ্জনক···কি করি?··· উইল! উইল!

শেক্স : তোমার গলায় এত গান ছিল···সব ফুরিয়ে গেল! এ আমি কি করলাম?

মেরী : উইল, এখন হাহুতাশ করার সময় নেই। উইল!

শেক্স : ঐ শোন! কার দীর্ঘশ্বাস!

মেরী : ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ।

শেক্স : কান্নার শব্দ পাচ্ছ—

মেরী : বৃষ্টি পড়ছে। এই কি স্বপ্ন দেখার সময়? ভোর হয়ে আসছে— যত সময় যাচ্ছে তত বিপদ বাড়ছে। কি করব এখন?—

শেক্স : (হঠাৎ ফেটে পড়ে) চুপ কর বাজে মেয়েলোক! বেশ্যা কোথাকার! মৃত্যুর সামনে স্তব্ধ হতে পার না? কাঁদ…চোখের জল ফেল! তুমি ওর প্রেমিকা ছিলে না? ওর পাওনা চুকিয়ে দাও—চোখের জল দিয়ে ওর রক্ত ধুয়ে দাও—

মেরী : কি? নিজের অপরাধ আমার কাঁধে চাপাচ্ছ? আমি বেশ্যা? আমার বিচার করছ তুমি? তুমি নিজে কি? জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী…বিয়ে করে গোপন করে রেখেছ…আর হত্যা করেছ মার্লোকে যে তোমার চেয়ে হাজার গুণে বড়—

শেক্স : সবাই জানে সে কথা।

মেরী : আর কেঁদে চলেছ যতক্ষণ না পাহারাদার এসে রানীর কাছে আমাদের ধরে নিয়ে যায়।…রানী ভীষণ রেগে আছেন গত কয়েকদিন ধরে… কেউ ওর সামনে যেতে সাহস করছে না,…ওর পুতুলের ঘরের এই এক দামী পুতুল আমার জন্য ভেঙে গেছে…রানী জানতে পারলে… ওঃ, আমার ভয় করছে…রানীর এক টুকরো হাসি, বরফের মতো চোখ…উইল! উইল! ওর দিকে তাকিয়ে থেক না—ও মারা গেছে! কিন্তু আমরা বেঁচে আছি—আমাদের কথা ভাব!

শেক্স : কে? মেরী?—তুমি কি মেরী? তুমি কি ওকে এত ভালোবাসতে? না হঠাৎ খেয়ালে ছুটে এসেছিলে—

মেরী : ভোর হয়ে আসছে!

শেক্স : তুমি কি আমাকে কোনোদিন ভালোবাস নি?

মেরী : কেমন করে বাঁচব আগে তাই চিন্তা কর।

শেক্স : আগে আমায় উত্তর দাও।

মেরী : তোমার কি ফাঁসি যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে?

শেক্স : উত্তর দাও!

মেরী : জীবনের দোহাই—

শেক্স : উত্তর দাও!

মেরী : কোনোদিন তোমায় ভালোবাসিনি। পেয়েছ উত্তর?

অ্যানের কণ্ঠস্বর : গত বাসন্তী পূর্ণিমায়—চাঁদের আলোয়—

শেক্স : গত বাসন্তী পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলোয় যখন লণ্ডন ভেসে গিয়েছিল, সেই জ্যোৎস্নার কুহকে তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে।

মেরী : তুমি জান তা প্রেম ছিল না।

শেক্স : সেই জ্যোৎস্না রাতে আমায় কাছে টেনে অতি যত্নে···চুপি চুপি আমায় বল নি 'ভালোবাসি'।

মেরী : সেই রাতে আমি স্বপ্ন-বিভোল ছিলাম।

শেক্স : সেই রাতে—সেই রাতটির জন্য অন্তত তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে।

মেরী : আমি জানি না।

শেক্স : পৃথিবী বদলে যেতে পারে—চাঁদের সব আলো মুছে যেতে পারে—সমস্ত পর্বতশিখর সাগরে লুকোতে পারে—কিন্তু সেই রাতে, আমার চরম জয়ের মুহূর্তের ভালোবাসা মিথ্যে হতে পারে না!

মেরী : সে কি প্রেম ছিল? হয়তো তোমায় আমি ভালোবাসতে পারতাম যদি তুমি আমায় ভালোবাসতে শেখাতে! তোমার কাছে আমি প্রেম চেয়েছিলাম—পাই নি।—না পেয়ে ভুলে গিয়েছি আমি কি চেয়েছিলাম। এখন আমি বাঁচতে চাই···তোমার জন্য আমি নিজের সর্বনাশ করতে পারব না।

শেক্স : মেরী, তুমি জান না আমি তোমায় কত ভালোবাসি। মেরী! আমায় দয়া কর!

মেরী : কি আছে তোমার আমায় দেওয়ার? তুমি বিবাহিত—আমি তোমার সন্তানের মা হলে তাদের কোনো নাম দেবার অধিকারটুকু তুমি দিতে পারতে? উইল! তুমি আমার ভালোবাসার যোগ্য নও!

শেক্স : আমি কি করেছি যার জন্যে—

মেরী : মিথ্যে বলেছ আমায়! মিথ্যে কথা বলেছ!

শেক্স : যদি মিথ্যে বলে থাকি—

অ্যানের কণ্ঠস্বর : তোমাকে পাওয়ার জন্য।—তোমাকে হারানোর ভয়ে··· যন্ত্রণায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম!

শেক্স : তোমাকে হারানোর ভয়ে আমি মিথ্যে বলেছিলাম—যন্ত্রণায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম!

মেরী : তুমি এত নোংরা, নীচ, ক্লীব যে যন্ত্রণার জ্বালায় আত্মসম্মান ভুলে গেলে—মিথ্যে কথা বললে! উইল! উইল, ভালোবাসার যোগ্যতা তোমার নেই—কাউকে এত ভালোবাসা তোমার বোকামি।

শেক্স : কিন্তু এই বোকামি—এই অযোগ্যতা থেকেই পৃথিবীর যত গান জন্ম নেয়—

[ঘোড়ার খুরের শব্দ]

শেক্স : মেরী !

মেরী : ওরা কারা ? সরে যাও তুমি। তোমার সুযোগ তুমি নিজে নষ্ট করেছ, কিন্তু আমাকে পালাতে হবে। শোন ! এখানে একটি অল্পবয়স্ক লোক ছিল ; একজন ফ্রান্সিস্ আর্চার—কোনো মেয়ে নয়, একজন অল্পবয়স্ক লোক—তুমি তাকে চেন না !

শেক্স : মেরী, আমি তাকে চিনি না !

[সরাইখানার চত্বরে কয়েকটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

মেরী : তুমি যদি আমাকে না যেতে দাও তাহলে আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব—শপথ করে বলব যে ওই লোকটিকে তুমি ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করেছ। ওরা এখনো মদ খাচ্ছে।

[দরজা খোলে]

সবাই একসাথে : (বাইরের ঘরে)

তুমি আমার প্রাণের খুশি
তুমি আমার সুখের চাওয়া—
তোমার সুরে সুর মিলিয়ে
হোক না আমার গানটি গাওয়া—।

মেরী : যদি তুমি পালিয়ে যেত পার, আমার কাছে কোনো খবর পাঠিও না আর নিজেও এস না।

[বাইরের ঘরে ঢুকে পড়ে। শেক্সপীয়র আধখোলা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে]

প্রথম ব্যক্তি : ওকে আটকাও।

মেরী : আমাকে যেতে দিন।

[ভিড়ের ভেতর মেরী হারিয়ে যায়। শেক্সপীয়র ঘরের দিকে ফিরে দাঁড়ায়—দরজা দুলে বন্ধ হয়ে যায়]

শেক্স : মার্লো! মার্লো! মেরী চলে গেছে—আর আমাদের ও বিরক্ত করবে না। এবার তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। মার্লো! কিট্, কেন তুমি এমন করলে? আমি যে তোমার। আমি তোমায় ভালোবাসতাম সে কথা ভুলে গেলে?

[দরজায় আঘাতের শব্দ]

কে? মেরী? তুমি চুপ করে শুয়ে থাক মার্লো! আমরা ওকে এখানে আসতে দেব না।

হেন্‌স্ : ভেতরে কে? ভেতরে কে?

শেক্স : দুজন মৃতলোক।

হেন্‌স্ : মার্লো আছ ভেতরে? উইল আছ?

শেক্স : কে? ভেতরে এস।

[হেন্‌স্‌লো দ্রুত ঘরে ঢোকে। দরজা আধখোলা থাকে]

হেন্‌স্ : আরে! অন্ধকারে চুপ করে বসে আছ? কি ব্যাপার?—কোনো গণ্ডগোল হয়েছে? যাক যেতে যেতে শুনব কি ব্যাপার। রানী জরুরী তলব করেছেন তোমাকে—রাগে গুম হয়ে আছেন উনি। বাব্বা! গোটা লণ্ডনটা চষে ফেলেছি···শেষকালে শুনলুম মার্লো এসেছে ডেপ্টফোর্ডে—আমি ঘোড়ায় জিন দিয়ে ছুটেছি যদি তোমার পাত্তা পাওয়া যায়!

শেক্স : হেন্‌স্‌লো, ওই দেখ!

হেন্‌স্ : কে করেছে এ কাজ?

শেক্স : আমরা—আমি আর সে। আর একজন ছিল এখানে।

হেন্‌স্ : সরাইখানায় ঢোকার মুখে দেখলুম এক অল্পবয়সী ছোকরা খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল, অন্ধকারে মুখ দেখতে পাই নি···শুধু শুনলাম "তাড়াতাড়ি"। সেই ছোকরাই কি—

শেক্স : হ্যাঁ, সেই।

হেন্‌স্ : কে? কে সে?

শেক্স : মৃত্যু। ঐ তার শিকার ফেলে গেছে। কিছু করতে পারবে হেন্‌স্‌লো?

হেন্‌স্‌ না। কিন্তু তোমাকে বাঁচাতে হবে। তোমাকে এখানে কেউ চেনে?

শেক্স যমকে যেমন চেনে লোকে। হেন্‌স্‌লো, সব শেষ হয়ে গেল!

সরাইওয়ালা (দরজার ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে) কোনো গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?

হেন্‌স্‌ গণ্ডগোল? গণ্ডগোল কেন হবে? শোন, আমাদের তাড়া আছে; আস্তাবলের সহিসকে বল আমাদের এক্ষুণি আর একটা ঘোড়া চাই।

[উইলের হাতের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দরজার দিকে নিয়ে যেতে থাকে]

সরাইওয়ালা : ওনার কি শরীর খারাপ? টলছেন?

হেন্‌স্‌ : তোমার মদের গুণ।

প্রথম ব্যক্তি : হেঁ হেঁ দাদা। সারের সেরা মদ এই সরাইখানায় পাওয়া যায়।

হেন্‌স্‌ : আচ্ছা তোমরা এবার পথটা ছাড়। মহারানী ডেকেছেন এই লোকটিকে।

লোকেরা : (দরজার কাছে ভিড় করে) রানী! রানী! রানী পাঠিয়েছেন? রানীমার জয়!

হেন্‌স্‌ : সরাইওয়ালা! তোমার লোকজন সরাও।

প্রথম ব্যক্তি : (টলতে টলতে ভেতরে ঢুকে) রানীমার জয়! বল, রানীমার জয়! ও দাদা! একটা লোক যে শুয়ে রয়েছে।

হেন্‌স্‌ : হ্যাঁ, আমাদের লোক। ও শুয়ে থাকুক।

দ্বিতীয় ব্যক্তি: ওরও কি নেশা হয়েছে?

প্রথম ব্যক্তি : নেশা আবার হয় নি! কাপড়ময় মদের দাগ। এঁ:, দেখেছ কত মদ নষ্ট করেছে!

সরাইওয়ালা : চল, চল সব। শুনলে তো ওদের তাড়া আছে।

প্রথম ব্যক্তি : ওকে কি জাগিয়ে দেব?

শেক্স : হ্যাঁ, ওকে জাগিয়ে দাও। আর যদি না পার তাহলে ওকে হিংসে কর কি করে ও এত গভীর ঘুমোচ্ছে ভেবে।

[দরজা দিয়ে উইল আর হেন্‌স্‌লো বেরিয়ে যায়। বাকি লোকেরা গান ধরে]

গান : যমরাজ গো, লক্ষ্মী দাদা,
ঘুচুক তোমার আপদ বালাই,
এখন এসো তোমার সাথে
বোতল নিয়ে ফুর্তি চালাই !
যমরাজ গো, লক্ষ্মী দাদা,
জানি তোমার মনটি সাদা,
দোহাই ছেড়ে দাও আমাদের
প্রাণটা নিয়ে ঘরে পালাই ॥

[দরজা দুলে বন্ধ হয়ে যায়। ঘর আস্তে আস্তে আলোকিত হতে থাকে। ভোরের সূর্যের আলো এসে পড়ে বিছানার ওপর। পাখিদের কলরব শুরু হয়]

—পর্দা—

(আগামী বারে সমাপ্য)

মিহির পাল

জীবনের মুখ

গঙ্গার বুক থেকে জলকণা সংগ্রহ করে উত্তুরে হিমেল বাতাস অনবরত ঝাপটা মারছে চিতাকটির বুকে। হাওয়ার স্পর্শে চিতা লেলিহান হয়ে উঠছে, সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে আগুনের শিখা ডাইনে বামে হেলছে, দুলছে, নাচছে।

একটি চিতাকে কেন্দ্র করে বসেছিল ওরা শীতকে এড়াবার জন্যে যথাসম্ভব চিতার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে, ওরা পাঁচজন—মনোজের দাদা সরোজ আর মনোজের পূর্বতন মেসের বন্ধুরা—দীপেন, কার্তিক, রবি ও অনন্ত। শান্তিময় আর বারীন পাটকাঠি হাতে করে চিতাকে ঘুরে ঘুরে বসে নিচু হয়ে ভাল করে আগুন ধরাচ্ছিল। চিতার আগুনের ছাটে তাদের মুখ শক্ত ও কঠিন লাগছিল। দখিন-শিয়রে-মাথা মনোজের সর্বাংশ ঘিরে আগুন জড়াচ্ছিল। অনেক আদরে সে যেন মনোজকে কোলে তুলে নিচ্ছিল।

সরোজ এতক্ষণ শূন্যচোখে ভাইয়ের ফর্সা দেহটার ক্রমে ক্রমে কালো হয়ে যাওয়া লক্ষ্য করছিল। আর সারাটা বিকেল সন্ধ্যা শোকের ভান করতে থাকা সরোজের এই প্রথম দুঃখে কষ্টে বুকটা টাটাল। দীপেন এই সময় চিন্তায় ধূসর হতে পারত। জলন্ত চিতার দিকে তাকাতে তাকাতে জীবন ও মৃত্যুর বিপরীত কোটিতে অবস্থানকে নিয়ে ভাবতে বসে দীপেনের পক্ষে গঙ্গার মতো উদাস হয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল।

পূর্বতন মেসের বন্ধুরা মনোজকে বাঁচাবার লড়াইতে নেমেছিল। দীপেন ও অন্যান্য সবাই। প্রথমটাতে তারা যথাসাধ্য দিয়েছিল—অর্থ, প্রীতি, সহানুভূতি—সব। ক্রমশ তারা নিজেদের দেউলিয়া হয়ে যেতে দেখল। তাদের মনে হচ্ছিল মনোজ তার কুকড়ে-যাওয়া বিশীর্ণ হাত দিয়ে অনেকদিন ধরে তাদের রুগ্ন দেহের অস্থি মাস মজ্জা চুষে চুষে খাচ্ছে। হাসপাতালে জীবনমৃত্যুর সীমায় ঝুলে থাকা মনোজকে নিয়ে তারা অসহিষ্ণু, বিরক্ত ও

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আজ দুপুরের পর মনোজ মরল। দীপ্তেনের পক্ষে সে হিসেবে নির্ভাবনা ও খুশি হয়ে ওঠাও সম্ভব ছিল।

কিন্তু দীপ্তেনের চেতনার মাঝে এ সব কোনো চিন্তাই ঠাই পাচ্ছে না। একটি জীবনের অবশেষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে আজ মৃত্যু ও মৃত সম্বন্ধে সমান উদাসীন। তার মনের মাঝে বন্দী বাঘটা খোঁচা খেয়ে গুমরাচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষ রাতের নিশ্ছিদ্র আঁধারের মাঝে দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলা রক্তিম চিতা কাটির মতো তার সমস্ত সত্তা দগ্ধ হচ্ছে, পুড়ছে সেই দুপুর থেকে। বরং অনেক দিনের জ্বলন্ত একক শিখাগুলো আজ দুপুরে সন্নিবিষ্ট হয়ে হঠাৎ মশাল হয়ে উঠেছিল। আর সে জ্বলন্ত মশালের লক্‌লকে আগুন বুকের ভেতরটা পোড়াচ্ছে।

ঘণ্টা কয়েক আগে বিকেলের মরে-আসা আলোর মধ্য দিয়ে বাসের দোতলায় সে বসে বসে আসছিল। অন্যদিন হলে এ সময় তার দৃষ্টিকে রাস্তায় ছড়িয়ে রাখত, চলতি বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই (কোনো কোনো দিন বসেও বা) বিক্ষিপ্ত নানা চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে যথাসম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েগুলোকে দেখত—বুক, মুখ, শাড়ি বা ব্লাউজের রং ইত্যাদি। কিন্তু আজ দোতলার জানলার পাশে বসবার সুযোগ পেয়েও সে কিছু দেখছে না। চোখ আর তৃষ্ণায় ঝিকিয়ে উঠছে না। ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ—সব তার শুষে নিয়েছে নিঃশেষে। সেই দুপুরের ব্যাপারটা, তার পরে দৃষ্টিকে পিনবিদ্ধ করে রেখে দীপ্তেন ভাবছিল ভীষণভাবে। একটা মনুষ্যসুলভ অপমানবোধ ও জ্বালা তাকে অনবরত খোঁচাচ্ছে।

ভুল হয়েছিল তার—ভুল। স্টেট্‌মেণ্টটা তৈরিতে একটা ভুল করে ফেলেছিল সে। তাদের ফার্মের কমার্শিয়াল ম্যানেজার সে ভুল ধরেছেন। আর তিনি একাউন্টেণ্ট দত্তসাহেবের মাধ্যমে বড়বাবু ও স্টাফের একস্‌প্লানেশন চেয়েছেন। সে স্টেট্‌মেণ্টে সই করলেও দত্তসাহেবের যে কিছু হবে না—তা দীপ্তেন জানত। অফিসারদের কোনোদিন কিছু হয় না। আর দত্তসাহেবের কাছে ভুলের জবাবদিহি চাওয়াটাও মামুলি, রীতিমাফিক। ও শালা, গোটা ভারতব্যাপী এদের অসংখ্য কলকারখানায় ও অফিসগুলোতে একযোগে স্ট্রাইকের সময় অফিসে তো রোজ এসেইছে উপরন্তু এ সুযোগে তাদের নামে অফিসারদের কাছে চুকলি খেয়েছে। আর তার ভিত্তিতেই অবাধ্যতার অজুহাতে দীপ্তেনের প্রিয় বন্ধু নীরেনের চাকরি গেছে। আরও

গেছে সঞ্জয়ের ও অমিয়ের, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন কারখানায় বদলী হয়েছে দেবব্রত ও রতনদা। আর গত ক'মাস ধরে ছেলেকটি এখানে ওখানে ঘুরছে নেড়ীকুকুর হয়ে খোয়ানো চাকরি ফিরে পাবার আশায়। বাইরে বদলী রদ করে কলকাতার অফিসে ফেরার জন্যে। হন্যে হয়ে ঘুরে মরছে রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তরে, বিভিন্ন মন্ত্রীদের বা তাদের স্নেহভাজন ব্যক্তিদের দরজায় দরজায় এবং ওদের কর্তাভাজন ব্যক্তিদের পিছু পিছু। আর একদিকে ওদের চোখে অনির্বাণ জ্বলছে ক্রোধ, রোষ ও ঘৃণা। কিছু না করতে পারার অক্ষমতায় ওরা ফুঁসছে।

আচমকা একটা শব্দ শুনে ওরা সবাই চমকে উঠেছিল—দীপ্তেন, কার্তিক, সরোজ, রবি ও অনন্ত। চিতাকে ঘিরে ঝিম মেরে বসে থাকা মূর্তি কটি হঠাৎ আঁতকে উঠেছিল। বারীন আর শান্তিময় চিতায় আগুন ধরাতে ধরাতে হঠাৎ জ্বলন্ত পাটকাঠি হাতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এদের ছায়া পেছনের এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালে অসম দেখাচ্ছিল। আর দুজনের মুঠো-করা পাটকাঠি হতে জ্বলন্ত শিখা উড়ন্ত হাওয়ার তোড়ে দক্ষিণে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল। বারীন খানিক দূরের একটা জ্বলন্ত চিতাকে লক্ষ্য করতে করতে বলল, বাবা! একখানা মাথা বটে! কি শব্দ করে ফাটল। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল। তারপর পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে হঠাৎ থেমে গেল। ফলে গলায় একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল।

দীপ্তেন ভাবছিল দত্তসাহেবের দামী মাথাটাও চিতার আগুনে পুড়বার সময় এমনি শব্দ করে ফাটবে কিনা। আজ দুপুরে দত্তসাহেব তার ঘেরা-ঘরে ডেকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে বিচারকের ভঙ্গিতে মাথাটা ডাইনে বামে নাড়ছিলেন। দীপ্তেনের একসময় চায়ে চামচ নাড়ার কথা মনে পড়েছিল। দত্তসাহেব তার মোটা ফ্রেমের চশমা চোখ থেকে খুলে সোজাসুজি দীপ্তেনের চোখে চোখ রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলছিল, ইনক্লাব করবার সময় তো ভুল হয় না—কাজে ভুল হয়ে গেল কি করে দাসবাবু। তারপর টাইয়ে বাঁধা কোটে ঢাকা শরীরটাকে চেয়ারে হেলান দিইয়ে পাইপটা ধরালেন। ধরাতে গিয়ে চোখমুখ কুঁচকে দীপ্তেনকে খুঁটে খুঁটে গরুহাটার গরু ক্রেতার মতোই যাচাই করছিলেন।

কথাটায় শ্লেষ, ভঙ্গিতে অপমানের সুর দীপ্তেনকে বিঁধছিল। কিন্তু বর্ষার জলের মতো ঘোলাটে সে চোখের দিকে তাকিয়ে সে কোনো

জবাব দিতে পারে নি। শুধু মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঘামছিল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে দাঁড়িয়ে জামার তলায় ছায়ার বুনে দেওয়া একটা পাতলা সোয়েটার-পরা দীপ্তেন ভীষণ গরম অনুভব করছিল। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার ঘর্মস্নাত বলে বোধ হচ্ছিল। তার কান চোখ মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল—সে বুঝতে পারছিল। তার গলা শুকিয়ে এসেছিল। বসতে পেলে সে বেঁচে যেত।

কিন্তু বসার কথা বলতে দীপ্তেন সাহস করে নি। অথচ আগস্টের স্টাইকের আগে অসিত বলেছিল একদিন। কেরানি অসিত সেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছি স্যার। আমাদের অন্তত বসতে বলা উচিত। আমাদের উপোসী শরীরের পা তো। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

প্রথমটাতে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন দত্তসাহেব। চশমা খুলে রেখে বোকা বোকা চোখে খানিকক্ষণ অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হাতের পাইপটা টানতে তিনি ভুলেই গেলেন। আগুনটা বোধ হয় নিভেই গেল। সম্ভবত সামান্য একটা কেরানির ঔদ্ধত্যে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন, এত সাহস এদের কোথা হতে জোটে। তারপর সামলে নিয়ে ভারি গম্ভীর মুখখানায় ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, Is it?

অসিতের ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল। চ্যাংড়া ছোকরা অসিতকে তখন বয়স্ক ও বিশিষ্ট দেখাচ্ছিল। শক্ত মুখে সে জবাব দিয়েছিল, আমার তো তাই ধারণা।

দত্তসাহেব যেন খেলা করছেন, Are you sure you are not demanding too much?

তারপরই ঘর থেকে তিনি তাদের চলে যেতে বলেছিলেন।

কদিন বাদে অসিতের উত্তরপ্রদেশের এক কারখানা-অফিসে বদলীর আদেশ এল। বোধ হয় এত তুচ্ছ কারণে অসিতের স্থায়ী চাকুরি খতম করা সম্ভব হল না। অথবা হয়তো দত্তসাহেব পুরো বঞ্চিত না করে কিঞ্চিৎ করুণা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু আজ? অসিতের সে ঘটনাটা যদি আজ ঘটত! স্ট্রাইকের পরের এই আতঙ্কগ্রস্ত থমথমে আবহাওয়ায় এ কথাটা যদি অসিত বলত! তবে?

তবে কি হত—সে ব্যাপারটা আর চৌবাচ্চার অঙ্কের মতো জটিল কিছু নয়। তাহলে আজ হয়তো অসিতের বিধবা মাকে নীরেনের স্ত্রীর মতোই দত্তসাহেবের ঘরে ঢুকে কাঁদতে দেখা যেত আর দত্তসাহেব ভারি গলায় বলতেন, চোখের জলের বৃথা অপচয় করছেন মিসেস সেন। এই জলটা যদি ছেলের পেছনে ব্যয় করতেন তাহলে বোধ হয় উপকার হত—আপনার আর আমার দুজনের পক্ষেই।

তবে এটা ঠিক—বৃদ্ধাকে দত্তসাহেব নিশ্চয়ই রোরুদ্যমানা নীরেনের স্ত্রীকে বলা কথাকটির পুনরুক্তি করতে পারত না। 'আপনি নাকখত দিতে পারেন নীরেনবাবুর অপরাধ-স্বীকৃতির স্বাক্ষর হিসেবে। পারেন?' তারপরই একটা উৎকট আনন্দে পৈশাচিক বিজয়োল্লাসে মাতাল-হয়ে-ওঠা দত্তসাহেব তার ঘেরা-ঘরের বদ্ধ আবহাওয়াকে ঘুলিয়ে দিয়েছিল। আর তার হাসির হোস পাইপের মধ্য দিয়ে চোখে আঁচল চাপতে চাপতে নীরেনের স্ত্রী রমলা সেকসনের টেবিল চেয়ার মাঝের জ্যামিতির রেখা ধরে দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিল। আহ, দীপ্তেন আর তার সহকর্মীরা প্রস্তরীভূত হয়ে শুধু সেই দৃশ্য দেখছিল। অনেক সোচ্চার প্রতিবাদের আগুন তাদের মাথায় জ্বলে উঠতে চাচ্ছিল। কিন্তু তারা বসে বসে নিষ্ক্রিয় থেকে সে আগুন নিভিয়ে ফেলেছিল। দীপ্তেন শুধু স্মৃতিকে আশ্রয় করেছিল। বসে বসে বন্ধু নীরেনের স্ত্রী সপ্রতিভ রমলার বিভিন্ন দিনের বুদ্ধিদীপ্ত কথাগুলো সে নাড়ছিল।

—বলো হরি…

—হরি বোল।

—বলো হরি-ই-ই-ই…

—হরি বো-ও-ও-ও-ল্।

হরিধ্বনি নয় যেন এক বীভৎস আতঙ্ক ঝড়ো হাওয়ার মতো এখানকার থমথমে আবহাওয়ার 'পরে, হাড়-কাঁপানো উত্তুরে বাতাসের প'রে হিংস্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তার সাথে পুত্রশোকাতুর এক বৃদ্ধের উচ্চকণ্ঠ বিলাপ চিতা কটিকে ও ঘিরে-থাকা মানুষগুলোকে সচকিত করে তুলেছিল। দীপ্তেন, সরোজ, রবি, অনন্ত, কার্তিক—সবাই ঘাড় ফিরিয়েছিল, শান্তিময় আর বারীন জ্বলন্ত পাটকাঠির অবশিষ্টাংশ চিতার তলায় গুঁজে

দিয়ে ওদিকটায় ছুটে গিয়েছিল। গভীর রাতে চৌবাচ্চার মাঝে জল পড়ার মতো একটা কান্নার আওয়াজের একটানা তিরতিরে শব্দ এতক্ষণ দীপ্তেনদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ঠিক কোথা থেকে শব্দটা উঠে আসছিল ওরা কেউ বুঝে উঠতে পারছিল না। আর বুঝবার কোনো তাগিদও ওরা অনুভব করে নি। শ্মশানের বুক হতে উঠে-আসা ঐ একটানা ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে শোকস্বরের মাঝে ওরা অন্তর্লীন হয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণের সেই শব্দটা এক্ষণের ঢেউয়ের ভেঙ্গে-পড়া গর্জনের মাঝে চাপা পড়ল।

দীপ্তেন দেখছিল হাত পনেরো দূরে নামিয়ে রাখা খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক শক্ত সুঠাম বৃদ্ধ হাউ হাউ করে আওয়াজ করছিল। তার ভেঙ্গে-পড়তে-চাওয়া, লুটিয়ে-যেতে-চাওয়া শরীরটাকে জনদুই লোক শক্ত হাতে ধরে রেখেছিল। দীপ্তেনের তাদের ছেড়ে-আসা-গ্রামের ঘরের পেছনের ফল-দেওয়া-বন্ধ-করা বাঁশের প্যালা দেওয়া কামরাঙ্গা গাছটার কথা মনে পড়ছিল।

খানিক বাদে বারীন আর শান্তিময় ফিরে এল। বারীন হাত-পা নেড়ে বোঝাতে শুরু করল ট্রেনের তলায় কাটা যাওয়াতে কোথায় কোথায় দেহ বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়েছে। বারীন বলছিল, চাদরটা একবার তুলেছিল। মাথার আধখানা প্রায় উড়ে গেছে। কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। একখানা চোখ একদম নেই। কি দেখাচ্ছে মাইরি! বারীন একটা কৌতুকাবহ ভঙ্গি করল।

দীপ্তেনের মনে হচ্ছিল, বারীনটা বড় বেশি ইতর হয়ে যাচ্ছে। একটা শোকাহত অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ও ব্যঙ্গ করছে অবলীলাক্রমে।

আজ দুপুরে দীপ্তেন দত্তসাহেবের ঘেরা ঘরে আর এক ব্যঙ্গের ও বক্রোক্তির সম্মুখীন হয়েছিল, চেয়ারে ঠেস দিয়ে পাইপটা টানতে টানতে দীপ্তেনকে দত্তসাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিলেন, কি শাস্তি আশা করেন দাসবাবু।

দীপ্তেনের ইচ্ছে হচ্ছিল মুখের 'পরে অগ্নিশলাকার মতো একটা অত্যন্ত রূঢ় উত্তর ছুড়ে দিতে। কিন্তু দীপ্তেন পারে নি। উপরন্তু সে নিজেকে প্রাণপণে সংযত করে রাখছিল। তার চোখের সামনে কতগুলো মুখ ভাসছিল——ছায়ার, মায়ের, নীতা, রীতা ও তপনের। কতগুলো শুকনো মুখ, বিষণ্ণ দৃষ্টি তার চেতনাকে ক্রমে ক্রমে নিরুত্তাপ করে ফেলছিল।

বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে বাসে করে যেতে যেতে দীপ্তেনের মনে হচ্ছিল দত্তসাহেব তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে শিকারী বেড়ালের মতোই খেলছিলেন। আর খেলতে খেলতে সত্যি সত্যিই সাজার পরিমাণটার কথাই ভাবছিলেন। পাঁচ বছরের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করবে, না গত পাঁচ বছরের ইনক্রিমেণ্ট বাতিল করে দিয়ে পিছিয়ে মাইনে স্থিরীকৃত করবে। অসিতের মতো, দেবব্রত ও রতনদার মতো তিনি তাকে বাইরেও বদলী করে দিতে পারেন। আর বোধ হয় সেটা বেশি স্বাভাবিক।

স্টাইকের পরে এতগুলো পরিবারের সাধারণ কেরানীকুলের সর্বনাশ করেও দত্তসাহেবের ক্রোধের আর উপশম হচ্ছে না, তুষের আগুন হয়ে তা জ্বলছে।

তাদের মাইনে বৃদ্ধির দাবিতে তাদের কোম্পানীর ভারতব্যাপী সমস্ত মিল-কারখানা-অফিসের লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী ধর্মঘট করেছিল। কিন্তু দত্তসাহেবের মতো অফিসারেরা এটাকে কেন ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করল! ক্ষুন্নিবৃত্তির দাবিকে (আহা, ইউ. এন. ও অভিযান শুরু করেছে পৃথিবীকে ক্ষুধা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। অভিযানের শিরোনামা—to attain freedom from hunger. কিন্তু তোমরা তাতে ভরসা রাখনি। নিজেরাই ধর্মঘট অস্ত্র হাতে নিয়েছ, ক্ষুধাকে, অভাবকে কবর দিতে পার নি কত পরিকল্পনার রুপোলি স্বপ্ন বোনা সত্ত্বেও। তোমরা বড্ড অধীর হয়ে উঠেছিলে। বাদলা পোকা যে মরবে সে তার বিধিলিপি। তার জন্যে আগুনকে দায়ী করা বৃথা। নীরেনের এক বন্ধু অনুপম চাকরী হারিয়ে অনাহারের জ্বালায় ও ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ যে ঘটবে এ তোমাদের জানা থাকা উচিত ছিল। দীপ্তেন, এখন এই পরিণতির কথা ভেবে হাহুতাশ করার কোনো মানে হয় না।) তারা তাদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধং দেহি বলে মনে করল! তারা নিজেদেরই কেন কোম্পানীর প্রতিভূ বলে ভাবছে আর শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী যারা কোম্পানীর বিপুল যন্ত্রকে নিরলস বয়ে চলেছে তারা যেন সব কোম্পানীর স্বার্থবিরোধী কণ্টক। তাই দত্তসাহেবরা সুযোগ পেলেই কুঠার নিয়ে কণ্টকের মূলোৎপাটনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ডিজেলের গ্যাস ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে যাওয়া বাসে যেতে যেতে দীপ্তেন ভাবছিল—তার তৈরি স্টেটমেণ্টে ভুলের আশ্রয় নেওয়াটা একটা ছলনা। গণ্ডীবদ্ধ সীতাহরণ ব্যাপারে রাবণ এমনি একটা ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল।

তাকে বধ করবার একটা সূত্র খুঁজছিলেন দত্তসাহেব এবং তার ভুলের ছিদ্রপথ তিনি খুঁজে বের করেছেন।

স্ট্রাইকের ব্যর্থতার পরে তাদের কলকাতা অফিসের কর্মচারীদের বরখাস্ত ও সাসপেনসনের পটভূমিকায় প্রত্যেকটি কর্মচারী হতাশার মুখোমুখি হয়ে পড়ে ও তাদের মধ্যে ভীত ও ত্রস্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়। কোম্পানীর বিশ্বস্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে (অর্থাৎ যে সমস্ত মুষ্টিমেয় কর্মচারী ধর্মঘটের আহ্বান উপেক্ষা করে অফিসে নিয়মিত হাজিরা দিয়েছে) তখন সবাই স্ব স্ব চাকুরী রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বড়বাবুদের নমস্কার করা, দত্তসাহেবকে দেখামাত্র উইস করা ইত্যাদি (যেগুলো আস্তে আস্তে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল) অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে চালু হয়ে যায়। আর তা ছোঁয়াচে রোগের মতোই ছড়িয়ে পড়ে। রেখে ঢেকে নয় প্রকাশ্যে খুশি করা, মনস্তুষ্টি-বিধান যেন প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়ে গেল।

আরও দু-চারটে ছেলের সাথে দীপ্তেন এ ব্যাপারে অসহযোগিতা করেছে প্রবলভাবে আর তাদের অনীহা সবার কাছেই ক্রমশ প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে।

কাজেই দত্তসাহেবের ঘরে ঘটে যাওয়া আজকের ব্যাপারটা ও পরবর্তী ঘটনাবলী অনিবার্য নিয়মে ঘটতে থাকবে, তা অস্বাভাবিক নয়—দীপ্তেন জানে। সে তাই অবাক হয় নি। শুধু একটা প্রত্যক্ষ অপমানবোধ তার মনটাকে তাতাচ্ছে।

তাদের বাসার স্টপ ছাড়িয়ে বাসটা এগিয়ে গিয়েছিল। ভাবনার সমুদ্রে ডুবে থাকা দীপ্তেন হঠাৎ ভেসে উঠল এবং সচকিত হয়ে বাসের দোতলা হতে নেমে এল। ঘরে ঢুকতেই সুলতা দেখতে পেয়ে বলে ওঠে, দীপু এসেছিল। তোর একটা চিঠি আছে। মেসের ছেলেটা এসে দিয়ে গেল। নীতা, দে তো চিঠিটা তোর দাদাকে।

দীপ্তেন সাড়া দিল না, চিঠিতে আগ্রহ দেখাল না। হয়তো আগামীকাল রোববার ভোরেই তাস খেলতে যাবার নেমন্তন্ন পাঠিয়েছে তার পুরনো মেসের বন্ধু কার্তিক। মাঝে মাঝে কার্তিক তাকে এমনি চিঠি পাঠায়।

দীপ্তেন ঘর-ঝাট-দিতে-থাকা মাকে দেখতে থাকল। সুলতার মুখে বয়সের, দুর্ভাবনার, অসুখের ও দারিদ্রতার অনেক ছাপ জড়ো হয়েছে। শীর্ণ মুখখানায় মাটি-ক্ষয়ে-যাওয়া বটের ভেসে-ওঠা শিকড়ের মতো অনেক আঁকিবুকি রেখা জমেছে, চোখ দুটো গর্তে বসে গিয়ে গভীর ক্লান্ত হয়েছে। তার কলকাতায়

বাইরে বদলীর আদেশ বেরোলে (দত্তসাহেব সাজা হিসেবে যদি এটাই বেছে নেয়) সুলতার মুখের অসংখ্য জ্যামিতিক রেখার মাঝে দুশ্চিন্তায় আরও কটি রেখা যুক্ত হবে। দৈনন্দিন সংসার চালানোর ভাবনা সুলতাকে অনবরত পিষ্ট করে তুলছে। তাছাড়া নীতা ও রীতার বিয়ের চিন্তা রাতগুলোকে নির্ঘুম করে রাখছে। ওদের বড়দি মিতা নার্সিং শিখতে শিখতে আকস্মিক-ভাবে আত্মহত্যা করে। সেই থেকে সুলতা ভয়ে ভয়ে আছে, নীতা নার্সিং শেখার দিকে ঝোঁকা সত্ত্বেও সুলতা রাজী হয় নি। আর স্বল্পভাষী দীপ্তেনের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুলতা কোনো এক সময় অবজ্ঞা ও ঘৃণা আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষায় বোমাবর্ষণের মুখোমুখি দাঁড়ান লোকটির মতো থরথর কাঁপছে, আর সেই অসহায় চাউনি মেলে রেখে সুলতা যেন বলে চলেছে—দোহাই ছায়া, তুমি দীপ্তেনের কানে কোনো মন্ত্র দিও না। দোহাই দীপ্তেন, তুমি শুধু ছায়ার মাঝে সুখ খুঁজো না। আর আমাদের পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট জঞ্জালের মাঝে ঠেলে দিও না। আমাদের পিঠে বাড়তি, অতিরিক্ত বা নষ্ট মালের সীলমোহর চাপিয়ে দিয়ে গুদামঘরে ফেলে রেখো না।

সুলতা তাই অনেক ভয়ে ভয়ে কাঁপে আর সংসারটাকে আগলে রাখে। ভয়, সংশয়, দুর্ভাবনা ও দারিদ্র্যতা পরিকীর্ণ জগতে সুলতা অতন্দ্র জেগে থাকে। কিন্তু সুলতা অনুভব করছে ভিত যেন ক্রমেই আলগা হয়ে যাচ্ছে। চুনবালি খসে খসে ইটের দাঁত ভেংচি কাটছে। আর দেখে দেখে ম্যালেরিয়ার-কাঁপুনি-লাগা সুলতা বেশি করে ঠাকুর দেবতা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে।

নীতা ততক্ষণে দাদার হাতে চিঠিটা এনে দেয়। দীপ্তেন খাম ছিঁড়ে (কার্তিক যখনই চিঠি দেবে খামে পুরে আঠা জুড়বে। কার্তিকের এই বিলাসিতা আজও দীপ্তেনকে হাসাল) চিঠি পড়তে পড়তে বলে উঠল, যা ! মনোজটা টেঁসে গেল। পোড়াতে যেতে হবে।

বলেই চিঠি থেকে মুখ সরাতেই দীপ্তেন দেখল, সুলতা তার দিকে প্রশ্ন তুলে তাকিয়ে। আর সাথে সাথে সুলতা বলে ফেলল, টিউশানি, টিউশানি যাবিনে আজ ?

দীপ্তেন দেখল, সুলতার মুখে একটা আতঙ্ক থমথম করছে, কামাই করলেই টিউশানি হাতছুট হয়ে যাবে—এমনি একটা ধারণা সুলতা পোষণ করে। টিউশানি কামাই করার কথা শুনলে সুলতা ভয় পায়।

দীপ্তেন বলবে ভাবল, মা ভয় পেয়ে কোনো লাভ নেই। দত্তসাহেবের

কোপে পড়ে বোধহয় আমাদের কলকাতার পাট তুলতে হবে। টিউশানি দুটো এমনিতেই ছাড়তে হবে। তারপর কলেজের তপন, স্কুলের রীতার কি অবস্থা হবে—আমি জানিনে। সংসারের কি হাল দাঁড়াবে আমি বলতে পারিনে। মা, শুনে তোমার চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু এর কোনো প্রতিকার আমার অজানা। দত্তসাহেব আমাদের মানুষ বলেই গণ্য করেন না। সামান্য ভুলে তিনি আমাদের খাঁচায় আটকানো জানোয়ারদের মতো খোঁচাতে থাকেন। আমি জানি, এখনই ছলছল চোখ তুলে তুমি আমায় দত্তসাহেবের পা জড়িয়ে ধরতে বলবে। আজ ঘেরা-ঘরে তাঁর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রেখে দত্তসাহেব বোধহয় মনে মনে সে অভিলাষই পোষণ করছিলেন। না মা, আমি তা পারব না, কখ্খনো না। কেননা, রমলার দুর্গতি আমি সচক্ষে দেখেছি, তাছাড়া যে ঘরের খোঁটা আলগা হয়ে গেছে, যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে—তা ঠেকা দেবার উৎসাহ আমার আর নেই। জোড়াতালি দিয়ে এ ঘরের বাঁধন আর ঠিক রাখা যাবে না। তা যাক্, একেবারেই ভূমিস্যাৎ হয়ে যাক্।

আসলে কিন্তু দীপ্তেন কোনো কথাই বলল না। চেয়ারে বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বারান্দা ছাড়িয়ে রান্নাঘরে দৃষ্টিটা বোলাল। একজোড়া ফর্সা হাতকে ইঞ্জিনের পিস্টনের ভঙ্গিতে এগিয়ে পিছিয়ে মশলা পেষাই করতে সে দেখছে। ছায়া এখন আসবে না—সে জানে। সাংসারিক কাজে নিরলস পরিশ্রম করা ও রাতে তাকে শয্যায় সঙ্গ দেওয়া ছাড়া পৃথিবীতে আরও কিছু বুঝবার জানবার ভাববার থাকতে পারে—ছায়ার কাছে তা বোধগম্য নয়। ছায়া, তুমি এত ঠাণ্ডা হলে কেন—শীতল! তোমার মাঝে উত্তাপ নেই কেন—তাপ! চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, চারদিকের স্পর্শে ছোঁয়ায় আমি যে জুড়িয়ে যাচ্ছি, আমি যে ঝিমিয়ে পড়ছি।

দীপ্তেন ক্লান্ত স্বরে মাথা নাড়ল। যেন সে এতক্ষণে স্মলতার প্রশ্নের জবাব দিল।

মাঘ মাসের ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ছে চিতার বুকে। আর চিতা লেলিহান হয়ে জ্বলছে। আগুনের শিখা মনোজের দেহটা প্রায় পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে। শান্তিময় আর বারীন খাটিয়া-ভাঙ্গা বাঁশ দিয়ে চিতাটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দিচ্ছিল। নাভিটাকে উলটে পালটে পোড়াচ্ছিল। আর সেটাকে ছোট করাতে মনোনিবেশ করেছিল।

গঙ্গার বুক থেকে ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া জলকণা সংগ্রহ করে তাদের 'পরেও ছোবল মেরে খুবলে খুবলে তাদের মাংস খুলে নিতে চাইছে, আর ওরা সবাই ঘন হয়ে চিতার আগুনকে ঘিরে শরীরকে ওম্ করে রাখার চেষ্টায় রত। অনেকক্ষণ কেউ বিশেষ কোনো কথা বলছে না। শুধু শান্তিময় মাঝে মাঝে অস্ফুটে কি বলছে। বারীন এক-আধটা কি মন্তব্য করছে। আর কার্তিক দীপ্তেনকে লক্ষ্য করে দু-একটা কথার হাউই মাঝে মাঝে ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিন্তু কথার পিঠে কেউ কোনো কথা না জুড়ে দেওয়াতে কোনো ধারাবাহিকতা রক্ষা হচ্ছে না। উত্তুরে দমকা হাওয়া এসে বারবার তা মুছে দিয়ে যাচ্ছে।

হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে-পড়া সেই বুড়ো লোকটা এখন চুপ করে গেছে। জ্বলে-ওঠা একটা চিতার পাশে অনেক লোকের মাঝে সে নেতিয়ে পড়েছে। সেই একটানা তিরতিরে কান্নার স্বরটা আবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

সরোজ ভাবছিল—এই বাকী রাতটুকু সে কোথায় কাটাবে। এত রাতে কৃষ্ণনগর কেন, কোথাকারও ট্রেন পাওয়া যাবে না। এই শীতের মাঝরাতে শ্মশানঘাট থেকে কোন আত্মীয়ের বাড়িই বা সে হানা দেবে।

মনোজকে পোড়াতে এসে দীপ্তেন আজ মরণের কথা ভাবছে না বা মরণকে নিয়ে মন ভারি করছে না। দীপ্তেন জানে মৃত্যু জীবনকে অসত্য করে তোলে। জীবন সত্য—তাই জীবনের জন্যে মানুষের এত ভালোবাসা। আর মনোজের এই মৃতদেহটা মিথ্যে বলেই তারা সবাই মিলে কত সহজে তাকে ভস্মীভূত করে ফেলল।

দীপ্তেন শুধু আজ দত্তসাহেবের আক্রমণের হিংস্র অস্ত্রগুলোর কথাই ভাবছে আর ভাবছে বিশেষ করে কেরানীকুলের কথা, যারা টিঁকে থাকার তাগিদে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াই করছে আর আত্মসমর্পণ করছে।

দীপ্তেন ভাবছে, তাদের দীন অবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন দত্তসাহেব। তাদের আর্থিক অসচ্ছলতার খবর, পারিবারিক জটিল পরিস্থিতির সংবাদ—সব পৌঁছে গেছে দত্তসাহেবদের কাছে। অথবা তাদের মাঝের জোটের অনাস্তিত্বের খবর দত্তসাহেব জানেন বলেই তিনি সাহস সঞ্চয় করেছেন। আর এ-সবের আচ্ছাদনে দাঁড়িয়ে মেঘনাদের মতো তিনি অস্ত্র ছুড়ে যাচ্ছেন অনবরত। দত্ত-সাহেব এ ক'মাস ধরে অর্ডারের পর অর্ডার চালু করেছেন, নিষেধাজ্ঞার পর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। তাদের কোনঠাসা করে ফেলেছেন দত্তসাহেব। তিনি ঠিক বুঝে নিয়েছেন, তারা—কর্মচারীরা দাবি আদায়ে নেমে পশ্চাদপসরণ

করেছে। তাদের জোট ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং এই সুযোগে আঘাতে আঘাতে পঙ্গু করে ফেলতে হবে যাতে তারা আর কোনোদিন সোজাপায়ে দাঁড়াতে না পারে।

তাই নীরেনের চাকুরী গেল, চাকুরী গেল সঞ্জয়ের ও অমিয়ের। বাইরে বদলী হল দেবব্রত ও রতনদা। একহাট লোকের মাঝে তুমি দত্তসাহেব রমলাকে অপমান করতে দ্বিধা করলে না। কেরানীদের তুমি বিকেল পাঁচটার সময় ফিরবার পথে সই করতে বাধ্য করছ, রোজ কাজের শেষে লাইন দিয়ে কাজের ফিরিস্তি আমাদের দাখিল করতে হচ্ছে। সেই লাইনে এগুতে এগুতে সাপ্তাহিক রেশন-পাওয়া রিফিউজিদের কথা আমার মনে পড়ে। লাইন দিয়ে এগুনোটা বিছুটি লাগার মতো মনে জ্বালা ধরায়। কম কাজ ও ভুলের জন্যে তুমি অহরহ আমাদের জবাবদিহি দাবি করছ ও চার্জশীট দিয়ে যাচ্ছে। আর তাতে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েই যাচ্ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইনক্রিমেণ্ট বন্ধের আদেশ জারী করতেও তুমি দ্বিধা করছ না। সামান্য চার টাকা করে বার্ষিক মাইনে বৃদ্ধি তাও বন্ধ করে তুমি আইনের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছ। সেকসনে আকস্মিকভাবে এসে তুমি মাঝে মাঝে হাজির হচ্ছ। কাউকে সিগারেট বিড়ি খেতে বা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখলে তুমি অপমানজনক উক্তি করতেও দ্বিধা করছ না। সেকসনে দাঁড়িয়ে পা চেয়ারে বা টুলে তুলে দিয়ে পাইপ টানতে টানতে তুমি দত্তসাহেব অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে ঘাড়টা এদিক-ওদিক ঘোরাও। একদল পতিত মানবদের মাঝে তুমি দয়া বিলোবার ভঙ্গি কর। আসলে তুমি একটা ভীতিকর আবহাওয়া বজায় রাখতে ভালোবাসো আর কই মাছ জিয়োনোর মতো করে সেই অবস্থাটা টিকিয়ে রাখছ।

এইসব করতে তুমি সাহস পাচ্ছ কারণ আমরা বিচ্ছিন্ন ও একক হয়ে পড়ছি। চাকুরীর সাথে টিউশানির উপরি রোজগার জুড়েও আজ পৃথিবীতে চলতে আমরা নাজেহাল হয়ে পড়ছি। চাকরী খোয়ালে আমরাও অনুপমের মতো জগতে টিকে থাকার ন্যূনতম ভিত্তিভূমিও হারিয়ে ফেলব—তা তুমি জান। আর জান বলেই, দত্তসাহেব, আমাদের প্রতি অবহেলা, তাচ্ছিল্য ও অসম্মান দেখাতে তুমি অকুণ্ঠ।

উত্তুরে হাওয়ার মৃত্যুশীতল হাত হতে অব্যহতি পাবার আকাঙ্ক্ষায় দীপ্তেনরা ঘন হয়ে চিতার পাশে বসে। সেইখানে মনোজের মৃতদেহ এইমাত্র

দাহ করা হল। নাভির শেষ টুকরোটা পোড়াবার জন্তে বারীন আর শান্তিময় শিখা সরে আসা গনগনে চিতাটা খোঁচাখুঁচি করছে। আশেপাশে বা খানিক দূরে আর কটি চিতা জলল বা নিভল। ঘন অন্ধকারের বুকে লাল আগুন কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। ছাই আর ধোঁয়া উড়ছে অবিরাম। কান্নার স্বর এখানে-ওখানে ঠাণ্ডা হাওয়ার মতোই শিষ খেয়ে খেয়ে ছড়াচ্ছে। এই এলাকাটা পেরোলেই ব্যস্ত জীবন কান্নার ঢেউটাকে নিশ্চিহ্ন করে শুষে নেবে। জীবনের হাতে হাত মিলিয়ে মানুষ আবার মৃত্যুকে ভুলবে। চিতার 'পরে আড়াআড়ি সাঁকোর মতো বিন্যস্ত হয়ে থাকা অর্ধদগ্ধ একটা গুঁড়ির তলায় চাক চাক আগুন গলিত লাভাস্রোতের মতো ঝলসাচ্ছে। সেই দিকে তাকাতে তাকাতে দীপ্তেন ভাবছে, পৃথিবীতে টিকে থাকার সংগ্রামে আমরা ক্রমশ হেরে যাচ্ছি, পিছিয়ে পড়ছি! অনুপম গলায় দড়ি পড়েছে, নীরেনের স্ত্রী রমলা আত্মসম্মানের গলায় ফাঁস লাগিয়ে দত্তসাহেবের ঘেরা-ঘরে ঢুকে পড়েছিল। মিতার আত্মহত্যার কথা ভেবে, নীতা, রীতা, তপনের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আমি ঝিমিয়ে পড়ছি। ছায়া তুমি যেন ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়ে, তোমার ছায়ায় কোনো তাপ নেই।

তবুও টের পাই মাঝে মাঝে আমরা হিংস্র নেকড়ে, খ্যাপা কুকুর হয়ে উঠছি আমি, নীরেন, সঞ্জয়, অমিয়, অসিত, দেবব্রত, রতনদা, সবাই। ক্ষুধার্ত সিংহের মতোই আমরা সব ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ছি। কেটলির ভেতরকার ফুটন্ত জলের মতো আমরা ফুটছি। একটা হিংস্রতা, ক্রূরতা আমাদের মধ্যে জোট পাকাচ্ছে, পাকাতে থাকছে। দত্তসাহেব, তুমি আমাদের সঙ্গে হীনমন্যতা নিয়ে কথা বলো না, ভিক্ষুকের মতো কথা কয়ো না। অবহেলা আমরা বেশিদিন সইব না। কারণ জীবনে আমরা অনেক ভুগেছি। কবে আমরা মরিয়া হয়ে তোমার টুঁটি টিপে ধরব। তারপর আদিম মানুষের মতো তোমায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে আগুনে ঝলসে ঝলসে খাব। আর আগুন ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে আমরা নাচব।

চিতাটা এতক্ষণে পুরোপুরি নিভে গেছে। গঙ্গা হতে বয়ে আনা অনেক ঘড়া জল দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করা হয়েছে। এখন ওরা একে একে উঠে দাঁড়াল—সরোজ, দীপ্তেন, কার্তিক, অনন্ত, রবি, বারীন, শান্তিময়—সবাই। তারপর হিমের হাওয়ার ঝাপটা সইতে সইতে জলন্ত চিতার পাশ কাটিয়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা ভেজা কান্নার মাঝ দিয়ে ওরা ধীরে ধীরে এলাকাটা পেরোতে লাগল।

জনৈক পর্যবেক্ষক

মার্কিন দেশে অধিকারের দাবিতে আন্দোলন

['পরিচয়'-এর জন্য লিখিত এই প্রবন্ধটির লেখক এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জনৈক মার্কিন ছাত্র ও গবেষক। ফলে স্বভাবতই এই আন্দোলনের যে চিত্র এখানে প্রতিফলিত হয়েছে তার মূল্য অপরিসীম, ও তার যাথার্থ্য সন্দেহাতীত।—অনুবাদক]

নাগরিক অধিকারের দাবিতে মার্কিন জনসাধারণের সংগ্রাম সংকটকালে এসে দাঁড়িয়েছে। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, গৃহীত বা আলোচ্য আইনসমূহ এবং নাগরিক অধিকারের দাবিতে সংগ্রামরত সংগঠনগুলির ঘোষিত লক্ষ্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরে ও দক্ষিণে লক্ষ লক্ষ নিগ্রো নতুন আশা ও ভরসা পেয়েছেন। তবু সংকটের পশ্চাতে কারণ আছে: অগ্রগতি এসেছে বড় মন্থর পদক্ষেপে, সামান্যতম অগ্রগতির জন্যও বিরাট প্রতিদান দিতে হয়েছে, দক্ষিণ প্রদেশের অভ্যন্তরে এবং উত্তরের আপাত-উদার শহর ও শহরতলীতে আন্দোলনের কর্মীরা বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। নিগ্রো-সমাজকে সমানাধিকার, শিক্ষা ও সুযোগ খুলে দিলেই মার্কিন সমাজের উপর সামগ্রিকভাবে গঠনগত ও মৌলিক পরিবর্তন-সাধনের দায় এসে পড়তে পারে, এই সম্ভাবনা যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

বিগত দশকে, বিশেষত কয়েক বছরে, নাগরিক অধিকারের আন্দোলন ক্ষমতা, প্রসার ও সংগঠনীশক্তি লাভ করেছে। তথাপি মানতে হবে, এই আন্দোলনের সূত্রপাত পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল আগে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের অগ্রগতির জন্য জাতীয় সংগঠন (এন. এ. এ. সি. পি) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। এই আন্দোলনের প্রথম চল্লিশ বছরে নিগ্রো-সমাজ আইনের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সুযোগমাত্র আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর পরেও নিগ্রো নাগরিক দক্ষিণাঞ্চলে চূড়ান্ত বৈষম্যের শিকার, উত্তরের শহরগুলিতে স্বতন্ত্র বস্তির বাসিন্দা, এবং নিজের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, এমনকি ধর্মজীবনেও সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত

হয়ে রইলেন। শাসনতন্ত্রের নির্মাতারা নিগ্রো নাগরিককে নাগরিকত্বের ভগ্নাংশরূপে কল্পনা করেছিলেন; কিন্তু কার্যত নিগ্রো নাগরিককে দাঁড়াতে হল মনুষ্যেতর জীবের পর্যায়ে। রাল্‌ফ্‌ এলিসনের ভাষায়, তাঁকে হতে হল "এক অদৃশ্য মানুষ", মানুষ হিসেবে তাঁর অস্তিত্ব রইল না। তাঁদের কৃষ্ণাঙ্গ ভ্রাতারা জীবনে প্রতিদিন যে অপমান ও অন্তর্বেদনা সহ্য করেন, তার খবর মার্কিন শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছে পৌছয় না বললেই চলে। কিছু অনুসন্ধিৎসু রিচার্ড রাইট্‌, জেম্‌স্‌ বল্‌ড্‌উইন, রাল্‌ফ্‌ এলিসন্‌ প্রমুখ সৃষ্টিশীল লেখক-লেখিকাদের রচনায় নিগ্রো-সমাজের গভীর অন্তর্বেদনার পরিচয় লাভ করেছেন। চারপাশের মানুষের কাছ থেকে স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের ঘৃণা, তাঁদের ভালোবাসা, এই লেখকেরা কাব্যময় শৈলীতে বেদনার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

আইনের ক্ষেত্রে এন. এ. এ. সি. পি-র দীর্ঘ আন্দোলনের সার্থকতম পরিণতি আসে ১৯৫৪ সালে। ১৮৯৫ সালে নিগ্রো-সমাজকে "স্বতন্ত্র অথচ সমান" রাখার যে নীতি চালু হয়েছিল, এই বছর সেই নীতির বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিলেন—তাঁরা রায় দিলেন, স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা নীতিগতভাবে অসাম্যের দ্যোতক। এই সিদ্ধান্তে গভীর আনন্দের সঞ্চার হয়। অথচ এক দশক পরে দেখা যায়, উত্তরের যে সব শহরে স্বতন্ত্র নিগ্রো-বসতি বর্তমান এবং দক্ষিণের সর্বত্র নিগ্রো ছেলেমেয়েদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পায়। যখন দেখি অসংখ্য নিগ্রো ছেলেমেয়ে স্বল্পবিত্ত ক্ষীণপ্রাণ বিদ্যালয়গুলিতে এখনও পড়তে যায়, তখন সেই দৃশ্যের পাশে কেণ্টাকি, টেনেসি, হাণ্ট্‌স্‌ভিল্‌, আলাবামা, অ্যাট্‌লাণ্টা ও জর্জিয়ায় আমাদের জয়লাভের তাৎপর্য ম্লান হয়ে যায়। উত্তরের বহু অঞ্চলে বসতির ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যের নীতি স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যত বর্ণবৈষম্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই সব অঞ্চলে এবার বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছে। এই মুহূর্তে নিউ ইয়র্ক ও শিকাগোয়, মণ্টগোমরি ও বার্মিংহামের বিদ্যালয়ে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের একত্রে শিক্ষালাভের সুযোগদানের দাবি বলীয়ান হয়ে উঠেছে।

১৯৫৪ সালের পরবর্তী এই কর্মব্যস্ত দশকে নাগরিক অধিকারের সপক্ষে অভিযানরত সংগঠনসমূহ ও শ্রমিকদের এক শক্তিশালী বাহিনী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মার্টিন লুথার কিং-এর নেতৃত্বে দক্ষিণী খৃষ্টীয় নেতৃত্ব সম্মেলন (এস. সি. এল. সি), জেম্‌স্‌

ফার্মারের নেতৃত্বে বর্ণসাম্য কংগ্রেস (সি. ও. আর. ই), অহিংস ছাত্র সংযুক্ত কমিটি (জিম ফোরম্যান ও জন লিউইসের নেতৃত্বে এস. এন. সি. সি. বা স্নিক্.)। এই সবকটি সংগঠনই অহিংস পন্থায় প্রত্যক্ষ গণ-অভিযানের পক্ষপাতী। এই সংগঠনগুলি সহস্র সহস্র শান্তশিষ্ট ভীরু মানুষ ও নির্লিপ্ত পর্যবেক্ষককে আন্দোলনের পথে নামিয়েছে। এঁরা উদাসীন কলেজ-ছাত্রদের কলেজের গণ্ডির বাইরে এনে ভোটারদের নাম লেখানোর অভিযানে, যানবাহনে বৈষম্যের বিধিভঙ্গের অভিযানে এবং নানা ধরনের সত্যাগ্রহে সামিল করেছেন। ভীত ও সন্ত্রস্ত দক্ষিণী নিগ্রোদের এঁরা ঘর থেকে বের করেছেন, ভোটার হিসেবে নাম লেখানোর লাইনে দাঁড় করিয়েছেন, অর্থনৈতিক বয়কটের আন্দোলনে দাঁড় করিয়েছেন।

আলাবামার মন্টগোমারিতে মধ্যবয়সিনী জনৈকা নিগ্রো বিধবা রোজা পার্কস্ শ্বেতাঙ্গ যাত্রীকে আসন ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে যে আন্দোলন শুরু করে দেন, তারই পরে এস. সি. এল. সি গঠিত হয়। এই অভিযানের উত্তেজনায় উদ্বুদ্ধ আন্দোলনে আবেগপ্রবণ ও গুণী ধর্মপ্রচারক মার্টিন লুথার কিং নিগ্রো সমাজের অগ্রণী প্রবক্তা ও নেতারূপে সামনে এগিয়ে আসেন। এস. সি. এল. সি-র শাখাপ্রশাখা বর্তমানে সমগ্র দক্ষিণ প্রদেশে ছড়িয়ে গেছে। প্রধানত নিজেদের শাখাপ্রশাখা ও এস্. এন্. সি. সি-র নেতৃত্বে পরিচালিত প্রত্যক্ষ অভিযানেই এই সংগঠনের তহবিল ব্যয়িত হয়।

বর্ণসাম্য কংগ্রেস ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এতাবৎকালের মধ্যে অহিংস গণ অভিযানগুলির জন্য অসংখ্য সংগ্রামী কর্মীকে প্রস্তুত করে তুলেছে। জেম্স্ ফার্মারের নেতৃত্বে 'কোর'-এর কর্মীরা ১৯৬১ সালে দক্ষিণ প্রদেশের অভ্যন্তরে যানবাহনে বর্ণবৈষম্যের বিধি অগ্রাহ্য করে আন্তঃরাজ্য পরিবহন ব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্যের নীতিকে আঘাত হেনে ভেঙে দেয়। গত বছর 'কোর'-এর সংগ্রামী কর্মীরা উত্তরের রাজ্যসমূহ ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পসমূহে কর্মী নিয়োগে বর্ণবৈষম্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এঁরা নিউ ইয়র্ক ও ফিলাডেল্ফিয়ায় গৃহনির্মাণ শিল্পে নিগ্রো শ্রমিকদের জন্য কাজ আদায় করে দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমানাধিকার ও সমান সুযোগের সপক্ষে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও যুক্তিনির্ভর বক্তাদের মধ্যে ফার্মার অন্যতম।

১৯৬০ সালে উত্তর ক্যারোলিনায় গ্রীন্সবরোয় ছাত্রেরা যে অবস্থান ধর্মঘট

শুরু করেন, তা অচিরেই সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। এই অভিযানের মধ্যেই কয়েকজন সংগঠক কর্মকর্তা ও ছাত্রকর্মীদের নিয়ে গঠিত এস্. এন্. সি. সি নামে সংগ্রামী গোষ্ঠীর জন্ম হয়। এই অভিযানগুলির পরেই ছাত্রেরা স্থির করেন যে, তাঁদের সংগঠন দক্ষিণ প্রদেশের সবচেয়ে গোঁড়া অঞ্চলগুলিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর অভিযানের পথ নেবেন। আঠারো-উনিশ থেকে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের ছাত্রেরা এস্. এন্. সি. সি কর্মীরূপে ন্যূনতম মাসোহারার বিনিময়ে কিংবা সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত আহার্যের দানে নির্ভর করে দক্ষিণ-পশ্চিম জর্জিয়া, মিসিসিপির বদ্বীপ অঞ্চলে; আলাবামার কৃষ্ণাঙ্গপ্রধান অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে নির্লিপ্ত ও পরপদানত দক্ষিণী নিগ্রোদের ভোটাধিকারের দাবিতে ঘরের বাইরে টেনে আনেন। মিসিসিপি ও আলাবামায় ভোটাধিকারের যোগ্যতাবিশিষ্ট নিগ্রোদের মধ্যে বোধহয় শতকরা দুই বা তিন ভাগ মাত্র ভোটারতালিকায় স্থান পেয়েছেন। অথচ শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে শতকরা ষাট ভাগ বা আরো বেশি এই অধিকার লাভ করেছেন। এই রাজ্যগুলির অনেক জেলায় নিগ্রোরা জনসমষ্টির অর্ধেকেরও অধিক, এবং সেই হেতু বিপুল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনাও তাঁদের হাতে।

এস্. এন্. সি. সি কর্মীরা নিগ্রো-সমাজের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও আশা ফিরিয়ে আনবার প্রয়াসে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। অথচ এই সব অঞ্চলে আসল লাভ বলতে সামান্যই হয়েছে। রাজ্য-শাসকমণ্ডলী, স্থানীয় রাজনীতিবিদেরা, পুলিশবাহিনী ও ফ্যাশিস্ট গুণ্ডারা বহুযুগ ধরে আপন মর্জিমাফিক যেখানে দাপটে রাজ্য চালিয়েছে, সেখানে একদিনেই পরিবর্তন আশা করা যায় না। "শ্বেতাঙ্গ শক্তির শক্তিস্তম্ভের" বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে এস্. এন্. সি. সি কর্মীদের জেলে যেতে হয়েছে, মার খেতে হয়েছে, গুলি খেতে হয়েছে। আশ্চর্য শৌর্যের জোরেই তাঁরা ময়দানে অনড় থেকেছেন। স্থানীয় দক্ষিণী কর্তারা নাগরিক অধিকারের দাবিতে অভিযানরত কর্মীদের মার লাগিয়েছে, আর এফ. বি. আই নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। স্নিক্‌নিক্‌রা কাজ করছেন এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী আবহাওয়ায়, আইন তাঁদের আশ্রয় দেয় না, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় কোনো শাসকমণ্ডলীই তাঁদের বাঁচাতে এগিয়ে আসে না। তাঁরা একা নিঃসহায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

চতুর্থ যে সংগঠনটি গত কয়েক বছরে এগিয়ে এসেছে, তাদের নাম কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান সম্প্রদায়। কেবলমাত্র নিগ্রোদের এই সংগঠনটিতে সদস্যেরা শ্বেতাঙ্গদের

ধর্ম বলে ঘোষণা করে খৃষ্টধর্মকে ত্যাগ করে এক বিচিত্র মুসলিম ধর্মনীতি গ্রহণ করেছেন। এই ধর্মনীতির শিক্ষা, সকল শ্বেতাঙ্গই মূর্তিমান পাপ; তাই নিগ্রো তাঁর প্রাপ্য সমানাধিকার পেতে পারেন কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গবিহীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে। এই মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা সুকঠোর এক নীতিতন্ত্র অনুসরণ করেন, এবং এঁরা নিজেদের দোকানপাট ও সমবায় প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা করেছেন। অপরাধপ্রবণ নিগ্রোদের সুনীতির কঠোর শাসনের আওতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় এঁরা উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। এঁদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিকে প্রায় কেউই আমল দেন না, কিন্তু মার্কিন নিগ্রোর উপর শ্বেতাঙ্গশ্রেণী এমনকি ধর্মের নামেও যে উৎপীড়ন চালিয়েছে, তার তিক্ত কাহিনী এঁরা যখন তুলে ধরেন, তখন অনেকেই কান পেতে শোনেন। সংখ্যাগুরু শ্বেতাঙ্গশ্রেণীর সুযোগ-সুবিধার তুলনায় নিগ্রো-সমাজ আন্দোলনের দ্বারা যেটুকু লাভ করেছেন, তার সামান্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এঁরা অন্যান্য সংগঠনগুলিকে দীর্ঘসূত্রতার পর্যায়ক্রমিক নীতি ছেড়ে বলিষ্ঠতর নীতির দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি এই সম্প্রদায়ের প্রধান মুখপাত্র ও অন্যতম নেতা দশম ম্যাল্‌কম্‌ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি এক কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান সমাজের ধর্মীয় সংস্কারগুলির কয়েকটি বর্জন করে অপেক্ষাকৃত ধর্মনিরপেক্ষ কর্মপ্রয়াসের আহ্বান জানিয়েছেন।

নাগরিক অধিকার আন্দোলন গত দশ বছরে অধিকতর শক্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই দু-ভাবে প্রসার লাভ করেছে। প্রথমত, এই আন্দোলন দক্ষিণের সীমিত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উত্তরাঞ্চলের অভিযানসমূহে তার শক্তিকে চালিত করেছে। উত্তরাঞ্চলে বর্ণবৈষম্য আরো জটিল আকারে প্রায়শই লুকিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের ক্ষেত্র স্কুল-কলেজ বা খাবারের দোকান ছাড়িয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের সামগ্রিক চক্রে মিশে গেছে। এই দুই ভাবে প্রসারের ফলে বৃহত্তর সংখ্যায় সক্রিয় যোগদানে আন্দোলনের লোকবল বৃদ্ধি পেয়েছে, আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরন্তু এতগুলি বিভিন্নধর্মী সংগঠনের আবির্ভাব এবং নীতি ও প্রভাবক্ষেত্রের প্রশ্নে এদের বিরোধ-হেতু সংগঠনগুলি আরো চিন্তাসমৃদ্ধ এবং তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, কর্মপ্রয়াসে গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে সহযোগিতার মূল্য উপলব্ধি করেছে।

এই জাতীয় সমবেত প্রয়াসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গত অগস্ট মাসে ২০০,০০০ মানুষের ওয়াশিংটন অভিযান। এই শোভাযাত্রীরা ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভের সম্মুখে সমবেত হয়ে কন্‌স্টিটিউশন অ্যাভিনিউ ধরে পদযাত্রা করে লিঙ্কন্ স্মৃতিস্তম্ভে গিয়ে পৌছয়। সবকটি সংগঠনই এই অভিযানের পরিচালনায় একত্রে কাজ করে, সবকটি সংগঠনের নেতাই সমবেত জনতার কাছে ভাষণ দান করেন। সেদিন অনেকেই বক্তৃতা করেন, গান করেন। কিন্তু রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিং সমগ্র জনতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে ঘোষণা করেন: "যেদিন আমরা স্বাধীনতার ডঙ্কা বাজিয়ে দেব, যেদিন তার ধ্বনি প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক শহরে, প্রত্যেক রাজ্যে প্রতিধ্বনিত হবে, সেদিন জানব, সেই দিন সমাসন্ন, যেদিন ঈশ্বরের সকল সন্তান, কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ, ইহুদী খৃষ্টান, প্রোটেস্টাণ্ট ক্যাথলিক, হাতে হাত ধরে সেই পুরনো নিগ্রো ধর্মসঙ্গীতের কথাগুলি গেয়ে উঠবে:

এতকাল পরে মুক্ত,
এতকাল পরে মুক্ত,
ঈশ্বর, ধন্যবাদ,
আমরা এতকাল পরে মুক্ত।" *

আগে কখনো মিসিসিপির বাইরে আসেননি এমন এক নিগ্রো মহিলা সেদিন বলেন যে, এর আগে কোনোদিন কোনো শ্বেতাঙ্গ মানুষের কাছে তিনি সৌজন্য পাননি।

কিন্তু এই একটি দিনের ঘনিষ্ঠ তাপ ও সৌহার্দ্য আমাদের কিছুটা বিমূঢ় করে দেয়। আমরা ভুলে যাই যে, দীর্ঘ ক্লান্তিকর অভিযান এই তো সবে শুরু, এই শোভাযাত্রা যেন হিসেব মিলিয়ে নেব বলে ক্ষণেকের বিরাম। মাত্র

* When you let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing, in the words of the old Negro spiritual,

Free at last,
Free at last.
Thank God Almighty,
We are free at last.

কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আলাবামার বার্মিংহামে এক নিগ্রো গীর্জায় বোমা পড়ল, চারটি নিগ্রো মেয়ে মারা গেল, সেইদিনই কৃষ্ণাঙ্গপ্রধান অঞ্চলের সেই অন্তরহীন অন্তরে আরো দুটি নিগ্রো যুবক আততায়ীর গুলিতে মারা গেল।

তার পরের কয়েকটি মাস ধরে অভিযান আবার শক্তি সংগ্রহ করে চলল। নিউ ইয়র্ক ও শিকাগোয় বৈষম্যভিত্তিক বিদ্যালয় নীতির বিরুদ্ধে বিদ্যালয়সমূহে পূর্ণ ধর্মঘট হ'ল। এই দুটি শহরের প্রত্যেকটিতেই ১০০,০০০-এর অধিক ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট করে। নিউ ইয়র্ক স্কুল বোর্ড বর্তমানে একজাতিক বিদ্যালয় বর্জন করার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা রচনার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু শিকাগোয় অভিযানের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে অনড় অটল স্কুল বোর্ড এবং শ্বেতাঙ্গ সমাজের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা।

এস্. এন্. সি. সি ও এস্. সি. এল্. সি দক্ষিণ প্রদেশে তাঁদের প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, উত্তরে নিগ্রোদের চাকুরীর দাবিতে 'কোর' তাঁদের চাপ বজায় রেখেছেন। এই বছর সংগঠনগুলি অধিকতর ও দ্রুততর অগ্রগতির দাবিতে আরো গণঅভিযানের পথে নামবেন।

সামনে বিপদ আছে। নিগ্রো বেকারী হ্রাসের চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকারসহ সরকারী সংগঠনসমূহ এবং নাগরিক অধিকাররক্ষা সংস্থাগুলি তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। নিগ্রো বেকারীর ভার এখনও শ্বেতাঙ্গশ্রেণীতে বেকারীর (শতকরা ৫.৬ ভাগ) দ্বিগুণ। বৈষম্যমুক্ত বিদ্যালয়ের জন্য আন্দোলন ও ভোটাধিকারলাভের অভিযানেও নামমাত্র অগ্রগতি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, নিগ্রোদের সমস্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরিদ্রতম শ্রেণীর সমস্যারই আরেক বৃহত্তর রূপ।

নিগ্রোরা সবচেয়ে স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিক। তাই স্বভাবতই স্বয়ংক্রিয়তা প্রবর্তনে ও লে-অফ্ বা সাময়িক বরখাস্তে এঁরাই সবার আগে মার খান। স্বল্পদক্ষ বেকার নিগ্রো শ্রমিকের কর্মসন্ধানের প্রশ্ন আজ স্বয়ংক্রিয়তার পথে দ্রুত অগ্রসরমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নমনশীলতা, বিকাশসম্ভাবনা, ও কর্মসুযোগের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মৌলিক সন্দেহের মধ্যে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে। অদক্ষ শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকেরাও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কিন্তু সামাজিক শ্রেণীরূপে নিগ্রোরা আরো বেশি ভুগছেন, কেননা, বর্ণবৈষম্যের খড়্গ তাঁদের বিরুদ্ধে সদা উদ্যত। নিগ্রোরা যে কী পাপচক্রে পড়েছেন,

তারই প্রমাণ। তাঁরা যতদিন দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা পাবেন, ততদিন তাঁরা চাকুরীর বাজারে অধিকতর শিক্ষিত শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়েই থাকবেন। নিগ্রোদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিপুল উন্নতি এবং তাঁদের কর্মপ্রাপ্তির সুযোগবৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। সেক্ষেত্রেও এই মুহূর্তে জীবিত স্বল্প-শিক্ষিত নিগ্রোশ্রেণী তথা প্রাপ্ত বয়স্কদের বৃহত্তর অংশ মার্কিন নাগরিককুলের দরিদ্রতম শ্রেণীরূপে তাঁদের জীবন কাটিয়ে দেবার দায় থেকে কিছুতেই মুক্তি পাবেন না। অবশ্য একথা উল্লেখ্য যে, অদক্ষদের শিক্ষাদান ও দরিদ্রদের সাহায্য দানের একটি অপর্যাপ্ত সরকারী পরিকল্পনা রাষ্ট্রপতি জন্‌সন্‌ প্রস্তাব করেছেন। এ যেন মরুপ্রান্তরে জলবিন্দু। এ পথে আশু কোনো পরিবর্তন আসবে না। দি 'আর্বান লীগ' নামে একটি নিগ্রো সংগঠন তাঁদের পরিচালক হুইট্‌নি ইয়ং-এর নেতৃত্বে প্রস্তাব করেছেন যে, নিগ্রো সমাজকে অনুন্নত জাতি বলে বিবেচনা করা হোক এবং তাঁদের জন্য বিশেষ সরকারী সহায়তা ও শিক্ষার ব্যবস্থা হোক। এই প্রস্তাবটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে এখন আলোচনা চলছে।

অন্যদিকে মার্কিন বর্ণবিরোধের ক্ষেত্রে হিংসাত্মক নীতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই আশঙ্কা দক্ষিণাঞ্চলের অভ্যন্তরে এবং নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ফিলাডেল্‌ফিয়া ও ওয়াশিংটনের স্বতন্ত্র নিগ্রো বসতি অঞ্চলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণীশ্রেণী ও স্থানীয় পুলিশের সংগঠিত পাশবিকতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র নিগ্রো প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন নৌবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক ও এন্‌. এ. এ. সি. পি-র প্রাক্তন শাখা-সভাপতি রবার্ট উইলিয়ম্‌স্‌। উত্তর ক্যারোলিনার মাল্‌রোয় উইলিয়ম্‌স্‌ নিগ্রোদের অস্ত্র যোগান, তাঁদের অস্ত্রশিক্ষা দেন। তাঁদের উপর শ্বেতাঙ্গেরা গুলি চালালে, তাঁরা গুলিতে জবাব দেন। অল্পকাল পরেই উইলিয়ম্‌স্‌ সহ অন্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে স্থানীয় পুলিশ কিড্‌ন্যাপিং-এর অভিযোগে একটি সাজানো মামলা ঠুকে দেয়। যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়, তাঁরা সকলেই পলায়ন করেন। কিন্তু অনেকেই পরে ধরা পড়েন, আজ তাঁরা মাল্‌রোয় মৃত্যুদণ্ডের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। রবার্ট উইলিয়ম্‌স্‌ প্রথমে ক্যানাডা ও পরে সেখান থেকে কিউবায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। উইলিয়ম্‌স্‌ কিউবাতেই রয়ে গেছেন। তিনি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য প্রচারিত 'রেডিও ফ্রী ডিক্‌সি' অনুষ্ঠানের পরিচালক।

সম্প্রতিকালে বিশিষ্টতর নিগ্রো নেতা কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান সম্প্রদায়ের পূর্বতন প্রধান প্রবক্তা দশম ম্যালকম নিগ্রোদের আত্মরক্ষার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন : "যে মানুষ অবিরত পাশবিক আক্রমণের শিকার, তাকে আত্মরক্ষা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেওয়া অপরাধ। হাতের কাছে একটি শট্‌গান বা রাইফেল রাখা আইনানুগ। যে সব অঞ্চলে পাশবিকতার হাত থেকে নিগ্রোদের রক্ষা করতে সরকার অনিচ্ছুক বা অপারগ, সেখানে আমাদের কর্তব্য রাইফেল-ক্লাব গঠন করে আপৎকালে নিজেদের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করা। আমাদের লোককে যখন কুকুরে এসে কামড়ায়, তখন সেই কুকুরকে বধ করার অধিকারও আমাদের আছে।"

উপরোক্ত সংগঠনগুলি এজাতীয় হিংসাত্মক নীতি এড়িয়ে চলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। হিংসার পথে উন্নতি আসবে না, হয়তো কেবল কঠিনতর বিরোধই আসবে। প্রতিনিধি সংসদে অনুমোদিত অথচ সেনেটে দক্ষিণীদের বিরোধিতায় বাধাপ্রাপ্ত নাগরিক অধিকার বিলটিকে অনুমোদনদানের দাবিতে এঁরা গলা মেলাচ্ছেন।* কিন্তু শুধু আইন যথেষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীকে এই আইনকে দৃঢ়সঙ্কল্পে দ্রুততার সঙ্গে কর্মে রূপ দিতে হবে। সম্প্রতি মার্টিন লুথার কিং ও এস্. এন্. সি. সি-র উপদেষ্টা হাওয়ার্ড জিন্ দাবি জানিয়েছেন যে, দক্ষিণাঞ্চলে নাগরিক অধিকার আন্দোলনে যোগদানকারীদের রক্ষার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি ব্যবহার করতে হবে। রাষ্ট্রপতি জনসন্ কী ভাবে এই সংকটের সম্মুখীন হবেন, তা-ই দেখবে বলে সবাই অপেক্ষারত। এই সহায়তাদান ও দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোদের ভোটার হিসেবে নাম লিপিবদ্ধ করবার সুযোগ দিতে হবে, এই দাবিতে স্থিরনিশ্চয় পদক্ষেপ করবার আইনগত অধিকার তাঁর হাতে আছে। যদি কংগ্রেস ও নাগরিক অধিকার সংস্থাগুলি তাদের ভূমিকা পালন করে, শাসন-কর্তৃপক্ষকেও তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। সকল শক্তির এই সমবেত প্রয়াসেই আমরা এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারি। জেম্‌স্ বল্‌ড্‌উইন্ এই চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছেন: "বর্ণসাম্যের যদি কোনো অর্থ থাকে, তবে তার অর্থ এই: ভালোবাসার শক্তিতে আমরা আমাদের ভ্রাতাদের দৃষ্টির আবরণ উন্মুক্ত করে তাদের আপন সত্তাকে তাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত

* আইনটি সম্প্রতি পাশ হয়েছে।

করে তুলব, বাস্তব থেকে পলায়ন করব না, তার পরিবর্তন শুরু করে দেব। মার্কিনীরা কবে প্রাপ্তবয়সী হয়ে উঠে উপলব্ধি করবে যে আমরা তাদের শত্রু নই, সেইদিনের জন্য হাতে টুপি ধরে এতদিন অপেক্ষা করে থাকা, এ বড় ক্লান্তিকর। নিগ্রোই আজ এ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তার ভবিষ্যৎ আলোকদীপ্ত হবে কি অন্ধকারেই আচ্ছন্ন থাকবে, এই প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপরেই মার্কিন দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। শহরে গ্রামে, আইনের চোখে, মনের গভীরে কৃষ্ণাঙ্গের পূর্ণ মুক্তিকে স্বীকার করেই শ্বেতাঙ্গ জনতা তাদের নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারবে। এই মুহূর্তেই সামনে সেই চ্যালেঞ্জ। কাল নিরবধি বর্তমান।" *

অনুবাদ : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

* And if the word *integration* means anything, this is what it means : that we with love, shall force our brothers to see themselves as they are, to cease fleeing from reality and begin to change it.

It is galling to have stood so long, hat in hand, waiting for Americans to grow up enough to realise that you do not threaten them.

He (the Negro) is the key figure in this country, and the American future is precisely as bright or as dark as his.

The price of the liberation of the white people is the liberation of the blacks—the total liberation, in the cities, in the towns, before the law, and in the mind.

The challenge is the moment, the time is always now.

পুস্তক-পরিচয়

Bengali Folk-Ballads from Maimansing and the Problem of Their Authenticity : Dr. Dusan Zbavitel. University of Calcutta : 1963 : Rs. 12.00.

ডক্টর দুশান্ জ্‌বাভিতেল্ চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাচ্যবিদ্যা ইন্‌স্টিট্যুটের ভারতীয় বিভাগের অধ্যক্ষ। বহুকাল ধরে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় রত রয়েছেন। বহু বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি তিনি তাঁর মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছেন। চেক্ ভাষায় তিনি একজন জনপ্রিয় লেখকও বটেন। গত বছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে একবার শ্রীজ্‌বাভিতেল্ বলেন যে, তিনি নিজেকে একজন বাঙ্গালী বলেই মনে করেন, এবং শুধু তাই নয়, তিনি মৈমনসিংহ গীতিকার মাধুর্যে এতই মুগ্ধ যে নিজেকে তাঁর মৈমনসিংহের বাঙ্গাল বলে ভাবতে ভালো লাগে। কথাটির আন্তরিকতা বক্তৃতা-সভার সভাপতি এমনকি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মশায়েরও হৃদয় স্পর্শ করেছিল। আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের প্রতি শ্রীজ্‌বাভিতেলের অন্তরের সুগভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। যে পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার সঙ্গে মৈমনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা তিনি পরীক্ষা করেছেন তার জন্য বাংলা সাহিত্য-সেবীদের শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ তাঁর অবশ্য প্রাপ্য। প্রসঙ্গত শ্রীজ্‌বাভিতেলের দেশবাসী আরেকজন মনীষীর কথা মনে পড়ছে—তিনি ভিণ্টারনিৎস্। বলতে দ্বিধা নেই—শ্রীজ্‌বাভিতেল্, ভিণ্টারনিৎসের যোগ্য উত্তরসূরী।

আলোচ্য পুস্তকটির ভূমিকায় শ্রীজ্‌বাভিতেল্ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁর উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন। মৈমনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের সংশয় ও তার ফলে মৈমনসিংহ গীতিকার যথোপযুক্ত মূল্যায়নে সমালোচকমহলে দ্বিধা শ্রীজ্‌বাভিতেলের কাছে অত্যন্ত মনে হয়েছে। হয় কেউ প্রমাণ করুন যে মৈমনসিংহ গীতিকা একটা বড়োরকমের ধাপ্পাবাজী আর না হয় সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করুন যে বাংলা সাহিত্যের এই গ্রামীণ সম্পদ খাঁটি এবং নির্ভেজাল। শ্রীজ্‌বাভিতেল্

মনে করেন যে দুটোর কোনোটাই করা হয় নি। উভয় পক্ষই অস্পষ্ট, ভাসাভাসা, ধোঁয়াটে যুক্তি অল্পস্বল্প তুলে নীরব হয়েছেন। ফলে বাংলার লোকজীবন থেকে আহৃত এই পরম মূল্যবান কাব্যৈশ্বর্য অবহেলিত হয়েছে এতদিন ধরে। শ্রীজ্‌বাভিতেলের এই বক্তব্যের সত্যতায় কোনো আপত্তি তো উঠতেই পারে না বরং শোচনীয়ভাবে বাংলা সাহিত্যসেবীদের বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত সম্পদগুলির প্রতি ঔদাসীন্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের ঋণ অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস বড়ো একটা দেখা যায় না কিন্তু অবহেলিত চন্দ্রকুমার দেকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার সাহস অনেকেরই আছে, জানি। কিন্তু গভীর ভালোবাসা, পরিপক্ব রসবোধ এবং বিশ্লেষণক্ষমতা প্রয়োগ করে চন্দ্রকুমার দের সারাজীবনের সাধনাকে উপযুক্ত সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এমন একজন বঙ্গসাহিত্যপ্রেমিক পাঠকের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, এ সত্যই আনন্দের কথা।

শ্রীজ্‌বাভিতেল অবশ্য মৈমনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হন নি, উপযুক্ত সমালোচনা ও বিশ্লেষণের দ্বারা এই গীতিকাসমূহের পরিপূর্ণ সমাদরেও অগ্রণী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করে বিষয়টিকে প্রাঞ্জলভাবে সমাধান করেছেন। কোথায় নিহিত রয়েছে মৈমনসিংহ গীতিকার বিশিষ্ট সৌন্দর্য, কোন কোন বিশিষ্ট গুণ এদের উৎকর্ষের উৎস, তা দেখাতে গিয়ে শ্রীজ্‌বাভিতেল্‌ গীতিকাগুলিকে একটি একটি করে করে বিশ্লেষণ করেছেন। এই গীতিকাগুলির প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠার পর এগুলির উপর ভিত্তি করে তিনি লোককাব্যের নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে তিন ধরনের অভিমত লক্ষ্য করেছেন লেখক। কেউ কেউ এই গীতিকাগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবেই সন্দিহান। এঁরা এগুলিকে কোনোরকম স্বীকৃতিই দিতে চান না। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে হয়তো গীতিকাগুলি মূলত খাঁটিই, কিন্তু এতে নানারকম ভাবে হস্তক্ষেপ করে অনেক অদলবদল করা হয়েছে। তৃতীয় আরেক দলের মতানুযায়ী গীতিকাসমূহ পুরোপুরি লোকসাহিত্যের নিদর্শন এবং এগুলোর মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অদলবদল করা হয় নি। গ্রন্থকার প্রথম দলে কবি জসীমুদ্দিন ও নন্দগোপাল সেনগুপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের প্রতিপক্ষ হিসাবে তৃতীয় দলে তিনি উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক আশুতোষ

ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মহম্মদ মনস্থরউদ্দীন, মৈমনসিংহের রওশন ইয়াজদানী ও চিত্তরঞ্জন দেবকে। মৈমনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা যে-যে কারণে সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই কারণগুলিকে লেখক আলোচনার স্থবিধার জন্যে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রথমত, এখন মৈমনসিংহে এই সব গীতিকার কোনো নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, গীতিকার ভাষা ও মৈমনসিংহে প্রচলিত উপভাষা বিভিন্ন। গীতিকাসমূহে প্রায় আগাগোড়া সাধুভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তৃতীয়ত, বিষয়ের দিক থেকে গীতিকাসমূহ ধর্মনিরপেক্ষ, রোমাণ্টিক এবং রং-চড়ানো।

১৯৬০ সালের শরৎকালে ইউনেস্কো থেকে একটি বৃত্তিলাভ করে শ্রীজ্‌বাভিতেল্‌ তিন মাস ধরে পূর্ব-মৈমনসিংহের গ্রামাঞ্চলে ঘুরেছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন কবি জসীমুদ্দিন। এবং তাঁরাও মৈমনসিংহ গীতিকার কোনো নিদর্শন খুঁজে পান নি। তথাপি শ্রীজ্‌বাভিতেল্‌ গীতিকাগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়ী। কারণ, ঐ বিশিষ্ট আঙ্গিকে গীতিকাসমূহের অবলুপ্তি তাঁর মতে নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে এরকম না ঘটাই অস্বাভাবিক। পরিবেশ এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রভাবেই এরকম ঘটে থাকে। গীতিকাসমূহ সংগ্রহের আগেই মৈমনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকায় ১৯১৪ সালের এপ্রিল-মে সংখ্যায় চন্দ্রকুমার দে গীতিকাসমূহের দ্রুত অবলুপ্তির বিষয়ে জানিয়েছিলেন। তাছাড়া, ছেলেবেলায় এই গীতিকাগুলি যাঁরা মৈমনসিংহের পল্লী অঞ্চলে স্বকর্ণে শুনেছেন, যথা—আজহাউল ইসলাম, রওশন ইয়াজদানী, জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি সাহিত্য-সেবীদের সাক্ষ্যও উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। গীতিকাসমূহের প্রকাশকালে মৈমনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকায় যাঁরা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন, যথা—স্থরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, তারিণীকান্ত মজুমদার, স্থধাংশুভূষণ রায় প্রভৃতি কেউই গীতিকাসমূহের প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন নি, যদিও তাঁরা অন্যান্য বিষয়ে চন্দ্রকুমার দেকে সমালোচনা করেছিলেন। একা চন্দ্রকুমার নন, নগেন্দ্রচন্দ্র দে এবং বিহারীলাল রায়ও কয়েকটি গীতিকা সংগ্রহ করেছিলেন। এতদ্ভিন্ন, গীতিকা আকারে দুর্লভ হলেও গীতিকার গল্পগুলি এখনও 'কিস্‌সা', 'লম্বাগীত' ইত্যাদি আকারে প্রচলিত আছে।

ভাষার দিক থেকে অধ্যাপক স্থকুমার সেন গীতিকাগুলি সম্বন্ধে যে আপত্তি তুলেছেন সে প্রসঙ্গে শ্রীজ্‌বাভিতেল্‌ মনে করেন—মৈমনসিংহের

আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে গীতিকার ভাষার মিল না থাকা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। চন্দ্রকুমার দে, এমনকি, দীনেশচন্দ্র স্বয়ং মৈমনসিংহের ভাষা অবিকৃত ভাবে ছাপার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। তাছাড়া লোক-কবিরা উপভাষায়ই বা কেন কবিতা রচনা করতে যাবেন যদি তাঁরা সাধু ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম হন? সাধু ভাষা ব্যবহৃত হলে, গ্রামাঞ্চলে কবির এবং কাব্যের মর্যাদা বাড়ে—এতো জানা কথা। পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কাব্যরচনায় সাধু ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যে সন্দেহের কি কারণ থাকতে পারে? মৈমনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের অন্যত্র থেকে সংগৃহীত লোকসাহিত্যের অজস্র নিদর্শনের মধ্যে সাধু ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। বিষয়ের দিক থেকে এবং উচ্চতর আঙ্গিকের দিক থেকে যে সব আপত্তি উঠেছে সে সম্বন্ধে শ্রীজ্‌বাভিতেল্ স্পষ্টতঃ পৃথক মানদণ্ড ব্যবহারের পক্ষপাতী। হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সাহিত্যের গণ্ডীর বাইরে মুসলমান সাহিত্যের প্রভাবে পুষ্ট লোক-সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড এবং ঐতিহ্যানুসারী সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড এক হতে পারে না বলেই লেখকের ধারণা। ধর্মীয় অনুশাসন ও সমর্থনের মুখাপেক্ষী ছিলেন না বলেই লোককবিরা বিষয়ের দিক থেকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দেখাতে পেরেছেন। মুসলমানী ঐতিহ্যের প্রেমগীতির প্রভাবকে তাই লোকজীবনে প্রতিফলিত করা লোক-কবিদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

শ্রীজ্‌বাভিতেলের পুস্তকটি চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে তিনি গীতিকাসমূহের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বিতীয় অংশে গীতিকাসমূহের বিষয় ও রচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অংশটিই সর্ববৃহৎ। এতে তাঁর আলোচ্য বিষয় হল গীতিকাসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি, যথা—গীতিকার কবিদের মতাদর্শ ও কলাদর্শ; হিন্দু ও মুসলমান ভাবনার মিশ্রণ; গীতিকাসমূহের রচয়িতাবৃন্দ; প্রকৃতি ও বারোমাসী; নীতি, চিন্তা ও ভণিতা; ছন্দ। চতুর্থ অংশে লেখক উপমা ও অন্যান্য অলঙ্কারের কাব্যসৌন্দর্য নির্ণয় করেছেন। স্বল্পপরিসর আলোচনায় সমগ্র পুস্তকটির প্রতি, অতএব, সুবিচার অসম্ভব।

মৈমনসিংহ গীতিকার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ যে সব কারণে সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সেই কারণগুলি শ্রীজ্‌বাভিতেল্ সম্পূর্ণ দূর করতে পেরেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। তবে গীতিকাসমূহের কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণে ও

তাদের সাহিত্যমূল্য নির্ণয়ে তিনি যে সব অভিমত প্রকাশ করেছেন সেগুলি অবশ্যই আরো আলোচনার অপেক্ষা রাখে। একজন মহাপ্রাণ বিদেশী উদ্যোগী হয়ে যে পথনির্দেশ করেছেন, আশা করব, আরো অনেকে উৎসাহের সঙ্গে সেই নির্দেশ গ্রহণ করে লোকসাহিত্যের সমাদরে ও সংরক্ষণে অগ্রণী হবেন।

অনিমেষ পাল

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন॥ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী॥ ছ' টাকা॥

রামমোহন ভারত-পথিক। রামমোহন উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রবর্তক। সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে আন্দোলন, কৃষকের খাজনার হার বেঁধে দেবার দাবি, কোম্পানীর নুনের একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর মধ্যে এক অসাধারণ প্রজ্ঞাবান মানুষের বহুমুখী কর্মজীবনের পরিচয় মেলে। দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি বরাবর চেষ্টা করে গেছেন। সেই বিষণ্ণ যুগে দীপ্ত সূর্যের মতো তাঁর আবির্ভাব। "ভারতবর্ষের জীবনে নব জাগরণের ও নব বসন্তের সব সম্ভাবনা" তিনি বহন করে এনেছিলেন। উনিশ শতকের ভারতের ইতিহাসে রামমোহনের প্রগতিশীল ভূমিকা তর্কাতীত। কিন্তু তিনি কি ভারতে শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেছেন? তাঁর যুগে এদেশে শিল্প-বিপ্লবের কোনো সম্ভাবনা ছিল?

আলোচ্য বই-এর শিরোনামা চমকপ্রদ। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিপাদ্য বিষয়, রামমোহন ও দ্বারকানাথ ভারতে শিল্প-বিপ্লব, তথা "বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করবার জন্য" এগিয়ে এসেছিলেন। শ্রীঠাকুরের বক্তব্যের সারাংশ আমরা উপস্থিত করবো। রামমোহনের যুগে ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হচ্ছিল। কোম্পানী এবং দেশী জমিদার শ্রেণী ছিলেন এই একচেটিয়া অধিকারের পক্ষে, আর উদীয়মান উদারনৈতিক শ্রেণী ছিলেন অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে। রামমোহন ও দ্বারকানাথ উদারনৈতিক শ্রেণীর দাবিকেই দেশের প্রগতির সহায়ক বলে স্বাগত জানিয়েছেন। শ্রী ঠাকুর লিখেছেন "নতুন নতুন ব্যবসা পত্তন করে ও

নতুন নতুন কাঁচা মাল উৎপন্ন করে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মরা গাঙে বান আনতে হলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বাঁধ ভেঙে ইউরোপীয় বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের স্রোত বইয়ে দেওয়া ছাড়া সে দিনের বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় আর কোন পথ ছিল না"। (পৃঃ ২২) ভারতে ইংলণ্ডের ভূমিকা প্রসঙ্গে লেখক বলেন, "বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামো ভেঙে সেখানে নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সম্ভবনা ঘটাবে ইংলণ্ড—এই ছিল সে যুগের ইতিহাসের নির্দেশ।" (পৃঃ ২৪) কোম্পানীর পক্ষ নিয়ে একদল ইংরাজ ও দেশী জমিদার সমসাময়িক সংবাদপত্রে আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৮৩০ সালের ১৪ই জানুয়ারী 'জন বুল'-এ প্রকাশিত ভেরিটাসের চিঠিখানি বেশ উপভোগ্য: "ব্রিটিশ কৌশল? সেটা কি বস্তু? এ দেশবাসীকে কৌশলে ঠকিয়ে যাতে টাকা নেওয়া যায় তারই নাম 'ব্রিটিশ কৌশল'। 'ব্রিটিশ মূলধন' কি? কেন, একটিও টাকা না নিয়ে ভারতে এসে একটি এজেন্সী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং বেপরোয়া ভাবে ধার করা।" (পৃঃ ৩১) রামমোহন ও দ্বারকানাথ ভিন্ন মত পোষণ করতেন, এঁরা ছিলেন অবাধ-বাণিজ্য নীতির স্বপক্ষে। দ্বারকানাথের মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ইংরাজদের সংস্পর্শে এসে "শিক্ষার ও চিন্তার স্বাধীনতা লাভ করেছে," অপরদিকে গ্রামদেশে যেখানে জমিদাররা জাঁকিয়ে আছেন, সেখানে "অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্য ব্যতীত আর কিছু নেই।" (পৃঃ ৫৮) দেশে তখন নীল চাষ প্রসারিত হচ্ছে। নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও, "চাষীদের অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে।" শ্রীঠাকুর দ্বারকানাথ ও রামমোহনের নীল চাষ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। (পৃঃ ৭৭-৭৮) দ্বারকানাথ শহর কলকাতা প্রসঙ্গে লিখেছেন—এখানে জীবিকার নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত; রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, স্বর্ণকার ও দরজীর মজুরির হার বৃদ্ধির মুখে; নৌকোর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাঝিদের অবস্থা উন্নত; কাপড়ের কম দরের দরুণ দরিদ্র শ্রেণী কাপড় কিনতে পারে। (পৃঃ ৮৮-৮৯) অবশেষে শ্রীঠাকুর মন্তব্য করেছেন, "ভারতবর্ষে শিল্প-বিপ্লব ঘটাতে হবে, পুরনো উৎপাদন-প্রণালীকে বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় কলকারখানা বসিয়ে নানা ধরনের জিনিস ও শস্তা জিনিস উৎপন্ন করতে হবে। এইটেই ছিল সেই যুগের ইতিহাস-নির্দিষ্ট কর্ম। তাই সেটা ধলা আদমী দিয়ে হোক কিম্বা কালা আদমী দিয়ে হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।...অতি

সচেতনভাবে এই শিল্প-বিপ্লব ঘটাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দ্বারকানাথ ও রামমোহন"। (পৃঃ ৯০) শ্রীঠাকুরের মতে "তাই ইংরাজের সহযোগিতায় ভারতের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করবার জন্ম দুটি অসামান্ত পুরুষ সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন—রামমোহন ও দ্বারকানাথ।" (পৃঃ ১১৪)

শ্রীঠাকুরের মতামত অভিনব, কিন্তু তর্কাতীত নয়। তাঁর কোনো কোনো সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক ভিত্তি দুর্বল। প্রথমত, রামমোহন-দ্বারকানাথের যুগে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করবার কোনো সম্ভাবনা ছিল কি? তখন দেশে বুর্জোয়া বা শ্রমিকশ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে নি। প্রধানত জমিদারি-জোতদারি প্রথার গর্ভে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম, তার নেতৃত্বে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব ঘটবার কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া "ইংরেজের সহযোগিতায়" ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব ঘটবার কোনো নজির ইতিহাসে আছে বলে আমার জানা নেই। দ্বিতীয়ত, সে যুগে শিল্প-বিপ্লব ঘটবার সম্ভাবনা ছিল কি? তখন বাংলার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কি? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়েছে (১৭৯৩)। পুরনো বণিক শ্রেণী বাণিজ্য ছেড়ে বা বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটে গিয়ে ঝুঁকেছেন জমির নিরাপদ আয়ের দিকে। বাংলার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য তখন এজেন্সী হাউসগুলির মুঠির মধ্যে। শিল্প-বিপ্লব ফাঁকা কথা নয়, শিল্প-বিপ্লব বলতে বোঝায় উৎপাদন-পদ্ধতির রূপান্তর। রামমোহনের যুগের বিশেষ অবস্থায় উৎপাদন-পদ্ধতির রূপান্তর সম্ভব ছিল? রামমোহন কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে গেছেন। ১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট পাশ হবার পরে এদেশে অবাধ-বাণিজ্য নীতি চালু হল। 'ফ্রি ট্রেড ক্যাপিটালিজম'-এর যুগে এদেশে শিল্পায়ন ঘটেছে সত্য, কিন্তু তার গতি ছিল মন্থর এবং সে পর্বেও "ইংরাজের সহযোগিতায়" শিল্প-বিপ্লব ঘটে নি। তৃতীয়ত, রামমোহন কি স্বয়ং এদেশে শিল্প-স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, যেমন হয়েছিলেন দ্বারকানাথ। বইটির অর্ধাংশ জুড়ে দ্বারকানাথের চিঠিপত্রের উদ্ধৃতি এবং কর্মজীবনের আলোচনা তাই আকস্মিক নয়।

নীলচাষ সম্পর্কে দ্বারকানাথ ও রামমোহনের বক্তব্য বহুল আলোচিত। নীলচাষের মতো সর্বজননিন্দিত এক প্রথার তাঁরা সমর্থক হলেন কি ভাবে? সে যুগেও এই প্রথার তীব্র সমালোচনা করে গেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকায়। রামমোহনের বক্তৃতায় এই কথাগুলি ছিল:

"নীলকুঠির আশেপাশের বাসিন্দারা নীলকুঠি থেকে দূরের জায়গার লোকদের চেয়ে ভালো কাপড় পরে ভালো অবস্থায় বাস করে।" নীলকুঠির খাস জমিতে বা সংলগ্ন জমিতে যারা চাষ করত, তারা মজুরি পেত এবং তাদের অবস্থা সাধারণ চাষীর তুলনায় হয়তো খারাপ ছিল না। কিন্তু নীলচাষ হত গ্রামে গ্রামে, জমিদারের এবং রায়তের জমিতে। এখানে দাদনপ্রথা ছিল ব্যাপক। দাদনপ্রথা গোমস্তা ও লাঠিয়ালের কল্যাণে চাষীকে প্রায় ভূমিদাসে পরিণত করে। ধানের জমিতে চাষী নীল করে, কিন্তু নীলের লাভজনক দর সে পায় না। নীলচাষীর ব্যাপক বিক্ষোভের পরিণতি নীলবিদ্রোহ, টাউন হলে দ্বারকানাথ-রামমোহনের বক্তৃতার ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে বিদ্রোহ ঘটেছিল। তাহলে দ্বারকানাথ ও রামমোহন এই প্রথাকে সমর্থন করতে পারলেন কি করে? এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক গবেষক লিখেছেন: "The Zamindars often enjoyed higher rents from the lands sown with indigo—a fact which might have brought Rammohun and Dwarkanath to the defence of the system।" (Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency*, পৃঃ ২৩৫)। রামমোহন ও দ্বারকানাথ উভয়ই ছিলেন বিত্তবান জমিদার। দ্বারকানাথ স্বয়ং নীলকুঠির মালিক ছিলেন।

শ্রীঠাকুরের এই বই সুখপাঠ্য। ঘরোয়া ভাবে তিনি রামমোহনের যুগের আলোচনা করেছেন। রামমোহন ও দ্বারকানাথের চিঠিপত্র বইতে উদ্ধৃত হয়েছে। সাহসের সঙ্গে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন, যার কয়েকটি মেনে নেওয়া গেল না, কিন্তু তাঁর বই পাঠকসমাজে সমাদর পাবার দাবি রাখে।

সুনীল সেন

প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দধারা প্রকাশন। ছ টাকা।

"দাওয়ায় নামকাওয়াস্তে ছায়া এক ফালি, সেই ছাওয়ায় বসে ওরা ঠোঙা বানাচ্ছে। সূর্য যত হেলবে ওরাও তত ঘনিষ্ঠ হবে। ····· ছায়া কাড়াকাড়ি করতে করতে এ ওর সাথে মিশে যেতে চাইবে। স্বার্থের টানে ভাই-বোনের ভালোবাসা তালগোল পাকিয়ে জমাট বাঁধবে। তারপর খিদের শ্রমে হতক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। ······ সকালে কয়েক খামচা করে মুড়ি

খেয়ে বিকেল চারটের ভাত খেতে হলে খাওয়ার আগে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেওয়া ভালো। ঘুম থেকে ওঠা মাত্র ভাত বেড়ে দিলে খেতে ইচ্ছে করে না। অনিচ্ছায় খেলে চালের খরচ কমে, হজমে দেরি হয়। ...... সংসারের জন্য মাধুরীকে কত প্ল্যানই খাটাতে হয়েছে! চোখ বুঁজে মাধুরী বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ বুঁজে থাকতে থাকতে, থাকতে থাকতে থাকতে থাকতে, আকাশে সূর্যের তাত সইতে সইতে, সূর্যের তাত সইতে সইতে সইতে সইতে মাধুরী ভাবতে চায় সূর্য নয়, চাঁদ। পৃথিবীতে রোদ নয়, জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার ষাঁড়াষাঁড়ি বান ডেকেছে। জ্যোৎস্নায় বিশ্বচরাচর থইথই করছে। ..... পৃথিবীর সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে গেছে কিনা তাই ভোল বদলেছে জ্যোৎস্নাও।”

‘প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি’ মোট সাতটি গল্পের সংকলন। বিভিন্ন সময়ে রচিত এবং প্রকাশিত এই গল্পগুলির গ্রন্থভুক্তি ঘটল উনিশশো তেষট্টির জানুয়ারি মাসে। সংকলনের প্রথম গল্পের (নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ) যে উদ্ধৃতি দিলাম উপরে, তা একটু দীর্ঘ হলেও গল্পগুলির সামগ্রিক মেজাজের উপস্থাপনায় প্রয়োজনীয় বোধ করেছি। ··· আজ চৌষট্টি সালে যখন বিশেষ করে সাহিত্যের চেহারাটা একেবারে নড়বড়ে অজীর্ণ রোগীর ফাঁপা কেরামতিতে দাঁড়িয়েছে, তখন হঠাৎ-উপস্থিত এই গল্পগুলি অবশ্যই তর্কমূলক হওয়া সত্ত্বেও, সুস্থরকমের আকর্ষণীয়। আকর্ষণীয় নানা কারণে। যে-কোনো গল্পই তার প্রমাণ।

প্রথম গল্পে—‘নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ’-র মাধুরী ঘরগেরস্তালির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই জীবিকার যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার স্বামী বিপিন রায়, যে “ইংরেজ তাড়াবার জন্য প্রাণ দিতে” যাওয়ার পুরনো স্মৃতি আঁকড়ে থেকে-থেকে সম্প্রতি বিপরীত পরিবেশের চাপে একেবার অনন্যোপায়-ভাবে ভিক্ষাজীবী, এবং দেহে-মনে অসুস্থ, অকর্মণ্য—তাদের আশ্চর্য আন্তর্বিরোধের কাহিনী অত্যন্ত সহজ নিরাসক্তিতে রচিত হয়েছে। এ নিরাসক্তি চাপা আন্তরিকতার। এ নিরাসক্তি আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে পাই। তাই হয়তো শান্তিবাবুর গল্পগুলি এতটা বেশি মানিকবাবুর কাছ-ঘেঁষা। দ্বিতীয় গল্প, ‘প্রাণ চায় চক্ষু না চায়’। এই গল্পটির চাল জটিল।

সামান্য ভাত-কাপড়ের সমস্যা মেটাতে কুন্তিকে এসে থাকতে হয় তার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় শ্যামলের বাড়িতে পরিচয় গোপন করে, এবং ফলত, শ্যামলের স্ত্রী চারুর অশান্তি। সমস্ত ব্যাপারটা একমাত্র শ্যামল ছাড়া আর সকলের অজানা থাকায় অন্য চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতমা চারুর উপর যে অনিবার্য ছায়াপাত ঘনিয়ে ওঠে, তারই নির্মোহ দলিল এই গল্পটি। এখানেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তৃতীয় ও পঞ্চম গল্পে ('মৃতজনে দেহ প্রাণ' এবং 'অন্ধজনে দেহ আলো') খুব একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করা না গেলেও, মোটামুটিভাবে লেখকের দায়িত্ববোধ এবং মমতা এ-দুটিতেও স্বচ্ছ। সংকলনটির ষষ্ঠ গল্পে ('কমলমুকুলদল খুলিল') নিচু জীবিকায় অভ্যস্ত কিছু মানুষের স্নেহ-ভালোবাসার খবর আমরা পাই বটে, কিন্তু তা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ায়, আসল স্বাদটুকু পেতে একটু অসুবিধা হয়। 'বন্ধু, রহো রহো সাথে' এবং 'আমি চঞ্চল হে' (চতুর্থ ও সপ্তম) যথাক্রমে দুটি সত্যিকারের উল্লেখ্য গল্প। আমাদের দেশের এই নষ্ট সমাজনীতির দ্বারা দুষ্ট ও প্রভাবিত এখনকার মানুষের আন্তর্সম্পর্ক প্রসঙ্গে এগুলি অন্তত আগামী কয়েক বছর পর্যন্ত স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবে। যদিও গল্পগুলিতে মাত্র কয়েকটি বন্ধুর মধ্যেকার নানা জটপাকানো মনস্তাত্ত্বিক সংকীর্ণতার পরিচয়টুকু রেখেই লেখক সরে গেছেন আড়ালে, তথাপি, জাতকেরানী ভূপতি ও তার অসুস্থ বন্ধু রাজনৈতিক কর্মী জিতু—এবং একই আপিসের দুই সহকর্মী বন্ধু জগদীশ ও মুরারিদের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব—নিশ্চয়ই বলতে পারা যায়, এখনকার ছন্নছাড়া এই শূন্যমূল্য সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় যথাযথ।

মনে রাখতে হবে 'প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি' নামক গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল উনিশশো তেষট্টি, এবং ঘটনাস্থল কলকাতা। সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে, অন্তত এই গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা, অন্তর্ভুক্ত সাতটি গল্পেরই বিষয় হল বর্তমান কলকাতার সাধারণ, আচ্ছন্ন মানসিকতা এবং জীবনযাপনের জটিলতা। গল্পগুলি মর্বিড হতে পারত, কিন্তু হয় নি, প্রধানত লেখকের আটপৌরে বর্ণনামূলক টানা-বাক্যবিন্যাস ও স্বাভাবিক বিশ্লেষণভঙ্গির দরুণ। এবং এগুলি থেকে কখনো-কখনো এমনই এক কটুমধুর satire-এর স্বাদ উদ্ভূত হয়েছে (উদাহরণ, 'বন্ধু, রহো রহো

সাথে'-র ভূপতির বাড়ি-ফিরে-এসে জামাকাপড় খুলতে-থাকার অংশটি—৭২-৭৩ পৃঃ) যা বলা যায়, মানিকবাবুর পর অনেকদিন বাংলায় পড়ি নি। এরকম বলছি না যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম লক্ষ্য করেই শান্তিবাবু তাঁর কলমে কালি ভরেছেন, কারণ, কোনো কোনো অংশে 'প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি' তার নিজস্ব দায়িত্বে যথেষ্টরও অধিক আন্তরিক। সংকলনটিকে পৃথক ধরনের নতুন মনে হওয়াতে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছি, আর সেইজন্যই হয়তো, এই গল্পগ্রন্থটির স্থানবিশেষের অকারণ বাক্য-জটিলতা পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। তদুপরি, এ-জাতীয় গ্রন্থের বহিরঙ্গে ঐ ধরনের অহেতুক বিজ্ঞাপনটি প্রাথমিকভাবেই যে-কোনো পাঠকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাতে পারে, যেটা অন্তত এখানে এমন পরীক্ষামূলক সাহিত্যের মুখবন্ধে একেবারেই কাম্য ছিল না। জানি না, কি ভেবে শান্তিবাবু ঐ বিজ্ঞাপনী রসিকতার অনুমোদন করেছেন। ...এইসব সামান্য ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করেই বলছি, এই শ্রেণীর গল্পসংকলন এখনকার ভারতবর্ষে আরো প্রয়োজন। এ-রকমের শাণিত আবেগ বাংলাসাহিত্যে পুনর্বার আমদানি করার জন্য অবশ্যই শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপকের স্ত্রী। অশোক রুদ্র। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। ২.০০।

ইতিহাসকে উপেক্ষা করে সাময়িকভাবে সফলতা লাভ করলেও পরে ইতিহাসের কাছে উপেক্ষিত হতে হয়। এই সত্য কোনো সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যতটা প্রযোজ্য তার থেকে কোনো শিল্পীর ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রযোজ্য। Ibsen-এর *A Doll's House* নাটকটির ইংরাজী ভাষায় একাধিক রূপান্তর হয়েছে। William Archer এই নাটকটির প্রথম ইংরাজী রূপ দেন এবং শুধুমাত্র এই নাটকটির অনুগত রূপান্তর করার জন্যই Archer-এর নাম চিরকাল ইংরাজী সাহিত্যসেবীদের কাছে অমর হয়ে থাকবে। Archer-এর একজন সমকালীন নাট্যকার Henry Arthur Jonesও (Herman-এর সহযোগিতায়) 'Breaking a Butterfly' নাম দিয়ে *A Doll's House*-এর ইংরাজী রূপান্তর করেছিলেন। Jones তাঁর রূপান্তরে প্রায় সর্বত্র মূলের প্রতি আনুগত্য রেখে শুধু একটি জায়গায় নিজের বিচার-

বুদ্ধি অনুযায়ী স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর Nora-Flora সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সন্তানদের চিন্তায় ঘরে আটকা পড়েছিল। আজ Jones-এর রূপান্তরটির কথা অসহায় গবেষক ছাড়া সকলেই বিস্মৃত হয়েছেন। *A Doll's Housa*কে কেন্দ্র করে ইংরাজী নাট্যজগতের এই ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আধুনিক কালের বাংলা দেশে। Archer-এর মতো শ্রীশম্ভু মিত্র *A Doll's House*-এর একটি অনুগত রূপান্তর করেছেন 'পুতুল খেলা'য়। Ibsen-এর প্রতি আনুগত্য শ্রীমিত্রকে Archer-এর মতো সাফল্য এনে দিয়েছে। শ্রীঅশোক রুদ্র Jones-এর পথ অনুসরণ করে ঐ নাটকটির বাংলা রূপান্তর করেছেন নিজের মতে। ফলে শ্রীরুদ্র Jones-এর মতোই ইতিহাসের শিক্ষাকে অস্বীকার করে নিজেকে ইতিহাসের বিরাগ-ভাজন করেছেন।

A Doll's House-এর বিষয়বস্তু এককথায় নারীর নিজের প্রতি এবং পরিবার তথা সমাজের প্রতি দায়িত্বের দ্বন্দ্ব। Ibsen-এ এই সমস্যাটি একটি সুবিন্যস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্থাপিত হয়েছে এবং পরিশেষে Nora-র ব্যক্তিত্ব অনমনীয় থেকেছে। শ্রীরুদ্রের কাছে Nora-র এই পরিণতিটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি, তিনি অন্য একটি পরিণতি কাম্য মনে করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতার মধ্যে না গিয়েও বলা যেতে পারে শ্রীরুদ্রের পক্ষে Ibsen-এর কাঠামোর মধ্যে থেকে অন্য পরিণতি ঘটানোর চেষ্টা আদৌ যৌক্তিক হয় নি। তিনি যদি একটি মৌলিক কাঠামোর মাধ্যমে নিজের বক্তব্য উপস্থিত করতেন, তাহলে তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা না থাকলেও যুক্তিগত নিষ্ঠা এবং পারম্পর্য থাকত। কিন্তু 'অধ্যাপকের স্ত্রী'তে শ্রী রুদ্র মূলের কাঠামোটি প্রায় অবিকৃত রেখে নিজের সিদ্ধান্তটি চাপিয়ে দিয়েছেন। বিপদ ঘটেছে সেখানেই। Ibsen-এর Nora পুতুল থেকে ধীরে ধীরে যুক্তি-সহ ভাবে এক সুকঠিন ট্র্যাজিক ব্যক্তিত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছে। শ্রীরুদ্রের নীরা শুরুতে 'স্বাধীনা জেনানা' থাকা সত্ত্বেও পরিণতিতে অত্যন্ত ছেঁদো কারণে হিঁদুয়ানীর খোলস পরছে কারণ শ্রীরুদ্রের ইচ্ছে তাই।

'অধ্যাপকের স্ত্রী' নাটকটি একটি 'Problem-play'। সমাজ ও নারীর ভেতরের সম্পর্ক নিয়ে শ্রীরুদ্র একটি thesis দিতে চেয়েছেন, কিন্তু একটি সার্থক 'Poblem-play' সৃষ্টি করতে গেলে নাট্যকারকে স্মরণ রাখতে হবে

যে তিনি প্রথমে শিল্পী, পরে প্রচারক। শ্রীরুদ্র সেই কথাটি ভুলেছেন। তিনি নাট্যকার হিসেবে ব্যর্থ হয়েছেন কারণ যে কোনো নাটকের প্রাথমিক গুণ—Logical development of the theme—'অধ্যাপকের স্ত্রী'তে অনুপস্থিত। অথচ তাঁর thesis চাপিয়ে দিতে শ্রীরুদ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফলত নাটকটিতে প্রচারকের স্থান নাট্যকারের উর্ধ্বে। এবং সেই কারণে এটি না হয়েছে একটি সার্থক নাটক, না হতে পেরেছে একটি গ্রহণযোগ্য thesis.

'অধ্যাপকের স্ত্রী'-র বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এটির অনাধুনিকত্ব। শ্রীরুদ্র যদি মনে করে থাকেন যে নীরার পরিণতি Nora-র মতো হলে বাংলা দেশের পাঠক বা দর্শক সেটি গ্রহণ করতে পারতেন না, তাহলে তাঁকে 'পুতুল খেলা'-র জনপ্রিয়তার কথা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এবং আর একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করি যে পাঠক বা দর্শকের রুচির পরিবর্তন ঘটানো তো শিল্পীরই দায়িত্ব। Bjrnson যখন *Gauntlet* লিখে দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতার ধ্বজা ওড়াচ্ছিলেন, ঠিক তখনই Ibsen জনমতের ভয় না করে *A Doll's House* রচনা করলেন। Ibsen ভুল করেছিলেন না ঠিক করেছিলেন তার বিচার ইতিহাস করেছে। শ্রীরুদ্র যদি বিশ্বাস করেন যে নীরার পরিণতি Nora-র পরিণতির থেকে পৃথক করার এমনি কোনো প্রয়োজন নেই, তাহলে বাংলা দেশের জনমতকে উপেক্ষা করেও তাঁর সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব ছিল। সে দায়িত্ব শ্রীরুদ্র পালন করেন নি। নাকি শ্রীরুদ্র সেই দায়িত্ব সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না?

A Doll's House-এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কারিগরি করতে গেলে যতটা মনোযোগী হওয়া কাম্য, শ্রীরুদ্রের লেখায় তার ছাপ নেই। আশানুরূপ মনোযোগ থাকলে তিনি *A Doll's House*-কে একাধিকবার Doll's House লিখতেন না, 'পুতুল খেলা'কে 'পুতুলনাচ' বলতেন না, কমলের মা সুষমার মতো অপ্রয়োজনীয় চরিত্র আমদানী করতেন না (Jones-এর সঙ্গে আর একটি মিল!) চিন্তাশূন্য হয়ে নাটকের নামকরণ করতেন না। "আমার না—একবার—একবার—গর্ভ হয়েছিল।" বা "সে আমাকে—আমাকে—বেশ্যা ডেকেছে। বেশ্যা! আমাকে বেশ্যা ডেকেছে·····!" জাতীয় আড়ষ্ট সংলাপ রচনা করতেন না। যাই হোক, পূর্বোক্ত দুর্বলতার তুলনায় এগুলি নিতান্তই তুচ্ছ।

পরিশেষে এই নাটকের পক্ষে একটি মাত্র কথা বলা যেতে পারে। H. A.

Jones তাঁর *'Breaking a Butterfly'*-তে *Ibsen*-কে হত্যা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার ভিত্তিভূমিতেই Shaw, Galsworthy, Granville-Barker, Hankin, Baker প্রমুখ নাট্যকারদের সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে। আশা করা যেতে পারে যে 'অধ্যাপকের স্ত্রী' তার চিন্তার জীর্ণতা এবং শৈল্পিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আগামী দিনের সার্থক এবং আধুনিক 'Problem-play'-র ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারবে।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

অনিলের পুতুল। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। মানস প্রকাশনী। ৫·৫০ পঃ।

অনিল নামীয় এক যুবক ও তার প্রেম-করে-বিয়ে-করা স্ত্রী পুতুলের সংসার-যাত্রার কাহিনী 'অনিলের পুতুল'। অনিল যে কোনো একজন মধ্যবিত্ত যুবক, যে কোনো এক সওদাগরি আফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। দাদা-বৌদি অসুস্থা মা ইত্যাদির যৌথ পরিবারের একজন, যার জীবন গণ্ডীবদ্ধ, আশা-আকাঙ্খা-স্বপ্নের দিগন্ত সীমাবদ্ধ। অনিল অসন্তুষ্ট, শ্রদ্ধাহীন—কিন্তু অসন্তোষ এবং শ্রদ্ধাহীনতার কারণ জানে না। এই অনিলের জীবন আহার-নিদ্রা-সঙ্গমের এবং চমৎকারা অন্নচিন্তার পৌনপুনিকতার একঘেয়েমিতে ঠাসা। এই একঘেয়েমির সুতীব্র জ্বালাবোধ 'অনিলের পুতুল'কে সাধারণ উপন্যাসের স্তর থেকে উঁচুতে নিয়ে যায়। উপন্যাসের উপসংহার অবশ্য জীবনের স্বীকৃতিতেই, অর্থনীতির হিসাবকে অস্বীকার করে, অনিল শেষ পর্যন্ত যখন সংসারের নবাগতকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট না করে স্বাগত জানাবে বলে ঠিক করে এবং ঠিক করে খুশি হয়ে উঠে।

অনিলের পুতুল অবশ্য প্রধানত অনিলেরই কাহিনী—পুতুল এখানে নিষ্প্রভ এবং কিছুটা ব্যক্তিত্বহীন। সেজো, নৃপেনদা, শৈলেশ ইত্যাদি চরিত্রগুলি অবশ্য দক্ষ হাতে চিত্রিত।

সঙ্গমের পৌনপুনিক বিবরণ অবশ্য কিছুটা বিরক্তিকর, সেজোর ঘায়ের বিস্তৃত বর্ণনায় গা-ঘিনঘিন করে এবং উপন্যাসের আবহাওয়াটা যদিও শ্বাসরোধকারী তবু একথা অনস্বীকার্য শ্যামলবাবু শক্তিমান লেখক এবং এই তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসে তিনি দুর্লভ সিদ্ধি অর্জন করেছেন। নির্লিপ্তি শিল্পীর শ্লাঘনীয় গুণ, সে গুণ তাঁর আছে। কিন্তু শিল্পীর আরও একটা গুণ থাকা দরকার। 'তৃতীয় নেত্র' কথাটা ঘসা পয়সার মতো পুরনো শোনাতে পারে—তবু বলব, শিল্পী শুধু ঘটনার লিপিকার নন, ব্যাখ্যাতাও। যা ঘটে তাই শুধু তিনি লিপিবদ্ধ করেন না, যা ঘটতে পারত কিন্তু ঘটল না—তাও তার এক্তিয়ারভুক্ত। আশা করব, পরিণতিতে শ্যামলবাবু হয়ে উঠবেন জীবনের ব্যাখ্যাকারও, শুধু লিপিকার নন।

প্রতোষ গুহ

'নান্দীকার'-প্রযোজিত 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'

এই শতকের গোড়া থেকেই ইবসেনীয় ন্যাচারালিজমের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহের মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে নাট্য-আন্দোলন নতুন নতুন চেহারা নিয়েছিল। সুইডেনে স্ট্রীণ্ডবার্গ 'প্যাশন'-এর নিবিড় চর্চায় বাস্তবের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে ন্যাচারালিজমের নতুন সংজ্ঞানির্দেশে ব্রতী হয়েছিলেন। জার্মানিতে কাইজার ও টলারের নেতৃত্বে এক্সপ্রেশনিজমের চর্চা শুরু হল—তার ঢেউ লাগল চেক্ নাট্যকার কাপেকের, আমেরিকার এলমার রাইস আর থর্নটম্ ওয়াইল্ডারের নাট্যরচনায়। অন্যদিকে ব্রেখট্ তার 'এপিক রিয়ালিজম' নিয়ে উপস্থিত হলেন মঞ্চ-মায়াজাল থেকে মুক্ত করে নাটককে বুদ্ধিগত পরিমার্জনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ফ্রান্সে ককতো, স্পেনে লরকা, ইংলণ্ডে এলিয়ট, আয়র্লণ্ডে ইয়েট্স্ কাব্যের সঙ্গে নাটকের অভেদ রচনায় ব্রতী হলেন। ইতিমধ্যে ইটালিতে চিয়েরালি ন্যাচারালিজমের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শুরু করলেন। চিয়েরালি-প্রদর্শিত পথে লিউইজি পিরান্দেল্লো সচেতনভাবে ইটালিতে ইন্টেলেক্চুয়াল্ ড্রামার সূত্রপাত করলেন।

অবশ্য পিরান্দেল্লো তার নাট্যজীবন শুরু করেছিলেন ইটালির ইবসেন-প্রেমিক গিয়োভানি ভার্গারই অনুসরণকারী হিসেবে—কিন্তু চিয়েরালির প্রভাবে অচিরে তার ইবসেনপ্রীতি ঘুচে গেল—এবং প্রবল আগ্রহে তিনি নিজস্ব নাট্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সযত্ন হলেন।

পিরান্দেল্লো নাটকে উপস্থিত grotesque and gruesome জগত স্ট্রীণ্ডবার্গের নাটকের স্মারক। 'দি নেকেড' নাটকের নায়িকা নিতান্ত রোমান্টিক প্রতিপন্ন হবার লোভে ব্যর্থপ্রেমের অজুহাত রচনা করে আত্মহত্যা করবার ভান করেছিল—শেষ পর্যন্ত তার ভান ধরা পড়ে গেলে সে বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করল। 'প্লেজার অফ্ অনেষ্টি' নাটকে এক মধ্যবয়সী সৎ ভদ্রলোক এক অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে বিয়ে করে স্ত্রীর সঙ্গে তার

যুবক প্রণয়ীর অবৈধ প্রেমকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হল। 'হেনরী দি ফোর্থ' নাটকের উন্মাদ নায়ক সুস্থ হবার পরেও নিতান্ত সামাজিক দায়েই পাগলামির ভান করতে বাধ্য হল। পিরান্দেল্লোর মধ্যে এই তিক্ততা স্ত্রীওবার্গের মতোই কতটা পরিমাণে তার অসুখী ব্যক্তিগত জীবনের ফলশ্রুতি তার বিশদ মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়—তবে ব্যক্তিগত জীবনে পিরান্দেল্লো যে নিতান্তই বিপর্যস্ত ছিলেন এটা সত্য ঘটনা। উন্মাদ স্ত্রীকে নিয়ে ঘরকন্না করা আর নিজের মেয়ের আত্মহত্যার সাক্ষী থাকার প্রভাবে শিল্পরচনায় cynicism-এর আবির্ভাব স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে এ-যুগের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মতো তাঁর রচনাতেও পশ্চিমী সভ্যতার অবক্ষয়ের প্রকট চেহারা লভ্য।

কিন্তু বীভৎসের উদ্ঘাটন ছাড়াও পিরান্দেল্লোর নাটকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে—সেটি হল Reality-র সঙ্গে নাট্যশিল্পের সম্পর্ক বিষয়ে, মানবচরিত্র সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তার তত্ত্বগত উপস্থিতি। প্রথমত 'প্যাশন'কে তিনি মঞ্চে আনেন বুদ্ধিগতভাবে দর্শকের কাছে তাকে উপস্থিত করবার জন্য—সে সম্পর্কে কোনো মায়ামোহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়। এ-সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্য স্মরণীয় : "People say that my drama is obscure and they call it cerebral drama. The new drama possesses a distinct character from the old : whereas the latter had as its basis passion, the former is the expression of the intellect." পিরানদেল্লোর এই 'ইন্‌টেলেকচুয়ালিজম্'কে এরিক্ বেণ্ট্‌লে একটু ঠাট্টাই করেছেন তার *Playwright as Thinker* বইতে। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে পিরান্দেল্লোর রচনায় নাটক ও তার নিজস্ব নাট্যতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে বিশেষ করে তার *Six Character in Search of an Author*-এ। শুধুমাত্র মঞ্চমায়াকে ভাঙবার জন্যই নয়, ইবসেনীয় নাট্যপদ্ধতির সঙ্গে তার একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে চরিত্রচেতনায়। এ-প্রসঙ্গে বিখ্যাত নাট্যসমালোচক এলার্ডাইস্ নিকলের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে : "For Ibsen, a character might be complex but the character was always one despite the complexity : Pirandello splits the atom that is mam, and with explosive results." সত্তার যে বিভিন্ন রূপ আছে এবং সেগুলি যে পরস্পরবিরোধীও

হতে পারে একথা দর্শকদের এবং 'অভিনেতা'দের মনে করিয়ে দেবার জন্য তাই 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'র 'বাবা'র এত প্রাণপণ প্রচেষ্টা। এবং সেই সঙ্গে এ-কথাও বার বার মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা যে অভিনেতারা যতই কলাকুশলী হোন না কেন—সত্তার বিভিন্ন রূপগুলির 'real' চেহারা তৈরি করা তাদের পক্ষে অসম্ভব—অতএব তাদের উচিত মঞ্চে চরিত্রকে নকল করা নয়—তাকে বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করা। এই হল তার নাট্যশিল্পের তাত্ত্বিক ভিত্তি। অবশ্যই এ-কথা মনে হতে পারে যে 'split personality' সম্পর্কে পিরান্দেল্লোর এই মতবাদ এমন কিছু নিজস্বতার পরিচায়ক নয় এবং শেষ পর্যন্ত তার তত্ত্বে গঠনমূলকতার চেয়ে প্রচলিত নাট্যপ্রথার প্রতি আক্রমণশীলতাই বেশি মূল্যবান। আর এমনি একজন নাট্যকারের এমন একটি নাটককে (*Six Character in Search of an Author*) বাংলাতে রূপান্তরিত করে কেউ যদি অভিনয় করেন তবে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে। প্রথম কথা পিরান্দেল্লো যে 'Reality'কে এ নাটকে, বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবেই হোক, মঞ্চস্থ করছেন—ভারতীয় বাস্তবে তার প্রতিরূপ আছে কিনা (না থাকলে শুধু অনুবাদ করে অভিনয় করা উচিত—পটভূমিকা অপরিবর্তিত রেখে)—দ্বিতীয় কথা পিরান্দেল্লোর নিজস্ব নাট্যনীতি এখন বাংলা নাটকে প্রয়োগ করার সার্থকতা আছে কিনা। নান্দীকারের অভিনয় দেখবার সময়েই প্রথম প্রশ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়—কেননা, বুর্জোয়া নীতিবোধের অসারতা, সামাজিক ব্যাভিচার, স্বামী-স্ত্রী-পুত্র সম্পর্কের জটিলতা আমাদের আধুনিক জীবনকে পীড়ন করে—সেজন্য ঐ সব সমস্যাকে আমাদের সমস্যা মনে করাতে কোনো বাধা নেই যেমন কোনো বাধা নেই ইবসেনের জগতকে আপন করে নিতে। গ্যাসমারের কথায় বলতে গেলে পিরান্দেল্লোর "anti-bourgeois protest against a smug society" আমাদের সমর্থন পেতে পারে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি একটু জটিল। প্রথমেই মনে হতে পারে ন্যাচারালিজমের সুস্থ আদর্শ গড়ে ওঠবার আগেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ফ্যাশনে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হল তত্ত্বের একটা বিশাল অংশ Conventional মঞ্চব্যবসার প্রতি ব্যঙ্গাশ্রয়ী—সেগুলি আমাদের দেশেও নিতান্তই সুপ্রযুক্ত এবং উপভোগ্য।

এর জন্য রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের ভাবানুবাদ এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনা প্রশংসনীয়। তবে অভিনয়ের ত্রুটিতে তাত্ত্বিক দিকটা সব সময়

সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু নাটকের মধ্যে 'অভিনেতৃবৃন্দে'র চরিত্রে নান্দীকারের অভিনেতৃবর্গ দলগত অভিনয়ে চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়েছেন—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপভোগ্য অভিনয়ের সঙ্গে মিলে তাতে পেশাদারী নাট্যাভিনয়ের ব্যবসাবৃত্তির প্রতি ব্যঙ্গটা ফুটেছে ভালো।

পিরানদেল্লোর এ নাটককে পশ্চিমে 'কমেডি' আখ্যা দেওয়া হয়—সে সম্পর্কে গ্যাসমার বলছেন: "His laughter is saturrine, if not indeed indistinguishable from acute distress." নান্দীকার গোষ্ঠী রূপান্তর করবার সময় এ-নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসাধন করেছেন। পিরানদেল্লোর *Cerebral* নাটককে বাংলাতে যথেষ্ট পরিমাণে "emotional experience"-এর বাহন করে তোলা হয়েছে। মূল নাটকের "saturrine laughter"-কে বজায় রেখেও নান্দীকার "acute distress"-কেই প্রধান করে তুলেছেন। শেষ দৃশ্যে নিঃসঙ্গ তিনটি চরিত্রের অনন্ত পরিক্রমার নিশ্চল ছবি (মূল নাটকে নেই—মূল নাটক ম্যানেজারের একটি হাল্কা কটুক্তি দিয়ে শেষ) দেখিয়ে নাটকের "তীব্র বেদনা"-কে প্রকট করা হয়েছে। এর ফলে নাটকের কমেডি চরিত্র যে ঘুচে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নতুন চেহারা যা দাঁড়িয়েছে সেটা প্রশংসনীয়।

ব্যক্তিগত অভিনয়ে কিছু কিছু ত্রুটি আছে। Stylisation সর্বত্রই সার্থক হয় নি—কারো কারো উচ্চারণে দোষ আছে। কিন্তু সমগ্রভাবে প্রযোজনা সার্থক এবং এমন একটি দুরূহ নাটক নিয়ে এমন আন্তরিকতাপূর্ণ চর্চা অভিনন্দনীয়।

ধ্রুব গুপ্ত

হ'য়েল, নারলিকার এবং অতঃপর ?

আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি, জটিল গণিত ও তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যার চড়াই ও উৎরাই অতিক্রম না করে এই দুর্বোধ্য বিষয়কে জানা সম্ভব নয়। তবুও আলোচনা করতে হবে। কারণ, ভাবতে হবে কেন এই আলোড়ন।

দার্শনিক ফয়েরবাখের তত্ত্ব পড়ে যে সমাজবিদ্যাবিদ্ উত্তেজিত হয়ে এগারোটা থিসিস্ লিখে ফেলেছিলেন, তাঁর উত্তেজনার কারণ ছিল। কেননা, কর্মকাণ্ডে উত্তেজনারও স্থান আছে। পদার্থবিদ্যা মূলত জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। এখানে, এই উত্তেজনা অসুস্থতার Euphemism মাত্র। এই প্রবন্ধ এই উত্তেজনা প্রশমনে প্রয়াস পাবে।

প্রশ্ন উঠেছে, মহামতি আইনস্টাইন-এর General Theory of Relativity নিয়ে। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে, নতুন করে আইনস্টাইন-অধ্যায় লিখতে হবে বিজ্ঞানের সারণীতে। ডঃ জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার ভারতীয়। অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল তাঁর গুরু তথা সহকর্মী। নারলিকারের গবেষণায় আমরা ভারতীয়রা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতে পারি। কিন্তু আজ যদি এতদিনের সঞ্চিত মনীষা এক নিমেষে সন্দেহের কারণ হয়ে উঠে, আমাদের কি সেই সন্দেহকেও একটিবারের জন্য সন্দেহ করা নিতান্ত সেকেলে কু-অভ্যাস বলে প্রতিভাত হবে ? বিশেষ করে, এই নতুন তত্ত্বের স্রষ্টা যাঁরা, তাঁরা নিজেরাই যখন এর প্রমিতি সম্বন্ধে কোনো নজির দেখাতে পারেন নি। একটি তত্ত্বের সমর্থনে অনেক নমুনা থাকে। কিন্তু একটি মাত্র Crucial Test হয়তো তাকে বানচাল করে দিতে পারে। এইটুকু Test of Time প্রয়োগ করাই বিজ্ঞানের রেওয়াজ। তাই প্রশ্ন উঠে—এই আলোড়ন প্রাকৃতজনসুলভ চিত্ত-দৌর্বল্য কিনা।

যে অট্টালিকায় আমরা অনেক মানুষ বাস করছি, একদিন সকালে যদি জানতে পারি তার ভিত্তিতে ফাটল ধরেছে, আমরা কি আনন্দে, উচ্ছ্বাসে ফেটে

পড়ি। নতুন ইমারত, নয়া ইনসান গড়তে হবে,—ধ্বনি হিসেবে সুন্দর হলেও জটিল শ্রমের কারণ (এবং দুশ্চিন্তারও) প্রকৃত স্থপতিদের। তাই হয়তো বিজ্ঞানীমহল আজ নিথর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে,—মোদ্দা কথাটা কি ? নিউটনের আমলে 'Action-at-a-distance'-এর তত্ত্ব চালু ছিল। যেমন ছেলের অসুখ মা দূর থেকে ঠাহর করতে পারেন। এই প্রাণিক স্পন্দনের মতো নাকি বস্তুজগতের শক্তিও লাফিয়ে চলে এক বস্তু থেকে অন্যত্র। মহাকর্ষকে এই ভাবে জড়বস্তুর ভর ভিত্তিক তথা দূরশ্রুত মহাশক্তি-ভিত্তিক আকারে নিউটন একদা খাড়া করেন। তার পরিণতি আমরা জানি। জানি, আলোর গতিবেগ সসীম। এও জানি তা লোরেনৎস 'invariance' মেনে চলে। যা সাধারণ যুক্তির আপেক্ষিক বেগের মধ্যে এক গৌরবময় ব্যতিক্রম। কিন্তু এইসব তত্ত্ব জানা ও একই সঙ্গে Radiation-কে তরঙ্গের কারণ হিসেবে জানা প্রকৃতই 'Action-at-a distance'-কে অস্বীকার করার পরের অধ্যায়। আবার 'Action at a distance' দেখা দিলে 'Maxwell-Dirac field' ভেঙে যাবে, এটাও বিবেচ্য। কিন্তু বস্তু কি ? বস্তুর গুণেই মহাকর্ষ ? না দেশের ঋজুতার তারতম্য, যা জড়সান্নিধ্যঘটিত, তার জন্য ?

দ্বিতীয় উত্তর বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের। প্রথম উত্তর প্রাচীনদের। তা ছাড়া, বস্তু কি মহাবিশ্বে নিরবচ্ছিন্ন ? না অবচ্ছিন্ন ? এখানেও দ্বিতীয় উত্তর আইনস্টাইনের, প্রথমটি দার্শনিক ম্যাক্ (Mach)-এর (যে ম্যাক্-এর বিরুদ্ধে *Empirio-Criticism* ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক প্রচুর সমালোচনা করেছেন অন্য তত্ত্বগত প্রসঙ্গে)। অঙ্কশাস্ত্রে Singularity বলে একটা কথা আছে। Analytical function যে বিশেষ কয়েকটা বিন্দুতে বা স্থানে non-analytical হয় তাকেই Singularity বলে। আধুনিক Field Theory-এর সঙ্গে charge ও আপেক্ষিকতা Mass বা matter-কে জড়িত করে থাকে। তাই, অবচ্ছিন্নতা হয়েল ও নারলিকারের Field-এ বিশ্বাস করে না। কারণ Self-field of election, Vacuum polarisation ইত্যাদিতে aesthetic value কমে যায়। কিন্তু একটা কথা, নতুন কোনো High Energy Physics তৈরি না করে, পুরনো অসুবিধের বদলে অসুবিধে-দুষ্ট সমস্ত পুরাতনকে বরবাদ করা তো এক হিসেবে শূন্যে প্রস্থান।

আরো একটা প্রশ্ন উঠেছে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব নাকি Physics is a

handmaid of abstract geometry. তাঁদের দুজনের নতুন তত্ত্ব নাকি মহাবিশ্বের ধর্ম থেকে উৎপন্ন। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চাইছেন তাঁদের method-টা inductive। কিন্তু গোটা বিশ্বের উপরে inductive method প্রয়োগ আদৌই সম্ভব কিনা,—পাল্টা তর্ক দার্শনিক মিল (Mill) বেঁচে থাকলে হয়তো তুলতেন। দুনিয়াতে true induction নেই। মানবমনের deduction-এর কাছে আমরা পুরুষানুক্রমে খামকা মাথা নিচু করি নি। নিরুপায় হয়েই করেছি। দেখা যাক্, সত্যিই আইনস্টাইনের তত্ত্ব abstract কিনা। সত্যিই তাতে পদার্থবিদ্যা অনাদৃত কিনা।

বিজ্ঞানের ছাত্রদের জানা আছে, মহাকর্ষ-তত্ত্বে 'Metrical Continuum' প্রকল্পের স্থান কত গভীরে। কিন্তু এই আইনস্টাইন-রীমান দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো বিন্দুর Metrical Structure শেষ বিচারে Group of Rotations-এর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ গোটা Rotationগুলো মিলেই একটা Group তৈরি করা চাই। পিথাগোরাস তত্ত্বে Metric space-এর বৈশিষ্ট্য ছিল: এই Group of Rotations আসলে linear transformations থেকে উৎপন্ন. এর গুণ হল Quadratic Ground formকে নিজের Identity-তে পৌঁছে দেওয়া। Rotation যদি পদার্থবিদ্যা না হয়, Angular Momentum'ও নয়; তাহলে Dispersion Relations রসাতলে যায়। বরং এই বিশ্বে Atom বা universe সবই Rotation-ধর্মী গতিবিদ্যা আশ্রয় করে আছে। নিউটন-এর সেই Pythagorean Metrical space সম্বন্ধেই অবাস্তবতার অভিযোগ আনা যায়।

নারলিকার-তত্ত্বে Field নেই শুনেছি। তাহলে Creation fieldটা কি? যেটা নাকি Matter-এর সৃষ্টি-ধ্বংসের নিয়ন্তা! এই Creation field-এর প্রয়োগে আইনস্টাইনের General field equationer থেকে নাকি Continuous universe জাতীয় আশ্চর্য রকমের সংকেত মেলে, ঠিক যেমন এতদিন শুধু field Equations থেকে অন্য অনেক সত্যের আভাস পাওয়া গেছে। আইনস্টাইন-তত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ এবং আইনস্টাইন-নারলিকার সমবায় ত্রুটিহীন— এ দুটো কথা মেনে নিলে যে তৃতীয় অশুভ একটা বিষয়ও মেনে নিতে হয়, তা হল হ'য়েল-নারলিকারও নির্ঘাত ভুল।

দার্শনিক ম্যাক্ (Mach)-এর বিশ্বাস ছিল 'Continuous Creation of matter'-এ। হ'য়েল ও নারলিকারের বিশ্বাসও অনুরূপ। Theory of

special creation যতদূর জানি বাইবেলের ব্যাপার। খ্রীষ্টের জন্মের কিছু পূর্বে বেলা ন'টা নাগাদ (আর কিছু করার না পেয়ে ?) ঈশ্বর একদিন বিশ্ব সৃষ্টি করে বসলেন। একথা মেনে নিতে কিন্তু আইনস্টাইন বাধ্য করেন না। সর্বোপরি তিনি মূলত Agnostic ছিলেন। দার্শনিক ম্যাক্ (Mach)-এর বিশ্বাসকে যুক্তি-তর্কের পিচ্ছিল পথে নারলিকার-হ'য়েল দেখিয়েছেন, বিশ্বের অন্য কোনো ভর না থাকলে, আমাদের ভরও শূন্য হয়ে যাবে। Absolute motion অর্থহীন। 'Aslolute Acceleration' অর্থহীন। তারপর কি ভরও অর্থহীন ?

প্রথম দুটো কথা আইনস্টাইন তাঁর Special ও General Theory of Relativity-তে প্রমাণ করেছেন। আর তৃতীয়টা হ'য়েল-নারলিকার তাঁদের তত্ত্বে দেখালেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এতেই কি বিজ্ঞানের 'নবযুগ' এসে যাবে ? Space-কে একরত্তি density তো আপেক্ষিক-তত্ত্ব আগেই দিয়ে রেখেছে। তাহলে Creation Field-এর প্রেরণা কোথায় ?

যে কোনো ভরকে বাকী বিশ্বের ভরের সঙ্গে তাঁরা সমীকরণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট করেছেন। এতটা গতিও আমাদের জানা নেই। মন্তব্যও অবান্তর। তবে, Quantum Field-এ এসব ব্যাপার ঘটে থাকে অর্থাৎ এই ধরনের partition scheme। মহাকর্ষের দুর্বলতাকে (বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের তুলনায়) বিশ্বের মোট প্রোটন-সংখ্যার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টাও হ'য়েল-নারলিকার করেছেন।

তাঁদের সাফল্য (ও বিজ্ঞানেরও) কামনা করি।

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

সংস্কৃতি-সংবাদ

শতবার্ষিকীর সংকল্প

খ্রীঃ ১৮৬০-এর সময় থেকে বাঙলা সাহিত্যে সৃষ্টির জোয়ার দেখা দেয়, সাহিত্যের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয়। আরও বিস্ময়কর তার পরবর্তী কয়েকটি বৎসরে বাঙালী মহামনস্বীদের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ থেকে সেই জ্যোতির্মণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বুঝে উঠতে পারি না—এ কি নিগূঢ় রহস্য, না, ইতিহাসেরই নিয়ম? সঙ্গে সঙ্গে শত বৎসর পরে আজ প্রশ্ন জাগে—বিংশ শতকে কি এমন একটা দশক বা এমন একটা যুগ বাঙলা দেশে বা ভারতবর্ষে আর এসেছিল বা আসবে? এ বৎসরই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির জন্মের শত বৎসর পূর্তি—আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ কিন্তু বিগত শত বৎসরের দিকে তাকিয়ে ভাববার মতো সাহস পাই না যে, এমন নক্ষত্রমণ্ডলী এ শতাব্দীতেও আর ফিরে পাব। এসব মনস্বীদের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবও যথাযথরূপে পালন করি কিনা তাতেও আমাদের সন্দেহ জাগে। জওহরলালের অন্ত্যেষ্টি-সমারোহেও এই প্রশ্নই মনে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে আমাদের খোঁচা দিয়েছে। অনুষ্ঠান ও সমারোহের যতটা সুযোগ স্বাধীনতা-লাভের ফলে আমরা আয়ত্ত করেছি, ভাববিলাস-বর্জিত অন্তরের গভীরতা ও সংকল্পের সুস্থিরতা সে পরিমাণে আমরা সঞ্চয় করতে পেরেছি কিনা কে জানে?

স্মৃতিউৎসবগুলি আমাদের আত্মস্থ হবারও আহ্বান। নানা কারণেই আজ আমাদের পক্ষে তা প্রয়োজন। বাঙলা দেশের কেন, ভারতবর্ষের শিক্ষা-জগতে আজ এমন সংকট দর্শায়িত যে, এ সময়ে কে শতবার না মনে করে পারে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম? একদিন অতি-সীমিত পরিবেশে তিনি যে দুর্বার সাহস ও নির্মাণশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন আজ তার অবসর অনেক বিস্তৃত, কিন্তু কোথায় সেই সৃষ্টিধর প্রতিভা? গত ২৮শে জুন যখন তাঁর শতবার্ষিক-উৎসব পালিত হয় আমরা তখন বিশেষ ভাবেই এই প্রশ্নের দংশন-জালাও অনুভব করেছি। তাঁর কীর্তি শত দিকে, শত ভাবেই তা কীর্তনীয়। সেই সঙ্গেই স্মরণীয় আজকের ব্যাপকতর পরিবেশে জটিলতর শিক্ষা-সংকটের কথা, তার সমস্যা ও সমাধানের উপায়। নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের (মিঃ চাগ্‌লার) প্রস্তাবিত শিক্ষা-কমিশন সেদিকে একটি আবশ্যকীয় চেষ্টা। কিন্তু আশুতোষের এই শতবার্ষিকটি শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাব্রতীরা বিশেষভাবে এই

জাতীয় শিক্ষা-সমস্যার আলোচনার বৎসরে পরিণত করুন না? 'পরিচয়'-এর পক্ষ থেকে আমরা আমাদের পরিমিতক্ষেত্রে বাঙালী শিক্ষাবিদ্‌দের এ জন্যে সবিনয়ে আহ্বান করি—আশুতোষের দানের কথা ও শিক্ষার বর্তমান সংকটের কথা আলোচনা সকৃতজ্ঞচিত্তে পত্রস্থ করা আমাদের কামনা।

ঠিক সেইরূপই আমাদের আশা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মনীষা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, ভাষা-সমস্যার আলোচনা, তাঁর জন্মশতবার্ষিক বৎসরে 'পরিচয়'-এর মারফৎ তা পরিবেশণ করা। আমাদের শক্তি অত্যন্ত সামান্য, আর আয়োজনও ত্রুটিপূর্ণ। এই পুণ্যক্ষণগুলিতে আমরা আমাদের সেই দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন বলেই চাই আমাদের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা জাগুক—আত্মপরীক্ষা জাগুক, জাগুক এইরূপে জাতীয় সমস্যাসমূহকে প্রত্যক্ষ করবার মতো সংকল্প ও সাহস!

নতুন পত্রিকা

ইচ্ছা থাকলেও আমরা যা করে উঠতে পারি না তার মধ্যে একটি 'পত্রিকা পরিচয়।' সংস্কৃতি-সংবাদ আজ অনেক সাময়িক পত্রেরই একটি সাধারণ প্রচেষ্টা, 'পরিচয়'-এর আর একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়। অবশ্য তা বলে 'পরিচয়'-এর অক্ষমতা ক্ষমার্হ, তা বলি না। বিশেষত, অন্যত্র অনেক ক্ষেত্রেই যখন সংস্কৃতি-বিলাস ও ব্যক্তি-বিজ্ঞাপনেই সংস্কৃতি-চর্চা উদ্দিষ্ট। তথাপি 'পত্রিকা পরিচয়' বিষয়ে আমাদের ত্রুটি আরও বেশি জমছে, তা স্বীকার করি। একটা কারণ, দেশীয় ও বিদেশীয় বহু সাময়িক পত্রেই আজ অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রকাশিত হয়—পরিমাণে অনেক বেশি যা অর্থহীন এবং অনেক বেশি সার্থকও। সে সবের খতিয়ান-রাখার আশা তাই ছেড়ে দিতে হয়। আবার, দেশে ও বিদেশে ওরূপই উল্লেখযোগ্য নতুন পত্র ও বই প্রকাশিত হয়। যাদের আবির্ভাব অভিনন্দনযোগ্য তাদেরও আমরা অভিনন্দন জানিয়ে উঠতে পারি না। যেমন সাপ্তাহিক 'কালান্তর'-এরও আমরা উল্লেখ করি নি। দুটি সম্প্রতি প্রকাশিত বাঙলা পত্রের তথাপি উল্লেখ না করলেই নয়। শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্ত সুদীর্ঘ কারাবাসের পরে বাঙলা সাময়িক পত্রের জগতে আবির্ভূত হয়েছেন 'কম্পাস' নিয়ে। 'কম্পাস' সংবাদ-সাপ্তাহিক; গতানুগতিক বাঙলা পত্রিকা নয়। ইতিমধ্যেই তা বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—[illegible] সেন-এর পাকিস্তানের রিপোর্ট তো একটা অভিনব

কীর্তিই বলতে হবে। কিন্তু কম্পাস-এর কোনো সংখ্যাই না পড়বার মতো নয়। অনেক প্রস্তাবই তথ্যে ও চিন্তায় সমৃদ্ধ। আরেকটি নতুন চেষ্টা—শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী-সম্পাদিত নতুন মাসিকপত্র 'নবজাতক'। মৈত্রেয়ী দেবী বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক মৈত্রের জন্য আপনাকে আত্মনিয়োগ করেছেন। মূলত যে তিনি কবি ও সাহিত্যিক সে সত্য তিনি ভোলেন নি, 'নবজাতক'ও তাঁকে ভুলতে দেয় নি। তাই 'নবজাতক'কেও অভিনন্দন জানাই।

একমাত্র প্রবন্ধ বা একমাত্র কবিতার বাহন হিসাবেও যে বাঙলা পত্র একমাত্র গল্পের বাহনদের পার্শ্বে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটিও কম উল্লেখযোগ্য কথা নয়। তাঁদের কথাও ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল। কিন্তু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার লিভিং এজ-এর (আমেরিকা) মতো কি বাঙলায় একটি সংকলন-পত্র প্রকাশ অসম্ভব ?

গোপাল হালদার

প্রাপ্তি-স্বীকার : সুশলভ রিপোর্ট

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম অধিবেশনে এম. এ. সুশলভ 'বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবিধানের সংগ্রাম' শীর্ষক যে রিপোর্ট পেশ করেন তার ইংরেজি এবং বাংলা তরজমা আমরা সমালোচনার জন্য পেয়েছি 'তাস' সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে।

সোভিয়েত-চীন মতবিরোধ আজ সংবাদপত্রের নিত্যকার আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিরোধ কি নিয়ে, কারা এই বিরোধের জন্য দায়ী এবং বিরোধ এড়াবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি কি করেছে এবং করছে—এই সুদীর্ঘ রিপোর্টে সুশলভ তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। তিনি কটু-কাটব্য বা গালিগালাজের আশ্রয় নেন নি—যা ইদানীংকার চীনা দলিলগুলির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—তথ্যের পর তথ্য, যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে তিনি তার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সুশলভ রিপোর্টের সঙ্গে হয়তো অনেকে একমত নাও হতে পারেন কিন্তু তারাও অবশ্যই একথা না মেনে পারবেন না যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিরোধ কি নিয়ে তা জানবার পক্ষে সুশলভ-রিপোর্ট একটি অবশ্য-পাঠ্য দলিল।

[illegible] বসু

: পাঠকগোষ্ঠী

'পরিচয়' শেক্সপীয়র সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৭১) শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত লিখিত 'বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই তিনটি বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে :

"১৯৬৩ সালে আমেরিকা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপককে আমাদের দেশে শেক্সপীয়র-চর্চার পরিপূর্ণ বিবরণী পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের শেক্সপীয়র-চর্চার তথ্যকে একত্রিত করে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ডক্টর অমলেন্দু বসু সেদিন কোনো তথ্যই পাঠাতে পারেননি।"

শেষ বাক্যটি কিয়ৎপরিমাণে অস্পষ্ট এবং সেজন্য আমার 'অপারগতা' সম্বন্ধে পাঠকগণ হয়তো প্রতিকূল ধারণা পোষণ করতে পারেন, অতএব ঘটনা যা হয়েছিল সে বিষয়ে আমি সংক্ষেপে দু'কথা লিখছি।

১৯৬৩ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে একটি ইণ্টারন্যাশনাল সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক কংগ্রেস উপলক্ষে পৃথিবীর সব দেশ থেকে প্রায় পাঁচশো ডেলিগেট নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়েছিলেন। এই ডেলিগেটদের মধ্যে আমিও ছিলাম। একদিন কিছু ডেলিগেটদের এক বেসরকারী সম্মিলনে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে একটি ইণ্টারন্যাশনাল বিব্লিওগ্রাফি প্রস্তুত হওয়া কাম্য। এ-প্রসঙ্গে আমাকে অনুরোধ করা হল যে আমি ডিসেম্বর ১৯৬৩-র মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান' বিব্লিওগ্রাফি প্রস্তুত করতে পারব কি না।

উত্তরে আমি বলেছিলাম যে সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে 'ইণ্ডিয়ান' কথাটিতে একটি অখণ্ড ভাষা ও সাহিত্য বোঝায় না। যে অর্থে জাপানী ভাষা ও সাহিত্য অথবা পোলিশ ভাষা ও সাহিত্য বলতে মাত্র একটি ভাষা ও সাহিত্যই বোঝায়, 'ইণ্ডিয়ান' বলতে তেমনটি বোঝায় না, কারণ ভারতবর্ষে অন্তত ১৪টি মুখ্য ভাষা ও সাহিত্য চলমান। এ ছাড়া আরও অনেক ভাষা ও সাহিত্য বিদ্যমান। কেবল মুখ্য ভাষাগুলির কথাই যদি বলি তাহলে সেগুলি পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলির সঙ্গে তুলনীয়, কী ব্যাপকতায় কী সাহিত্য-সমৃদ্ধিতে। হিন্দীভাষীর সংখ্যা পৃথিবীর বৃহত্তম ভাষাভাষীদের মধ্যে [illegible] স্থান অধিকার করেছে। আমার নিজ ভাষা বাংলায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য

রীতিমত সমৃদ্ধ, বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী বাদ দিয়েও যে বাংলা সাহিত্য অবশিষ্ট থাকে তা বৈচিত্র্যে ও মহত্ত্বে যে কোনও অপর সাহিত্যের তুলনায় মর্যাদা পেতে পারে। আমি আমার নিজ ভাষায় (বাংলায়) শেক্সপীয়র গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করার দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। বস্তুত বাংলা ভাষায় এই বিশেষ বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জী-সংক্রান্ত কাজ ইতিপূর্বেই কিছু হয়েছে। হিন্দী ভাষার পঞ্জী সম্বন্ধেও আমি দায়িত্ব নেবার স্বীকৃতি দিয়েছিলাম। আমার অনেক উত্তর-ভারতীয় ছাত্র আমার উপদেশে হিন্দী-সাহিত্যে শেক্সপীয়রের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং এতদুপলক্ষে চমৎকার পঞ্জী প্রস্তুত করেছেন। আরেক ছাত্র উর্দুতে ও আরেক ছাত্র তেলেগুতে (এই দুই ভাষার একটিও আমি জানি না) আমার শেখানো পদ্ধতিতে শেক্সপীয়র-পঞ্জী প্রস্তুত করছেন। এঁদের সাহায্যে আমি মোট চারিটি ভাষা ও সাহিত্যের পঞ্জী সরবরাহ করতে সমর্থ কিন্তু চৌদ্দটি ভাষা ও সাহিত্যের পঞ্জী প্রণয়ন আমার সাধ্যের অতীত, সম্ভবত যে কোনও ব্যক্তির একার সাধ্যাতীত। এই কথা আমি নিউ ইয়র্কের সেই সম্মিলনে বলেছিলাম।

এই হল আমার 'অপারগতার' কাহিনী। শ্রীমান রুদ্রপ্রসাদের বাক্যের অস্পষ্টতায় এমন ধারণা হতে পারে যে আমার অপারগতা আসলে আমারই দুর্বলতা, যদিও সেটা সত্য কথা নয় এবং তেমন ধারণা সৃষ্টি করা তাঁর অভিপ্রেতও নয়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে বর্তমান ১৯৬৪ সালে বাংলায় উপরোক্ত গ্রন্থ-পঞ্জীর অনেক মূল্যবান ছিটেফোঁটা এখানে সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে একটি নানা ভাষার গ্রন্থপঞ্জী। কিন্তু সর্বভারতীয় সম্পূর্ণ পঞ্জী এখনো প্রস্তুত হয়নি, কয়েক বছরের মধ্যে হবার সম্ভাবনা দেখছি না। সাহিত্য আকাদামি এ বিষয়ে নিরাসক্ত। ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ইংলিশ স্টাডিজ-এর সম্পাদনা-সমিতির সভাপতি হিসাবে আমি একটি সর্বভারতীয় শেক্সপীয়র-গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ণের চেষ্টা করছি।

অমলেন্দু বসু

হুগো প্রসঙ্গ

চৈত্র মাসের 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত শ্রীকুমার সেনের পত্রটি পড়লাম। আমার লেখায় একটি অবান্তর লাইনই তাঁর উষ্মার কারণ হয়েছে। "হুগো ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক" এই লাইনটি দিয়ে হুগোর রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্রমবিকাশ

নিয়ে কিছু আলোচনা করব ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে সে ইচ্ছা ত্যাগ করি, কিন্তু দুঃখের বিষয় লাইনটি কাটতে ভুলে যাই। তবে পত্রলেখক উত্তেজিত হয়ে কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন। এগুলির জবাব দেওয়া দরকার।

প্রথমত, হুগোর কোনো মূল্যায়নের এবং সেই প্রসঙ্গে লাফার্গের সমালোচনা করার কোনো চেষ্টা আমি করি নি এবং করা সঙ্গতও মনে করি নি।

দ্বিতীয়ত, লাফার্গের সূত্র অনুযায়ী আমি হুগোকে রাজতন্ত্রের সমর্থক বানাই নি। লাফার্গের ব্যাখ্যা অভ্রান্ত এমন কথাও আমি বলিনি। রবীন্দ্রনাথকে নস্যাৎ শুধু উগ্র বামপন্থীরাই করেন নি, তাঁদের সঙ্গে সনাতনী রক্ষণশীলেরাও রবীন্দ্রনাথকে নস্যাৎ করেছিলেন এ কথাও মনে রাখা দরকার। রাগটা শুধু বামপন্থীদের উপর ঝাড়লে চলবে কেন?

এঙ্গেলস্-এর চিঠিগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে, লাফার্গ কখনও বামপন্থী বিচ্যুতি, কখনও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির কবলে পড়েছেন। হুগোর ক্ষেত্রে তাঁর বামপন্থী বিচ্যুতি ঘটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে চট্ করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত হবে না। কারণ, সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে কারুর মতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয় না। বার্নার্ড শ ও তলস্তয় শেক্সপীয়রকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন বলে আমরা তাঁদের উগ্র বামপন্থী আখ্যা দেব?

তৃতীয়ত, লাফার্গ হুগোর সমকালীন লোক। হুগোকে গর্কী বা অন্যেরা যে ভাবে গ্রহণ করেছেন লাফার্গ সে ভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে পারেন নি। হয়তো সমকালীনতাই এর কারণ। হুগোর গণতন্ত্রপ্রীতিতে লাফার্গ ও তাঁর মতো বামপন্থীরা বুর্জোয়াপ্রীতি ছাড়া আর কিছু দেখতে পান নি। তিনি হুগোর শোক-মিছিলে সমাজতন্ত্রীদের যোগদান সম্পর্কে লিখেছেন:

"All the socialists and revolutionary organisations have decided to take no part in the funeral procession of this greatest of charlatans, this reactionary humbug." (পত্র নং ১৫৫, এঙ্গেলস পল ও লরা লাফার্গ পত্রাবলী)

এ রকম তীব্র মন্তব্যের কারণ শুধুই উগ্র বামপন্থী মনোভাব নাও হতে পারে। আমি নিজে হুগোর ভক্ত পাঠক, লেখক হিসাবে হুগো সম্পর্কে লাফার্গের মন্তব্য আমার পক্ষে হজম করা কঠিন, তবে রাজনীতির বিচারে হুগোর গণতন্ত্রপ্রীতি একটু ঠুনকো ছিল বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে এক সময় জন ষ্ট্র্যাচি বার্নার্ড শ সম্পর্কে তাঁর 'কামিং ষ্ট্রাগল ফর পাওয়ার' নামক গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছিলেন

তা মনে পড়ছে। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, বার্নার্ড শ ইংরেজদের মধ্যে (আইরিশম্যান হলেও) কমিউনিজমকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু প্রতিপত্তি ও স্বচ্ছন্দ জীবনের মোহ কাটিয়ে না উঠতে পেরে তিনি কমিউনিস্ট হন নি। সম্ভবত লাফার্গও একই কারণে হুগোর প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন।

সুকুমার মিত্র

চারুলতা প্রসঙ্গে

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'চারুলতা'র আলোচনা পড়ে কিছু প্রশ্ন জেগেছে যার নিরসন চাই।

মহৎ-সাহিত্যভিত্তিক চিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে মূল সুর, স্বাদ ও রসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে কেউ বলেছেন—চারুর গোপন শোকের অনাবৃত আত্মস্বরূপটি দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে এবং তাতে অন্তঃপ্রবাহী রসবিন্যাসের বিচ্যুতি হয়নি। কেউ বলেছেন সারাংশ বিধৃত হয়েছে। কেউ বলেছেন ছন্দোবদ্ধ রচনায় সুর যোজনা করে যে-গান তা নতুন সৃষ্টি, তার বিচার কাব্যগুণ দিয়ে নয়, সুর দিয়ে।

মানুষের সত্তা, আত্মস্বরূপ তো অখণ্ড নয়। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পারিপার্শ্বিকের টানা-পোড়েনে এক মানুষের অসংখ্য সত্তা, অসংখ্য রূপ। মূল সুর বা সারাংশকে বিধৃত করতে হলে প্রবলতর রূপটিকেই ধরতে হবে।

চারুর রূঢ়তা, কামনা, অসংযম কাহিনীর মূল সুর? ভূপতির নিয়ম-তান্ত্রিকতা, অমানবিকতা মূল সুর? না চারু-ভূপতির হৃদয়ে মস্তিষ্কে, ন্যায়-অন্যায়ে, ভালো-মন্দর টানা-পোড়েনে বিক্ষত হওয়ার গান মূল সুর? পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বিশ্বস্ততায় টান পড়া আর সুপরিকল্পিত বিশ্বাসঘাতিনী হওয়ার স্বাদ এক? বিষাদময় কাব্যে বসন্ত-বাহার-হোরি সুরারোপ গ্রহণযোগ্য?

চা দিতে বলায় চারুর সর্বপ্রথম যে কথা শোনা গেল তার স্বর, তার ভঙ্গি, তার সংলাপ পীড়াদায়ক ভাবে রূঢ়। প্রথম যে-চারু আদর্শনিমগ্ন ভূপতিকে দেখল তার দৃষ্টি বেদনাদায়করূপে তীব্র। 'স্বর্ণলতা' প্রসঙ্গে "হাসছ কেন"র স্বর ও ভঙ্গি, সাহিত্যচর্চায়, ভূপতির নির্দেশের উল্লেখে আচরণ, অমলকে 'বিশ্ববন্ধু' দিয়ে আঘাত, অমলের বুকের উপরে কান্না, ভূপতির অমঙ্গল-আশঙ্কাক্ষণে অমলের হাত ধরে টানাটানি, বিশ্বাসঘাতিনী প্রমাণিত হওয়ার পরও নির্দ্বিধায় ভূপতির মুখোমুখি হয়ে অকম্পিত স্বরে তাকে আহ্বান সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত রূঢ়, আত্মকেন্দ্রিক, ঈর্ষাপরায়ণ, অসংযমী নারী সৃষ্টি হয়েছে—তাতে চারু নেই।

এ চারুকে ভালোবাসা যায় না, এ চারুর জন্ত সমবেদনা হয় না। সহানুভূতি আর ঘৃণা কি এক ?

চারুর অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রনার ব্যথা বোধ করে ভূপতির মানবিক আচরণ চিত্রে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে এক নিয়মতান্ত্রিক, হৃদয়হীন ভূপতি সৃষ্টি হয়েছে। পত্রান্তরে ভূপতিকে প্রভু-মনোভাব ও আত্মম্ভরিতায় মণ্ডিত করা হয়েছে। ষাট বছর আগে যে দু'টি চরিত্র দৃষ্টিভঙ্গির গুণে সমবেদনা আদায় করেছে ষাট বছর অগ্রগতির পরে সে চরিত্রবিন্যাসে যদি বিরাগ সৃষ্টি হয় তবে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিক্রিয়াশীল বলে সন্দেহ জাগে, প্রশ্ন জাগে 'মহানগর'-এর শেষার্ধের ব্যর্থতার কারণ কি ?

শেষ দৃশ্যের শিলীভূত রূপের সমর্থনে একাধিক পত্র-পত্রিকা 'নিষ্প্রাণ' শব্দটি প্রয়োগ করে তারিফ করেছেন। 'নষ্টনীড়' কি একটি শিলীভূত, মিউজিয়ামে রাখা বাড়ির ছবি ? সে নীড়ের রক্তাক্ত-হৃদয় পাখিদের হারানো সুরের করুণ রেশ কোথায় ?

চারুর নিঃসঙ্গতা প্রকাশের অধ্যায়টিকে নিয়ে বহু মাতামাতি হয়েছে। বস্তুত ঐ অংশের অভিনয় অতি দুর্বল। নিঃসঙ্গতা-প্রকাশক কতকগুলি এ্যাকশান বিধিবদ্ধ করে যান্ত্রিক ভাবে পালিত হয়েছে। ঐ অংশের ছবির স্বরতার জন্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়েছে—ছবির মন্থরতা দর্শকের সত্তার সঙ্গে মিশে যায়নি তার কারণ যান্ত্রিক অভিনয়—তারও গোড়ার কারণ চারুলতার রূপান্তর। প্রকাশ যা পেয়েছে তা ধনী-গৃহিণীর খামখেয়ালীপনা। দূরবীণটির ব্যবহারেও (অথবা বহুল ব্যবহারে) ধনী গৃহিণীর হাতের খেলনার বেশি আর কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

ঝড়ের হাওয়ার সঙ্গে অমলের আবির্ভাব বা খাঁচার পাখির ইঙ্গিতে কি নতুন সৃষ্টির কৃতিত্ব আছে ? আমাদের কি নতুনতর কিছু দাবি করার নেই ?

একাধিক আলোচনায় অমলের দেওয়া দোলায় চারুর ভুবনদোলার ইঙ্গিত আরোপিত হয়েছে। অথচ কথাটা সঠিক মনে হয় না—না ভাবার্থে, না আক্ষরিক অর্থে। অমল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চারুকে কোনো দোলাই দেয় নি। না হৃদয়ে, না মস্তিষ্কে। পরের দোলাগুলি নিজেই দিয়ে নিতে পারবে ব্যক্ত করার পর আর মাটিতে পা ছুঁয়ে যাওয়ার উপরে দোদুল্যমান সংসারে শক্ত মাটিতে দাঁড়াবার প্রয়াসের ইঙ্গিত প্রযোজ্য কি ?

প্রচণ্ড দোল খাওয়া অবস্থায় অকম্পিত অ-ভগ্ন স্বরে গান কি সম্ভব ?

গাড়িতে (শেষ বারে) ভূপতির চলমানতার সঙ্গে, তার মুখের উপরের আলোর ব্যতিক্রমে সঙ্গতি ছিল না মনে হয়।

অমলের সুটকেসটি কালোপযোগী ?

শ্রীরায় আমাদের জয়ের পতাকা এনে দিয়েছেন। চিত্র-সমালোচকরা সে পতাকার প্রহরায় অতন্দ্র আছেন তো !

বিন্দু রায়